মানুষ

মানুষ আর প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা

SHAMABESH

আরব গেরিলাদের আক্রমণের লক্ষ্য মূলত পশ্চিমের ভোগবাদী সভ্যতার আরামআয়েশ, অবকাশ আর মুনাফার জায়গাগুলো। এই আরাম আর মুনাফার পেছনে রয়েছে গোত্রে গোত্রে দাঙ্গায় সিয়েরা লিয়নের জঙ্গলে জমে ওঠা একহাঁটু রক্ত, অনাহারে বিনাচিৎসায় মরা ইরাকের পাঁচ লাখ শিশু, নিহত ছেলের শিয়রে কালাশনিকভ হাতে-ধরা ফিলিস্তিনি মা। এই আরামে ব্যাঘাত ঘটানোই তো একটা পবিত্র দায়িত্ব, আর তা কমবেশি পালন করে চলেছেন আরব গেরিলারা।

আর সব বাতাসের মতো এই বাতাসও বাংলাদেশে লাগে। সেলুনে ঝোলে লাদেনের ছবিঅলা ক্যালেন্ডার। সাইকেলের তালার চাবির রিং-এ ঝোলে লাদেন। মসজিদ থেকে বেরিয়ে একজাতীয় মোল্লা স্লোগান হাঁকে 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালেবান'। বাতাসের ঝাপটায় আরও একটা যে-জিনিস বরাবরের মতো এবারও দৃষ্টিগোচর হয় সেটা হলো আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি। এদের একদল মুখে এমন 'শান্তি-কল্যাণ' -মার্কা টেপ মেরে রাখে যা দেখেই সন্দেহ হয়; আরেক দল এত উচ্ছ্বাসে দামামা বাজায় যে অবিশ্বাস না-করে উপায় থাকে না। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের মতো সর্বার্থে গরীব দেশের ততোধিক গরীব মানুষদের একটা পক্ষ নিতেই হয়।

মূল্য ঃ ৪৯৫ টাকা

ISBN. 984-8243-20-8

মানুষ

মানুষ আর প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা

SHAMABESH

আধুনিক ও নিরীক্ষাধর্মী সাহিত্য ও অনুবাদগ্রন্থ
প্রকাশনা ও পরিবেশনা

মানুষ

মানুষ আর প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ২০০৩

SHAMABESH

সমাবেশ, ঢাকা ॥

২০০৩

মানুষ : সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা
সম্পাদক : সেলিম রেজা নিউটন

প্রকাশক
সমাবেশ
২৭, আজিজ মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

© ২০০৩ সেলিম রেজা নিউটন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩

এই বইয়ের কোনো অংশ লেখক বা প্রকাশকের
অনুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ

অলঙ্করণ ও লোগো : সেলিম রেজা নিউটন

মুদ্রণ
প্রত্যাশা, ঢাকা

ISBN 984-8243-20-8

উৎসর্গ

বাংলাদেশের হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ-পাহাড়ী-আদিবাসী জনমানুষ,
'সংখ্যালঘু' হওয়ার কারণে যাঁদের জীবন-যৌবন-সম্মান পর্যুদস্ত;

এবং

চাপিয়ে-দেয়া যুদ্ধ ও অনাহারে আহত-নিহত-উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইন,
ইরাক ও আফগানিস্তানের 'সংখ্যাগুরু' মানুষ,
শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে প্রবল মিডিয়ায় যাঁরা অদৃশ্য।

স ম্পা দ না ত থ্য

সম্পাদনা-পরিষদ
আ-আল মামুন
উদিসা ইসলাম
নাজনীন আখতার
ফাহমিদুল হক
বদরে মুনীর
মাহমুদুল হাসান সুমন
রিপন মাহমুদ
সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক
সেলিম রেজা নিউটন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
চিঠিপত্র: প-৮৮/এফ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রাজশাহী–৬২০৫
ফোন: ৭৫০০৪১-৩০৯৭ **মোবাইল:** ০১৭১-৮৬০৩৬৩ ০১৭১-৮৬০৩৬৪
ই-মেল: sunewton@librabd.net A_ev susmita@rajbd.com

মানুষ-এর কথা

প্রতিরোধ মহাপ্রভু স্বয়ং

আরশিনগর টের হয় না কার? যাকে দেখা না-যায় একদিনও, তার খোঁজে দিন যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন খবর হয় ঐ নগরের মালিক 'আমি' নয়, 'প্রভু'– গ্রামময় রাষ্ট্র হয়। আয়নায় আবছা হয় 'আমি'; পড়শি ভেসে ওঠে। আমার-বাইরের-অথচ-আমারই-অস্তিত্বের, অর্থাৎ 'আমাদের', ইতিহাস কখনো সমাজ কখনো অচেতন কখনো-বা রাষ্ট্রের জামা গায়ে দিয়ে টেলিভিশনে হাজির হয়। তখন তাহাকে বলে তাঁহার প্রভুর স্বর। বকধার্মিক সময় দাঁড়িয়ে থাকে এক পায়ে; আর ঝিম-মারা সতর্কতায় বোঝে: 'এইখানে শিকার বোধ হয় বসে থাকে শিকারীর খোঁজে।' পর্দা থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে রাস্তায়; ইঁদুর লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে পিকচার টিউবে। গোলামি আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকে; তাঁহাদের জন্য নহে। কিন্তু দাস হওয়া সহজ নয়; মাংশমগজ পিষ্ট হয়। আরশিনগরের আত্মরক্ষার তাগিদ আমার আর পড়শির প্রতিরোধের কর্তব্য বোধ করে। প্রতিরোধ মহাপ্রভু স্বয়ং। দিব্যযুগে তাঁর অযুত অবতারের একটার নাম আমরা দিয়েছি **মানুষ**।

নোম চমস্কির মনুষ্যভাষাবিদ্যা, প্রচারণাবিচার, মুক্তিবাদী সমাজতন্ত্র, আর আত্মঠিকুজির তত্ত্বতালাশ করা আমরা **মানুষ**-এর ১ম সংখ্যার কাজ হিসাবে নিয়েছিলাম। তেড়ে-আসা অগ্নিঝড় আমাদেরকে ঠেলে দিল সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধের দিকে। যুগের আবছায়াতে নাকানিচুবানি খেতে-থাকা প্রস্তুতিহীন নেমে পড়ি। সরল বোঝা যায়, প্রতিরোধের কথা বলা সহজ, যথাশৃংখলায় কাজ বের করে আনা কঠিন। আফগানিস্তানের প্রস্তরযুগ-প্রত্যাবর্তনের বিস্তারিত বিবরণীও, অন্তত কারও কারও, কর্মতন্দ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে সক্ষম হয় না। এই শিক্ষা আমল নয়– অর্জন করতে করতেই এক বছর পার হয়। তারপর, যাই হোক, কিছু-একটা উৎপাদিত হয়। এই হয় **মানুষ** এর সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা।

আটটা অংশে ভাগ করেছি আমরা এই সংখ্যাটা। উদ্দেশ্য: মিডিয়া-জমানায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-আগ্রাসন আর বিদ্যমান প্রতিরোধের চেহারাকে নিজের মাথা দিয়ে, একেবারে ব্যক্তিগত এলাকায়, ব্যক্তিগত- ও যৌথ-ভাবে মোকাবেলা করা। এই মোকাবেলা মানে মহান গণতান্ত্রিক মতৈক্যে পৌঁছানোর কসরত না– স্বাধীন উপলব্ধিসমূহের এক সঙ্গে থাকার ও যুথবদ্ধ অনুশীলনের হিম্মত অর্জন করা। সুতরাং, **মানুষ**-এর নিজস্ব কোনো প্রকার 'পার্টি-লাইন' বা 'সম্পাদকীয় পলিসি' খোঁজার চেষ্টা বৃথা। মতপার্থক্য এর পাতায় পাতায় অস্তিত্বের মতোই বৈচিত্র্যশীল। কেন্দ্রীয় প্রশ্নটাই শুধু সাধারণ: 'খাঁচার মেঝেটাকে প্রসারিত করতে থাকা'; শেকলের জোড়গুলাকে আলগা করতে থাকা; যে যেভাবে যতটা পারে।

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্রের দিকে তাকালেই পরিকল্পনা স্পষ্ট হবে। লেখাগুলা কেন বাছাই করা হলো সে-সম্পর্কে যেখানে যা বলার মনে হয়েছে সেখানেই সেটা বলা হয়েছে; ছোট হরফে ডানেবাঁয়ে ইনডেন্ট করে। কিছু ইংরেজি লেখা শেষ পর্যন্ত দিতেই হলো। এসবের অনুবাদ দেয়া গেলেই ভালো হতো, কিন্তু গুরুত্বের বিবেচনায় বাদ দেয়াও মুশকিল। বেশ কিছু লেখা/অনুবাদ পুনর্মুদ্রণ করা হলো সংখ্যাটাকে অধিকতর পুষ্ট করার জন্য। লেখাগুলার সাথে-সাথে পুনর্মুদ্রণের উৎস বলে দেয়া হয়েছে। আদি লেখক/মুদ্রক/প্রকাশকের অনুমতি নেয়া হয়েছে সাধ্যমতো।

পাতা ওল্টালেই বোঝা যাবে, এই পত্রিকাটা বিপুলভাবে ইন্টারনেট-নির্ভর। প্রতিরোধের নতুন যে-ভাষা ইন্টারনেট নির্মাণ করে চলেছে তার দ্বারা অনুপ্রাণিতও বটে **মানুষ**। বিশেষ করে মার্ক্সসিস্ট ইন্টারনেট আর্কাইভ, জেড নেট, অল্টারনেট, মাদারজোন্স, নোম চমস্কি আর্কাইভ, এডওয়ার্ড সাইদ আর্কাইভ থেকে অকাতরে আমরা নিয়েছি, শিখেছি ক্রমাগত। সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় ইন্টারনেটসূত্র বলা আছে। কবিতাগুলার বেলায় ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া হয় নি মুদ্রাক্ষরিক সাজনদারির বিঘ্ন কমাতে। কবি বা কবিতার নাম দিয়ে সার্চ দিলেই যে-কেউ জেনে নিতে পারবেন।

মানুষ-এর জন্য কাজ করেছেন অনেক মানুষ। সবার কাজ পেশ করা গেল না। কম্পোজকরা-প্রুফদেখা কাজ আপাতত গুছিয়ে তুলে রাখতে হলো ৩০০ পৃষ্ঠারও বেশি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথা ছিল মুসতাক আহমেদ (গণযোগাযোগ), নাজিয়াত চৌধুরী (গণযোগাযোগ), জুবাইদা আক্তার (গণযোগাযোগ), রবিউল ইসলাম (গণযোগাযোগ), হুমায়ুন কবীর (গণযোগাযোগ), অরুণাশিস রাজন (নৃবিদ্যা), শিপলু (পদার্থবিদ্যা), শান্ত্বনা রাণী কুণ্ডু (ইংরেজি), দেবাশিস রায় (হিসাববিদ্যা) এর সাথে ওঁদের করা কাজগুলা নিয়ে বসা হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠা যায় নাই। এঁদের কাজগুলা এবং **মানুষ**-এর জন্য করতে করতে আমাদের ফেলে রাখা আরও সব অসমাপ্ত কাজ নিশ্চয়ই পাঠকের সামনে হাজির করা যাবে কিছু আগে বা পরে। এক সাথে আরও কাজ আমাদেরকে

করতেও তো হবে।

পাঠককে পরিস্কার করে জানিয়ে রাখা ভালো, আমরা এই সংকলনের চূড়ান্ত ডামি তৈয়ার পর্যন্ত করার পরের সব কাজ – ট্রেসিং থেকে কাগজ-মুদ্রণ-বাঁধাই আর পরিবেশন – 'পাঠক সমাবেশ' করেছে। তাঁদের সাথে সম্পাদিত প্রকাশনা-চুক্তির শর্ত মোতাবেক ১০০ কপি পত্রিকা আমরা নিজেরা বিক্রি করে দিতে রাজি হয়েছি। সেই অনুযায়ী ১০০ কপি পত্রিকার দাম ৩২ হাজার টাকা 'পাঠক সমাবেশ'-কে আমাদের আগাম দিতে হয়েছে। পরে এই ১০০ কপি পত্রিকা বিক্রি করে আমরা ঐ ৩২ হাজার টাকা ফেরত তুলে আনব বলে পরিকল্পনা করেছি। সম্পাদনার 'সম্মানী' বাবদ আমরা পেয়েছি ৭৫টা বই। তা থেকে ৩৫টা গেছে লেখক-কপি।

এই দুষ্কালেও **মানুষ**-এর মতো একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে এক কথায় রাজি হয়ে যে-হিম্মত দেখিয়েছেন 'পাঠক সমাবেশ' তা অসাধারণ। বইমেলা শুরু হওয়ার মাত্র ১৫ দিন আগে গিয়ে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও যে 'পাঠক সমাবেশ' এই পত্রিকার দায়িত্ব নিয়েছেন সেইজন্য তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আর, **মানুষ**কে ২৫ হাজার টাকা বিনাসুদে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ দেয়ার কারণে বন্ধু সাহেদ সরোয়ার সোহেলের কাছে বহুৎ শুকরিয়া।

সেলিম রেজা নিউটন

'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি'

বছর দশেক আগে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম। আমাদের বন্ধু দেবরাজ সাহা তখন কোলকাতায় পড়তো। আর আমরা মফস্বলে থেকেও হাত থেকে হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়ে ফেলতাম পশ্চিম বাংলার তথাকথিত অফ-ট্র্যাকের (*আনন্দবাজার* বা 'আনন্দ পাবলিশার্স'-এর প্রকাশনাগুলোর বাইরে) সদ্যপ্রকাশিত বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা। দেবরাজই একবার ছুটিতে নিয়ে এলো উপন্যাসখানা। লেখক বাংলা ভাষার ভারতীয় ঔপন্যাসিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। একটা চলনসই মাত্রার বাংলাউপন্যাসপাঠকপাঠিকা, হয়তো আমার মতোই, ঠিকঠাক বিশেষণ না-জোগাতে পারলেও অকাতরে স্বীকার করবেন, সন্দীপনের গদ্য তাদের ভালো লাগে। আর যেহেতু বক্ষ্যমান রচনাটির উদ্দেশ্য অন্যতর, তাই চাটুজ্জ্যে বাবুর গদ্যের লাইনে লাইনে ঋজু, অকোমল কবিতার কথা স্মরণমাত্র করে যদি উপন্যাসটার কাহিনী বলার চেষ্টা করি তো ব্যাপার দাঁড়ায় নিম্নরূপ।

কথিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী একজন প্রৌঢ় লেখক একটা পুরস্কার পেয়েছেন। তার রয়েছে এক তরুণী প্রেমিকা। লেখক ভদ্রলোক ইতোমধ্যে আমেরিকা বেড়ানোর একটা মওকা পেলেন, এবং গেলেন। ফিরে এসে বিয়ে করবেন। প্রি-প্রোষিতভর্তৃকা তরুণী প্রেমিকা হবু বর-এর আমেরিকা গমন, এবং স্বদেশ প্রত্যাগমনের অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ে একজন বিফল মার্ক্সিস্ট ও প্রমিজিং ব্যবসায়ী খণ্ডকালীন ছেলেবন্ধু কর্তৃক গর্ভবতী হন। দুজনেরই মোটামুটি – মেয়েটার বেশি, ছেলেটার কম – অনুতাপ হয়। লেখক ফিরে এলে তার তরুণী প্রেমিকা তাকে অনেক চুমুটুমুর পরে ব্যাপারটা বলেন। ভদ্রলোক সমুচিত আদর-সঙ্গমের পর পরামর্শ দেন এ্যাবর্সন করাতে, এবং দ্বিতীয়বার সঙ্গমে আগ্রহী লেখককে প্রত্যাখ্যান করেন তরুণী। কেঁদে-টেঁদে এ্যাবর্সনের সিদ্ধান্ত নেন। ইত্যবসরে সেই ছেলেবন্ধুর পৌরুষোদয় কিংবা বোধোদয় ঘটে। মদটদ গিলে বাস্তিল দুর্গ ভাঙ্গার স্বপ্নবিকলনে হাসপাতালের, অথবা ক্লিনিকের দরোজাদারোয়ান মাড়িয়ে মুখ-থুতনি ফাটিয়ে চিৎকার করেন, "ডোন্ট কিল মাই সান," অবশ্য কন্যাসন্তান জন্মেছিল। তরুণী তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। বেশ কিছুদিন পর দুর্ঘটনা-পরবর্তী প্রলাপে ব্যর্থ বামপন্থীর পূর্ব প্রেমিকার কথা ফাঁস হয়ে গেলে তরুণীর গলা থেকে কোলরিজ-এর আলবট্রাস খসে পড়ে। উল্লেখ্য, ক্লিনিক থেকে ফিরে তাঁরা বর-বধূ হয়েছিলেন।

উপন্যাসটার নাম *আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি*। কাহিনীর কোথাও আরব, কিংবা গেরিলা, অথবা আরব গেরিলাদের উল্লেখ দূরে থাক, আঁচও নাই। কোনো কোনো সাহিত্যতত্ত্ব মতে উপন্যাসের নামকরণের কারণ খুঁজতে কাহিনী হাতড়ানো হয়তো স্থূলতা বলে বিবেচিত, কিন্তু ইচ্ছাটা শেষ পর্যন্ত হয়ই। পশ্চিমা ধনবাদী সংস্কৃতির আদলে এবং/অথবা পাশাপাশি গড়ে ওঠা এক প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতির ধনী-গরিব নানা ধরনের মানুষ কাহিনীর পাত্রপাত্রী। তাদের বানানো এবং লুটেপুটে খাওয়া দুনিয়াটা যে যেকোনোকিছুর বিনিময়েই প্রত্যখ্যান করা যেতে পারে– আমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনে হয়তো তা স্পষ্ট হলো না– সন্দীপনের বলার কথা সম্ভবত সেটাই। তো এই সংস্কৃতির মুখ আঁচড়ে দেয়ার মতো, এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো কিংবা দাঁড়িয়ে হারিয়ে যাওয়ার মতো কেউ তো আর নাই। ছত্রখান সোভিয়েত ইউনিয়ন। তিয়েনআনমেন ঘটে গেছে। চসেস্কুর সোনার বেসিন আবিষ্কৃত। মাঝে মাঝে উঁকি মারে আরব গেরিলার কাঁধে আমেরিকার স্টিংগার মিজাইল। তেলের ট্যাংকারের তলে অতল সাগরে জ্বলে যায় নামহীন গোত্রময়। সে-আশায় কি বলা গেল, 'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি'? দরকারের খাতিরে এমন সরলীকরণ উপযোগবাদিতা হলে সন্দীপন-বাবু মাফ করবেন। গরম কড়াই-জ্বলন্ত চুলা ধরনের ক্লিশে উপমা নিয়ে কেউ ঝাঁপিয়ে

পড়লে লেখকের যথার্থ ঢাল হবে হয়তো বিদগ্ধ অভিমান। এবং তার কহতব্য চমকে ওঠার মতো।

শিবের গীতটা দীর্ঘ হয়ে গেল, ফলে/কিন্তু ধান ভানা সহজ এবং সংক্ষিপ্ত হবে।

২০০১ এর সেপ্টেম্বরে আমেরিকার টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন ইত্যাদি সাত-সতেরতে বেশ একটা যুতসই হামলার পর– যার ফলে নিহত ৩০০০ নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ যোগ করা যেতে পারে মার্কিন বিদেশনীতির সামরিক-বাণিজ্যিক বাস্তবায়নের ফলে সারা পৃথিবীতে নিহত অসংখ্য অসংখ্য মানুষের সাথে– দুনিয়াজুড়ে আরব আরব রব পড়ে গেল। তারপর ওসামা বিন লাদেন নামের এক আরব গেরিলা কমান্ডারকে মারার জন্য ইঙ্গো-মার্কিন ছোটভাই-বড়ভাই অনন্ত সুবিচারের বোমায় তামা করে দিল দুর্ভিক্ষ- খরা- আর তালিবান-পীড়িত আফগানিস্তান। তালিবান-নিধন আর নারীমুক্তির তলে তলে তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে ডিক চেনির তেলের লাইনটা স্রোতস্বিনী হলো। লাদেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নোম চমস্কি লিখলেন, 'মেরে ফেলা হলে লাদেন পাবে শহীদের মর্যাদা'। রবার্ট ফিস্ক লাদেন-দর্শনের যে কাহিনী ফাঁদলেন তাতে মনে হতে পারে, ১২০ এমএম মর্টার শেল লাদেনের সামনে পড়ে থেমে গিয়ে ফাটে না, সিজ্‌দা করে। আরও আরও মন্তব্যে এবং গল্পে রোনাল্ড রিগ্যান-এর প্রিয়ভাজন সৌদি তেলব্যবসায়ী ও নির্মাণ-ঠিকাদার ওসামা বিন লাদেন ব'নে গেলেন দুনিয়ার হিরো, একদিন র‍্যাম্বো যার পক্ষে ছিল, এখন বিপক্ষে।

আর সব বাতাসের মতো এই বাতাসও বাংলাদেশে লাগে। দুর্গাপুজায় লাদেন-পটকার বাম্পার বিক্রি হয়। সেলুনে ঝোলে লাদেনের ছবিঅলা ক্যালেন্ডার। সাইকেলের তালার সাথে চাবির রিং-এ ঝোলে লাদেন। মসজিদ থেকে বেরিয়ে একজাতীয় মোল্লা স্লোগান হাঁকে, 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালেবান'। বাতাসের ঝাপটায় আরও একটা যে-জিনিস বরাবরের মতো এবারও দৃষ্টিগোচর হয় সেটা হলো আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি। এদের একদল মুখে এমন 'শান্তি-কল্যাণ'-মার্কা টেপ মেরে রাখে যা দেখেই সন্দেহ হয়; আরেকদল এত উচ্ছ্বাসে দামামা বাজায় যে অবিশ্বাস না-করে উপায় থাকে না। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের মতো সর্বার্থে গরীব দেশের ততোধিক গরীব মানুষদের অনেকের বিপদ ঘটে, নিরপেক্ষতা নামক ডিমের ওপর তা দিয়ে বসে থাকা তাদের জন্য মুশকিল হয়। একটা পক্ষ নিতেই হয়। বুশ-ব্লেয়ারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সাথে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা-সন্ত্রাসের কোনো দূরতম তুলনাও চলে না, যেমন চলে না মোসাদ-এর সাথে হামাস-এর।

পাশাপাশি অনেককেই এটা বলে বোঝাতে হয় যে এ-সমর্থন কোনো ধর্মীয় একাত্মতার উপলব্ধি থেকে নয়। 'বাংলা হবে আফগান' বলে যারা আকাশ ফাটায় তাদের জিহাদের অর্থ সংখ্যালঘু প্রতিবেশীর বাড়ি বা দোকান দখল, 'কম্যুনিস্ট' ছাত্রের রগকর্তন, নানা মাত্রার ফতোয়া জারি এবং রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ইতিহাসবাজির বিভিন্ন গর্তে খাবি খায়। 'লাদেন' বা 'তালেবান' বলে গলা ফাটানো এদের সেই পরগাছা ও লোভী সংস্কৃতির প্রকাশ। যেমন সেলুনে সোয়ার্জনিগার ঝোলে, চাবির রিং-এ ম্যাডোনার বুক। পুজায় শ্রীদেবী-পটকা। এই জিহাদীদের সাথে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-বিরোধী আরব গেরিলাদের কোনো নৈতিক সংযোগ স্থাপিত হওয়া কঠিন। ভালো-মন্দ না, কেবল বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলেই এটা স্পষ্ট হয়।

লক্ষ না করলেও চোখে পড়ে যে আরব গেরিলাদের আক্রমণের লক্ষ্য মূলত পশ্চিমের ভোগবাদী সভ্যতার আরামআয়েশ, অবকাশ আর মুনাফার জায়গাগুলো। এই আরাম আর মুনাফার পেছনে রয়েছে গোত্রে গোত্রে দাঙ্গায় সিয়েরা লিয়নের জঙ্গলে জমে ওঠা একহাঁটু রক্ত, অনাহারে বিনাচিকিৎসায় মরা ইরাকের পাঁচ লাখ শিশু, নিহত ছেলের শিয়রে কালাশনিকভ হাতে-ধরা ফিলিস্তিনি মা। এই আরামে ব্যাঘাত ঘটানোই তো একটা পবিত্র দায়িত্ব, আর তা কমবেশি পালন করে চলেছেন আরব গেরিলারা।

ইঙ্গ-মার্কিন-ইজরাইলি সন্ত্রাসকে 'শান্তির ললিত বাণী' শুনিয়ে শান্ত করা যেতে পারে বলে কাগজে-কলমে বার বার জানিয়ে যাচ্ছেন এডোয়ার্ড সাঈদের মতো আরও অনেকেই। কিন্তু বাণী দিয়ে বোমা ঠেকানো যায় না; ধনতন্ত্রের ঢুলুঢুলু সুন্দর, জঘন্য মুখে জরুরি জখমটা তৈরির কৃতিত্ব এক্ষেত্রে আরব গেরিলাদেরই। আর তাই আরব গেরিলাদের সমর্থন করা। এ-সমর্থন নির্জলা মানবিক। দূর মরু আরবের গেরিলাদের সাথে ধর্মবিশ্বাসজনিত মিল আবিষ্কারের ফলে জিহাদের জোশ অনুভব করা যেমন মূর্খতা তেমনি বোকামি এই মিলজনিত কারণেই গ্লানির বোধে সিঁটিয়ে থাকা।

২০০১-এর সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার হামলা, তৎপরবর্তী আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন বোমাহামলার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের চায়ের টেবিলের সরবতা, বাংলাদেশের নির্বাচন-পরবর্তী জোট সরকারের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু তাড়ানোর তাণ্ডব ইত্যাদি পার হয়ে দেবরাজ একদিন বলে ফেলল, 'আমি তো হিন্দু!' সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পরিচয়ের গ্লানি আমারও কিছু কমে আসে। একদিন হয়তো থাকবেও না। গেরিলারা সবকিছু ধ্বসিয়ে দেয়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরাগুলো কোনো গেরিলাই আর জোড়া দিতে পারে না। আর কাঁচ তো ভাঙবেই।

বদরে মুনীর

বিশেষ কবিতা

অসীম কুমার দাস

ধর্ষিতার গান, ২০০১

আমরা '**মানুষ**'-এর জন্য অসীম কুমার দাসের কাছ থেকে লেখা চেয়েছিলাম; যেকোনো ধরনের লেখা, তাঁর পছন্দমতো। তিনি এই কবিতাটা দিয়েছেন। আমরা সেটাকে জোরের সাথে ছাপছি আমাদের অক্ষমতাকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই। বাংলাদেশের ধর্মরাজনৈতিক সংখ্যালঘুদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সঙ্গীতে আমরা যে কিছুই করতে পারি নি! এমনকি কানে তুলা দিতেও না!!

২০০১ সালের শেষ দিকে যখন আমরা মানুষ এর কাজ করছি তখন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসযজ্ঞ চলছে। ক্ষমতার সেই অশ্বমেধযজ্ঞের শিকার হলেন আমাদের হিন্দু সমাজ আর আওয়ামী লীগের গ্রামীণ-মফস্বলের কৃষক-ক্ষুদে দোকানদার শ্রেণীর সাধারণ কর্মী-কর্মচারীর দল। কোনো প্রতিরোধ না, কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি না, এমনকি কোনো হরতালও না, আওয়ামী লীগের বড়লোক নেতারা যথাসময়ে নিরাপদে কেটে পড়ল বিপদমুক্ত দূরত্বে। সমস্ত সম্পন্ন হবার পর তারা 'সংখ্যালঘু-নির্যাতন', আর আন্তর্জাতিক পরিসরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুরুব্বি ইঙ্গ-মার্কিন-ভারতীয় লবির সাথে সুর মিলিয়ে 'বাংলাদেশ তালেবান হয়ে গেল' বলে একটা গেল-গেল রব তুললেন সারাদেশে। আর ৪-দলীয় জোট বললেন দেশে কিছুই ঘটে নি, সব ষড়যন্ত্র আর কারসাজি। বাংলাদেশে প্রকৃত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই– দেখা গেল। বড়লোকদের দুই দলের কামড়াকামড়িতে নিরীহ গরিব মানুষরা মরিচপেষা হচ্ছে। আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তাদের গোলামি করছেন উচ্ছিষ্টের লোভে।

বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র-বিধ্বংসী বিশ্বপরিস্থিতিতে দুনিয়াজোড়া ইঙ্গমার্কিন সামরিক আস্ফালন-আক্রমণে বিচলিত বোধ করি। 'মুসলমান মানেই মৌলবাদী সন্ত্রাসী'– এই তত্ত্বকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা আফগানিস্তান আর সন্ত্রাস-যুদ্ধ-মিডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করি। সীমিত সামর্থ্য বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করার সুযোগ আপাতত আমাদেরকে দেয় নি। ভবিষ্যতে মানুষ এর বিশেষ সংখ্যা করে বা অন্য কোনোভাবে, বাংলাদেশের ক্ষমতা-চাটা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পূর্বাপর, কীর্তিময়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পরিগঠনের ধারা এবং ধর্ম ও রাজনীতির ঐতিহাসিক বিচার নিষ্পন্ন করার কর্তব্য আমাদের সামনে থেকে গেল। আপাতত দেয়া গেল শুধু অসীমের কবিতা।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

কেঁদে উঠি যদি যন্ত্রণায়
অন্ধকারে ঢেকে দিও লোনা জল;
রক্তে যদি ভেসে যায়
শরীরের সমস্ত সরণী

ঢেলে দিও এ্যান্টার্কটিকা শাদা,
শোণিতের সূর্যবিন্দু শান্ত হবে
বরফের কঠিন চুম্বনে;
যদি অঙ্গ ছিন্ন হয়
পুঁতে দিও মাটির তলায়
মাতা বসুমতী দিবে ঠাঁই;
বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে যদি
হাতের কঙ্কণ, এই কণ্ঠহার
ছুঁড়ে ফেলো অগ্নিকুণ্ডে স্বর্ণমায়া
তুচ্ছ আভরণ;
কণ্ঠ যদি আর্তি পায় অনুনয়ে
শব্দ যদি ভেঙ্গে যায় ভয়ে, আরো গাঢ়তর ভয়ে,
রুদ্ধ কোরো প্রার্থনার লেশ
সুনিশ্চিত কোরো সেই মেয়েলী আবেশ যেন
আক্রান্ত করে না কারো সিংহবীর্য
আর বীররস;
ধূলায় লুণ্ঠিত যদি কালো বেণী
কেটে দিও সর্প বলে
জড়াবে না বার বার আঙ্গুলে তোমার;
যদিবা অশ্লীল ভাবো সিঁথির সিঁদুর
গলিত সীসার জল ঢেলে দিও
রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার;
শেষ দুর্বলতা হয়ে
যদি কোনো মাতৃমূর্ত্তি
ভেসে ওঠে অসতর্ক স্মরণে তোমার
বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় উৎপাটিত কোরো তার স্মৃতি;
আর যদি মৃত্যু হয়
ছুঁড়ে দিও নদীর আত্মায়,
যেন এক অধ্বনিন পুনরুত্থানের পরে
উঠে আসি এলোচুলে, খড়গহস্তা
অনন্ত বাংলার প্রতিটি নদীর রক্তজলস্রোত ছিন্ন ক'রে
রণচণ্ডী হয়ে বারবার।

বিশেষ কবিতা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

মুদ্রণতথ্য iv

উৎসর্গ v

সম্পাদনা-তথ্য vii

মানুষ-এর কথা ix

বিশেষ কবিতা: 'ধর্ষিতার গান, ২০০১' xii

বিস্তারিত সূচিপত্র xvi

মানুষ-এর কাজের লোকদের পরিচিতি ৬৭৭

অদৃশ্য আফগানিস্তান: আফগানিস্তানের কবিতা
১–৩৯

অদৃশ্য আফগানিস্তান: আদলহীন এক দেশ
৪১–১১৩; ৫২১–৫৯৫

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট, সম্রাটের সন্ত্রাস
১১৫–২২৭; ৫৫৩–৬৫২

ইসলাম, পশ্চিম, নারী
২২৯–৩০৬; ৬৫৩–৬৫৫

প্রচারণা, পুঁজিবাদ, যুদ্ধ
৩০৭–৩৮৫; ৬৫৭–৬৫৯

আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা
৩৮৭–৪২৪; ৬৬১–৬৬৯

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি: ইরাক-প্যালেস্টাইন-বালী-কেনিয়া-আফগানিস্তান
৪২৫–৪৯৩; ৬৭১–৬৭৫

ইরাক ও প্যালেস্টাইনের কবিতা
৪৯৫–৫২০

বিস্তারিত সূচিপত্র

অদৃশ্য আফগানিস্তান: আফগানিস্তানের কবিতা

শাবগির পুল্লাদিয়ান	নির্বাসনের কাল তরজমা: রিপন মাহমুদ ৩
	আসছে বছর তরজমা: রিপন মাহমুদ ৭
কাহার অসি	কাবুল ছেয়েছে ঘন নীল তমসায় তরজমা: বদরে মুনীর ৯
	সক্ষম হতে পারা তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন এবং সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী ১০
লতিফ নাজেমী	লেগুন এবং ছায়া তরজমা: বদরে মুনীর ১২
	রক্তুতুষার তরজমা: বদরে মুনীর ১৩
	প্রস্তরলাগি পদ্য তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন, রিপন মাহমুদ, আ-আল মামুন, সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী এবং বদরে মুনীর ১৪
	স্বর্গের পদাবলী তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী এবং সেলিম রেজা নিউটন ১৫
বাহার সায়ীদ	জাতীয় বিপর্যয় তরজমা: রিপন মাহমুদ ১৭
	দৃশ্য তরজমা: রিপন মাহমুদ ১৭
	আমি শুনেছি তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন ১৮
লায়লা সারাহাত	আসামায়ি পাহাড় তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী ১৯

জেবা শরিশ-শামলি	তোমাদের কথা মনে পড়ে তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী ২০
মুসা মারূফী	ঘড়ি তরজমা: রিপন মাহমুদ ২২
খলিলুল্লাহ খলিলি	হে বিশাল পর্বতমালা তরজমা: বদরে মুনীর ২৩
	পৃথিবীর মাঠে খসে পড়া তেতোফল তরজমা: বদরে মুনীর ২৩
ড. আমিন আজিমী	সুখস্বপ্নের স্মৃতি তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন এবং রিপন মাহমুদ ২৪
আহমদ শাহ্ দুররানি	একটি জাতির ভালবাসা তরজমা: বদরে মুনীর ২৬
হান্‌জালা-ই-বাদ্‌ঘিস	নেতৃত্ব তরজমা: বদরে মুনীর ২৭
আবু শুকুর-ই-বল্‌খ	যে-গাছের বীজ তেতো তরজমা: বদরে মুনীর ২৮
রাবিয়া বল্‌খি	ভালবাসার জাল তরজমা: বদরে মুনীর ২৯
খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি	আমি এলাম গায়েব থেকে তরজমা: বদরে মুনীর ৩০
	জীবনের ভ্রম তরজমা: বদরে মুনীর এবং সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী ৩০
দাকিকি-ই-বল্‌খ্	হে আমার মাবুদপ্রতিমা! স্বর্গ থেকে কোনো মেঘ... তরজমা: বদরে মুনীর ৩১
খুশাল খান খাত্তাক	জীবন জীবন নয় সম্মানরহিত তরজমা: বদরে মুনীর ৩২
	শীতের আগমন তরজমা: বদরে মুনীর ৩২

এ-কথা সবার জানা, যে প্রকৃত জ্ঞানী ...
তরজমা: বদরে মুনীর
৩২

আদম খিলের আফ্রিদি
তরজমা: বদরে মুনীর
৩৩

জালালুদ্দিন রুমি

শূন্যতা
তরজমা: বদরে মুনীর
৩৫

পর্যাপ্ত কথা
তরজমা: বদরে মুনীর
৩৭

মাঝে-মাঝে পুরা ভুলে যাই
তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন
৩৮

কে এই বদলগুলা করে?
তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন
৩৯

অদৃশ্য আফগানিস্তান: আদলহীন এক দেশ

মোহসেন মাখমালবাফ	কী বলব পড়শির কথা, হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে... আফগানিস্তানের বিপর্যয়ে দুনিয়ার উদাসীনতা তরজমা: বদরে মুনীর ৪৩
সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী	আফগানিস্তানের মানুষ মানেই কি আদিম বর্বর 'মৌলবাদী'? আফগানিস্তানের দেশ-কাল ও জনসংস্কৃতির চিনপরিচয় ৭৭
সাইয়ীদ রাহ্‌মাতুল্লাহ্ হাশেমী	তালেবান সরকারের ভাষ্য তরজমা: মানস চৌধুরী ৯৫
রবার্ট ফিস্ক	লাদেনের মুখোমুখি অনুবাদ: সুমন কায়সার ১০৩
রবার্ট ফিস্ক	'দ্বিতীয় রাতেই আমাদের পড়শির ঘরে বোমা পড়ল' অনুবাদ: মানস চৌধুরী ১০৭
আফাজউদ্দিন বিপ্লব	অন্যরকম মোল্লা ওমর ১১১
Taleban Government	Facts and Realities under Taleban Administration ৫২১
Human Rights Watch	Poor Human Rights Record of Northern Alliance Commanders ৫৪৩

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট, সম্রাটের সন্ত্রাস

ফাহমিদুল হক ও
রিফাত ফাতিমা — আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধ: সন্ত্রাস দমন অথবা তেল-উত্তোলন
১১৭

নোম চমস্কি — সন্ত্রাসবাদ কাজে লাগে
তরজমা: উদিসা ইসলাম
১৩৫

এডোয়ার্ড এস হারম্যান — আক্রমণের বাজেট
তরজমা: আ-আল মামুন
১৪১

তারিক আলী — বোমা, পাল্টা আঘাত এবং ভবিষ্যত
তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী
১৪৭

এডোয়ার্ড সাঈদ — সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গির আবশ্যকতা: বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং পিছিয়ে আসা
তরজমা: বদরে মুনীর
১৫১

বন্দনা শিবা — সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একাত্মতা
তরজমা: মলয় কর্মকার
১৫৭

নোম চমস্কি — 'এই প্রথমবার বন্দুকের নল উল্টোদিকে ঘুরেছে। এটা এক নাটকীয় পরিবর্তন।'
তরজমা: আ-আল মামুন
১৬১

মার্ক স্টীল — তুমি হলে কী করতা?
তরজমা: রেহনুমা আহমেদ এবং মানস চৌধুরী
১৬৯

অরুন্ধতী রায় — যুদ্ধ মানে শান্তি
অনুবাদ: নাসিরুদ্দীন কবীর
১৭৩

সলিমুল্লাহ খান — ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ
১৮১

সলিমুল্লাহ খান — যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য
১৮৯

সলিমুল্লাহ খান — শুভ ও অশুভ নয়, প্রভু ও ভৃত্য অথবা আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের আগাম ফলাফল
১৯৭

তারিক আলী — সামরিক নয় রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য
তরজমা: প্রথম আলো
২০৩

অরুন্ধতী রায় — 'ইনফিনিট জাস্টিস'-এর বীজগণিত
অনুবাদ: জিকরুল ইসলাম
২০৭

রামজি বারুদ — আমেরিকা, তোমার দুঃখ আমরা বুঝি,
আমাদের দুঃখ তুমি বোঝ?
অনুবাদ: গাউস রহমান পিয়াস
২১৫

নোয়াম চমস্কি — মেরে ফেলা হলে লাদেন পাবে শহীদের মর্যাদা
তরজমা: প্রথম আলো
২১৯

রবার্ট ফিস্ক — আমেরিকায় সন্ত্রাস
তরজমা: জুয়েল মাজহার
২২৫

Noam Chomsky — "Just Got Your Message. Quick Reaction"
৫৫৩

David McReynolds — Statement on September 11 Attack
৫৫৫

Albert and Shalom — ZNet's September 11 Talking Points
৫৫৭

Noam Chomsky — On 9/11 attacks and the Aftermath
৫৭১

Albert and Shalom — 47 Questions and Answers on
The War in Afghanistan
৬২৩

Howard Zinn — Retaliation
৬৪৫

Herman and Peterson — Who Terrorizes Whom?
৬৪৭

ইসলাম, পশ্চিম, নারী

মাহমুদুল হাসান সুমন ও নাজনীন আখতার — আফগানিস্তানে নারীর লড়াই সংগ্রামের ভাষা: কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্ন
২৩১

বারবারা এরেনরিখ — নারীবিদ্বেষের রহস্য
তরজমা: নাজনীন আখতার ও মাহমুদুল হাসান সুমন
২৩৭

সোনালী কোলহাৎকর — আফগান নারীদের 'উদ্ধারকার্য'
অনুবাদ: সায়দিয়া গুলরুখ
২৪১

তারিক আলি — দুর্নীতির বাদশাহী: সৌদি সখ্যতা
তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন ও সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী
২৪৭

ক্যাথারিন ফিনার — নারীবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদ
তরজমা: নাসিমা সেলিম অলিক
২৫১

ফরিদা আখতার — বেগম রোকেয়া, বোরকা ও আফগান নারী
২৫৫

এডোয়ার্ড সাঈদ — ইসলাম এবং পশ্চিম ব্যানার হিসেবে অপর্যাপ্ত
তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন
২৫৯

ফরহাদ মজহার — ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম
২৬৫

সলিমুল্লাহ খান — না ক্রুসেড ও না জেহাদ
২৮৭

রেহনুমা আহমেদ — মালেক আল্লুলা'র *দ্য কলোনিয়াল হারেম*: পাশ্চাত্য-প্রভুর ফ্যান্টাসিতে উপনিবেশের নারী
২৯৫

এডোয়ার্ড সাঈদ — অজ্ঞতার সংঘাত
অনুবাদ: আমীনুর রহমান
৩০১

Edward S. Herman — Folks Out There have a "Distaste of Western Civilization and Cultural Values"
৬৫৩

প্রচারণা, পুঁজিবাদ, যুদ্ধ

আ-আল মামুন	মক্কেল রাষ্ট্রের একটি সংবাদপত্রে মার্কিন 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' ৩০৯
সেলিম রেজা নিউটন	পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানের মুখ: শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান-সমাজে 'সংখ্যালঘু' 'অপর'-এর সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার কায়দাকানুন ৩২৯
রবার্ট ফিস্ক	যখন সাংবাদিকরা ভুলে যান যে হত্যা হত্যাই তরজমা: উদিসা ইসলাম ৩৪৯
এডোয়ার্ড এস. হারম্যান	'মূল্য হিসেবে এটা ঠিকই আছে' তরজমা: আ-আল মামুন ৩৫৩
রবার্ট ফিস্ক	আমার মার খাওয়া এই জঘন্য যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা এবং ক্ষুব্ধতার একটি প্রতীক তরজমা: রিপন মাহমুদ ৩৫৭
এক্সট্রা ম্যাগাজিন	সন্ত্রাসবাদের কাহিনী: তিনটি ঘটনা, দুটি মানদণ্ড অনুবাদ: গুঞ্জন চৌধুরী ৩৬৩
নূরুল ইসলাম	মার্কিন তোপের মুখে আল জাজিরা টিভি স্টেশন ৩৬৫
এন্ড্রু মার	'দ্য বিগ আইডিয়া': নোম চমস্কির সাক্ষাৎকার তরজমা: আ-আল মামুন ৩৬৯
জে টি. হ্যারিস	সংবাদ ও মুনাফা অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন ৩৮৩
Norman Solomon	War Needs Good Public Relations ৬৫৭

আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা

মাইকেল ম্যান্ডেল	আপনারা যা খুশি বলুন, কিন্তু এ যুদ্ধ বেআইনি তরজমা: বদরে মুনীর	৩৮৯
আ.ন.ম. ওয়াহিদ	আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা এবং মানবাধিকার-পরিপ্রেক্ষিত	৩৯৩
আ.ন.ম. ওয়াহিদ	সুদান ও আফগানিস্তানে মার্কিনী হামলা: আন্তর্জাতিক আইনগত পর্যালোচনা	৩৯৯
জিওভ প্যারিশ	পূর্ণ প্রলয়প্রান্তে তরজমা: ফাহমিদুল হক ও রিফাত ফাতিমা	৪০১
বিবৃতি	আফগানিস্তানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে নোবেল বিজয়ী কবি, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের আন্তর্জাতিক আবেদন তরজমা: রিফাত ফাতিমা	৪০৫
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	যুদ্ধাপরাধী? যুদ্ধাপরাধী না! মানুষ না!	৪০৯
মঈনুস সুলতান	যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা	৪১৫
আসিফ নজরুল	আন্তর্জাতিক আইন, আমেরিকার বিরোধিতা	৪২১
Terry J. Allen	Afghanistan: 1 Million may Die even if No Bombs Fall	৬৬১
Justin Podur	Answers to Some Common Pro-War Arguments	৬৬৩
Albert and Shalom	Five Arguments Against War	৬৬৭

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি:
ইরাক-প্যালেস্টাইন-বালী-কেনিয়া-আফগানিস্তান

নোম চমস্কি — ‘যদি গান্ধীর মতো নেতার দ্বারাও শাসিত হয় তবু ইরাক অস্ত্রব্যবস্থা গড়ে তুলবে’
সাক্ষাৎকারগ্রহণ: মাইকেল অ্যালবার্ট
তরজমা: আ-আল মামুন
৪২৭

নরম্যান সলোমন — বাগদাদ, হেমন্ত ২০০২: দণ্ডিত নগরী
তরজমা: আ–আল মামুন
৪৩৯

মাইকেল প্যারেন্টি — ইরাককে আক্রমণের কারণ
তরজমা: ফাহমিদুল হক
৪৪৩

ফরহাদ মজহার — ইরাক-পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশে “মৌলবাদ” আতংকের স্বরূপ
৪৫১

মঈনুস সুলতান — এক ইরাকি কিশোরের আঁকা তৈলচিত্র
৪৬১

ফরহাদ মজহার — ইন্তিফাদা জিন্দাবাদ: ফিলিস্তিনী শিশুকিশোরদের ঢিল আর গুলতি লড়াই
৪৬৫

জন পিলজার — বালী ও সাম্রাজ্যবাদ
তরজমা: আ-আল মামুন
৪৭৩

অ্যান ট্যালবট — কেনিয়ায় সন্ত্রাসী হামলা: উত্তরহীন প্রশ্নাবলী
তরজমা: বদরে মুনীর
৪৭৭

রাওয়া — জাতিসংঘ এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে আফগান নারী বিপ্লবী সংঘ ‘রাওয়া’র আবেদন
তরজমা: উদিসা ইসলাম
৪৮৩

হাফিজুর রশীদ — আফগানিস্তানের হাল-হকিকত
৪৮৫

রবার্ট ফিস্ক — বিন লাদেন বেঁচে আছেন
তরজমা: প্রথম আলো
৪৮৯

Edward Said — Misinformation about Iraq
৬৭১

ইরাক ও প্যালেস্টাইনের কবিতা

ই. ইয়াঘি — ফিলিস্তিনি আমি
তরজমা: বদরে মুনীর
৪৯৭

দুনিয়া আল-আবেদ আকাবি — শিশুর প্রশ্ন
তরজমা: রিপন মাহমুদ
৪৯৯

হানান আশরাবি — হাদিলের গান
তরজমা: বদরে মুনীর
৫০১

আবদেল রহিম মাহমুদ — শহীদ
তরজমা: রিপন মাহমুদ
৫০৪

ইব্রাহিম তুকান — আমার জন্মভূমি
তরজমা: রিপন মাহমুদ
৫০৫

কনি আল-রামাহি — গাজা
তরজমা: আ-আল মামুন
৫০৭

কামাল নাসির — গল্প
তরজমা: ফাহমিদুল হক
৫০৮

বুলান্দ আল-হায়দারি — ডাকপিয়ন
তরজমা: বদরে মুনীর
৫০৯

কারেম আল-ইরাকি — ফেরেস্তারা ডাকে
তরজমা: বদরে মুনীর
৫১০

কনি আল-রামাহি — বাবা
তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী
৫১২

ন্যান্সি হর্ন — আমি জেনিন
তরজমা: বখতিয়ার আহমেদ
৫১৪

আবদেলকরিম আল-কারমি — ফিরে আসবো
তরজমা: আ-আল মামুন
৫১৭

নাদিয়া আল-রামাহি — সৈনিকের পরাজয়
তরজমা: বখতিয়ার আহমেদ
৫১৯

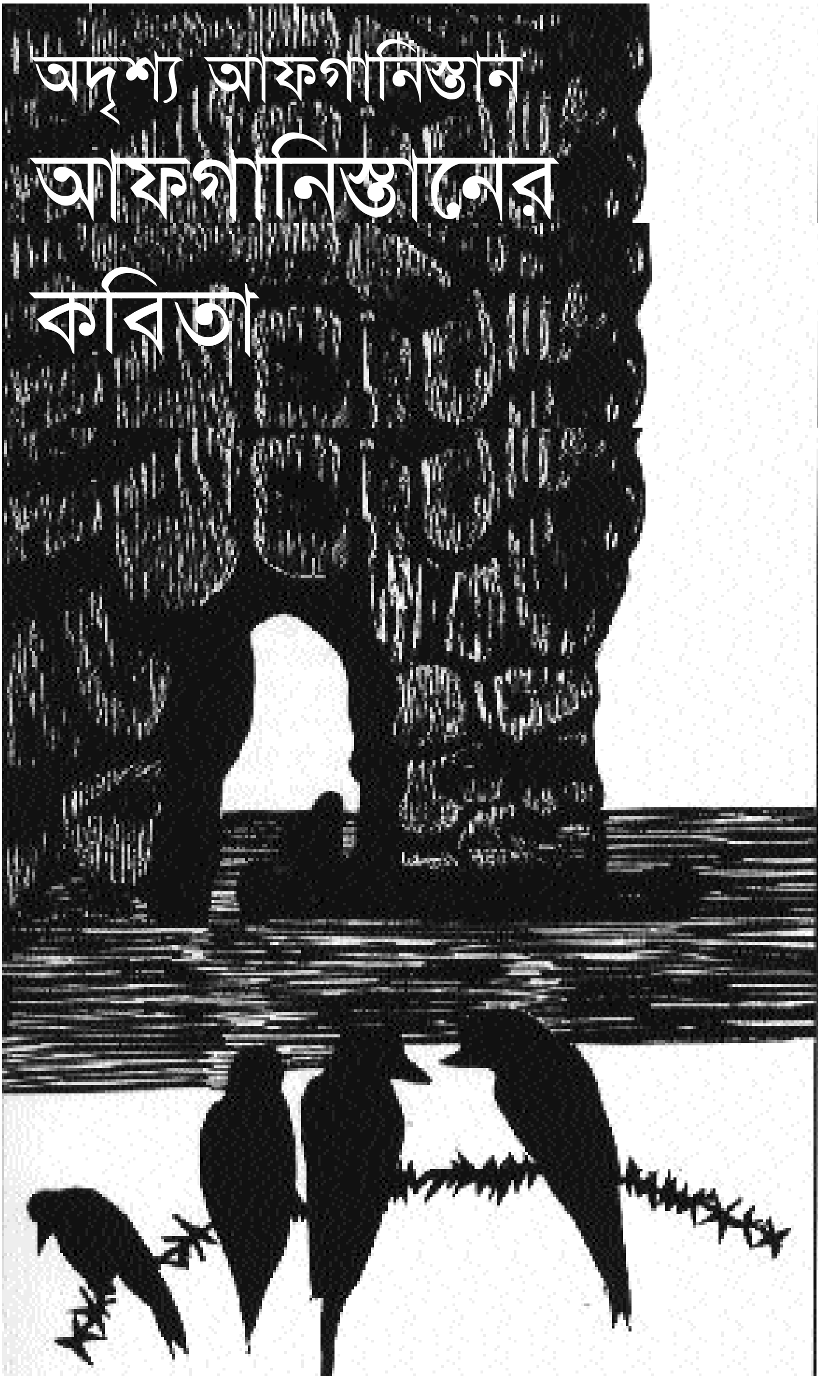
অদৃশ্য আফগানিস্তান
আফগানিস্তানের
কবিতা

আ ফ গা নি স্তা নে র ক বি তা

শাবগির পুল্লাদিয়ান

নির্বাসনের কাল

তরজমা: রিপন মাহমুদ

আমি এক নির্বাসিত, এসেছি পূর্ব থেকে
সুদূরের সেই সব জাদু আর পুরাণের এলাকা থেকে
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ঝলসানো পার্বত্য অঞ্চল থেকে
সময়ের গর্তে পরিত্যক্ত রক্তের অঞ্চল থেকে।

আমি এক নির্বাসিত, এসেছি পূর্ব থেকে
শৃঙ্খল আর পরাজিতের লালকেল্লা থেকে
যেখানে বন্দীরা থাকে হঠাৎ-মৃত্যুর অপেক্ষায়
যেখানে আকাশ, রক্তের দরিয়া হয়ে,
গলে পড়ে কাস্তে-আর স্লেজ-এ।
লাল পপিদের দেশের আকাশে ঝরছে রক্তের বৃষ্টি,
এক পুষ্পিত দেশের নোনা কান্নার জলাভূমিতে
আজ দুঃখ মুকুলিত।
একটি দেশ, যেখানে
শতাব্দীর বিষাক্ত হাওয়ায়
নিভে গেছে মিম্বারের ঝাড়বাতিদান।

আমি এক নির্বাসিত, এসেছি পূর্ব থেকে
আমার কাঁধে জখম আর যন্ত্রণার ভারি বোঝা,
শব্দহীনতার এই পাশবিক সময়ের নির্বাসিত।

শোকাতুর জননীর বুক থেকে
সেই অনিঃশেষ বেদনার দূর্গ থেকে
সেই নদীর ক্রন্দন আর ব্যথার ফোয়ারা থেকে
প্রতীক্ষার কপালে অপেক্ষমাণ সেই টান টান চোখ থেকে
বিষাদিত এতিমখানার গলিতে ঐসব ফেলে
আসা ছেলেমেয়ে থেকে
সেইসব কাফন-পরা রাত্রি-দখলদারদের থেকে
তাড়া খাওয়া ব্যথার কথা আমি জানি
রক্তাক্ত দিনকে যারা বেঁচে থাকা বলে।

বেদনার অশ্রুতে অশ্রুতে আমাকে বলতে দাও
সন্তাপের কবরে শায়িত সেইসব গাদাগাদি মানুষের কথা
নিয়তির মুখবন্ধে খোদিত সেইসব দুর্দশার কথা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

তাদের গুহায় লুকানো শঙ্কা-ভূতের কথা
আমাকে বলতে দাও।
ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো অন্ধকার গোলকধাঁধায়
মৌনতার মরীচিকা গিলছে তাদের দিনগুলো।
যেনবা তাদের মগজের ভেতরটা গ্রাস করেছে একটি জানোয়ার।
আমাকে বলতে দাও একটি জাতির কথা
বন্দুকের গর্জন ছাড়া যে আর শোনেনি কিছুই
না-কোনও সঙ্গীত অথবা বাঁশির সুর দয়া করে তাদের শ্রুতিকে।

আমাকে লিখতে দাও শোণিতধারায়
তাদের আঁধার চালায় অপেক্ষা করা সেইসব মৃত্যুর কথা,
টকটকে লাল রুটির টুকরা আর
ক্রুদ্ধ হতাশাভরা বিষের গামলা একসাথে গিলে
প্রতিদিনের বেদনা আর যন্ত্রণার পাত্র থেকে পান ক'রে
আর নিরুত্তর ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
হত্যাযজ্ঞের গোধূলীকালে
লালপথে তারা হয়েছে শহীদ।

এস, আমাকে তোমার জন্য গান গেতে দাও–
এই শাহ্‌নামাসম মহাকাব্যের চূড়ান্তে
মৌন আর জীর্ণ পোশাকের সেইসব মানুষের গান
মুক্তির কান্নায় যারা চিৎকার করছে–
বঞ্চিতের গান
শতাব্দীর পুরাণ-স্রষ্টাদের গান।
যাদের রক্ত আজ পণ্যসামগ্রী
অথবা লুণ্ঠিত প্রাসাদের অলঙ্কার।
যদিও এখনও তারা পীড়িত বিপর্যয়ের জ্বরে
অথবা প্রতারণার লাল-শিকলে বন্দী,
তবুও তাদের গান মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিবেদিত।

আমাকে বলতে দাও
সেইসব একা একা, বঞ্চিত আর উজ্জ্বল খেলোয়াড়দের কথা
যাদের তরবারি ছিলো সুরক্ষার ছাতা।
আরও বলতে দাও, ক্ষমতা
আর পয়সাকড়ির গলিঘুঁজি হাতড়ে-বেড়ানোদের কথা
সেইসব পায়াভারি আর জাঁকালো যুদ্ধপ্রভুর কথা
কাপুরুষতার যুদ্ধক্ষেত্রে
যারা মেরেছে তোমার পিঠে ছুরি।
সময়ের তলায় যখন বিপর্যয় ঠেকে গেছে

তারা বিস্মিত করেছে তাদের আঁধার, নির্মম বাসনা।

আমাকে বলতে দাও, পচা লেগুনের মতো ঘৃণার দুর্গন্ধভরা
শহরের কথা
গোঙানো ষাঁড়ের পুঁতিগন্ধময় আস্তাবল থেকে আসা
শুধু একটি ধ্বনির কথা
এই শহরের কথা যার
ইস্পাত-মুখোশ-আঁটা জল্লাদেরা জাদুর রাজধানীকে তুলে দিয়েছে সন্ত্রাসের চাকায়–
রঙ আর আশঙ্কার পকেট থেকে বের হয়ে, নিষ্ফলতার কামানের মধ্যে,
একটি হাত ওজন করছে হৃদয়ের সোনা
অন্যহাতে, আগুন-ছোঁড়া শয়তানের মতো
শোণিতের ঢাল থেকে
গরম-সীসার স্তূপ গড়িয়ে দিয়েছে
যেনবা অগ্নিগিরির সারির সাথে জুড়ে দিয়েছে সৌরচুল্লি।

আমি এক নির্বাসিত, এসেছি পূর্ব থেকে
পরিযায়ী একটি পাখির মতো
দক্ষিণের রক্ত-লাল ঝড়ে বিপর্যস্ত পর্যটক,
চলে যাচ্ছি গিরি, পর্বতের চূড়া দিয়ে
গোধূলি অঞ্চলে ডুবে যাওয়া সূর্যের মতো।
আমার দু'চোখ তাকিয়ে তোমার দিকে
হায় কত পরিশ্রান্ত আর জখম আমার মিলে যাওয়া!

আমি তো এখানে অথচ কল্পনা আমার এখনও
উত্তাল ঢেউয়ের মতো
উড়ছে স্মৃতির পাখায় পাখায়
এই শীতল আর আঁধার উপসাগরের দুই পারে।
আমি জানি না
সেই পাণ্ডববর্জিত দেশে
সেই বিচ্ছেদের দেশে
সেই স্মৃতি আর মমতার দেশে
বসন্ত এসেছে কীনা?
চারণভূমিতে ফুটতে থাকা সূর্যের মতো
যেখানে বসন্ত তার বিস্তীর্ণ ঘাগ্‌রা মেলেছে,
হিন্দুকুশ থেকে যেখানে নামছে শীত
বন্য জুডাস বৃক্ষ যেখানে ঢেকে দিচ্ছে প্রত্যেকটি ঢাল,
এই রক্তাক্ত-ভূমিতে জীবনের দিকে ফিরে
ছিপছিপে উইলোগুলি যেখানে নুইয়েছে তাদের কোমর
কাঞ্চননদীতে ফেলছে তাদের সবুজ রঙের ঝুরি

যেখানে ভাঙা ছাদের রয়ে-যাওয়া খুঁটি থেকে
শহীদের গান গাইছে ভারুই পাখি,
আগুন আর রক্তের এই ভূখণ্ড ছাড়িয়ে
যেখানে সালাঙ পরেছে রঙিন ঢোলা জামা
আর লাল বনফুল অঙ্কুরিত হচ্ছে জুডাস বৃক্ষের ছাই থেকে–
যেখানে আরও দূরের রক্তরাঙা উপত্যকা পার হয়ে
বাতাস ফিরে আসছে আলবারকুশ চূড়া থেকে,
যেখানে বিস্ময়কর দুলকি চালের ঘোড়া
তেজস্বী খুরের আঘাতে ধরেছে গান "শাদিয়ান" সুরে।
বল্‌খের জল্লাদের কেল্লা থেকে
লাল ফুল যেখানে নিশান উড়িয়েছে
আর পুরাণ যুগের পুষ্পিত বাগান থেকে
অথবা বল্‌খের নববসন্তের টিউলিপ থেকে
বসন্তের দূত এনেছে ডালা এবং
ডালা বোঝাই সন্দেশ।

আমি এক নির্বাসিত, এসেছি পূর্ব থেকে
কুয়াশাচ্ছন্ন সিলিঙে আমার মাথা দুলছে
আমার দু'চোখ তাকিয়ে তোমার দিকে,
হায় কত পরিশ্রান্ত আর জখম আমার মিলে যাওয়া!

নির্বাসনের খরায়
যদি তোমার তেজের চারাগাছ
নুয়ে পড়ে
যদি তুমি এক টুকরা রুটির জন্য অবজ্ঞার পাত্র হয়ে যাও
শরণার্থী ক্যাম্পে
মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে গিয়ে
যদি ভেঙে পড়ে তোমার অহঙ্কারের ডানা,
আর নির্বাসনের তীরে বিপর্যস্ত তোমার গর্বিত সারাদেহ,
মনে ক'রো সেই প্রাচ্যদেশীয় বৃক্ষের কথা।
তোমারও শেকড় প্রোথিত ঐসব পূর্বদেশীয় ভূমিতে।
তুমিতো সেই আর্কেডিয়ান ধরে নেমে আসা
চিরসবুজ তুবা-উদ্ভিদ
তোমার প্রতি শাখায় সিমার্ঘের বাসা।

পূর্ব থেকে তুমি এসেছ, যেখানে
রাত্রি তোমার চুলের থোকা থেকে তুলে নিচ্ছে কালো ফুল!
আর তোমার চোখের পূর্ব কোণ থেকে
সূর্য নিয়তই মুখ তুলছে বর্ণিল

রংধনুর বিপরীতে!
যদি ছাই-রঙা ভোরে
পশ্চিমের কুয়াশাচ্ছন্ন বেহেস্তে তুমি মনমরা হয়ে থাকো,
আর তোমার নীরবতার সুরা কানায় কানায় পূর্ণ
স্বদেশ আর প্রিয়তমার
আত্মা-পোড়ানো বিষে,
মনে ক'রো সুদূরের পর্বতমালাকে
মনে ক'রো সেই নির্মল নীলাকাশকে!
যেখানে বাতাস কাঁচের পাত্রের মতো
সোনালী সূর্যের ধব্‌ধবে ভোরে
তোমার ধ্যানস্থ কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে
আলোকের তীর হয়ে বিঁধে যাচ্ছে গৌরবের দূর্গে।

যদিও তুমি এই রক্তাক্ত আর বিশ্বাসঘাতক শতকের শেষপ্রান্তের এক আহত মানুষ
যার প্রশ্বাসে আগুন ঝরে আর যার পাথুরে হৃদয় শুধু কেঁপে কেঁপে ওঠে।
যদিও তারা নির্লজ্জতার নেহাই পেটাচ্ছে তোমার অভিজাত মাথায়
এমনকী তারা ভেঙেছে তোমার সুর-তোলা হাত
আর তোমার রক্তাক্ত দেহে পরিয়ে দিয়েছে
হতদরিদ্র ফকিরের ছিন্ন পোশাক।

বিজয়ের কাফেলা ছাপিয়ে অনুসন্ধানী সূর্যের মতো
যখন চড়বে তুমি সম্মান আর সোনার রথে
যখন সমৃদ্ধ হবে তুমি চির প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো,
ভুলে যেও না অতীত গৌরবের সেইসব পৌরাণিক স্মৃতি।

আসছে বছর

তরজমা: রিপন মাহমুদ

হে আমার স্বদেশভূমি, আমার সর্বস্বান্ত ভূমি!
আমি তো বলেছিলাম আসছে বছরে
কাজ ফেলে সুহৃদ বসন্ত নিয়ে
ফিরব তোমার পাহাড়ের শীর্ষদেশে।
আমি তো বলেছিলাম আসছে বছরে
ফিরে আসব বাতাস আর ঢেউ নিয়ে
আমি তো বলেছিলাম আসছে বছরে
থেকে যাবে দীর্ঘ সময় তোমার
পুনরুত্থিত বসন্ত জুড়ে।
আমি তো বলেছিলাম আসছে বছরে
ধূলিময় রাজপথে

বসে কথা বলব এতিমদের সাথে
যাদের দু'চোখ ভরা কান্নার ফোয়ারা

আমি তো বলেছিলাম একটি পবিত্র চুমু
রোপণ করব শহীদের রক্ত-ছোপান মাটিতে
আমি তো বলেছিলাম আসছে বছরে
মুছে দেব নির্বাসিতের হলুদ
ক্ষত, বৃদ্ধা মা'র রক্ত-চোয়ানো স্ফটিক অশ্রুজলে
আমি তো বলেছিলাম আসছে বছরে
স্বাধীনতার তাজা বসন্তে
ছিন্ন পোশাকের ঐসব সাহসী যোদ্ধার সাথে উঠব নেচে
আমি তো বলেছিলাম আসছে বছরে
স্বাধীনতার দূর্গের পিছে
নত হব রক্তিম নামাজে

হে ধ্বংসের ভূমি!
আগুনের হাতে ঝলসানো আজ তোমার পুষ্পরা
আরেকটি বছর তো এসে গেল, কিন্তু তোমার বসন্ত কই?
গভীর ক্ষতের হে অনন্ত দুঃখভোগী
শুয়ে আছো হতাশার ছাইয়ের তাঁবুতে
আরেক বছর এলো
এখনো তো আমি তোমার বসন্ত দেখি নাই!

অন্য দোজখের প্রাণ সংহারী শিখার মাঝ থেকে
বাতাস আর বৃষ্টির প্রবল শব্দের পরিবর্তে
অশুভ যুদ্ধের আগুনের বিবর্ণ খবর আসে
আরেক দোজখ থেকে!

কাহার অসি

কাবুল ছেয়েছে ঘন নীল তমসায়

তরজমা: বদরে মুনীর

আবার রক্তে
রঞ্জিত রাজপথ
এবং শহর মৃত্যু ছাপিয়ে
ছেয়ে গেছে ঘন নীলে।

আবার শিশুরা মরছে ক্ষুধায়, নগ্ন এবং
কোনও-রাজনীতি-কোনও-বন্দুক-ছাড়া
এবং মায়েরা– অনভ্যস্ত, যুদ্ধে এবং নির্দয়তায়–
মৃত্যুর পায়ে মাথা কুটে কুটে মরে।

আবার নতুন অত্যাচারের তীক্ষ্ণ, শকুন থাবা
খেলা করে এই শহরের লোকালয়ে
আবার নতুন আহতের গলা থেকে
রক্ত ফোয়ারা ঊর্দ্ধে লাফায় নবতর চিৎকারে।

এতিমের সাথে যোগ করে দিতে আরও এতিমের সারি,
আর্ত হৃদয়ে জুড়ে দিতে আরও ব্যথা,
অহমিকা আর প্রতিশোধ প্রবণতা
ফের উশ্‌কায় কাপুরুষদের বর্বর জটিলতা।

আবার রক্ত-পিপাসিনী স্ফিংক্স
হা বাড়িয়ে আসে গিলে নিতে এই গরীব এবং ধ্বস্ত শহরতলী
আবার অনেক দূর-দূরান্ত থেকে
আকাশ দেখছে আমাদের ম'রে যাওয়া।

আবার এ-জাতি সর্বশরীরে
রক্ত ঝরিয়ে মৃতের সংখ্যা গোনে
বিষাদদীর্ণ, শঙ্কিত এই দেশ
পুনরায় বোনে লাল-কাফনের থান।

আবার রাত্রি রক্ত-ছদ্মবেশে
বুক ঘ'ষে হাঁটে ছাদের ওপরে আর দরজার নিচে
আবার ভোরের ধাতব বিছানা থেকে
দিন চলে যায়, ক্রমশ মিলায়, ধীরে ধীরে পুরোটাই।

আবার দুইটি ভেড়ার যুদ্ধে
ভেড়ীটা হারায় ঠ্যাং, শেষাবধি মরে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

দুইটি তাগড়া ষাঁড়ের যুদ্ধে
বেচারি গাধাটা সর্বস্বান্ত হয়।

এ-শহর ছেড়ে যার কোনও আর পালানোর পথ নাই
বোমায় পিণ্ড, চূর্ণিত তার দেহ
আর যার কোনও থাকারই ইচ্ছা নাই
তাকেই বন্দী করা হল শেষে ঘোড়ার নালে ও জিনে।

পুনরায় শেল আর শ্র্যাপনেল
বুকে-চোখে বিঁধে যায়
আবার শংকা এবং বেদনা গ্রাস করে লোকালয়
আবার যেখানে-সেখানে মানুষ চলছে গোরস্থানে।

একজন কেউ সংরক্ষিত ট্রেঞ্চের আশ্রয়ে,
অন্য কেউবা তার ওপরেই প্রতিশোধে উদ্যত;
আপনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন:
মরলো যে, সে কে? উত্তর হবে, ও, সে এক জল-বাহক, অথবা মুচি।

আবার শহর, ক্লান্ত শহর অসংখ্য মৃত্যুতে,
দগ্ধ এবং ভগ্নস্তূপে লীন;
আর আসমায়ী পর্বত আজ ভেঙে পড়ে বেদনায়
আবার কাবুল ছেয়েছে ভীষণ নীলে।

সক্ষম হতে পারা

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন ও সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী

যদি আমি না-পারি মরতে শহীদের মরা তোমার সকাশে,
যদি আমি না-পারি খুঁড়তে যথাযথ গোর,
তোমার জন্য যোগ্য কাফন না-পারি বানাতে;
যদি আমি বইতে না-পারি তোমার আঘাত আমার স্কন্ধে,
যদি আমি বইতে না-পারি তব খঞ্জর তোমার পেছনে;
যদি আমি রাখতে না-পারি তোমার ক্রোধকে বহাল তোমার বৃদ্ধ বয়েসে,
যদি আমি করতে না-পারি তোমার দয়াকে সুপরিপূর্ণ;
যদি আমি তোমার সুবাদে তুলতে না-পারি সবুজ পতাকা তোমার কবরে,
যদি আমি না-পারি তোমার অসি-শমসের পালিশ করতে;
যদি আমি না-পারি তোমাকে জল দিতে এক পাত্র যখন বিক্ষত তুমি;
যদি আমি না-ই হতে পারি আকাশের নিচে প্রশংসার্হ
কোনো ধূলিকণা যেইখানে তুমি নিঃশ্বাস নিতে, নামাজ পড়তে ...
বানাতে তো পারি তোমার প্রেম ও বাসনার গান –
তোমার না-মেটা আকাঙ্ক্ষাদের শ্রদ্ধা জানাতে,

লিখতে তো পারি গাছের গা-কেটে তোমার নামের মর্ম,
বুনতে তো পারি নদীর উদরে চিরসবুজের গুল্ম,
তোমার ব্যথার একটা বাগান করতে তো পারি;
আনতে তো পারি শহরের বুকে পর্ব্বত থেকে তোমার অস্ত্র,
জমকালোভাবে বর্শা আমার ছুঁড়তে তো পারি,
লালটুকটুকে গোলাপের সাথে ইস্পাত দিয়ে
তোমার স্মৃতিতে গড়ে দিতে পারি খ্যাতির মিনার;
বাজাতে তো পারি ঢাকে আর খোলে তোমার স্বপ্ন-সংকীর্তন,

আমি জন্মাতে পারি নতুন বাগিচা তোমার হাস্য থেকে,
উথলাতে পারি তোমার প্রেমকে নদীর জিহ্বা দিয়ে,
আমি করে দিতে পারি তোমার ক্রোধকে রক্তবর্ণ আলোকিত ওম
আগুনের জিভ দিয়ে –
ঠিক যেমনটা বলেছিলে তুমি আগে
ঠিক যেমনটা ছিলে তুমি তেজী
এবং অন্তহীন!

কাবুল। ডিসেম্বর ১৯৮৮

লতিফ নাজেমী

লেগুন এবং ছায়া

তরজমা: বদরে মুনীর

মুখভারকরা পাহাড়ের ওই পারে
শস্যভূমির আওতার থেকে দূরে
একটি পুরনো লেগুন আঁধারে একা
কাঁটালতা আর ঘন ঝোপঝাড়ে ঘেরা,

চাঁদের আলোয় কখনো যায় না দেখা
স্বর্গের চোখ, আর হাত থেকে দূরে
ক্লান্তি-এবং অবসাদ-ভারী চোখে
পুরনো লেগুন গভীর নিদ্রাগত,

বুড়ো পপলার শাখার আঙুল দিয়ে
মাঝে মাঝে ছোঁয় জলের উপরিতল
নিশীথ-বাতাস ছুটে আসা চিৎকারে
লেগুনের মুখে আঁকায় আক্রমণ।

কালো গিরগিটি বুক ঘষে ঘষে এসে
পেঁচিয়ে ধরেছে ঘাসের ঠাণ্ডা বাহু
অবশ নদীর মোহনাপথের দিকে
ভিড় গিজগিজে বাদুড় মেলেছে ডানা,

উইলো এবং ওকের তৃষিত পাতা
লেগুনের জলে ভিজিয়েছে ঠোঁট, মুখ
নয়ানজুলির, ছোট্ট নদীর তীরে
ব্যাঙেরা গেয়েছে আবেদনহীন গান।

ক্ষুদ্র এবং নাছোড়বান্দা লতা
একে অন্যের জড়িয়ে রেখেছে গলা
লেগুনে গজানো বুনো গন্ধের ফ্লোরা
বাতাসে তীব্র সৌরভ ছড়িয়েছে

ক্ষয়িত, ধ্বস্ত নলখাগড়ার ছোরা
লেগুনে প্রোথিত এবং আকাশে ডগা
বাতাসে বাতাসে গর্জনে কম্পিত
গোপনীয় সব বিদ্রোহে উদাসীন।

প্রতিরাতে এক ছায়া আসে বুকে হেঁটে
ওক বন থেকে নিস্তেজ মোহনায়
বাদুড় পালায় মধুর স্বপ্ন ভেঙে
বুড়ো শকুনেরা আবর্তে পাক খায়

আমি সে-রাতের প্রত্যাখ্যাত ভূত,
অক্ষম পাপে কানায় কানায় ভরা
শোচনায় বলি লেগুনের কানে কানে
আমার সকল কৃষ্ণ প্রেমের কথা।

রক্তুতুষার

তরজমা: বদরে মুনীর

কবিতাটা হাফিজুল্লা আমিনের অত্যাচারী শাসনসময়-সংক্রান্ত। সে-সময়ে হাজার হাজার আফগান বুদ্ধিজীবীকে খুন করা হয়েছে কাবুলে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে। "আমরা এসেছি সে-শহর থেকে মিকাইল যার নৃপতি/সূর্যের সব সংবাদ আছে সঙ্গে"– পঙ্‌ক্তিটি আফগান কম্যুনিস্টদের সেই আকাশকুসুম মতাদর্শের দিকে ইঙ্গিত করে যে-ধারণার বশে তারা মনে করত যে, সত্য কেবল তাদেরই দখলে, এবং এই বিশ্বাস সমস্ত জাতিকে ঠেলে দিয়েছিল এক রক্তকলঙ্কিত মতাদর্শিক সংঘাতের ভেতর।

জুর-যাওয়ান্দ: ফেরদৌসীর শাহনামার এক পৌরাণিক চরিত্র, যে পারস্যের কিংবদন্তি রাজা সিয়োশের মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ বয়ে এনেছিল। 'গোয়েন্দাদের দপ্তর' শব্দদুটি কাবুলে তারাকি-শাসকদের গোয়েন্দা সংস্থা কে. এ. এম.-এর দিকে ইঙ্গিত করে, যাদের নির্যাতন ছিল কুখ্যাত।

সারাদিনমান রক্তুতুষার ঝরেছে
আমাদের এই শহরের প্রতি জখমদীর্ণ অঙ্গে
এবং রাত্রি নিজেরই দু'চোখে সেঁধিয়ে দিয়েছে তীব্র
মাসকারা ফেলে বারুদের তাজা চূর্ণ,
লোহার জুতায়, বর্মেমোড়ানো লোকেরা
চণ্ড, পাষাণ হৃদয়ে
নিশ্চুপ সব গৃহস্থালির গর্ভে
ক্রোধের গরল ঢেলেছে,
শ্লোগান বেজেছে বাতাসে:
"আমরা এসেছি সে-শহর থেকে মিকাইল যার নৃপতি,
সূর্যের সব সংবাদ আছে সঙ্গে।"

সাহসের ভরে তাদের সামনে উদ্ধত কেউ বলেনি:
"তোমাদের হোক লজ্জা!
কী করে তোমরা সূর্যের কথা বলছো
নিজেরাই যাকে রাত্রির ক্রুশে বলি দাও সর্বত্র।
তোমাদের এই আস্ফালনের প্রাপ্য কেবল করুণা!"

এবং আমরা এসব তামাশা বন্ধ করতে পারিনি,
চিৎকার করে বলতে পারিনি কিচ্ছু:
বলতে পারিনি, খোরাশান মৃত, অথচ,
বৃষ্টির প্রতি ফোঁটায় ফোঁটায় লুকায়িত তার অশ্রু
বলতে পারিনি, সিয়োশের তাজা রক্ত
আঙুরের প্রতি পাতার শিরায় ব্যপ্ত।
একে তুমি শুধু তুষার বলো না, বলো না।
এটা তো একটা শব্দ:
পৃথিবীর এই গরম গর্ভজঠরে
এ-তুষার হলো আমাদের সব আত্মার আলো, উৎস।
কেউ একজন ছিটিয়ে দিয়েছে আমাদের সব ছিন্নভিন্ন ধমনী
যেন দুমড়ানো আঙুরের শাখা-প্রশাখা।

যেখানে-সেখানে কবিতার দেবী শৃঙ্খলে ছিল বন্দী
যেখানে-সেখানে মুক্তিকামীর হয়েছিল শ্বাসরুদ্ধ
এবং প্রতিটি কণ্ঠে স্তব্ধ হয়েছিল স্বর-যন্ত্র
আর রাত্রির শিশুদের কাছে ছিল আমাদের কয়েদখানার চাবিটা।

আতঙ্কে সব নিষ্ফল মেঘ উড়ে চলে গেছে পালিয়ে
এই বনভূমি-ভরা সব ওকবৃক্ষ
উৎপীড়নের নিদয় শিখায় জ্বলে যায় সারারাত্রি।

জাগরণ নাই, উত্থানও নাই কিছুতে,
আসছে সকালে নাই আর কোনো আস্থা
আর নাই কোনো জুর-যাওয়ান্দ– সিয়োশের শেষ সংবাদ বয়ে আনবে,
গোয়েন্দাদের দপ্তর থেকে যে আর কখনো ফেরেনি!

প্রস্তরলাগি পদ্য

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন, রিপন মাহমুদ, আ-আল মামুন,
সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী এবং বদরে মুনীর

হে ভাই আমার, পাথর,
কতোকাল আর লুকিয়ে থাকবে
শক্ত মুঠির ভেতর?
আঘাত করো এ-অলীকের মস্তকে
রোষে-আক্রোশে পূর্ণ ও-বুক থেকে
তোমার আগুনে
বানাও কোরালভুমি।
বিচূর্ণ করা পাথুরে স্বভাব তোমার

কবর ফলক হওয়া, সেতো অপমান।
হতে চেয়েছিলে ধৈর্য্যমুক্তাহার
কিন্তু সময় নেই কো মৌনতার।
নির্দয়ভাবে সুযোগ-হারানো তুমি।

পাথর, হে নীরবতা,
পাহাড়ে জন্ম তবু এত চুপচাপ!
উত্থিত হও, জাগো–
রাতের কৃষ্ণভালে গেঁথে দাও
তোমার কবিতা লাল!

সোয়ালো-উড়াল তোমার স্বরের ডানায়
মেলানোর লাগি কত প্রতীক্ষা আর
তছনছ করো টলোটলোমলো
সাপে কিলবিল ডালা।

ওগো প্রস্তর, অস্ত্র বঞ্চিতের
বদমাশদের বাহিনীকে ছিঁড়ে
শোধ নিও আমাদের।
খাপ খুলে দিও প্রতিশোধ-নেয়া
পুরাতন তলোয়ার–
ভাগ্য ফিরবে যেদিন উৎসবের।

স্বর্গের পদাবলী

তরজমাঃ সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী ও সেলিম রেজা নিউটন

(ওরা বলে, নীরবতা হলো সম্মতি-লক্ষণ)

নীরবতা হলো না-বলা কথার মর্মরধ্বনি।
নীরবতা হলো আওয়াজের মতো।
নীরবতা হলো ঘাসের-ফুলের নিশ্চুপ গান।
নীরবতা হলো শব্দের ক্রোধ, অক্ষরাঘাত।
নীরবতা ঝড়-পূর্ব মিথ্যা নিস্তব্ধতা নয়।

নীরবতা নিজে-নিজেই তুফান।
নীরবতা নিজে-নিজে চিৎকার।
নীরবতা হলো নিজেই নিনাদ।
নীরবতা হলো প্রেমের প্রভাতে প্রত্যাদেশের শ্লোক।

নীরবতা হলো উদ্ভাসনের নিশিরজনীতে উজ্জ্বলনের স্তোত্র।
নীরবতা হলো স্বর্গের পদাবলী।

কত না বছর জানতে চেয়েছি আমি:
তুমি কি আমাকে ভালোবাস, ওগো বলো?
ঠোঁট বুঁজে তুমি চুপচাপ রয়ে গেলে।

আর, অন্যেরা বলে:
আহা কী দারুণ খোশনসিবের লোক!
মৌনসম্মতির-ই অন্য নাম হয় নীরবতা।

বাহার সায়ীদ

জাতীয় বিপর্যয়

তরজমা: রিপন মাহমুদ

পাথরের হৃদয়কে যে ভাঙছে সে কে?
প্রতি ঘরে মেলে দিচ্ছে যে বেদনা সে কে?

ক্ষুধার্তের হাহারব– তা কি যথেষ্ট ছিলো না?
বঞ্চিতের দুঃখ– তা কি যথেষ্ট ছিলো না?

যে, তুমি শোণিত আর ধুলোর প্রলেপ দিলে
আমাদের ইতিহাস আর কুলাচারে
তুলনাহীন সেসব
প্রাচীন সম্পদে লাগালে আগুন,
আর মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে গেলে
আমাদের শিশুদের অথবা বাধালে যুদ্ধ
পূর্বপুরুষের সাথে?

ইতিহাসের চেহারা থেকে, মানবতার কান্না কী
ধুয়ে দিতে পারবে এ সকল অপমানের কলঙ্ক?

দৃশ্য

তরজমা: রিপন মাহমুদ

সমস্ত শরীর জুড়ে গনগনে ফুল
আবার বিবর্ণ হ'য়ে গেছে তৃণভূমি

গোলাপ থেকে সুরভী নয়
ভেসে আসে ধোঁয়া
আগুন আবার গ্রাস করছে বাগান

বুলেটের বৃষ্টির আতঙ্কে
আবার বাগান ছেড়ে যাচ্ছে আবাবিল

দিকে দিকে ছড়ানো ছিটানো কুঁড়ি আর ডালপালা
শোণিতের স্রোত আবার প্লাবিত করছে বাগান

রক্তঝরা এই ভূমিতে কেবল গজায় বেদনা
পপিতে আবার রক্ত-গন্ধ
ক্ষতচিহ্ন সংকুল বসন্ত আমাদের
বুলেট-বৃষ্টির নিচে দৃশ্যাবলী এরকমই

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

আমি শুনেছি

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন

শুনেছি আমি নিজ-বাসভূমে
যামিনী ভয় পায় তারকা-তারাদের, গাছেরা ভয় পায় চাঁদ-শশী;
দিবস ভয় করে সূর্য-আফতাব, নদীরা ভয় পায় জলরাশি।

শুনেছি নিজ-ভূমি-অঞ্চলে
আশারা আশ্রয় খুঁজছে কাফনের আবরণে।
ফকির-ভিখারিরা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় মানুষজনদের বাড়িঘরে।
পিতারা তাহাদের গমের খোয়াবেতে ফসল-কাটা-মাঠে ঘুম পাড়ে।

মায়েরা নিজেদের কলিজা ভেজে দেয়
এতিম বাচ্চার সম্মুখে।
দুধ না-পেয়ে তার বদলে ছেলেপুলে
চিবায় মায়েদের বক্ষকে।

শুনেছি ঘরদোর বিক্ষত।
দেয়ালে জেগে-থাকা হাঁ-করা ক্ষতদাগ
ঢাকবে সে-রকম লোক নাই।
বোমার-রকেটের আওয়াজে ভেঙে যায়
যখন জানলার হাড়গোড়,
ব্যথায় রাস্তারা কাতরায়।

শুনেছি শীতকাল লিখেছে ব্রত তার
তুষারে বরফের অন্দরে:
কাঁপাবে ঠকঠকে শীতল ঠাণ্ডায়
বস্ত্রহীন লোকজনদেরে।

শুনেছি আমি যুবজনেরা প্রায়শই
পড়ছে প্রেমে ফলবৃক্ষের
এবং বধুগণ ধোঁয়ার কালি দিয়ে
সাজছে সাজ নিজ চক্ষের।

শুনেছি মেষপাল – যেহেতু নেই ঘাস – খাচ্ছে মানুষের গোস্ত-হাড়মাস।
ভবিষ্যৎ সে তো বোঝায় কিছু-না'কে
ডিমের ভাবনায় নিরত – এই মতো – কেবল একখানি মুরগি ব্যতিরেকে।

আফগানিস্তানের কবিতা

লায়লা সারাহাত

আসামায়ি পাহাড়

তরজমা : সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী

ও আসামায়ি পাহাড়,
তোমার পাথুরে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
হাজারো নীরব স্ফুলিঙ্গের আত্মা।
ও পাথর, ও সহিষ্ণুতা,
তোমার উত্তুঙ্গতা হলো তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা
ইতিহাসের আশ্চর্য কবিতা।
ও পাহাড়,
পুরাণের পবিত্র অহঙ্কার
উৎকীর্ণ তোমার চেতন মনের গহীনে।
এই শহরের সীমাহীন বেদনা
খোদিত তোমার ঠাণ্ডা নির্দয় শিরায়
কতকাল ধরে ।
ও পাথর, ও সহিষ্ণুতা,
নিঃশব্দ সাক্ষী তুমি কত অন্যায়ের।
কোন্ সে জখমে উথলে উঠেছে
তোমার ভেতর-পাথরের রক্তাক্ত হৃদয়
যা হঠাৎ তোমার পাঁজর করেছে বিদীর্ণ।
ও পাহাড় ও সহিষ্ণুতা!

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আমাদের জানা থাক, আফগানিস্তানের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে এই আসামায়ী পাহাড়ের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে ১৯৯১ সালে।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

জেবা শরিশ-শামলি

তোমাদের কথা মনে পড়ে

তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী

তোমাদের কথা মনে পড়ে ...

যখন তোমার কোনো নিজের পছন্দ নেই, কোনো কণ্ঠস্বর নেই,
হক নেই, অস্তিত্ব নেই;
যখন তোমার কোনো হাসি নেই, সুখ নেই,
কোনো স্বাধীনতা নেই, প্রতিরোধ-সক্ষমতা নেই–
তোমার বেদনা আর যাতনা-নৈঃশব্দ্য আর একা-একা মুখ,
তোমার বিক্ষোভ আর হতাশা-ক্রন্দন আর তোমার অসুখ।

তোমাদের কথা মনে পড়ে ...

যখন তোমরা সব অপব্যবহারে নষ্ট আক্রান্ত, প্রহৃত
আর বোরখায় মোড়া;
যখন তোমরা সব নিপীড়িত, শ্বাসরুদ্ধ, প্রায়-খুন, গলা-টিপে-ধরা;
অনুভূতিশূন্য তুমি বোধ কর শূন্যতা নির্জীবতা, রোদন-গোঙানি;
তুমি ছায়া তুমি ভূত – অনেক শঙ্কায় ভরা প্রাণী।

তোমাদের কথা মনে পড়ে ...

যখন তোমরা সব অন্ধকারে ডুবে আছো, তারাহীন রাত্রির স্থিরতা
আকাশের দিকে হাত মনে ত্রাস শুধু বিষণ্ণতা
পৃথিবীকে প্রশ্ন কর দুচোখের ব্যথাভরা জলে:
এত অপরাধ কেন? কীসের কারণ? সেটা
কেউ কি বোঝাতে পার বলে?

তোমাদের কথা মনে পড়ে ...

যখন তোমরা জেগে উঠবে ঘুমের থেকে,
দাঁড়াবে নিজেরা নিজ পায়ে,
সবাই বলবে, “না – আর বসে থাকবো না কোনো পরাজয়ে”।
ভাঙ্গবে শেকলগুলো, পোড়াবে বোরখা আর
ভেঙ্গে দেবে সকল দেয়াল,
‘সকলে নিপাত যাক’ – সর্বশক্তি দিয়ে তুমি
করে যাবে এই চিৎকার।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

তোমাদের কথা মনে পড়ে ...

যখন তোমরা নাও পবিত্র শপথ, আর লড়ে যাও প্রতিরোধ গড়ে;
উপার্জন করে নাও তোমাদের স্বাধীনতা তোমাদেরই সবটুকু জোরে -
যতই দাও না তার চড়া দাম কোনোদিন হাল ছাড়িও না;
বিভ্রমে পড়ো না কভু, হয়ো না কম্পিত তুমি,
হারিয়ে যেও না।

মুসা মারূফী

ঘড়ি

তরজমা: রিপন মাহমুদ

ভিয়েনায় আমাদের রান্নাঘরে
ঘড়ি টিক দেয়
এর কাঁটা সময়কে নিয়ে যায়
সামনের দিকে।

কাবুলে আমাদের রান্নাঘরে
ঘড়ি টিক দেয়
এর কাঁটা সময়কে নিয়ে যায়
পেছনের দিকে।

প্রথমটি ভবিষ্যের এবাদত আর
দ্বিতীয়টি ইতিহাসের ভজনা করে।
দুই-ই চলছে দ্রুত,
তারা সময়কে টেনে নেয় বিপরীত দিকে।

কিন্তু সময় দৌড়াচ্ছে
বর্তমানের সন্ধানে,
হায়! এরই মাঝে এটা খোঁজে বর্তমান
বর্তমান হবে ইতিহাস।

খলিলুল্লাহ খলিলি

হে বিশাল পর্বতমালা

তরজমা: বদরে মুনীর

আকাশ ছাড়িয়ে যাওয়া হে বিশাল পর্বতপ্রাকার!
আর কত কাল তুমি আত্মপ্রেমে তৃপ্তি খুঁজে পাবে?
আমি তো সামান্য এক
ক্ষুদে প্রজাপতি, অথচ স্বাধীন, দেখ, তুমুল বেড়াচ্ছি নেচে
পুষ্পদের চূড়ায় চূড়ায়, অন্যদিকে তুমি আজও
তেমনি শৃঙ্খলিত।

পৃথিবীর মাঠে খসে পড়া তেতোফল

তরজমা: বদরে মুনীর

আমি সেই তেতোফল খসে পড়ছি পৃথিবীর মাঠে।
এইভাবে সময়ের সাঁড়াশির মাঝখানে বেঁচেবর্তে থাকি।
হায় মুক্তির বসন্ত! তোমার করুণা ছাড়া
আর কী বা আছে, এই তিক্ততায় এনে দেবে মধু?
দুনিয়ার সব থেকে বড় সম্পদ তো বন্ধুদের সঙ্গ, আর
তাদের বিচ্ছেদে আসে মৃত্যুর যন্ত্রণা;
অথচ বন্ধুরা সব একসাথে আজ
গভীর ক্লান্তিতে শুয়ে ধুলার অতলে ...
আর কী বা যায় আসে
তারা আজ জীবিত না মৃত!
আমাকে পেঁচিয়ে রেখেছে আমার যাত্রা দুঃখে, আর যন্ত্রণায়
জীবনের মধুভাণ্ডে কী আর আনন্দভার রয়েছে আমার?
ধাবিত বাতাসে একা, প্রজ্জ্বলিত একটি মোমের মতো আমি
কেঁপে উঠি, আমি জ্বলে যাই ... মরে যাই।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

ড. আমিন আজিমী

সুখস্বপ্নের স্মৃতি

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন ও রিপন মাহমুদ

আমার জন্ম হয়েছে আফগানিস্তান নামে দেশে
নানাবিধ সব গোষ্ঠীগোত্র-লোকজন দিয়ে গড়া,
কোনো গোষ্ঠীতে থাকাতেই এসে দারুণ গর্ব মেশে,
গিরিপর্বতে বসত করত তারা।

রাতের আকাশ পূর্ণ থাকত উজ্জ্বল সব তারায়,
যেন আলোকের আদি;
ঐ মাধুরীকে কেমনে বা লোকে বয়ান করবে ভাষায় –
মনে আসে ইত্যাদি –
বুঝিয়ে বলার মতোই সে এক বিষয়;
দক্ষতা যদি থাকত আমার লেখায়!

পর্বত কত সুউচ্চ আর নদনদী সুগভীর
আকাশ সুনীল ছিল আর ছিল লালরঙা মরুভূমি –
তখন – যখন টিউলিপ চমকাতো।
বাকিটুকু রূপকথা:
গ্রন্থে যেভাবে পড়ে লোকজন,
পদ্যছন্দ-যথা।

প্রথম জীবনে তুমি শিখেছিলে
দায়িত্বে কেউ নেই –
একক এবং অদ্বিত আল্লা ছাড়া।

অপরের প্রতি ছিল সম্মান
ছিল সম-মর্যাদা –
কিন্তু আখেরি অধিকারটুকু
শুধু মুরুব্বিদেরই।

যা-কিছু ভেবেছি শুকরিয়া আল্লার:
যা তুমি দেখছ সকল কিছুর
লক্ষ্য-যুক্তি আছে –
জানে না তো কেউ কী আছে
খোদার কাছে।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

যখন পক্ষী গান গায়, ধারা ঝরে,
বন্যা যখন, শিশু মারা যায় ঘরে –
প্রশ্ন ওঠে না কোনো।
মহান খোদার এটাই কায়দা জেনো।
এইসব দেখে ভয় পেয়েছিনু আমি
কেননা তখন ছিলাম ক্ষুদ্র শিশু।

ছিলাম একলা বালক;
ঔৎসুক্যই ঠেলেছে আমাকে দূরে ...
সেই পথে ছিল বিচ্ছিন্নতা
এবং অন্তরালোক।

সখা-সাথী ছিল মুখরিত পাখিদল;
অপরূপ সেই কবুতর আমি
উড়াতাম – উড্ডীন।
কৃতজ্ঞতার ডানার উড়ালে
বাড়ি-ফিরে-আসা দিন।

আমার কুকুর 'নেকড়ে'কে সাথে নিয়ে
কাটিয়েছি কাল বিস্তৃত ময়দানে
খেলেছি, ছুটেছি, দৌড়েছি পায়ে পায়ে।

যক্ষুণি আমি মাথা ফিরিয়েছি
সদাসতর্ক ঠিক সে,
ভূমিতে আমার দেয়া ধাপগুলো
তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে।

এখন যখন ভাবছি অতীত-অঙ্গে,
একা-একা লাগে, আহা,
'নেকড়ে'টা যদি থাকত এখনও সঙ্গে!
পড়তে দিত না কখনও আমাকে তো সে,
সদাসর্বদা হাঁটত আমার পাশে
শহরের শুরু থেকে একদম শেষে।

কোনো কোনো রাতে খোয়াবে-স্বপ্নে তাকে
দেখি; আর শুনি তার দূর-ধ্বনি ডাক-এ
স্মৃতিকুঠুরীতে এতটা বছর পরে
এখনও সে আছে আমার হৃদয় জুড়ে –
তাহার জন্য কাঁদে প্রেম অন্তরে।

আহমদ শাহ্ দুররানি

একটি জাতির ভালবাসা

তরজমা: বদরে মুনীর

রক্তের মাশুল গুনে আমরা তোমাকে ভালবাসি।
যুবারা তোমার জন্য হারাচ্ছে গর্দান।
তোমার দুয়ারে এসে দম ফেলে আমার হৃদয়।
তোমার সান্নিধ্য থেকে দূরে
বেদনা সাপের মতো হৃদপিণ্ড জাপটে ধরে।
বেমালুম ভুলে যাই দিল্লির মুকুট
যখন আমার মনে পড়ে আফগান ভূমিতে দাঁড়ানো
পাহাড়ের চূড়া।
তুমি, আর দুনিয়ার মধ্যে যদি একটিকে বেছে নিতে হয়,
আমার আপন বলে নির্দ্বিধায় টেনে নেবো
তোমার ঊষর মরুভূমি।

হান্‌জালা-ই-বাদ্‌ঘিস

নেতৃত্ব

তরজমা: বদরে মুনীর

সিংহের চোয়ালে যদি নেতৃত্ব ঘুমায় তবে সিংহ হও।
সে-চোয়াল থেকে তাকে কেড়ে আনো।
মহত্ত্ব, সম্মান, আর উজ্জ্বল গৌরব হবে তোমার সম্বল।
সবই যদি ব্যর্থ হয়, মানুষের মতো
মৃত্যুর মোকাবিলা করো।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

আবু শুকুর-ই-বল্‌খ

যে-গাছের বীজ তেতো

তরজমা: বদরে মুনীর

যে-গাছের বীজ তেতো
তাকে তুমি যত চিনি-মাখন গেলাও
তার ফল তেতোই থাকবে।
সে-গাছে কখনও তুমি মাধুর্য পাবে না।

রাবিয়া বল্‌খি

ভালবাসার জাল

তরজমা: বদরে মুনীর

ছলচাতুরীর প্রণয়ের জালে আটকা পড়েছি আমি
কোনো সাধনাই হয় না আমার সুফলের অনুগামী।
বুঝিনি কখন চড়েছি এমন উন্মাদ বুররাকে
রাশ টানি যত শোনে না কিছুই, মাতাল ছুটতে থাকে
ভালবাসা সেই ব্যপ্ত, বিশাল মহাসাগরের মতো
হেন বিদ্বান নাই যে সেখানে সাঁতরেছে যথাযথ।
প্রকৃত প্রেমিক শেষতক থাকে বিশ্বাসে অবিচল
আর রুখে দেয় জীবনের সব লাম্পট্যের চল।
চারপাশ যদি ভয়ে ভরে যায়, দেখাও তোমার জাদু,
বিষ খাও, তবু চিনি চেখে বলো, মিষ্টি, অতীব স্বাদু।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি

আমি এলাম গায়েব থেকে

তরজমা: বদরে মুনীর

"আমি এলাম গায়েব থেকে
এবং তাঁবু টাঙালাম বস্তুজগতের অরণ্যে।
খনিজ লবণ আর শাকসবজির রাজত্ব পার হয়ে
আমার মনের যন্ত্রপাতি আমাকে নিয়ে গেলো প্রাণীর রাজত্বে,
সেখানে পৌঁছার পর আমি তাকে পেরিয়ে গেলাম;
তারপর স্ফটিকস্বচ্ছ মানবহৃদয়ের খোলে
আত্মার বিন্দুকে আমি যত্ন করে মুক্তা বানালাম;
আর ভালো মানুষদের সাথে আমি
ঘুরে বেড়ালাম উপাসনালয়ের আশেপাশে,
এবং সে অভিজ্ঞতাও অতিক্রম করলাম;
তারপর আমি যে-পথ ধরলাম সে-পথ ধাবিত তাঁর দিকে;
আর গোলাম হলাম তাঁর দরজায়;
তারপর উবে গেলো যত ভেদাভেদ
আর আমি তাঁর সাথে বিলীন হলাম।"

জীবনের ভ্রম

তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী ও বদরে মুনীর

বিনা কাজে আমি আসিয়াছি গতকাল।
আজকেও করা হলো না তো কোনো কিছু।
কালকে এ-জাল অবহেলে চলে যাব।
না-আসাই তবে ছিল না কি ঢের ভালো?

দাকিকি-ই-বল্‌খ্‌

হে আমার মাবুদপ্রতিমা! স্বর্গ থেকে কোনো মেঘ ...

তরজমা: বদরে মুনীর

"হে আমার মাবুদপ্রতিমা! স্বর্গ থেকে কোনো মেঘ
মাটিতে ফেলেছে এক পান্নার ঘাগরা।
রক্তের প্রলেপমাখা রেশমের মতো মরুভূমি,
আর মৃগনাভির সৌরভ ভাসে আকাশে-বাতাসে।
কস্তুরী এবং লাল মদের মিশ্রণে কোনো শিল্পী
আমার ভালবাসার চিত্রকল্প এঁকেছে বালুতে।
হরিণ এবং বাঘ উভয়ের পক্ষেই সমান
শান্তিপূর্ণ হয়েছে পৃথিবী।
এই উপলক্ষে আমাদের দরকার এক সূর্যমুখী প্রতিমার,
আর সূর্যের বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকা একফালি চাঁদ।
আমাদের অবশ্যই এমন প্রতিমা দরকার যার
দু-গাল রুবির মতো লাল,
আর দরকার তার সাথে মানাবে এমন লাল মদ।
দুনিয়ার রূপ পাল্টে হয়েছে ময়ূর,
এখানে কর্কশ তো ওখানে কোমল শান্ততা।
কাদা থেকে উঠে আসে গোলাপের ঘ্রাণ
যেন বা গোলাপজলে মাখানো ময়দা।"

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

খুশাল খান খাত্তাক

জীবন জীবন নয় সম্মানরহিত

তরজমা: বদরে মুনীর

জীবন জীবন নয় সম্মানরহিত;
মানুষ মানুষ হয় হয়ে সম্মানিত।

জাতির সুখ্যাতি আর জাতির সম্মান:
জীবনে তাদের দাবি জন্মের সমান।

এমন ভাবনা-সঙ্গে কেটে যায় দিন;
লাভে-লোকসানে নিরুত্তর, উদাসীন।

শীতের আগমন

তরজমা: বদরে মুনীর

যখন সূর্যের থেকে লিব্রা ঘুরে আসে, তখনই শীতের আগমন।
একদা গ্রীষ্মের দাহে দুর্বল পৃথিবী পুনরায় শক্তি ফিরে পায়;
মানুষেরা মনের আনন্দে খায় আর খোঁজ করে পানির সুস্বাদ;
প্রেমিক-প্রেমিকা ফের আলিঙ্গন করে, বাহুতে মিলায় বাহু,
অধরোষ্ঠ যুগ্ম হয়ে ওঠে।

সৈনিক সাদরে পরে শীতের পোশাক;
ঘোড়া তুলে নেয় শীত-সরঞ্জাম;
একজন বোঝে না বর্মের বিড়ম্বনা;
অন্যজন তোয়াক্কা করে না জিনের ওজন।
বাজপাখি ফিরে আসে প্রত্যাগত সন্ন্যাসীর মতো;
আর এই জ্বলজ্বলে জ্যোৎস্নায় আর্তনাদ করে ওঠে
আকাশে সারস।

এ-কথা সবার জানা, যে প্রকৃত জ্ঞানী ...

তরজমা: বদরে মুনীর

নিজেকে যে জানে সে-ই যে প্রকৃত জ্ঞানী
সে-কথা সবার জানা;
কেননা, আত্মদর্শনে, আর অন্তর্দৃষ্টিতে
পবিত্রতম বিদ্যার বসবাস।

যদি-বা হৃদয়ে না থাকে ভক্তি, ভয়
কিছুই হয় না শুভ;
যে-লোক দক্ষ যত্রতত্র কোরানের বাণী দিতে
তার দিকে কান কখনও দিও না ভুলে।

আদম খিলের আফ্রিদি

তরজমা: বদরে মুনীর

আদম খিলের আফ্রিদি কুমারীরা
গোলাপি এবং সুশ্রী-সুদর্শনা;
মনোহরণের যাবতীয় কৌশলে
তাদের হৃদয় সহস্র শোভাময়।

আয়ত চোখের কুঞ্চিত ভঙ্গিমা,
ব্যাপ্ত, অর্ধগোলাকৃতির ভুরু,
মধুর অধর, গোলাপি গণ্ডদেশ
আর চাঁদপানা ফর্সা কপালগুলো;

গোলাপ-কুঁড়ির মতোন ক্ষুদ্র মুখ
সেখানে আবার শুভ্র দাঁতের সারি,
তাদের চুলের সঘন কৃষ্ণবেণী
সুরভিত যেন তিমির তেলের মোম;

একটি লোমের চোরাচিহ্নও নাই
এমনই ডিমের মতো মসৃণ ত্বক,
সুগোল গোড়ালি, ছোট্ট পায়ের পাতা,
হৃষ্টপুষ্ট নিতম্ব সম্ভার;

মেদহীন পেট, উদার বক্ষভার
যথার্থ চারু, সুনিপুণ ক্ষীণ কটি,
তাদের শরীর আলিফের মতো ঋজু,
আর চকচকে রূপালি শুভ্রতায়;

আমিও ঘুরেছি শিকারী পাখির মতো
বন্ধ্যা, ঊষর পাহাড়ে পাহাড়ে একা,
কত মনোহর, ছোট্ট তিতির ছানা
মরেছে আমার বাসনার খেসারতে।

আনাড়ি যুবক, অথবা ধূর্ত বুড়ো–
শিকারীরা থাকে শিকারের সন্ধানে;

এবং প্রবীণ শিকারী পাখির চোখ,
তরুণের চেয়ে নিশ্চিততর হয়।

লান্দাইয়ের অমেয় জলের স্রোত,
অথবা বারা'র সতেজ ফোয়ারাধারা
পিপাসার মুখে যে কোনও সুধার চেয়ে
অনেক মধুর, অনেক শ্রান্তিহরা।

মাতারি খাতের পাশ দিয়ে চূড়ামালা
উঠে গেছে সোজা আকাশবিলাসী ঝোঁকে,
যেখানে উঠলে, উঠতে থাকলে আরও
হৃতবল হাঁটু ফিরে পায় উদ্যম।

তিরাহ প্রদেশে আমিও এসেছিলাম
একদিন এই আদম খিলের মাঝে;
এখন সকল দরদী আত্মা থেকে
বিদায় নিয়েছি, আত্মস্থিত, একা।

শোনো হে খুশাল, সকল প্রেমের গাথা
আগুনে আগুনে অঙ্কিত হয় ভালো:
এর শিখা তুমি যতই লুকাতে চাও
ধোঁয়া দেখা যাবে, ধোঁয়া তবু দেখা যাবে।

জালালুদ্দিন রুমি

শূন্যতা

তরজমা: বদরে মুনীর

আমাদের কাজ আর খোদার কাজের
মাঝে ফারাকটা ভেবে দেখ।

আমরা প্রায়ই বলি,"কেন তুমি ওটা করেছিলে?"
কিংবা "অমন করেছিলাম কেন আমি?"

আমরা যা করি, যা কিছু করি না কেন
সবই তো খোদার সৃষ্টিশীল কাজ।

আমরা পেছনে তাকাই এবং
ফেলে আসা ঘটনাবলি খুঁতিয়ে দেখি,
কিন্তু আরও একভাবে দেখা যায়– অতীত এবং ভবিষ্যত
একই সাথে– সেই পথ যুক্তিতর্কে মিলবে না।

কেবল খোদাই এটা বুঝতে পারেন।
শয়তান কৈফিয়ত দিয়েছিল, তোমারই কারণে
আমি এমন পতিত,
কিন্তু আদম স্বীকার করেছিল, এটা আমাদেরই পাপ।
এই অনুশোচনার পরে খোদা আদমকে
বললেন, সকলই আমার পূর্বজ্ঞানের অধীন,
নিজেকে এমন অজুহাতে কেন বাঁচালে না?

উত্তরে আদম বলেছিল, আমি শঙ্কিত ছিলাম
এবং চেয়েছিলাম সম্মানিত হতে।

যারা সম্মানের সাথে চলে তাদের সম্মানিত করা হবে।
যারা মধুরতা বয়ে আনে তাদের পরিবেশন করা হবে
কাঠবাদামের পিঠা।
ভালো মেয়েদের বানানো হয়েছে ভালো ছেলেদের সাথে
থাকার উদ্দেশ্যে।

তোমার বন্ধুকে ভালবাসো।
অথবা উপেক্ষা করো,
এবং দেখ, কী ঘটে!
ভালবাসা, কিছু বলো যেন খুলে যায়

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

সেই রহস্যের জটাজাল, যার মধ্যে
আমরা কী স্বাধীন, আবার কত বাধ্য!
এক হাত পক্ষাঘাতে কাঁপে, অপর হাতটি কাঁপছে, কেননা
তুমি তাকে চড় মেরে ফিরিয়ে দিয়েছ।

খোদার আরশ থেকে আসে উভয় কম্পন,
কিন্তু তুমি একটার জন্য দোষ মানো,
আর অন্যটার খবর কী?

এ-গুলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন।
বস্তুর প্রতি আত্মার আচরণ বিভিন্নপ্রকার।
বিজ্ঞানী বুল-হাকাম ছিল ওমরের বন্ধু,
প্রত্যক্ষ সমস্যা সমাধানে যে ছিল নির্ভুল,
কিন্তু ওমরের আধ্যাত্মিক বিস্ময়ের
এলাকাগুলো সে বুঝতে পারেনি।

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি,"এবং তোমার সঙ্গে তিনি সর্বদা বিরাজমান,
তুমি যেখানেই থাকো," কিন্তু কবে তাঁকে আমি ছেড়ে গেছি!

অজ্ঞতা খোদার খাঁচা।
আর জ্ঞান খোদার প্রাসাদ।

খোদার নিশ্চেতনায় আমরা ঘুমাই।
আমরা জেগে উঠি খোদার খোলা হাতে।

আমাদের কান্না খোদার বৃষ্টির ধারা।
খোদার আলোকরাশি আমাদের হাসি।

সংগ্রাম এবং শান্তিময়তা
উভয়ই খোদার ভেতরে বাস করে।

আমরা তাহলে কারা,
এই জটিল দুনিয়া-জালে,
যা প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র সরল, ঋজু রেখা,
মিলেছে আল্লার সূচনায়?

কিচ্ছু না।
আমরা হলাম
শূন্যতা।

পর্যাপ্ত কথা

তরজমা: বদরে মুনীর

শব্দের একটা অংশ কীভাবে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়?
পানি ছেড়ে উড়ে যায় কী ক'রে আর্দ্রতা?

আগুন ছিটিয়ে তুমি আগুনের শিখা
নেভানোর কোশেশ ক'রো না!
রক্ত ঢেলে ধুয়ো না জখম!

যত জোরে দৌড়াও না কেন,
তোমার ছায়াও ছোটে আরও দ্রুততর।
মাঝে মাঝে তোমার সামনে।

কেবল মাথার উপরে সম্পূর্ণ সূর্য
ছায়া মুছে দিতে পারে।

কিন্তু সে-ছায়া তোমাকে এতোদিন সাহায্য করেছে!
যা আঘাত করে, সেটাই তোমাকে আশীর্বাদ করে।
অন্ধকার তোমার প্রদীপ।
তোমার সীমানাগুলো তোমার অভীপ্সা।

এটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু তা তোমার
হৃদয় ঢেকে রাখা কাঁচের আবরণ ভেঙে দিতে পারে,
যা আর কখনও জোড়া লাগবে না।

আলো আর ছায়া– উভয়েরই উৎস তোমার থাকতে হবে।
শোনো, এবং তোমার মাথা রাখো সম্ভ্রমের বৃক্ষতলে।

যখন সে-গাছ থেকে ডানা আর পালকেরা ঝ'রে ঝ'রে
জমে উঠবে তোমাকে ঢেকে, নিঃশব্দ– ঘুঘুর মতো– সুনশান থেকো।
একটি কুজনও যেন না বাজে গলায়।

ব্যাঙ যখন পানিতে থাকে, সাপ তাকে ধরতে পারে না।
কিন্তু সে ডাঙায় উঠে ডাকাডাকি জুড়ে দিলে
সাপ তার দিকে ফের ছুটে যায়।

ব্যাঙ যদি সাপের মতো হিস্‌হিস্‌ করতে শিখত,
তবু সাপ সেই হিসহিসানির তলদেশ থেকে
শুনতে পেত তার কাঙ্ক্ষিত ব্যাঙের ডাক।
কিন্তু ব্যাঙ যদি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকতে পারতো,

সাপ ফিরে যেত তার বিঘ্নিত নিদ্রায়,
আর ব্যাঙের পক্ষেও শস্যে পৌঁছানো সম্ভব হ'ত।

আত্মার আবাস সেই নিঃশব্দ নিঃশ্বাসে।

শস্যের কণা এমনই,
তুমি তাকে যত মাটিতে ফেলবে,
সে বেড়ে উঠবে।

এগুলোই কি পর্যাপ্ত বলা,

নাকি চাই আরও বেশি নিঙড়ানো রস?
কিন্তু বন্ধু, আমি কে?

মাঝে-মাঝে পুরা ভুলে যাই

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন

মাঝে-মাঝে পুরাপুরি ভুলে যাই
বন্ধুত্বের মানে কী।

উন্মাদ অচেতন আমি
উথলে উপচে দেই বিষণ্ন বাহাদুরি
এখানে-ওখানে-সবখানে।

আমার গল্পগুলা লোকে বলাবলি করে
নানাবিধ বিবিধ উপায়ে:
রসের পিরিতি, আর নোংরা তামাশা,
আর একটা যুদ্ধ, আর চাকুরির খালি এক পদ।

আমার বিস্মৃতিকে টুকরা টুকরা করো
যত তুমি পারো,
সেইসব যাবে চাদ্দিকে।

এই যে যাচ্ছি আমি অন্ধকার আঁধারের টানে,
সেটা কি অংশ কোনো বৃহৎ প্ল্যানের?

সখা, খুব সতর্ক হও।
সহানুভূতির বশে কিংবা কৌতুহলে
আমার নিকটে আসিও না।

কে এই বদলগুলা করে?

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন

কে এই বদলগুলা করে?
দক্ষিণে তীর ছুঁড়ি।
যায় সেটা বামে।

অশ্বের পিঠে চড়ে হরিণের পিছে ছুটি
এবং আমাকে দেখি ধাওয়া করে
ভেতরেরই লোভী এক আমি।

গোপনে ফন্দি আঁটি যেন পাই যাহা আমি চাই,
এবং তা শেষ হয় জেলে।
লোককে ফাঁসাবো বলে বৃহৎ গর্ত খুঁড়ি
এবং নিজেই পড়ি তাতে।

এখন উচিত হয়
আমার কাঙ্ক্ষাকেই
সন্দেহ করা।

অদৃশ্য আফগানিস্তান
আদলহীন
এক দেশ

মোহসেন মাখমালবাফ

কী বলব পড়শির কথা, হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে ...

আফগানিস্তানের বিপর্যয়ে দুনিয়ার উদাসীনতা

তরজমা: বদরে মুনীর

> মোহসেন মাখমালবাফের ‘Limbs of no body: World’s indifference to the Afghan tragedy’ নামের এই লেখাটা নেয়া হয়েছে *ইরানিয়ান* পত্রিকা থেকে। বলে রাখা ভালো: এই লেখার তিন ভাগের এক ভাগেরও কিছু কম অংশ *‘প্রথম আলো’*তে ছাপা হয়েছিল ২৩শে নভেম্বর ২০০১ তারিখে ‘আফগানিস্তান পরিস্থিতি: না-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ শিরোনামে, মোস্তফা কায়সারের অনুবাদে, কোনো সংক্ষেপন-বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই; লেখাটার কোনো উৎস নির্দেশ করা ছিল না। এখানে *ইরানিয়ান* পত্রিকা (www.iranian.com) থেকে সম্পূর্ণ লেখাটার তরজমা দেয়া হলো নতুন শিরোনামে। লেখাটা পড়লে বোঝাই যাবে, তবু মনে করিয়ে দেয়া দরকার, এই লেখাটা যখন লেখা হচ্ছিল তখন আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী হামলা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে নি।

আপনি যদি আমার লেখা পুরোটা পড়েন, তো আপনার সময় লাগবে এক ঘণ্টার মতো। এই এক ঘণ্টায়, আফগানিস্তানে আরও ১৪ জন মারা যাবে যুদ্ধে আর ক্ষুধায় এবং আরও ৬০ জন উদ্বাস্তু হবে অন্যান্য দেশে। এই মৃত্যু আর দেশান্তরের কারণ বর্ণনা এ-লেখার উদ্দেশ্য। আপনার মিষ্টি জীবনে এই তিক্ত বিষয় যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়, দয়া করে পড়বেন না।

পৃথিবীর চোখে আফগানিস্তান

গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ার পুশান-চলচ্চিত্র-উৎসবে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো আমার পরের ছবির বিষয় নিয়ে। আমি বললাম, আফগানিস্তান। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন, “আফগানিস্তান কী?” কেন এমন হয়? একটা দেশ কেন এতটা বাতিল হয়ে যাবে যে, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো আরেকটি এশীয় দেশের মানুষ তার নামটা পর্যন্ত জানবে না?

কারণটা স্পষ্ট। আজকের পৃথিবীতে আফগানিস্তানের কোনো ভূমিকা নাই। এটা এমন কোনো দেশ না যাকে মনে রাখা দরকার তার বিশেষ পণ্যসামগ্রীর জন্য, অথবা তার বৈজ্ঞানিক

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

অগ্রসরতার জন্য, অথবা এমন কোনো জাতি হিসাবে যারা শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশেষ সুনাম পেয়েছে। পরিস্থিতি যদিও ভিন্ন, তবু যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আফগানিস্তান একটা অদ্ভুত দেশ হিসাবেই চিহ্নিত।

কোনোভাবেই এই অদ্ভুততার কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত থাকে না। যারা আফগানিস্তানের নামটা স্বীকার করেন, সাথে সাথে দেশটির সাথে জুড়ে দেন চোরাচালান, তালিবান, ইসলামী মৌলবাদ, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ, দীর্ঘ মেয়াদী এক গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং উচ্চ মৃত্যুহার। এই বিষয়নিষ্ঠ প্রতিকৃতিতে শান্তি, স্থিতি বা উন্নয়নের কোনো চিহ্ন নাই। সে কারণে আফগানিস্তান-ভ্রমণে উৎসাহ জাগে না পর্যটকদের, আফগানিস্তানে বিনিয়োগে বাসনা জাগে না ব্যবসায়ীদের।

তো কেন এটা বিস্মৃতির অতলে তলাবে না? কুখ্যাতি এতদূর গেছে যে, কেউ একজন অচিরেই অভিধানে লিখবেন, আফগানিস্তানকে একটা মাদক উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যার রুক্ষ, উগ্র ও মৌলবাদী জনগণ তাদের নারীদের নিরন্ধ্র বোরকার ভেতরে রাখে।

এত কিছুর পর ধ্বংস হলো এ যাবত জানা বৃহত্তম বুদ্ধমূর্তি যা সম্প্রতি গোটা বিশ্বের সহানুভূতি চাগিয়ে তুলেছে এবং শিল্প-সংস্কৃতির সকল সমর্থকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে বিধ্বস্ত মূর্তিটি রক্ষায়। কিন্তু কেবল জাতিসঙ্ঘের হাইকমিশনার ওগাতা ছাড়া আর কেউই কেন মারাত্মক দুর্ভিক্ষে ধুঁকে ধুঁকে মরা দশ লাখ আফগানের জন্য দুঃখপ্রকাশটুকুও করলেন না। কেন এই মৃত্যুহারের কারণগুলো নিয়ে কেউ কিছু বলে না? বুদ্ধমূর্তি ভাঙায় সবার এত কান্নাকাটি কীসের, যখন ক্ষুধার্ত আফগানদের মৃত্যু ঠেকাতে কিছুই শোনা যাচ্ছে না? আধুনিক দুনিয়ায় কি তবে মানুষের চেয়ে মূর্তি বেশি দরদের?

আমি আফগানিস্তান চষে বেড়িয়েছি এবং দেখেছি সে-জাতির জীবনের বাস্তবতা। চলচ্চিত্রকার হিসাবে আমি ১৩ বছরের ব্যবধানে আফগানিস্তান নিয়ে দুটো ছবি বানিয়েছি (*দ্য সাইক্লিস্ট*, ১৯৮৮ এবং *কান্দাহার*, ২০০১)। এ-কাজে ছবির জন্য তথ্য জোগাড় করতে আমি পড়েছি ১০,০০০ পৃষ্ঠার মতো বিভিন্ন বই এবং দলিলপত্র। আর তাই, আফগানিস্তানের যে-চিত্র আমি জানি, তা বাদবাকি দুনিয়ার জানার চেয়ে আলাদা। এটা আরও জটিল, ভিন্নরকম এবং বিপর্যস্ত এক চিত্র, যদিও তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্টতর। এটা এমন এক চেহারা যা উপেক্ষা আর দমনের চেয়ে দাবি করে মনোযোগ।

কিন্তু কোথায় সাদি, যিনি দেখবেন এই বিপর্যয়; মহাত্মা সাদি, যাঁর কবিতা – 'সকল মানুষ একটি দেহের অঙ্গ' – জাতিসঙ্ঘের প্রবেশদুয়ারে উৎকীর্ণ?

ইরাণী জনগণের মনে আফগানিস্তান

আফগানিস্তান সম্পর্কে ইরাণীদের ধারণা গড়ে উঠেছে ঐ একই জল্পনার ওপর ভিত্তি করে যা প্রচলিত মার্কিনী, ইউরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যীয় লোকদের ভেতর। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, দেখার দূরত্বটা কিছু কম। ইরাণী শ্রমিকেরা, দক্ষিণ তেহরাণের লোকেরা এবং ইরাণী শহরের শ্রমজীবী বাসিন্দারা আফগানদের ভালো চোখে দেখে না, এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করে। শ্রম-মন্ত্রণালয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তারা আফগানদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি তুলেছে। ইরাণী মধ্যবিত্তরা অবশ্য পাহারাদারি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আফগানদের বিশ্বস্ত মনে করে। নির্মাণ-ঠিকাদাররা বিশ্বাস করে, ইরাণীদের চেয়ে আফগান শ্রমিকরা ভালো কাজ করে আর মজুরি চায় কম। মাদকবিরোধী দপ্তরগুলো এদের মাদকদ্রব্য চোরাচালানের চালিকাসূত্র বলে চিহ্নিত করেছে এবং এমন প্রস্তাব রেখেছে যে, চোরাচালানীদের ধ্বংস আর

সমস্ত আফগানদের উচ্ছেদ করতে পারলে চিরদিনের জন্য মাদক-সমস্যার সমাধান সম্ভব। চিকিৎসকরা এদের 'আফগান-ফ্লু' ধরনের কিছু সংক্রামক রোগের কারণ মনে করে, যার অস্তিত্ব ইরাণে ছিল না। তারা এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা আফগানিস্তান থেকেই শুরুর প্রস্তাব করেছে, এবং এটা করতে তারা আফগানিস্তানের জনগণের জন্যও পোলিও-টিকার খরচা বহন করেছে।

আফগানিস্তান সম্বন্ধে দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

একটা দেশের নাম জড়িয়ে সংবাদ-শিরোনামগুলি বরাবরই খুঁতিয়ে দেখা দরকার। মিডিয়া একটা দেশের যে-চেহারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরে তা হলো, দেশটার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য, এবং তার সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের যে মনগড়া ধারণা থাকতে পারে, তার সমন্বয়। যদি একটা জায়গা নিয়ে দুনিয়ার কিছু দেশ লোভাতুর উৎসাহী হয়ে ওঠে, তো নিশ্চিত, তার ভিত্তি সংবাদ-এর মাধ্যমেই তৈরী হয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমার ধারণা আজকের আফগানিস্তানে কেবল পপি-বীজ ছাড়া উৎসাহ জাগানোর মতো আর কিছু নাই। যে-কারণে বিশ্বের সংবাদ-এ আফগানিস্তানের জন্য বরাদ্দ খুব সামান্য অথবা শূন্য, এবং অদূর ভবিষ্যতে এর সমস্যাগুলো সমাধানের সম্ভাবনাও দূর-পরাহত। যদি কুয়েতের মতো আফগানিস্তানের তেল থাকত, এবং থাকত তেল-নির্ভর উদ্বৃত্ত আয়, আফগানিস্তানও তিন দিনের মধ্যে ফেরত নিয়ে নিত মার্কিনীরা আর মার্কিন সৈন্যদের খরচাপাতি আসত সেই উদ্বৃত্ত আয় থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বেঁচে থাকাকালে পূর্ব ব্লকের বিরুদ্ধে যোদ্ধা হিসাবে এবং কমিউনিস্ট অত্যাচারের সাক্ষী হিসাবে আফগানরা পশ্চিমা মিডিয়ার আনুকূল্য পেয়েছে। সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার এবং পরবর্তীতে তার টুকরা টুকরা হওয়ার পর শিক্ষা ও সামাজিক সক্ষমতার সুযোগ-বঞ্চিত এক কোটি মেয়ের জন্য, অথবা অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ যে দারিদ্র ও খাদ্যাভাব তা দূরীকরণে কেন যুক্তরাষ্ট্র – যে মানবাধিকারের দালালি করে – কোনো জরুরী পদক্ষেপ নিচ্ছে না?

উত্তর হলো, আফগানিস্তান তীব্র বাসনা-জাগানো কিছুই নিবেদন করে না। আফগানিস্তান কোনো সুন্দরী মেয়ে না যে তার হাজার প্রেমিকের হৃৎকম্পন বাড়িয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৃদ্ধার সাথেই তার আজ সাদৃশ্য। যে তার কাছে যাবে সে-ই মৃত্যুর মাশুল গুনে বিতাড়িত হবে, এবং আমরা জানি, আমাদের সময় সাদির সময় না যখন 'সকল মানুষ একটি দেহের অঙ্গ' ছিল।

আফগান-বিপর্যয়ের খতিয়ান

গত দুই দশকে আফগানিস্তানের কোনো নিশ্চিত খতিয়ান নাই। তাই সমস্ত তালিকা ও সংখ্যা আপেক্ষিক এবং পুরোপুরি সঠিক নয়। এ সকল তথ্যানুসারে, ১৯৯২ সালে আফগানিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল দুই কোটি। গত ২০ বছরে এবং রুশ-আগ্রাসনের কাল পর্যন্ত যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিকার হয়ে, সামরিক হামলায়, খাদ্যাভাবে এবং বিনাচিকিৎসায় মারা গেছে ২৫ লাখ আফগান।

অন্য কথায়, এই বিপর্যয়ের ফলে প্রতি বছর ১,২৫,০০০ জন, অথবা দিনে ৩৪০ জন, অথবা ঘণ্টায় ১৪ জন কিংবা প্রতি ৫ মিনিটে এক জন খুন হচ্ছে অথবা মারা যাচ্ছে। এটা সেই পৃথিবী যেখানে কয়েকমাস আগে হতভাগ্য রুশ-সাবমেরিণের নাবিকেরা মৃত্যুমুখে পড়েছে আর স্যাটেলাইট-মিডিয়াগুলো সেই দুর্ঘটনার প্রতিটা মিনিট প্রচার করেছে। এটা সেই বিশ্ব যা

অবিরাম প্রচার করেছে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের দৃশ্য।

অথচ গত ২০ বছরে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন আফগানের মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়ে কেউ কিছু বলে নি। আফগান-উদ্বাস্তুর সংখ্যা আরও ভয়াবহ। অপেক্ষাকৃত নির্ভুল পরিসংখ্যান-মতে, আফগানিস্তানের বাইরে ইরাণে ও পাকিস্তানে দেশান্তরী আফগান উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৬৩ লাখ। এই অংককে বছর, দিন, ঘণ্টা এবং মিনিট দিয়ে ভাগ করলে ফল দাঁড়ায়, গত ২০ বছরে প্রতি মিনিটে একজন করে আফগান উদ্বাস্তু হয়েছে। গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচতে যারা উত্তর থেকে দক্ষিণে আর দক্ষিণ থেকে উত্তরে দৌড়ে বেড়ায় তারা এই পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন জাতির কথা মনে করতে পারি না যার জনসমষ্টির ১০ শতাংশ কমেছে মরে, এবং ৩০ শতাংশ কমেছে দেশ থেকে পালিয়ে আর তার পরও যে সহ্য করেছে পৃথিবীর এমন উদাসীনতা। আফগানিস্তানে নিহত ও শরণার্থীদের সমষ্টি ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার সমান, কিন্তু এমন-কি আমাদের, ইরাণীদের, ফিলিস্তিন বা বসনিয়ার জন্য যে-সহানুভূতি দেখা যায় তার ১০ শতাংশও খুঁজে পাওয়া যায় না আফগানিস্তানের বেলায়, আমাদের একটা সাধারণ ভাষা ও সীমানা থাকা সত্ত্বেও।

আফগানিস্তানে ঢোকার পথে দোঘারুণ-সীমান্ত পার হওয়ার সময় একটা সাইনবোর্ড দেখলাম, অদ্ভুতদর্শন-বস্তু সম্পর্কে দর্শনার্থীদের সতর্ক করে দিচ্ছে। ওগুলো মাইন। পড়ে দেখলাম, "আফগানিস্তানে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় সাত জন মাইনের ওপর পা ফেলে। সাবধান, যেন যেকোনো সময় আপনিও তাদের একজন হয়ে না-যান।"

আরও ভয়াবহ তথ্যের মুখে পড়লাম এক রেডক্রস ক্যাম্পে। মাইন অপসারণের জন্য কানাডার যে-দলটি এসেছিল, দুর্দশার ব্যাপকতা বুঝে সব আশা ছেড়ে তারা ফিরে গেছে। এই তথ্যানুসারে আগামী ৫০ বছর আফগানিস্তানের জনগণকে তাদের ভূমি নিরাপদ ও বাসযোগ্য করতে দলে দলে মাইনের ওপর পা রাখতে হবে। কেননা, পরবর্তীতে সংগ্রহের কোনো নকশা বা পরিকল্পনা ছাড়াই প্রতিটা দল বা গোত্র অন্যদের বিরুদ্ধে মাইন পেতেছে। যুদ্ধকালে ব্যবহার ও শান্তির সময়ে পুনঃসংগ্রহের সামরিক কায়দায় মাইনগুলো স্থাপিত হয় নি। তার মানে একটা জাতি মাইন পেতে রেখেছে তার নিজেরই বিরুদ্ধে। এবং যখন খুব বৃষ্টি হয়, জমে-থাকা জলের নিচে ঘাপটি-মেরে-থাকা এই মালগুলো শান্ত, নিরাপদ গ্রামীণ রাস্তাকে ভয়ঙ্কর করে তোলে।

এসব পরিসংখ্যান আফগানিস্তানে বসবাসে ঝুঁকির মাত্রা তুলে ধরে যা তাদের বাধ্য করে নিরন্তর দেশত্যাগে। আফগানরা বোঝে তাদের পরিস্থিতি কত ভয়ঙ্কর। এরপর আছে ক্ষুধা আর মৃত্যুর অবিরত হুমকি। আফগানরা কেন দেশ ছাড়বে না? একটা জাতি, যার উদ্বাস্তুর হার মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ, তো নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে নিরাশ হবেই। থেকে-যাওয়া ৭০ শতাংশের ১০ ভাগ খুন হয়েছে বা মারা গেছে এবং বাকি ৬০ ভাগ সীমান্ত পার হতে পারে নি, কেউ কেউ সীমান্ত পার হলেও প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের ফেরত পাঠিয়েছে।

এই শোচনীয় পরিস্থিতিও আফগানিস্তানে বিদেশীদের অবস্থানের ক্ষেত্রে একটা বাধা। চোরাচালানী ছাড়া অন্য কেউ সেখানে বিনিয়োগের ঝুঁকি নেয় না এবং রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সরাসরি পশ্চিমের দেশগুলোতেই উড়ে যেতে বেশি পছন্দ করে। এর ফলে আফগানিস্তান যে-সমস্যায় জর্জরিত তার সমাধান আরও কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে জাতিসঙ্ঘের বরাদ্দ এবং নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সত্ত্বেও কেবল তিনটি দেশের (সরকারীভাবে) এবং আরও দুটি দেশের (বেসরকারীভাবে) ব্যতিক্রম ছাড়া আফগানিস্তানে আর কোনো রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নাই। আছে কেবল দূর থেকে রাজনৈতিক উস্কানিমূলক মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া।

পৃথিবীর একটা অংশের প্রতি অজ্ঞতা এবং দুর্দশার এমন ব্যাপক সুযোগে পরাক্রান্ত একটা

দেশের সমস্যার দ্ব্যর্থকতার সাথে যোগ হয় এই সব। প্রায় ২০,০০০ পুরুষ, নারী ও শিশুকে আমি হেরাত শহরের এখানে-সেখানে মরতে দেখেছি ক্ষুধায়। হাঁটার সামর্থ্যহীন তারা মাটিতে ছড়িয়েছিটিয়ে অবধারিত মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল। এটা সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের ফল। একই দিনে এই লোকগুলোকে দেখতে জাতিসঙ্ঘের তৎকালীন উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার জাপানের সাদাকো ওগাতো-ও এসেছিলেন। এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, বিশ্ব এদের সাহায্য করবে। তিন মাস পর ইরাণী বেতারে শুনলাম, মাদাম ওগাতা জানিয়েছেন, দেশব্যাপী ক্ষুধায় মরছে এমন আফগানের সংখ্যা ১০ লাখ।

আমি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, বুদ্ধের মূর্তি কেউ ভাঙে নি; এটা ভেঙে পড়েছে লজ্জায়। আফগানিস্তানের প্রতি তাবৎ বিশ্বের অজ্ঞতার লজ্জায়। এর বিশালতা যে কোনোই কল্যাণ করল না এটা জেনে সে ভেঙে পড়েছে।

তাজিকিস্তানের দুশানবে-তে এক দৃশ্য দেখেছিলাম, যেখানে ১,০০০০০ আফগান দক্ষিণ থেকে উত্তরে দৌড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন হাশরের দিন। পৃথিবীর কোথাও কোনো মিডিয়ায় এই চিত্র দেখানো হয় নি। যুদ্ধপীড়িত ও ক্ষুধার্ত শিশুরা খালি পায়ে দৌড়াচ্ছে মাইলের পর মাইল। এর পর সেই একই পালানো-মানুষেরা আক্রান্ত হলো দেশীয় শত্রুদের হাতে এবং তাজিকিস্তানেও তাদের আশ্রয় মিলল না। আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তানের মধ্যবর্ত্তী নো-ম্যান্স্-ল্যাণ্ডে তারা মরল হাজারে হাজারে, এবং আপনি অথবা অন্য কেউ আর তাদের খুঁজে পাবেন না।

বিখ্যাত তাজিক কবি মিসেস গুলরুখ সার ঠিকই লিখেছেন: "অবাক হবার কিছু নাই এই দুনিয়ায় কেউ যদি তত দুঃখে মারা যায়, যে-দুঃখ আফগানিস্তানের। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কেন কেউ মরছে না এত যন্ত্রণায়।"

আফগানিস্তান, আদলহীন এক দেশ

বিভিন্ন কারণে আফগানিস্তান একটা দেশ যার কোনো আদল নাই। আফগান নারীরা আদলহীন, তার মানে দুই কোটি জনসমষ্টির ভেতর এক কোটির প্রকাশিত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। একটা জাতি, যার অর্ধেক এমন-কি তার নারীদের কাছেও অদেখা, তার তো কোনো আদলই নাই। গত কয়েক বছরে কোনো টেলিভিশন সম্প্রচার নাই। শরীয়ত, হিবাদ ও আনিস নামে শুধু খবর সম্বলিত, ছবি ছাড়া কয়েকটা দু'পাতার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সাকুল্যে আফগানিস্তানের গণমাধ্যমের এই হলো চেহারা। ধর্মের অজুহাতে ছবি আঁকা ও ছবি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো সাংবাদিকের আফগানিস্তানে প্রবেশাধিকার নাই, ছবি তোলা তো দূরের কথা।
একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও আফগানিস্তানে কোনো চলচ্চিত্র শিল্প বা থিয়েটার প্রযোজনা নাই। আগে তবু ১৪টা সিনেমা হল ছিল যারা ভারতীয় ছবি দেখাতো এবং চলচ্চিত্র স্টুডিওগুলোরও কিছু প্রযোজনা ছিল ভারতীয় ছবির অনুকরণে, কিন্তু এখন সে-গুলোও উধাও।

চলচ্চিত্র জগতে, যেখানে বছরে হাজার হাজার ছবি তৈরি হয়, আফগানিস্তান থেকে কিছুই আসে না। যা হোক, আফগানিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে হলিউড তৈরি করেছে "র‍্যাম্বো"। গোটা ছবিটা বানানো হয়েছে হলিউডে এবং একজন আফগানও সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পাকিস্তানের পেশোয়ারে র‍্যাম্বোর উপস্থিতি যার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্য, ব্যাক প্রোজেকশন-এর কৌশলকে কৃতজ্ঞতা ! এটা বানানো হয়েছিল কেবল কিছু যুদ্ধদৃশ্য চিত্রায়ণ এবং উত্তেজনা সৃষ্টির স্বার্থে। এটাই কি একটা দেশের হলিউড-নির্মিত চেহারা, যার জনসমষ্টির ১০ শতাংশ খুন হয়েছে এবং ৩০ শতাংশ হয়ে গেছে উদ্বাস্তু, আর যেখানে সম্প্রতি ক্ষুধায় মরছে ১০ লাখ মানুষ?

আফগানিস্তান দখলে নিয়োগকৃত সৈনিকদের স্মরণ করে রুশরা দুটো ছবি বানিয়েছে। রুশ-প্রত্যাহারের পরে মুজাহেদিনরা কিছু ছবি করেছে যেগুলো অপরিহার্যভাবে প্রোপাগাণ্ডামূলক কাহিনীচিত্র, এবং তা আফগানিস্তানের অতীত বা বর্তমান পরিস্থিতির আসল চেহারা না। ছবিগুলো মূলত মরুভূমিতে যুদ্ধকরা অল্প কিছু আফগানের বীরত্বগাথা।

আফগান অভিবাসীদের অবস্থা নিয়ে ইরাণে দুটো ছবি তৈরি হয়েছে, *শুক্রবার* এবং *বৃষ্টি*। আমি দুটো ছবি বানিয়েছি, *দ্য সাইক্লিস্ট* এবং *কান্দাহার*। ইরাণী এবং বিশ্ব মিডিয়ায় আফগানদের চেহারা চিত্রণের এই হলো সার্বিক তালিকা। এমন-কি বিশ্ববিস্তৃত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালাতেও এ-বিষয়ে সীমিত সংখ্যক তথ্যচিত্র পাওয়া যাবে। সম্ভবত এটা এক বহির্দেশীয় এবং আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র অথবা এক মহাজাগতিক অজ্ঞতা যা আফগানিস্তানকে একটা আদলছাড়া দেশ হিসাবে জিইয়ে রেখেছে।

আদলহীন এক দেশের ঐতিহাসিক চেহারা

আফগানিস্তান নজরে আসে যখন এটা ইরাণ থেকে আলাদা হলো। প্রায় ২৫০ বছর আগে এটা ইরাণের একটা প্রদেশ হিসাবে গণ্য হতো এবং নাদির শাহ'র আমলে এটা ছিল বৃহত্তর খোরাসান প্রদেশের অংশ। এক মাঝরাতে, ভারত থেকে ফিরে, ঘুশানে খুন হলেন নাদির শাহ। নাদির শাহ'র সৈন্যবাহিনীর এক আফগান সেনাপতি আহমাদ আবদালি ৪,০০০ সৈন্যসহ পালিয়ে গেলেন। তিনি ইরাণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, এবং এভাবে আফগানিস্তান সৃষ্টি হলো।

সে-সময়ে দেশটা ছিল কৃষক-প্রধান এবং পুরোপুরি গোত্রশাসিত। যেহেতু আহমাদ আবদালি ছিলেন পশতুন গোত্রের, অন্যান্য গোত্র যেমন তাজিক, হাজেরা ও উজবেকদের কাছে তিনি স্বাভাবিকভাবেই একচ্ছত্র শাসক হিসাবে গৃহীত হন নি। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো, প্রত্যেক গোত্র শাসন করবে তাদের নিজেদের গোত্রের নেতৃবৃন্দ। গোত্রপতিরা সবাই মিলে এক যুক্তগোত্রব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন যা "লয়া জিগরা" হিসাবে পরিচিত।

তখন থেকে আজ পর্যন্ত আফগানিস্তানে এর চেয়ে ন্যায্য ও উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা চালু হয় নি। এই লয়া জিগরা ব্যবস্থা দেখায় যে, অর্থনৈতিকভাবে কখনো কৃষিনির্ভর অস্তিত্ব থেকে আফগানিস্তানের কোনো উন্নয়ন ঘটে নি, কেবল তাই না, এটা কখনো গোত্রশাসনের বাইরে যায় নি এবং জাতীয়তার ধারণা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

একজন আফগান নিজেকে আফগান মনে করে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে দেশ ছাড়ছে। তার দিকে তাকানো হয় করুণা করে অথবা তাকে ভোগ করতে হয় চরম অপমান। আফগানিস্তানে প্রত্যেক আফগান একজন পশতুন, হাজেরা, উজবেক, বা তাজিক। ইরাণে, সম্ভবত কুর্দিস্তান প্রদেশ ছাড়া, আমরা সবাই প্রথমত ইরাণী। আমাদের একটা সাধারণ পরিচয়ের যে ধারণা তার প্রথম শর্ত হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। কিন্তু আফগানিস্তানে সবাই প্রাথমিকভাবে একটা গোত্রের সদস্য। গোত্রতন্ত্র তাদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য।

একজন ইরাণী এবং একজন আফগানের চিন্তার ক্ষেত্রে এই সুস্পষ্ট ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এমন-কি ইরাণের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও প্রার্থীর গোত্র-পরিচয়ের কোনো জাতীয় তাৎপর্য থাকে না এবং তা বিশেষ কোনো ভোটও আনে না। আফগানিস্তানে, আহমাদ আবদালির আমল থেকে আজ পর্যন্ত যখন তালিবান দেশের ৯৫ শতাংশ শাসন করছে, বরাবরই প্রধান নেতৃবৃন্দ এসেছেন পশতুন গোত্র থকে। (ব্যতিক্রম কেবল বাশেহ সাঘা নামে পরিচিত হাবিবুল্লাহ গালেহকানি'র নয় মাসের শাসন আর তার পরপরই তাজিক বুরহানউদ্দিন রাব্বানি'র দুই বছরের

শাসনকাল, তাজিকরা আর কখনো ক্ষমতায় যায় নি।) যাহোক, আফগানিস্তানের জনগণ আহমাদ আবদালির আমল থেকে সবসময়ই গোত্রভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থেকেছে।

ইরাণের সাথে তুলনা করলে অবস্থা কী দাঁড়ায়? রেজা শাহ'র রাজত্বকালে গোত্রতন্ত্র দুর্বল হয়েছে এবং তার জায়গা নিয়েছে জাতীয়তাবাদ। কিন্তু আফগানিস্তানে সেটা ঘটে নি। এমন-কি আফগানিস্তানের মুজাহেদিনরা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে কখনো একত্রে লড়ে নি, বরং প্রত্যেক গোত্র তাদের নিজেদের অঞ্চলে যুদ্ধ করেছে।

কান্দাহার তৈরির সময় যখন আমি ইরাণ- ও আফগানিস্তান-সীমান্তের শরণার্থী শিবিরগুলোতে ছিলাম, আমি বুঝেছি যে-আফগান শরণার্থীরা শিবিরের দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে তারাও তাদের আফগান জাতীয় পরিচয় গ্রহণ করে নি। তাজিক, হাজেরা বা পশতুন হওয়ায় সেখানেও তাদের মধ্যে সংঘাত হয়েছে। আফগানদের ভেতর ভিন্ন গোত্রে বিয়ে হয় না, হয় না কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন। এবং সামান্য বিরোধের সূত্র ধরে ব্যাপক রক্তপাতের উপক্রম ঘটে। রুটির লাইনে ঢুকে পড়ার অপরাধে এক গোত্রসদস্যকে আমি খুন হতে দেখেছি ভিন্ন গোত্রের আরেকজনের হাতে।

নিয়াতক শরণার্থী শিবিরে (ইরাণ-আফগানিস্তান সীমান্তে), যেখানে ৫,০০০ উদ্বাস্তুর বাস, পশতুন ও হাজেরা শিশুদের একসাথে খেলাধুলা করা সহজ না। তা কখনো কখনো পারস্পরিক হানাহানিতে রূপ নেয়। তাজিক ও হাজেরারা পশতুনদের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে, এবং পশতুনদেরও একইরকম মতামত। কেউই এমন-কি অন্য গোত্রের মসজিদে নামাজ পড়তেও আগ্রহী না। একটা ছবি দেখাতে বাচ্চাদের একের পর এক বসাতেও আমাদের ঝামেলা হয়েছে। তারা একটা সমাধান দিল, যার ফলে হাজেরা ও পশতুন শিশুরা একসাথে ছবি দেখতে রাজি হলো।

নানান অসুখবিসুখ তো শিবিরে আছেই, এবং কোনো ডাক্তার নাই। শহর থেকে ডাক্তার আনা হলে শিবিরের বাসিন্দারা চরম অসুস্থদের আগে চিকিৎসার সুযোগ দেয় না। কেবল গোত্রীয় নিয়মই গ্রাহ্য। তারা একটা দিন ঠিক করে হাজেরা রোগীদের জন্য, এবং পশতুনদের জন্য আরেক দিন। তদুপরি, পশতুনদের ভেতর শ্রেণীচৈতন্য তাদের সবার একই দিনে ক্লিনিকে আসার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দৃশ্য ধারণের জন্য এক্সট্রাদের দরকার হয়, আমাদের বাছতে হয়েছিল হয় হাজেরা না-হয় পশতুনদের মধ্যে থেকে যদিও তাদের সবাই শরণার্থী এবং উভয়ই একই দুর্দশার শিকার। এখানেও যে-কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গোত্রীয় মতামত প্রথমে আসে। অবশ্যই বেশিরভাগ লোক সিনেমার সাথে পরিচিত না। আমার দাদির মতো, সিনেমা হলে পা না দিয়ে থাকতে পারার জন্য তারা খোদার কাছে শুকরিয়া আদায় করে।

আফগানিস্তানের চিরস্থায়ী গোত্রতন্ত্রের কারণ জড়িয়ে আছে এর অর্থনীতির সাথে। প্রত্যেক আফগান গোত্র ভৌগোলিক দেয়াল ঘেরা এক একটা উপত্যকায় বন্দী এবং এমন এক সংস্কৃতির প্রাকৃতিক কয়েদি যার প্রধান অবলম্বন পাহাড়-সঙ্কুল প্রতিবেশ আর কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। সাংস্কৃতিক গোত্রতন্ত্রের উৎস কৃষিব্যবস্থা যার শিকড় আফগানিস্তানের গভীর উপত্যকায় প্রোথিত। গোত্রতন্ত্রে বিশ্বাস ঐ উপত্যকাগুলোর মতোই গভীর।

আফগানিস্তানের ভূমি-বিবরণ এরকম যে এর ৭৫ শতাংশ ভূখণ্ড পর্বতসঙ্কুল যার মধ্যে কেবল সাত শতাংশ কৃষিকাজের উপযোগী। শিল্পবিকাশের কোনো সম্ভাবনাও এর নাই। দেশটা পুরোপুরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল, আর তৃণভূমিগুলো (বৃষ্টি মৌসুমে) অর্থনৈতিক সচলতার একমাত্র উপায়। কৃষিনির্ভরতা এই গোত্রতন্ত্রের ভিত্তি আবার অন্যদিকে এটাই ভীষণ অন্তর্কলহের

উৎস। এটা যে আফগানিস্তানকে একটা আধুনিক রাষ্ট্র হতে দেয় নি কেবল তাই না, এই ভ্রূণ-জাতির একটা জাতীয় পরিচয় অর্জনের পথেও এটা অন্তরায় হয়েছে।

এমন কোনো সাধারণ জনপ্রিয় বিশ্বাস নাই যেখানে আফগানিস্তান এবং আফগানদের উল্লেখ করা হয়। আফগানিস্তানের জনগণ হিসাবে একটা বৃহত্তর সামষ্টিক পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে আফগানরা এখনো প্রস্তুত না। ধর্মযুদ্ধের অপবাদের বিপরীতে, সংঘাতের উৎস লুকায়িত গোত্রীয় বিরোধে। তাজিকরা আজ যে-তালিবানের সাথে যুদ্ধ করছে তারা মুসলিম এবং সুন্নি। যুক্তগোত্রব্যবস্থার ধারণা জন্ম দেয়ার জন্য আহমাদ আবদালির বুদ্ধিমত্তা এখনো প্রশংসাযোগ্য। তিনি অন্তত তাদের চেয়ে আধুনিক ছিলেন যারা অন্যান্য গোত্রের ওপর একগোত্রীয় শাসনের স্বপ্ন দেখেন অথবা সমস্ত জাতির জন্য একব্যক্তির শাসন কল্পনা করেন– যখন গোত্রতন্ত্র এবং তার অবকাঠামো যথারীতি অবিকৃত।

প্রায় ৬০ লাখ জনসমষ্টি নিয়ে পশতুনরা আফগানিস্তানের বৃহত্তম গোত্র। এরপর তাজিকদের জনসমষ্টি ৪০ লাখ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ হচ্ছে হাজেরা ও উজবেক যাদের জনসংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৪০ লাখ এবং ১০ থেকে ২০ লাখ। বাকী কিছু ক্ষুদ্র গোত্রের মধ্যে আছে ইমাঘ, ফার্স, বেলুচ, তুর্কমান এবং কিজিলবেশ।

পশতুনদের বেশিরভাগের বাস দক্ষিণে, তাজিকদের উত্তরে এবং হাজেরাদের মধ্য অঞ্চলে। ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নিয়ে এই ভৌগোলিক একত্রায়ণের ফলাফল দাঁড়াবে, হয় সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নায়ণ, অথবা গোত্রপতি থেকে লয়া জিগরা পর্যন্ত ধারাবাহিক যোগাযোগ। এই দুই দৃশ্যপটের একমাত্র বিকল্প হিসাবে অত্যাবশ্যক অর্থনৈতিক অবকাঠামোর পরিবর্তন এবং গোত্র-পরিচয়ের বদলে একটা জাতীয় পরিচয়।

আজকে যে আমরা ইরাণে একজন গোত্রপরিচয়-প্রভাব মুক্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারি তার কারণ অন্তত গত শতকে তেল থেকে আগত অর্থনৈতিক রূপান্তর। ইরাণী অর্থনীতিতে তেলের গুণাগুণ বা পরিমাণ কেমন সেটা প্রশ্ন না। বিষয় হচ্ছে, ইরাণের মতো একটা কৃষিনির্ভর দেশের অর্থনীতিতে যখন তেলের আগমন ঘটে, অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে তা বদলে দেয় এবং রাজনৈতিক আদান-প্রদানে ইরাণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা একটা মূল্যবান কাঁচামাল রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে দাঁড়ায় এবং বিনিময়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে পারে।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোকে বদলে দেয় এই রূপান্তর যা পক্ষান্তরে তেল রপ্তানি করে এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর পণ্য ব্যবহার করে পুরনো সংস্কৃতি ভেঙে ফেলে এবং আধুনিকতর সংস্কৃতি গড়ে তোলে। যদি প্রতীকী মাধ্যম হিসাবে টাকাকে মুছে ফেলি, তবে আমরা ভোগ্যপণ্যের বিনিময়ে তেল দিয়েছি। কিন্তু আফগানিস্তানের মাদকদ্রব্য ছাড়া বিশ্ববাজারে বিনিময়যোগ্য কিছু নাই। আর তাই সে নিজের দিকে নিজে পেছন ফিরিয়েছে এবং একা হয়ে গেছে। সম্ভবত ২৫০ বছর আগে আফগানিস্তান যদি ইরাণ থেকে পৃথক না হতো, তেল রাজস্বের অংশীদারিত্বের ওপর ভিত্তি করে এর কপাল হতো ভিন্ন।

আফিমের পরিমাণ, যা আমি পরে বিস্তারিত লিখব, এতই তুচ্ছ যে ইরাণী তেলের সাথে তার কোনও তুলনাই চলে না। ২০০০ সালে অভাবনীয় লাভের ফলে তেল থেকে ইরাণের উদ্বৃত্ত আয় ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আফগানিস্তানে আফিমের মোট বিক্রি থেকে গেছে ৫০ কোটি ডলার। আমরা বিশ্বঅর্থনীতিতে আমাদের ভূমিকা রেখেছি এবং অন্যদের পণ্য ব্যবহার করে আমরা বুঝেছি যে, আমাদের স্বতন্ত্র পছন্দ আছে এবং এভাবে আমরা আরও খানিকটা আধুনিক হয়েছি। কিন্তু আফগানিস্তানের একজন কৃষকের কাছে তার উপত্যাকাই তার দুনিয়া

এবং যখন অনাবৃষ্টি করুণা করে, তার জীবিকা কৃষিকাজ। এর মধ্যে গোত্র ব্যবস্থা তার সামাজিক সমস্যার সমাধান করে। বিশ্বঅর্থনীতিতে সে আর অংশ নিতে পারে না। তার অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক লেনদেনের ভিত্তিভূমি কেমন যে তাকে অংশীদারিত্বে উদ্বুদ্ধ করা হবে? উপরন্তু, আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি কোনও পরিবর্তন ছাড়া টিকিয়ে রাখার ওপর নির্ভর করে আন্ত র্জাতিক মাদক ব্যবসার ৮০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ, কারণ, পরিবর্তন মানেই, প্রথমত সেই ৮০০ কোটি ডলারের হুমকির মুখে পড়া। সুতরাং আফগানিস্তানের পক্ষে সমুচিত কোনো মুনাফা আদায় করা সম্ভব হবে না যদ্দিন না তা নিজেই এসে আফগানিস্তানের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

যদিও মাত্র ২৫০ বছর আগে তেল প্রসঙ্গে ইরাণ ও আফগানিস্তান ছিল একই ইতিহাসের অংশীদার, ইরাণের ইতিহাস যে বাঁক নিয়েছে তা আফগানিস্তানের পক্ষে আরও অনেক অনেক দিন সম্ভব না। দুনিয়াকে দেয়ার মতো আফগানিস্তানের পণ্য কেবল আফিম। তথাপি, এই পণ্যের প্রকৃতির কারণে এবং এই কলঙ্কিত জাতীয় সম্পদের পরিমাণের সামান্যতার জন্যও, তেলের সাথে এর তুলনা চলে না। আমরা যদি উত্তর আফগানিস্তানের জ্বালানী গ্যাস বিক্রির ৩০ কোটি ডলারের সাথে আফিম বিক্রি থেকে আয়কৃত ৫০ কোটি ডলার যোগ করি, এবং সমষ্টিকে মোট জনসংখ্যা ২ কোটি দিয়ে ভাগ করি, ফল দাঁড়াবে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৪০ ডলার। যদি আমরা আবার এই অংকটিকে ৩৬৫ দিন দিয়ে ভাগ করি, একজন আফগানের দিনপ্রতি উপার্জন পাওয়া যাবে ১০ সেন্ট অথবা স্বাভাবিক দিনে একটুকরা রুটির দামের সমান মুদ্রা।

কিন্তু, দেশটির বাৎসরিক আয় চলে যায় সরকার আর দেশীয় মাফিয়ার হাতে এবং তার ন্যায্য বণ্টন হয় না। সুতরাং এই রাজস্ব জনগণের প্রয়োজন মেটাতে যেমন অপ্রতুল, তেমনি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতেও এটা খুবই সামান্য।

জনসমষ্টির ৩০ শতাংশ কেন দেশ ছেড়েছে?

পশুপালকেরা অভ্যাসবশত অন্যত্র যায় তাদের জীবিকার তাগিদে। শহরের বাসিন্দা এবং কৃষিজীবীদের ভেতর বাইরে যেতে কমই আগ্রহী। আফগান পশুপালকদের বিচরণশীলতার প্রধান কারণ কৃষি মৌসুমের সাথে সম্পর্কিত। শুকনো জমি এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া এড়াতে তারা প্রতিনিয়ত সবুজ আর উষ্ণ অঞ্চলের দিকে যায়। পশুপালকের জন্য এই যাতায়াত একটা প্রাকৃতিক চিত্র। দ্বিতীয় কারণ হ'ল নির্দিষ্ট কাজের অভাব। কর্মহীনতার ফলে মৃত্যু এড়াতে আফগানরা দেশ ছাড়ে।

আফগানদের প্রতিদিনের রুজি নির্ভর করে অন্যান্য দেশে কাজ করার ওপর। প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর একজন আফগানকে চারটা প্রধান প্রসঙ্গ বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত তার পশুর পাল, যার নির্বিঘ্ন প্রতিপালন নির্ভর করে অনাবৃষ্টির ওপর। একটি দল বা উপদলের হয়ে যুদ্ধ করা তার দ্বিতীয় বিবেচ্য এবং সাধারণত কাজের অভাবেই সে সেনাবাহিনীতে ঢোকে। নিজের পরিবারকে জীবন ধারণের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করা তার অন্যত্র গমনের আরেকটি কারণ এবং এই সমস্ত কিছুতেই ব্যর্থ হ'লে সে ঢুকে পড়ে মাদক ব্যবসায়।

এই শেষ পন্থাটির বিস্তার সীমিত এবং পপিবীজ উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত ৫০ কোটি ডলার দিয়ে ২ কোটি জনসমষ্টির একটা জাতির শ্রমপ্রয়াসগুলো মাপা যায় না। এভাবে, আফগানিস্তানের জনগণকে আফিম-চোরাচালানী হিসাবে সাব্যস্ত করা ভুল এবং খুব সীমিত সংখ্যার ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য।

রেজা শাহ এবং কামাল আতাতুর্কের সমসাময়িক আমানুল্লাহ খান ১৯১৯-১৯২৮ আফগানিস্তান শাসন করেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আধুনিকতার প্রতি তার ঝোঁক ছিল। ১৯২৪ সালে আমানুল্লাহ ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন, সাথে নিয়ে ফিরলেন একটা রোলস রয়েস এবং তার সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। তিনি তার স্ত্রীকে নেকাব ছাড়তে বললেন এবং আফগান পোশাক ছেড়ে পুরুষদের পড়তে বললেন পশ্চিমা স্যুটকোট। আফগান পুরুষদের প্রথার বিপরীতে তিনি বহুগামিতা নিষিদ্ধ করলেন। ঐতিহ্যবাদীরা সাথে সাথে আমানুল্লাহর আধুনিকীকরণের বিরোধিতা শুরু করলো। কৃষিনির্ভর গোত্রগুলির কেউই এইসব পরিবর্তন মেনে নিল না এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গ'ড়ে উঠল। এখানে পরিষ্কার যে, আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ছাড়া আধুনিকতা কেবল অর্থনৈতিকভাবে কৃষিনির্ভর একটি গোত্র সমাজের ওপর সংস্কৃতির বিসদৃশ আরোপন, যার কোনও শিল্পবাণিজ্য নাই, কৃষি ব্যবস্থা নাই এমনকী প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের প্রাথমিক উপাদানও এর নাই, ভিন্ন গোত্রে বিয়ে যে নিষেধ তা আর না বলি। ঐতিহ্যবাদী আফগান সংস্কৃতিকে উশ্‌কে দেবার ক্ষেত্রে এই উপরিতলের আনুষ্ঠানিক এবং পাতি আধুনিকতা কেবল অ্যান্টিবডির মতো কাজ করেছে, এর প্রতি আফগানিস্তানকে এমন বিমুখ করেছে যে পরবর্তী দশকগুলোতেও আধুনিকতা সংস্কৃতিকে কোনো গ্রহণযোগ্য অবকাঠামোয় ফেলতে পারে নি।

এমন-কি আজও আধুনিকতার পূর্বশর্ত– যার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং পণ্যের বিনিময়ে সস্তা কাঁচামালের সংস্থান– এখনও সৃষ্টি হয় নি। আফগানিস্তানের সবচেয়ে অগ্রসর মানুষেরা মনে করে যে, আফগান সমাজ এখনও নারীদের ভোটাধিকারের জন্য প্রস্তুত না। যখন সমস্ত প্রগতিশীল দল গৃহযুদ্ধে মত্ত তখনও তারা নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় হয় নি বলে বিবেচনা করে; আর এটা তো স্পষ্ট যে বেশির ভাগ রক্ষণশীলেরা মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক কাজকে নিষিদ্ধ করবে। এর মানে স্বাভাবিকভাবে এরকম দাঁড়ায়, ১ কোটি নারী তাদের বোরকার ভেতরে বন্দী।

আমানুল্লাহর আধুনিকতার, যার লক্ষ্য ছিল পুরুষ শাসিত আফগানিস্তানে একগামিতা প্রবর্তন করা, ৭০ বছর পর এই হ'ল আফগান সমাজ পরিবার বিষয়ে যার একমাত্র ধারণা হ'ল সেটা একটা হারেম। ২০০১ সালে, ইরাণ/আফগানিস্তান সীমান্তের শরণার্থী শিবিরগুলোতে পর্যন্ত নারীদের কাছে বহুগামিতা গ্রহণীয় ব্যাপার। পশতুন এবং হাজেরাদের দুটো বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি হাজির ছিলাম এবং বরের যেন আরও ভালো বিয়ে হয় এমন আশা করতে শুনেছি। প্রথমে আমি ঠাট্টা ভেবেছিলাম। আরেক স্থানে কনের আত্মীয়স্বজন বলছিল, "যদি বরের সামর্থ্যে কুলায় তো চারটা পর্যন্ত স্ত্রী সত্যি খুব ভালো এবং এটা একটা ধর্মীয় ঐতিহ্য, পাশাপাশি ক্ষুধার্ত মানুষদের এক মুঠো সাহায্যও করা হল"।

কান্দাহার-এর জন্য বিয়ের গীত ধারণ করতে যখন সাভেহ শিবিরে গেলাম, দেখি এক দুই বছরের মেয়ের সাথে সাত বছরের ছেলের বিয়ে হচ্ছে। আমি কখনোই এর মানে বুঝি নি। ছেলেটা অথবা ছোট্ট মেয়েটা, যে কোলে চড়ে দুধ খাচ্ছে, কেউই তাদের পছন্দ নির্বাচন করে নি। ঐতিহ্যবাদী সমাজের এই চিত্র পেছনে রেখে, আমানুল্লাহর আধুনিকতা ছিল কেবল অন্যদেশের বিপর্যয়কর অনুকরণ।

আবশ্যকীয়ভাবে কিছু লোক বিশ্বাস করে যে, যদি কোনো নারী বোরকা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত কম শ্বাসরুদ্ধকর নেকাব পরে তো তার ওপর আল্লার গজব নামবে এবং সে একটি কালো পাথরে

পরিণত হবে। সম্ভবত কেউ একজন বোরকার থেকে তাকে জোর করে বের করে আনলে সে বুঝতে পারবে, সংস্কারটা অসত্য এবং সে নিজের জন্য পোশাক বেছে নিতে পারবে।

আমানুল্লাহর আধুনিকতার আরো এক-পেশে দৃষ্টিকোণ রয়েছে। ঐতিহ্যবাদী সমাজগুলোতে শ্রেণীবৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রাখার একটা রূপ হলো শঠতার সংস্কৃতি। ইরাণী সমাজে ঐতিহ্যমণ্ডিত ধনী পরিবারগুলো তাদের বাড়ির ভেতরটা সাজায় প্রাসাদের ঢঙে কিন্তু গরীবদের ভয়ে বাড়ির বাইরেটা ক'রে রাখে বস্তির মতো। অন্য কথায় এই অভিজাত নিউক্লিয়াসের একটা গরীব, অসভ্য খোল দরকার।

ঐতিহ্যবাদীরাই যে কেবল সবসময় আধুনিকতার বিরোধিতা করেছে, তা নয়। মাঝে মাঝে এই বিরোধ দেখা দিয়েছে ধনীদের প্রতি গরীবদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। আমানুল্লাহর কালে যখন গরীবদের ক্ষেত্রে খচ্চরের চেয়ে ঘোড়া থাকাটা অধিক সম্মানের এবং সম্ভ্রমের, তখন একটা রোলস রয়েস গরীবদের জন্য তাচ্ছিল্যের। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে যে যুদ্ধ তা প্রাথমিকভাবে রোলস রয়েস এবং খচ্চরের যুদ্ধের সমতুল্য। এই যুদ্ধ সম্পদের সাথে দারিদ্রের। আজকের আফগানিস্তানে একমাত্র আধুনিক বিষয় হচ্ছে হাতিয়ার। দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ একটি রাজনৈতিক/সামরিক পদক্ষেপ হওয়ার পরিবর্তে তৈরি করেছে চাকরির ক্ষেত্র, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রেরও একটা বাজার সৃষ্টি করেছে। সমসাময়িক সময় থেকে অনেক পিছিয়ে থাকলেও আফগানিস্তান আজ আর ছুরি-চাকু দিয়ে যুদ্ধ করতে পারে না। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার একটা মারাত্মক ঘটনা। লম্বা দাড়ি আর বোরকার পাশে স্টিঙ্গার মিজাইল-গুলো এখনও অগাধ আধুনিকতার প্রতীক যা ধ্বংস এবং আধুনিক সংস্কৃতির সমানুপাতিক।

আফগান মুজাহিদের জন্য অস্ত্রের একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে যা কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে। যদি সব অস্ত্রশস্ত্র আফগানিস্তান থেকে তুলে নেয়া হয়, যুদ্ধ থেমে যাবে এবং সবাই মেনে নেবে যে আর কারও ওপর কোনও আক্রমণ হবে না। এই প্রায় শূন্য অর্থনৈতিক অবস্থা ছেড়ে আজকের মুজাহেদিনদের সবাই অন্য দেশে শরণার্থীদের সাথে যোগ দেবে। আফগানিস্তানের ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা, যুদ্ধ এবং শান্তি, গোত্রতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে হবে এর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কর্মসংস্থানের সংকট মাথায় রেখে। এটা বুঝতে হবে যে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক সংকটের আশু কোনও সমাধান নাই।

একটা দীর্ঘমেয়াদী মীমাংসা নির্ভর করে অর্থনৈতিক ভেল্কিবাজির ওপর, দেশ জুড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে সামরিক আক্রমণের ওপর না। এমন ভেল্কিবাজি কি বারেবারেই ঘটে নি? সোভিয়েত প্রত্যাহার কি ভেল্কিবাজি না? মুজাহেদিনদের পক্ষে তাদের সার্বভৌমত্ব কি অলৌকিক ঘটনা না? তালিবানদের হঠাৎ ক্ষমতা দখল কি তাদের প্রেক্ষিতে ভেল্কিবাজি না? তো সমস্যা তবু থাকে কেন? আলোচনা-পর্যালোচনায় দেখা যাবে আধুনিকতা এখানে দুটি মৌলিক সমস্যার মুখে পড়েছে। একটির মূল অর্থনীতিতে প্রোথিত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অপুষ্ট আধুনিকতা থেকে আফগান ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃতির মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার পরিণতি

আয়তনে আফগানিস্তান ৭০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। ভূমির ৭৫ শতাংশ পাহাড়। মানুষ থাকে উঁচু পাহাড়-ঘেরা আবছা উপত্যকায়। উচ্চতার এই অবরোধ কেবল রুক্ষ প্রকৃতি, দুর্গম যাতায়াত এবং ব্যবসাবাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতাই প্রমাণ করে না আফগান গোত্রগুলোর ভেতর সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দুর্গ হিসেবেও এদের দেখা হয়। এটা স্পষ্ট, কেন আফগানিস্তানে আন্তঃপ্রদেশ যোগাযোগ পথের অভাব। রাস্তার এই ঘাটতি যে কেবল সেই যোদ্ধাদের বাধার সৃষ্টি

করে যারা আফগানিস্তান দখল করতে চায় তাই না, যে-ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় হতে পারে তাদেরও দমিয়ে দেয়।

একই মাত্রায় এই পাহাড়গুলো বিদেশীদের অনাহুত প্রবেশ রুখে দেয়, অন্য সংস্কৃতির অবাঞ্ছিত আগমনে এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপেও বাধা তৈরি করে। যে দেশের ৭৫ শতাংশ পাহাড় সেখানে সম্ভাব্য শিল্পনগরীগুলোতে ভোক্তার বাজার সৃষ্টি এবং কৃষিজ সামগ্রী শহরে রপ্তানির সমস্যা অনেক। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের পরও যুদ্ধ দীর্ঘতর হয় এবং শেষ খুঁজে পায় না।

অতীতে কাফেলাগুলোর জন্য আফগানিস্তান ছিল করিডোর; সিল্ক রোড ধ'রে বল্‌খ হ'য়ে চীনে যাওয়া যেত এবং কান্দাহার হ'য়ে ভারত। গত শতাব্দীতে জলপথ এবং আকাশ পথের আবিষ্কার আফগানিস্তানকে একটি প্রাচীন বাণিজ্য পথের বদলে কানাগলিতে পরিণত করেছে। পুরনো সিল্ক রোড ছিল উট আর ঘোড়ার গমনপথ এবং আধুনিক রাস্তার বৈশিষ্ট্য তার ছিল না। এই একই আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ ধরে ভারত গিয়েছেন নাদির শাহ্‌, আলেক্সান্ডার, তিমুর এবং মাহমুদ-শাহ্‌ গজনবি। রাস্তার বন্ধুর অবস্থা ছাড়াও সেখানে ছিল কাঠের আদিম সেতু, গত বিশ বছরের যুদ্ধে যেগুলো মারাত্মকভাবে ধ্বংস হয়েছে।

সম্ভবত আজ, দুই দশকের বহিঃআক্রমণ এবং গৃহযুদ্ধের পর জনগণ চায় এমন একটা শক্তিশালী দল যারা বিজয়ী হবে এবং আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক নিয়তির যা হোক একটা নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দেবে। এই একই পর্বতমালা অন্তরায়ও। সম্ভবত আফগানিস্তানের প্রকৃত যোদ্ধা এর ক্ষুধার্ত জনগণ না, বরং এর উঁচু পর্বতমালা যা আত্মসমর্পণ করে না। আহমাদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বে তাজিকদের প্রতিরোধ টিকে আছে পাঞ্জসির উপত্যকার দয়ায়। ধরা যাক, যদি আফগানিস্তান পর্বতসংকুল না হত, সোভিয়েতেরা সহজেই এটা দখল করতে পারত; অথবা কুয়েতের সমতলের মতো আমেরিকানদের দাবড়ে বেড়ানোর জন্য একে উৎসর্গ করা হ'ত এবং এশিয়ার কেন্দ্রীয় বাজারের কাছাকাছি নিয়ে আসা হ'ত।

পর্বতসংকুল হওয়ায় যুদ্ধ এবং শান্তি-পরবর্তী পুনর্গঠন, উভয়েরই খরচ বাড়ে। যদি আফগানিস্তান এতো উঁচুনিচু না হ'ত এর অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভাগ্য ভিন্ন রকম হ'ত। এটা কি ভৌগোলিক দুর্ভাগ্য? একজন যোদ্ধাকে কল্পনা করুন যাকে ক্রমাগত পাহাড়ে পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে আর নামতে হ'চ্ছে। ধরা যাক, সে সমস্ত আফগানিস্তান দখল করলো। এরপর তাকে ক্রমাগত তার সৈনিকদের সংস্থানের জন্য পাহাড়ের চূড়াগুলো দখল করতে হবে। বাইরের শত্রুর, আর আভ্যন্তরীণ বন্ধুর নাগাল থেকে আফগানিস্তানকে দূরে রাখতে এই পাহাড়গুলো যথেষ্ট।

আপনি যখন সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের দিকে তাকাবেন দেখবেন একটি জাতির প্রতিরোধ কিন্তু যখন অভ্যন্তরে চোখ ফেরাবেন, বুঝতে পারবেন প্রত্যেক গোত্র রক্ষার চেষ্টা করেছে সেই উপত্যকা যেখানে তারা বন্দী। শত্রু চলে গেলে আবার সবাই নিজেদের উপত্যকাকে পৃথিবীর কেন্দ্র হিসাবে দেখে। এবং আবার একই পর্বতমালা কৃষিকাজকে করেছে ভীষণ কঠিন। মাত্র ১৫ শতাংশ জমি কৃষির উপযুক্ত এবং কার্যতঃ তারও অর্ধেক চাষ করা হয়। পশু পালনের কারণও এটা যে তৃণভূমিগুলো পাহাড়ের ধারে অথবা আশপাশে অবস্থিত।

এটা বলা যায়, আফগানিস্তান এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বলি। পাহাড়গুলোর কোনও পথ নাই এবং রাস্তা নির্মাণ ব্যয় সাপেক্ষ। রাস্তা যদি থাকেও তো সেগুলো হয় সামরিক না হয় চোরাচালানীদের চোরাগলি। কেবল ট্রাঙ্ক রোড গেছে সীমান্তের কাছ দিয়ে। সীমান্তবর্তী একটা রাস্তা কেমন করে আফগানিস্তানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগের সমস্যা

সমাধানে প্রধান সড়কের ভূমিকা নেবে? যে সামান্য কটা আন্তঃপ্রদেশ রাস্তা ছিল তাও যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে। কার স্বার্থে এই অনড় উঁচু উঁচু পাহাড় কাটার খরচ জোগানো হবে? কোন্ সম্ভাবনাময় লাভের আশায় এই মাত্রাতিরিক্ত খরচ সরবরাহ করা হবে?

বলা হয়, আফগানিস্তান লুকানো মাইন-এ ভরা। কোন পথে এই সম্ভাব্য সুযোগ বুঝে কাজে লাগানোর জিনিসগুলো তাদের গন্তব্যে পৌঁছাল? কে প্রথম এই মাইন অপসারণে বিনিয়োগ করবে যা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সুফল আনবে? রাস্তার অভাব কি মাইন অপসারণে সোভিয়েত ও আফগানদের যথেষ্ট নিরুৎসাহিত করেছে?

অন্যদিকে, আদিঅন্তহীন লুকানো পথের এক দেশ আফগানিস্তান, যেগুলো মাদক চোরাচালানের জন্য খুবই উপযুক্ত। চোরাচালানের জন্য যতখুশি ঘোরানো-প্যাঁচানো রাস্তা পাবেন কিন্তু চোরাচালানীদের ধ্বংসের জন্য আপনার চাই সোজা রাস্তা যার অস্তিত্ব সেখানে নাই। অগণন পথ আপনি চিনতে পারবেন না এবং একই পথে আপনি প্রতিদিন আক্রমণ করতে পারবেন না। বড়জোড় একটি জংশনে আপনি কোনো কাফেলা থামাতে পারেন। ইরাণের সেমনাম শহরের কাছে এক চোরাচালানীকে ধরা হল সে আফিমের ঝোলা নিয়ে খালি পায়ে কান্দাহার থেকে হেঁটে এসেছিল। ধরাপড়ার সময় তার পায়ের তলায় কোনও চামড়া ছিল না, কিন্তু তখনও সে হাঁটছিল।

আফগানিস্তানের পাহাড়গুলোতে পানি যত না উপকারে আসে তার চেয়ে বেশি আনে দুর্ভোগ। শীতকালে বরফ। বসন্তে বন্যা এবং গ্রীষ্মকালে এর অভাবে সৃষ্টি হয় খরা। পাহাড়গুলোর এটাই সম্পত্তি কিন্তু ধরে রাখার জন্য কোনও সাধ্য নাই। অনিয়ন্ত্রিত জলধারা এবং রুক্ষ মাটি কৃষির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে। এটাই আফগানিস্তানের ভৌগোলিক চিত্রঃ দুর্গম, চাষবাসের অনুপযুক্ত এবং মাইন অপসারণ অসম্ভব কেন না খরচা অনেক। এটা ঠিক যে অনেকে ভৌগোলিক অবস্থান এবং চূড়ান্ত জটিলতার কারণে আফগানিস্তানকে বিভিন্ন গোত্র, প্রজাতি এবং ভাষার এক জাদুঘর মনে করে। বিচ্ছিন্নতা এবং বহিরাগমনের অভাবে দেশটিতে প্রচলিত সমস্ত প্রথা অবিকল থেকে গেছে। এরকম একটা রুক্ষ আর শুষ্ক দেশের পক্ষে, (যার ৭ শতাংশ ভূমি কেবল চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত, তারও আবার অর্ধেক হয় খরায় ক্ষতিগ্রস্ত) এর জনগণকে সাহায্যের জন্য পপিবীজের চাষই একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা। যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে এবং রুটির দাম যদি না বাড়ে, তো এই সমস্ত পপি সম্পদ থেকে প্রত্যেক আফগানের ভাগে জোটে একটুকরা রুটি।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনও উন্নয়ন ছাড়া আফগানিস্তান এর অর্ধেক জনগণকে চালিয়ে নিতে পারে। যদিও সম্পদ দেশীয় মাফিয়াদের দখলে থাকছে অথবা খরচা হচ্ছে বিভিন্ন অস্থায়ী আফগান সরকারের পেছনে এবং জনগণ এর ভাগ পায় না।

এখন যে গোড়ার প্রশ্নটা আসে সেটা হল, আফগান জনগণ কী করে বাঁচে? তারা বাঁচে হয় ইরাণে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক যুদ্ধে অংশ নিয়ে অথবা তালিবান স্কুলে ধর্মতত্ত্বের ছাত্র হিসেবে নাম লিখিয়ে। পরিসংখ্যান মতে, ৩০০ থেকে ১,০০০ ছাত্রধারণ ক্ষমতা নিয়ে ২,৫০০-এর বেশি তালিবান স্কুল ক্ষুধার্ত এতিমদের আকৃষ্ট করে। এই স্কুলগুলোতে যে কেউ একটুকরা রুটি আর একবাটি ঝোল-এর নিশ্চয়তা পেতে পারে, তারা কোরান পড়ে আর সুরা মুখস্ত করে এবং তারপর তালিবান বাহিনীতে যোগ দেয়। কর্মসংস্থানের এটাই একমাত্র বিরাজমান উপায়। এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই দেশান্তর, চোরাচালান এবং পেশা হিসাবে যুদ্ধের চলমানতা এবং আমার বিস্ময় হয়, তালিবানদের ওপর সম্ভাব্য বিজয়ের পর মাসুদ কী ক'রে জনগণের এই চাহিদার মোকাবিলা করবেন? ক্রমাগত যুদ্ধের মাধ্যমে, অথবা

পপি চাষের উন্নয়নে, নাকি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনায়?

ইরাণ সীমান্তে আফগান শরণার্থীদের যারা দেশে ফিরতে চায় তাদের জাতিসঙ্ঘ, মাথাপিছু ২০ ডলার ক'রে দেয়। বাসযোগে তাদের আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় অথবা সীমান্তের কাছে নামিয়ে দেয়া হয়। মজার ব্যাপার হল, কাজের অভাবে এই আফগানরা আবার দ্রুত ফিরে আসে এবং যদি সনাক্ত করা না যায় তো আবার তারা আরও ২০ ডলার নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। জীবিকাহীন এই আফগানরা যে কোনও কিছুর সমাধান খোঁজে একটা কাজের ভেতর। এবং যুদ্ধ যেহেতু বড়জোড় একটা চাকরি, আফগান নেতৃত্বের অল্পই এই যুদ্ধে নিহত হয়।

ক্রমাগত যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত এবং প্রতিবেশী ছয়টি রাষ্ট্রকে তাদের অনুগত বাহিনীকে সাহায্য সরবরাহের সুযোগ করে দেয়। এই উদার দানের উদ্দেশ্য সাধারণত যুদ্ধ অব্যাহত রাখা অথবা শক্তির ভারসাম্য রক্ষা, কিন্তু আফগানিস্তানের জন্য এটা সৃষ্টি করে চাকরির ক্ষেত্র। আমাদের তো ভুললে চলবে না যে দুই বছর ধরে চলছে অনাবৃষ্টি এবং এর ফলে মরে গেছে ব্যাপক পশু সম্পদ। জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত মৃত্যুর হার মতে আগামী কয়েকমাসে এর সংখ্যা দাঁড়াবে দশ লাখ। এখানে যুদ্ধের কিছুই করণীয় নাই। এটা দারিদ্র এবং দুর্ভিক্ষ। পানির অভাবে পশুপালন যখন হুমকির মুখে, দেশান্তর বেড়ে যায় এবং যুদ্ধ আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

একজন আফগানের গড় আয়ু ৪১.৫ বছর এবং দুই বছরের কম বয়সী শিশু-মৃত্যুহার হাজারে ১৮২ থেকে ২০০। ১৯৬০ সালে গড় আয়ু ছিল ৪৩ বছর এবং ২০০০ সালে তা এসে ঠেকেছে ৪১-এ। তো বাস্তবতা হ'ল, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই গড় আয়ু কমে এমনকী ১৯৬০ সালে যা ছিল তারও নিচে নেমে গেছে।

কান্দাহার চিত্রায়ণের রাত্রিগুলো আমি কখনও ভুলতে পারি নি। ফ্লাশলাইট দিয়ে আমাদের দলটি যখন মরুভূমি হাতড়াচ্ছিল, আমরা সেখানে শরণার্থীদের মরতে দেখেছি ভেড়ার পালের মতো। আমরা যখন ওদের জাবল হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, ভেবেছিলাম ওরা কলেরায় মরছে, পরে বুঝলাম মরছে ক্ষুধায়। সেই দিনরাত্রিগুলোতে অত মানুষকে অনাহারে মরতে দেখে, এখনও আমি নিজেকে যে কোনও খাদ্য গ্রহণের জন্য ক্ষমা করতে পারি না। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত আফগানদের প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ ভেড়া ছিল। অর্থাৎ জনপ্রতি একটা ভেড়া। আফগানিস্তানের মতো একটা পশুপালক জাতির জন্য এটা ঐতিহ্যগতভাবে ছিল প্রধান সম্পদ। সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষে এই সম্পদ একেবারেই গেছে। একটি পশুপালক জাতিকে কল্পনা করুন পশুসম্পদছাড়া। আজকের আফগানিস্তানের আসল বিপর্যয় এর দারিদ্র এবং এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।

আসল স্বাধীনতা যোদ্ধা যে-সাধারণ জনগণ বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের বদলে আমি যদি মুজাহেদিনদের সমর্থন করতে যেতাম, আমাকে ফিরে আসতে হ'ত। প্রতিবেশী কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি হ'লে আমি রাজনৈতিক-সামরিক হস্তক্ষেপের বদলে আফগানিস্তানের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরিতে উৎসাহী হতাম। আল্লা মাফ করুন, আমি যদি আল্লাহর স্থানে থাকতাম, আফগানিস্তানকে এমন কিছু দিয়ে অনুগ্রহ করতাম যা এই বিস্মৃত জাতির কাজে লাগে। এবং আমি এটা বিশ্বাস না করেই লিখছি যে এ-লেখা এই সময়ে কোনও কাজে আসবে। যে-সময় সাদি'র সময় থেকে অনেক ভিন্ন যখন, "সমস্ত মানুষ একটি দেহের অঙ্গ।"

বাংলাদেশের ড. কামাল হোসেন, জাতিসঙ্ঘের আফগানিস্তান বিষয়ক মানবাধিকার উপদেষ্টা, আমাদের অফিসে এসেছিলেন ২০০০-এর গ্রীষ্মে। তিনি জানালেন, ১০ বছর ধ'রে জাতিসঙ্ঘের কাছে তিনি স্রেফ নিষ্ফল অভিযোগ ক'রে যাচ্ছেন। তিনি এসেছিলেন আমাকে একটি ছবি বানানোর কথা বলতে যা হয়তো দুনিয়াকে জাগাবে। আমি বললাম, "আমি ওটা

খুঁজছি যা মর্মস্পর্শ করবে।"

এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, আফগানিস্তানের দুর্দশা বিদেশী আগ্রাসনে যত না ঘটেছে তারচেয়ে বেশি ঘটেছে তাদের উদাসীনতায়। আবারও, যদি আফগানিস্তান তেল থেকে উদ্বৃত্ত আয়ের দেশ কুয়েত হ'ত, কাহিনীও ভিন্ন হত। কিন্তু আফগানিস্তানের তেল নাই এবং প্রতিবেশী দেশগুলো এর কমমজুরীর শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেয়। এটাই একমাত্র স্বাভাবিক যখন জীবিকার সব উপায় ব্যর্থ– একটু আগে যেমন বলেছি– বেছে নেয়ার জন্য থাকে কেবল চোরাচালান, তালিবানে যোগ দেয়া অথবা দুনিয়ার অজ্ঞতায় হেরাত, বামিয়ান, কাবুল কিংবা কান্দাহারের আনাচে-কানাচে পড়ে পড়ে মরা।

জাবল-এর কাছে অবৈধ অভিবাসী ভর্তি এক শরণার্থী শিবিরে আমাকে একবার থাকতে হয়েছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম না ওটা শরণার্থী শিবির না জেলখানা। দুর্ভিক্ষে অথবা তালিবান আক্রমণে যে সব আফগান ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তাদের আশ্রয় প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং ফেরত পাঠানোর জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। এরকম ক্ষেত্রে এটা ন্যায্য এবং যৌক্তিক। যে কারণেই হোক একটি দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যাখ্যাত হ'লে বিতাড়িত হয়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট মানুষেরা মরছিল ক্ষুধায়। আমার ছবির জন্য এক্সট্রা বাছা থামিয়ে দিলাম। কর্তৃপক্ষকে জিগ্যেস ক'রে জানা গেল, এত লোককে খেতে দেয়ার সামর্থ্য শিবিরের নাই এবং ওরা এক সপ্তাহ ধরে খায় নি। তাদের খাওয়ার জন্য ছিল কেবল পানি। আমরা কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলাম। তারা প্রার্থনা করল, আমরা যেন সেখানে প্রতিদিন যাই।

এক মাসের বাচ্চা থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ, মোট ৪০০ আফগানের জন্য আমরা খাবার আনালাম। তাদের বেশির ভাগই ছোট ছোট বাচ্চা, ক্ষুধার জ্বালায় মায়ের কোলে বিবশ হয়ে গেছে। এক ঘণ্টা ধরে আমরা কেঁদেছি আর ভাগ করে দিয়েছি রুটি ও ফলফলারি। কর্তৃপক্ষ দুঃখ আর অনুতাপ নিয়ে জানালো, বাজেট বরাদ্দ হয়ে আসতে অনেক সময় লাগে, এবং বলেই চললো, ক্ষুধার্ত শরণার্থীদের স্রোত তাদের সামর্থ্যের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। এই হলো একটা দেশের কথা যাকে নষ্ট করেছে এর নিজেরই প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর নির্দয়তা। এক আফগান কবি, ইরাণ থেকে ফের আফগানিস্তানে বিতাড়িত হওয়ার কালে তার অনুভূতি জানিয়েছিলেন কবিতায় এবং চলে গিয়েছিলেন:

> আমি পায়ে হেঁটে এসেছিলাম, পায়ে হেঁটে চলে যাব
> যে আগন্তুকের কোনও মাটির ব্যাংক নাই, সে চলে যাবে।
> এবং যে শিশুর কোনও পুতুল নাই, সে চলে যাবে।
> আজ রাতে ফুরাবে আমার নির্বাসনের মেয়াদ।
> এবং ভাঁজ করে রাখা হবে শূন্য টেবিল।
> দিগন্তে দিগন্তে আমি ঘুরেছি যন্ত্রণাদগ্ধ।
> আমিই সেই লোক যাকে সবাই ঘুরতে দেখেছে।
> আমার যা নাই আমি তা সৃষ্টি করব এবং চলে যাব।
> আমি এসেছিলাম পায়ে হেঁটে, পায়ে হেঁটেই চলে যাব।

বিশ্বে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ এবং আফগানিস্তানে এর উৎপাদনের অনুপাত

আধুনিক দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি সরবরাহ নির্ভর করে চাহিদার ওপর। সব জায়গাতেই মাদকদ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে ওঠে এর ব্যবহারের দিকে লক্ষ রেখে। এই বিশ্ববাজারের আওতায় অনুন্নত ও উন্নত উভয় দেশই যেমন ভারত, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ২০০০ সালে প্রকাশিত জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী '৯০ দশকের শেষার্ধে

সারা দুনিয়ায় মাদকসেবীর সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। একই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়, ৯০% অবৈধ আফিম উৎপাদিত হয় দুইটি দেশে তাদের একটি আফগানিস্তান, পাশাপাশি এখানে উৎপাদিত হয় ৮০% হেরোইন। আবার সকল নারকোটিক ড্রাগের ৫০% তৈরি হয় আফগানিস্তানে। আপনি ভাবতে পারেন, এই ৫০% যদি দশ কোটি ডলারের অর্ধেকের সমান হয় তবে বিশ্বজুড়ে সমস্ত মাদকের দাম দাঁড়ায় দশ কোটি ডলার। কিন্তু ব্যাপার তা না। কেন?

মাদক উৎপাদন থেকে আফগানিস্তানের উপার্জন পাঁচ কোটি ডলার, কিন্তু এর আসল দাম দাঁড়ায় ৮০০ কোটি ডলার। দুনিয়ার বাকী অংশে পরিবহন ব্যয় সহ এর মূল্য হয়ে যায় ১৬০ গুন। এই ৮০০ কোটি ডলার কে পায়?

যেমন, তাজিকিস্তানে হেরোইন যে দামে ঢোকে বিক্রি হয় তার দ্বিগুন দামে। উজবেকিস্তানেও একই ব্যাপার। একই সময়ে নেদারল্যান্ডের মাদকসেবীরা তা কিনছে মূল দামের ১৬০ থেকে ২০০ গুন বেশি দামে। ডলারগুলো এসে জমে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মাফিয়াদের হাতে যারা ওই দেশগুলোর রাজনীতিতেও বিভিন্ন পথে প্রভাব রাখে।

মধ্য এশিয়ার অনেক দেশের গোপন বাজেট সরবরাহ হয় মাদক চোরাচালানের মাধ্যমে, অন্যদিকে কেমন করে সে-সব চোরাচালানীকে এই সম্পদের প্রধান উপকারভোগী হিসাবে দেখা যাবে যারা কান্দাহার থেকে সমস্তটা পথ পায়ে হেঁটে আসে? কেমন ক'রে তাদের আমরা আসল মাদক চোরাচালানী বলবো?

মাদক ব্যবসা থেকে আসা এই মাত্রাতিরিক্ত মুনাফার ব্যাপারটা যদি না থাকতো, ইরাণ তো সহজেই পপি চাষ বন্ধে উৎসাহিত করার জন্য আফগানিস্তান থেকে পাঁচ কোটি ডলারের গম কিনতে পারে। তারপরও এই ৭৯৫ কোটি ডলারের মুনাফা মাফিয়া আর তার দোসরদের কাছে এত বেশি মূল্যবান যে পপি চাষ ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। মজার ব্যাপার হল, আফগান মাদক উৎপাদনকারী নিজে তা গ্রহণ করে না। মাদক ব্যবহার নিষিদ্ধ কিন্তু এর উৎপাদন বৈধ। ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটাকে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের শত্রুদের কাছে মরণ-বিষ পাঠানো হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই যুক্তি বেশ সুন্দরভাবে কূটাভাষপূর্ণ কেন না আফগানিস্তানের সরকারী বাজেটে মাদকের অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

বিশ্বে মাদক ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৪০০০ কোটি ডলার এবং আফগানরা এই বাজারের বলি। আফগানিস্তানের ভাগ মাত্র ১/৮০০০ অংশ কেন? উত্তর যা-ই হোক, এই বাজারের এমন একটা জায়গা দরকার যেখানে মানবিকতা সামান্যই রক্ষিত হয় কিন্তু যা মাদক উৎপাদনের স্বর্গরাজ্য। যদি আফগানিস্তানে অস্পষ্ট গলির বদলে থাকতো পরিষ্কার রাস্তা, অথবা যুদ্ধ থেমে যেত এবং অর্থনীতি চাঙ্গা হ'ত আর অন্যান্য উদ্যোগ এই পাঁচ কোটি ডলারের স্থানটা দখল ক'রে নিত, তবে এই ৪০০০ কোটি ডলারের বাজারের কী হ'ত?

২০০০-এর সেপ্টেম্বরে যখন আমি কান্দাহার থেকে ফিরছিলাম, তেহরাণের পথে দেখা হ'ল খোরাসানের গভর্ণরের সাথে। তার কথায়, হেরাতে যখন আফিমের দাম ৫০ ডলার, ম্যাসাদে তখন ২৫০ ডলার এবং চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর হ'লে দাম বাড়ার বদলে আফিম আরও সস্তা হয়। যেমন, ম্যাসাদে যদি এর দাম ৫০০ ডলারে ঠেকে, হেরাতে পাওয়া যায় ৭৫ ডলার দিয়ে। এর কারণ নিহিত ভীষণ দারিদ্র আর দুর্ভিক্ষে। আফগানিস্তানের ভেড়া, যার মাথাপিছু দাম ছিল ২০ ডলার, এখন সীমান্তে পাওয়া যাচ্ছে এক ডলারে কিন্তু যেহেতু তারা রোগগ্রস্ত, এর কোনও বাজার নাই এবং সীমান্তে কড়া পাহাড়া যেন ভেড়াগুলো ইরাণে চালান হ'তে না পারে।

যদিও আফগানিস্তানের সম্পদের উৎস হিসাবে তেলের মতো মৌলিক গুরুত্ব পপিবীজের

নাই, কোনও না কোনও ভাবে এটা তেলেরই সমকক্ষ। আরও বেশি গুরুত্ব-সহ মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর গোপন বাজেট বরাদ্দ হয় মাদকদ্রব্য থেকে।

আফগানিস্তানের দূরারোগ্য অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি সারা দুনিয়ার নির্বিকার থাকার জোরালো উৎসাহের কারণ এখানে পরিষ্কার। কেন আফগানিস্তান স্থিতিশীল হবে? সরাসরি এর মাটি থেকে আসা ৮০০ কোটি ডলারের সম্ভাব্য খেসারত সে কেমন করে দেবে?

অনেকের জন্য মাদকব্যবসা আনন্দদায়ক। মাত্র কয়েকমাস আগে আমি আফগানিস্তানে ছিলাম, শোনা যেত, প্রতিদিন এক বিমানভর্তি মাদকদ্রব্য সরাসরি আফগানিস্তান থেকে উড়ে যায় পারস্য উপসাগরের দেশগুলোতে। ১৯৮৬ সালে যখন আমি "দ্য সাইক্লিস্ট" বানানোর জন্য গবেষণা করছিলাম, স্থল পথে গেলাম পাকিস্তানের মিরজাভেহ থেকে কোয়েটা ও পেশোয়ারে। কয়েকদিন লেগেছিল। মিরজাভেহ প্রবেশের পর আমি একটি রঙিন বাসে উঠে বসলাম যেমনটি আপনারা হয়তো "দ্য সাইক্লিস্ট"-এ দেখে থাকবেন। নানা ধরনের অদ্ভুত লোকে বাসটি ভর্তি ছিল। তাদের লম্বা, হাল্কা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি এবং লম্বা আলখাল্লা।

প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি বাসের ছাদ মাদকদ্রব্যে ঠাসা। রাস্তা ছেড়ে বাসটি চলছিল বিস্তীর্ণ খোলাময়দানের মাটি কাদার ওপর দিয়ে। সবখানে ধূলায় পূর্ণ এবং নরম মাটিতে চাকা দেবে যাচ্ছিল। আমরা এসে থামলাম এক পরাবাস্তব ফটকের সামনে, দালির ছবিতে যেমন দেখা যায়। এটা এমন এক ফটক যা কোনও কিছু থেকে না করে পৃথক, না দেয় কিছুর সাথে জোড়া। মরুভূমির মাঝখানে সোজাসুজি স্থাপিত এটা ছিল কেবল এক কল্পিত ফটক। বাসটি ফটকে থামলো। সেখানে তখন একদল মোটর সাইকেলআরোহী এসে আমাদের চালককে নামতে বলল। তারা সামান্য কিছু কথাবার্তার পর এক বস্তা টাকা নিয়ে এলো এবং চালককে সাথে নিয়ে গুনতে লাগল। দু'জন মোটর সাইকেলআরোহী উঠে এসে আমাদের বাসটা দখলে নিল। আমাদের চালক এবং তার সহকারী টাকা নিয়ে মোটর বাইকে চড়ে চলে গেল। নতুন চালক জানিয়ে দিল, এই বাস এবং এর ভেতর যা কিছু আছে তার মালিক এখন সে। তখন আমরা আবিষ্কার করলাম যে বাসের সাথে সাথে আমরাও বিক্রি হয়ে গেছি।

এই হাতবদল কয়েকঘণ্টা পর পর চলতে থাকল এবং আমরা নানারকম চোরাচালানীর কাছে বিক্রি হ'লাম। বুঝতে পারলাম, পথের একেকটি অংশ একটি নির্দিষ্ট দলের নিয়ন্ত্রণে, এবং যতবার বাসটি বিক্রি হল, ততবার এর দাম বাড়লো। প্রথমে ছিল এক বস্তা টাকা, তারপর এটা বেড়ে হল দুই বস্তা এবং শেষ পর্যন্ত তিন বস্তায় গিয়ে ঠেকলো। সেখানে কাফেলাও ছিলো যারা দু'শটা ভারি মেশিনগান তাদের উটের পিঠে বয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি আমাদের বাসটি আর উটের পিঠের অস্ত্রের কথা ভুলে যেতে পারেন, তো আপনি পৌঁছে যাবেন ইতিহাসের আদিম অতলে। এবার আমরা তাদের অস্ত্র বিক্রির জায়গাগুলোতে গেলাম। ঝোলায় ভরে গুলি বিক্রি চলছে যেন ওগুলো সীমের বিচি। দাড়িপাল্লায় কিলোগ্রাম হিসাবে গুলি ওজন হচ্ছে এবং বিক্রি হচ্ছে। তো এমন সুযোগ যদি না থাকে তবে দুনিয়ার মাদকব্যবসা চলবে কী ক'রে?

আমি খোরাসান চলে গেছি এবং সীমান্ত পর্যন্ত চিত্রায়ণের জন্য জায়গা খুঁজেছি। সন্ধ্যার পর সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামগুলো ফাঁকা হয়ে যায়। চোরাচালানীদের ভয়ে গ্রামবাসীরা অন্য শহরে পালিয়ে যায়। আমাদেরও তারা পালাতে বলেছিল। নিরাপত্তাহীনতার গুজব এত বেশি ব্যাপক বিস্তৃত যে সূর্য ডোবার পর খুব কম গাড়িই যাতায়াত করে। রাত্রির অন্ধকারে রাস্তাগুলো তৈরি হয়ে থাকে চোরাচালানের কাফেলা পারাপারের জন্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই কাফেলাগুলো গঠিত হয় পাঁচ থেকে একশ জনকে নিয়ে। তাদের বয়স ১২ থেকে ৩০ এর মধ্যে। প্রত্যেকের পিঠে থাকে একটা করে মাদকের বস্তা এবং কেউ কেউ কাফেলাকে রক্ষার

জন্য বহন করে হাতচালিত রকেট লাঞ্চার এবং কালাশনিকভ। মাদকদ্রব্য যদি বিমানে উড়ে না যায় তবে যায় কন্টেইনার-এ চড়ে এবং তাও যদি না হয় তো তাদের বহন করে মানব খচ্চর। ঘটনার বিশালত্বটা একবার কল্পনা করুন, যখন কাফেলাগুলো একদেশ পার হয়ে আরেক দেশে যাচ্ছে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত, ধরা যাক, তারা আমস্টারডম পৌঁছাচ্ছে। আবার কল্পনা করুন এই ৮০০ কোটি ডলারের ব্যবসা বজায় রাখতে বিভিন্ন এলাকার মানুষদের ভেতর কী ভয় আর আতঙ্কই না তারা সৃষ্টি করে। চোরাচালানীদের হাতে খুনের সঠিক সংখ্যা জানতে চেয়েছিলাম তাইবাদের এক কর্মকর্তার কাছে। জানা গেল গত ২ বছরে ১০৫ জন হয় নিহত হয়েছে অথবা অপহৃত। ৮০ জনের মতো অবশ্য ফিরতে পেরেছে। দ্রুত আমি দুই বছরের ১০৪ সপ্তাহ দিয়ে ১০৫কে ভাগ দিলাম। ফল দাঁড়ায় সপ্তাহে একজন। হিসাব করে দেখলাম, এই সংখ্যা যদি একটা জনপদকে এত অনিরাপদ করে তোলে যে এর অধিবাসীরা নিজের গ্রাম ছেড়ে রাতের আঁধারে অন্য শহরে পালিয়ে যায়, সেখানে আমরা কেমন করে আশা করি, আফগানিস্তানের মানুষ দেশেই থাকবে? গত ২০ বছরে প্রতি পাঁচ মিনিটে তাদের একজন খুন হয়েছে। তবু তারা আফগানিস্তানেই থাকবে, আমাদের দেশে আসবে না? কী করে ভাবি যে আমরা তাদের তাড়িয়ে দিলেই, নিরাপত্তার অভাব আবার তাদের ফিরিয়ে আনবে না?

রাস্তায় অবস্থানরত কর্মকর্তাদের কাছে এই খুন আর অপহরণের কারণ জানতে চাইলাম। স্পষ্ট দেখা যায় ইরাণ সীমান্তে গ্রামবাসীদের সাথে এই কাফেলাগুলোর লেনদেন। যখন কোনও ইরাণী চোরাচালানী সময় মতো টাকা পরিশোধ করতে পারে না, তাকে অথবা তার পরিবারের কোনও সদস্যকে অপহরণ করা হয় এবং টাকা দেয়ার পর তাদের ছাড়া হয়। আবার আমার মনে হয়, এই আগ্রাসনেরও অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। দোঘারুণ সীমান্তের কাছে কাস্টমের দালালরা বলছিল, সে এলাকা গত ৮ বছর ধরে এমন নিরাপত্তাহীনতায় কাল কাটাচ্ছে কিন্তু পত্রিকাগুলো এ-বিষয়ে লিখছে কেবল দু'বছর হ'ল। এর কারণ, অপেক্ষাকৃত এই খোলা মতামতের ঢেউ ইরাণের সংবাদপত্রগুলোর নতুন ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত।

দেশান্তর এবং তার ফলাফল

কেবলমাত্র পশুসম্পদ সাথে নিয়ে মৌসুমী বিচরণ ছাড়া দেশান্তরী আফগান কৃষকরা দুই দশক আগেও কখনও দেশের বাইরে যায় নি। সে কারণে প্রতিটি যাত্রা, এমন-কি খুব সংক্ষিপ্তটিও আফগান জীবনে মারাত্মক দাগ রেখে গেছে। যেমন, আমানুল্লাহ খান এবং একদল ছাত্র পশ্চিমে গেলেন পড়তে। ফিরে এলেন আধুনিকতার সাথে আফগানিস্তানের এক নিষ্ফল পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রদূত হ'য়ে। কিছু কর্মকর্তা রাশিয়ায় গেলেন, পরে এসে কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের বীজ ছড়ালেন। যাহোক সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আফগানিস্তানের জনসমষ্টির ৩০%-এর দেশান্তরী হওয়া অবশ্য বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে না। যুদ্ধ এবং দারিদ্র তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে এবং এখন, এদের বিশাল জনসংখ্যা আশ্রয়দাতাদের পর্যন্ত অতিষ্ট ক'রে তুলেছে। ইরাণে এবং পাকিস্তানে যথাক্রমে ২৫ লাখ এবং ৩০ লাখ আফগানের দেশান্তর উভয় দেশের জন্যই এক গুরুতর সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যখন আমি আফগানদের তাড়ানোয় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের অভিযোগ করলাম যে, তারা তো আমাদের অতিথি, উত্তরে যা শুনতে হল তার মোদ্দা কথা, এই ২০ বছরে যথেষ্ট হয়েছে। যদি এরকমই চলতে থাকে খোরাসানে এবং সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে, তো এলাকাগুলোয় আমাদের জাতীয় পরিচয় হুমকির মুখে পড়বে এবং এমন-কি আমাদের এর চেয়েও মারাত্মক সমস্যা যেমন স্বাধীনতার দাবীর মুখে পড়তে হতে পারে, অথবা এমন-কি সীমান্তের নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়তে পারে।

পাকিস্তান যেমন ইসলামী মুজাহিদদের (তালিবান) প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল খুলেছে ইরাণী সমাজ কিন্তু আফগানদের প্রশিক্ষণের তেমন স্কুল খুলে বসে নি। "দ্য সাইক্লিস্ট" তৈরির সময় আমি পাত্রপাত্রীর খোঁজে আফগান নিকটবর্তী এলাকায় যেতাম। সেসময় এক আফগান কর্মকর্তা বলছিল যে তাদের প্রত্যাশা ইরাণী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন আফগান ছাত্রদের গ্রহণ করে কেননা যদি রাশিয়া আফগানিস্তান ছেড়ে যায় তখন তো তাদের ডিগ্রী পাশ মন্ত্রী/কূটনৈতিক কর্মকর্তা দরকার। তাছাড়া একপাল যোদ্ধা দিয়ে যুদ্ধ চালানো যায়, দেশ চালানো যায় না। তারপর, সামান্য কিছু আফগান ছাত্রকে ইরাণী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পড়ার অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু তাদের কেউই আজ দেশে ফিরতে আগ্রহী না। তাদের যুক্তি হিসাবে তারা নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্ষুধার কথা উল্লেখ করে। তাদের একজন জানাচ্ছে যে, আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ জীবনযাত্রার মান ইরাণের সর্বনিম্ন জীবনযাত্রার মানের চেয়েও নিচে। হেরাতে শুনেছিলাম, হেরাতের গভর্ণরের মাসিক বেতন (২০০০ সালে) ১৫ ডলার। অর্থাৎ দিনে ৫০ সেন্ট বা ৪,০০০ ইরাণী রিয়াল। আফগানদের ব্যাপক দেশান্তরের ফলে ইরাণী চোরাচালানীদের নতুন ব্যবসা শুরু হয়েছে আদম পাচার। যে আফগান পরিবারগুলো সীমান্তে পৌঁছতে পারে, আরো অনেক দূর তাদের যেতে হয় তেহরাণ পৌঁছতে হলে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত পথিমধ্যে কোথাও যেমন জাবল-এ, জাহে-দান-এ, কেরমান-এ অথবা অন্য কোনও শহরে ধরা পড়ছে ততক্ষণ তারা কপাল ছেড়ে দেয় পিকআপ-চালানো চোরাচালানীদের হাতে। চোরাচালানীরা প্রত্যেক উদ্বাস্তুকে তেহরানে টেনে আনতে দাবী করে ১,০০০,০০০ রিয়াল।

যেহেতু ৯৯% ক্ষেত্রে আফগান পরিবারগুলো এত বিরাট অংকের টাকা দিতে পারে না, ১৩-১৪ বছরের একজোড়া বালিকা জিম্মি হিসাবে রাখা হয় আর পরিবারের বাদবাকীদের গলিপথে চালান করে দেয়া হয় তেহরাণে। যতদিন না পরিবারটি কাজ খুঁজে পায় এবং ধার শোধ করে ততদিন মেয়েগুলোকে ধ'রে রাখা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দেনা শোধ হয় না। ১০,০০০,০০০ রিয়ালের দেনা মাথায় নিয়ে ১০ সদস্যের একটা পরিবারকে যথারীতি সুদ গুনতে হয় তিন মাস পর। এর ফলে বিপুল সংখ্যক আফগান বালিকা সীমান্ত এলাকাগুলোতে জিম্মি হয়ে থাকে অথবা চোরাচালানীদের রক্ষিতায় পরিণত হয়। এলাকার এক কর্মকর্তা গোপনে জানালেন সে-অঞ্চলের কেবল একটা শহরেই বালিকা জিম্মির সংখ্যা দাঁড়াবে আনুমানিক ২৪,০০০।

আমার এক বন্ধু তেহরানে বাড়ি বানানোর সুবাদে আফগান শ্রমিকদের সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি লক্ষ করেছেন, একদিন হঠাৎ দু'জন ইরাণী এলো এবং শ্রমিকদের বেশির ভাগ টাকাই নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, তাদের বিনা পয়সায় আনা হয়েছিল এই শর্তে যে তারা পরে চোরাচালানীদের টাকা শোধ দেবে। কিছু টাকা তারা জমাতো, যদি তাড়িয়ে দেয়া হয় তখন আফগানিস্তানে পরিবারের জন্য নিয়ে যাবে এই আশায়। পাকিস্তানের শরণার্থীদের থেকে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন।

ইরাণে যারা আসে তারা হাজেরা। এরা ফার্সীভাষী শিয়া। একই ভাষা এবং ধর্ম তাদের ইরাণে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের দুর্ভাগ্য তাদের স্বতন্ত্র চলাফেরা। মোঙ্গলীয় চেহারার কারণে ইরাণীদের ভেতর থেকে তাদের সহজেই চিনে ফেলা যায়। পাকিস্তানে যাওয়া পশতুনরা একই ভাষা, ধর্ম এবং গোত্রসংস্কৃতির কারণে সহজেই পাকিস্তানীদের সাথে মিশে যায়। যদিও এই শিয়া হাজেরারা ইরাণের চেয়ে পাকিস্তানকে অনেক উদার বলে ভাবে কিন্তু ইরাণে কাজের সুযোগ তাদের কাছে পাকিস্তানের দেয়া স্বাধীনতার চেয়ে বেশি আবেদনময়। এর মানে স্বাধীনতার আগে চাই রুটি। মুক্তি খুঁজতে গেলে প্রথমেই আপনার থাকতে হবে খাদ্য। আজ যে ইরাণীরা

স্বাধীনতা চাচ্ছে তারা কি ক্ষুধার সমস্যা পেরিয়েছে?

ফলশ্রুতিতে উপযুক্ত কোনও কাজ না পেয়ে ক্ষুধার্ত সুন্নি/পশতুন আফগান ছুটে যাচ্ছে ধর্ম তত্ত্বের স্কুলগুলোতে যারা খাবার ও আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। বস্তুত ইরাণ কখনও আফগান শরণার্থী বিষয়ে সংগঠিত উপায়ে কোনও পদক্ষেপ নেয় নি, পক্ষান্তরে পাকিস্তান উস্কানি দিয়ে, সংগঠিত করে তালিবান সরকার সাজিয়েছে বহুবিধ কারণে। প্রথমটা হল দুরান্ত-রেখা।

ভারত থেকে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার আগে, আফগানিস্তান-ভারত সীমান্তের পশতুনেস্তান অঞ্চলে দু'পক্ষের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বৃটিশরা দুরান্ত-রেখা টেনে দু'দেশের মধ্যে অঞ্চলটা ভাগ করে দিলো এই শর্তে যে ১০০ বছর পর আফগানিস্তান আবার ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশতুনেস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে। তারপর যখন পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করল, ভারতের অর্ধেক পশতুনেস্তান হয়ে গেল পাকিস্তানের অর্ধেক। ছয় বছর আগেই আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পাকিস্তান আফগানিস্তানকে পশতুনেস্তান ফিরিয়ে দেয়ার সময় পার হয়েছে। কেমন করে পাকিস্তান, যে এখনও কাশ্মীরকে নিজের বলে দাবী করে, এর সমতলের অর্ধেক আফগানিস্তানকে দেবে?

সবচেয়ে ভালো সমাধান, ক্ষুধার্ত আফগান মুজাহিদদের আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়া। পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত তালিবানরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের পৃষ্টপোষকের কাছ থেকে পশতুনেস্তান ফিরিয়ে নেয়ার উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করবে না। বিস্ময়ের কিছুই নাই তালিবানদের আবির্ভাব হল ঠিক সেই ১০০ বছর সময়সীমা শেষ হওয়ার মুহূর্তেই। দূর থেকে তালিবানদের মনে হবে অবিবেচক আর ভয়ঙ্কর মৌলবাদী। যখন আপনি কাছে যাবেন, দেখবেন ক্ষুধার্ত পশতুন এতিমদের যাদের চাকরি ঐ ধর্মতত্ত্বের ছাত্র হওয়া এবং স্কুলে যোগ দেয়ার প্রধান প্রণোদনা যাদের ক্ষুধা। আপনি যখন তালিবানদের আত্মপ্রকাশ পর্যালোচনা করবেন, দেখতে পাবেন পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক স্বার্থ।

যদি মৌলবাদ গান্ধির গণতান্ত্রিক ভারত থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতার কারণ হয়, সেই কারণ ক্রিয়াশীল এর টিকে থাকায় এবং বিস্তারে যার খেসারত দিচ্ছে আফগানিস্তান। একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙার কাজে বিশ্বে পাকিস্তানের গুরুত্ব ছিল কম্যুনিস্ট পূর্বের বিরুদ্ধে পশ্চিমের প্রথম (প্রতিরক্ষামূলক) শক্ত ঘাঁটি হিসাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর পশ্চিমা গণমাধ্যমে আফগান যোদ্ধা যেমন হারালো তার নায়কোচিত অবস্থান, পাকিস্তানও হারালো তার যুদ্ধনৈতিক গুরুত্ব এবং কর্মহীন হ'য়ে পড়ল।

সমাজতত্ত্বের সূত্র মতে প্রতিটি সংগঠন কিছু কেনে এবং কিছু বিক্রি করে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সেনাবাহিনী নিজের অথবা অন্যদেশের সরকারের কাছে তাদের সামরিক তৎপরতা বিক্রি করে। পশ্চিমের তুলনায় বিশ্বে পাকিস্তানের জাতীয় বৃত্তি কী ছিল? অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সেনাবাহিনী সেজে থাকা কিন্তু ভেতরে ভেতরে পশ্চিমা বিশ্বাস পোষণ করা আর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক তৎপরতা বিক্রি করা। সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পর পাকিস্তানি সামরিক তৎপরতার চাহিদাও পশ্চিমের কাছে ফুরিয়ে গেল।

তখন কোন্ বাজারে পাকিস্তান তার সামরিক তৎপরতা বেচবে এবং এই মূল্যবান জাতীয় বৃত্তি বজায় রাখবে? যে কারণে পাকিস্তান বানালো তালিবান: আফগানিস্তানের ওপর প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং পশতুনেস্তানের অধিকার দাবী থেকে আফগানদের বিরত রাখতে। ঘটনা হচ্ছে, পাকিস্তান সবার আগে যে কর্মসংস্থান সমস্যার মুখোমুখি তার মূল কারণ এখানে প্রোথিত। একজন চলচ্চিত্রকার হিসাবে যদি আমি আমার দেশে ছবি বানাতে না পারি, আমার কাজের জন্য অন্য কোথাও চলে যাব। সেনাবাহিনীরও একই উপায়। বড় কোনও যুদ্ধের সংগতি হিসাবে

একটি জাতির শক্তির প্রচুর সঞ্চয় সরাসরি চলে গেল সেনাবাহিনী বানাতে যা সামরিক তৎপরতা জোগাবে। যুদ্ধ যখন শেষ হয়, এই গোষ্ঠীগুলো অন্য বাজার খোঁজে তাদের তৎপরতা বজায় রাখতে। যদি তারা বাজার খুঁজে না পায়, অবসন্ন হ'য়ে পড়ে এবং হয় অভ্যুত্থান ঘটায় না হ'লে অর্থনৈতিক বুনিয়াদে রূপান্তরিত হয়। পরেরটার উদাহরণ অনেক দেশে পাওয়া যাবে যারা তাদের সামরিক সংগঠনগুলোকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, কৃষিকাজে সাহায্য বা রাস্তা নির্মাণের কাজে লাগিয়েছে।

বৃহত্তর বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে সামরিক সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টির জন্য যুদ্ধ বাধানো হচ্ছে এবং সরকার আদেশ পালন করে যাচ্ছে। দেশান্তর প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। ইরাণের মতো না করে পাকিস্তান আফগান শরণার্থীদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক ছাত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং তালিবান বাহিনী বানিয়েছে।

সোভিয়েত আগ্রাসনের আগে একজন আফগান ছিল কৃষক। সোভিয়েত হামলার পরপর নিজের উপত্যকা বাঁচাতে প্রতিটি আফগান হয়ে উঠলো মুজাহিদ। সংগঠন এবং দল তৈরি হল। সোভিয়েত উৎখাতের পর আফগানরা আর কৃষিকাজে ফিরল না। নতুন পেশা আরও অবেদনময় আর সমৃদ্ধির মনে হল। প্রত্যেক গোত্র বা দল অন্যের সাথে যুদ্ধ বাধালো। প্রতিবেশী ছয়টি দেশ, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া প্রত্যেকেই সামরিক দলগুলোর ভেতরে নিজেদের স্বার্থে ভাড়া করার মতো যোদ্ধা খুঁজলো। ফলে পেশার ক্ষেত্রে এক নতুন ঢেউয়ের উদয় হল। দু'বছরে গৃহযুদ্ধ এত মারাত্মক আকৃতি নিল যে এর ধ্বংসযজ্ঞ দীর্ঘকাল রুশ দখলদারিত্বের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে ছাড়িয়ে গেল। গৃহযুদ্ধে জনগণের জন্য নাভিশ্বাস দশা, এবং যখন পাকিস্তান হাতে সাদা নিশান আর লোকজনকে নিরস্ত্রীকরণ এবং শান্তির আশ্বাসসহ তালিবান বাহিনী পাঠালো, জনগণ তাদের সাদরে গ্রহণ করল। অল্প সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানের বেশিরভাগ অংশ তালিবান দখলে এলো। তখনই তালিবানের পাকিস্তানি শিকড় প্রকাশিত হল।

সবসময়ই মৌলবাদীতার কারণে তালিবানরা সমালোচিত হয়ে আসছে কিন্তু তাদের এহেন আচরণের কারণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে সামান্যই। যদিও হেরাতের যে কবি খালি পায়ে ইরাণ এসেছিল সে খালি পায়েই আফগানিস্তান ফিরে গেছে, কিন্তু পাকিস্তানের পেশোয়ারের দিকে যে এতিম আফগান হাঁটা ধরেছিল সে আরব দেশগুলোর দেয়া টয়োটা চালিয়ে আফগানিস্তানকে উদ্ধার করতে ফিরেছে।

কেমন করে পাকিস্তান, নিজের জনগণের চাহিদা সামলাতেই যার হাঁসফাঁস, তালিবানদের খাদ্য, অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিবে? আরব দেশগুলো যেমন সৌদি আরব অথবা সংযুক্ত আরব আমিরাত এর সাহায্যে– যারা পূর্বে ইরাণের প্রতিযোগী হিসাবে মক্কায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে– ইরাণের প্রতিদ্বন্দ্বী একটা ধর্মীয় শক্তির খোঁজ চলছিল। সৌদি আরব এবং আমিরাত যারা ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণাকে নিজেদের আধুনিক স্বার্থের জন্য হুমকি মনে করত, চিন্তা করল ফিরে যদি যেতেই হয় তবে তালিবানদের মতো আরও পশ্চাদপদ ইসলামেই বা প্রত্যাবর্তন নয় কেন? যদি ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠেই এবং সে-ই বিজয়ী যে সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎগামী, তবে কেন সেই চরম আদিম ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া না, যার নাম তালিবানিজম!

আধুনিক বিশ্বে, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশান্তর একটা ধর্তব্য বিষয়। যেমন তুর্কীরা জার্মানীতে এলো, এবং জার্মানরা যেসব কাজ করত না তুর্কীরা সেগুলোকে পেশা হিসাবে নিল। সন্তান জন্মদানে অনাগ্রহী জার্মানদের বিপরীতে তুর্কিরা সমানে বংশ বাড়াতে থাকলো এবং এখন আশঙ্কা করা হয় যে আগামী কয়েক দশকে জার্মানীর মোট জনসমষ্টির সিংহভাগ দাঁড়াবে তুর্কীজনতা। এই হিসাবে মানলে খুব শীঘ্রই জার্মানী একটা

তুর্কী পরিচয় লাভ করবে এবং ভোটের ভূমিকা বিবেচনায় আনলে আমরা কল্পনা করতে পারি হয়তো ৩০ বছর পর জার্মান চ্যান্সেলার হবে এক তুর্কী। এর মানে তুর্কী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে পাল্টে দেবে জার্মানীর জাতীয় পরিচয়। এটা ইতিহাসের প্রহসন।

একই ঘটনা আমেরিকায় এশীয় এবং আফ্রিকান অভিবাসীদের ক্ষেত্রে। প্রথমে ইউরোপীয় অভিবাসীরা আমেরিকার জাতীয় পরিচয় তৈরি করেছিল। এশীয় এবং আফ্রিকানরা পরে আমেরিকা গেছে বিপ্লবের ফলে অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অর্থনৈতিক অর্জনের আশায়। আমেরিকায় ইউরোপীয় অভিবাসীদের মতো না করে এশীয় এবং আফ্রিকানরা বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে। ধীরে ধীরে এই আধা-ইউরোপীয় আমেরিকান পরিচয় পরিবর্তিত হয়ে হবে এশীয়-আফ্রিকান পরিচয়। ফলে মাথাচাড়া দেবে আন্তঃগোত্র সংঘাত।

আমেরিকান সমাজ যদি আজ ‘সভ্যতাসমূহের সংলাপ’-এর প্যারাডাইমকে স্বাগত জানায় তো সেটার কারণ আগামীর আমেরিকান সমাজে জাতিগত সংঘাত মোকাবিলা করা অন্যদিকে ইরাণীরা মনে করে, আমেরিকান প্রেক্ষিতে এটা সংস্কৃতির লেনদেন-এর কোনও প্রস্তাব না, বরং এই ‘সংলাপ’ তাদের নিজেদের সংস্কৃতিগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

কিন্তু ইরাণী মনীষীরা, যারা অন্য মহাদেশগুলোকে কৌশলগত সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছে, কেন এই আফগান দেশান্তরকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারছে না? কারণ ইরাণীরা পাকিস্তানিদের মতো না যারা আফগানিস্তানকে একটা সুযোগ মনে করে; তারা বরাবরই একে সুযোগের চেয়ে হুমকি হিসাবেই বেশি বিবেচনা করেছে। ইরাণীরা সবসময়ই আফগানদের চোরাচালানী অথবা মৌলবাদী বলে সন্দেহ করে। ইরাণী বিনিয়োগকারীরা কখনোই এই বিপুল সংখ্যক ক্ষুধার্ত আফগান শ্রমিকদের সম্ভাব্য লাভজনক বিষয় বলে মনে করে নি। এমন বিনিয়োগের কথা তারা কখনও ভাবে নি যা আফগানিস্তানকে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর ভোক্তা ক'রে তুলবে, অথবা সস্তা আফগান শ্রম ব্যবহার ক'রে উদ্বৃত্ত পণ্যের সম্ভাব্য রপ্তানির ধান্দাও তাদের নাই।

দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে এর রাজনৈতিক সম্পর্ক উভয়ই আফগানদের দুর্ভাগ্যের কারণ। অনেক বছর অগে স্পেনের একনায়ক ফ্রাঙ্কোকে নিয়ে এক বিশাল প্রশ্ন উঠেছিল। স্পেনের প্রতিবেশী দেশগুলোতে গণতন্ত্র থাকলেও ফ্রাঙ্কো একনায়কতন্ত্র চালিয়ে গেলেন। প্রতিবেশীদের উৎসাহ আর প্রণোদনায় স্পেন পরবর্তীতে আরও গণতান্ত্রিক হল এবং আজকে সে ই.ই.সি-এর অপরিহার্য সদস্য। স্পেনের কপালের অর্থ এরকমই দাঁড়ায় যে প্রতিবেশীরা সহায় হ'লে ভালোভাবে বাঁচা অসম্ভব না। আফগানিস্তান এমন সব প্রতিবেশীদের দিয়ে বেষ্টিত যারা একে হুমকি হিসাবে দেখে অথবা নিজেদের রাজনৈতিক-সামরিক সমস্যাগুলো সমাধানের সুযোগ বলে ভাবে। যদি আফগানিস্তানের আরও গণতান্ত্রিক প্রতিবেশী থাকতো যারা একে একটা অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সুযোগ হিসাবে দেখতো, এর অবস্থা এতদিনে আর একটু ভালো হ'ত। গণতান্ত্রিক ইউরোপীয় দেশগুলোর অনুকূল সান্নিধ্যে ফ্যাসিস্ত স্পেনে গণতন্ত্র এলো অথচ ভাবী প্রগতিবাদী আমানুল্লাহ খানের আফগানিস্তান তালিবানদের দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত হল কেবল এর প্রতিবেশীদের দুর্ভাগ্যজনক ভূমিকার কারণে। একটা আরবীয় প্রবাদ এই পরিস্থিতির যথার্থ বর্ণনা করে: “প্রথমে প্রতিবেশী, তারপর ঘর।”

তালিবান কারা?

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, সরকারের কাছে একটি জাতির নিরাপত্তার দাবী অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়গুলোর চেয়ে বড়। সামাজিক নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং স্বাধীনতা আসে তারপর। সোভিয়েত

উৎখাতের পর ব্যাপক গৃহযুদ্ধ দেশব্যাপী মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করল। এবং দেশটা নিক্ষিপ্ত হল এক ভীষণ বিপজ্জনক ঝামেলায়। প্রতিটা দল ক্রমাগত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজল। জাতীয় নিরাপত্তা দিতে অবশ্য কেউই পারল না। উপহাসের ব্যাপার হ'ল দেশকে অরক্ষিত রেখে সবাই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করল।

নিরস্ত্রীকরণনীতি এবং শান্তির অগ্রদূত পরিচয়দাবীকারী ধার্মিক তালিবানরা দ্রুত জন-সমর্থন আদায়ে সক্ষম হল। অন্যান্য দলগুলোর অসফল উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত ছিলো যুদ্ধে আর নিরাপত্তাহীনতায়। হেরাতের লোকেরা যদিও ফার্সী বলে আর তালিবানরা পশতুন, হেরাতে যখন আমি তালিবানদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছি, দোকানদারদের কাছে শুনেছি তালিবানরা আসার আগে তাদের দোকানপাট প্রতিদিন লুঠ করত অস্ত্রধারীরা এবং ক্ষুধার্ত লোকেরা। এমনকী যারা তালিবানের বিরোধিতা করে তারাও এদের আনা নিরাপত্তায় খুশি।

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটি কারণে। একটা হল জনগণকে নিরস্ত্রীকরণ এবং অপরটি হচ্ছে মারাত্মক শাস্তির বিধান, যেমন চোরদের হাত কেটে নেয়া। এই শাস্তি এত কঠোর, অসহনীয় এবং দ্রুত যে হেরাতের ২০,০০০ ক্ষুধার্ত আফগান যদি তাদের সামনে একটুকরা রুটি প'ড়ে থাকতে দেখে, কেউ সেটা তুলে নেয়ার সাহস করবে না।

দু'বছর ধ'রে আফগানিস্তানে যাচ্ছে-আসছে এমন ট্রাক চালকদের আমি দেখেছি, তারা তাদের বাহনে কখনও তালা লাগায় না। তাদের কাছ থেকে কখনও কিছু চুরি যায় নি। আফগানদের কেবল আর্থিক নিরাপত্তাই দরকার ছিল না, সামাজিক নিরাপত্তা এবং উৎপীড়ণ থেকে মুক্তির বিষয়টা বিবেচ্য ছিল। তালিবানদের আগে অন্যান্য গোত্র এবং দলগুলো কেমন করে মানুষের জীবন এবং সম্ভ্রম নষ্ট করেছে সে বিষয়ে নানা ধরনের গল্প শুনেছি। নিরস্ত্রীকরণ এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যা, যাই হোক, এসব মর্যাদাহানির মাত্রা অনেক কমিয়েছে।

তো, আমাদের সামনে এখন ২ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ যার ৩০% দেশান্তরী, ১০% মরেছে আর বাদবাকী ৬০% না খেয়ে মরছে। জাতিসঙ্ঘের তথ্যানুসারে আগামী কয়েকমাসের মধ্যে ১০ লাখ আফগান মারা যাবে ক্ষুধায়। আজ যখন আপনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করবেন, রাস্তার আনাচে-কানাচে পড়ে থাকতে দেখবেন অনেক মানুষ। কারও নড়াচড়ার শক্তি নাই, নাই যুদ্ধ করার অস্ত্রও। শাস্তির ভয় তাদের অপরাধ করতে দেয় না। সান্ত্বনা কেবল অপেক্ষা করা আর মরা যখন মানবতা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে অবজ্ঞায়। এটা সাদীর সময় না, যখন, "সকল মানুষ একটা দেহের অঙ্গ।"

কেবল একজনের হৃদয় পাথর হয়ে যায় নি, তিনি হলেন বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি। তাঁর সমস্ত মহিমা নিয়ে এই বিপর্যয়ের বিরাটত্বে তিনি লজ্জায় ভেঙে পড়লেন। রুটির অভাবে মরা একটা জাতির সামনে বুদ্ধের ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীনতা আর শান্ততার ভাব লজ্জা পেল এবং তিনি পড়ে গেলেন। এই দারিদ্র, অজ্ঞতা, নিপীড়ণ আর মৃত্যুহারের সবটুকু দুনিয়াকে জানাতে ভেঙে চুরমার হলেন বুদ্ধ। কিন্তু উদাসীন মানবতা কেবল শুনল বুদ্ধমূর্তি বিনাশের শব্দ। এক চীনা প্রবাদ আছে, "চাঁদের দিকে আঙুল তুলে ধরো, বোকা তোমার আঙুলের দিকেই তাকাবে।" বুদ্ধ যে দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই মুমূর্ষু জাতিটাকে কেউ দেখল না। তবে কি আমরা যোগাযোগের নানারকম মাধ্যমগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকব, যোগাযোগের বিষয়গুলো ফেলে রেখে? আফগানিস্তানের মতো একটা দুর্ভাগা দেশের প্রতি দুনিয়ার অবহেলার চেয়ে কি তালিবানদের মূর্খতা ও মৌলবাদ গভীর?

অনাহারক্লিষ্ট আফগানদের ক্যামেরাবন্দী করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধি ড. কামাল হোসেনের সাথে কথা বললাম। উত্তর আফগানিস্তান (আহমাদ শাহ মাসুদ নিয়ন্ত্রিত)

এবং কান্দাহার (তালিবান নিয়ন্ত্রিত) যাওয়ার অনুমতি চাইলাম তার কাছে। সিদ্ধান্ত হল একটা ছোট দল যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের কেবল দুজন (আমার ছেলে ও আমি) শুধু একটা ছোট ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। আমাদের ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল এবং দেওয়া হল জাতিসঙ্ঘের দশআরোহীর একটা ছোট বিমান যা সপ্তাহে একবার যেত উত্তরে একবার দক্ষিণে।

আমাদের যাওয়ার জন্য কোন্ সময়টা সুবিধাজনক সেটা জানাতে জাতিসঙ্ঘ দপ্তর লাগালো দুই সপ্তাহ। আমরা তৈরী ছিলাম কিন্তু তাদের কথায়, এতে আরও একমাস লাগতে পারে। "যেহেতু একমাসে আরও বেশি শীত পড়বে এবং আরও লোক মারা যাবে, সেগুলো আপনার ছবিকে আরও মনোজ্ঞ করে তুলবে," তারা বললেন। উপযুক্ত হিসাবে ফেব্রুয়ারি মাস প্রস্তাব করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আরও মনোজ্ঞ?" তাদের উত্তর ছিল, হয়তো তা দুনিয়ার বিবেককে নাড়া দেবে। কি বলবো বুঝে পাচ্ছিলাম না।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা চুপ মেরে গেলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম এক সাথে উত্তর এবং দক্ষিণে আমরা যেতে পারব কিনা। তালিবানরা রাজি হল না। সাংবাদিকদের তারা খুব একটা দেখতে পারে না। আমি ওয়াদা করলাম কেবল যারা ক্ষুধায় মরছে তাদের ছবিই তুলব। তবু তালিবানরা গললো না। বললাম যে আবার পাকিস্তানে প্রবেশের জন্য আমার আরও একবার জাতিসঙ্ঘের আমন্ত্রণ প্রয়োজন। পরে আমাকে একটা কাগজ ধরিয়ে দেয়া হ'ল তেহরাণের পাকিস্তানি দূতাবাসে যোগাযোগের জন্য। সন্তুষ্টই হলাম কেন না এর অগে *কান্দাহার*-এর পোশাক সজ্জা পেশোয়ার থেকে আনার জন্য পাকিস্তানি দূতাবাসের ভিসা পেয়েছিলাম।

পাকিস্তান দূতাবাসের শরণে গেলাম। প্রথমে তেমন পাত্তা দিল না কেউ। কিছুক্ষণ পর আমাকে ডাকা হল। খুব সম্ভ্রান্ত এক মহিলা এবং এক ভদ্রলোক আমাকে একটা কক্ষ দেখিয়ে দিলো। যে ২০ মিনিট আমি কক্ষটায় ছিলাম তার ১৫ মিনিট তারা আমার সাথে কথা বলল আমার মেয়ে সামিরা এবং সিনেমায় তার আন্তর্জাতিক সাফল্য নিয়ে। মূল বিষয় তারা এড়িয়ে গেল এবং কথার ফাঁকে তারা জিজ্ঞেস করলো কেন আমি ভিসার জন্য জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে আবেদন করেছি এবং এটাও জানালো যে তাদের কাছে সরাসরি গেলেই আমি বরং ভালো করতাম। তাছাড়া তারা এমন ছবি সমর্থন করতে পারে না যা তালিবান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। তারা আমাকে আফগানিস্তানের চেয়ে বরং পাকিস্তানেই যেতে বলল। মনে হল আমি তালিবান দূতাবাসে বসে আছি।

বললাম তারা আমার "দ্য সাইক্লিস্ট" যদি দেখে থাকেন তো দেখবেন সেটার অনেক অংশ পেশোয়ারে চিত্রায়িত এবং এটা কোন রাজনৈতিক ছবি না। এও বললাম যে আমার উদ্দেশ্য মানবিক এবং ক্ষুধার্ত আফগানদের বিশেষ করে আমি সাহায্য করতে চাই। আমার ছবি এই ক্ষুধা আর কর্মহীনতার সমস্যা নিয়েই নির্মিত। উত্তরে তাদের বক্তব্য, ইরাণে যে ২৫ লাখ আফগান আছে তাদের নিয়ে ছবি করছি না কেন? আলোচনা চালানো বৃথা। তারা আমার পাসপোর্ট নিয়ে নিল এবং দয়া করে আসতে বলল। কয়েকদিন পর পাসপোর্ট ফেরত পেলাম সাথে নির্দেশিকা, যদি আমি ট্যুরিস্ট হিসাবে পাকিস্তান যেতে চাই তো ভিসা দেয়া যেতে পারে কিন্তু ছবি বানানো বা আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য না। দূতাবাস থেকে ফেরার সময় এপর্যন্ত তালিবান সম্পর্কে যা শুনেছিলাম এবং পড়েছিলাম সব আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

পেশোয়ারের এক তালিবান স্কুলের কথা মনে পড়ল যেখানে ইরাণী পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আমাকে ঘিরে ফেলা হল। "দ্য সাইক্লিস্ট" তৈরির সময় পেশোয়ারে আরেকদিনের কথা মনে পড়ে, আমাকে গ্রেফতারের পর হাতকড়া পরানো হল। জানি না কেন,

আফগানিস্তান নিয়ে যে ছবিই করতে গেছি শেষ হয়েছে এসে পাকিস্তানে!

সবাই সাবধানে থাকতে বলে। অপহরণ বা সীমান্তসন্ত্রাসের হুমকি বরাবরই থাকে। জাহেদান এবং জাবল এর সংযোগ পথে সন্দেহভাজন প্রতিপক্ষকে খুন করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকতে পারে তালিবানরা। আমি বলি আমার বিষয় রাজনৈতিক না, মানবিক। শেষ পর্যন্ত একদিন ছবির কাজ শেষ করে সীমান্তের কাছাকাছি যখন হাঁটছি দেখি ঘিরে ধরল একদল যারা আমাকে খুন কিংবা অপহরণের জন্য এসেছে। তারা মাখমালবাফের খোঁজ করল। আমার তখন লম্বা, পাতলা দাড়ি আর পরনে আফগান পোশাক। মাসুদি টুপি আর চাদরে আমার অর্ধেক মুখ ঢাকা, বাকী অর্ধেকে আমাকে দেখতে আফগানদের মতো লাগে। তাদের অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। অথচ আমি হিসাব করে পাইনা তাদের কি কোনও রাজনৈতিক গ্রুপ পাঠালো। না টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়ার জন্য পাঠালো চোরাচালানীরা।

নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ফিরে যাই। নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ এবং শাস্তি বিধান যেমন চোরের হাত কেটে নেয়া, ব্যভিচারীকে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং প্রতিপক্ষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তালিবানরা আফগানিস্তানে এক আপাতঃ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। আপনি যদি শরিয়ত রেডিও (ভয়েস অব তালিবান), যা কেবল দিনে দুই ঘণ্টা সম্প্রচারিত হয়, শোনেন তো বুঝবেন যদি কোনও লড়াই হয়েও থাকে, তারা তা প্রচার করবে না তাদের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার মতো কোনও অজুহাতে। যেমন তারা যদি বলে, তাখার-এর জনগণ তালিবানদের স্বাগত জানিয়েছে তো আপনাকে বুঝতে হবে তালিবান বাহিনী তাখার আক্রমণ করেছে এবং দখল করেছে। বাদবাকী সংবাদ শুক্রবারের নামাজ সংক্রান্ত, অথবা বামিয়ানে কোনও বন্দীর হাতকর্তনের বিষয়ে, কান্দাহারে কোনও যুবতী ব্যাভিচারিণীকে না মরা পর্যন্ত পাথর ছুঁড়ে মারা প্রসঙ্গে অথবা কোনও নাপিতের শাস্তির ব্যাপারে যে হয়তো পশ্চিমা ঢঙে কিছু তরুণের চুল কেটে দিয়েছে। তো শাস্তিবিধান অথবা প্রোপাগান্ডা যে কোন কারণেই হোক একটা জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা অন্ততঃ আফগানিস্তানে এখন বিরাজমান।

আফগানিস্তানের সেই অর্থনৈতিক শক্তি নাই যার ফলে তালিবানরা জনগণের কল্যাণে কিছু করতে পারে অথচ তালিবানরাই একমাত্র সরকার, যারা দেশটিতে নিরাপত্তা এনেছে। যারা তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা এর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করছে। এবং যারা এদের সমর্থন করছে তাদের যুক্তি আফগানিস্তান শাসন করবে অবশ্যই আফগানরা। যে-ই শাসন করুক আফগানিস্তান, তাকে অবশ্যই জাতীয় নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। যে কোনও যুদ্ধই নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয় আর আফগানিস্তান যেহেতু গোত্রতন্ত্রের অনুরক্ত, ক্ষমতায় কেউ একজন আসার সাথে সাথে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এটা বরং ভালো, যে-ই আফগানিস্তান শাসন করুক না কেন তাকে প্রথমতঃ দেশটিকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হবে, তারপর অন্যান্য। আফগানিস্তানে মানুষের স্বাধীনতা নাই বলে যারা তালিবানদের সমালোচনা করেন, তাদের মন্তব্য প্রায় অপ্রাসঙ্গিক কেন না একটা নিরাপত্তাহীন, ক্ষুধায় মুমূর্ষু জাতি স্বাধীনতা ও উন্নয়নের আগে চায় নিরাপত্তা আর খাদ্য।

তালিবান কারা এ প্রশ্নের উত্তরে বলতেই হয়, রাজনৈতিকভাবে, পাকিস্তান সমর্থিত সরকারের হাতিয়ার হলো তালিবান। ব্যক্তিগতভাবে তারা পাকিস্তানের জেহাদি জন্মানো স্কুলগুলোর ক্ষুধার্ত তরুণ ছাত্র। প্রথম তারা একটুকরা রুটির জন্য এই সুযোগ নেয় এবং পরবর্তীতে খেপে ওঠে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক-সামরিক অবস্থান তৈরির উদ্দেশ্যে। একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী তালিবানদের এই অঞ্চলে মৌলবাদের হোতা বিবেচনা করে আবার আরেক গোষ্ঠী মনে করে তালিবানরা হল সেই পশতুন যারা আহমাদ আবদালির আমল থেকে

আফগানিস্তান শাসন করে আসছে।

অন্তর্সংঘাতের এক বিরাট যুগ পেরিয়ে আজ আবার তারা তাদের ২৫০ বছরের ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। তারা দাবী করে গত সিকি শতাব্দীতে, তাজিকদের ৯ মাসের শাসনকাল এবং আরেক তাজিক রাব্বানির ২ বছরের শাসনামল ছাড়া পশতুনরাই সবসময় নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং শাসন কাজে তাদের অভিজ্ঞতা আফগানিস্তানের প্রয়োজন।

বিষয়গুলো আমি সামান্যই বুঝি। আমার কাজ ছবি বানানো এবং আমি যে এই ব্যাপার নিয়ে এতো ঘাঁটাঘাঁটি করছি তার কারণ আরেকটু নির্ভুল পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে আমি আমার চিত্রনাট্য লিখতে চাই। তারপরও আমি এগোচ্ছি, জানি পরিস্থিতি আরও জটিল। আমেরিকা যেহেতু দরকার মনে করলো, তিনদিনের মধ্যে ইরাকের কাছ থেকে কুয়েত ফিরিয়ে নিল। আধুনিকতার পক্ষে তার এত দালালির দরদ, কেন সে ১ কোটি নারীকে বাঁচাতে কোনও উদ্যোগ নিচেছ না, যাদের না আছে কোনও শিক্ষার সুযোগ না আছে সামাজিক ভূমিকা এবং যারা বোরকার ফাঁদে বন্দিনী? আধুনিক কালে এই ক্রমচলমান বর্বরতা কেন সে থামাচ্ছে না? তার কি সে ক্ষমতা নাই, না কি নাই সদিচ্ছা? উত্তর ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি।

তেলের মতো লোভনীয় কোনও সম্পদ আফগানিস্তানের নাই এবং কুয়েতের মতো নাই তেল থেকে আসা উদ্বৃত্ত আয়। আরেকটা উত্তরও কানে আসে। আরও কয়েক বছর যদি যুক্তরাষ্ট্র তালিবানদের সমর্থন করে যায় তো প্রাচ্যীয় নৈতিকতার যে চেহরা দুনিয়ার সামনে দাঁড়াবে তাতে সবাই একে প্রত্যাখ্যান করবে যেমন আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আফগানিস্তান। ইসলামের যে বিপ্লব এবং পুনর্গঠনের ধারণা, তার সাথে যদি তালিবানদের আদিম পশ্চাদগামী ধারণাকে মিলিয়ে ফেলা যায় তো পৃথিবী চিরকালের মতো ইসলামের অগ্রযাত্রা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অনেকে এই বিশ্লেষণকে জীর্ণ, অনাধুনিক এবং ক্লিশে মনে করেন। তারা আমাকে এসব চিন্তা বাদ দিতে বলেন এবং আমিও তা-ই করি।

মোল্লা ওমর কে?

কান্দাহারের দিকে আমার আপাত অন্তহীন যাত্রায় সর্বত্র শুনেছি মোল্লা ওমরের কথা। তার খেতাব আমির-উল-মুমেমিন (বিশ্বাসীদের নেতা)। কিছু ইরাণী রাজনীতিক বিশ্বাস করে ইরাণী সরকারের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কেউই তার অতীতজীবন সম্বন্ধে সত্যিই তেমন কিছু জানে না। কেউ বলে তার বয়স ৪০ আর এক চোখ অন্ধ কিন্তু তার কোনও ছবি নাই যার ফলে এ তথ্যকে সত্য অথবা মিথ্যা বলা যাবে। কেমন করে একটা জাতি একচোখ অন্ধ এক লোকের হাতে রাতারাতি তাদের নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়, যার কোনও ছবি পর্যন্ত দেখা যায় নি? মোল্লা ওমরকে নিয়ে আমি ছবি বানাতে প্রলুব্ধ ছিলাম। রাজনৈতিক কারণে এড়িয়ে গেছি কিন্তু আমার আগ্রহ মেটে নি। পাকিস্তান যদি যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের জনগণের জন্য নিরস্ত্রীকরণের নামে নির্ভুল নাটক বানিয়েও থাকে যা সাদরে গৃহীত হয়েছে তবে তারা কোন্ বিচারে মোল্লা ওমর নামের এক নেতার পরিকল্পনা করল যার কোনও পূর্ব পরিচয় নাই? একজন যে কেউ না অথবা কারও চোখেও পড়ে নি, নেতা হয়ে গেল একটি দেশের যেখানে প্রতিটি গোত্র বা উপগোত্রের নিজেদের নেতা বিদ্যমান। সম্ভবত এখানেই রহস্য লুকায়িত। যদি চেনাজানা কাউকে আফগানিস্তানের নেতা বানানো হত, তখন প্রত্যেকেই তার বিরোধিতার অজুহাত খুঁজে পেত।

সীমান্তের কাছে চায়ের দোকান সম্পর্কে একটা কৌতুক শুনেছি:

চায়ের দোকানটিতে নিয়মিত আফগান খরিদ্দাররা আসে। সেখানে একটা টেলিভিশন ছিল কাঁচ মোছার কলকব্জা লাগানো, যাতে প্রয়োজনে মালিক সামান্য পানি ছিটিয়ে যে কোন দাগ মুছতে পারে। এরকম ব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায় দোকান মালিক জানাল, যখনই সীমান্ত এলাকার মুজাহেদিনদের সম্বন্ধে অনুষ্ঠান থাকে, তাদের প্রতিপক্ষরা টিভি পর্দায় থু থু ছোঁড়ে, আর যেহেতু খরিদ্দাররা নস্যি ব্যবহার করে তাই তাদের থু থু বর্ণিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিভি পর্দা অকেজো হয়ে যায় তাই সে এই পন্থা আবিষ্কার করেছে।

আফগান নেতৃবৃন্দের চেহারা যখন এত গভীরভাবে সমালোচিত এবং উপহাস্য, যদিও আফগানিস্তান শাসনের জন্য তাদের দরকার, সবচেয়ে ভালো উপায়, চেহারাহীন এক নেতৃত্বের নকশা করা যা তার বর্তমান বা পূর্বাবস্থার জন্য সমালোচিত হবে না, এবং যা সীমান্তঘেঁষা এলাকায় টেলিভিশনগুলোকে থু থু মুক্ত রাখতে পারবে।

আমি যদি বুদ্ধের লজ্জায় লজ্জিত না হতাম, এই রচনার নাম দিতাম "আফগানিস্তান, চেহারা ছাড়া এক দেশ।" মোল্লা ওমর সম্পর্কে যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি, বলেছে সে দুনিয়াতে আল্লার প্রতিনিধি যে মানুষের আইনের বদলে দেশের সংবিধান হিসাবে এনেছে কোরান। তার অনুসারীদের মতো সেও চূড়ান্ত ধার্মিক। তার বেতন হেরাতের গভর্ণরের বেতনের মতোই তুচ্ছ, মাসে ১৫ ডলার এবং তার জীবনযাপন সেই গরীবদের মতো যারা রাস্তায় রাস্তায় মরছে।

আমার মনে হয় চেহারাহীন এই মানুষটির চেহারাই সম্পূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য কেন না প্রাচ্যে কেউ তাদের নেতাদের খুব অত্যাধুনিক এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে দেখতে চায় না অথবা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কাউকেও চায় না। যদি কেবল নেতৃবৃন্দ কিছুটা সাধারণ মানুষের মতো হয়, জনগণের সন্তুষ্টির জন্য সেটাই যথেষ্ট। এক আফগান এমন ধারণা জানালো যে যদি সে না খেতে পায় তবু সে সুখী কেন না মোল্লা ওমরও সবসময় রোজা রাখেন অর্থাৎ তারা একে অন্যের মতো। এমন নেতার জন্য সে খোদাকে ধন্যবাদ জানালো।

হেরাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক ছাত্রের সাথে কথা বলছিলাম। আমার সাথে কথা বলা কেউ দেখে ফেলতে পারে বলে সে ইতস্ততঃ করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করি আফগানিস্তানে মোট কলেজ ছাত্রের সংখ্যা সে জানে কি না। হাঁটতে হাঁটতে এবং সরাসরি সামনে তাকিয়ে সে বলল, "এক হাজার"? "বেশি কিসে?" জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, "কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং কারিগরিবিদ্যায়।" "তুমি কী পড়ছো?" আমি জিজ্ঞাসা করি এবং সে উত্তর করে, "তত্ত্বীয় চিকিৎসা বিদ্যা।" আমি বললাম, এর মানে কী এবং তার উত্তর, মোল্লা ওমর মনে করেন মানুষ কাটাছেঁড়া পাপ। মোল্লা ওমরের ছবি দেখেছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, দেখে নি, এবং চলে গেল।

পশতুভাষী শরণার্থীদের মধ্যে আমি গিয়েছিলাম তারাও কেউ মোল্লা ওমরকে দেখে নি কিন্তু যারা দেখেছে তাদের তারা চেনে। আমি এমনকি ইরাণী রাজনৈতিকদের সাথে দেখা করেছি যারা সত্যিই মোল্লা ওমরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তারা তাকে সুদর্শনও মনে করে। আফগানদের একটা দল, যারা রাত্রে ইরাণে ঘুমায় আর দিন হলে আফগানিস্তান যায় মজুর খাটতে তারাও মোল্লা ওমরের গুণমুগ্ধ। তাদের কথায় সে একজন সাধারণ ধার্মিক এক রাতে যে নবী মোহাম্মদকে স্বপ্নে দেখেছিল এবং নবী তাকে আফগানিস্তান রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। যেহেতু আল্লা তার সাথে ছিলেন, এক মাসের মধ্যে আফগানিস্তান দখলে আনা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা

ধারণা করা হয় ১৮০টার মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা আফগানিস্তানে কাজ করছে। তারাও আমার অরাজনৈতিক প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যান। শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছি তারা খুব সামান্য কয়েকটি কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রথম কাজ ক্ষুধার্তদের মধ্যে রুটি বিতরণ, দ্বিতীয়টি উত্তর-দক্ষিণ বন্দী বিনিময়ের সংগ্রাম এবং তৃতীয়টি হ'ল ভূমিমাইনের শিকারদের জন্য কৃত্রিম হাত-পা বানানো। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তাৎপর্যহীন ভূমিকার কথা ভুলে আমি মুগ্ধ হয়েছি সে-সব তরুণদের দেখে যারা রেডক্রসের মাধ্যমে এখানে এসেছে। ১৯ বছরের এক বৃটিশ তরুণীর সাথে দেখা হল যার কথায় তার আসার কারণ "কোনও কাজে লাগা।" এটা আফগানিস্তান যেখানে সে প্রতিদিন মানুষের জন্য নানারকম কৃত্রিম হাত-পা বানাতে পারে। তার মতে ইংল্যান্ডে সে এমন কাজ পাবে না যা তাকে এমন তৃপ্তি দেবে। তার আসার পর থেকে কয়েকশ' মানুষ তার বানানো কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের সাহায্যে হাঁটতে সমর্থ হয়েছে।

আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা একটা বাঁধা ধরা পথে এই জাতির গভীর এবং বিস্মৃত জখমগুলোতে কেবল হাত বুলানো, তার বেশি না। ড. কামাল হোসেন, যিনি সম্ভবত পাকিস্তানে ভিসা বিষয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন, আমাকে আর ডাকেন নি।

তার কথাগুলো মনে পড়ে, যেদিন তিনি আমাদের অফিসে এসে জানালেন কেমন লাগছে তার কাজ এবং সমস্ত উদ্যোগ কেমন বিফলে যাচ্ছে এবং তিনি আমার সহকারী হতে চান। এবং এমনকি আজ যখন *কান্দাহার* বানানো শেষ, আমার পেশাকে মনে হয় নিষ্ফল। আমি বিশ্বাস করি না যে একটা রিপোর্ট ঠুকে জ্বালানো জ্ঞানের সামান্য শিখা অথবা একটা ছবি মানুষের এই সাগর-সমান অজ্ঞতায় কোনও ভূমিকা রাখতে পারবে। এবং আমি বিশ্বাস করি না একটা দেশ, যার জনগণ আগামী ৫০ বছরে তাদের হাত-পা হারাবে ভূমি-মাইনের বিস্ফোরণে, রক্ষা পাবে ১৯ বছরের এক বৃটিশ তরুণীর চেষ্টায়। কেন সে আফগানিস্তানে যায়? কেন ড. কামাল হোসেন, তার সমস্ত নিরাশা নিয়ে এখনও জাতিসঙ্ঘে রিপোর্ট করে যাচ্ছেন। কেন আমি ছবি বানাই অথবা লিখি এই সব? আমি জানি না, কিন্তু প্যাসকাল যেমন লিখেছেন: "হৃদয়ের যুক্তি থাকে চেতনা তা জানতে পারে না।"

আফগান নারী, পৃথিবীর সবচেয়ে অবরুদ্ধ নারী

আফগান সমাজ পুরুষশাসিত। এমনকি এটাই বলা যায় যে, এক কোটি আফগান নারীর, যারা আফগানিস্তানের জনসমষ্টির অর্ধেক, সামাজিক অধিকার দুর্বলতম অজানা গোত্রটির অধিকারের চেয়েও কম। এক্ষেত্রে কোনও গোত্রের ব্যতিক্রম নাই। এমনকি তাজিকরাও আফগান নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকার করে না, অর্থাৎ এ-বিষয়ে সবাই এক।

তালিবান আসার পর পর মেয়েদের স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেল এবং অনেক দিন মেয়েদের রাস্তায় বের হওয়া নিষেধ ছিল। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হল, এমনকি তালিবান আসার আগেও প্রতি ২০ জন নারীর একজন লিখতে ও পড়তে পারত। এই পরিসংখ্যানে বোঝা যাচ্ছে কার্যতঃ আফগান সংস্কৃতিই ৯৫% নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আর বাকী ৫% করেছে তালিবানরা। তো আরও বাস্তবানুগ ধারণা নিয়ে কেন জিজ্ঞাসা করা যাবে না, তালিবান কর্তৃক আফগান সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নাকি এই সংস্কৃতিই তালিবান উত্থানের কারণ?

যখন আফগানিস্তানে ছিলাম, বোরকাপরা মেয়েদের দেখেছি রাস্তায় ভিক্ষা করছে অথবা

পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে কিছু কিনছে। যা আমাকে আকৃষ্ট করল সেটা হচ্ছে, মহিলারা বোরকা থেকে হাত বের করে ফেরিওয়ালা বালকের দিকে মেলে ধরছে নখ রাঙানোর জন্য। অনেকক্ষণ ধরে আমি ভাবলাম বাড়িতে ব্যবহারের জন্য তারা নেইল পালিশ কেনে না কেন? পরে বুঝলাম এটাই সস্তা উপায়। একবার নখ রাঙ্গানোর চেয়ে নেইল পালিশ কেনা বেশি খরচার। আমি নিজেকেই বললাম, এটা শুভ লক্ষণ যে বোরকার ভেতরও মেয়েরা বাঁচতে চাচ্ছে এবং এই অভাবের ভেতরও তারা যতদূর পারে নিজেদের সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল রাখছে। যাহোক, পরে আমার এই সিদ্ধান্তই নিতে হয়েছে যে, কোনও নির্দিষ্ট পরিবেশে অথবা পোশাকে মেয়েদের বিচ্ছিন্ন এবং বন্দী করে রাখা কোনও কাজের কাজ না, বরং আশার ব্যাপার হল তারা এখনও প্রসাধন করে।

সতীনদের সাথে প্রতিযোগিতায় সে যেন পিছিয়ে না পড়ে সে-জন্যও নিজেকে যত্নে রাখতে হয় আফগান মাহিলাদের। তরুণদের মধ্যেও বহুগামিতা সাধারণ ব্যাপার এবং অনেক আফগান বাড়ি মূলত হারেম। তারপর বিয়ের খরচা এত বেশি যে বিয়ে করা মানে একটা মেয়ে কেনা, ছবি বানানোর সময় আমি দেখেছি বুড়ো লোকেরা ১০ বছরের বালিকাকে বিয়ে দিচ্ছে এবং সেখান থেকে যে টাকাটা পাচ্ছে তা দিয়ে নিজেদের জন্য বিয়ে করে আনছে আরেকটা ১০ বছরের বালিকা। তার মানে, এই বালিকাদের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি স্থানান্তর করতে একটা সীমিত পুঁজি এক হাতে থেকে অন্য হাতে ঘুরছে। এদের মধ্যে এমন মহিলা অনেক, স্বামীর সাথে যাদের বয়সের ব্যবধান ৩০ থেকে ৫০ বছর।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই মহিলারা এক বাড়িতে থাকে অথবা এমনকি একটি ঘরে এবং তারা যে কেবল আত্মনিবেদন করেছে তাই না, এই নিয়ম তারা মেনেও নিয়েছে। আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে ছবির জন্য প্রচুর পোশাক আর বোরকা এনেছিলাম। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছবিতে এক্সট্রা হিসাবে কাজ করতে যে মহিলাদের রাজী করানো হয়েছিল তাদের অনেকে টাকার বদলে বোরকার জন্য অনুরোধ করতো। তাদের মধ্যে একজন তার মেয়ের বিয়ের জন্য বোরকা চাইল এবং আমি, ইরাণে যদি বোরকা জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে এই ভয়ে তাদের কাউকেই বোরকা দিলাম না।

একবার আমরা যখন কিছু আফগান মহিলাকে ছবিতে অংশ নেয়ার প্রস্তাব করলাম, তার স্বামী জানালো সে এত ধার্মিক যে তার মহিলাকে অন্য কেউ দেখতে পাবে না। আমি বললাম যে, আমরা তো বোরকা ঢাকা অবস্থায় ছবি নেব, কিন্তু তার উত্তর: দর্শকরা যখন ছবিটা দেখবে, সে তো জানবে যে বোরকার নিচে কোনও মেয়েলোক আছে এবং সেটাই তার ধর্ম নষ্ট করবে।

বারবার আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, তালিবানরা বোরকা আনল, না বোরকা আনলো তালিবানদের? সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে রাজনীতি ক্রিয়াশীল, নাকি সংস্কৃতিই টেনে আনে রাজনীতি?

ইরাণের নিয়াতাক শরণার্থী শিবিরে আফগানরা নিজেরাই গণগোসলখানা বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ দেয়ালের ওপাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ তো ঠিকই জানবে যে ওপারে বিনা কাপড়ে গোসল করছে বিপরীত লিঙ্গের কেউ, এতেও পাপ হবে।

বর্তমানে কোনও মহিলা চিকিৎসক আফগানিস্তানে নাই এবং কোনও মহিলা যদি ডাক্তার দেখাতে চায় তাকে সঙ্গে করে আনতে হবে ছেলে, স্বামী অথবা বাবা এবং তাদের মাধ্যমে কথা বলতে হবে ডাক্তারের সাথে। বিয়ের ক্ষেত্রেও, কনে নয়, তার ভাই অথবা বাবা 'কবুল' বলে।

ফ্রয়েডের মতে মানুষের অত্যাচার প্রবণতা আসে পশুপ্রবৃত্তি থেকে এবং সভ্যতার ধারণা এই পশুপ্রবৃত্তিকে একটা পাতলা প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখে। এই সূক্ষ্ম ত্বক ছিঁড়ে যায় নখের আঁচড়ে। পূর্ব পশ্চিম উভয় অংশেই হিংস্রতা বিরাজমান, পার্থক্য কেবল সংঘটিত হওয়ার ধরনে, তাদের বাস্তব অস্তিত্বের প্রশ্নে না। ছুরি, ভোজালি বা তরবারি দিয়ে শিরশ্ছেদের ফলে মৃত্যু আর গুলি, গ্রেনেড, মাইন ও মিজাইলের আঘাতে মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনের যে সমালোচনা করা হয় তা মূলতঃ নিপীড়নের মাধ্যমের সমালোচনা। পৃথিবীর অবিচারের ফলে দশ লাখ আফগানের মৃত্যু দুনিয়ার বিচারে কোনও নিপীড়ন না। গৃহযুদ্ধ এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ১০% আফগান জনসমষ্টির মৃত্যুকে নিপীড়ন বলে ধরা হয় না, কিন্তু তরবারি দিয়ে কারও শিরচ্ছেদ বহুদিন ধরে স্যাটেলাইট টিভি-সংবাদের প্রধান শিরোনামে থাকে।

কোনও ব্যক্তির শিরশ্ছেদের দৃশ্য দেখা স্বাভাবিকভাবেই ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস্য কিন্তু প্রতিদিন ভূমিমাইন বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু কেন আমাদের মনে একই অনুভূতি জাগায় না? আফগান নির্যাতনের যে সমালোচনা আধুনিক পশ্চিমে করা হয় সেটা তার ধরন নিয়ে, বিষয়বস্তু নিয়ে না। একটা মূর্তি নিয়ে পশ্চিম দুঃখের কাহিনী ফাঁদতে পারে কিন্তু লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু কেবল যুক্ত হয় পরিসংখ্যানের সাথে। স্ট্যালিন যেমন বলেছিলেন: "একজন মানুষের মৃত্যু দুঃখজনক, কিন্তু এক মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু কেবল পরিসংখ্যান।"

গোত্রতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে থাকা একটি দেশ আফগানিস্তান এবং গোত্র নিয়ম এখানে কর্তৃত্বশীল। এ গোত্রগুলো ভীষণভাবে বিদেশী কর্তৃত্বের প্রতিবাদ করেছে অথচ এদের নিজেদের স্বার্থসংক্রান্ত সংঘাত থেকে উপকৃত হয়েছে বিদেশীরাই। যদিও আফগানিস্তানকে অনেক জাতিগোষ্ঠীর জাদুঘর বলা হয় কিন্তু পর্যটকরা কখনো এই জাদুঘর দেখতে আসে না।

যদি কেউ আফগানিস্তান ডিঙিয়ে যায় তো সেটা করে সে নিজের দরকারে; যেমন নাদির শাহ গিয়েছিলেন ভারত দখল করতে অথবা সোভিয়েতরা এসেছিল উষ্ণপানির খোঁজে। এই ভাবে রুক্ষ আফগানদের, নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছ থেকে তারা যা শিখেছে তার পাশাপাশি, সবসময়ই মোকাবিলা করতে হয়েছে পশ্চিমের অন্যান্য বৈরিতা।

আফগানিস্তানে যুদ্ধের পরিণতি

ইরাণের কাছ থেকে আফগানিস্তান স্বাধীন হয়েছে ২৫০ বছর আগে এবং প্রায় ১৫০ বছর, অন্যান্যদের মতে প্রায় ৮২ বছর, আগে দুরান্ত রেখা দিয়ে এর সীমানা নির্দিষ্ট হয়। অনুপযুক্ত আধুনিকতাকে সে রুখে দিয়েছে ৭৭ বছর আগে। ২০ বছর আগে দেশটা সোভিয়েতরা দখল করে নেয় এবং গত ১০ বছর ধরে এখানে গৃহযুদ্ধ লেগে আছে। আফগানিস্তানের জনসমষ্টির ৪০% ভয়ানকভাবে খুন হয়েছে অথবা হয়েছে উদ্বাস্তু। তারপরও এই দেশটিকে এবং এর জনগণকে হয় উপেক্ষা করা হয় অথবা হুমকি বিবেচনা করা হয় অথবা অন্যদের প্রতি হুমকি হিসাবে এদের ব্যবহার করা হয়। সীমান্ত পার হওয়ার সময় দেখলাম সারবাঁধা ইরাণী কামান আফগানিস্তানের দিকে তাক করা এবং যখন আফগানিস্তানে প্রবেশ করলাম দেখি সেই সারবাঁধা কামান ইরাণের দিকে তাক করা। এই কামানগুলোই বলে দেয়, উভয় দেশই একে অন্যকে হুমকি মনে করে। সীমান্তের ওপারে শুনেছি এক সামরিক অঞ্চল প্রধান ইরাণের

রাষ্ট্রদূতকে ডেকে বলেছে তাদের বাড়িগুলো তো কাদা দিয়ে বানানো, তাহলে ইরাণী কামানগুলো কিসের দিকে তাক করে সাজানো? সে বলেছিল,

> সবচেয়ে জঘন্য যা তোমরা করতে পার সেটা হচ্ছে গোলা মেরে আমাদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়া, আর বৃষ্টি এলে আমরা আবার ভেজা কাদা এনে নতুন ঘরবাড়ি বানিয়ে নেব। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন বেদনার হবে যদি আমাদের কামানগুলো তোমাদের সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর ধ্বংস ক'রে দেয়? তোমরা তো বৃষ্টির পানি দিয়ে কাঁচ লোহা বা সিরামিক বানাতে পার না। কেন তোমরা এসে আমাদের জন্য হেরাত পর্যন্ত রাস্তা বানিয়ে দাও না?

দোঘারুণ থেকে যখন হেরাত যাচ্ছি, আমার মনে হ'ল যেন এক উত্তাল সমুদ্রে ভাসছি। আমার মনে পড়ল একবার আমি শুটিং এর সময় পারস্য উপসাগরে ঝড়ের কবলে পড়েছিলাম। ঢেউগুলো আমাদের ছোট নৌকাকে কয়েক মিটার উপরে তুলছিল আবার পানির সমতলে আছড়ে ফেলছিল। মাঝি আমাদের বলল, যদি নৌকা উল্টে যায়, তো বিদায়। এবং এখন আমি আবার সেই ঢেউ দেখছি, কিন্তু এগুলো আবর্জনার ঢেউ। রাস্তার শুরুতে আমাদের গাড়ি ঢাল বেয়ে নামল, তারপর ঢাল বেয়ে ওঠা এবং মাঝপথে গাড়ি ধাক্কা খেতে লাগল আবর্জনার ঢেউয়ের সাথে। যদিও এই এলাকা সমান এবং আফগানিস্তানের অ-পাহাড়ি অংশের অন্তর্ভুক্ত, এর রাস্তা ইরাণের ঘোরানো-প্যাঁচানো গলিগুলোর চেয়েও দুর্গম।

প্রতিটি ঢেউয়ের শীর্ষে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে বেলচা হাতে লোক আর বালকেরা। যতদূর চোখ যায়, দেখা যায় এই বেলচা হাতের মানুষদের। আমাদের গাড়ি তাদের কাছাকাছি যেতেই তারা ময়লা দিয়ে গর্তগুলো ভরাট করতে লাগল, অর্থহীন আফগান কাগজের মুদ্রাগুলো ওদের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার সময় ধূলোর ভেতর ওগুলোকে ঠিক তেমন দেখালো যেমন আমরা পাতার নৃত্য দেখেছিলাম *ওয়ান্‌স্ আপ্‌অন এ টাইম ... সিনেমা* ছবিতে। এটা সেই বেলচাধরা মানুষদের দৃশ্য যারা ধূলায় হারিয়ে যায় এবং কিছু না থেকে নিজেদের জন্য জীবিকা সৃষ্টি করেছে। আফগানিস্তানে যত দৃশ্য আমি দেখেছি তার ভেতর এটাই সবচেয়ে পরাবাস্তব। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম প্রতিদিন কতগুলো গাড়ি এই রাস্তা ধরে যায়। সে বলল, "৩০টার মতো"। আমি বললাম, "যদি এই হাজার হাজার বেলচাধরা মানুষ ভিড় করে ৩০টা গাড়ির জন্য," কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি চালানোয় মন দিচ্ছে, আর সে আমার প্রশ্নের উত্তর করার মেজাজেও নাই। ধীরে, আমি রেডিওর দিকে ফিরলাম। বছর পেরিয়ে গেছে, আমি রেডিও শুনি না, টিভি দেখি না এবং কয়েকমাস কোন খবরের কাগজও পড়ি না। আজ ২০০০-এর ২৩ সেপ্টেম্বর, বেলা ২:০০ টা। ইরাণী সংবাদ খোলা। ২০ লাখ ইরাণী শিশু আজ থেকে স্কুলে যাবে এই সংবাদ শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। আমি জানি না এমন হল কি সেই শিশুদের জন্য আনন্দে যারা স্কুলে যাচ্ছে, নাকি আফগানিস্তানে যারা স্কুলে যেতে পারছে না তাদের প্রতি সমবেদনায়।

রাস্তার দিকে তাকাই মনে হয় কোনও ছবি দেখছি। ড্রাইভার বলল, এই বাড়িগুলোর কোনও কোনওটিতে গোপনে মেয়েদের স্কুল খোলা হয়েছে এবং কিছু মেয়ে বাড়িতে পড়াশুনা করে। আমি চিন্তা করি, এখানে ছবির বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। হেরাতে পৌঁছে আমি দেখি মহিলারা বোরকার ভেতর থেকে হাত বের করে নখ বাড়িয়ে দিচ্ছে। নিজেকে বলি, ছবির জন্য আরেকটা বিষয়। আমি দেখি ১৯ বছরের বৃটিশ তরুণীটিকে যে এই ভয়ঙ্কর আফগানিস্তানে এসেছে কারও কাজে লাগার জন্য। আবার নিজেকে বলি, আরও একটা বিষয় পাওয়া গেল। প্রচুর খোঁড়া মানুষ আমি দেখি, যারা পা হারিয়েছে মাইন বিস্ফোরণে। তাদের একজন কৃত্রিম পা না পেয়ে শরীরের বাম দিকে একটা বেলচা বেঁধে নিয়েছে এবং সেটা দিয়ে সে হাঁটছে। আমি নিজেকে বলি, এখানেও থেকে যাচ্ছে ছবির জন্য আরো একটা বিষয়।

হেরাত পৌঁছে আমি দেখি রাস্তা ঢেকে গালিচার মতো পড়ে আছে মৃত বা মুমূর্ষু মানুষ। এ-দৃশ্যকে আর আমার ছবির বিষয় মনে হয় না মনে হয় সিনেমা থেকে পালিয়ে অন্য কাজ খুঁজি। আফগানিস্তানের শীর্ষ সামরিক প্রধান মাসুদকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তার সন্তানদের তিনি কী হিসাবে দেখতে চান, উত্তরে বলেছিলেন, "রাজনীতিবিদ।" এর মানে, যুদ্ধকে সমাধান বলে ভাবার প্রবণতা সেনাপ্রধানের মাথা থেকেও দূর হয়েছে। তিনি মনে করেন আফগানিস্তানের পরিত্রাণের উপায় যত না সামরিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। আমার মতে একমাত্র সমাধান হচ্ছে, আফগানিস্তানের সমস্যাগুলোকে তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিহ্নিত করা এবং একটি জাতির আসল চেহারা উপস্থাপন করা যা, এর নিজের এবং অন্যদের কারণে, এতদিন অস্পষ্ট এবং চেহারাহীন থেকে গেছে।

জীবিকা সংকটের স্বরূপ

একদিন শিল্পোন্নত দেশগুলো নিজেদের পণ্য সামগ্রী দিয়ে আভ্যন্তরীণ বাজার ভরে ফেলেছে, তারপর এসেছিল আন্তর্জাতিক বাজারে। পণ্যব্যবহারের দাম হিসাবে শিল্পে অনুন্নত দেশগুলোর কেউ অন্য পণ্যসামগ্রী দিয়েছে এবং অন্যরা দিয়েছে সস্তা শ্রম। এই খেলায় আফগানিস্তান, পাহাড়ি ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এবং যাতায়াত পথের অভাবে, এর কাঁচামাল যথার্থ ব্যবহার করতে পারে নি।

জনশক্তির ভুলব্যবস্থাপনা এবং বিক্ষিপ্ততার কারণে– কৃষিনির্ভর সময় থেকে যার শুরু– আর অনৈক্যের ফলে, যা গোত্রগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, আফগানিস্তান তার শ্রমশক্তিকে বিশ্ববাজারে অন্যান্য পণ্য বা সুযোগসুবিধার বিনিময় হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে নি। এভাবে, গ্রাসাচ্ছাদনের বিশ্বব্যাপী খেলায় আফগানিস্তান থেমে থাকে এবং টিকে থাকে এর তৃণভূমি থেকে আসা সামান্য সম্পদের ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবেশ করলে দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং কৃষকেরা হয়ে যায় যোদ্ধা। সোভিয়েত উৎখাতের পর এই যোদ্ধারা তো আর কৃষিকাজে ফিরে যেতে রাজি না।

একদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিস্তৃত হয়েছে গৃহযুদ্ধ। সেই থেকে বেড়েছে নিরাপত্তাহীনতা আর দেশত্যাগ। ঘরছাড়া আফগানদের ৩০% সম্ভবত অন্যান্য শহরে অপেক্ষাকৃত ভালো থাকতে পেরেছে এবং আর তারা জীবিকার জন্য তৃণভূমি নির্ভর হতে চায় নি, বিশেষ করে, যখন নিয়মিত অনাবৃষ্টির হুমকিটা তাদের জানা। আফগানরা চেয়েছিল আরও একটু নাগরিক জীবন। এর মানে আফগানিস্তান সব ঐতিহাসিক শ্লথগতি নিয়েও বিশ্ববাণিজ্যে তার প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে দিয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতা বা বিক্রেতা-ক্রেতার বিশ্ববাজারে ঢোকার জন্য উপস্থাপনযোগ্য সবচেয়ে তাৎক্ষণিক সম্পদ কী? সংশয়াতীতভাবে উত্তর, আফগানিস্তানের সস্তা শ্রম। কাঁচামাল কাজে লাগানোর চেয়ে রাস্তাহীন, পর্বতময় আফগানিস্তানে শ্রমশক্তি অনেক সহজপ্রাপ্য। আফগানিস্তান বিষয়ে কর্তৃত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গির যাওয়া উচিত এর সামরিক রাজনৈতিক প্রিজমটিকে পাশ কাটিয়ে। এর জায়গায় এনে বসানো উচিত অর্থনৈতিক নির্দেশনার ধারণা। যদি জীবিকা সমস্যার সমাধানই বর্তমান সংকটের মূল এবং চূড়ান্ত বলে ধরা হয়, তো জাতীয় ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে বিশ্ব বাজারে এবং আন্তর্জাতিক গ্রাসাচ্ছাদনচক্রে আফগানিস্তানও প্রবেশ করতে পারে। সে তার প্রকৃত অংশ বুঝে নিতে পারে, বিনিময়ে দিতে পারে শ্রম, পণ্য সামগ্রী এবং নিতে পারে আজকের দিনের সভ্যতার ও আধুনিকতার নানা সুযোগ সুবিধা। এরকম ঘটেছে মাও-এর চীনে, গান্ধির ভারতে এবং বেশ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে পরিশ্রমী জাপানে।

এরকম অনুকূল অবস্থান থেকে দেখলে আফগানদের রুগ্নতা কোনও দুর্দশা না। এটা আফগান চিকিৎসকদের বাজার। বিশেষজ্ঞের অভাব কোনও দুর্দশা নয়। এটা কয়েকমাসের প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্যসহকারী বানানোর বাজার। ক্ষুধা কোনও দুর্দশা নয়। এটা রুটি পণ্যায়নের বাজার। রুটির অভাব কোনও দুর্দশা নয়। এটা গম বিক্রির বাজার। গমের অভাব কোনও দুর্দশা নয়। এটা উদ্বৃত্ত পানি কাজে লাগানোর বাজার।

শ্রমশক্তি ব্যবহারে পানি কাজে লাগানো মানে বাঁধ। শ্রমের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ মানে গম। গম হচ্ছে রুটি। রুটি হচ্ছে পরিতৃপ্তি। তৃপ্তির ওপারে থাকে উদ্বৃত্ত। উদ্বৃত্ত পরিতৃপ্তি হল উন্নয়ন। উন্নয়ন হচ্ছে সভ্যতা। স্টালিন বলেছিলেন, "একজন মানুষের মৃত্যু দুঃখজনক, কিন্তু এক মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু কেবল পরিসংখ্যান।"

যেদিন ১২ বছরের এক ছোট্ট আফগান বালিকাকে– আমার মেয়ে হান্নার সমান বয়সী– আমার হাতের ওপর ক্ষুধায় ছটফট করতে দেখেছি, সেদিন থেকে এই ক্ষুধার ভোগান্তিকে সামনে আনতে চেষ্টা করেছি এবং সবসময়ই পরিসংখ্যান তুলে ধরে আমাকে শেষ করতে হয়েছে। হায় আল্লা, আমি এত ক্ষমতাহীন হলাম কেন, আফগানিস্তানের মতো? মনে হয় সেই কবিতার কাছে যাই, সেই ভবঘুরে উম্মূলতার কাছে আর হেরাতের সেই কবির মতো কোথাও হারিয়ে যাই, অথবা লজ্জায় ভেঙে পড়ি বামিয়ানের বুদ্ধের মতো।

আমি পায়ে হেঁটে এসেছিলাম, পায়ে হেঁটে চ'লে যাব
যে-আগন্তুকের কোনও মাটির ব্যাংক নাই, সে চ'লে যাবে।
এবং যে-শিশুর কোনও পুতুল নাই, সে চ'লে যাবে।
আজ রাতে ফুরাবে আমার নির্বাসনের মেয়াদ।
আর ভাঁজ ক'রে রাখা হবে শূন্য টেবিল।
দিগন্তে দিগন্তে আমি ঘুরেছি যন্ত্রণাদগ্ধ।
আমি সেই লোক যাকে সবাই ঘুরতে দেখেছে।
আমার যা নাই আমি তা সৃষ্টি করব এবং চলে যাব।
আমি এসেছিলাম পায়ে হেঁটে, পায়ে হেঁটেই চলে যাব।

সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী

আফগানিস্তানের মানুষ মানেই কি আদিম বর্বর 'মৌলবাদী'?

আফগানিস্তানের দেশ-কাল ও জনসংস্কৃতির চিনপরিচয়

প্রাককথন

আমরা ক'জন মিলে **মানুষ** পত্রিকার কাজ শুরু করেছিলাম প্রায় দুবছর হয়ে গেল, ২০০১ সালের গোড়ার দিকে। সেখানে বিষয় ছিল নোম চমস্কি। কাজ যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে সেইসময় অর্থাৎ ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টম্বরে আচমকা ঘটে গেল পেন্টাগন-টুইন-টাওয়ারে আত্মঘাতী যাত্রীবিমান-হামলা এবং তার পরবর্ত্তী ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যে কোনোরকম সাক্ষী-প্রমাণের তোয়াক্কা না-করেই আমেরিকা নিজের ক্ষমতার বীভৎস দাপট দেখাতে লাগল বিশ্বের অত্যন্ত দরিদ্র আর ক্ষুধার ভারে জর্জরিত একটা ছোট্ট দেশ আফগানিস্তানের ওপর, যে-দেশ ইতোমধ্যেই নানা মাপের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে-আগ্রাসনে নিঃস্ব হয়ে আছে ব্যাপকভাবে, যুদ্ধ যে-দেশের ভূমিকে করে রেখেছে বন্ধ্যা, গৃহযুদ্ধ যে-দেশের আনাচে-কানাচে হানছে সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত ছোবল, ক্ষুধা-মহামারী যে-দেশের নিত্য সঙ্গী হয়ে আছে, যে-দেশে শিশুমৃত্যুর হার বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে ভয়ানক মাত্রায় বেশী। তৃতীয় বিশ্বের এরকম হতদরিদ্র একটা দেশে যখন চলছে আমেরিকার অসভ্য, বর্বর, নিষ্ঠুর, অন্যায় হত্যাযজ্ঞ, আর আমেরিকার শাসককুল যখন নানাভাবে এই নির্লজ্জ হত্যাকে জায়েজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে কখনো 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', কখনো 'সভ্যতার পক্ষে যুদ্ধ', কখনো-বা 'ন্যায়ের পক্ষে লড়াই' ইত্যাদি মিথ্যা ধুয়া তুলে তখন আমরা আফগানিস্তান নিয়ে জানা বোঝার চেষ্টা চালাতে শুরু করি। নোম চমস্কির কাজ করতে করতে তাঁর কাছ থেকে ততদিনে যা শেখা গিয়েছিল তা আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে এনে দিল খুচরা আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দিকে। ফলে **মানুষ** এর 'নোম চমস্কি সংখ্যা'র অর্ধসমাপ্ত কাজ ভবিষ্যতের জন্য তোলা রেখে আমরা মন দিলাম দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আগ্রাসন আর প্রচারণা-যুদ্ধের দিকে।

মানুষ এর বর্তমান সংখ্যার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে নানান বিষয় ভাগ করে নিই। কেউ বেছে নেন আফগানিস্তানের নারীদের বিষয়, কেউ দেখাতে নামেন আফগানিস্তানে

আমেরিকার হামলার পেছনের অর্থনৈতিক দিকটি, কেউ বেছে নেন আফগানিস্তানের কবিতা ও সে-দেশের কবিদের। এভাবে আমার ভাগে পড়ে সাধারণভাবে আফগানিস্তানের জনগন আর তাঁদের সাহিত্য-শিল্প ও জনসংস্কৃতির দিকগুলির পরিচিতি দাঁড় করানোর দায়িত্ব।

ইন্টারনেট থেকে আফগানিস্তানের জনসংস্কৃতি বা ফোকলোরের বেশকিছু উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলো পড়ে আমার নিজেরও আফগানিস্তানের মানুষ সম্পর্কে একটা ভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠে যা বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমা মিডিয়ার আফগান-প্রতিকৃতি থেকে বিলকুল আলাদা। আরও নানান বইপত্র-মালমশলা নাড়াচাড়া করে বোঝা গেল, আফগানিস্তানকে যেখানে বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাদপদ ও অজ্ঞ জাতি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তার উল্টো পিঠেই আছে আফগানিস্তানের জনগণের অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয়; আছে সে-দেশের মানুষের সাহিত্যমত্তা, সৌন্দর্যচেতনা ও গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতিভাস। এভাবে এগুতে এগুতে আফগানিস্তানকে জানাবোঝার ছোট একটি প্রয়াস হিসেবে আমি এ লেখাটি লিখতে শুরু করি। আর জানতে শুরু করি আমাদের দেশের মতনই গরীব এই দেশটির জনগণের সাহিত্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, সমাজভাবনা, নান্দনিক চেতনা এবং কিছু অন্যরকম বৈশিষ্ট্যের কথা।

এই লেখাটি করতে যেয়ে আমি নির্ভর করেছি ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস এর লেখা 'আফগানিস্তান' নামে একটা নিবন্ধের ওপর। কার্ল মার্কসের সম্পাদনায় 'নয়া মার্কিন-সাইক্লোপেডিয়া'-র জন্য ১৮৫৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে এই রচনাটি এঙ্গেলস রচনা করেছিলেন (মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৪০)। এছাড়া, *ব্রিটানিকা* বিশ্বকোষ এবং মাইক্রোসফ্‌ট করপোরেশনের *এনকার্টা* বিশ্বকোষের ২০০২ সালের সিডি-রম-সংস্করণের ওপর বিপুলভাবে নির্ভর করেছি। আর ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটির কথা তো আগেই বলেছি। এইসব উৎস থেকে নকলনবিশি করে তথ্য জোটানো আর সেই তথ্যগুলোকে এক জায়গায় সাজানো ছাড়া এই লেখায় আমার আর কোনো কৃতিত্ব নেই।

পশ্চিমা মিডিয়া আর জগতবিচারের ঠুলি

পশ্চিমা-মিডিয়া আমাদের চোখে এঁটে দিয়েছে নানামাপের ঠুলি। আর আমরা, অন্তত সাধারণত, ঐ ঠুলিওয়ালা চোখ দিয়ে আমাদের জগত-মানুষকে জানছি। পশ্চিমা মিডিয়াগুলো তাদের স্বার্থেই যাবতীয়ভাবে লিপ্ত। তাদের স্বার্থকে রক্ষা করা ও উত্তরোত্তর তার সমৃদ্ধি ঘটানোই তার আসল কাজ। এই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যখন যাকে নিজেদের সুবিধা-স্বার্থের বিপরীতার্থক মনে করেছে তাদেরকে তারা মিডিয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। প্রচারণার আড়ালে ঢেকে গেছে প্রকৃত সত্য।

পশ্চিমা-মিডিয়ার মাধ্যমে আমরাও তাদের সঙ্গে প্রায়শই আনন্দে তাল মেলাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকেরই যে আলাদা আলাদা চোখ আছে এবং সেই ইন্দ্রিয়টিকে একটু কষ্ট করে যদি আমরা সচল ও উদার রাখি তাহলে এই পশ্চিমের মিডিয়া-সংবাদের জারিজুরি ও তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে এগুলোর বীভৎস ব্যবহারের কূটচাল অনেকক্ষেত্রেই ধরে ফেলতে পারব। কিন্তু পশ্চিমা-মিডিয়াগুলো এতই শক্তিশালী আধিপত্য আমাদের উপর বিস্তার করে বেড়ে আছে যে, পশ্চিমাপ্রীতিতে আচ্ছন্ন এই সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই এর বাইরে গিয়ে একটু ভিন্নভাবে আমাদের জগত ও এ জগতের তাবত কারিগর 'মানুষ'কে বুঝতে চায় না। তাই দেশকাল-তত্ত্ব ভুলে বসে আমরা নিজের দেশকেই কতকক্ষেত্রে বিচার করি পশ্চিমা-তত্ত্বদর্শনে।

এতো গেল এক দিক। কিন্তু সবচেয়ে যেটা গোল পাকিয়েছে সেটা হলো এই পশ্চিমা মিডিয়ার সংবাদ কাভারেজ। এই মিডিয়াগুলো আমাদের নিত্যনতুন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দেয়। তাদের মাধ্যমেই আমরা পরিচিত হই তাদের বাইরের আরো অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে। সম্প্রতি টুইন টাওয়ারে ও পেন্টাগনে ঘটে যাওয়া ধ্বংসের পাল্টা হিসেবে আমেরিকা যে নগ্ন ও অত্যন্ত গর্হিত অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালালো গোটা আফগানিস্তান জুড়ে তা আমাদের সকলেরই চোখে-কানে দেখা-শোনা।

গোটা আফগানিস্তানকে আমাদের মিডিয়া ও পশ্চিমের মিডিয়াগুলো যেভাবে পরিবেশন করেছে তা নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়। আফগানিস্তান নামটি মনে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে শব্দটি আমাদের চোখে ভেসে আসে তা হলো 'তালেবান'। আফগান মানেই আমরা সাধারণভাবে বুঝি তালেবান। সেই তালেবান, যারা এ পবিত্র আসমানী পৃথিবীর চরম শত্রু এক পশ্চাদপদ জনজাতির প্রতিনিধি। এই হিসেবেই পশ্চিমের সংবাদমাধ্যমগুলো সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে আফগানিস্তানের মানুষদের পরিচিতি এনে দিয়েছে। সেজন্যই আমরা 'তালেবান' জুজুর ভয় এড়াবার কৌশল হিসেবে আফগানিস্তানকে, আফগান মানুষকে, মনে মনে এড়িয়ে চলি। আর পশ্চিমা সংবাদ শ্রবণের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের চোখকে আবারো পশ্চিমা-মিডিয়া চশমার ফ্রেমে জড়াই। আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষ যে আমাদের বাংলাদেশের যেকোনো নিরীহ মানুষের মতই জলজ্যান্ত স্বাভাবিক, এ সত্য আমাদের মাথায় অনেকক্ষেত্রেই ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। 'তালেবান' শব্দটির ন্যাক্কারজনক বৈশিষ্ট্য আমরা যতটা জানি, এর উদ্ভব-সময় এবং পরিস্থিতি নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। আফগানিস্তানে তালেবানী উত্থান কেন এবং কীভাবে হলো সে-বিষয়ক সংবাদ আমরা আমাদের মিডিয়াগুলোতে পাই না বললেই চলে।

অনেক দেশের বুদ্ধিজীবীরা আফগানিস্তানে বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন; লিখেছেনও। খোদ আমেরিকায় বসেও অনেক বুদ্ধিজীবীই আফগানিস্তানের মানুষ নিয়ে লিখেছেন। তাঁদের লেখা সচরাচর আমাদের সাধারণ মানুষের নাগালে আসে না। তাঁদের লেখা পড়ে আমরা আমাদের তালিমারা চোখকে নিয়ে বিভ্রমে পরি। আফগানিস্তানের মানুষের মধ্যেও যে সুকুমার-বৃত্তি আছে, তাদের জীবনও যে গর্ব করার মতো ঐতিহ্যের আলোকে আলোকিত, তারাও যে পরস্পর পরস্পরের সাথে মানবিক পর্যায়ের নানা সম্পর্কে আবদ্ধ, এই 'পশ্চাদপদ' জনজাতিরাও যে তাদের অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে গড়ে তোলেন তাদের নিজস্ব জনসংস্কৃতিকে, এবং সে-সংস্কৃতির তীক্ষতা যে পৃথিবীর যেকোনো দেশের জনসংস্কৃতির মতই প্রবহমান, তার খোঁজ পাওয়া যায়। মিডিয়া যেভাবে আফগানিস্তানকে কেবল যুদ্ধবাজ ও ধর্মীয় গোঁড়ামীতে ঠাসা জনজাতি হিসেবে পরিচিত করেছে তার বিপরীতে স্বচ্ছবুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমরা এই নিরীহ-কিন্তু-সাহসী-সহমর্মী-উদার মানবিক এক জনজাতিকে চিনতে পারা সম্ভব। সম্ভব আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে এদেরকে মিলিয়ে দেখতে পারা।

'অ্যারিয়ানা' থেকে আফগানিস্তান

আজকের দুনিয়ায় 'ইতিহাস' এর মালিক পশ্চিম মুল্লুকের শাসকরা আফগানিস্তানকে একটা বর্বর-আধাবর্বর দেশ বলে চালাতে চাইলেও ঘটনা এই যে, লোকে যাকে বলে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি আফগানিস্তানে সেই বস্তু সুপ্রাচীন কালের। ১০০০০০ বছর আগে প্যালিলিথিক লোকজন আফগানিস্তানে বিচরণ করেছে। সবচেয়ে আদিতে মানুষের যে-সম্প্রদায়গুলো কৃষিকাজ শুরু করে উত্তর-আফগানিস্তানের লোকেরা তাদের মধ্যে পড়ে। উত্তর আফগানিস্তানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে দেখা গেছে, ৫০০০০ বছর আগে এখানে মানুষ বাস করতো। ৩০০০০ বছর আগের নিয়াণ্ডার্থাল-মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে এখানকার বাদাঘ্স্তানের পাহাড়ী গুহায়। আক-কোপারাক এলাকার গুহায় পাওয়া গেছে ১০০০০ হাজার বছর আগের নিওলিথিক

পশুপালনভিত্তিক সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সিন্ধু নদের তীরে ৫০০০ বছর আগের গড়ে-ওঠা হরপ্পা সভ্যতার আগের ও পরের, তাম্র-যুগের, প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা পাওয়া গেছে। 'আর্য' বলে পরিচিত লোকেরা মধ্য-এশিয়া থেকে আফগানিস্তানে আগমন করতে শুরু করে খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বছর আগে থেকে। এদেরই একটা অংশ যায় পারস্যে, আর একটা অংশ যায় ভারতে।

আফগানিস্তানের ভাষাগত, জাতিগত, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য অসাধারণ। এই অঞ্চল আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি-সভ্যতার মিলনকেন্দ্র। তাম্র-যুগে আফগানিস্তানের মানুষের সাথে মেসোপটেমিয়া ও মিশরের বাণিজ্য-লেনদেন ছিল। হরপ্পা-সভ্যতার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাওয়া গেছে প্রত্নখননে। এই অঞ্চল কখনো সাইরাস, দারিয়ুস প্রমুখ আরামেনিয়ান শাসককুলের, কখনো আলেজাণ্ডার ও গ্রীক রাজাদের, কখনো ব্যাবিলনীয় শাসকদের, কখনো ভারতীয় মৌর্য নৃপতিদের, কখনো পারস্যের বাদশাহদের অধীনে ছিলো। একসময় মধ্য-এশিয়ার পাঁচটা যাযাবর গোত্রের যৌথশক্তি কুশান নাম ধারণ করে আফগানিস্তান শাসন করেছে। এদের রাজা কনিষ্কের নাম সুবিদিত। এর সাম্রাজ্য ছিল উত্তর ভারতের মথুরা থেকে একদিকে মধ্য-এশিয়া, অন্যদিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। অমূল্য ভাবসম্পদ ও মূল্যবান বিলাসদ্রব্য আনানেওয়ার জন্য প্রাচীনকাল থেকে সুখ্যাত রোম-ভারত-চীন বরাবর সিল্ক-রোডের একটা শাখা আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে বিন্যস্ত ছিল। এই রাস্তার পথিমধ্য-বিনিময়কেন্দ্র ছিল বল্‌খ্‌। এই পথ ধরেই ভারতের তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধসংস্কৃতিকে নিয়ে যায় আফগানিস্তান হয়ে চীনপর্যন্ত।

আর্যদের নামানুসারে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষকে যেমন বলা হতো, তেমনি আফগানিস্তানকে বলা হতো 'অ্যারিয়ানা'। এই কদিন আগেই আফগানিস্তানের বিমানসংস্থার নাম ছিল অ্যারিয়ানা এয়ারলাইন্‌স্‌। অ্যারিয়ানা-আফগানিস্তানের পরিচয় রাতারাতি গায়েব করে দিয়ে পশ্চিমা মিডিয়া তাকে বানিয়েছে 'তালেবানা'-আফগানিস্তান।

রাষ্ট্র ও ভূগোল: 'এই আমার দেশ– বাঘ-সিংহের দেশ'

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশ আফগানিস্তান। এর উত্তরে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান। পূর্বদিকে চীন, আর পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মিরের বিতর্কিত ভূ-খণ্ড। দক্ষিণে পাকিস্তান, আর পশ্চিমে ইরান। আয়তন প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার বা আড়াই লক্ষ বর্গ-মাইল। দেশটা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে; পারস্য আর ভারতবর্ষের মাঝখানে। আরেক বরাবর দেখলে এর একপাশে পশ্চিম হিমালয় থেকে বের হয়ে আসা হিন্দুকুশ-পর্বতমালা অন্য পাশে ভারত-মহাসাগর।

আগেকার আমলের আফগানিস্তানের মধ্যে পারস্য দেশের খোরাসান আর কোহিস্তান, এবং হেরাত, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের বেশ খানিকটা অংশ ছিল।

আকাশ থেকে তাকালে দেখা যাবে, আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম আর দক্ষিণের সীমান্ত মানে সমতল মরুভূমি আর পাহাড়ী উঁচুনীচু। ওদিকে দক্ষিণ-পূর্ব আর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মাটি ধীরে ধীরে খাড়া হতে হতে হিন্দুকুশ পর্বতমালার চূড়ায় উঠে গেছে – চূড়াগুলো হিমবাহে ঢাকা। উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত গঠন করেছে যে-নদী তার নাম আমুদরিয়া।

আফগানিস্তানের ভূ-ভাগ খুবই অসমতল। সুউচ্চ মালভূমি, বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, গভীর উপত্যকা আর সঙ্কীর্ণ খাড়া খাতে ভরা।

উষ্ণমণ্ডলের আর দশটা পার্বত্য দেশের মতই আফগানিস্তানের জলবায়ুতে সকল বৈচিত্রই দেখা যায়। হিন্দুকুশের সুউচ্চ চূড়াগুলোতে সারাবছরই বরফ থাকে, আর উপত্যকাগুলোতে

তাপমাত্রা থাকে ১৩০ ডিগ্রী। গরম পশ্চিমের চেয়ে পূর্বেই বেশী। তবে দেশটা মোটের ওপর ভারতের চেয়ে শীতল। গরমকাল এবং শীতকাল অথবা দিন এবং রাতের মধ্যে তাপমাত্রার পরিবর্তন খুবই ব্যাপক। তথাপি দেশটি স্বাস্থ্যবান। প্রধান অসুখ বলতে জ্বরজারি, সর্দি-শ্লেষ্মা আর চোখ-ওঠা।

আফগানিস্তানের মাটি অত্যন্ত উর্বর ও প্রাচুর্যপূর্ণ। বালুকাময় উপত্যকায় পাওয়া যায় প্রচুর আখ আর তুলা; এবং ইউরোপীয় ফলফলারি আর শাকসব্‌জী বিপুল পরিমাণে জন্মে ছয় থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মালভূমিগুলোতে। অভিজাত অরণ্যে ও বনানীতে পর্বতভাগ আবৃত। সেখানে প্রচুর ভালুক, নেকড়ে এমনকি সিংহ, বাঘ, লেপার্ড ইত্যাদি। মানুষের কাজে লাগে এমন প্রাণীরও অভাব নেই। পারস্যজাতের বা লম্বাজাতের ঘোড়ার সাইজ ও জাত ভালো। উট আর গাধা কাজে লাগে ভারবাহী পশু হিসাবে; আর ছাগল, কুকুর ও বিড়াল দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর সংখ্যায়।

হিন্দুকুশ ছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিমে বল্‌খ্-প্রদেশে আছে সোলায়মান পাহাড়। নদী তুলনা-মূলকভাবে আফগানিস্তানে কম। তাদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো হেলমান ও কাবুল নদী। উভয়েরই উৎপত্তি হিন্দুকুশে। আফগানিস্তানে বড় বড় শহর বলতে রাজধানী কাবুল এবং গজনী, পেশোয়ার, হেরাত, কান্দাহার, মাজার-ই-শরীফ।

দেশের অর্ধেকটা অংশ ছয় হাজার ছয় শত ফুট উঁচু পর্বতমালা। ছোট ছোট হিমবাহ আর বছর জুড়ে তুষারপাত সাধারণ ব্যাপার। নদীর ধারের উপত্যকাগুলো আর সামান্য কিছু নীচু জমি যেগুলা আছে সেখানে ভূ-গর্ভস্থ পানির সেচে কৃষিকাজ চলে। এছাড়া কৃষিকাজ কঠিন ব্যাপার। মাত্র ১২ শতাংশ জমিতে কৃষিকাজ হয়। এছাড়া বেশকিছু জমি কৃষিকাজ থেকে বাদ পড়েছে সোভিয়েতদের ফেলে যাওয়া স্থল-মাইনের কারণে। ভেড়া আর ছাগল পালনেই কৃষিজমি প্রধানত কাজে লাগে।

দেশটা যেহেতু প্রচুর পাহাড়ে ভরা কাজেই এর গিরিপথগুলো অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। খৃষ্টের জন্মের ৩২০ বছর আগে আলেকজান্ডার দেশটি দখল করেছিলেন কুশান গিরিপথ দিয়ে। একই গিরিপথগুলো বাবর ব্যবহার করেছিলেন পনের শতকে আফগানিস্তান আর ভারত দখল করার সময়। সালান গিরিপথ আর হিন্দুকুশ পর্বতমালার কেন্দ্রভাগ দিয়ে সোভিয়েতনির্মিত সুরঙ্গপথগুলো দিয়ে সোভিয়েতরা ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান দখল করে নেয়।

বহু জাতি বহু ভাষার দেশ

আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও সংস্কৃতির একটা মিলনক্ষেত্র; বহুজাতি-ভাষার দেশ। এখানকার লোকেরা ইরান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান আর উজবেকিস্তানের বহু জাতি গোষ্ঠীর লোকদের সাথে সম্পর্কিত। এইসব জাতিগোষ্ঠীগুলির কাছে মধ্যবর্তী সীমান্তের কোনো ঠিক থাকে না। বেশীরভাগ আফগান কৃষক ও পশুপালক। কিছু যাযাবর গোষ্ঠীও আছে।

আফগানিস্তানে সর্বশেষ আদমশুমারি হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। তখন লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৫ লক্ষ। ২০০১ সালের এক আন্দাজ অনুসারে লোকসংখ্যা এখন ২ কোটি ৬৮ লক্ষ। যোদ্ধাহত ও উদ্বাস্তুদের কারণে সঠিক আন্দাজ করা কঠিন। ১৯৯৯ সালে পল্লী এলাকায় বাস করতো জনসংখ্যার ৭৯ ভাগ। আর নাগরিকদের অর্ধেক বাস করত কাবুলে। যাযাবর জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ। উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৫০/৬০ লক্ষ।

দেশের দুই-পঞ্চমাংশ লোক পশতুন বা পাখতুন বা পুশতুন বা পাঠান। এদের দামটাই সমাজে বেশী। এদের মূল ঘাঁটি হিন্দুকুশের দক্ষিণে কিন্তু পাঠানরা সারাদেশেই বাস করে। পাঠানরা পাকিস্তানেও বাস করে। পাঠানরা সাধারণত কৃষক। তবে অনেকেই যাযাবর; ছাগলের কালো পশম দিয়ে তৈরী করা তাঁবুতে বাস করে। পাঠানরা পশতু-ভাষায় কথা বলে। এটা একটা ইন্দো-ইরানীয় ভাষা।

দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি হলো তাজিকরা। এদের উৎপত্তি ইরানে। এরা উত্তর কাবুল এবং বাদাঘ্স্তানের উপত্যকায় বাস করে। এরা কৃষক, কুটিরশিল্পী আর বণিক। এরা কথা বলে দারী ভাষায়। এটা এক ধরনের আফগান-ফার্সি ভাষা। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাও বটে। বেশিরভাগ শহরে লোকজন পশতু ভাষার তুলনায় দারী ভাষায় বেশী কথা বলে। তাজিকরা তাজিকিস্তানের লোকজনদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পশতু এবং দারী আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা।

কেন্দ্রভাগের চারণক্ষেত্রগুলোতে থাকে হাযারা জাতি। যদিও এদের পূর্বপুরুষেরা উত্তর-পশ্চিম চীনের জিংজিয়ান প্রদেশের মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত লোক কিন্তু হাযারাগণ প্রাচীন ফার্সীতে কথা বলে। এদের বেশীরভাগই কৃষক আর পশুপালক। দীর্ঘদিন ধরে হাযারাগণ বঞ্চণা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। এর একটা কারণ হলো তারা শিয়া সম্প্রদায় মুসলমান, যেখানে দেশের বেশীরভাগ মুসলমানই সুন্নী সম্প্রদায়ের।

পূর্বদিকে কাবুল নদীর উত্তরে বিচ্ছিন্ন একটা পাহাড়ী এলাকাকে বলে নূরীস্তান। নূরীস্তানী লোকেরা ইন্দো-ইরানীয় বিভিন্ন উপভাষা বলে।

দক্ষিণে বাস করে বালুচিরা। এরা বালোচি নামে ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় কথা বলে। দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তান আর দক্ষিণ-পূর্ব ইরানেও একই ভাষায় লোকেরা কথা বলে।

হিন্দুকুশের উত্তরে আমুদরিয়া নদীর কাছে সমভূমিগুলোতে বিভিন্ন গোষ্ঠী বাস করে, যারা কথা বলে বিভিন্ন টার্কিক ভাষায়। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো উজবেকেরা, তুর্কম্যানরাও এদের অন্তর্গত। এরা থাকে একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে – ভাকান করিডোরে। সোভিয়েত দখলদারিত্বের কারণে এরা ব্যাপকভাবে বিতাড়িত হয়েছিল এবং এদের ব্যাপক অংশই তুরস্কে পালিয়ে যায়। এই সবগুলো গোষ্ঠীর লোকেরাই স্থায়ী কৃষক, বণিক আর যাযাবর ধরনের মেষপালক। যাযাবররা মঙ্গোলীয় বা মধ্যএশীয় টাইপের গোল আর পশমাবৃত তাঁবুতে থাকে। যুদ্ধের আগে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদগুলো প্রায় সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে। একারণে জাতিগত টেনশান এবং সহিংসতা একেবারে নীচু-মাত্রায় নেমে এসেছিল যদিও সবসময় কাবুলে পাঠানরাই রাজনৈতিকভাবে আধিপত্যশীল গোষ্ঠী ছিল। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে একবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ক্ষমতা ভাগাভাগি করার নিয়ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু জাতি-গোষ্ঠীগুলো যুদ্ধের আগে ক্ষমতায় তাদের যে অংশ ছিল তার চাইতে বেশী ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। যার আবশ্যিক পরিণাম ছিল সহিংস ও জাতিগত সংঘাত।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধন হলো তাদের ইসলাম ধর্ম। আফগানিস্তানের প্রায় সবাই, প্রায় ৯৯ শতাংশ, হলো মুসলমান। আফগান মুসলমানদের ৮৪ ভাগই সুন্নী, বাকীরা শিয়া – প্রধানত হাযারা এবং তাজিক। শহরের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে হিন্দু, শিখ, পারসী, এবং ইহুদীদের ছোট ছোট গোষ্ঠী। ১৯৬০ এর দশক থেকে অনেক আফগান ইহুদি ইসরায়েলে চলে গেছে। মাজার-ই-শরিফ মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান। এখানে পঞ্চদশ

শতকের একটা মসজিদে মুসলমানদের নেতা হযরত আলীর মাজার আছে বলে মনে করা হয়। সারা আফগানিস্তান জুড়ে দরবেশদের পতাকাবৃত মাজার দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ এই দরবেশদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং সন্তান প্রসব, বিবাদ-মীমাংসা, নৈতিক নেতৃত্ব আরও নানান দিক দিয়ে এই দরবেশদের কাছে মানত করে।

আফগানিস্তানের মুসলমানদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো মোল্লা। সম্পূর্ণ কোরান যিনি মুখস্ত তেলাওয়াৎ করতে পারেন তাকে মোল্লা বলে। সব মোল্লা অবশ্য পবিত্র কোরানের সব কথার মানে বোঝেন না। কারণ তা লেখা ও মুখস্ত করা হয় আরবী ভাষায় যা আফগানিস্তানের স্থানীয় ভাষা না। শুক্রবারের নামাজে মোল্লারা ইমামতি করেন ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। বিয়ে, দাফন-কাফন প্রভৃতিও মোল্লারাই পরিচালনা করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ও বাচ্চাদেরকে মোল্লারা ইসলামের আইন ও আদর্শ শেখান। তারা ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে স্থানীয় ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করেন এবং আরো বহুবিধ শারীরিক সামাজিক ব্যক্তিগত সমস্যায় মোল্লাদেরকে ডাকানো হয় উপদেশ ও সমাধানের জন্য। এমনকি চিকিৎসা ঔষধপত্র স্থানীয় পর্যায়ে পান নিয়ে হাঙ্গামা পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদির বেলায়ও লোকজন মোল্লাদের ওপর নির্ভর করে। কিছু কিছু প্রত্যন্ত পল্লীতে স্থানীয় মোল্লা আর স্থানীয় খান (জমিদারভূস্বামী) ঠিক করে দেয় সেখানকার লোকজন কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না।

গ্রামের মসজিদটিই ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এটি প্রায়ই গ্রামের অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাম্প্রতিক কালে ধর্মের নামে সনাতন রীতিনীতি আচার-আচরণ আবার ফিরে এসেছে আফগানিস্তানের সমাজে। এগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তালিবান এবং অন্যান্য মৌলবাদী বিদ্রোহী দলগুলোর দ্বারা। এর ফলে নারীদের কাজকর্মের ওপর বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নারীকে করা হয়েছে আরো অবরুদ্ধ। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ খবর দিয়েছে ২টা নতুন অধ্যাদেশ আফগানিস্তানে জারী হয়েছে – আফগান নারীদের আচরণের/গতিবিধির ওপর বোরখা পরার ওপর, পারফিউম ব্যবহারের ওপর এবং পুরুষ সঙ্গী ছাড়া নারীর ঘরের বাইরে যাওয়ার ওপর। নব্বইয়ের মাঝামাঝি থেকে নারীদেরকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে এসব বিধিনিষেধ লংঘন করার জন্য যা গত শতক ধরে দমিত ছিল।

শিক্ষা: সনাতন ও অর্বাচীন

আফগানিস্তানে দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। একটা হলো সনাতন ধর্মীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় শিক্ষক হলেন মোল্লারা। তাঁরা গ্রামের মসজিদগুলোতে স্কুল বা মক্তব পরিচালনা করেন। তাঁরা কোরানের ধর্মীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে শিক্ষা দেন। সেইসাথে তারা পঠন লিখন এবং গণিত শিক্ষার অনুশীলন করান।

আফগানিস্তানের নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটি ১৯৬৪ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত হয়। সংবিধানে সকল পর্যায়ের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হয়। এই লক্ষ্য অবশ্যই কমই পূরণ করা গেছিল। ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়। গৃহযুদ্ধের আগে মর্যাদাসম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবৈতনিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৮ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে এর অধীনে আরো নয়টা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কলেজের জন্য সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় ফ্র্যান্স, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, শিমর এবং রাশিয়ার মতো দেশগুলোর কাছ থেকে। আগে শুধু পুরুষরাই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারত। নতুন ব্যবস্থায় সকল ফ্যাকাল্টিতে বা অনুষদে ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা চালু করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ড শিক্ষা

করার জন্য জালালাবাদ নোঙ্গরার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে।

১৯৭৮ সালে কম্যুনিস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের আগে পাবলিক বা সরকারী স্কুলব্যবস্থা ছিল পশ্চিমা মডেলের ধাঁচে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। কাবুলে এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে মাধ্যমিক স্কুল ছিল। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং পাঁচ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা সবাই লাভ করবে এরকমটাই ছিল প্রত্যাশিত যদিও অনেক আফগানই স্কুলে যেতে পারত না। কারণ তারা যেসব এলাকায় বাস করতো সেখানে কোনো স্কুল ছিল না।

১৯৬৮ সালের রিপোর্ট অনুসারে আফগানিস্তানের প্রাথমিক স্কুলে যাবার মত বয়সের মোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫২ শতাংশ স্কুলে নাম লিখিয়েছিল। মাধ্যমিক স্কুলে যাবার মত বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ২২ শতাংশ স্কুলে গেছে। ১৫ বছরের বেশী বয়সের সমস্ত আফগান লোকজনের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৫৮ – এটা ২০০১ সালের হিসাব – এদের মধ্যে পুরুষ ৭৪ শতাংশ আর নারী ৪৪ শতাংশ। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন এসব সংখ্যা একটু বেশী বেশীই কেননা এই সময়কালে ৮০ ভাগেরও বেশী স্কুল যুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। গৃহযুদ্ধের কারণে নিম্নমধ্য এবং উচ্চতর পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষাসুবিধার বেশীরভাগটা বন্ধ হয়ে গেছে না হয়ত নষ্ট হয়েছে। ১৯৭৮ সালের অভ্যুত্থানের পর কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬ জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে, দেশ থেকে পালিয়েছেন ২৬০ জন।

সামাজিক জীবনযাত্রা

আফগান জনগণ নানা ধরনের বহু স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হলেও জীবনযাত্রার কিছু কিছু উপাদন তাদের একই রকমের।

স্বভাবের দিক থেকে আফগান সমাজে পরিবারই মূল। পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধন দেখা যায় যেখানে নানা প্রজন্মের সদস্যরা বাস করে। পরিবারের সবচাইতে প্রবীণ ব্যক্তি বা পিতামহের নির্দেশেই পরিবার পরিচালিত হয়। তাঁর কথাই সমস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে আইন।

পারিবারিক সম্মান, গর্ব এবং অন্যদের প্রতি সম্মান দেখানো এগুলো অত্যন্ত দামী গুণাবলী হিসেবে বিবেচিত হয়। যাযাবর ও গ্রামবাসী উভয়েরাই পরিবারে একত্রে বসবাস করে এবং একটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরী করে। গ্রামের প্রতিটি পরিবারই সাধারণতঃ একটা ইট-কাদর ঘর বা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ইট-মাটি বা পাথুরে-দেয়ালের ঘর বানায়।

১০০টার কম বাসা নিয়ে গঠিত এরকম বসতির সংখ্যা ১০ হাজারের ওপরে এবং ১০০টা থেকে ২৫০টা বাসা নিয়ে গঠিত এরকম মাত্র এক হাজারটা বসতি আফগানিস্তানে দেখা যায়। আফগানিস্তানে ৫৩টি শহর আছে যেগুলো ২৫ শ' থেকে ২৫ হাজার মানুষের জন্য বিন্যস্ত।

ছোট গ্রামগুলিতে কোথাও কোন স্কুল নেই, গুদাম নেই এমনকি সরকারের কোনো প্রতিনিধি নেই। প্রতিটা গ্রামেই তিনটা কর্তৃত্ব করার উৎস থাকে এদের মধ্যে আছে: মালিক যিনি গ্রামের মাথা বা প্রধান, মিরার যিনি পানি-বন্টনের দায়িত্বে থাকেন এবং মোল্লা যিনি ইসলামিক আইনের শিক্ষক সাধারণভাবে একজন 'থান' যিনি প্রচুর জমির মালিক তিনিই সমস্ত গ্রামকে শাসন করেন মালিক এবং মিরার উভয়ের কাছ থেকে আইনের ধারণা নিয়ে।

আফগানিস্তানের গ্রামের লোকেরা পোষাক হিসেবে সূতির ব্যাগি ট্রাউজার পরে। পুরুষেরা তার ওপরে লম্বা ঝোলানো সূতির শার্ট পরে থাকে। তারা কোমরের চারপাশে বিস্তৃত কাপড়ে জড়িয়ে রাখে (উর্দির অংশ হিসেবে বা সৌন্দর্যের জন্য) এছাড়া তারা মাথায় টুপি পরে যার ওপরে থাকে পাগড়ি (মাথার সঙ্গে লেগে থাকে)। মাঠে কাজ করার সময় তারা এই পাগড়ি খুলে রাখে। আফগান মেয়েরা লম্বা, ঢোলা শার্ট বা লম্বা অন্তর্বাস পরে ঘূর্ণ্যমান স্কার্টের সাথে

ট্রাউজারের ওপর। মেয়েরা চওড়া শাল দিয়ে তাদের মাথা ঢাকে।

সম্পদশালী পরিবারের মেয়েরা গয়না পরে। শহরের মেয়েরা যখন বাড়ী ছেড়ে বের হয় তখন তারা মুখ থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা তাঁবুর মত বোরখা পরিধান করে।

গ্রামের মেয়েরা কদাচিত বোরখা পরে। শিক্ষিত শহরের মেয়েরা এই প্রথার অমান্য করেছিল বিশেষ করে সোভিয়েত শাসনামলে যেখানে বোরখা পরাটা পশ্চাদপদ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। মেয়েরা যারা তালিবানি শাসন-এলাকাতে বাস করে সেখানে জোর করে তাদেরকে জনসম্মুখে বোরখা পরাতে বাধ্য করা হয়।

অধিকাংশ গ্রামের আফগান জনগণের দৈনন্দিন প্রধান খাদ্য হচ্ছে নান রুটি, স্যুপ, একধরণের দই বা ঘোলজাতীয় পদার্থ যার নাম মাস্ট, শাকসবজী, ফল আর মাঝে মধ্যে বিশেষ উপলক্ষে খাদ্য তালিকায় থাকে ভাত-মাংস। চা আফগানদের প্রিয় পানীয়।

ফসল কাটা ও ঘরে তোলার মরশুমে নারী-পুরুষ একত্রে মাঠে কাজ করেন। পরিবারের বড় শিশুরা পশুর পালের যত্ন নেয়, তারা ছোট শিশুদেরও দেখাশুনা করে থাকে।

বছরে দুবার যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষেরা গ্রামের মধ্য দিয়ে গ্রীষ্মকালে উঁচুজমীতে আর শীতকালে নীচুজমীতে আস্তানা গড়ে – পশুচারণের জন্য। গ্রামবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবেই তাদের ফসল কাটা হয়েছে এমন মাঠগুলোতে যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষদের পশুচারণ করতে অনুমতি দিয়ে থাকে যেখানে পশুর পাল জমিকে উর্বর করে সার জমানোর মধ্য দিয়ে। যাযাবর লোকেরা গ্রামবাসীর কাছ থেকে চা, গম, কেরোসিন কিনে সরবরাহ করে আর গ্রামবাসীরা যাযাবরদের কাছ থেকে পশমী সুতা, দুগ্ধজাত সামগ্রী কিনে থাকে। যাযাবর জনগণ দুগ্ধজাত সামগ্রী মাংস পশম এগুলোর জন্য তাদের পশুদের ওপর নির্ভর করে, এসব বস্তুসামগ্রী পরিবহণের জন্যও তারা তাদের পশুপালের ওপর নির্ভর করে। যাযাবর মেয়েরা গ্রামের মেয়েদের চেয়ে স্বাধীন আর কম নিঃসঙ্গ।

উত্তরাঞ্চলে আফগানদের একটা প্রিয় খেলা হলো ‘বুজকামি’। এ খেলায় যে দলগুলো অংশ নেয় তারা ঘোড়ায় চড়ে প্রতিযোগিতা করে একটা বড়সর ধরহীন বাছুরকে গোলপোস্টে জমা রাখতে প্রতিযোগিতা করে এ খেলাটিতে। এটা আফগানিস্তানের একটা পুরোনো খেলা। আফগানদের অন্যান্য খেলাধূলার মধ্যে রয়েছে পলো এবং খোসাই। এ খেলাগুলোর সাথে রেসলিং এর মিল রয়েছে।

‘নওরোজ’ আফগানদের খুবই গুরুত্বপর্ণ উৎসব। বসন্তের প্রথম দিনে তারা এ দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে।

দারী ও পশতু সাহিত্য

দারী এবং পশতু উভয় ভাষায় সাহিত্য বিকশিত হয় মুসলমান শাসনের প্রথম শতকগুলোতে। তখন আরবী ভাষাও ব্যবহৃত হতো। ফার্সী কবি ফেরদৌসীর ১০১০ সালে লেখা বিশাল মহাকাব্য ‘শাহনামা’ (বাদশাদের কেতাব) দারী ভাষায় রচিত ৬০ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট। এর পাশাপাশি অন্য অনেক কবিতা ও গল্প দারী এবং তুর্কী ভাষায় লেখা হয়েছে। খুসাল খান খাত্তাক সতের শতকের কবি এবং যোদ্ধা। কৌম সমাজের বিধিবিধান বর্ণনা করার জন্য তিনি পদ রচনা করতেন। সাম্প্রতিক রচনাগুলো স্বদেশের যুদ্ধ ও ধ্বংস আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে আর পর্যালোচনা করেছে ইতিহাস ও আধুনিকতাকে। সাঈদ বুরহানউদ্দিন মাজরু ধ্রুপদী ছন্দময় দারীগদ্যে কয়েক খণ্ড কেতাব লিখেছেন ১৯৭২ সালে। ওখানে একজন মুশাফিরের কথা বলা হয়েছে যে তার স্বদেশী লোকজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রবাসে যায়, সেখানে তারা

ভাববিনিময় করে আর প্রাচীনকাল থেকে এযাবত যত আখ্যান-উপাখ্যান আছে সেগুলোকে সাম্প্রতিককালের যুক্তি, প্রভা, বিজ্ঞান এবং মনোবিশ্লেষণ-এর আলোকে পর্যালোচনা করে। সোভিয়েত-যুদ্ধের দিনগুলোতে লেখালেখির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ইসলাম এবং স্বাধীনতা – এই যুগল উদ্বেগ।

কবিতা: রক্ত, প্রেম আর দরবেশী অনুধ্যান

আফগানিস্তানের কবিতা ও কবিরা জগত-শ্রদ্ধেয়। শত শত বছর ধরে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর শিকার হওয়া সত্ত্বেও এবং কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আফগানদের শিল্পকলা সুবিকশিত হয়েছে। আফগানিস্তানের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সুফীবাদের বীজ। দেশটিতে ইসলাম আর সুফীবাদ পরস্পর গলা জড়িয়ে অবস্থান করে আছে। সারা দেশে অসংখ্য মাজার আছে। আফগানিস্তানের কবিতার মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় সুফীবাদের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। জগৎখ্যাত সুফী মহাকবি জালালউদ্দিন রুমির জন্ম আফগানিস্তানের বল্‌খ প্রদেশে। ইসলাম এবং মহাজাগতিক অর্থানুসন্ধান ছিল তার রচনার উপজীব্য। আফগানিস্তানের আরো উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আছেন খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি, লতিফ নিজামি, দাকিকি-ই-বল্‌খ, বাহার সায়িদ, খলিলুল্লাহ খলিলি, আবু শুকুর-ই-বল্‌খ, রাবিয়া বল্‌খি, খুসাল খান খাত্তাক, আহমেদ শাহ দুররানি প্রমুখ। আমরা বেশ কিছু আফগান কবিতা পড়তে যেয়ে দেখি কবিতাগুলোতে নানাভাবে মানুষের জগত-জীবনের আধ্যাত্মবাদী চিন্তা-চেতনা, প্রেমভাব ও যুদ্ধের অনুষঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। আফগান কবিদের কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা আফগানিস্তানের সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল চেহারা দেখতে পাই যার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান আমাদের কাছে ভিন্ন রূপে উপস্থিত হয়।

সঙ্গীত: উপত্যকায় বাতাসের সুর

সঙ্গীতের প্রধান ধারাগুলো হচ্ছে লোকগান, গাথা এবং নাচ। অনেক রকমের তারযন্ত্র আছে তার মধ্যে ছয়তারের 'রোহাব'কে পশ্চিমা বেহালা ও মেলো- এর পূর্বসূরী মনে করা হয়। অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে আছে সন্তর, চ্যাং, হার্প, প্লাকট (হাতে পাম্প করা মুখে বাজানোর এক প্রকার যন্ত্র), হারমোনিয়াম, বিভিন্ন রকমের ঢোল।

প্রাচীন আফগানিস্তানে মূলত তিন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছিল dandwehi, wanaa, yunaa। এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে বাঁশী; এখন একে বলা হয় toula। wanaa কে বলা হয় তার-যন্ত্র। আর yunaa হলো নীচু খাদের স্বরযুক্ত যন্ত্র। একে বলা হয় dowl। ৪ হাজার বছর আগে প্রথম অ্যারিয়ানা-রাজ ইয়ামা'র রাজদরবারে এসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো। এগুলোর মধ্যে বাঁশী হচ্ছে সবচাইতে প্রাচীনতম ও সরলতম যন্ত্র। এখনও সারা আফগানিস্তান জুড়ে এর প্রচলন আছে। আমাদের দেশের মতো আফগানিস্তানেও বাঁশীটাকে রাখালিয়া মনে করা হয়। বাঁশী কাঠের তৈরী হয় ও বিভিন্ন রং করা হয়ে থাকে। উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের সবচাইতে পুরোনো যন্ত্রের নাম তার (tan) এখনও সবচেয়ে সরল তারযন্ত্রে দুটো তার থাকে যা নূরীস্তানের গ্রামে প্রচলিত। নূরীস্তানের মানুষ যে গান ও সুর গেয়ে থাকে সেগুলো গত ৪ হাজার বছর পর্যন্ত বদলায়নি। নীচু খাদযুক্ত স্বরের যন্ত্র যা সারা আফগানিস্তানে প্রাচীন ও বর্তমানকাল জুড়ে জনপ্রিয় তা হলো ঢোল। আফগানরা যে 'তার' যন্ত্রটি ব্যবহার করে তা দেখতে অনেকটা আমাদের দোতারার মত। আফগান পল্লীর প্রতিদিনকার জীবনে, বিয়েতে, কাজেকর্মে বা কৃষিতে ঢোল

নিয়মিত বাজানো হয়। আর সবসময়ই সেই প্রাচীনকাল থেকে এর সঙ্গে থাকে attan (নাচ) বা জাতীয় নাচ। 'আতান' আসলে পশতুন এলাকার নাচ পরে এটা জাতীয় নাচে পরিণত হয়েছে। বড় বৃত্তাকারে এ নাচ হয়ে থাকে। সবাই এই সময় হাততালি দেয় এবং ঢোলের তালে তালে দ্রুত তাল লয় পরে হতে থাকে। জাতীয় নাচের সাথেও ঢোল বাজানো হয়। কালের বিবর্তনে এই তিনটা অদ্বিতীয় যন্ত্র বিভিন্ন রূপ লাভ করতে থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। tan বিবর্তিত হয়ে বিচিত্র রূপ লাভ করে দোতারা, সেতার, শাশ্তার, তাম্বুরা এবং পশ্চিমে গিয়ে এটি রূপ লাভ করে গীটারের। এখানকার প্রাচীন বাঁশী (প্রাচীন উত্তর আফগানিস্তানে যা উৎপত্তি লাভ করেছিল) toula সিল্ক রোড হয়ে চীনে যায়। কথিত আছে যে, প্রাচীন গিরিপথ ও উপত্যকা যখন এইসব ছন্দবদ্ধ যন্ত্রের সুরে-স্বরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে কিংবা যখন আপনি রাতের আফগান উপত্যকায় বাতাসের সুর শুনবেন আপনি শুনবেন প্রাচীন সুষম সেইসব সুর যা বাতাসে বয়ে চলেছে।

গল্প: কথন ও শ্রুতির ঐতিহ্য

গল্প বলা একটা প্রাচীন পুরোনো সংস্কৃতি যা এখনও আফগানিস্তানে বিকশিত হয়ে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম বলেই লোককথা বলা আজও আফগানিস্তানে একটা চলমান সংস্কৃতির ধারা হিসেবে ক্রিয়াশীল। লোককথা বলার এই প্রাচীন অভ্যাসে গান আছে, কথা আছে। এটা অত্যন্ত উন্নতমানের একটা শিল্পের রূপ যা আফগান জনগণের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্যের বিষয়। আফগান-জনসংস্কৃতিতে সেই মালা যোগসূত্র রচনা করে অতীতের সঙ্গে বর্তমান আফগান সমাজের। আফগান-জীবনের সমস্ত দিকই সম্পর্কিত এই লোককথাগুলিতে। এগুলো প্রায় ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আচার-আচরণ শেখায়। আফগানিস্তানের জনগণের বিনোদনের এগুলো একটা বড় রূপ।

গল্পবলার প্রাচীন শিল্পরীতিটি যে আফগানিস্তানে এখনও প্রাণবন্ত তার একটা কারণ ব্যাপক অনক্ষরতা। বহু যুগের পুরানো লোকগল্প বলার এই রীতি অত্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে। গান এবং মুখের কথা সহযোগে গঠিত এই আঙ্গিকটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। ফোকলোরের ব্যবহারই আফগান সমাজের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার উপায়। এইসব গল্পে সনাতন মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আচরণ শেখানো হয়। এসব গল্প আফগানিস্তানের বিনোদনেরও একটা প্রধান রূপ।

হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র কারুকাজ এবং স্থাপত্য

আফগানরা যা বানায় তাই আকর্ষণীয় হয়। এমনকি প্রতিদিনের বাজারে শষ্য নিয়ে যাওয়ার যে বস্তা সেটা পর্যন্ত এম্ব্রয়ডারি করা থাকে সেগুলোকে আরো সুন্দর দেখানোর জন্য। যাযাবররা যখন উটের কাফেলা নিয়ে যায়, দেখতে সার্কাস-শোভাযাত্রার মত লাগে, আর তাদের সঙ্গের জন্তুগুলিকেও তারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পোষাক পরিচ্ছদে সাজায়। সূক্ষ্ম ক্যালিগ্রাফি এবং গ্রাফিক আর্টের ইসলামী ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে ভবন সজ্জরি। এমন রীতি যাতে সোনা-রূপা ইত্যাদির মিহি সুতা দিয়ে করা আলঙ্কারিক কারুকাজের নক্শা করে ভবন সাজানো হয়।

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে আছে হালকা নীল সবুজ রঙের জাকজমকপূর্ণ আগুনে পোড়ানো টালির কাজ। হেরাতে এই কাজ বিশেষভাবে খ্যাত। অন্যান্য সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের মধ্যে আছে পুস্তক চিত্রায়ন, তামা কাঠের পাথরের নানাবিধ সূক্ষকর্ম। আফগানদের সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য

হলো সনাতন শিল্প-সঙ্গীত আর অবসরবিনোদনমূলক নানান অনুসঙ্গ। সোনা আর রূপার অলঙ্কার দুর্দান্ত অলঙ্কৃত এ্যম্ব্রয়ডারি, নানা কিসিমের চামড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদি ঘরে তৈরীর রীতি এখনও বর্তমান। পারস্য স্টাইলে বোনা আফগানিস্তানের কার্পেট সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত।

আফগানিস্তান সকল যুগের বিস্ময়কর স্থাপত্য ধারণ করে। গ্রীক ও বৌদ্ধস্তূপসমূহ, বিহার, মিনার, তোড়ন বা খিলান, স্মৃতিস্তম্ভের নানাবিধ সৌধ, ইসলামী মিনার আর নানাবিধ মন্দির ও দূর্গ ভরা একদেশ আফগানিস্তান। সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গাগুলোর মধ্যে আছে হেরাত এবং মাজার-ই-শরীফের বিশাল মসজিদ। পশ্চিম দিকের মাঝ বরাবর উচ্চ ভূমিতে ‘জাম’ নামক স্থানে মসজিদের মিনার ১ হাজার বছরের পুরানো কালের কালে-ই-বোস্ত এর মহাখিলান চেলযিনা (৪০ সিঁড়ি) এবং মুঘল বাদশাহ বাবর কর্তৃক কান্দাহারে উৎকীর্ণ শিলালিপি, সম্প্রতি ধ্বংসপ্রাপ্ত বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি, গজনীর বিজয়স্তম্ভ, বাদশাহ বাবরের সমাধি আর কাবুলের বিশাল বালাহিসার দূর্গ।

প্রবাদ, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার: জনসংস্কৃতির অকাট্য বিবরণী

মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী তীক্ষ্ণভাবে ও রূঢ়ভাবে ফুটিয়ে তোলে তার ‘প্রবাদের’ মধ্য দিয়ে। এগুলো সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত সৃষ্টি যা স্মৃতি ও শ্রুতির মধ্য দিয়ে টিকে থাকে অনেককাল। এ প্রবাদের মধ্য দিয়ে কোনো দেশের সাধারণ মানুষের জীবনজগত ও জগত বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গিগত জ্ঞানের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

আমরা এখন এমন কতকগুলো আফগান প্রবাদ উল্লেখ করব যেগুলির মধ্য দিয়ে পশ্চাদপদ দুর্বল একটি দেশের মানুষের শক্তিশালী কিছু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য আলোকিত হয়ে উঠবে। এ প্রবাদ রচয়িতারা সকলই আফগান – সকলেই মুসলিম কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় এরা সবাই হলো মানুষ – সমাজের দেশের একেবারে ক্ষমতাহীন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবর্জিত সাধারণ মানুষ যারা জাতিতে মুসলমান হলেও তাদের লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবনাভিজ্ঞতার্জিত জ্ঞানের পরিচয়ই উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেন – তারা ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষ যার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ দেশের দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি ও তাদের জ্ঞানলাভের প্রতিনিধিত্ব করে তাদেরই জনসংস্কৃতির পরিমণ্ডল।

বেকন বলতেন কোনো জাতির প্রতিভা, রসজ্ঞান এবং ধাত বুঝতে হলে সকলের আগে তাদের প্রবাদবাক্যগুলি পড়তে হয়। নীচে আফগান জাতির কতকগুলি প্রবাদ-বাক্য দেওয়া গেল। এ থেকে তাদের প্রকৃতি-পরিচয় অনেকটা পাওয়া যাবে বোধ হয়।

১. বন্ধু যদি চোর হয় তবে নিজের গাধাটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখবে।
২. পাখী খাবার জিনিস সহজেই দেখতে পায়, কিন্তু ফাঁদ দেখতে পায় না।
৩. মাথার উপরে খোলা তলওয়ার না দেখলে আল্লার কথা মানুষের মনে পড়ে না।
৪. অনেকগুলো কালো জিনিসের মধ্যে একটা শাদা জিনিসকে খুব বেশী শাদা দেখায়।
৫. মা বাঘিনী হলেও নিজের সন্তানের মাংস খায় না।
৬. গাধা বুড়ো হলেও মালিকের বাড়ী চেনে না।
৭. যে ঝগড়া-বিবাদ-প্রিয় সে একসাথে দুই বিয়ে করে।
৮. নিজের বুদ্ধিটাকেই মানুষ সবচেয়ে বড় ভাবে।
৯. খেঁকশিয়ালী নিজের ছায়াকে অত্যন্ত বড় মনে করে।
১০. পাঁকের ভিতরে স্থির হয়ে যে দাঁড়িয়ে থাক সেই বেশী ডুবে যায়।

১১. এইমাত্র যে আকণ্ঠ পোলাও খেয়েছে ক্ষুধার্থের মর্ম সে কি ঝুঝবে?
১২. মুরগী না ডাকলেও রাত পোহায়।
১৩. যে-ঘাস ষাঁড়ে খায় তাতেই আবার গাধার কান কাটে।
১৪. মেঘ দেখতে কালো হলেও তার জল শাদা।
১৫. মুসাফিরের দুনিয়াই হচ্ছে সরাইখানা।
১৬. নিজের পেট পরের খাবার জিনিষ নিয়ে বেশী বোঝাই করো না।
১৭. যার বগলে কোরান সেও পরের ষাঁড় দেখে লোভ করে।
১৮. ক্ষ্যাপা কুকুর নিজেকেও কামড়াতে ছাড়ে না।
১৯. সামান্য একটা পেঁয়াজও ভালোমুখে মানুষকে দিতে হয়।
২০. ভালুকের বন্ধুত্ব আঁচড়-কামড়ের নিমিত্তই হয়ে থাকে।
২১. যে ভালোবাসে সেই পরিশ্রম করে।
২২. চোখ দুটো বড় হলেও আমরা দেখতে পাই ছোট ছোট দুটি তারকার ভিতর দিয়ে।
২৩. বর্শার আঘাত সাংঘাতিক হলেও সহজে সারে, কিন্তু মানুষের জিহ্বার আঘাতে মনে যে ঘা হয় তা কখনো সারে না।
২৪. বেকুবের বন্ধুত্ব ভালুকের আলিঙ্গনে তুল্য।
২৫. গাধার বন্ধুত্ব, লাথি খাওয়ার হেতু ভিন্ন আর কিছুই নয়।
২৬. যে ভোগ করে বাস্তবিক পক্ষে ধন তারি – যে সঞ্চয় করে, পাহারা দিয়ে রাখে, তার নয়।”
২৭. ঘরের মত কোন জায়গা নেই।
২৮. কাঁটা ছাড়া গোলাপ নেই।
২৯. বাতাস ছাড়া গাছ নড়ে না।
৩০. এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে যাবার রাস্তা থাকে।
৩১. এমনকি সবচাইতে উঁচু পাহাড়ে যাবারও রাস্তা আছে।
৩২. যে গাধা তোমার না তাকে তুমি থামিও না।
৩৩. একটি শুভ বছর নির্ধারিত হয় এর বসন্তকালের মাধ্যমে।
৩৪. ফুলের মত বিকশিত হও কিন্তু তোমার জীবন ফুলের চেয়েও লম্বা হোক।
৩৫. না-ধরা চড়াই পয়সায় পঁচিশটা পাওয়া যায়।
৩৬. তুমি যাই রোপণ করবে তারই ফসল পাবে।
৩৭. মানুষের সঙ্গে বেড়ে ওঠলেও নেকড়ের বাচ্চা নেকড়েই হবে।
৩৮. সজারুর বাচ্চাও তার মায়ের কাছে সবচাইতে আদরের।
৩৯. প্রকৃত বন্ধু একজনই হয় যে তার বন্ধুর বিপদে পাশে থাকে।
৪০. প্রথম দেখায় বন্ধুত্ব, দ্বিতীয় দেখায় ভ্রাতৃত্ব।
৪১. এটা একইরকম গাধা, কিন্তু নতুন জিনযুক্ত।
৪২. ঝুঁকে মড়া বোঝা তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।
৪৩. গাধার সামনে বাইবেল।
৪৪. একফুলে বসন্ত আসে না।
৪৫. পানি পরীক্ষা না করে জুতা খুলো না।
৪৬. ঘরে সিংহ বাইরে শেয়াল।
৪৭. সাপের কামড় যে খেয়েছে সে রশিতেও ভয় পায়।
৪৮. তোমার কম্বলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তোমার পা প্রসারিত কর।
৪৯. না কাঁদলে মা তার শিশুকেও দুধ খাওয়ান না

৫০. সব জ্বালাই পার করা যায় ক্ষুধার জ্বালা ছাড়া।
৫১. হাতের পাঁচ আঙ্গুল ভাই, কিন্তু তারা সমান নয়।
৫২. শোনা কখনো দেখার চেয়ে ভাল নয়।
৫৩. ভাঙ্গা হাত কাজ করতে পারে কিন্তু ভাঙ্গা-মন পারে না।
৫৪. রুটি আর পেঁয়াজ থাকলেও মুখ উজ্জ্বল রাখ।
৫৫. তুষারহীন কাবুলের চেয়ে স্বর্ণহীন কাবুল ভাল।
৫৬. শিশুর কাছে সত্য জিজ্ঞাসা কর।
৫৭. খৃষ্টান ও ইহুদীদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দাও।
৫৮. রক্ত দিয়ে রক্ত ধোয়া যায় না।
৫৯. চালনী ঝাঝরকে বলে তোমার গায় ফুটা।
৬০. অধিক কসাই গরু নষ্ট করে।
৬১. চুরি করো না তাহলে রাজাকে ভয় পাবে না।/চোর হয়ো না, রাজাকে ভয় পেয়ো না।
৬২. তুমি এক হাতে তালি বাজাতে পারবে না।
৬৩. ফোটা ফোটা জলে নদী তৈরী হয়।
৬৪. বোকা বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভাল।
৬৫. আশা নিয়েই পৃথিবী বেঁচে থাকে।
৬৬. বোকার প্রতি সঠিক উত্তর হলো নিরবতা।
৬৭. একজনও বলবে না তার নিজের ঘী টক।
৬৮. গরম আগুন যেকোনো উপাদেয় খাবারের চেয়ে ভাল।
৬৯. সস্তা ভিনেগার মধুর চেয়ে মিষ্টি।
৭০. যে কোনঠাসা হয়ে আছে সে লড়াই করবে।
৭১. ধৈর্য্য তিক্ত কিন্তু এর ফল মিষ্টি।
৭২. তোমার নিজের সম্পত্তি নিজেই দেখাশোনা কর, তাহলে আর প্রতিবেশীকে চোর সাব্যস্ত করতে হবে না।
৭৩. শেয়াল তার নিজের মাংস নিয়েই বিপদে।
৭৪. তারা শেয়ালকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্বাক্ষী কে?' সে তখন বলল, 'তার লেজ'।
৭৫. লবণ মাংসকে সংরক্ষণ করে কিন্তু লবণ যদি খারাপ থাকে তাহলে এটা কী করবে?
৭৬. নতুন ভৃত্যই ছুটন্ত হরিণকে ধরতে পারে।
৭৭. দেয়ালের ইঁদুর আছে আর ইঁদুরের কান আছে।
৭৮. খারাপ লোহা কখনোই ধারালো তলোয়ার বানাতে পারে না।
৭৯. এমনকি সোনার তৈরী চাকু হলেও কেউ তা দিয়ে নিজের হৃদয়কে আঘাত করে না।
৮০. ঋণ ভালবাসাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।
৮১. কুমার ভাঙ্গা জগ থেকে পানি পান করে।
৮২. তাড়াহুড়োর কাজ সাফল্য বয়ে আনতে পারে না।
৮৩. অতীত ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের খোঁজ কর।
৮৪. সেই ব্যক্তিকে ভয় কর যে আল্লাহকে ভয় করে।
৮৫. আমার দুঃখে নুন ছিটিয়ো না।
৮৬. যদি না আল্লাহ পারে ডাক্তার কী করতে পারে?
৮৭. যে দৌড়ে সেও পড়ে।
৮৮. অন্যের ওপর নির্ভরশীল একটি হাত যেন খোদা না বানায়।

৮৯. মিথ্যাবাদী ভোলার যোগ্য।

৯০. বনে আগুন লাগলে ভেজা শুকনা সবই পুড়বে।

৯১. পানি যখন তোমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে তখন এক ফ্যাদমই কী আর একশ ফ্যাদমই কী?

৯২. যে খোঁজে সেই পায়।

৯৩. আমাদের প্রার্থনা আল্লার দরকার নাই।

৯৪. কম কথা, বেশী কাজ।

৯৫. সম্প্রদায় কখনো শক্তি দিয়ে বানানো হয় না।

৯৬. যে নিজেকে খান বলে দাবী করে সে খান নয়।

৯৭. ভাই-ভাই এর মধ্যে টাকা পয়সার হিসাবে বোঝাপড়া থাকা উচিত।

৯৮. যদি তুমি আমাদের সঙ্গে বস আমাদের মত পাবে, যদি তুমি রান্নার পাত্রের পাশে বস তাহলে কালো হবে।

৯৯. আমি এমন একজনকে বিপথে যেতে দেখিনি যে সত্যের পথ অনুসরণ করছে।

১০০. মহিমা শুধু ঈশ্বরেরই।

১০১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাঙ্গ।

১০২. যদি তুমি আল্লাহকে স্বীকৃতি দাও অন্তত তাকে তার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে জান।

১০৩. যাকে চিনি দিয়ে মারা যায় তাকে বিষ দিয়ে মারার দরকার নাই।

১০৪. যা গর্জন করে তা বর্ষে না।

১০৫. যা তুমি নিজের মধ্যে দেখ তাই তুমি পৃথিবীতে দেখ।

১০৬. মানুষ বিচলিত হলে ঈশ্বর উপকৃত হন।

১০৭. ফুটা চালের নীচে থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিতে বসা।

১০৮. এক হাতে দুই তরমুজ নেয়া যায় না।

১০৯. আমি যাই চাই আমার ড্রাম তা করে না।

১১০. খারাপ ক্ষত সেরে ওঠে কিন্তু খারাপ কথা সেরে ওঠে না।

১১১. তার বলের নীচেও একটা ছোট বল আছে।

১১২. যে গর্তে একবার পানি প্রবাহিত হয়েছে তা আবার প্রবাহিত হবে।

১১৩. স্মার্ট লোকজন এক ইশারাতেই মোদ্দাকথা ধরতে পারে।

১১৪. যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বোকারা আছে কেউই কপর্দকশূণ্য হবে না।

১১৫. কর্মের মধ্যেই আশীর্বাদ আছে।

১১৬. ভালো সুগন্ধী পারফিউমারের বিজ্ঞাপনের চেয়ে তার নিজস্ব গন্ধেই পরিচিত হয়।

১১৭. যেখানে নিয়মানুবর্তিতা সেখানে সামাজিক বিশ্বাস আছে।

১১৮. তার মাথা চুলকানোর পর্যন্ত সময় নাই।

১১৯. শৈশবে তুমি খেলা প্রবণ হও, যৌবনে তুমি কামনা প্রবণ হও আর বার্ধক্যে তুমি দুর্বলময় হও – তুমি তাহলে উপাসনাপ্রবল হবে কখন?

১২০. সে একশত মাথা ভেজালেও একজনকে কামাতে পারে না।

১২১. ভেরীবাদকের কাজ কী? বাজানো।

১২২. অদ্ভুতভাবে প্রতিপন্ন হতে না চাইলে জনতার দিকে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন কর।

১২৩. দেয় মাপমত; হিসাব নেয় আউন্স-মতো।

১২৪. আল্লাহ বলেছেন, 'খাও এবং পান কর', কিন্তু তিনি বলেননি গলা পর্যন্ত ভরতি কর।

১২৫. একটা আনবিক যুদ্ধ তোমার সমস্ত দিনকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

১২৬. নদীর জল কুকুর খেলেও ঘোলা হয় না।

এইসব প্রবাদ নিয়ে নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করলে করা যেতে পারে অবশ্যই। কিন্তু প্রবাদগুলোর সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত প্রবাদের চমকে দেবার মতো সাদৃশ্যই এইটুকু বোঝানোর জন্য যথেষ্ট যে, আফগানিস্তানের জনমানুষের মনন বাংলাদেশের মতো একটা দেশের চেয়ে আলাদা কিছু নয়; অন্তত এমন কোনো কিছু নয় যাতে করে তাদেরকে 'একটা আলাদা জাতের মানুষ' বলে বিশ্বময় কুৎসা রটনা করে বেড়ানো যেতে পারে।

এবারে আফগানিস্তানের প্রচলিত কতকগুলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের নমুনার দিকে তাকাবো।

১. 'magpie' (কিচির-মিচির করা এক ধরনের পাখী) কারোর বাড়ীর দেয়ালে বসলে মনে করা হয় কোনো খবর আসবে।
২. মাথার টাক ঢেকে রাখলে বৃষ্টি নামে।
৩. কাঁচি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে যুদ্ধ ঘটে।
৪. নতুন চাঁদের দিকে তাকিয়ে শিশুর মুখ দেখলে সে মরে যেতে পারে।
৫. চন্দন জ্বালানো কাঠকে আঘাত করলে বৃষ্টি আসে।
৬. বাম পাশ থেকে যে জেগে ওঠে তাকে দেখতে উদ্বিগ্ন, অসুখী আর নোংরামুখ দেখায়।
৭. নিজের জিবে কামড় লাগা মানে কেউ একজন অবশ্যই পাল্টা কামড় দিচ্ছে।
৮. হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলে অতিথি আসে।
৯. পানি শব্দ করে গড়িয়ে গেলে অতিথি আসে।
১০. তুমি যখন কোথাও এমন সময়ে পৌঁছাও যখন অন্যরা তাদের খাবার সবে শুরু করে এর অর্থ তোমার শ্বাশুড়ী তোমাকে খুব পছন্দ করবে।
১১. মাটিতে দাগ কাটলে ঋণগ্রস্ত হয়।
১২. অনেক চাবির গোছা হাতে জড়ালে যুদ্ধ ঘটতে পারে।
১৩. চৌকাঠে বসলে বাপ ঋণগ্রস্ত হয়।
১৪. মঙ্গলবারে জামার সেলাইয়ের কাপড় কাটা ভাল নয়।
১৫. হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে।
১৬. পায়ের গোড়ালি চুলকালে ভ্রমণ হয়।
১৭. ডান চোখের পাতা কাঁপলে সুখ আসে।
১৮. গলায় পানি আটকানো মানে কেউ স্মরণ করছে।

এইসব সংস্কার ও বিশ্বাস আমাদেরকে সহজেই বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের কথা মনে করিয়ে দেবে। আমাদের দেশের মানুষদের মধ্যে এইরকম অনেক সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

উপসংহার

নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা আফগানিস্তানে চোখে পড়ে। এগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য, গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব, নারীবৈষম্য, চৌর্যবৃত্তি, অপহরণ আর দস্যুতা। প্রজন্ম ধরে রক্ত-যুদ্ধ চলা – এটা আফগানিস্তানে 'লিজেন্ডে' পরিণত হয়েছে এবং প্রতিশোধ বিবেচিত হয়ে থাকে ভুলের প্রতিকার হিসেবে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ দেশটাকে এমন ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে যে, সেখানে নিরাপদে হাঁটাচলা করার রাস্তার পর্যন্ত অভাব। বছরের পর বছর যুদ্ধ এদেশের যৌথ পরিবারগুলোকে আলাদা আর নিঃস্ব করে

দিয়েছে। যৌথ পরিবারগুলি ঐতিহ্যগতভাবেই বিধবা আর পিতৃহীন শিশুদের দেখাশুনা করত। যুদ্ধ তাদের জীবনকে করেছে চরম অনিশ্চিত। কিছু কিছু প্রদেশে মহামারী আর অপুষ্টিজনিত রোগবালাই বাড়িয়েছে ১৯৯০ সালে এবং প্রথমবারের মত এটা খোঁজ পাওয়া গেছে এই শতকে।

পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর একটি হল আফগানিস্তান যেখানে শিশুমৃত্যুর হার সবচাইতে বেশী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আগ্রাসনের যুদ্ধ এই দেশটিকে সবদিক থেকে পঙ্গু করে ফেলেছে। শিক্ষাবর্জিত, চরম দারিদ্রে নিমজ্জিত গোটা আফগান জাতির ওপর আমেরিকা যে মিথ্যা সন্ত্রাসের ধোয়া তুলে বীভৎস হামলাটা চালালো এবং এই হত্যাযজ্ঞটিকে নিজেদের প্রচারণা শক্তির সাহায্যে জায়েজ করার প্রাণপণ চেষ্টা করল তা সত্যিই ভাবার মত বিষয়। পৃথিবীর অনেক দেশই এই হামলাকে সমর্থন করেছে আমেরিকার সঙ্গে একই সুরে। অথচ বুঝতে অসুবিধা হয় না এই হামলার মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক ।

কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় গ্যাস রপ্তানির রাস্তাটি খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আমরা জানি আফগানিস্তানে শাসন ব্যবস্থা চলছে আমেরিকার বানানো পুতুল সরকারের মাধ্যমে। এর আগে তালিবানদের সঙ্গে আমেরিকার গ্যাস-লাইন নিয়েই দ্বন্দ দেখা দেয় যার জের হিসেবে গোটা আফগানিস্তানে চলে আমেরিকার অমানবিক হামলা। তালিবানদের উৎখাত করার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে মারা পড়ে, আর সমস্ত দেশটিকে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করে আদিম, পশ্চাদপদ আর বর্বর জনজাতি হিসেবে। আজকের পৃথিবীর ক্ষমতাশীল সাম্রাজ্যশক্তির আফগানিস্তানের উপর শোষণের একটা চমৎকার নিদর্শন হিসেবে আফগানিস্তানে হামলা ও বর্তমানে সেদেশের গ্যাস সম্পদকে আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়ে আমরা অন্যভাবে আমেরিকার সন্ত্রাসী কান্ডকারখানার পরিচয় পাই।

সবশেষে আমি একটি আফগান-প্রবাদের মধ্য দিয়ে আমার লেখাটি শেষ করতে চাইছি সেটি হলো: 'এক হৃদয়ের রাস্তা আছে অন্য হৃদয়ে যাবার'। যে দেশের মানুষ এরকম প্রবাদ তৈরী করে, যে দেশ অসংখ্য গোষ্ঠীতে স্বতন্ত্র থাকলেও সারা দেশের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান চালিয়ে বাস করে, সেই দেশটিকে সন্ত্রাসের ভুয়া উছিলায় ধ্বংস করে দেয়া যায় না। আর মিডিয়াকে কাজে খাটিয়ে আফগানিস্তানকে একটি সন্ত্রাসী জাতি হিসেবে তুলে ধরার পেছনে যে অবশ্যই অন্যরকম অর্থনৈতিক ফায়দার ব্যাপার আছে তা একটু চোখ-কান-মন খোলা রেখে জানতে চাইলেই জানতে পারা যায়।

আফগানিস্তানের মানুষ মানেই যে টুপি-দাড়িওয়ালা আদিম বর্বর 'মৌলবাদী' নন, বরং জলজ্যান্ত সুসভ্য, সৃষ্টিশীল মানুষ – শুধু এইটুকু বুঝলেও পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী তথা বর্ণবাদী ডিসকোর্সের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারা যায়।

সাইয়ীদ রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ হাশেমী

তালেবান সরকারের ভাষ্য

তরজমা: মানস চৌধুরী

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পটভূমি বানানোর ব্যাপারে একপাক্ষিক সর্বব্যাপী পশ্চিমা প্রচারণার বিপরীতে আমরা তালেবান সরকারের ভাষ্যটাও জানতে চেয়েছিলাম। এই লেখাটা সেই দিক থেকে কাজে আসে। আফগানিস্তানের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হাশেমী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০১ সালের ১০ই মার্চ তারিখে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন এটা তারই শ্রুতিলিপির সম্পাদিত রূপ। *প্রথম আলো*-র শুক্রবারের সাময়িকীতে এটা ছাপা হয়েছিল ২৬শে অক্টোবর ২০০১ তারিখে। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় সাম্প্রতিক কালে যেসব লেখালিখি হয়েছে তার মধ্যে এই লেখাটা ছিল তালেবান সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের নিজেদের বক্তব্য জানার সম্ভবত একমাত্র উৎস। এখানেই এর বিশেষ গুরুত্ব।

হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়।

সুরা হুজুরাত ৪৯:৬, আল কোরআন।

এই মাত্র আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে একটা সভা থেকে এসেছি এবং সেখানে প্রথম যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলতে শুরু করেছিলাম তা হচ্ছে মূর্তি। এবং এখানে প্রথম যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা শুরু করেছি তাও হচ্ছে মূর্তি। এটা বড়ই পরিতাপের যে, আমরা কত কম দেখতে পাই এবং কত কম জানি। কেউই আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো দেখল না; আগেও কেউ তা দেখেনি। আর এখন যে একমাত্র বিষয়বস্তু আফগানিস্তানকে প্রতিনিধিত্ব করছে তা হচ্ছে মূর্তি।

আফগানিস্তানকে এশিয়ার সন্ধিস্থল বলা হয়। তাই আমরা ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। আমরা ১৮ শতকে দুর্ভোগ সয়েছি, ১৯ শতকে এবং এখন এই শতকেও চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। আমরা ব্রিটিশদের আক্রমণ করিনি। আমরা রুশদের আক্রমণ করিনি। তারাই আমাদের আক্রমণ করেছে।

তাহলে দেখেন আফগানিস্তানের সমস্যা আমাদের তৈরি করা নয়।

সোভিয়েত আগ্রাসন

আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক সমস্যার সূত্রপাত ঘটে ১৯৭৯

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

সালে। আফগানিস্তান একটা শান্তিপূর্ণ দেশ ছিল। রুশরা তাদের ১ লাখ ৪০ হাজার সেনাসহ ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্তান আক্রমণ করল, সেখানে এক দশক ধরে থাকল, ১৫ লাখ মানুষ মেরে ফেলল, আরো ১০ লাখ লোককে পঙ্গু করল এবং রাশিয়ার নৃশংসতার কারণে পৌনে ২ কোটি লোকের মধ্যে ৬০ লাখ দেশান্তরী হলো। এমনকি এখনো আমাদের সন্ত ানরা মারা যাচ্ছে। কারণ তারা আমাদের জন্য মাইন পুঁতে রেখে গেছে। এবং কেউই এসব জানে না।

অন্যদিকে রাশিয়ান দখলদারিত্বের কালে মার্কিন সরকার, ব্রিটিশ সরকার, ফরাসি, চীনা এবং অন্য সকলে সমর্থন যুগিয়ে এসেছে মুজাহিদীন নামের প্রতিবিপ্লবীদের। পাকিস্তানে এরকম মাত্র সাতটি দল এবং ইরানে আটটি দল রাশিয়ার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়েছে। রাশিয়ানরা চলে যাওয়ার পর তারা সকলে আফগানিস্তানে এসে ঢুকল। তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ আর ছিল গাদা গাদা অস্ত্র। এবং একটা কোনো অখণ্ড প্রশাসন না থাকার কারণে তারা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে থাকল।

তারা যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা রাশিয়ানদের থেকেও ভয়ঙ্কর। কেবল রাজধানী কাবুলেই ৬৩ হাজার মানুষ মারা পড়েছে। এই নৈরাজ্যের কারণে আরো লাখ দশেক লোক দেশ ছেড়েছে।

তালিবানের শুরু

এই নৈরাজ্য আর ধ্বংস দেখে তালিবান নামে একদল ছাত্র, তালিবান শব্দের মানে একদল ছাত্র, (আমাদের ভাষায় ছাত্রের বহুবচন হচ্ছে তালিবান; আরবি ভাষায় এটা দুজন ছাত্রকেও বোঝাতে পারে, কিন্তু আমাদের ভাষায় বোঝায় ছাত্ররা) আন্দোলন গড়ে তুলল, যার নাম শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। এটা প্রথমে শুরু হয়েছিল আফগানিস্তানের দক্ষিণের একটি প্রদেশ কান্দাহারে। এটা ঘটেছে যখন একজন যুদ্ধপ্রভু বা কমান্ডার দুজন কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে তাদের শ্লীলতাহানি ঘটাল। সেই মেয়ে দুটোর মা-বাবা একটা স্কুলে গিয়ে শিক্ষকের কাছে সাহায্য চাইলেন।

ওই স্কুলের শিক্ষক তখন, তাঁর ৫৩ জন ছাত্রসমেত, কেবল ১৬টি বন্দুক জোগাড় করে ওই কমান্ডারের ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। মেয়ে দুজনকে উদ্ধার করার পর তাঁরা ওই কমান্ডারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে তার দলের আরো অনেককে। এই কাহিনী সর্বত্রই বলা হয়ে থাকে। বিবিসিও এই কাহিনীটিকে উদ্ধৃত করেছে। এই কাহিনী শুনে আরো বহু শিক্ষার্থী এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন এবং অপরাপর যুদ্ধপ্রভুদের নিরস্ত্র করতে শুরু করেছিলেন।

এই শিক্ষার্থী আন্দোলনই এখন রাজধানীসহ দেশের ৯৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সেই যুদ্ধপ্রভুদের একাংশ কেবল আফগানিস্তানের উত্তর ভাগে রয়ে গেছে।

আমাদের অর্জন

আমরা মাত্র পাঁচ বছর সরকারে আছি এবং নিচে লেখা এগুলো অর্জন করেছি, এবং আপনারা অনেকেই তা জানেন না:

১. প্রথম আমরা যা করেছি তা হচ্ছে এই খণ্ড-বিখণ্ড দেশটাকে একত্রিত করা। আফগানিস্তান আগে পাঁচ ভগ্নাংশে খণ্ডিত ছিল। আমরা একে জোড়া লাগিয়েছি, এমন সময়ে যখন এ কাজ আর কেউ করেনি।

২. দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা করেছি, যাতে সবাই বিফল হয়েছে, তা হলো মানুষজনকে নিরস্ত্র করা। যুদ্ধের পর প্রতিটি আফগানের কাছে একটা কালাশনিকভ ছিল, এমনকি আরো অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন স্টিংগার মিসাইল, এমনকি তাদের ফাইটার প্লেন এবং ফাইটার হেলিকপ্টার ছিল। এই লোকগুলোকে নিরস্ত্র করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ ৩ বিলিয়ন ডলারের জন্য আবেদন করে, সেই টাকা দিয়ে অস্ত্রগুলো পুনঃক্রয় করবে বলে। এই উদ্যোগটার অসারতার জন্য কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি এবং সকলেই আফগানিস্তান প্রসঙ্গ ভুলে গেল। তাহলে দ্বিতীয় কাজটা আমরা করেছি দেশের ৯৫ শতাংশ অংশের অস্ত্র উদ্ধার।

৩. তৃতীয় যে কাজটা করেছি আমরা তা হচ্ছে আফগানিস্তানে একটা একক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, যা বিগত ১০ বছর ধরে এখানে ছিল না।

৪. আমাদের চতুর্থ অর্জনটা সকলের কাছেই বিস্ময়কর যে, আমরা বিশ্বের আফিম চাষের ৭৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছি। আফগানিস্তান বিশ্বের আফিমের ৭৫ শতাংশ উৎপাদন করত। গত বছর আমরা একটা ডিক্রি জারি করি, যাতে মানুষজন আর আফিম চাষ না করে এবং এই বছর জাতিসংঘ মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ইউএনডিসিপি এবং তাদের প্রধান বার্নার্ড এফ সগর্বে ঘোষণা করলেন যে আফিম চাষ ০ শতাংশ। গোল্লায়; হচ্ছে না, একেবারেই চাষ হচ্ছে না। প্রসঙ্গত এটা জাতিসংঘের নিজের জন্য খুব ভালো খবর ছিল না। কারণ তাদের অনেকেরই এতে চাকরি খোয়া গেছে। ইউএনডিসিপিতে ৭০০ তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কাজ করতেন সেখানে এবং মাইনে পেতেন এবং কখনোই আফগানিস্তানে যাননি। ফলে আমরা যখন এই ডিক্রি জারি করলাম, আমি জানি যে তাঁরা খুশি হননি এবং এই বছরে তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন।

৫. আমাদের পঞ্চম সাফল্য হচ্ছে মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এখন আপনারা ভাবতে পারেন যে, আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত আছি। বাস্তব হচ্ছে একেবারেই উল্টো। একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে আছে বেঁচে থাকার অধিকার। আমাদের আগে আফগানিস্তানে কেউই শান্তিতে বসবাস করতে পারত না। আমরা প্রথম যে কাজটা করেছি তা হলো, মানুষজনকে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করা। দ্বিতীয় বড় যে জিনিসটা আমরা নিশ্চিত করেছি তা হচ্ছে মানুষজনের জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার, ওখানে আপনাদের মতন না, বিচার কিনতে হয় না। আফগানিস্তানে ন্যায়বিচার হচ্ছে মুক্ত এবং অনায়াসলভ্য।

নারী অধিকার

নারী অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আমাদের সমালোচনা করা হচ্ছে। আপনারা কি জানেন আমাদের আগে কী ঘটত? এখানে কিছু আফগান দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আফগানিস্তানের গ্রামদেশে নারীদের জীব-জন্তুর মতো করে ব্যবহার করা হতো। আক্ষরিক অর্থেই তাদের বিক্রি করা হতো। এই ঘৃণ্য রেওয়াজ আমরা বন্ধ করি। স্বামী বাছাই করার বেলায় তাদের মতামতের কোনো দাম ছিল না। প্রথম আমরা যেটা করলাম তা হচ্ছে তাদেরকে নিজ ভবিষ্যৎ বেছে নিতে দিলাম।

আফগানিস্তানে আরেকটা ব্যাপার ঘটত যে, উপঢৌকন হিসেবে নারীদের বিনিময় চলত। অবশ্যই এতে ধর্মীয় কিছু নেই, এটা সাংস্কৃতিক। দুটো বিবদমান গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে রফা করতে চাইলে তারা নারী বিনিময় করত। এটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে আফগানিস্তান সম্বন্ধে, তার উল্টোটাই ঘটে, নারীরা কাজ

করে। এটা সত্য যে, ১৯৯৬ সালে রাজধানী কাবুল দখল করার আগ পর্যন্ত আমরা নারীদের ঘরের ভেতরে থাকতে বলতাম। এর মানে এই নয় যে, আমরা চেয়েছি তাঁরা চিরকালই ঘরের ভেতরে থাকুন। আমরা বলেছি কোথাও আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই, আপনাদের ঘরের ভেতরে থাকতে হবে।

আমরা মানুষজনকে নিরস্ত্র করলাম, আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এখন নারীরা কাজ করছেন। সত্য, নারীরা এখানকার মতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন না। আমরা চাই না যে আমাদের নারীরা যুদ্ধ-বৈমানিক হোন, কিংবা তাঁরা বিজ্ঞাপনে দর্শনীয় বস্তু আকারে ব্যবহৃত হোন। তাঁরা কাজ করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এবং এরকম।

একইভাবে নারীশিক্ষা নিয়ে আমাদের কোনোই সমস্যা নেই। আমরা বলেছি যে আমরা শিক্ষা চাই এবং শিক্ষিত আমরা হবই, তা কারো কোনো চাপ থাকুক বা নাই থাকুক, কারণ তা আমাদের বিশ্বাসের অংশ। আমরা সেটা করতে আদিষ্ট। যখন আমরা পৃথক স্কুল থাকার কথা বলি, তার মানে এই নয় যে আমরা চাই না আমাদের নারীরা শিক্ষিত হোক। এটা সত্য যে, আমরা সহ-শিক্ষার বিপক্ষে। কিন্তু এটা সত্য নয় যে, আমরা নারী শিক্ষার বিপক্ষে।

এমনকি আমাদের এখনো স্কুল আছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সহায়-সম্পদের। আমরা এই কর্মসূচিগুলো বাড়াতে পারছি না। আমাদের সরকারের আগে নানা ধরনের পাঠ্যসূচি চালু ছিল। রাজাদের বন্দনা করে এমন পাঠ্যসূচি ছিল, কমিউনিস্টদের বন্দনা করে এমন পাঠ্যসূচি ছিল এবং সাতটা দলের পক্ষের পাঠ্যসূচি ছিল। সে কারণে কী পড়া উচিত, তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা দোটানায় পড়ে যেত।

আমরা পাঠ্যসূচি একত্রীকরণের কাজে হাত দিয়েছি এবং সেটা চলছে। সম্প্রতি আমরা আফগানিস্তানের সব বড় শহরে এবং কান্দাহারে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ পুনরায় চালু করেছি। চিকিৎসা অনুষদে ছাত্রদের থেকে বেশি সংখ্যায় ছাত্রীরা লেখাপড়া করছে। তবে তারা পৃথক পৃথক শিক্ষায়তনে পড়ছে এবং সুইডিশ পর্ষদগুলোও মেয়েদের জন্য স্কুল চালু করেছে। আমি জানি তা যথেষ্ট নয়, কিন্তু এটুকু পর্যন্তই করার সামর্থ্য হয়েছে আমাদের।

ওসামা বিন লাদেন

আমরা সন্ত্রাসবাদকে পৃষ্ঠপোষকতার দায়েও অভিযুক্ত। আর মার্কিনিদের কাছে সন্ত্রাসবাদ কিংবা সন্ত্রাস বলতে বোঝায় কেবল বিন লাদেন। আপনারা এখন সেই আফগানিস্তানকে জানবেন না, কিংবা জানবেন না যে বিন লাদেন ১৭ বছর ধরে আফগানিস্তানে আছেন এমনকি আমাদের অস্তিত্ব তৈরি হওয়ার ঢের আগে। বিন লাদেন আফগানিস্তানে ছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং রোনাল্ড রিগ্যান, মার্কিনের তখনকার প্রেসিডেন্ট এবং ডিক চেনি এসব মানুষজনকে বলতেন মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বলতেন স্বাধীনতার বীরবর্গ। কারণ এঁরা তাঁদের স্বার্থে লড়েছিলেন।

আর এখন যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, এসব লোকের আর দরকার নেই এবং তাঁরা সন্ত্রাসবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বীর থেকে সন্ত্রাসবাদী। একবারেই ইয়াসির আরাফাতের মতো যিনি সন্ত্রাসবাদী থেকে বীরে রূপান্তরিত হয়েছেন। বিন লাদেন যে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত তার সঙ্গে ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানে ক্রুজ মিসাইল হামলার পার্থক্য কী?

দুটোর কোনোটাই ঘোষিত ছিল না এবং দুটোই সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। যদি নির্বিচারে সাধারণ মানুষ মারা প্রসঙ্গ আসে তাহলে দুটোতেই তা ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার একজন লোককে মারতে চেষ্টা করেছে তাকে একটা ন্যায্য বিচারের সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে। ১৯৯৮ সালে তাদের মনে হলো আর আফগানিস্তানে ক্রুজ মিসাইল পাঠিয়ে দিল এবং তারা ঘোষণা করল যে তারা ওসামা বিন লাদেনকে মারার চেষ্টা করেছে।

আমরা তখন ওসামা বিন লাদেনকে চিনতাম না। আমি তাঁকে চিনতাম না; তিনি নিছক একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাই আমরা সবাই হতভম্ব হয়েছিলাম। অনেকের মতো আমি রাতে বাসায় বসে ছিলাম, আমাকে জরুরী কাউন্সিল সভায় ডেকে পাঠানো হলো এবং বলা হলো যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে।

৭৫টা ক্রুজ মিসাইল দিয়ে তারা একটা মাত্র লোককে মারার চেষ্টা করেছে এবং তারা সেই লোকটাকে পায়নি; অন্য ১৯ জন ছাত্রকে মেরে ফেলেছে এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কখনোই অনুতাপ প্রকাশ করেনি। আপনারা যদি আমাদের জায়গায় থাকতেন তাহলে কী করতেন? যদি আমরা গিয়ে ৭৫টা ক্রুজ মিসাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেলতাম এবং বলতাম যে আমরা একটা লোককে মারতে গিয়েছিলাম, যাকে আমরা আমাদের দূতাবাস হামলার জন্য দায়ী মনে করেছি এবং আমরা সেই লোকটাকেও পাইনি এবং আমরা অন্য ১৯ জন মার্কিনিকে মেরে ফেলেছি। কী করত তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? তাৎক্ষণিকভাবেই যুদ্ধ ডাকতেন আপনারা। কিন্তু আমরা নম্র। আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিনি।

আমাদের প্রস্তাবনা

বরং আমরা এ ব্যাপারে বরাবরই খোলামনের ছিলাম। আমরা বলেছি, যদি এই লোকটা সত্যিই কেনিয়া/তাঞ্জানিয়ার ঘটনাতে জড়িত হয়ে থাকে, যদি এসব ভয়াবহ ঘটনায় তাঁর জড়িত থাকার কোনো দলিল-প্রমাণ কেউ আমাদেরকে দেয়, আমরা তাঁকে শাস্তি দেব। কেউ আমাদের কোনো প্রমাণ দিল না। আমরা তাঁকে ৪৫ দিনের ট্রায়ালে রাখলাম এবং কেউই আমাদের কোনো ধরনের তথ্য-প্রমাণ দিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বলল, আমাদের বিচার ব্যবস্থায় তাদের আস্থা নেই। আমরা হতবাক হয়েছি যে, তাদের বিচার ব্যবস্থাটা তাহলে কোন ধরনের?

তারা একটা লোককে মারার চেষ্টা করেছে কোনো রকমের বিচারের সুযোগ তাকে না দিয়েই। এখানে আমাদের মধ্যে যদি কেউ অপরাধী হয়, পুলিশ গিয়ে তার বাড়িঘর ভাঙতে শুরু করবে না, নিশ্চয়ই প্রথমে তাকে আদালতে নেবে। তাহলে আমাদের প্রথম প্রস্তাবটি নাকচ হয়েছে। তারা বলল, তারা আমাদের বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না এবং আমাদের অবশ্যই তাঁকে নিউ ইয়র্কে হস্তান্তর করতে হবে। প্রথম প্রস্তাবটি নাকচ হওয়ার পর আমরা বলে আসছি যে, আমরা রাজি আছি, আপনারা চাইলে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল আফগানিস্তানে এসে এই লোকটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। যাতে তিনি কোনো কিছু না করতে পারেন।

এমনকি তাঁর কোনো টেলিযোগাযোগ নেই। আমাদের সেই প্রস্তাবও নাকচ হলো। তৃতীয় প্রস্তাব আমরা দিয়েছি ছয় মাস আগে, সেটা ছিল যে আমরা তৃতীয় একটি ইসলামী দেশে ওসামা বিন লাদেনের বিচার মেনে নিতে রাজি আছি, যেখানে সৌদি আরব ও আফগানিস্তানের সম্মতি থাকবে। সেটাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা এখনো যথাসম্ভব খোলামন নিয়ে আছি। এবং চতুর্থ বারের মতো আমি এখানে

আমার নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে পত্র নিয়ে এসেছি, যেটা আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে চাচ্ছি এই আশায় যে, তাঁরা সমস্যাটার সমাধান করবেন। কিন্তু আমি মনে করি না যে তাঁরা সেটা করবেন। কারণ আমরা মনে করি, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই একজন জুজুবুড়ি খুঁজে বেড়ায়।

মনে আছে গর্বাচেভ কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি করতে যাচ্ছেন। সবাই মনে করল পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে তিনি যুক্তরাষ্ট্র উড়িয়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমি ওদের শত্রুকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছি। এবং তারপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড করলেন। তিনি সঠিকই বলেছিলেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়ার পর বহু লোকের চাকরি গেছে: পেন্টাগন থেকে, সিআইএ থেকে এবং এফবিআই থেকে। কারণ তখন তাঁদের আর প্রয়োজন নেই।

তাই আমাদের মনে হয় যে, বোধহয় এই লোকগুলো এখন একজন জুজুবুড়ি খুঁজছে। হতে পারে যে তারা তাদের বার্ষিক বাজেটকে সিদ্ধ করতে চায়, হতে পারে যে তারা চায় তাদের নাগরিকরা তাদের প্রয়োজনবোধ করুক।

আফগানিস্তান কোনো সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয়, আমরা এমনকি একটা সূচও বানাতে পারি না। কীভাবে আমরা একটা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হব? কীভাবে আমরা দুনিয়ার প্রতি একটা হুমকিতে পরিণত হই? যদি বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ সত্যিই সন্ত্রাস শব্দ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তাহলে মেলা দেশ আছে যারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের জন্য অস্ত্র বানায়, যারা পারমাণবিক অস্ত্র বানায়, তারা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র; আমরা নই।

অবরোধ

এখন আমাদের বিরুদ্ধে অবরোধ। আর এই অবরোধে বিস্তর সংকট দেখা দিয়েছে। যদিও আমরা ইতিমধ্যেই বহু সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি– ২৩ বছরের ধারাবাহিক যুদ্ধ, আমাদের অবকাঠামো সর্বাত্মক ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এবং শরণার্থী সংকট এবং আমাদের কৃষি জমিতে পুঁতে রাখা ল্যান্ড-মাইনের সংকট– হঠাৎ করেই জাতিসংঘ, রাশিয়ার প্ররোচনা সমেত, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করছে।

এবং অবরোধ অনুমোদন পেয়েছে, আমরা অবরোধের শিকার। এক মাস আগে কয়েকশ বাচ্চা মারা গেছে। ৭০০ বাচ্চা মারা গেছে অপুষ্টিতে এবং ৪০০ শৈত্য প্রবাহে। কেউই এ নিয়ে কথা পর্যন্ত বলল না। অথচ প্রত্যেকেই মূর্তির ব্যাপারটা জানে।

মানুষ মরছে আর মূর্তির মেরামত

সারা দুনিয়া যখন অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন আমাদের অতীত নিয়ে দুর্ভাবনা করার কোনো অধিকার তাদের নেই। আমি সদর দপ্তরে যোগাযোগ করেছি, আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করেছি কেন মূর্তি ভাঙতে চায়, আমি উলেমাদের পর্ষদ প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি যিনি সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বললেন যে ইউনেস্কো এবং আরেকটা এনজিও সুইডেন থেকে, নাকি আর কোনো স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ নরওয়ে বা সুইডেন– এরকম কোনো দেশ থেকে তারা এসেছে একটা প্রজেক্ট নিয়ে, বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া এইসব মূর্তিকে মেরামত করা হবে। নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অনুরোধ করলেন, যাতে টাকাগুলো মূর্তি মেরামতে খরচ না করে বাচ্চাদের জীবন রক্ষার্থে খরচ করা হয়।

এই ভদ্রলোকেরা বলল,'না, এই টাকা হচ্ছে মূর্তির জন্য।' লোকজন সত্যি সত্যি খেপে গেছিল। তারা বলল, যদি আমাদের বাচ্চাদের বিষয়টি তোমরা গুরুত্ব না দাও তাহলে এই মূর্তিগুলো আমরা ভেঙে দেব। আপনারা এই অবস্থায় পড়লে কী করতেন? যদি আপনাদের চোখের সামনে বাচ্চারা মারা যেত, যদি আপনাদের বিরুদ্ধে অবরোধ থাকত, আর যদি সে সমস্ত লোকজন মূর্তি বানাতে আসত, যারা নিজেরাই অবরোধ আরোপ করেছে? কী করতেন আপনারা?

কফি আনান

আর আছেন কফি আনান। কফি আনানকে তো আপনারা চেনেন, জাতিসংঘের মহাসচিব। তিনি পাকিস্তান গেলেন, এবং বললেন সেখানে আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এই লোকটা আসার ব্যাপারে কোনোদিনই গা করেননি, এসব শিশুদের ব্যাপারে কথা বলতে গা করেননি, নিজে থেকে কোনোদিন ৬০ লাখ শরণার্থী প্রসঙ্গে কথা বলতে গা করেননি এবং কখনোই আফগানিস্তানের দারিদ্র্যের প্রসঙ্গে কথা বলেননি। তিনি ঐ অঞ্চলে গেছেন এই মূর্তিগুলোর কারণে।

এটা সত্যি সত্যিই পরিহাসের। এই লোকগুলোর শিশুদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই, যাঁরা মারা যাচ্ছেন তাঁদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই, বিদেশী হস্তক্ষেপের ব্যাপারেও মাথাব্যথা নেই; তাঁদের মাথাব্যথা শুধু মূর্তিগুলো নিয়ে। এবং আমি নিশ্চিত যে, তাঁরা আমাদের ঐতিহ্যের ব্যাপারেও খুব বেশি চিন্তাগ্রস্ত নন। তাঁদের চিন্তা শুধু তাঁদের পিকনিক স্থান নিয়ে। হয়তোবা মূর্তিগুলো সামনে থাকলে ওখানে তাঁদের একটা ভালো পিকনিক স্থান হবে।

এবং আমি এও নিশ্চিত যে, এইসব অবরোধ যা আমাদের সরকারের ওপর চাপানো হয়েছে কখনো আমাদের বদলাতে পারবে না। কারণ আমাদের কাছে আমাদের আদর্শটাই সব। অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে আমাদের মতাদর্শ বদলানোর প্রচেষ্টা কোনো কাজে আসবে না। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে পারে, যেখানে অর্থনীতিই সব, কিন্তু আমাদের কাছে আমাদের আদর্শই সব। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, কিছু-না'র জন্য বেঁচে থাকার চেয়ে কিছু একটার জন্য মরে যাওয়া অনেক ভালো।

রবার্ট ফিস্ক

লাদেনের মুখোমুখি

তরজমা: সুমন কায়সার

১৯৯৮ সালে বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে এক কথপোকথনে মিলিত হন। সে সাক্ষাৎকারে আমেরিকা, সৌদি আরব, প্যালেস্টাইন, ইরাকে মার্কিন হামলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কথা বলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে মার্কিন পত্রিকা *দি নেশন*-এ প্রকাশিত সে সাক্ষাৎকারটি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতেও গুরুত্বপূর্ণ।

ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে শেষবার আমার দেখা হয় গত বছর। আফগানিস্তানের এক পাহাড়চূড়ায় স্থাপিত ক্যাম্পের তাঁবুতে। তাঁবুর একটু দূরেই পাহাড় কেটে বানানো ফুট পঁচিশেক উঁচু এয়ার রেইড শেলটার। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লাদেনের প্রতিরোধের সময়কার এক স্মৃতিচিহ্ন, যদিও এখনো ক্রুজ মিসাইলের ধাক্কা সামলানোর মতো যথেষ্ট শক্ত। সাদা সৌদি পোশাক পরা লাদেন তাঁবুতে ঢুকে করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। তারপর জোড়াসন হয়ে শতরঞ্চিতে বসলেন। আমার ব্যাগে বৈরুত থেকে বের হওয়া সেদিনের কয়েকটা পত্রিকা ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই প্রায় ছোঁ মেরে কাগজগুলো নিলেন লাদেন। তার পরের প্রায় আধঘণ্টা সব ভুলে ডুবে রইলেন তাতে। আফগান পোশাক পরা এক আরব মুজাহিদ পড়ার সুবিধার জন্য সামনে ধরে ছিল সশব্দ এক গ্যাসবাতি। লাদেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলেন ইরান, তার নিজের দেশ আর ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীর এলাকার খবরগুলো। দু-একটি খবর সত্যি কি না তা আমার কাছে জানতেও চাইলেন তিনি।

এক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা মানুষটিকে মাপতে মাপতে আমার মনে হলো, বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের এই কথিত হোতা দুনিয়ার খুব একটা খোঁজখবর রাখেন না। স্বদেশের নেতৃবৃন্দকে ঘৃণার চোখে দেখা এই সৌদি নাগরিক আগের এক সাক্ষাতে বলেছিলেন আমাকে, 'মাতৃভূমিকে মুক্ত করার লড়াই যদি হয় সন্ত্রাসবাদ তবে তা করতে পেরে আমি বরং সম্মানিত।'

তবে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সুদান ও আফগানিস্তানে গত মাসের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর যে শিরোপা দিয়েছেন লাদেনকে তা নিশ্চয়ই আরো বেশি সম্মানের। ক্লিনটনের বালকোচিত অভিধা, 'আমেরিকার এক নম্বর গণশত্রু'– সম্পর্কে যার সহজ-সরল মনোভঙ্গি রাজনৈতিকভাবে যেমন অপরিণত তেমনি

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

বিপজ্জনক। গত বছর তুষারাবৃত সেই পর্বতশীর্ষে (এত ঠাণ্ডা যে, ভোরে চুলের মধ্যে বরফ জমে আছে দেখেছিলাম) ওসামা বিন লাদেনকে দেখাচ্ছিল বিচ্ছিন্ন, প্রায় নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। তখনো 'অশুভ' সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা উপেক্ষাই করছিল তাকে।

ক্লিনটন পুরোপুরি বদলে দিয়েছেন সেই ছবিটা। নতুন শিরোপাটা দিয়ে তিনি এই সৌদি ভিন্নমতাবলম্বীর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করলেন। পাশ্চাত্য 'অন্যায়ের' সবচেয়ে বড় শত্রু তথা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন ওসামা বিন লাদেন।

আমেরিকা আজকাল তার প্রতিপক্ষকে যেভাবে হলিউডি গুণ্ডাদের মতো বিবেচনা করে, ঘটনা এত করুণ না হলে তা নিয়ে মজাই করা যেত। অলিভার নর্থও ফিলিস্তিনি ঘাতক আবু নিদালকে আমেরিকার এক নম্বর গণশত্রু ঘোষণা করেছিলেন। সাদ্দামকে তুলনা করা হয়েছে হিটলারের সঙ্গে, যদিও সাদ্দামের জনপ্রিয়তা স্টালিনের স্মৃতিই মনে করিয়ে দেয়। আবার এর আগে সাদ্দাম যখন আমাদের 'নিজের লোক' হিসেবে ইরানে অভিযান চালাচ্ছেন তখন আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে ভিলেন বানিয়েছি। রোনাল্ড রিগ্যান লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার আল গাদ্দাফিকে বলেছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের সেই খ্যাপা কুত্তা'। এমনকি শান্তির পথে পা বাড়াতে বাধ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত যে ইয়াসির আরাফাত ছিলেন মহা সন্ত্রাসবাদী, ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির পর তাকেই আমরা বলছিলাম মহা রাষ্ট্রনায়ক।

ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার এই 'হেট ফিগার'-এর পরম্পরার বিষয়টি বোঝেন, বা বুঝলেও গ্রাহ্য করেন কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম লাদেনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। নিজের ধর্ম ইসলামের অর্থও এখানেই শিখেছেন তিনি। আফগান সংগ্রাম তাকে প্রণোদিত করেছে ভাবতে। লাদেন বলেছিলেন আমাকে, 'ওখানে দুবছরে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, অন্য কোথাও তা একশ বছরে হতো না।'

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আফগানদের সাহায্য করতে নয় হাজার আরব যোদ্ধা নিয়ে এসে হিরোতে পরিণত হন লাদেন। নিজের ভারি নির্মাণ উপকরণ (প্রসঙ্গত, নির্মাণকাজ লাদেনের এক পারিবারিক ব্যবসা ছিল) ব্যবহার করে দুর্গম পাহাড়ে রাস্তা বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন অস্ত্রাগার ও হাসপাতাল। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি যে ঘাঁটিগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ঠিক সেগুলোতেই সিআইএ ট্রেনিং দিয়েছিল লাদেনের এখনকার আফগান সহযোদ্ধাদের অনেককেই। কিন্তু আশির দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন এজেন্টদের তৈরি করা ওই ঘাঁটিগুলোকে তখন 'মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি' বলা হলেও এখন তার নাম 'সন্ত্রাসীদের আখড়া'। লাদেন আমাকে বলেছেন, তিনি বা তার সহযোদ্ধাদের কেউ আফগানিস্তানে 'মার্কিনি সহযোগিতার কোনো নজির' দেখেন নি। কিন্তু সিআইএ-র উপস্থিতি নিশ্চয়ই গোচরে ছিলো তার।

লাদেনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৯৩ সালে, সুদানের মরু এলাকায়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জন্য সড়ক তৈরি করছিলেন লাদেন। মিশরীয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, খার্তুমের উত্তরের সেই মরুভূমিতেই প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকবিরোধী কট্টরপন্থীদের প্রশিক্ষণ দিতেন লাদেন। তো, সেবার রুশবিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কে মুখ খোলাতে পেরেছিলাম তাকে।

লাদেন বলছিলেন, 'একবার রুশ সৈন্যরা আমার মাত্র তিরিশ মিটার দূরে ছিল। আমাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল তারা। মাথার ওপর তুমুল বোমাবর্ষণ চললেও আমি কিন্তু ভেতরে খুব শান্ত বোধ করছিলাম। এতটাই যে, একসময় ঘুমিয়ে পর্যন্ত পড়ি ওই অবস্থার মধ্যেই। আমাদের প্রথম দিককার বইগুলোতে এ অভিজ্ঞতাটির কথা আছে। একসময় একটা ১২০

মিলিমিটার মর্টার শেল এসে পড়লো আমার সামনে। কিন্তু ফাটলো না। রুশ বিমান থেকে আরো চারটা বোমা ফেলা হয়েছিল আমাদের সদর দপ্তরের ওপর। সেগুলোও বিস্ফোরিত হয় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করেছিলাম আমরা। তারা শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান ছেড়ে পালায়। না, মৃত্যুভয় কখনোই হয় নি আমার। মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর বেহেশতেই যাবো। যুদ্ধের আগে আল্লাহ অন্যরকম প্রশান্তি এনে দেন আমাদের মধ্যে।'

১৯৮০ সালে লাদেন যখন প্রথম আসেন তখন আমি নিজেও আফগানিস্তানে ছিলাম। তখনকার রিপোর্টিং নোটগুলো এখনো যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মুজাহিদরা কীভাবে সহশিক্ষার অপরাধে স্কুল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিত আর গলা কাটতো শিক্ষকদের সে কথা লেখা আছে নোটগুলোতে। ওই সময় *লন্ডন টাইমস* পত্রিকা আফগান মুজাহিদদের বলত 'মুক্তিযোদ্ধা'। পরে মুজাহিদরা ৪৯ জন যাত্রীসহ একটি বেসামরিক আফগান বিমান ভূপতিত (ব্রিটিশ নির্মিত ব্লোপাইপ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে) করলে একই পত্রিকা তাদের বলল 'বিদ্রোহী'। মজার ব্যাপার, রুশরা ছাড়া আর কেউই তাদের তখন একবারও 'সন্ত্রাসবাদী' বলে নি।

১৯৯৬ সালে সুদান পাসপোর্ট বাতিল করে লাদেনকে বহিষ্কার করলে (যার পুরস্কার হিসেবে আমেরিকা এখন তার ওপর ক্ষেপণাস্ত্র মেরেছে!) তিনি আফগানিস্তানে ফিরে যান। ততোদিনে আফগান পোশাকধারী আরব যোদ্ধারা আলজেরিয়ার ক্ষমতাবঞ্চিত ইসলামপন্থীদের সঙ্গেও কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে।

ওসামা বিন লাদেন সৌদি শাসকদের বিবেচনা করেন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। তার মতে আবদুল আজিজ আল সউদ দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আইন চালু না করায় তারা জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। লাদেন বলেন, 'দেশটা যেন সউদ পরিবারের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তারপর খনিজ তেল আবিষ্কৃত হওয়ায় রাজপরিবার পেল আরেকটা বড় সমর্থন–পেট্রোডলার। অঢেল টাকা হাতে আসায় জনগণ যা চায় তাই দিয়ে তাদের খুশি করা হলো।' তবে ১৯৯০ সালে যা ঘটল সে তুলনায় এগুলো নিশ্চয়ই তুচ্ছ। '৯৬ সালে আফগানিস্তানে লাদেন বলেছিলেন আমাকে, 'ইরাক প্রতিবেশী কুয়েত দখল করে নেওয়ার পর দুই পবিত্র স্থানের দেশ সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করলে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শরীয়া আইনের ছাত্ররা জোর প্রতিবাদ জানান। সৌদি শাসকরা এত বড় ভুল করায় তাদের ভাঁওতাবাজি ধরা পড়ল। তারা কিনা সমর্থন জানাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশকে। দক্ষিণ ইয়েমেনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনী কমিউনিস্টদের সাহায্য করেছে সৌদি শাসকরা। আরাফাতকে তারা সহায়তা করেছে হামাসকে দমন করতে। আলেমদের অপমান ও কারাবন্দী করার পর সৌদি শাসকরা বৈধতা হারিয়ে ফেলেছিল।'

সৌদি আরব নাগরিকত্ব কেড়ে নিলেও এখনো যোগাযোগ রাখে ওসামার সঙ্গে। কারণ দেশের অনেক প্রভাবশালী লোক তার সমর্থক। ইসলামাবাদের সৌদি দূতাবাসের মাধ্যমে লাদেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে রিয়াদ। লাদেন আমাকে বলেছেন, সৌদি রাজপরিবারের এক দূত 'জেহাদ' ত্যাগ করার বিনিময়ে তার পরিবারকে ২০০ কোটি রিয়াল দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

সুদানের মরুপ্রান্তরে বসে কোনো একদিন লাদেনের মনে স্থির বিশ্বাস হয়, আফগানিস্তানকে রুশমুক্ত করতে পারলে মার্কিনিদেরও মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া করা সম্ভব তার পক্ষে। লাদেন আমাকে বলেছেন, সৌদি আরবের খোবারে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে '৯৬ সালের বোমা হামলায় তিনি জড়িত নন। তবে ওই ঘটনার জন্য সৌদি সরকার যে তিন তরুণের শিরচ্ছেদ করেছে তাদের দুজনকে তিনি চিনতেন।

লাদেন বলেন, 'ফিলিস্তিনে ৬০ জন ইহুদী মারা গেলে গোটা দুনিয়া এক হয়ে নিন্দার ঝড় তোলে, কিন্তু ৬ লাখ ইরাকি শিশুর মৃত্যুতে (মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে) সেরকম প্রতিক্রিয়া হয় না। ইরাকের শিশুদের এভাবে হত্যা করা ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের শামিল। অনেক মুসলিম দেশেই ক্রমশ আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের বিশ্বাসভাজন আলেমগণ আমেরিকাকে আরব থেকে উচ্ছেদ করা অবশ্য কর্তব্য বলে ফতোয়া দিয়েছেন।'

যুক্তরাষ্ট্র কেনিয়া ও তানজানিয়ায় তার দূতাবাস ভবনে বোমা হামলার কোনো কারণ স্বীকার করতে চায় না বলেই এ বিষয়টি খুব কম লোকের নজরে এসেছে যে, ১৯৯০ সালে সৌদি আরবে প্রথম মার্কিন সৈন্য প্রবেশের ঠিক অষ্টম বর্ষপূর্তির দিন ঘটে ওই হামলা।

লাদেনকে যখন আমি শেষবার দেখি তখনও জাতিসংঘ ক্যাম্পে ইসরায়েলী সৈন্যদের লেবাননী উদ্বাস্তু গণহত্যার বিষয়টি তার মন থেকে মোছে নি। ইসরায়েল দাবি করেছে ব্যাপারটি 'ভুলক্রমে' ঘটে গেছে। জাতিসংঘ তা একরকম মেনে নিয়েছে। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট একে বর্ণনা করেছেন শুধু একটি দুর্ঘটনা হিসেবে, যেন তা ছিল কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। লাদেনের ভাষায় এটা 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদেরই' এক নমুনা। তিনি বলেন, এ ঘটনার জন্য দায়ী ইসরায়েলীদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত।

গত আগস্টে ওসামা বিন লাদেন ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রায় একই কথা বলেছেন। কিন্তু এক বধিরের কথা কি আরেক বধিরের কানে ঢোকে?

অ দৃ শ্য আ ফ গা নি স্তা ন

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

রবার্ট ফিস্ক

‘দ্বিতীয় রাতেই, আমাদের পড়শির ঘরে বোমা পড়লো’

তরজমা: মানস চৌধুরী

এই অনুবাদটা মানস চৌধুরী আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। রবীন আহসান সম্পাদিত *যুদ্ধ ও যুদ্ধের রাজনীতি প্রসঙ্গ: আফগানিস্তান* বইয়েও এটা ছাপা হয়েছিল। মূল লেখাটা জেড নেট (www.zmag.org) থেকে নেয়া। লেখাটার আদি শিরোনাম “বোমা হামলায় তালিবান চিন্তিত নয়” বদলানো হয়েছে।

কথা বলবার আগে ডাক্তার সাহেব ভাবেন, প্রতিক্রিয়া এবং মতামতের জন্য লম্বা সময় ধরে ভাবেন। তাঁর কাহিনী কাবুলের আর পাঁচটার মত নয় এবং বেশ খ্যাতিমান হওয়াতে খোলাখুলি কথা বলা তাঁর পক্ষে সমস্যাজনক। তাঁর নাম প্রকাশ না করবার জন্য তিনি তিনবার আমায় বলেন। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কি পরিচয় তিনি চান, বললেন ভণিতা তিনি পছন্দ করেন না। ফলে তিনি ডাক্তারই থাকবেন, শিশুদের ডাক্তার যা তাঁর পরিচয় আর কি, যিনি তাঁর কাহিনী বললেন মাথায় একটা ছোট গোল সাদা টুপী পরে আর মুখে একটা বিরাট মলিন হাসি রেখে। তিনি তালিবান পছন্দ করেন না। কিন্তু তিনি আমেরিকানদের পছন্দ করেন না। তিনি গুছিয়ে কথা বলেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কাবুল বিমানবন্দরে আমেরিকানরা কী ধ্বংস করেছে, তিনি তৎক্ষণাত উত্তর করলেন। “তিনটা সামরিক বিমান এবং এরিয়ানা এয়ারলাইন্সের একটা রাশিয়ায় বানানো তুপোলেভ টিইউ-১৫২।” তাঁর প্রতি আমার আস্থা আছে।

খবরের কাগজবিহীন শহর কাবুলে রেডিওর গুঞ্জন। “আমরা সবগুলো স্টেশন ধরি যেহেতু বিভিন্ন সময়ে সেগুলো খোলে – পশতু ভাষায় ভয়েস অব আমেরিকা সন্ধ্যা ৭টায়, তারপর রাত ৮টায় বিবিসির পশতু অনুষ্ঠান ধরি,” ডাক্তার বলে চলেন। “বিবিসির সবচেয়ে ভালো অনুষ্ঠান হচ্ছে দারি (পার্সিয়ান) সম্প্রচার – এটা হচ্ছে মাজালায়া ওস্যাইয়েহ মায়োনা (সেণ্ট্রাল এশিয়া ম্যাগাজিন) যা ভালোমতই জানে আফগানিস্তানে কী হচ্ছে – আর জঘন্য হলো ইরানী রেডিও’র অনুষ্ঠান একদম ভুলভালে ভরা। মার্কিন আক্রমণের আগে এরা মনোযোগ দিলো তালিবান বিরোধী প্রচারণায়। কিন্তু হামলার পর, এরা তালিবান নিয়ে কিচ্ছু বলে না – শুধু মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে বলে এবং প্রচুর পরিমাণে পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা।” এবং তালিবান আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কিছু পরিবার

টেলিভিশন দেখে। "টেলিভিশন দেখে লুকিয়ে, পাতাল ঘরে, ছোট ছোট ডিশের সঙ্গে লাইন লাগানো। এবং যখন তারা দেখলো পাওয়েল এবং মোশাররফ একত্রে, হাত ধরে আছে এবং বন্ধু বন্ধু ভাব, তো অধিকাংশ লোকই যখন এটা দেখলো – যখন তারা বুঝলো যে মার্কিন-পাকিস্তান সহযোগিতা হতে যাচ্ছে – তারা অনুভব করলো যে তাদের বিরুদ্ধে একটা নতুন আগ্রাসন।" মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল এবং পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ইসলামাবাদে সাক্ষাৎ করেছেন ১৬ই অক্টোবর।

রেডিও আর টেলিভিশন অস্ফুট স্বরে চলতে থাকা কাবুলের ঐ কুঠুরীগুলোর অভ্যন্তরে দানা বাঁধা সন্দেহ অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। ইরানীরা তালিবানকে ঘৃণা করে, কিন্তু তারা মার্কিনীদের ঘৃণা করে আরও বেশি। পাকিস্তানীরা তালিবান তৈরিতে মদদ দিয়েছে। এখন মার্কিনীরা পাকিস্তানীদের বন্ধু। ডাক্তার সাহেব খানিক্ষণ বিরতি দিলেন যখন আমি অদৃশ্য সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা করছি। "তুমি নিশ্চয়ই কিছু টের পাচ্ছো" হঠাৎই বললেন তিনি। "অধিকাংশ মানুষজন, নিরপেক্ষ মানুষজন যারা ধরো রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত নয়, তারা মার্কিন নীতিমালা একেবারেই ঘৃণা করে – এবং তালিবান যদি মানুষজনের বিপক্ষে তাদের নীতিমালার নিছক ২০ ভাগও বদলায়, তাহলে লোকজন তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। আমরা অপেক্ষায় আছি কবে নারীর বিপক্ষে এবং শিক্ষার বিপক্ষে তালিবান নীতিমালার সমাপ্তি ঘটবে। দেখ, মানুষজন কোনওদিনও ভুলবে না পাকিস্তান আফগানিস্তানকে অমর্যাদা করার জন্য কী না করেছে – তারা পাকিস্তানকে জন্মের শত্রু হিসেবে দেখে।" ডাক্তার সাহেব বুঝতে চাইলেন তিনি যা বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি কিনা। তার মানে আফগানরা কেবল নিজেদেরই বিশ্বাস করতে পারে? আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সম্মতিতে মাথা নাড়লেন। "শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ১১ই সেপ্টেম্বর একটা নতুন অবস্থা তৈরি করেছে। আমরা জানতাম আমেরিকা তালিবান এবং ওসামাকে বানাতে সাহায্য করেছে – আফগানিস্তানে কেউ "বিন লাদেন" যোগ করবার তোয়াক্কা করে না – "এবং আমরা ওদেরকে মার্কিন এবং পাকিস্তানের 'বাচ্চা' বলতাম। প্রথম রাতে হামলার সময়, আমরা ঠিক জানি না কী হতে যাচ্ছে। একেবারেই অকস্মাৎ বোমা ফেলা শুরু হয়েছে। কোন সাধারণ লোক হতাহত হয়নি। পরে, মার্কিনীরা নিরীহ লোকজন নিশানা করতে শুরু করেছে। কারো কারো অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো এবং তাদেরকে শহরের কেন্দ্রে জুম্হারিয়েত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু হাসপাতালে যাবার পথে তালিবান আমাদের বাধা দিলো। আমাদের কোন যোগাযোগই ছিল না।" ডাক্তার সাহেব খুবই তিক্ত স্বরে অভিযোগ করলেন যে হাসপাতালে না আছে ওষুধপত্র না আছে যন্ত্রপাতি – "বাসাতেই চিকিৎসা বরং ভালো," এক পর্যায়ে তিনি এটাই বললেন – কিন্তু তিনি আরও ক্ষিপ্ত কাবুলে টানা বোমা বর্ষণে। "দ্বিতীয় রাতেই, আমাদের পড়শির ঘরে বোমা পড়লো। একটা দেয়াল লোকজনের গায়ের উপর পড়েছে, কিন্তু কেউ মারা যায় নি। তারা হাসি-মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যখন সামরিক নিশানাগুলোতে হামলা হলো, তালিবান আমাদেরকে যেতে দিলো না ঠিক হাসপাতালের মত। তারপর তালিবান ঘোষণা দিলো লোকজন যাতে ঘরের ভেতর থেকে না বেরোয়। আমাদের বাড়ির আশপাশে থাকতে হলো। তারপর তারা আমাদের ঘরের মধ্যেই থাকতে বললো।" কাবুলের পাহাড়ে হামলার পর বাড়িঘর বিধ্বস্ত হলে ডাক্তার সাহেব আহতদের সেবা করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তালিবান আবার রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

"শুরুতে, ৯০ ভাগ বোমাই নিশানায় ছিলো, কিন্তু তারপর মার্কিনীরা ১০০০ পাউণ্ডের বোমা মারা শুরু করলো এবং আশপাশের এলাকা সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলো। যখন তারা

টেলিভিশন টাওয়ারে আঘাত করছে আমাদের বাড়িঘর কেঁপে উঠেছে, মাটি কেঁপে উঠেছে এবং চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ। তারপর রেডিও শরিয়ত (তালিবান রেডিও) বন্ধ হয়ে গেলো কিন্তু পরের দিনই দেখি তারা নতুন এন্টেনা লাগানোর কাজ করছে। তালিবান সব সময় তাই করছে। যতবার কোন কিছু ধ্বংস করা হচ্ছে, তারা সাথে সাথেই আরেকটা বসাচ্ছে। তারা সর্বত্র ঘুরে ঘুরে যত ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতি আছে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এই হামলার ব্যাপারে তালিবান একেবারে অবিচলিত।" ডাক্তার সাহেব আবার বিরতি দিলেন। "আমি আসলে বর্ণনার চেষ্টা করছি মার্কিন হামলার প্রতি তালিবান প্রতিক্রিয়া। বুঝতে পারছো? হামলার ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ ছিলো না। ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক – আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

"অনেককেই তালিবান বলেছে যে তারা জিততে যাচ্ছে। প্রতি রাতে, মার্কিনীরা কাবুলের কাছে বোমা মেরেছে। কিন্তু প্রত্যেক রাতেই বোমা ফেলার বৃত্তটা কেন্দ্রের দিকে ক্রমে ছোট হয়ে এসেছে – ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর।" ডাক্তার সাহেব বললেন, যে চারজন মাইন-অপসারণকারী আফগান মার্কিন হামলায় মারা গেছেন তাঁরা মরেছেন কারণ তাঁদের অফিস রেডিও আফগানিস্তান থেকে ভাড়া করা ছিলো, ট্রান্সমিটার ধ্বংস হবার সময়েই তাঁরা মারা গেছেন।

"রাতের বেলায়, আমরা ভারী সব শব্দ শুনি, বিমানের পাখার আওয়াজ, মনে হয় খুব নিচ দিয়ে যাওয়া উড়োজাহাজ আর আমরা শুনলাম এগুলো নাকি 'ডিসকভারি' বিমান। আচ্ছা 'ডিসকভারি' বিমানটা আবার কি?" ডাক্তারকে বললাম যে আমার মনে হয় এগুলো পাইলটবিহীন গোয়েন্দা বিমান এগুলো বোমা মারা জায়গার ছবি তুলতে যায়, সামরিক ভাষায় একে "পতঙ্গ" (drones) বলে, এই এক ধরনের বিমানকেই তালিবান গুলি করে নামাতে পারে – অন্তত এখন পর্যন্ত তো তাই। ডাক্তার সাহেবের কাহিনী ক্রমান্বিক। প্রথম শুক্রবার মার্কিনীরা হামলা করলো মাগরিবের নামাজের পর, একটা পেট্রোল ডিপোতে। "একটা ভূমিকম্পের মত মনে হলো – মাটি আবার কেঁপে উঠলো।" এরপর মার্কিনীরা পরিবহণ ডিপোর দিকে তাক করলো, ১৯৯০ তে সোভিয়েতরা যে পুরাতন বাস-ট্রাক রেখে গেছিলো, তারপর তথাকথিত বাবাজান বাহিনীর পরিত্যক্ত ব্যারাকগুলো। বাবাজান বহুকাল আগেই কাবুল ছেড়ে গেছে। সে এখন তথাকথিত নর্দার্ন এ্যালায়েন্সের একজন যোদ্ধা।

"পরবর্তী নিশানা হলো গিয়ে কাবুলের এক মাইল উত্তরে একটা ছোট উপত্যকা যেখানে ০১৫ ব্যাটালিয়ন তালিবানের খাদ্যগুদাম পাহারা দিচ্ছিলো। মার্কিনীরা বোমা মেরে খাবারের পুরো সঞ্চয় ধ্বংস করলো। ছয়টা শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করেছে তারা একটু পর পর সেগুলো ফেটেছে এবং আশপাশের বাড়িঘর – তাদের জানালা, দরজা, ছাদ সব চুরমার হয়ে গেছে।" ডাক্তার সাহেব মাথা নাড়তে থাকলেন। যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত তিনি কাবুলে ফিরবেন না।

"কাবুলের কিছু লোক, আমার কিছু বন্ধুবান্ধব, মনে করে যে আমেরিকা আক্রমণ করবে। অন্য কেউ কেউ বিশ্বাস করে – আশা করে – যদি (সাবেক বাদশাহ) জহির শাহ আসেন, হয়তো তিনি কোন সুরাহা করতে পারবেন এবং যুদ্ধটা শেষ হবে। তুলনামূলকভাবে শিক্ষিতরা মনে করে যে মার্কিনীরা আফগানিস্তানে লম্বা সময় থেকে যাবে। আমার কথা যদি বলো, আমার কাছে পাকিস্তানীরা, মার্কিনীরা এবং তালিবান আর ওসামা সবই সমান।"

"যদি ওসামা সন্ত্রাসবাদীর আচরণ করে থাকে, তাহলে মার্কিনীরাও তাই করছে, সন্ত্রাসবাদীর মত কাজ করছে এখন। যদি জহির শাহ আসেন, তোমার কি মনে হয় না মার্কিন উপদেষ্টারা তার পেছনে থাকবে? আমার নিজের অনুভূতি হচ্ছে মার্কিনীরা বোকামি করছে। অপেক্ষা করো, তুমি নিজেই দেখবে।"

পেশোয়ার। অক্টোবর ২৭, ২০০১

আফাজউদ্দিন বিপ্লব

অন্যরকম মোল্লা ওমর

এই লেখাটা দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকার ১৮ই জানুয়ারি ২০০২ তারিখের সংখ্যা থেকে নেয়া। আফগানিস্তান সম্পর্কে প্রচলিত প্রচারণা-গণ্ডির বাইরের ধারণা এই লেখা থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও পাওয়া যায় বলে এর গুরুত্ব। মোল্লা ওমর সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক ইমেজ নির্মাণ করা উদ্দেশ্য হিসাবে আমাদের মনে জারি ছিল না সেই কথাটা বলে রাখা দরকার। পাঠকের বিচার পাঠকের।

আফগান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে দীর্ঘ প্রায় চার মাসেও তারা এ যুদ্ধে তাদের মূল লক্ষ্য ওসামা বিন লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা মোল্লা ওমরের নাগাল পায়নি। অত্যাধুনিক সব সমরাস্ত্র দিয়ে টানা দুই মাস হামলা করে মার্কিন বাহিনী তালেবান শাসনের পতন ঘটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তালেবানের শীর্ষ নেতা মোল্লা ওমর তাদের কাছে এখনও অধরাই রয়ে গেলেন। বেশ কয়েকবার খুব কাছাকাছি পৌঁছে দুর্ধর্ষ মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডোরা কাবু করতে পারেনি স্বঘোষিত আমিরুল মুমেনীন মোল্লা ওমরকে। ধীরস্থির ও দৃঢ়চিত্তের এই নেতার চাল-চলন ও বেশভূষার কারণেই তাকে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে! তাকে ধরতে না পারার এ রহস্য জানান তারই দীর্ঘদিনের সহযোগী ও ব্যক্তিগত ড্রাইভার কারী সাহিব। সাহিব বর্তমানে পাকিস্তানে আত্মগোপন করে আছেন। সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানিয়েছেন তার মনিবের বহু অজানা কথা।

গত ৭ অক্টোবর মার্কিন বাহিনী যখন কাবুলে মোল্লা ওমরের বাড়িতে বিমান হামলা চালিয়ে আফগান যুদ্ধ শুরু করে তখন মোল্লা ওমর ওই বাড়িতেই ছিলেন। অনুসারীরা এ সময় তাকে বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করার জন্য বারবার অনুরোধ করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বুশও যদি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি ঘর ছাড়ব না।' এ সময় তার উপদেষ্টারা জানালেন, আমেরিকা এবার রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। তাতেও বিচলতি হননি মোল্লা ওমর। তিনি গ্যাস মাস্ক পরে থাকবেন বলে জানালেন। কিন্তু মাস্ক পরে কয়েক ঘণ্টার বেশি থাকা যায় না– এ কথা জানানোর পর তিনি স্থান ত্যাগে রাজি হন। তার গাড়ির বহরে মার্কিন বাহিনী হামলা করতে পারে– এই ভেবে তিনি রিকশায় চড়ে শহরের ব্যস্ত লোকালয়ে মিশে যান। পরে কাদামাটিতে ঢাকা একটি ট্রাকে চড়ে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

তিনি অজানা গন্তব্যে চলে যান।

টানা বিমান হামলা ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের আক্রমণ এবং স্পেশাল ফোর্সের অভিযানের ফলে আফগানিস্তানে তালেবান যখন নাজুক অবস্থায় তখন মার্কিন সৈন্যরা একবার মোল্লা ওমরের বাড়ি ঘেরাও করে। কিন্তু সে সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তবে তার সমর্থকরা এ সময় বাড়ির চারপাশেই লুকিয়ে ছিল। যাহোক, শেষতক তালেবানের পতন ঘটল, বহু তালেবানকে বন্দি করা হল, কিন্তু তাদের শীর্ষ নেতা মোল্লা ওমর কোথায়? তিনি কি সীমান্ত গলিয়ে দেশের বাইরে চলে গেছেন? না। সাহিব জানান, 'আমিরুল মু'মেনীন দেশেই আত্মগোপন করে আছেন।'

পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো মোল্লা ওমরকে এক পৈশাচিক ব্যক্তিত্ব রূপে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু সাহিব জানান একেবারে উল্টো। তিনি বলেন, কোন গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খলা বাধলেই সবাই দৌড়ে আসত মোল্লা ওমরের কাছে। ঝগড়া মীমাংসার ব্যাপারে তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ছিলেন দুর্নীতির ঘোর বিরোধী। তবে শেষের দিকে তিনি বেশ দুর্বল চিত্ত হয়ে পড়েন এবং ওসামা বিন লাদেনের ক্রীড়নকে পরিণত হন। একেক সময় একেক ধরনের বেশ ধরে সাধারণের চোখ ফাঁকি দেয়া তার জন্য কোন ব্যাপারই না। সাহিব জানান, প্রকৃতপক্ষে মোল্লা ওমরের নেতৃত্বের ধরন ছিল সপ্তম শতকের সাহাবী খলিফা ওমরের মতো। অনেক সময় রাতে তিনি একা একাই বের হয়ে যেতেন। কখনও হেঁটে, কখনও বা ভাঙাচোরা একটি মোটর সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন শহর কিংবা উপশহরের অলিতে গলিতে। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। তালেবান শাসনামলে তারা শান্তি তে আছে কিনা জানতে চাইতেন। মোল্লা ওমরের জন্ম ও শৈশব তেমন সমৃদ্ধ ছিল না। রাস্তার ধারে এক কুঁড়েঘরে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি। কোন মতে নাম দস্তখত করতে পারেন। তবে তার মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব ছিল না। আশির দশকে সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একটি চোখ হারান। পরে নব্বইয়ের দশকে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আইন-শৃঙ্খলাহীন রাস্তাঘাটের পাশে ওঁৎ পেতে থাকা যৌন শিকারীদের কঠোর হাতে দমন করে তিনি আফগানবাসীর কাছে কিংবদন্তিতে পরিণত হন। এ সময় তিনি এক নারী ধর্ষণকারীকে ধরে এনে ট্যাংকের ব্যারেলে ঝুলিয়ে মারেন। এতে কাবুল জুড়ে বাহবা বাহবা পড়ে যায়। ১৯৯৬ সালে তিনি 'আমিরুল মু'মেনীন' উপাধিতে ভূষিত হন।' শীর্ষ নেতা হলেও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস করতেন না। প্রতি রাতে মাংস পরিবেশন করলেই বাবুর্চিকে তিনি তিরস্কার করে বলতেন, বাইরে আমার সৈন্যরা না খেয়ে আছে। তারা হচ্ছে আমার শক্তি। তার জন্য নতুন গাড়ি আনা হলে সেগুলো তিনি কমান্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এক সময় তার এত বেশি সহচর হয়ে পড়েছিল যে, তার অফিসে আর জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, তার অফিস সর্বত্রই। তবুও তিনি সহচরদের বিমুখ করেননি। তালেবান শাসন কায়েম করে দেশে গান-বাজনা নিষিদ্ধ করলেও তিনি গাড়িতে চড়েই প্রখ্যাত তালেবান শিল্পী সারাজির দেশাত্মবোধক গানের সিডি ছেড়ে হেডফোন লাগিয়ে বসতেন। এক সময় তিনি গুনগুন করে নিজেও গেয়ে উঠেন, 'এই আমার দেশ, বাঘ সিংহের দেশ, সুউচ্চ পর্বতমালা, নদীনালা আর সবুজের চাদর বিছানো আমার এই দেশ, সর্বোপরি শত শহীদের রক্তে ভেজা এই দেশ আমার। আমরা শত্রুকে দেই উচিত শিক্ষা, বিশাল এই দেশকে আমরা আগলে রাখি।'

তিনি বেশ রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। গত বছর যখন কাবুলে তার বহুকক্ষ বিশিষ্ট বাড়িটি নির্মাণ করা হয় তখন তিনি দেয়ালে একটি চিত্রকর্ম ঝুলিয়েছিলেন, যেখানে ছিল একটি

ফুল আর একটি যুদ্ধ বিমানের প্রতিকৃতি। গোটা বাড়িটিতে তিনি তার চার স্ত্রী ও ১২ সন্তান নিয়ে বাস করতেন। সন্তানদের যেন কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে তিনি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। মোল্লা ওমরের বাড়িটির প্রতি-তলায় ছিল ১০টি করে কক্ষ। তিন স্ত্রীর জন্য তিনি এগুলো ভাগ করে দিয়েছিলেন। চতুর্থ স্ত্রীর জন্য তিনি এ ভবনের সঙ্গে আরেকটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ভবন তৈরি করেন। মোল্লা ওমরের চতুর্থ স্ত্রী নিয়ে অনেক গুঞ্জন আছে। এক সময় শোনা গিয়েছিল এই চতুর্থ স্ত্রী হচ্ছে ওসামা বিন লাদেনের কন্যা। আসলে তা ঠিক নয়। সাহিব জানান, লাদেনের মেয়েকে যাতে বিয়ে না করতে হয় সে জন্যই দুরদর্শী মোল্লা ওমর অন্যত্র চতুর্থ বিয়ে করে ফেলেন। শরীয়ত অনুযায়ী তখন আর তাকে লাদেনের কন্যাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দেয়া যায়নি। এভাবেই তিনি তার পরিবারের ভবিষ্যৎ দুর্দশা থেকে রক্ষা পান বলে সাহিব জানান।

যুদ্ধঃ দস্যুর দাপট, সম্রাটের সন্ত্রাস

ফাহমিদুল হক
রিফাত ফাতিমা

আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধঃ সন্ত্রাস দমন অথবা তেল উত্তোলন

> আমাদের মধ্য থেকে ফাহমিদ আর রিফাতের দায়িত্ব ছিল আফগানিস্তানে পশ্চিমা আগ্রাসনের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি উদঘাটন করার। অনেক পরিশ্রম করে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা দুজন। এই লেখা অত্যন্ত জোর দিয়ে প্রমাণ করেছে 'সন্ত্রাসবিরোধী' যুদ্ধ মর্মবস্তুর দিক দিয়ে জ্বালানী-যুদ্ধ।

আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধ প্রায় শেষ। এই যুদ্ধের কারণ কী ছিল? ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এ নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পাল্টা জবাব ছিল এই যুদ্ধ? মৌলবাদী মুসলমান, সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে এই 'ক্রুসেড'? কিংবা ওসামা বিন লাদেন বা তার আল কায়েদা নেটওয়ার্ক অথবা তালিবানরা এককভাবে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী? যদি বলা হয়, এর কোনোটাই আফগান যুদ্ধের প্রধান কোনো কারণ নয়, এগুলোকে কারণ হিসেবে বিশ্ববাসীকে দেখানো হচ্ছে (আইওয়াশও বলা যায় একে), মূল কারণ অন্য কিছু, তবে পাঠকরা কি চমকে উঠবেন? টুইন টাওয়ারে বোমা হামলা হয়, আর কোনো প্রমাণ ছাড়াই কেন আমেরিকা কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে এসে বোমা হামলা করে? 'ইনফিনিট জাস্টিস'-এর জন্য কেন আমেরিকা দেশটাকে ধ্বংস করে গুঁড়িয়ে ফেলেছে? লাখ লাখ আফগান শিশু অনাহারে ধুঁকছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রধান সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেন বা তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর কেন ধরা পড়ছে না? একজনকে ধরতে কেন একটি দেশ ধ্বংস করার প্রয়োজন পড়ে?

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মধ্য এশিয়ার দেশগুলো পৃথক হয়ে যাবার পর ভঙ্গুর অর্থনীতিকে জোরদার করার জন্য সেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের বিপুল পরিমাণের রিজার্ভ তেল-গ্যাস রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বর্তমানে মধ্য এশিয়ার বিশাল রিজার্ভ থেকে তেল-গ্যাস রফতানির জন্য বেশ কয়েকটি পাইপলাইন নির্মাণের প্রক্রিয়া বা পরিকল্পনা চালু আছে। সবকটি পাইপলাইনেই কয়েক বিলিয়ন করে খরচ পড়বে লাইন নির্মাণ বাবদ। এছাড়া কাস্পিয়ান বেসিন থেকে পশ্চিম, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব দিকের সব রুটেই গুরুতর রাজনৈতিক প্রতিকূলতা রয়েছে (অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে)। যদি আফগানিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে, তবে

তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান রুট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব হবে (এই রুটটি কম ব্যয়সাপেক্ষ, সম্ভাবনাময় এশীয় বাজারে তেল-গ্যাস রফতানির জন্য এটাই সর্বোত্তম রুট)। এজন্যই যখন আফগানিস্তানে তালেবানদের দখলদারিত্ব সম্প্রসারিত হচ্ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন করেছে, নানাভাবে সাহায্যও করেছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল তালেবানরাই পুরো আফগানিস্তানে একক শাসন কায়েম করবে এবং আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু এক পর্যায়ে তালেবানদের সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র-সরকার ও মার্কিন তেল-কোম্পানি ইউনোকল নিজ দেশে ব্যাপকভাবে নারীবাদী ও মানবাধিকার গোষ্ঠীসমূহের সমালোচনার মুখে পড়ে (তালেবান শাসনকার্যে নারীরা চরমভাবে নিগৃহীত হচ্ছিল ও মানবতার ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছিল, যদিও আফগানিস্তানে কোনোকালেই নারীর সম্মান ছিল না)। এছাড়া ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কেনিয়ায় ও তানজানিয়ার মার্কিন দূতাবাসে হামলার অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্র ক্রুজ মিসাইলের মাধ্যমে আফগানিস্তানে হামলা চালালে (লাদেন সৌদি নাগরিক হলেও তিনি তালেবানদের আশ্রয়ে ছিলেন) তালেবানদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে, ১৯৯৮ সালে ইউনোকল পাইপলাইন নির্মাণের প্রকল্প বাতিল ঘোষণা করে (যদিও এরপরও গোপনে ইউনোকলের পাইপলাইন নির্মাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল)। এরপর ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পরে যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা হয় তালেবানদের উৎখাতের মাধ্যমে আফগানিস্তানে একটি পুতুল-সরকার বসাতে, পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে এবং সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে পুরো মধ্য এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিশ্চিত করতে। আফগানিস্তান-যুদ্ধ প্রায় শেষ, পুতুল-সরকার সেখানে বসানো হয়ে গিয়েছে, সামরিক উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে (এই উপস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই) এবং অচিরেই পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হবে। পুরো ব্যাপারটা হলো এই; ব্যাপারটা এমনই সহজ, এমনই পরিষ্কার। তেল-গ্যাসের জন্য আমেরিকা যে যেকোনো রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, ইতিহাসেও তার সমর্থন রয়েছে।[১] ফরহাদ মজহার যেমন বলেছেন, "... এই দাহ্য পদার্থগুলোই সভ্যতার প্রধান সংকট ...।" (মজহার, *চিন্তা*, ডিসেম্বর ২০০১)

আর *সিএনএন-একুশে টিভি*-দেখা, *প্রথম আলো-ইত্তেফাক*-পড়া পাঠক-দর্শকের মনে যদি যা বলা হলো, সে-ব্যাপারে সংশয় থাকে তবে এই নিবন্ধটি কষ্ট করে পড়তে হবে কিংবা এই নিবন্ধের শেষে যে-তথ্যপঞ্জির তালিকা দেয়া আছে তা পড়ে নিতে হবে। কারণ আধিপত্যশীল মিডিয়াতে প্রকৃত সত্য প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়, বস্তুত পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোতে পশ্চিমা স্বার্থটাকেই ইনিয়ে বিনিয়ে বয়ান করা হয়, আর আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো পশ্চিমা সংবাদ-সংস্থাগুলোর পরিবেশিত সংবাদই হুবহু ছাপিয়ে থাকে। (আন্তর্জাতিক হিসেবে পরিচিত মার্কিন মালিকানার সংবাদমাধ্যমগুলো কীভাবে এবং কী-মাত্রায় মার্কিন-সরকারের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে এবং এজন্য ডাঁহা মিথ্যা কথা বলে থাকে তা জানার জন্য মার্কিন লেখক মাইকেল প্যারেন্টির *ইনভেন্টিং রিয়েলিটি* বইটি পড়া যেতে পারে।)

মধ্য এশিয়ার তেলকাহিনী

মধ্য এশিয়া বলতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি দেশ কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও আজারবাইজানকে নিয়ে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলটিকে বলা হয়ে থাকে। দেশগুলো কাস্পিয়ান সাগরের আশপাশে অবস্থিত বলে অঞ্চলটিকে কাস্পিয়ান-অঞ্চল বা কাস্পিয়ান-বেসিনও বলা হয়ে থাকে। সোভিয়েত শাসনের সময় মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর

অর্থনীতি ছিল রাশিয়ামুখী, অনেকক্ষেত্রে রাশিয়ানির্ভর। ৭০ বছর ধরে তাদের রাস্তাঘাট, রেললাইন, পাইপলাইন, সবই ছিল রাশিয়ামুখী। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর তারা আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইলো। সোভিয়েত আমলে দক্ষিণের মুসলিম-প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ ছিল; ১৯৯১ সালে এই সীমান্তগুলো খুলে দেয়া হয়। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো দেশগুলো তাদের তেল-গ্যাস রফতানির মাধ্যমে দ্রুত নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বানাতে চাইলো। পশ্চিমা তেল-কোম্পানিগুলোকে আমন্ত্রণ জানালো, সম্পদ উত্তোলনের জন্য ও রফতানির ব্যবস্থা করার জন্য (ব্যাপারটাকে এভাবেও বলা যায়: পশ্চিমা তেল-কোম্পানিগুলো তেলের গন্ধে ছুটে এলো)। মধ্য এশিয়ার দেশগুলো, পশ্চিমা তেল-কোম্পানিগুলো এবং প্রস্তাবিত রুটের আওতাধীন ভৌগোলিক রাষ্ট্রগুলো সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তুরস্ক– এই দেশগুলো একটি সর্বনাশা 'গেম'-এ জড়িয়ে পড়ে। আহমেদ রশিদ একে বলেছেন 'দি নিউ গ্রেট গেম'।

আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া বিষয়ে সাংবাদিকতা করে বিখ্যাত পাকিস্তানি সাংবাদিক আহমেদ রশিদ ২০০০ সালে *Taliban: Islam Oil and New Great Game in Central Asia* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরে ২০০১ সালে সেই বইটিই *Taliban: The Story of Afghan Warlords* নামে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আফগানিস্তানের দখলদারিত্ব নিয়ে ব্রিটিশ-ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে দু'বার যুদ্ধ হয়। ব্রিটেন ও রাশিয়ার এই দ্বন্দ্বকে 'গ্রেট গেম' বলা হয়ে থাকে। আর মধ্য এশিয়ায় পাইপলাইন নিয়ে যুদ্ধকে তিনি 'দি নিউ গ্রেট গেম' বলছেন। আহমেদ রশিদ তার বইতে মধ্য এশিয়ার তেল-সম্পদের সঙ্গে তালিবানদের উত্থানের সম্পর্ককে বলেছেন 'তালেবানকে প্রণয়াভিসারে ডাকা' (Romancing the Taliban)। তিনটি অধ্যায়ে তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাপারটি বর্ণনা করেছেন।

পশ্চিমা তেল-কোম্পানিগুলো কাজাখস্তানে ১৯৯৩-৯৪ সালে, আজারবাইজানে ১৯৯৫-৯৭ সালে এবং সবশেষে তুর্কমেনিস্তানে ১৯৯৭-৯৯ সালে তেল-গ্যাস উত্তোলনের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ১৩টি দেশের ২৪টি তেল-কোম্পানি কাস্পিয়ান অঞ্চলে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কাজাখস্তানের রয়েছে সবচেয়ে বেশি তেলের রিজার্ভ, যার পরিমাণ আনুমানিক ৮৫ বিবি (বিলিয়ন ব্যারেল); কিন্তু প্রমাণিত রিজার্ভের পরিমাণ ১০-১৬ বিবি। (মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশের তেলের রিজার্ভের পরিমাণ জানতে সারণী ১ দ্রষ্টব্য) কাস্পিয়ান অঞ্চলে প্রমাণিত গ্যাস-রিজার্ভ ২৩৬-৩৩৭ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট (টিসিএফ), যেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের রিজার্ভ ৩০০ টিসিএফ। তুর্কমেনিস্তান পৃথিবীর একাদশতম গ্যাস-রিজার্ভের দেশ; এখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাব্য রিজার্ভ হলো ১৫৯ টিসিএফ। (মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভের পরিমাণ জানতে সারণী ২ দ্রষ্টব্য) গ্যাসের চাহিদা পৃথিবীব্যাপী অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবেশ-সহায়ক, সিএনজি প্রায় দূষণমুক্ত একটি জ্বালানি। একটি ওয়েবসাইট (www.naturalgas.org)-এর মতে

> সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাস আন্তর্জাতিক পণ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চয় আনুমানিক ৪,৯০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট; পৃথিবীর সমগ্র পেট্রোলিয়াম সঞ্চয়ের ৪৭% গ্যাস। এর মধ্যে ৪০% রয়েছে মধ্য এশিয়ার সাবেক সোভিয়েত দেশসমূহে এবং ৩৭% রয়েছে আরব উপসাগরীয় দেশসমূহে। ... অন্যদিকে, বর্তমানে সারা বিশ্বের মোট পেট্রোলিয়াম-উৎপাদনের মধ্যে গ্যাস ও তরল গ্যাস-এর পরিমাণ ৪২%। (Jon Flanders; *Gas, oil and Afghanistan*, http://members.localnet.com)

সারণী ১: মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর তেলের রিজার্ভ (*Taliban*, Ahmed Rashid, p. 144)

দেশ	সম্ভাব্য রিজার্ভ	প্রমাণিত রিজার্ভ
কাজাখস্তান	৮৫ বিলিয়ন ব্যারেল	১০-১৬ বিলিয়ন ব্যারেল
আজারবাইজান	২৭ বিলিয়ন ব্যারেল	৪-১১ বিলিয়ন ব্যারেল
তুর্কমেনিস্তান	৩২ বিলিয়ন ব্যারেল	১.৫ বিলিয়ন ব্যারেল
উজবেকিস্তান	১ বিলিয়ন ব্যারেল	-

সারণী ২: মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর গ্যাসের রিজার্ভ (*Taliban*, Ahmed Rashid, p. 144)

দেশ	সম্ভাব্য রিজার্ভ
কাজাখস্তান	৮৮ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট
আজারবাইজান	৩৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট
তুর্কমেনিস্তান	১৫৯ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট
উজবেকিস্তান	১১০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট

বোঝাই যাচ্ছে তেল-গ্যাসের রিজার্ভের দিক থেকে মধ্য এশিয়া একটি আকর্ষণীয় স্থান। আর এরকম একটি 'তেলাকর্ষণীয়' স্থানে আমেরিকার তেল-কোম্পানিগুলো এসে হাজির হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বরং এটা খুবই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হলো, আমেরিকার তেল কোম্পানি আসা মানেই, আমেরিকার আসা হয় কি না। খুবই হয়। তেল-কোম্পানিগুলো আমেরিকাকে যে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ফেরত দেয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেসব আলোচনায় না গিয়ে, কোনো ইতিহাস-প্রমাণ হাজির না করেই, বলা যায়, বর্তমান বুশ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই তেল-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ স্বয়ং খুব সম্প্রতি দেওলিয়া হয়ে যাওয়া এনরনসহ লোকসানগ্রস্ত কয়েকটি তেল-কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। বুশের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী কনডোলেজা রাইজ ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শেভরন তেল-কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ছিলেন হেলিবার্টন নামক কোম্পানির প্রধান নির্বাহী, যে-কোম্পানিটি তেল-কোম্পানিগুলোর কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে।

> হেলিবার্টনের ভূমিকা সম্পর্কে ১৯৯৮ সালে একটি কনফারেন্সে ডিক চেনি বলেন, 'আমাদের ব্যবসার ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশই জ্বালানি-বিষয়ক। ইউনোকল, এক্সন, শেল, শেভরন এবং পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ তেল-কোম্পানিগুলোকে আমরা সহায়তা করি। ফলে প্রায়ই আমাদের প্রতিকূল স্থানে কাজ করতে হয়। ঈশ্বর এমন সব স্থানে তেল-গ্যাসের ভাণ্ডার দিয়েছেন যেখানে গণতান্ত্রিক শাসন নেই, এবং এরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়। কখনও এমন জায়গায় আমাদের যেতে হয় যেখানে সাধারণত কেউ যেতে চাইবে না। কিন্তু আমরা ব্যবসার খাতিরে সব জায়গায় যাই।' (Jon Flanders; *Gas, oil and Afghanistan*, http://members.localnet.com)

ডিক চেনিদের যে মধ্য এশিয়ায় তেলের গন্ধে ছুটে আসতে হয়েছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহই থাকে না, তার এই সত্যভাষণ আমাদের নিঃসংশয় করে। ব্যবসার খাতিরে তারা যেমন পৃথিবীর যেকোনো স্থানে যান, তেমনি ব্যবসার খাতিরে তারা যেকোনো কুকর্ম করতে পিছপা হন না। সেটা যুদ্ধ হতে পারে, সেটা রাষ্ট্রীয় আইন পরিবর্তন বা উপেক্ষা হতে পারে, ঘুষ হতে পারে, অবলীলায় মানুষ খুন হতে পারে। তেল-কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক বাজেট বাংলাদেশের মতো দেশের বাৎসরিক বাজেটের চেয়েও অনেক বেশি হয়ে থাকে। এজন্য যেকোনো কুকর্ম করতে

তাদের তেমন বেগ পেতে হয় না; আর তাদের পেছনে মার্কিন সরকারের সমর্থন তো থাকেই। এখানে হেলিবার্টন কোম্পানির কিছু কুকর্মের নমুনা দেয়া হলো।

নাইজেরিয়ায় তেল-গ্যাস লুটপাটের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসে, তাদের ওপরে নাইজেরীয় মোবাইল পুলিশ ইউনিট নির্বিচারে গুলি চালায়। এই গুলিবর্ষণের ঘটনায় হেলিবার্টন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে জানা যায়। একই দেশে শেল ও শেভরন কোম্পানির সম্পদ রক্ষার জন্য হেলিবার্টন 'হত্যা কর ও এগিয়ে যাও' নীতিতে কোম্পানিদ্বয়ের জন্য ইউনিট গঠন করে। ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো-সরকারের সঙ্গে তেল-গ্যাস-চুক্তি বিষয়ে হেলিবার্টন কোম্পানি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। সুহার্তো-পরবর্তী সরকার ঐ চুক্তি বাতিল করে দেয়। ডিক চেনি ইরান-লিবিয়া অবরোধ তুলে নেবার ব্যাপারে লবি করেছে। এমনকি অবরোধ বলবৎ থাকা অবস্থায়ও ইরানে হেলিবার্টন কোম্পানি তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে, চেনি প্রধান নির্বাহী হবার পূর্বে, হেলিবার্টন মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ১৫,০০০ ডলারের বিনিময়ে একটা রফাও করে ফেলে, কোনো অপরাধ স্বীকার না করেই। ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধের ব্যাপারে চেনির সমর্থন থাকলেও, ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধের পরেও, ইরাকের তেল-শিল্প পুনর্গঠনের ব্যাপারে হেলিবার্টনের সঙ্গে জড়িত কোম্পানিগুলো কাজ করে গিয়েছে।

'ব্যবসার খাতিরে যেকোনো স্থানে গমন' নীতিতে কাস্পিয়ানের ব্যাপারেও স্বভাবতই হেলিবার্টন আগ্রহী হয়ে উঠেছে। "১৯৯৮ সালে চেনি তেল-শিল্পের এক্সিকিউটিভদের এক সমাবেশে বলেন, '... একটি অঞ্চল কৌশলগত কারণে হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অঞ্চলটি হলো কাস্পিয়ান ...'।" (Jon Flanders; *Gas, oil and Afghanistan*, http://members.local-net.com) 'দি ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ' ছবিতে জেমস বন্ডকে তার মিশন নিয়ে মধ্য এশিয়ার এক তেলক্ষেত্র থেকে আরেক তেলক্ষেত্রে যেতে দেখে বোঝা যায়, কৌশলগত কারণে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে মধ্য এশিয়া কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৯৭ সালে যখন ইউনোকলের পাইপলাইনের পরিকল্পনা কাজ করছিল, তখন হেলিবার্টনকে প্রস্তাব দেয়া হয় কাস্পিয়ান অঞ্চলে

চিত্র ১: মধ্য এশিয়া (কাস্পিয়ান বেসিন) ও আফগানিস্তান (Microsoft Encarta Interactive World Atlas2001)

সমন্বিত খননের কাজটি গ্রহণ করার জন্য, যেটি ১৯৯৭ সালের শেষ দিকে শুরু হবার কথা ছিল। এছাড়া ঐ প্রকল্পে হেলিবার্টন ছিল টেকনিক্যাল সার্ভিস প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্তসহ প্রধান ঠিকাদার ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক।

এতক্ষণের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মধ্য এশিয়ার তেল-গ্যাসের জন্য পশ্চিমা তেল-কোম্পানিগুলোর ব্যাপক আগ্রহ ছিল এবং এই আগ্রহের কথা অপ্রকাশ্য থাকে নি। আর ব্যাপারটা কেবল আগ্রহের পর্যায়ে ছিল না, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এবং তাদের নীতি অনুসারে যেকোনো উপায়ে তেল নিয়ে ব্যবসা করার চর্চা তেল-কোম্পানিগুলোর মধ্যে ছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনায়, আফগান যুদ্ধের সঙ্গে এইসব তেল-গ্যাস রিজার্ভের সম্পর্ক কোথায় এবং কীভাবে, তা উঠে আসে নি। এখন আমরা আফগানিস্তান প্রসঙ্গে যাবো। ব্যাপারটা এভাবে বর্ণনা করা যায়: ঐ বিশাল তেল-গ্যাস উত্তোলনের পর রফতানির ব্যাপারে আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে যে-পাইপলাইন রুটটি যাবে, সেটাই হলো সবচেয়ে সহজ ও লাভজনক; আর এটাই হলো এই 'নিউ গ্রেট গেম'-এ আফগানিস্তানের জড়িয়ে পড়া, তালেবানের উত্থান ও আফগান যুদ্ধের প্রধান ফ্যাক্টর। এখন আমরা এই রুটটির আলোচনায় যাবো। কিন্তু এই রুটকে বোঝার আগে আমাদের মধ্য এশিয়ার তেলসম্পদ স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ও চালু অন্য রুটগুলো সম্পর্কে জেনে নেবার দরকার আছে। গ্রেট গেমের পুরো ব্যাপারটি আঁচ করতে হলে এর প্রয়োজন রয়েছে।[২]

উত্তর রুট: কাস্পিয়ান থেকে রাশিয়া

কৃষ্ণসাগরের নভরোসিস্ক বন্দর থেকে শুরু হওয়া চালু রাশিয়ান পাইপলাইনটি প্রথমে আজারবাইজান এবং পরে কাজাখস্তানের নতুন তেলক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে। রাশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর পাইপলাইন কনসোর্টিয়াম এবং বিদেশী সংস্থাগুলোর মধ্যে উত্তরের রুট নিয়ে একটি পরিকল্পনা ছিল, যা অসংখ্য প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। প্রথম প্রতিবন্ধকতা হলো চেচনিয়ার যুদ্ধ; এই পাইপলাইনের প্রথম অংশ চেচনিয়া দিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার জন্য সুবিধাজনক, কেবল এই কারণেই আমেরিকা এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিল। তৃতীয়ত, তুরস্ক কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার তেল-গ্যাস ট্যাংকারের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করে। ১৭ মাইল দীর্ঘ বসফরাস (তুরস্ক) প্রণালী এখনই কোলাহলমুখর– এটি কৃষ্ণসাগরকে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং কেবল এপথেই প্রতিদিন ১.৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সরবরাহ হয়।

পশ্চিম রুট: জর্জিয়া হয়ে তুরস্ক

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আজারবাইজান ও জর্জিয়া গ্যাস স্থানান্তর সংক্রান্ত এক চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তি অনুসারে জর্জিয়া হয়ে গ্যাস-পাইপলাইন আজারবাইজান হয়ে তুরস্কে পৌঁছাবে এবং ২০০৪ সাল নাগাদ রফতানি শুরু করবে। এই ট্রান্স-কাস্পিয়ান গ্যাস-পাইপলাইনের খরচ পড়বে এক বিলিয়ন ডলার। আজারবাইজানের গ্যাস তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বাজারে পৌঁছাবে অথবা ইউরোপে যাবে। তা হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিকল্পনা মতোই কাস্পিয়ান থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত একটি গ্যাস-গ্রিডের সম্প্রসারণ ঘটবে। জর্জিয়ায় এখনও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব দিকের রাষ্ট্রগুলো যেমন উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কাজাখস্তানের জন্য এই

রুট বিশেষ সুবিধাজনক হবে না। কাস্পিয়ান সাগর সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ই তেল-কোম্পানিগুলোকে স্পর্শকাতর করে তোলে। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর কাস্পিয়ান সাগরে কে কর্তৃত্ব করবে তার আইনগত কোনো কাঠামো নেই। "ফ্রান্স শুরম্যান সেপ্টেম্বর ৬, ২০০১-এ 'তেলসমৃদ্ধ কাস্পিয়ানে সংঘাত' শীর্ষক এক নিবন্ধে বলেছেন, কাস্পিয়ানকে বড়ো হ্রদ বা ইনল্যান্ড সি বলা যায়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যদি এটা হ্রদ হয়, তা হলে তীরবর্তী দেশগুলোর কোনেটিরই এর জলভাগের ওপর সার্বভৌম অধিকার থাকবে না। এর মানে হচ্ছে কেউই এককভাবে নিজেদের জন্য এর অর্থনৈতিক ফায়দা নিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে শুধু পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা পানির নিচের তেল উত্তোলন করতে পারবে।" (Jon Flanders; *Gas, Oil and Afghanistan*; http://members.localnet.com) আমেরিকা এই প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে; এতে তার দুটো লাভ হবে। প্রথমত, এর ফলে দ্রুত বিনিয়োগ ফান্ড তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার বর্তমান প্রিয়পাত্র তুরস্ক এই অঞ্চলে সাবেক মিত্র ইরানের বিপক্ষে শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাবে।

পূর্ব রুট: চীন

পূর্ব এশিয়া ও জাপানের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচ্য রুট হতে পারে তুর্কমেনিস্তান থেকে চীনের জিনজিয়াং পর্যন্ত। তারপর পূর্ব-উপকূলীয় শিল্পাঞ্চলে চীনা গ্যাস-গ্রিড হয়ে জাপান পর্যন্ত। এক্ষেত্রে দূরত্বের বিষয়টি বাধা সৃষ্টি করতে পারে, ৭০০০ কিলোমিটারেরও বেশি বন্ধুর পার্বত্য পথ পাড়ি দিতে হবে। মিতসুবিশি, এক্সন এবং চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়ামের যৌথ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই পাইপলাইন নির্মাণের খরচ পড়বে দশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আবার চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও এখানে একটি বাধা হিসেবে কাজ করবে। খরচের ব্যাপারে মতৈক্য না হওয়ায় সম্প্রতি চীনের পূর্বাঞ্চলে একটি তেল পাইপলাইন নির্মাণের চুক্তি চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কাজাখস্তানের সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছে। যাহোক, চীন কাস্পিয়ানের হাইড্রোকার্বন-সম্পদের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী এবং সুপার ট্যাংকারের সাহায্যে তেল-গ্যাস আমদানির জন্য আরবসাগর পর্যন্ত পাইপলাইন তৈরিতেও চীনের আগ্রহের কথা জানা গেছে।

দক্ষিণ রুট: ইরান

ইরানের সঙ্গে তুর্কমেনিস্তানের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে এবং তুর্কমেনিস্তান থেকে ইতোমধ্যেই ইরানের শিল্পাঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর ইরানে একটা গ্যাস পাইপলাইন সংযুক্ত রয়েছে। ইরানের নিজেরই বিশাল তেল-গ্যাসের ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি এগুলোর অবস্থান। তুর্কমেনিস্তান ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্ক বিস্তৃত হলে দু'দেশই লাভবান হবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বিদ্যমান পাইপলাইনটি সম্প্রসারিত হয়ে যেমন ইউরোপে যেতে পারে তেমনি আরব সাগরেও যেতে পারে। যাহোক, ইরানের সমৃদ্ধি ওয়াশিংটন যে ভালো চোখে দেখবে, এমন নয়। সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের হিসেবটি বাদ দিলেও ইরান সম্পর্কে ওয়াশিংটনের প্রধান ভাবনা হলো পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তার প্রভাবশালী অবস্থান। শাহ যখন ক্ষমতায় ছিলেন, ব্যাপারটি তখন সহ্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু ইরানে ইসলামী অভ্যুত্থানের পর বিষয়টি আমেরিকার গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। কিন্তু মার্কিন তেল-কোম্পানিগুলো এতোই ব্যবসা বোঝে যে, যখন ফরাসী, জাপানী, ইতালীয়, চীনা, মালয়েশীয় এবং রাশিয়ান

কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ইরান থেকে সরে এসেছে, তখনও আমেরিকান তেল-কোম্পানিগুলো ওয়াশিংটনকে ইরানের প্রতি নমনীয় হবার জন্য চাপ প্রয়োগ করে এসেছে; বিশেষ করে ১৯৯৬ সালের ইরান ও লিবিয়ার ওপর আরোপিত মার্কিন অবরোধ তুলে নেবার ব্যাপারে তারা অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না ওয়াশিংটন সৌদি আরব ও অন্যান্য রক্ষণশীল উপসাগরীয় রাষ্ট্রে তার তেলবিষয়ক স্বার্থের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারছে, ততক্ষণ কাস্পিয়ান বেসিনের গ্যাসের জন্য ইরানের পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়টি পছন্দ করবে না।

আফগান রুট: সর্বোত্তম রুট

তেল-গ্যাস রফতানিকারকদের কাছে পাইপলাইনের দৈর্ঘ্যের ওপর লাভালাভ নির্ভর করে। তুর্কমেনিস্তানের খনিজসম্পদ রফতানির জন্য সবচেয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ও কম ব্যয়সাপেক্ষ আফগানিস্তান-পাকিস্তান-ভারত রুটটি। এটি মূলত একটি গ্যাস-পাইপলাইন। তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ১৯৯৭ সালে ঐক্যমত্যে পৌঁছে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত কম পাহাড়ী এলাকা দিয়ে পাকিস্তানের মুলতান পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের ব্যাপারে। পাকিস্তান থেকে ভারত বা উদীয়মান এশীয় বাজারে রফতানির ভাবনাও এখানে ছিল। এক্ষেত্রে ইউনোকলের নেতৃত্বে সেন্ট-গ্যাস কনসোর্টিয়াম গঠিত হয় নিবোক্ত কোম্পানিগুলোর সমন্বয়ে: ইউনোকল কর্পোরেশন (৪৬.৫%), ডেল্টা ওয়েল কোম্পানি (সৌদি, ১৫%), তুর্কমেনিস্তান সরকার (৭%), ইন্দোনেশিয়া পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (ইনপেক্স, জাপান, ৬.৫%), ইতোসু ওয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি লিমিটেড (সিয়েকো, জাপান, ৬.৫%), হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ (কোরিয়া, ৫%), দি ক্রিসেন্ট গ্রুপ (পাকিস্তান, ৩.৫%)। রাশিয়ার গাজপ্রম কোম্পানি প্রথমে ১০% শেয়ার নিয়ে কনসোর্টিয়ামে থাকলেও পরবর্তী সময়ে নিজেদের প্রত্যাহার করে।

১.৯ বিলিয়ন ডলার বাজেটের, ১২০ সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের গ্যাস-পাইপলাইন আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান সীমান্ত থেকে ১২৭১ কিলোমিটার দূরত্বে আফগানিস্তানের ভেতরে প্রথমে দক্ষিণে এবং পরে পূর্বে যাবে, হেরাত-কান্দাহার রোড অনুসরণ করে কোয়েটার নিকটবর্তী পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে শেষ হবে পাকিস্তানের মুলতানে, যেখানে কার্যরত একটি পাইপলাইনের সঙ্গে এটি সংযুক্ত হবে। তুর্কমেনিস্তান দৌলতাবাদ ফিল্ড থেকে ১৬৯ কিলোমিটার দূরত্বের একটি পাইপলাইন নির্মাণ করেছিল যা সীমান্তের সেন্ট-গ্যাসলাইনে যুক্ত হবে। মুলতান থেকে নয়াদিল্লি পর্যন্ত আরো ৬৪৪ কিলোমিটার অতিরিক্ত লাইনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন ছিল।

গ্যাস-পাইপলাইনের পাশাপাশি তুর্কমেনিস্তানের চার্দজু থেকে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত দিনে ১০ লক্ষ ব্যারেল তেল সরবরাহ করার জন্য ১০০০ মাইল দীর্ঘ একটি তেলের পাইপলাইন নির্মাণেরও পরিকল্পনা ছিল ইউনোকলের। ইউনোকলের হিসেব অনুযায়ী সেন্ট্রাল এশিয়ান ওয়েল পাইপলাইন প্রজেক্ট নামে পরিচিত এই পাইপলাইন নির্মাণে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার খরচ হবে। (সালমা রহমান, ইউনোকল ও তালেবান)

ইউনোকল কোম্পানির হাত ধরেই মার্কিন সরকার আফগানিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার হবার পর থেকে আফগানিস্তানের ঘটনাবলীতে মার্কিন আগ্রহ কমে গিয়েছিল। সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সশস্ত্র যুদ্ধে মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ সাহায্যের কথা সবার জানা। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় তেল-গ্যাস উত্তোলনের পর্ব শুরু হলে, মধ্য এশিয়া ও আফগান বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র পুনরায়

আগ্রহী হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এক্ষেত্রে সব ধরনের তথ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করত।

ব্রিডাস-পর্ব

তবে ইউনোকল কোম্পানি আফগান পাইপলাইন নির্মাণের অনুমতি পেলেও, ১৯৯৪ সালে তুর্কমেনিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিয়াজভের কাছে তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান-ভারত রুটের কথা সর্বপ্রথম প্রস্তাব করে আর্জেন্টিনার তেল-কোম্পানি ব্রিডাস। ব্রিডাসের চেয়ারম্যান কার্লোস বুলগেরোনি তার দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে টানা নয় মাস তিনি ও তার এক্সিকিউটিভরা ইসলামাবাদ, আসকাবাদ, মস্কো, ওয়াশিংটন থেকে আফগানিস্তানের যুদ্ধবাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা পর্যন্ত জেট প্লেন-এ করে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন তার প্রস্তাবিত পাইপলাইন প্রকল্পটি কতটা বাস্তবসম্মত ও সবার জন্য কতটা লাভজনক। এক পর্যায়ে বুলগেরোনি ও নিয়াজভের মধ্যে বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়।

১৯৯৬ সালে ব্রিডাসের সঙ্গে তৎকালীন আফগান সরকারের একটি ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে ব্রিডাস আফগানিস্তানে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করতে পারবে ও তা পরিচালনা করতে পারবে এবং একটি আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম গঠিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে-সরকার আর টিকে থাকে নি, তালেবানরা কাবুল দখল করে ফেলে। এর আগে ব্রিডাস মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোকলকে তার উদ্যোগে অংশ নিতে স্বাগত জানায়। ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে তুর্কমেনিস্তানের কর্মকর্তারা আমেরিকার হিউস্টনে প্রথমবারের মতো ইউনোকলের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় করিয়ে দেয় ব্রিডাস কোম্পানি। ইউনোকলের প্রতিনিধিরা আসাকাবাদ ও ইসলামাবাদ সফর করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রিডাসের প্রকল্পে যোগ দেবার ব্যাপারে আলোচনা করতেই এই সফর। ব্রিডাস তুর্কমেনিস্তানের কেইমির ক্ষেত্রে আগে থেকেই তেল উত্তোলন করে আসছিল। কিন্তু দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে, এই অভিযোগে ইতোমধ্যে তুর্কমেন সরকারের সঙ্গে ব্রিডাসের বিবাদ শুরু হয়। নিয়াজভ বিকল্প কোম্পানি হিসেবে ইউনোকলকে পছন্দ করেন। আমেরিকার সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলাও হয়তো তার লক্ষ্য ছিল। আমেরিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার কয়েক দফা আলাপও হয়। আমেরিকাও এতে খুশি হয় এই ভেবে যে, এর ফলে ইরানের ওপর বাণিজ্য বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তুর্কমেনিস্তানের নির্ভরতা কমবে। ব্রিডাস ও ইউনোকলের মধ্যে কে আফগান পাইপলাইনের জন্য তুর্কমেনিস্তান সরকারের অনুমতি পাবে, তা নিয়ে 'গেম' চলতে থাকে। ব্যাপারটি জাতিসংঘ পর্যন্ত গড়ায়। নিউ ইয়র্কে নিয়াজভ ব্রিডাস ও ইউনোকল, দুই কোম্পানিকেই ডেকে পাঠান। সেখানে ১৯৯৫ সালের ২১ অক্টোবর হতাশ ব্রিডাস-এক্সিকিউটিভদের সামনে নিয়াজভ ইউনোকলের সঙ্গে আফগান পাইপলাইন নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 'গেম'-এ ব্রিডাস পরাজিত হয় এবং তার দেয়া ফর্মুলা অনুসারেই ইউনোকল দৌলতাবাদ ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের অনুমতি পায়। যখন কোনো পশ্চিমা কোম্পানি মধ্য এশিয়ায় তেল-ব্যবসা করার কথা ভাবে নি, ব্রিডাস তখন সেখানে তার ব্যবসা করছিল। আফগান রুটটির পরিকল্পনাও ছিল ব্রিডাসের। ইউনোকলকে ব্রিডাসই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল একসঙ্গে কাজ করার জন্য। কিন্তু বড়ো কোম্পানির কাছে রাজনীতিতে হেরে গেল ব্রিডাস। মার্কিনি কোম্পানির কাছে আর্জেন্টেনীয় কোম্পানির হারারই কথা, কারণ মার্কিন কোম্পানির পেছনে ছিল মার্কিন সরকার। বোয়াল পুঁটিকে গিলে খেল।

ইউনোকল-পর্ব: তালেবানদের উত্থান

'নিউ গ্রেট গেম'-এ ইউনোকল জিতলেও তখনও কাজ অনেক বাকি। কারণ তেলক্ষেত্রের মালিক নিয়াজভের অনুমতি পাওয়া গেলেও পাইপলাইন যাবে যে-ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে, সেই আফগানিস্তানের অনুমতি পাওয়া যায়নি তখনও। কিন্তু তখন আফগানিস্তানে চলছে গৃহযুদ্ধ। আফগানিস্তানে অনুমতি দেবার কোনো সুস্পষ্ট কর্তৃপক্ষ ছিল না, থাকলেও কে যে শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানের ক্ষমতায় থাকবে, তা নিয়ে সংশয় ছিল। আফগান প্রেসিডেন্ট তখন নজিবুল্লাহ। তালেবানরা কান্দাহারে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী তো ছিলই। তালেবানরা ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে হঠাৎ করে কাবুল দখল করে ফেলে। তখন এটা কেউ কেউ সন্দেহ করে যে এখানে হয়তো আফগানিস্তানের সোভিয়েত-আগ্রাসন-পর্বের সিআইএ-আইএসআই চক্রের পুনরুত্থান ঘটেছে। অন্তত ইরান ও রাশিয়া এমনই অভিযোগ করে। ইরান সাংবাদিকদের কাছে জানায় যে সৌদি আরব ও সিআইএ তালেবানদের দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে সাহায্য করেছে।

> ১৯৯৬ সালে ইউরেশিয়া রিসার্চ সেন্টার বিবৃতি দিয়েছিল যে, দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ করা হচ্ছিল ইউনোকল এবং সৌদি আরবের ডেল্টা কোম্পানি আফগানিস্তানে তালেবানদের ধ্বংসাত্মক ও অমানবিক কার্যক্রমের জন্য অর্থসাহায্য দিয়েছে।" (http://pwkr.oreqonpeaceworks.org, *Unocalgate, War for Big Oil*?)

আর এসবকিছুর পেছনে যে পাইপলাইন নির্মাণের ফ্যাক্টরটিই কাজ করেছে, তাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা এরকম: আইএসআই রিপোর্ট দিয়েছে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তালেবানদেরই আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা বেশি, অন্তঃত পাকিস্তান তাই চেয়েছে। আমেরিকা এখানে ইউনোকলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে তালেবানদের সাহায্য করেছে। এখন তালেবানদের নির্দিষ্ট ট্রানজিট ফি দিয়ে পাইপলাইন নির্মাণের কাজে হাত দেয়া যাবে। পাকিস্তানের আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হবার অন্যতম একটা কারণ হলো আফগানিস্তানের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ জনগোষ্ঠীই পশতু, যার পাকিস্তানি জাতিগত নাম পাঠান। বলাবাহুল্য, তালেবানরাও পশতু এবং তাদের উত্থানের পেছনে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে।

কিন্তু ইউনোকলের পাইপলাইনের সঙ্গে তালেবানদের উত্থানের সম্পর্কটিকে এককথায় বলে দিলে চলে না। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করাতে হলে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা প্রয়োজন। সেরকম অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণও অবশ্য হাজির করা সম্ভব।

> তালেবানরা কাবুল দখলের পরপরই ইউনোকলের এক্সিকিউটিভ ক্রিস ট্যাগার্ট সংবাদ-সংস্থাসমূহকে জানান, পাইপলাইন-প্রকল্পটি এখন বাস্তবায়িত করতে সহজ হবে, কারণ তালেবানরা কাবুল দখল করেছে। ... এর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ইউনোকল ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা আফগান বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের 'বোনাস' হিসেবে মানবিক সাহায্য দেবে। একসময় বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে রাজি হয়েছিল যে তারা একটি যৌথ কাউন্সিল করবে যা পাইপলাইন প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণ করবে। (Ahmed Rashid, *Taliban*, p. 166)

এর অর্থ, ইউনোকল পাইপলাইন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনেক টাকা ঢেলেছে। তালেবানদের ক্ষমতা দখলের পর আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে এই অর্থ শেষ পর্যন্ত তালেবানদের পকেটেই গেছে, টাকাগুলো অস্ত্র হিসেবে তালেবানদের হাতেই উঠেছে। আর তেল-কোম্পানির স্বার্থ আর

আমেরিকার স্বার্থ যে সমার্থক, তা আগেই তেল-কোম্পানিগুলোর সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আলোচনার মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে। এছাড়া মার্কিন প্রশাসন যেন তাদের পক্ষে কাজ করে, সেজন্য তারা প্রশাসনকে নানাভাবে উৎকোচও দিয়ে থাকে।

> ১৯৯৯ সালে ইউনোকল রিপাবলিকান পার্টিকে ১২৫,০০০ ডলার সফট মানি হিসেবে দিয়েছিল এবং মার্কিন সরকার তাদের বিশেষ কর্পোরেট স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করবে, এই লক্ষ্যে লবি করার জন্য ১.৪ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। (http://pwkr.oreqonpeaceworks.org, *Unocalgate, War for Big Oil*?)

তাই তালেবানদের কাবুলে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে আমেরিকার কণ্ঠেও ইউনোকলের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

> ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে তালেবানরা কাবুল দখল করার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গ্লিন ডেভিস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সাবেক প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে হত্যা করার মাধ্যমে মৌলবাদী তালেবানদের ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মতামত কী, সাংবাদিকরা এ-প্রশ্ন করলে ডেভিস তালেবানদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'নাথিং অবজেকশনেবল'। তিনি তালেবানদেরকে আধুনিকতা-বিরোধী, কিন্তু পশ্চিমা-বিরোধী নয়, বলে বর্ণনা করেন। ... ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত নিযুক্ত আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী সচিব রবিন এল রাফেল বলেন, পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকর্তারা এই অঞ্চলে আমেরিকান বিনিয়োগে সহয়তাস্বরূপ ইউনোকলের পাইপলাইন প্রকল্পকে প্রমোট করে। রাফেল কান্দাহারে তালেবান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অন্যান্য আফগান গোষ্ঠীর সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করেছেন। (www.washingtonpost.com, *Taliban Not 'Objectionable'*)

সিনেটর হ্যাংক ব্রাউন বলেন, "ভালো ব্যাপার যেটা হয়েছে সেটা হলো, একটি পক্ষ তবুও আফগানিস্তানে একটি সরকার গঠনে সমর্থ হচ্ছে।" (Ahmed Rashid, *Taliban*, p. 166) রয়টার সেসময় লিখেছিল, "সুনির্দিষ্টভাবেই ইরান সীমান্তে একটি সুন্নি-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইরানকে একঘরে করে ফেলা এবং বাণিজ্য রুটের ও পাইপলাইনে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবার মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যে ইরানের মনোপলি ভেঙ্গে দেবার ব্যাপারে তালেবানরা মার্কিন নীতি বাস্তবায়নের কাজ করছে।"

নিয়াজভ ব্রিডাসের সঙ্গে একরকম বিশ্বাঘাতকতা করলেও ব্রিডাস তার আসাকাবাদ ও কাবুলের অফিসের মাধ্যমে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল, অন্তত আফগানিস্তান অংশে পাইপলাইন নির্মাণের অনুমতি পাবার জন্য। ব্রিডাস তালেবানদের জানায়, তারা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার মাধ্যমে টাকা ধার করে পাইপলাইন নির্মাণ করবে না, প্রয়োজনীয় খরচ নিজেরাই বহন করবে। কিন্তু ইউনোকল বলেছে, কাবুলের সরকার গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়া পর্যন্ত কাজে হাত দিতে পারবে না। কারণ, ঐ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ছাড়া বিশ্বব্যাংক বা অন্য কোনো সংস্থা ঋণ দেবে না। ইউনোকলের টোপ ছিল, তার প্রকল্প অনুমোদন করলে তালেবানরা সহজেই মার্কিন স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হবে। আর এই মার্কিন-স্বীকৃতি তালেবানের খুবই প্রয়োজন ছিল, যা তাদের আন্তর্জাতিকভাবে সংহত অবস্থায় এনে দিতো। কারণ যে-উপায়ে তারা ক্ষমতায় এসেছিল, তা কোনোক্রমেই বৈধ ছিল না। ব্রিডাস এবং ইউনোকল, উভয় কোম্পানিই তালেবানকে রাজি করানোর ব্যাপারে আঞ্চলিক প্রভাবকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। উভয় কোম্পানির সঙ্গেই সৌদি রাজপরিবারের সদস্যদের সুসম্পর্ক ও শেয়ার ছিল। কিন্তু পাকিস্তান ইউনোকলকে সমর্থন করায় ইউনোকল অনেকখানি এগিয়ে যায়।

> ১৯৯৬ সালে বেনজির ভুট্টো সরকারের পতনের পর নওয়াজ শরিফ ক্ষমতায় এলে, প্রধানমন্ত্রী, তার তেলমন্ত্রী চৌধুরি নিসার আলি খান, সেনাবাহিনী ও আইএসআই ইউনোকলকে পুরোপুরি সমর্থন করে।

> পাকিস্তান তালেবানদের জন্য আরো প্রত্যক্ষ মার্কিন সহায়তা কামনা করে এবং ইউনোকলকে বলে নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করতে যাতে মার্কিন স্বীকৃতি দ্রুত আসে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউনোকল উভয়েই আইএসআই-এর বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছিল– আফগানিস্তানে তালেবানদের বিজয় ইউনোকলের কাজকে সহজ করে দেবে এবং মার্কিন স্বীকৃতি দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হবে। (Ahmed Rashid, *Taliban*, p. 168)

তবে তালেবানরা ইউনোকলের সহায়তা পেয়ে থাকলেও, ব্রিডাসকে নিয়াজভের মতো বাতিল করে দেয় নি। বরং বিজ্ঞ কূটনীতিকের মতো তারা বাৎসরিক এক বিলিয়ন ডলার ট্রানজিট ফি'র সুবিধাতেই কেবল সন্তুষ্ট ছিল না, রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণেও তেল-কোম্পানিকে অংশ নিতে বলেছে। ব্রিডাস সেসবে রাজিও ছিল। এছাড়াও ব্রিডাস পাইপলাইনের প্রতি ২০ কিলোমিটার অন্তর পুলিশ প্রহরা-ভবনও নির্মাণ করে দিতে চেয়েছিল।

তবে ইউনোকলের জন্য তালেবানদের কূটনীতি শেষ পর্যন্ত কোনো সমস্যা হতো না। সমস্যা দেখা দিল নিজ ঘরে। তালেবানদের মানবাধিকারবিরোধী, নারীদের জন্য অবমাননাকর ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তখন আফগান নারীদের সংগঠন রাওয়া ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে শুরু করেছে। তালেবানদের ব্যাপারে ইউনোকল ও মার্কিন সরকারের অবস্থান, মার্কিন নারীবাদীদের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। নারীবাদীরা অভিযোগ করে "তালেবানদের না থামানোর চেষ্টা করে আমেরিকা বরং তাদের নীরব সমর্থন দান অব্যাহত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে যখন তালেবানরা আফগানিস্তানে হত্যা এবং নারী নির্যাতন চালাচ্ছিল ঐ সময়েই তালেবান প্রতিনিধিদের ইউনোকল ওয়াশিংটনে অভ্যর্থনা জানায়।" (www.genders.org) তিনশ' নারীসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকারগোষ্ঠী স্বাক্ষর করে ইউনোকল ও মার্কিন সরকারবিরোধী এবং আফগান নারীদের পক্ষের স্বাক্ষরতা-অভিযানে। ইউনোকল যদিও বরাবরই তার ওয়েবসাইটে বলছিল যে আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার না আসা পর্যন্ত তারা সেখানে কোনো ব্যবসা শুরু করবে না, তবুও তারা ভেতরে ভেতরে ঠিকই তালেবানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতো। "তালেবানদের ঊর্ধ্বতন কিছু কর্মকর্তা ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে টেক্সাসে ইউনোকলের সঙ্গে মিলিত হয় পাইপলাইন নির্মাণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য। এছাড়া আফগানিস্তানের নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, আফগানিস্তানের শ্রমিকদের বিশেষত পাইপলাইন নির্মাণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য তাদের ইউনোকলের সঙ্গে এক মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি আছে।" (www.feminist.org, *U.S. Oil Company Joins in Business Partnership with World's Most Repressive Regime*.)

হলিউডের তারকারাও নারীবাদীদের সঙ্গে যোগ দেয়। জাতিসংঘের মুখেও সমালোচনার সুর শোনা যায়। "জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রমের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ইয়াসুশি আকাশি বলেন, 'তেল ও গ্যাস নিয়ে লড়াইয়ের কারণে আফগানিস্তানে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ঘটেছে। আশংকার ব্যাপার হলো এই কোম্পানিগুলো এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলো তাদের নিজ স্বার্থে তালেবানদের ব্যবহার করছে'।" (Ahmed Rashid, *Taliban*, p. 168) ইউনোকলের শেয়ারহোল্ডাররাও ১৯৯৮ সালের জুনে বার্ষিক সভায় নারীবাদী ও মানবাধিকার-গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ইউনোকলের তালেবানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবসায় নিয়োজিত হবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৯৮ সাল জুড়ে ইউনোকলের ওপর নারীবাদীদের চাপ অব্যাহত ছিল। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে পরিবেশবাদীরা ক্যালিফোর্নিয়ার এটর্নি জেনারেলের কাছে মানবতা ও পরিবেশের বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য

ও তালেবানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য ইউনোকলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার আবেদন জানায়। এভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপে ও প্রচারে ইউনোকলের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে কেনিয়া ও তানজানিয়ার মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা হলে আমেরিকা আফগানিস্তানে অবস্থানরত সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে প্রধান সন্দেহভাজন বলে অভিযুক্ত করে এবং ১৯৯৮ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে তার পরিত্যক্ত ক্যাম্পে আমেরিকা ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করে। এরপর দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে শুরু করে। পাকিস্তান ও কান্দাহার থেকে ইউনোকল তার স্টাফদের সরিয়ে নেয় এবং ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে সেন্ট গ্যাস কনসোর্টিয়াম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে।

তালেবানদের প্রতি আমেরিকার মনোভাবের পরিবর্তন
(ইউনোকল সত্যিকার অর্থে নিজেদের প্রত্যাহার করে নি, আদৌ ...)

ইউনোকলের সেন্ট-গ্যাস প্রকল্প থেকে প্রত্যাহারের পর কেবল লাদেনকে কেন্দ্র করেই তালেবানদের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। আমেরিকার মুখে এবারে তালেবানরা মানবাধিকারবিরোধী, নারী-নির্যাতনকারী, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী প্রভৃতি আপ্তবাক্য জোরেশোরে শোনা যেতে থাকে, যদিও ১৯৯৭ সালে পাকিস্তান সফরের সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট প্রথম প্রকাশ্যে তালেবানদের নারী-নিগ্রহের সমালোচনা করেছিলেন। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন দূত বিল রিচার্ডসন ইসলামাবাদ ও কাবুল সফরের সময়ে তালেবানদের সমালোচনা করেছিলেন। তবে তাদের দুজনেরই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে শান্তি-প্রতিষ্ঠা। আর এই শান্তি আফগানদের জন্য শান্তি আনুক বা না আনুক, পাইপলাইন নির্মাণকার্যটি শান্তিতে করা যেতো। কিন্তু আফগানিস্তানে শান্তি আসে নি। পরিহাস এই যে, যে-আমেরিকা তালেবানদের উত্থানে মদদ জোগালো সেই তালেবানরাই আমেরিকার হাতে আজ নির্মূল হলো। যাদের অর্থ ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় মাদ্রাসাগুলোর ছাত্ররা ক্রমশ তালেবান হয়ে উঠলো, সেই সিআইএ-আইএসআই চক্রের হাতেই তালেবানরা নিহত হলো। তালেবান বা আল-কায়েদাদের ধরতে আমেরিকাকে সাহায্য করলো পাকিস্তান। এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমেরিকার স্বার্থেই তারা মদদ পেয়েছে, আবার আমেরিকার স্বার্থেই তারা নির্মূল হয়েছে। আর এই স্বার্থ হলো ইউনোকলের পাইপলাইন, যে-পাইপলাইন থেকে ইউনোকলের এবং আমেরিকার রিজার্ভে জমা হবার কথা ছিল (এবং কথা এখনও আছে) বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। কয়েক বিলিয়নের জন্য তাই কিছু মিলিয়ন গোলা-বারুদ খরচ করা। এর মধ্যে পড়ে যদি কয়েক হাজার নিরীহ আফগান মারা যায়, কয়েক লাখ আফগান যদি উদ্বাস্তু হয়, বাংলাদেশের মতো দেশের গার্মেন্টস শিল্প হুমকির মুখে পড়ে তাতে আমেরিকার কিছু যায় আসে না।

মজার ব্যাপার হলো, ইউনোকল আনুষ্ঠানিকভাবে পাইপলাইন প্রকল্প থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও, সত্যিকার অর্থে তারা নিজেদের কখনোই প্রত্যাহার করে নি, গোপনে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে, তালেবানদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। "২০০০ সালের মার্চ মাসে সেন্ট-গ্যাস কনসোর্টিয়াম থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবার প্রায় এক বছর পরে ইউনোকল তালেবান সরকারের সঙ্গে পাইপলাইন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছে।" (www.germanyindymedia.org, *Unocal Still Pushing Afghanistan Pipe*)

আবার মার্কিন সরকারও কিন্তু তেল-গ্যাসের ভাবনা মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে নি। অন্তত ১১ই সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পরে তালেবানদের একেবারে

উৎখাত করে পুতুল সরকার বসানোর আগ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যে তালেবানদের সমালোচনা করলেও, পাশাপাশি তাদের সঙ্গে পাইপলাইন বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে গেছে। "বুশ প্রশাসন তালেবানের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করে ২০০১ সালের গোড়ার দিকে। ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদেও কথাবার্তা হয়। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে এশিয়া বিভাগের দেখাশোনা করেন ক্রিস্টিনা রকা। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের ঘটনার আগে ক্রিস্টিনা পাকিস্তানে তালেবান-রাষ্ট্রদূত আব্দুল সালাম জায়িফের সঙ্গে আগস্টের দুই তারিখে কথা বলেন।" (ফরহাদ মজহার উদ্ধৃত, জাঁ ব্রিসকা ও গিওম দাসকি; *Bin Laden, Le Verti Interdite*) ২০০০ সালের মে মাসে আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, ইরান এবং তুর্কমেনিস্তান-এর মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়। এবং তালেবানি পত্রিকা 'দি কাবুল টাইমস'-এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল যে, খনি ও শিল্পমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ ইসা আখন্দ মধ্য এশিয়াভিত্তিক মার্কিন কোম্পানি 'সেন্ট্রাল এশিয়া ওয়েল এন্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রি'-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। পত্রিকাটি কোম্পানি-প্রতিনিধি রফিক ইয়াদগারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় "সেন্ট্রাল এশিয়া ওয়েল এন্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রি মধ্য এশিয়ায় গ্যাস আহরণে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত এবং সেই সঙ্গে আফগানিস্তানে গ্যাস ও তেল শোধনাগার স্থাপনে ইচ্ছুক।" (Jon Flanders; *Gas, oil and Afghanistan*) তিনি আরো জানান তুর্কমেন কর্তৃপক্ষ তার কোম্পানিকে সহায়তা করতে রাজি আছে।

এবং অনিবার্য আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধ

১১ সেপ্টেম্বরের বোমা-হামলা কিংবা আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধ শুরু হবার আগেই একটি ওয়েবসাইটে (http://pwkr.oreqonpeaceworks.org) 'Unocalgate, War for Big Oil' শিরোনামের একটি নিবন্ধে বলা হয়েছিল "পেন্টাগন যদি এখন বোমা ফেলে, আক্রমণ করে ও আফগানিস্তান দখল করে 'আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার' সেখানে বসায় তবে এটা খুবই সম্ভব যে ইউনোকল আবার তার প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসবে।" তালেবানদের ললাটে যুদ্ধের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হবার কথা কিছুকাল পূর্বেই লিখিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, পাইপলাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল আফগানিস্তানে একটি মার্কিন-অনুগত সরকার। তালেবানদের সম্ভাবনা দেখে আমেরিকা তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে ইউনোকলের আর পাইপলাইন নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি, তালেবানদের কর্মকাণ্ড ও নারী-বাদীদের প্রতিরোধ তা হতে দেয় নি। তাই তালেবানদের পতন নিশ্চিত ছিল। আর এব্যাপারে মার্কিন হুমকি-ধামকি তালেবানদের দেয়া হয়েছিল, এবং এটা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এব্যাপারে ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে গার্ডিয়ান (www.guardian.co.uk) পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়, নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার মাস দুয়েক আগেই ওসামা বিন লাদেন এবং তালেবানরা মার্কিন সামরিক হামলার হুমকি পেয়েছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে বার্লিনে আমেরিকান, রাশিয়ান, পাকিস্তানি ও ইরানি সাবেক কূটনীতিকদের চার দিনব্যাপী একটি সম্মেলনে তালেবানদের এই হুমকি দেয়া হয়। সম্মেলনে উপস্থিত পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়াজ নায়েক জানান, "আমেরিকানরা আমাদের এরকম ইঙ্গিত করেন যে, তালেবানরা যদি ঠিকঠাকমতো না চলে এবং পাকিস্তান যদি এব্যাপারে তাদের প্রভাবিত করতে না পারে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ না নেবার কোনো সুযোগ থাকবে না।" নিয়াজ নায়েক পাকিস্তানি সরকারের মাধ্যমে বার্তাটি তালেবান সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ টুইন টাওয়ারে বোমা হামলা না হলেও আফগানিস্তানে বোমা হামলা হতো অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে হলেও

কাবুলে নতুন (পুতুল) সরকার আসতো। যে-লাদেন আমেরিকার হাতে তৈরি (যাকে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর অনেকে ফ্রাংকেনস্টাইন উপাধী দিয়েছেন), সেই লাদেনকে আমেরিকাই ধীরে ধীরে প্রধান শত্রু বানিয়ে তুলেছে (আমেরিকার মতো একটি পরাক্রমশালী দেশের প্রধান শত্রু লাদেনের মতো একজন আরব, হাস্যকর!)। আবার ঠগ বাছতে বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গেল, ঠগ ধরা পড়লো না আজও। কত বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারালো, কত শিশু অনাহারে ধুঁকছে, কাবুল-কান্দাহার ছাতু হয়ে গেল, কিন্তু লাদেন আর ধরা পড়ে না। কী সস্তা ধোঁকাবাজি! লাদেন হলো ছুতো, কাবুল ছাতু করার ছুতো। মূল ব্যাপার হলো ঐ পাইপলাইন, ঐ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। আর ফ্রাংকেনস্টাইন বানাতে সময় লেগেছে, পুতুল বানাতে সময় লাগে নি। (পাঠক, হামিদ কারজাই-এর হাসিমুখ পত্রিকার পাতায় দেখেছেন? আমেরিকার প্রেমে গদগদ সে-হাসি।)

বাংলাদেশ কী ভাবছে? ইউনোকল তো এখানেও ...

আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ কী শিক্ষা নিতে পারে? বাংলাদেশও তো তেল-গ্যাস রফতানি প্রসঙ্গে উত্তাল। সরকার চাচ্ছে গ্যাস দ্রুত রফতানি করতে, কিন্তু জনমত ক্রমশই তার বিরুদ্ধমতে চলে যাচ্ছে। এবং পাঠক লক্ষ করুন, এখানেও সেই ইউনোকল। একবার এশিয়ার মানচিত্র নিয়ে বসুন, তাতে রেখা টানুন: তুর্কমেনিস্তান থেকে পাইপলাইন আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানের মুলতানে, মুলতান থেকে দিল্লি। আর এদিকে, বাংলাদেশের বিবিয়ানা-গ্যাসক্ষেত্র থেকে দিল্লি। দুটি রেখা কি মিলে গেল? মিলবেই তো, দুটিরই প্রস্তাবক যে ইউনোকল। এশিয়ার খনিজ সম্পদের অনেকখানিই মার্কিন ব্যবসার আওতায় চলে এলো। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বা ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কেন 'তলাবিহীন' এই 'ঝুড়ি'-তে পালাক্রমে আসছেন, তা খুবই স্পষ্ট। সামান্য হলেও গ্যাসের সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে। "শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই"– কিন্তু বাবুর তো ঐ দুই বিঘেই চাই। কিছু দক্ষিণা নাও? উৎপাদন অংশীদারী চুক্তি অনুসারে আমাদের গ্যাস, অন্যরা তুলে দেবে, কিন্তু আমরা পাবো মাত্র ২১ ভাগ! ৭৯ ভাগই তাদের! সেই ৭৯ ভাগ তারা ভারতে রফতানি করবে। করতে না দিলে আমাদেরই সেই গ্যাস কিনতে হবে ডলারে, দ্বিগুণেরও বেশি দরে। কী তাজ্জব কথা, নিজেদের গ্যাস নিজেদেরই কিনতে হবে, তাও আবার বেশি দামে! বেশি দামে গ্যাস কিনে রিজার্ভে যে-ঘাটতি পড়বে, তা মোকাবেলা করতে গ্যাসের দাম দেশের ভেতরেও বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ এজন্য বেড়ে যাবে, সারের দাম বাড়বে; কারণ এসব শিল্পের প্রধান জ্বালানি গ্যাস।

এই চুক্তিই করেছে আমাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলো। যদি ধরে নিই, তাদের মাথায়ও হয়তো নিয়াজভের মতো দেশের অর্থনীতি দ্রুত চাঙ্গা করার একটা সৎ ইচ্ছা ছিল বা আছে, কিন্তু নাইজেরিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এভাবে কোনো দেশের অর্থনীতি মজবুত হয় না। তুর্কমেনিস্তানেরও হবে না, বাংলাদেশেরও হবে না। বরং রফতানিকৃত গ্যাস দেশের ভেতরে কাজে লাগালে অনেক বেশি অর্থ আসতে পারে। যে-ভারতে গ্যাস রফতানির জন্য এতো তোড়জোড় সেই ভারতেই আমাদের চেয়ে তিন গুণ গ্যাস রিজার্ভ রয়েছে। যে-চুক্তির ফাঁদে আমরা পড়েছি, তা বাতিল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কারণ গ্যাসের জন্য আফগানিস্তানে ক্লাস্টার বোমা পড়েছে, আমাদেরও যেকোনো খারাপ পরিস্থিতির কথা মনে রাখতে হবে। তাই গ্যাস রফতানির বিরুদ্ধে এদেশে যারা আন্দোলন করছেন, তাদের স্যালুট জানিয়ে বলছি, আরও অনেক বেশি শক্তি অর্জন করতে হবে।

সর্বসাধারণের গণ অংশগ্রহণ ছাড়া এই আন্দোলন সফল হবে না। সুখের কথা এই, আমাদের দেশের সরকারগুলো নিয়াজভের সরকারের মতো একনায়কতান্ত্রিক নয়, তালেবানদের মতো মৌলবাদীও নয়। আমাদের সরকার গণতান্ত্রিক বলে আমরা জানি, তাই 'গণ'-এর স্বার্থের কথা তারা একেবারে ভুলে যাবেন না, সেই আবেদনটুকু রেখে নিবন্ধটি শেষ করছি।

পরিশিষ্ট: নিউ গ্রেট গেমের কালপঞ্জি

১৯৯৫

মার্চ ১৬: প্রেসিডেন্ট নিয়াজভ এবং পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ব্রিডাসের আফগান গ্যাসপাইপলাইন চালুর প্রাকসম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এপ্রিল: তুর্কমেন কর্মকর্তারা ব্রিডাসের আমন্ত্রণে টেক্সাসে অফিসিয়াল ট্যুরে যান এবং প্রথমবারের মতো ইউনোকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জুন: ইউনোকলের প্রতিনিধিরা আসাকাবাদ ও ইসলামাবাদে আফগান পাইপলাইনের ব্যাপারে ব্রিডাসের সঙ্গে একত্রে আলোচনা করেন। তুর্কমেন সরকারকে ব্রিডাস সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ফলাফল জানায়।

অক্টোবর ২১: নিউ ইয়র্কে ইউনোকল/ডেল্টার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিয়াজভ আফগান পাইপলাইন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

১৯৯৬

ফেব্রুয়ারি: ব্রিডাস আফগান সরকারের সঙ্গে পইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রিডাস তুর্কমেনিস্তানে তাদের ব্যবসায় নাক গলানোর জন্য ইউনোকল ও ডেল্টার বিরুদ্ধে টেক্সাসে মামলা দায়ের করে।

মার্চ: ইউনোকলকে বিশেষ ক্ষমতা দেবার জন্য পাক-প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর কাছে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত টম সিমন্স আবেদন জানান।

সেপ্টেম্বর ২৭: তালেবানের হাতে কাবুলের পতন ঘটে। আমেরিকা জানায় তারা আফগানিস্তানের সঙ্গে দ্রুত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।

অক্টোবর ১: তালেবান কর্তৃক কাবুল দখলের ঘটনাকে ইউনোকল সমর্থন জানিয়ে বলে পাইপলাইন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এখন অনেক সহজ হবে।

অক্টোবর ২৬: প্রেসিডেন্ট নিয়াজভ ও ইউনোকল/ডেল্টার মধ্যে এক চুক্তি হয়। এতে আফগান পাইপলাইনের জন্য কনসোর্টিয়াম গঠনে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয় এই দুই কোম্পানিকে।

নভেম্বর: ব্রিডাস তালেবান এবং জেনারেল রশিদ দোস্তামের সঙ্গে পাইপলাইন নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯৯৭

জানুয়ারি: জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ইয়াসুসি আকাশি পাইপলাইন প্রকল্পের জন্য আফগান যুদ্ধবাজ নেতৃবৃন্দ ও তেলকোম্পানিগুলোর সমালোচনা করেন।

ফেব্রুয়ারি: ওয়াশিংটনে গিয়ে তালেবান প্রতিনিধিদল আমেরিকার স্বীকৃতি চায় এবং ইউনোকলের সঙ্গে দেখা করে। ব্রিডাসের অতিথি হয়ে আরেকটি তালেবানপ্রতিনিধিদল আর্জেন্টিনা সফর করে। ফিরে এসে তারা সৌদি গোয়েন্দাপ্রধান প্রিন্স তুর্কির সঙ্গে জেদ্দায় সাক্ষাৎ করে।

মার্চ: ইউনোকল কান্দাহারে অফিস স্থাপন করে এবং আফগানদের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং সেন্টার চালু করে। ব্রিডাসের চেয়ারম্যান কার্লোস বুলগেরনি কাবুল-কান্দাহার সফর করেন এবং ব্রিডাস সেখানে অফিস স্থাপন করে।

এপ্রিল ৮: তালেবান জানায় যে-কোম্পানি প্রথম পাইপলাইনের কাজ শুরু করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

জুন ৯: ব্রিডাসের কার্লোস বুলগেরনি তালেবান নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান, যেকোনো ধরনের নিরাপদ পরিস্থিতিতে ব্রিডাস কাজ শুরু করতে আগ্রহী। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও শিল্পকারখানা সচল করতে আফগানদের সহায়তা করার জন্য ব্রিডাস প্রতিশ্রুতি দেয়।

জুলাই ২২: তুর্কমেন-মার্কিন বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষায় নতুন সংস্থা গঠিত হয়। ইউনোকল এর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।

আগস্ট ২২: তালেবানরা জানায় ব্রিডাস ইউনোকলের চেয়ে বেশি সুবিধা দেবে এবং এজন্য ব্রিডাসের সঙ্গে দ্রুত চুক্তি করবে। ইউনোকল জানায় তারা এখনও হাল ছাড়ে নি।

সেপ্টেম্বর ১২: ব্রিডাসের সঙ্গে পাইপলাইন নিয়ে আলোচনার জন্য পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আর্জেন্টিনায় পৌঁছে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তালেবান-প্রতিনিধিদের পাঁচ দিন পেশোয়ারে আটকে রাখে।

অক্টোবর ২৫: আসাকাবাদে সেন্ট-গ্যাস পাইপলাইন লিমিটেড গঠিত হয়। এতে ইউনোকল ও সৌদি আরবের ডেল্টা কোম্পানিসহ বিভিন্ন দেশের কয়েকটি কোম্পানির মধ্যে শেয়ার বণ্টন হয়।

ডিসেম্বর: আফগানিস্তানে টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করার জন্য ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কাকে ইউনোকল ৯০০,০০০ ডলার প্রদান করে।

১৯৯৮

ফেব্রুয়ারি ৩: ইউনোকল কনসোর্টিয়াম থেকে রাশিয়ান কোম্পানি গাজপ্রম নিজেদের প্রত্যাহার করে।

জুন: ইউনোকলের বার্ষিক সভায় কিছু শেয়ারহোল্ডার আফগান পাইপলাইন বিষয়ে কোম্পানির পরিকল্পনা বিষয়ে আপত্তি জানায় তালেবানদের মানবাধিকার লংঘনের কারণে। ইউনোকল জানায় ১৯৯৫ থেকে এপর্যন্ত ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এই প্রকল্পে তারা ব্যয় করেছে এবং আফগানিস্তানে দাতব্য সহায়তার জন্য এক মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আগস্ট ২১: ইউনোকল পাইপলাইন স্থাপন পরিকল্পনা স্থগিত করে এবং আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের ওপর মিসাইল হামলা শুরু হবার পর ইসলামাবাদ ও কান্দাহার থেকে নিজেদের কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করে নেয়।

সেপ্টেম্বর ১০: একদল পরিবেশবাদী গোষ্ঠী ক্যালিফোর্নিয়ার এটর্নি জেনারেলের কাছে তালেবানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং মানবাধিকার ও পরিবেশবিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত থাকার জন্য ইউনোকলের অবলুপ্তির আবেদন জানায়।

অক্টোবর: টেক্সাসের আদালতে ব্রিডাস কর্তৃক ইউনোকলের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা খারিজ হয়ে যায়।

ডিসেম্বর ৪: ইউনোকল আফগানিস্তান পাইপলাইন কনসোর্টিয়াম থেকে সরে দাঁড়ায়। ইউনোকল উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কাজাখস্তান থেকে তাদের অফিস গুটিয়ে নেয়।

১৯৯৯

জানুয়ারি ২৪: তুর্কমেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মুরাদভ পাকিস্তান সফরকালে জানান পাইপলাইন প্রকল্প এখনও চালু আছে।

এপ্রিল ২৯: গ্যাসপাইপলাইন প্রকল্প পুনরায় চালু করার জন্য ইসলামাবাদে পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তালেবান চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জুলাই ৬: ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর বিষয়ে আফগানিস্তান অসম্মতি জানালে আমেরিকা তালেবানের ওপর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে।

২০০১

সেপ্টেম্বর ১১: নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে সন্ত্রাসী বোমা হামলা হয়। আমেরিকা এ-হামলার জন্য ওসামা বিন লাদেন ও তার আল কায়েদা নেটওয়ার্ককে দায়ী করে।

অক্টোবর ৭: আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা শুরু হয়।

তথ্যসূত্র

১. 'Resource Wars' বইয়ের লেখক মাইকেল ক্লার, যিনি আমেরিকার হ্যাম্পশায়ার কলেজের শান্তি ও বিশ্ব নিরাপত্তা অধ্যয়ন কর্মসূচির পরিচালক, ২০০১ সালের ২৮ মে 'রেডিও ফ্রি ইউরোপ'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "মধ্য এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলের বিপুল খনিজ সম্পদ অঞ্চলটিকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে ... আমি মনে করি আমেরিকা এক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়ো করে দেখছে। আমেরিকাকে ঐ অঞ্চল

থেকে তেল নিতেই হবে এবং সেসব দেশে যে-ধরনের সরকারই থাকুক না কেন, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে হবে (আজারবাইজান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান-এর সরকারগুলো মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে থাকে)। আমি মনে করি আমার বইতে যা লিখেছি, এসব হলো তারই প্রতিফলন: আমেরিকা তেলকে একটি নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসেবে দেখে থাকে এবং সে একে যেকোনো উপায়ে রক্ষা করবে, অন্য বিবেচনা, অন্য মূল্যবোধ এখানে তুচ্ছ।" (Jon Flanders; *Gas, Oil and Afghanistan*)

২. রুটসমূহের বর্ণনার অংশটুকুর জন্য রিচার্ড ট্যানটার-এর 'Pipeline Poltics: Oil, gas and the US interest in Afghanistan' শিরোনামের প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে। (Richard Tanter; *Pipelin Politics: Oil, gas and the US interest in Afghanistan*; www.zmag.org)

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

Ahmed Rashid (2001), *Taliban: The Story of the Afghan Warlords*, Pan Books, London.

Jon Flanders; http://members.localnet.com/jeflan/jfafghanpipe.htm; *Gas, Oil and Afghanistan.*

Richard Tanter; http://www.zmag.org/tanteroil.htm, *Pipeline Politics: Oil, Gas and the US Interest in Afghanistan.*

www.germanyindymedia.org, *Unocal Still Pushing Afghanistan Pipe.*

Jonathon Steel, Ewen MacAskill, Richard Norton-Taylor and Ed Harriman (September 22, 2001); www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,556279,00.html, *Threat of US strikes passed to Taliban weeks before US attack.*

http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=&contentId=A39681-2001Nov4, *Taliban Not 'Objectionable'.*

http://pwkr.oreqonpeaceworks.org/news/oilwar.html, *Unocalgate: War for Big Oil?*

http:www.genders.org/g27/g27_afw.html

http://www.feminist.org/news/pr/pr052898.html, *US Oil Company Joins in Business Partnership With World's Most Repressive Regime.*

Microsoft Encarta Encyclopedia 2001, *Afghanistan.*

ফরহাদ মজহার (২০০১); ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম; *চিন্তা*; ডিসেম্বর ২০০১।

সালমা রহমান (২০০১), *ইউনোকল ও তালেবান* (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)।

নোম চমস্কি

সন্ত্রাসবাদ কাজে লাগে

তরজমা: উদিসা ইসলাম

ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি এ্যান্ড কালচার ফোরামের সৌজন্যে ১৮ই অক্টোবর ২০০১ তারিখে প্রফেসর নোম চমস্কির দেয়া বক্তব্যের বিশেষ অংশ এটি। *Al-Ahram Weekly Online* (১–৭ নভেম্বর ২০০১) এর ৫৫৮ নং সংখ্যার (www.ahram.org.eg/weekly/2001/558/1 war. htm) ওয়েবসাইট থেকে এই লেখাটা ডাউনলোড করে **মানুষ** এর জন্য অনুবাদ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, সন্ত্রাসকে দুর্বলদের অস্ত্র বলাটা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। নোম চমস্কি বলেছেন, এটা ক্ষমতাসীনদের অস্ত্র এবং বিশ্বের পরাশক্তির হয়ে এটা কাজ করে।

১১ই সেপ্টেম্বর যা ঘটে গেল তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা– এমন ঘটনা যা ইতিহাসকে বদলে দেবে– সর্বসাধারণের মধ্যে বিরাজমান এই ধারণা দিয়েই শুরু করছি। আমাদের যে প্রশ্নটি করা দরকার তা হলো কেন ঘটনাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে? এটা নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন করার আছে। প্রশ্নটা হলো "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" বলতে আদপে কী বোঝানো হচ্ছে? এবং এর সাথে সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্ন হলো সন্ত্রাসবাদ কী?

১১ই সেপ্টেম্বরের পর এখন আমাদের নিজেদেরকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করা দরকার তা হলো ঠিক এই মুহূর্তে কী ঘটছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই আরেকটি প্রশ্ন নিহিত আছে তা হলো এই হামলার ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি?

নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর খবর অনুযায়ী আফগানিস্তানে সত্তর থেকে আশি লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের কিনারে পৌঁছে গেছে। আসলে ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বেই সেখানে এই বাস্তবতা বিরাজ করছিল। তারা আন্তর্জাতিক খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভর করে টিকে ছিল। ১৬ই সেপ্টেম্বর *টাইমস* রিপোর্ট করেছে যে, "আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য সরবরাহ পৌঁছে দিতে পাকিস্তানের ট্রাকবহর আর যেন ব্যবহার করতে দেয়া না হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই দাবি করেছে"। আমি যতদূর জানি, লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপরে দুর্ভিক্ষের গুরুভার চাপিয়ে দেয়ার মার্কিন দাবি নিয়ে আমাদের দেশে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে সামরিক হামলার হুমকি আন্তর্জাতিক ত্রাণকর্মীদেরকে আফগানিস্তান থেকে অপসারণ করতে বাধ্য করে যা ত্রাণকর্মসূচিকে আরও নাজুক অবস্থানে নিয়ে যায়। *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ম্যাগাজিন একজন ত্রাণকর্মীকে উদ্ধৃত করে বলেছে "দেশটির জনগণের জীবন-মরণের প্রশ্নটি

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

বৈদেশিক সাহায্যের সূক্ষ্ম দড়ির ওপর ঝুলে ছিল, আমরা সেই দড়িটি কেটে দিলাম"।

এ-যাবৎ সবচেয়ে বড় ত্রাণসরবরাহকারী জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য-কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) অক্টোবরের শুরুতেই, খুবই সীমিত পর্যায়ে হলেও, খাদ্যবোঝাই জাহাজের চালান পাঠাতে শুরু করেছিল। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে তাদের কোনো আন্তর্জাতিক ত্রাণকর্মী ছিল না যারফলে ত্রাণ বিতরণব্যবস্থা ব্যহত হয়। বোমাবর্ষণ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ত্রাণকর্মসূচিটাও বন্ধ হয়ে যায়। ডব্লিউএফপি এরপর আবার এ-কর্মসূচি চালাতে শুরু করে, তবে খুবই মন্থর গতিতে। কিন্তু লন্ডনের *ফাইনান্সিয়াল টাইমস্*-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ত্রাণসংস্থাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান থেকে খাবার-প্যাকেট ফেলাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে। এটাকে প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছে, এটা ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করেছে বেশি।

এক সপ্তাহ অব্যাহত বোমাবর্ষণের পর *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পিছনের পাতায় একটা কলামের ভিতরে অসতর্কভাবে বলে ফেলে যে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, খুব দ্রুতই পঁচাত্তর লক্ষ আফগান এমনকি এক টুকরো রুটি সংগ্রহ করতেও পারবে না এবং তীব্র শীত নামতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি যা তাদের কাছে এই এক টুকরো রুটি পৌঁছে দেওয়াও সম্পুর্ণভাবে অসম্ভব করে তুলবে। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, বোমাবর্ষণ অব্যাহত থাকার ফলে বর্তমান ত্রাণ সরবরাহের ব্যবস্থাও চাহিদার তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। এই অসতর্ক মন্তব্য আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে পশ্চিমা সভ্যতা তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ মানুষের– আবার হিসেব করুন– গণহত্যা প্রত্যাশা করছে।

এদিকে পশ্চিমা সভ্যতার নেতৃবৃন্দ কথিত প্রধান সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের ব্যাপারে কোনোরকম আলোচনার আহ্বান আরও একবার তীব্র ভাষায় নাকচ করে দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মার্কিনি দাবির পক্ষে কিছু যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরার আবেদনও নাকচ করে দিয়েছেন। যেদিন এই আবেদন চরমভাবে নাকচ করে দেয়া হলো সেই একই দিনে জাতিসংঘের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির পক্ষ থেকে একজন বিশেষ দূত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। আমি যতদুর জানি, এই অনুরোধের খবর কোনো মিডিয়াতে আসেনি। কয়েকদিন পরই অক্সফ্যাম এবং খ্রীস্টান সাহায্য সংস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ ত্রাণসংস্থাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একই অনুরোধ জানায়। কিন্তু সেই রিপোর্টও মিডিয়াতে আসেনি।

যা ঘটে চলেছে তা এক ধরনের নীরব গণহত্যাই বটে। এটা আভিজাত্যের সংস্কৃতির, যে সংস্কৃতির আমরাও অংশীদার– ভেতরের চেহারা অনুধাবনে আমাদের সাহায্য করে। এটা এই ইঙ্গিত দেয় যে, আগামী দিনগুলোতে যা ঘটবে আমরা তার খবর রাখি না; কিন্তু পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কর্মসূচিও এগিয়ে চলেছে, অনুমান করা যায়, যা পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে। কোনো মন্তব্য ছাড়াই এটাকে খুবই নৈমিত্তিক ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা যেমন খুবই স্বাভাবিক একটা পরিস্থিতি ইউরোপের একটা বড় অংশের জন্যও পরিস্থিতি সেই একই রকম, কিন্তু বাদবাকি পৃথিবীর জন্য পরিস্থিতি এরকম নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপের বেশিরভাগ অংশেও পরিস্থিতি এরকম নয়।

স্পষ্টতই, ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষকে আমরা যে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি– তালিবান নয় বরং যারা তালিবানদের নিপীড়নের শিকার– সে-বিষয়টি কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে থেকে আসুন এর চেয়েও বিমূর্ত একটি প্রশ্নের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

১১ই সেপ্টেম্বর ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কিত প্রশ্নে আসে যাক। আমি মনে করি এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল, কিন্তু দুঃখজনক হলেও বলতে হবে যে ব্যাপকতার কারণেই

এটি ঐতিহাসিক ঘটনা তা নয়। যদিও ব্যাপকতার মাত্রা নিয়ে ভাবাটা অস্বস্তিকর কিন্তু মাত্রাগত দিক দিয়ে বিচার করা একেবারেই বিরল নয়। ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা সম্ভবত সবচেয়ে স্বল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি জীবন কেড়ে নিয়েছে।

দুঃখজনক হলেও বলতে হবে, কিছু কিছু সন্ত্রাসী অপরাধকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে বড় করে দেখার একটা প্রবণতা আছে। তা সত্ত্বেও, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কারণ তা কিছু পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তনটা হলো বন্দুকের নল তাক করায়। এটা নতুন। বৈপ্লবিকভাবেই নতুন।

মার্কিন জাতীয় ভূখণ্ড শেষ যেবার আক্রান্ত হয়েছিল কিংবা আক্রান্ত হওয়ার কারণে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল সেটা ছিল ১৮১৪ সালে যখন ব্রিটিশরা ওয়াশিংটন পুড়িয়ে দিলো সেই সময়। ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার ঘটনার পর হরহামেশাই পার্ল হারবারের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কিন্তু এই তুলনাটা ভালো নয়। আপনি যাই ভাবুন না কেন, জাপানিরা মার্কিন দুটি কলোনিতে হামলা করেছিল– জাতীয় ভূখণ্ড কখনোই আক্রান্ত হয় নি। এই কলোনি দুটোকে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে থেকে দখল করে নেয়া হয়েছিল এবং এই দখল কোন প্রীতিকর উপায়ে ঘটেনি । মার্কিনিরা হাওয়াই এবং ফিলিপাইনকে "অধিন-ভূখণ্ড" (টেরিটরি) হিসেবে আখ্যায়িত করতে পছন্দ করে কিন্তু কার্যত এগুলো উপনিবেশ ছাড়া কিছু নয়।

এইবার জাতীয় ভূখণ্ড ব্যাপক আকারের হামলার শিকার হয়েছে, আপনি কোনো না কোনো ভাবে এর কিছু তুলনা দিতে পারবেন কিন্তু এই ঘটনাটি ছিল একেবারেই অনন্য।

প্রায় ২০০ বছর সময়কালে আমরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লক্ষ লক্ষ আদিবাসীকে বহিষ্কার করেছি কিংবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি । আমরা মেক্সিকোর অর্ধেক ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছি, মধ্য-আমেরিকা ও ক্যারিবিয় অঞ্চলের সর্বত্র এবং কখনো কখনো এ-অঞ্চলের বাইরেও ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছি। আমরা হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দখল করে নিয়েছি এবং এই দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ ফিলিপাইনবাসীকে হত্যা করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে যে-উপায়ে তার আধিপত্যের সীমা বিস্তার করেছে সেটা ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। কিন্তু এরা সবসময়ই অন্যদেরকে হত্যা করেছে, লড়াইটা চলেছে অন্য কোন জায়গায়– অন্যরাই সবসময় ব্যাপক নরহত্যার শিকার হয়েছে।

ইউরোপের বেলায়, পরিবর্তনটা আরো বেশি নাটকীয় কেননা ইউরোপের ইতিহাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বীভৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত ইউরোপেরই উত্তরসূরী। শত শত বছর ধরে সারাবিশ্বজুড়ে ইউরোপ খুবই নির্বিকারভাবে নরহত্যা চালিয়ে এসেছে। এভাবেই তারা সারাবিশ্বে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল– এটা বাচ্চাদের হাতে চকলেট ধরিয়ে দিয়ে মনজয় করার মতো কোনো ব্যাপার ছিল না। সেই সময়কালে ইউরোপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শিকার হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল ইউরোপীয়দেরই পরস্পরের প্রতি পরিচালিত হত্যাকাণ্ড।

শত শত বছর ধরে একে অপরের প্রতি নরহত্যা চালানোটাই ইউরোপের প্রধান খেলা ছিল। একে অন্যের সাথে কিংবা অন্য কোনো কেতাদুরস্ত দেশের সাথে যুদ্ধের মানসিকতা পরিবর্তন কিংবা গণতন্ত্র বিকাশের কারণে যে ১৯৪৫ সালে এসে এই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তা কিন্তু নয়। এ-খেলার পরিসমাপ্তি ঘটার কারণ হলো, সকলেই বুঝে গেছে যে পরবর্তীতে তারা এই খেলা খেলতে গেলে পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ ইউরোপীয়রা এবং সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এত ব্যাপক আকারের ধ্বংসযজ্ঞের সমরাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছে যে অনিবার্যভাবেই তাদেরকে এই খেলা থেকে সরে আসতে হয়েছে।

কিন্তু এই পুরো রক্তাক্ত খুন-হত্যার সময়কালে ইউরোপীয়রা পরস্পরকে হত্যা করছিল

এবং অন্য অঞ্চলেও তারাই হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল। আবারও বলতে হয়, এর কিছু ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু পরিমাণে খুবই কম; ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে সেই তুলনায় এই ব্যতিক্রম একবারেই দর্শনযোগ্য নয়। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা ছিল প্রথম পরিরর্তন, প্রথমবারের মতো বন্দুকের নল উল্টোদিকে ঘুরেছে।

আপনি চাবুক হাতে আধিপত্য করছেন নাকি শত শত বছর ধরে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে আপনার জগৎ দেখার দৃষ্টিভঙ্গি– খুবই অন্যরকম হয়। সুতরাং, আমার মনে হয়, শোক ও বিস্ময়টা বেশ বোধগম্য। এবং এটাই সেই কারণ যেজন্য পৃথিবীর বাকি অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ এটাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। বর্বরতার শিকারদের প্রতি তাদের সহানুভূতি নেই কিংবা এই ঘটনায় তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েনি এমনটি নয়, বরং এই অনুভূতি সার্বজনীন– কিন্তু তারা এটাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। আমরা নিশ্চয় এটা অনুধাবন করতে চাইব।

বেশ, এবার সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নটিতে আসা যাক। "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ব্যাপারটা কী? শীর্ষ পর্যায়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বর্ণনা করা হয় ক্যান্সার কিংবা প্লেগ, যা বর্বরতার এবং "সভ্যতার বিকৃত বিরুদ্ধতাকারীরা" ছড়িয়ে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে। এরূপ অনুভূতির সাথে আমিও সহমত পোষণ করি। যে-কথাগুলো আমি উদ্ধৃত করলাম তা বিশ বছর আগে ব্যবহার করা হয়েছিল। আমি প্রেসিডেন্ট রিগ্যান এবং তার পররাষ্ট্র সচিবকে উদ্ধৃত করছি। বিশ বছর পূর্বে রিগ্যান প্রশাসন ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য এবং আমি যেভাবে উল্লেখ করলাম সেভাবেই তারা এটাকে বর্ণনা করেছিল।

এবং এটা ঠিকই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল। "সভ্যতার বিকৃত বিরুদ্ধতাকারীদের দ্বারা ছড়ানো প্লেগ" এর বিরুদ্ধে রিগ্যান প্রশাসন সাড়া দিয়েছিল একটি নজিরবিহীন সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে। আকারের দিক দিয়ে যা ছিল নজিরবিহীন এবং এই নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে ব্যাপক নৃশংসতা চালিয়েছিল। আমি এই নৃশংসতার বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনায় যাবো না বরং কেবল একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো যেটা নিয়ে কোনো বির্তক নেই: নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে রিগ্যান-মার্কিনি যুদ্ধ। এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই এই কারণে যে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ– আন্তর্জাতিক বিচারালয়, বিশ্ব আদালত এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ– এর পক্ষে রায় দিয়েছে। যেসব জনগণের কাছে আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, ন্যায়পরায়ণতা এবং এরকম বিষয়গুলো সামান্যও গুরুত্ব বহন করে অন্তত তাদের কাছে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

নিকারাগুয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক শুধু এ-কারণেই নয় যে, বিষয়টি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই বরং প্রাসঙ্গিক হওয়ার আরেকটি কারণ হলো যে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে আইন মান্যকারী একটি রাষ্ট্র কীভাবে সাড়া দেবে– এবং তারা প্রকৃতপক্ষে সাড়া দিয়েছিল– তার দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে তুলে ধরে। এবং এই প্রক্রিয়া নিয়েও কোনো বিতর্ক নেই।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার চেয়ে নিকারাগুয়ার ওপর চালানো সন্ত্রাস ছিল অনেক বেশি তীব্র, ভয়াবহ। নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে রিগ্যান-মার্কিনি যুদ্ধ সেদেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, দেশটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল, এবং সম্ভবত দেশটির পক্ষে আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয়।

নিকারাগুয়া এর জবাব দিয়েছিল। তারা ওয়াশিংটনে বোমা ফেলার মাধ্যমে জবাব দেয়

নি। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব আদালতের কাঠগড়ায় তোলার মাধ্যমে জবাব দিয়েছিল। আর এজন্য তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে একটুও বেগ পেতে হয় নি। বিশ্ব আদালত নিকারাগুয়ার পক্ষে রায় দেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "বেআইনী সমরশক্তি" প্রয়োগের জন্য নিন্দা জানায়। "বেআইনী সমরশক্তি" প্রয়োগ আরেকভাবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদেরই শব্দান্তর মাত্র। আদালত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ইতি টানতে এবং ব্যাপক ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেয়। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব আদালতের এই রায় অবজ্ঞার সাথে খারিজ করে দেয় এবং ঘোষণা করে যে, এরপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-আদালতের আর কোনো রায় মেনে নেবে না। নিকারাগুয়া এরপর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হলো। সকল রাষ্ট্র যাতে করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে এই মর্মে নিরাপত্তা পরিষদ একটা প্রস্তাব গ্রহণের কথা বিবেচনা করেছিল। কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু সকলেই ইঙ্গিতটা বুঝেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে ভেটো দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এতদিনের ইতিহাসে একমাত্র দেশ যে-দেশ একই সাথে বিশ্ব আদালত কর্তৃক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কারণে নিন্দিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি ভেটো প্রদান করেছে।

নিকারাগুয়া এরপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গেল। সাধারণ পরিষদে কোনো ভেটো নেই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতিবাচক ভোট সেখানে ভেটোরই অনুরূপ। সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের মতোই একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং এল সালভাদর এর বিরুদ্ধতা করেছিল। পরবর্তী বছরে নিকারাগুয়া তাদের অভিযোগ সাধারণ পরিষদে আবারও পেশ করে। এইবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল ইসরাইলকে তার পক্ষে টানতে সক্ষম হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার জন্য গৃহীতব্য প্রস্তাবের বিপক্ষে মাত্র দুটো ভোট পড়ে। এ-পর্যায়ে এসে নিকারাগুয়া আইনগত পদ্ধতির প্রতি সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, যেখানে ক্ষমতার মানদণ্ডে সবকিছু নিরূপিত হয় সেখানে তারা থাকতে পারবে না।

উল্টো দিকে সন্ত্রাস অন্য ভাবেও কাজে আসে এবং সন্ত্রাস ক্ষমতাশালীদের একটা অস্ত্র। সন্ত্রাসকে দুর্বলদের অস্ত্র হিসেবে সচরাচর যেভাবে বলা হয় সেভাবে বললে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক ভুল থেকে যায়। সহিংসতার অন্যান্য হাতিয়ারগুলোর মতো সন্ত্রাসও প্রধানত ক্ষমতাশীলদেরই অস্ত্র– অভাবনীয়ভাবেই। সন্ত্রাসকে দুর্বলদের অস্ত্র বলা হয় এ কারণে যে, ক্ষমতাশীলরা মতাদর্শিক ব্যবস্থাটিকেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের সন্ত্রাসকে কখনোই সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য করা হয় না।

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

এডোয়ার্ড এস. হারম্যান

আক্রমণের বাজেট

তরজমা: আ-আল মামুন

> মার্কিনীরা প্রতিরক্ষার নামে প্রতি বছর যা খরচ করে তা প্রকৃতপক্ষে বিদেশে নিজেদের আক্রমণাত্মক দখলদারিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের পয়সা থেকে এইভাবে জাতীয় প্রতিরক্ষার নামে কতিপয় বৃহৎ ব্যবসা কর্পোরেশানের পকেটে যায়। হারম্যানের এই লেখা থেকে এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এই অনুবাদের জন্য হারম্যানের মূল লেখাটা (৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১) ইন্টারনেট থেকে নেয়া: www.zmag.org।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই যখন জর্জ অরওয়েল তার *১৯৮৪* নামক উপন্যাসটি প্রকাশ করেন ঠিক সেই সময়েই মার্কিন 'যুদ্ধ-বিভাগ'-এর নতুন নামকরণ করা হলো 'প্রতিরক্ষা বিভাগ'। এই নাম পরিবর্তনের ঘটনা এমন এক সময় ঘটে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী এবং বিস্ময়কর সামরিক শ্রেষ্ঠত্বেরও অধিকারী। সেই কারণেই বলা যায়, বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদৌ কোনো প্রতিরক্ষা সমস্যা ছিল না। মার্কিন সামরিক-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল যুদ্ধ করার জন্য; এবং ইরান, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দূরবর্তী রাষ্ট্রগুলোতে সিআইএ-এর সাথে যোগসাজসে আক্রমণ ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন আধিপত্যকে আরো বিস্তৃত করা; নিজস্ব ভূ-খণ্ডকে কোনোরকম হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য এই সামরিক-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিশাল সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে বিদেশে সামরিক-অভিযান চালানোর সামর্থ্য ছিল না। তারা মার্কিন হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন ছিল বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পশ্চিম-ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজে থেকে অভিযান চালানোর চেয়ে, তাদের প্রতি মার্কিন হামলার হুমকি, তাদের জন্য অনেক বেশি আতঙ্কের কারণ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর অতর্কিতে পরমাণবিক বোমা দিয়ে হামলার প্রশ্নটি নিয়ে সামরিক পর্যায়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল এবং মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ১৯৫০-এর গোপনীয় ৬৮-তম রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে এই

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

দৃঢ়বিশ্বাস ব্যক্ত করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে অস্থিতিশীল করে দেয়ার মতো শক্ত অবস্থানে রয়েছে (অবশ্য, অনেক আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তৎপরতায় নিয়োজিত হয়েছিল এবং পরবর্তী অনেক বছর ধরে এই তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল)।

তবু, পশ্চিমা প্রচারণা-ব্যবস্থা সাফল্যের সাথে জনগণকে ধারণা দেয় যে, বিশ্ববিজয়ের দূরভিসন্ধির অংশ হিসেবেই পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের হামলা আসন্ন। জ্ঞাত কর্মকর্তারা জানতেন যে এই প্রচারণা ছিল পুরোটাই মিথ্যা, কিন্তু তারা জনগণকে স্নায়ুযুদ্ধকালীন সামরিকায়ন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতি গেলানোর জন্য– এর মধ্যে রয়েছে যেমন, গ্রীসে দক্ষিণপন্থী পুলিশীরাষ্ট্র কায়েম এবং ১৯৪০-এর শেষে ও ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে ইন্দোচীনে ফ্রান্সের কলোনি স্থাপনকে সমর্থন দেয়া ইত্যাদি– তারা সবসময় এই মিডিয়া প্রচারণাকে স্বাগত জানিয়েছে এবং উস্কে দিয়েছে। পরবর্তীকালে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে এবং এমনকি, মিসাইল সমরাস্ত্রটিও অর্জনে সক্ষম হলো তখন আক্রমণের সম্ভাবনার কথা আরো বেশি করে তুলে ধরা হতে থাকলো। কিন্তু অস্ত্রের গুণগত দিক দিয়ে এবং কৌশলগত অবস্থানে অস্ত্র স্থাপনের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই ব্যাপকভাবে এগিয়ে ছিল এবং সমরাস্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ও পরিমাণগত দিক থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশ্বের সবচে দক্ষ প্রচারণা-ব্যবস্থার অধিকারী দেশটির মিডিয়াগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের আনবিক অস্ত্রের সমতুল্যতা বা আধিক্যের কারণে এদেশেও ব্যাপক আনবিক অস্ত্র অর্জন করা দরকার– প্রবক্তাদের এমন দাবিকে ব্যাপক কভারেজ দেয় এবং সামরিক শিল্পায়ন কমপ্লেক্স-এর (এমআইসি) কোনোরকম সমালোচনা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৮ থেকে সেই ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চলে আসা একটা অসুস্থ রসিকতা ছিল প্রতিনিয়ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সামর্থ্যের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সামর্থ্যের অপ্রতুলতার কথা বলে যাওয়া– এর মধ্যে ছিল মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্রের অপ্রতুলতা, দূরত্ব অতিক্রমে ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা-সল্পতা, অরক্ষিত পরিস্থিতি ইত্যাদি– আর এর সবই ছিল মিথ্যা। কিন্তু এগুলোর সাহায্যেই আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়ার মাধ্যমে সফলভাবে ফলপ্রসূ প্রচারণা চালানো হয়। সমরাস্ত্রের অপ্রতুলতার যে-কথা বলা হতো সেটা যে ছলনা ছিল তা জানার জন্য এবং ১৯৮০ এর দশকে রিগ্যান প্রশাসনের সামরিকায়ন তৎপরতাকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়া এ-মিথ্যাগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করেছিল তা জানার জন্য টম গারভেসির ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত *দ্য মিথ অব সোভিয়েত মিলিটারি সুপিরিয়রিটি* গ্রন্থটি আমাদেরকে চমৎকার সাহায্য করে। (গারভেসির এই গ্রন্থটি *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় কখনোই পর্যালোচনা করা হয় নি, এমনকি এই গ্রন্থটির নামও উল্লেখ করা হয় নি এবং *ওয়াশিংটন পোস্ট* এটাকে উন্মাদের মতো একটি কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকেই মার্কিন 'প্রতিরক্ষা' পলিসির সাথে আরেকটি যে-বিষয় নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে দেখা গেলো তা হলো, প্রবলভাবে একটা অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চাপিয়ে দেয়া। শুরু থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমরাস্ত্রের দিক থেকে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মার্কিন নেতারা তাদের প্রাধান্যশীল অবস্থান ধরে রাখছিল– এমনকি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আরো বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন আনবিক সমরাস্ত্র সংযোজন যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়টিকেও বিবেচনা না করে, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে বলি দিয়ে এবং জনকল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে (জনকল্যাণ তহবিলের সম্পদ চলে যাচ্ছিল সামরিক খাতে)। ১৯৫০ এর দশকে প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার কর্তৃক পেন্টাগনে গবেষণা প্রকল্পের প্রথম পরিচালক হিসেবে মনোনীত হার্বার্ট ইয়র্ক তার ধ্রুপদি গ্রন্থ *রোড টু*

অবলিভিয়ন (১৯৭০)-এ ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৫ সাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতা প্রতিনিয়ত উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে কিন্তু একই সময়ে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরন্তর এবং দ্রুতহারে এবং নির্মমভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি সংকটজনক মুহূর্তেই মার্কিন তৎপরতা আনবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ইন্ধন যুগিয়েছে (পৃষ্ঠা নং, ২২৬, ২৩১-২)।

অনিবার্যভাবেই অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সারা বিশ্বের সকল দেশের জন্যই ছিল খুবই ব্যয়বহুল, তবু প্রতিটি দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটাকে গ্রাহ্যই করে নি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর এই প্রতিযোগিতার প্রভাব দেখেই পরিতৃপ্ত থেকেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি দরিদ্র দেশের জন্য এমন ব্যয় বহন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ এবং তাদেরকে নাগরিক ব্যয় কমিয়ে অস্ত্র নির্মাণে মনোযোগী হতে হয়েছে। এমনকি মধ্য '৫০ এর দশক থেকে মার্কিন কর্মকর্তারা সুস্পষ্টভাবে বলতেও শুরু করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র প্রতিযোগিতা চাপিয়ে দেয়ার মূল লক্ষ্য এবং বাড়তি পাওনা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের দৈন্য-দশা; এবং এটা দেশটিকে অস্থিতিশীল করে দেয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারই একটি অংশ।

সুতরাং, বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা ছিল শত্রুকে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করার মাধ্যমে দৈন্যদশায় ফেলে দেবার উদ্দেশ্যপ্রসূত এবং সেই শত্রুর অস্ত্রপ্রতিযোগিতার ব্যয় ছিল প্রকৃত অর্থেই তাদের "প্রতিরক্ষা" নিশ্চিত করার জন্য। ক্ষুদে শত্রুদের সামরিকভাবে ধ্বংস করে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে নিকারাগুয়ার মতো "ভালো দৃষ্টান্তের হুমকির" পরিসমাপ্তি ঘটাতে এবং ভিয়েতনাম ও অন্যান্য অনেক দেশের বাজার-বিমুখ উন্নয়নের পথে চলাকে স্তব্ধ করে দিতেও এই অস্ত্র-প্রতিযোগিতা কাজে লেগেছিল। এসব শত্রুদের প্রতি নিরাপত্তার হুমকি তৈরি করার মাধ্যমে এসব রাষ্ট্রকে আরও বেশি একনায়কসুলভ, আরও বেশি অনমনীয় হতে বাধ্য করা হয়; এবং নিজ দেশের জনগণ ও অন্যদেশের কাছেও এসব দেশের আকর্ষণ এতে করে হ্রাস পায়।

সমরাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব মিত্রদেশগুলোর ওপরে এবং নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করারও সুযোগ করে দেয়। এটা করা হয়েছিল অংশত, নিয়ন্ত্রণ-কৌশল হিসেবে ন্যাটোর মতো সামরিক জোট ব্যবহারের মাধ্যমে এবং অংশত, সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক সরকারগুলোকে উৎখাত করার জন্য সেখানে তৎপর সামরিক গোষ্ঠীগুলোর সাথে সম্পর্ক নির্মাণের মাধ্যমে। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ল্যাটিন আমেরিকায় অব্যাহতভাবে এরকম উৎখাতের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এ-সম্পর্কে পেনি লারনাক্স তাঁর *ক্রাই অব দ্য পিপ্‌ল* (১৯৮০), এবং আমি আমার *রিয়াল টেরর নেটওয়ার্ক* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে বৈশ্বিক-অর্থনৈতিক-কাঠামো ও নব্য-উদারনৈতিক নির্ভরশীলতায় অন্যান্য দেশকে ঢুকিয়ে দিতেও সামরিক-ক্ষমতা সহায়তা করে। স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালে যদিও হিসেব কষা হতো যে মার্কিন সামরিক-বাজেটের অন্তত ৫০ শতাংশ নিয়োগ করা হয় সোভিয়েত-শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে পড়া এবং রাশিয়ার জিডিপি নেদারল্যাণ্ডের স্তরে নেমে এলেও মার্কিন জনগণের জন্য এসব ঘটনা কোনো শান্তির সুযোগ বয়ে আনে নি। মার্কিন সামরিকায়ন বাজেট ১৯৮৯ সালের শীর্ষস্তর থেকে ১২ শতাংশ কমে ১৯৯৬ সালে নিববর্তী স্তরে নেমে এলেও বর্তমানে আবার এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে এবং উভয় দলের সমর্থনে সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স আরও অধিক বাজেট বাগিয়ে নিচ্ছে।

এটা আবারও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সামরিক বাজেট বৃদ্ধির সাথে "প্রতিরক্ষার" কোনো

সম্পর্ক নেই; বাজেট বৃদ্ধির কারণ হলো সম্পদের ওপর সামরিক শিল্প-কমপ্লেক্সের আধিপত্য বাড়ানো, সামরিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে লাভের জন্য জঘন্য কামড়া-কামাড়ি বাড়ানো এবং পুরো বিশ্বব্যাপী মার্কিন ক্ষমতার ছড়ি ঘুরানোর জন্য আক্রমণাত্মক শক্তি বৃদ্ধি করা। (জনগণের দাবী পূরণের প্রতি রক্ষণশীলদের অঙ্গীকার থাকলেও ট্যাক্স হ্রাস করাকেই জনগণের দাবী হিসেবে দেখানো হয়। জন-অভিমত বিশ্লেষক স্টিভেন কুল-এর মতে, জনগণ মূলত চায় "সামরিক ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হোক– অন্তত ২৪ শতাংশ"। কিন্তু জনগণের এই দাবী রক্ষণশীলদের [রিপাবলিকান ও নব্য-ডেমোক্রাটদের] প্রকৃত বাজেট বরাদ্দ সিদ্ধান্তে কোনো হেরফের ঘটায় না। এই সিদ্ধান্তগুলো প্রণীত হয় আরও উচ্চপর্যায়ের ইচ্ছেমতো)।

এরূপ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের বেলায় জনস্বার্থ-ভাবনা যে একেবারেই গুরুত্বহীন তা আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বুশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের জাতীয় মিসাইল প্রতিরক্ষার (এনএমডি) প্রকল্প-প্রস্তাব সামনে তুলে ধরা থেকে। এই প্রকল্প খুবই অযৌক্তিক এবং, দেশে ও বিদেশে জনকল্যাণের দিক থেকে বিচার করলে, আক্ষরিক অর্থেই উন্মাদের কাজ। "দুর্বৃত্ত"দের হুমকির কথা বলে এই প্রকল্পের পক্ষে যে যুক্তি দাঁড় করানো হয় তাও হাস্যকর– পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখবো, চীন যখন একটাও মিসাইল অর্জন করেনি নিক্সন আমলের সেই সময়ে চীনের মিসাইল হুমকির অজুহাতে জাতীয় মিসাইল কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছিল– এবং এখন দুর্বৃত্তের হুমকি বলবৎ রাখতে বুশকে উত্তর কোরিয়ার সাথে কঠোর আচরণ করতে হয়! বর্তমানে "চীন সঙ্কটের" যে-কথা বলা হয় তার মূলে আছে একদিকে, চীনের বিশাল বাজারে ঢোকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের চীনা লবির সাথে কীভাবে একটা রফায় আসা যায় সেই ভাবনা এবং অন্যদিকে, "প্রতিরক্ষা" ভনিতার আড়ালে সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সওয়ালাদের ব্যাপক ও হাড়-কাঁপানো ব্যয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি বড় ধরনের দুর্বৃত্তের হুমকি খাড়া করা। 'জাতীয় মিসাইল প্রতিরক্ষা' প্রকল্পের প্রবক্তারা স্পষ্ট করেই জানেন যে এই কর্মসূচি ব্যাপক আক্রমণাত্মক হুমকিসম্পন্ন; শুধু তাই নয়, তারা আক্রমণাত্মক হুমকি সৃষ্টি করাকেই এর প্রধান ভূমিকা বলে মনে করে, আর এব্যাপারে সরকারি নথিপত্রে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণও রয়েছে (দেখুন, জোসেপ গার্সন, "ইন ডার্ক টাইমস: দ্য পলিটিক্স এন্ড জিওপলিটিক্স অব মিসাইল ডিফেন্সেস", www.zmag.org, জুলাই-আগস্ট ২০০১)। তারা এটাও জানে যে, এই প্রকল্প অন্যান্য দেশের সরকারকেও অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করবে। সুতরাং, বলা যায়, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য "জাতীয় প্রতিরক্ষা" নয়, বরং স্বার্থের কামড়া কামড়ির বাইরেও, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো মার্কিন আক্রমণাত্মক-সামর্থ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাতে করে অন্য দেশগুলোর ওপর মার্কিন ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে চাপিয়ে দেয়া যায়।

কিন্তু, আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়া, জাতীয় মিসাইল প্রতিরক্ষা কর্মসূচি নিয়ে তড়িঘড়ি করার জন্য এবং একপাক্ষিকভাবে অত্যাসন্ন এন্টি ব্যালাস্টিক মিসাইল চুক্তি ভঙ্গ করা নিয়ে স্বল্প পরিমাণে সমালোচনা করলেও, কখনোই জোর দিয়ে বলে না এবং খুব কমই তুলে ধরে যে এই নতুন মিসাইল প্রতিরক্ষা প্রকল্প আক্রমণাত্মক-হুমকি সৃষ্টি করবে; এবং পেন্টাগন এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক চাপ দিচ্ছে। মিডিয়া এমন ভান করে যে এটা একধরনের প্রতিরক্ষা অস্ত্র এবং প্রধান আলোচনার বিষয় হলো, জাতীয় প্রতিরক্ষা দিতে এটা কতোটুকু কার্যকরী হবে। যেহেতু আমরা 'দুর্বৃত্তদের' হাত থেকে নিজেদের নিরাপত্তা চাই সেহেতু মিডিয়া এমন চিত্রায়ণের মাধ্যমে মিসাইল প্রতিরক্ষাকে সঙ্গত হিসেবে উপস্থাপন করে। সুতরাং, দায়দায়িত্বহীনতা ও উন্মাদগ্রস্ততার স্বাভাবিকীকরণ করা হিসেবে এটাকে আখ্যায়িত করা যায়। অতীতের মিডিয়া তৎপরতার সাথে এই তৎপরতা খাপে খাপে মিলে যায়। তখন যেমন তারা ছলনাপূর্ণ "সামরিক

ব্যবধানের” দাবিকে, যার ওপর ভিত্তি করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, কিংবা অতীত-বর্তমানের বিভিন্ন স্বার্থগত-হানাহানিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি এখনও পারছে না।

ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব এবং অন্যান্য স্থানে মার্কিন আক্রমণাত্মক ক্ষমতার সূত্রে লাভবান হওয়া কর্পোরেট-সমাজ, যার মধ্যে রয়েছে সামরিক-শিল্প ঠিকাদার ও বৈশ্বিক সামরিক ফার্মগুলো, পরিবেশবাদী ও শান্তিবাদীদের মোকাবিলায় বুশের তৎপরতা এবং প্রবলভাবে কর্পোরেট এজেণ্ডা সামনে নিয়ে আসাকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করছে। সাধারণ জনগণের সেবায় না-লাগলেও আক্রমণ-ক্ষমতা কর্পোরেট সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করে। তাই আমাদের মতো সাধারণ নাগরিকদেরকে– যাদেরকে কর্পোরেট ও উন্মাদগ্রস্ত সামরিক হিসেব-নিকেশের বাইরে রাখা হয়েছে– এই সামরিকায়ন এজেন্ডার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লড়তে হবে। এর প্রথম পদক্ষেপ হলো “প্রতিরক্ষা বাজেট” ধারণার প্রতি উপহাস ছুঁড়ে দেয়া। আসুন আমরা এই বাজেটকে সঠিক অর্থে অর্থাৎ, “আক্রমণের বাজেট” কিংবা বলা যায় “আক্রমণ এবং মুনাফার হানাহানির বাজেট”– হিসেবে আখ্যায়িত করি।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

তারিক আলী

বোমা, পাল্টা আঘাত এবং ভবিষ্যৎ

তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র-বিধ্বংসী সন্ত্রাসী হামলার পরপরই লিখিত এই রচনায় ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার সম্ভাব্য পরিণাম তথা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এর স্বল্প- ও দীর্ঘ-মেয়াদী প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারিক আলীর ধারণা এই ঘটনার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য পরিণাম স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র কায়েম। এই অনুবাদের জন্য তারিক আলীর মূল লেখাটা ইন্টারনেট থেকে নেয়া: www.zmag.org

গত তিন সপ্তাহ ধরে পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা তালেবানদের বুঝিয়ে চলেছেন যেন তারা ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরিত করে এবং পাকিয়ে ওঠা বিপর্যয় এড়ায়। তারা ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু ওসামা হচ্ছে তালেবানদের নেতা, মোল্লা ওমরের জামাই সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । আরো মজার বিষয় হচ্ছে, নিজেদের সৈন্য, অফিসার এবং বৈমানিকদের আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে নেয়ার পর পাকিস্তান তালেবানদের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারে কিনা এবং তার সহায়তার ওপরে তালেবানদের যে-অংশগুলো পুরোপুরি নির্ভরশীল সে অংশগুলোকে প্রত্যাহার করতে পারে কিনা। মিলিটারি শাসকদের একটা মূল লক্ষ্য হবে কাবুলের ভবিষ্যত কোয়ালিশন সরকারের ওপর নিজের প্রভাব বজায় রাখা। পাকিস্তান ও তালেবানদের মধ্যকার সম্পর্ক এ বছর উত্তেজনাপূর্ণ। বন্ধুত্ব দৃঢ় করার জন্য পাকিস্তান গত ছয় মাস আগে আফগানিস্তানে একটা ফুটবল দল পাঠিয়েছিল একটা বন্ধুত্বপূর্ণ খেলার জন্য। যখন দুই দল কাবুলের স্টেডিয়ামে পরস্পরকে মোকাবিলা করছে তখন নিরাপত্তা বাহিনী ঢুকে ঘোষণা করলো যে পাকিস্তানি ফুটবলারদের পোষাক অশ্লীল। তারা পরে ছিল ফুটবল খেলার হাফপ্যান্ট যখন নাকি আফগান দল পরে ছিল হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঝোলা লম্বা হাফপ্যান্ট। সম্ভবত তারা ভেবেছিল পাকিস্তানীদের সম্মুখিত উরু দর্শকদের মধ্যে (যাদের সবাই ছিল পুরুষ) অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে। কে বলতে পারে? পাকিস্তানি দলটিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের মাথা মুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের সবাইকে চাবকানো হয়েছে আর স্টেডিয়ামের দর্শকদের বাধ্য করা হয়েছিল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করতে। পাকিস্তান বরাবর গোলা নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে এটা ছিল মোল্লা ওমরের তরিকা।

কাবুল এবং কান্দাহারের ওপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অনুগত বৃটিশ মিত্রের বোমা বর্ষণে তালেবানদের পাকিস্তানবিহীন অংশটির এবং বিন লাদেনের জিহাদ ইন্টারন্যাশনালের আরবদেরকে নিয়েই শুধু গঠিত স্পেশাল ব্রিগেডের যুদ্ধক্ষমতায় তেমন প্রভাব ফেলবে না। এখনকার রিপোর্ট অনুসারে এই যৌথ বাহিনী ২০ থেকে ২৫ হাজার দৃঢ় যোদ্ধা নিয়ে গঠিত। তা সত্ত্বেও তালেবানরা মোক্ষমভাবে ঘেরাও ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের পরাজয় অনিবার্য। দুইটা গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে ইরান এবং পাকিস্তান তাদের বিরুদ্ধে মোতায়েন হয়ে আছে। তারা যদি আরো কয়েক সপ্তাহ টেকে তবে সেটা অস্বাভাবিক বলে ধরতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে তাদের কিছু কিছু বাহিনী পাহাড়ে চলে যাবে এবং অশীতিপর বাদশাহ জহির শাহকে তার আরামদায়ক রোমান ভিলা থেকে বিধ্বস্ত ভাঙ্গাচোরা কাবুলের কম স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিয়ে এসে নতুন যে সরকারকে বসানো হবে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার আগে তারা অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না পশ্চিম নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যায়।

পশ্চিম সমর্থিত উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালেবানদের চেয়ে কম ধার্মিক কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রেই তাদের রেকর্ডের কোনো অন্ত নাই। এই যুদ্ধ যে ড্রাগের বিরুদ্ধেও একটা যুদ্ধ ব্লেয়ারের এই দাবিকে মুখ-ভ্যাঙানি দিয়ে তারা গত বছর থেকে ব্যাপক মাত্রায় হেরোইন মার্কেটিং করা শুরু করেছে। তালেবানদের চেয়ে তারা কোনো অগ্রগতি ঘটাবে এ ধারণা হাস্যকর। বিরোধীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়াই হবে তাদের প্রথম তাড়না। যাই হোক, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে গুলবু-দ্দিন হেকমতিয়ারের আলাদা হয়ে যাওয়ায় জোট দুর্বল হয়ে পড়েছে। হেকমতিয়ার একসময় পশ্চিমের পছন্দের স্বাধীনতা-যোদ্ধা ছিলেন। হোয়াইট হাউস এবং ডাউনিং স্ট্রিটে রেগ্যান এবং থ্যাচার তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। এই লোকটা এখন কাফেরদের বিরুদ্ধে তালেবানদেরকে সমর্থন করবে বলে ঠিক করেছে। আফগানিস্তানে নতুন একটা মক্কেল রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা সহজ কোনো ব্যাপার হবে না। স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে।

প্রধান একটা দুশ্চিন্তা হলো নিজেদের দেশের মধ্যে কোনঠাসা ও পরাজিত হয়ে পড়া তালেবান পাকিস্তানের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং এর শহরগুলোয় ও সামাজিক বুননে প্রতিহিংসার ধ্বংস ডেকে আনবে। পেশোয়ার, কোয়েটা ও করাচি হচ্ছে বিশেষভাবে বিপদাপন্ন। ততক্ষণে একটা "বিজয়" অর্জন করার পরে পশ্চিম যথারীতি চোখ বন্ধ করে ফেলবে। এই অপারেশনের অনুমিত লক্ষ্য– ওসামা বিন লাদেনকে ধরা। দেখতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে ততটা সহজ সেটা নাও হতে পারে। প্রত্যন্ত পামীর পর্বতমালায় তিনি সুরক্ষিত অবস্থায় আছেন। যেহেতু তার কর্তব্য নির্ধারণের জন্য তিন সপ্তাহ হাতে ছিল কাজেই তিনি গায়েবও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তবু বিজয়ের দাবি জানানো হতে থাকবে। পশ্চিম তার নাগরিকদের সংক্ষিপ্ত স্মরণশক্তির ওপর ভরসা রাখবে। কিন্তু ধরা যাক বিন লাদেনকে ধরা হলো এবং মেরে ফেলা হলো, 'সন্ত্রাসবাদ' যুদ্ধের মধ্যে এটা কি কাজে আসবে? অন্য আরো লোকজন ১১ই সেপ্টেম্বরের কার্যকলাপগুলোকে ভিন্ন কায়দায়, নকল করার সিদ্ধান্ত নেবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মনোযোগ সরে যাবে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে।

সৌদি আরবের রাজপরিবারের মধ্যে তীব্র উপদলীয় সংঘাত বাড়ছে। মুমূর্ষু বাদশাহ ফাহাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা তিনটা বড় বিমানে চড়ে সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেছেন। স্পষ্টতই প্রাসাদ-অভ্যুত্থান এড়ানোর জন্য। যুবরাজ আব্দুল্লা দায়িত্ব পেলেন এবং তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি প্রিন্স সুলতান দুর্বল হয়ে পড়লেন। সৌদি বিশারদগণ জোর দিয়ে বলছেন যে, যুবরাজ ওয়াহাবি মোল্লামৌলবীদের সাথে বেশি ঘনিষ্ট। এমনকি ব্যাপারটা যদি সেরকমও হয় তাকে খুবই ক্রুদ্ধ রাজপথের মুখোমুখি হতে হবে। মিশরের হোসনী মোবারকের অবস্থাও তাই। তিনিও উদ্বিগ্ন এবং ন্যাটো জোটের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন আর গোঁ ধরে আছেন যেন তার

সৈন্যদেরকে ব্যবহার করা না-হয়। কায়রোর রাজপথ খুবই রাগী হয়ে আছে। যদি এই দুই দেশে অভ্যুত্থান হয়, তাহলে একটা স্বাধীন প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র সৃজন করার দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমেরিকার আর কিছু করার নাও থাকতে পারে। অবশ্য ১১ সেপ্টেম্বরের পরিণামগুলো এখনই আন্দাজ করাটা খুবই শীঘ্রই হয়ে যাচ্ছে।

এডোয়ার্ড সাঈদ

সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গির আবশ্যকতাঃ বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং পিছিয়ে আসা

তরজমাঃ বদরে মুনীর

বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র-বিধ্বংসী সন্ত্রাসী হামলার পরপরই লিখিত এই রচনায় ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে মার্কিন নাগরিকদের সিভিল রাইট্‌স্ খর্ব হবার আশঙ্কা, ইসলামকে কেন্দ্র করে পণ্ডিতদের ও মিডিয়ার স্টিরিওটাইপিং, সর্বত্রপ্রসারমান প্রতিশোধোন্মত্ততা ইত্যাদি বিষয়ে সাঈদ আলোচনা করেছেন। এই অনুবাদের জন্য মূল লেখাটা ইণ্টারনেট থেকে নেয়াঃ www.zmag.org

৭০ লক্ষ আমেরিকান, যারা মুসলিম (যাদের কেবল ২০ লক্ষ আরব) এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের বিপর্যয় ও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া যারা সশরীরে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের জন্য সময়টা ছিল হৃদয়বিদারক, ভীষণ অনাকাঙ্ক্ষিত। এ-জঘন্য নৃশংসতায় অনেক নিরপরাধ মুসলিম ও আরব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও সামগ্রিকভাবে এই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি একটা ঘৃণার ভাব বিভিন্ন রূপে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জর্জ ডব্লিউ বুশ তো সরাসরি আমেরিকা এবং আল্লাহ এক করে ফেলেছেন সেই ‘‘বদলোকদের’’ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে – যাদের তিনি ধরতে চান জ্যান্ত অথবা মৃত – যারা এই বীভৎস ঘটনার হোতা। আর এর মানে, কারো কোনো পুনর্বিবেচনা ছাড়াই ঘটনার কেন্দ্রে চলে আসেন পালিয়ে বেড়ানো মুসলিম উগ্রপন্থি ওসামা বিন লাদেন, বিপুল সংখ্যক আমেরিকান যাকে ইসলামের প্রতিনিধি মনে করেন। টেলিভিশন ও রেডিও তাদের সংগ্রহ থেকে এই ঝাপসা চরমপন্থীর (তাদের ভাষায়, প্রাক্তন প্রমোদবালক) ছবি ও বিক্ষিপ্ত পরিচয় অনবরত প্রচার করেছে, যেমন তারা প্রচার করেছে আমেরিকার শোক ‘‘উদ্‌যাপনরত’’ ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের দৃশ্য।

আমাদের পণ্ডিতেরা অনবরত ‘‘আমাদের’’ সাথে ইসলামের যুদ্ধের উল্লেখ করে যাচ্ছেন, এবং ‘‘জিহাদ’’, ‘‘সন্ত্রাস’’ প্রভৃতি শব্দ দেশজুড়ে ব্যাপক বিস্তৃত ভয় আর ক্রোধকে আরো শোচনীয় করে তুলেছে। ইতোমধ্যে দুজন (যাদের একজন শিখ) খুন হয়েছেন উন্মত্ত জনতার হাতে যারা হয়তো উৎসাহিত হয়েছে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা পল ওলফ্‌উইজ-এর মন্তব্যে, যেমন তিনি আক্ষরিকভাবেই "প্রান্তিক দেশসমূহের" ধারণা পোষণ করেন, এবং শত্রুপক্ষকে পারমাণবিক শিক্ষা দিতে আগ্রহী। শত শত মুসলিম এবং আরব দোকানদার, ছাত্র, হেজাবপরা মহিলা এবং সাধারণ নাগরিকদের সহ্য করতে হয়েছে ছুঁড়ে দেওয়া অপমান এবং সমগ্র এলাকায় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারে আর দেয়ালচিকায় ঘোষিত তাদের মৃত্যুপরোয়ানা থেকে থেকেই উঁকি দিচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ১০টা ভয়ঙ্কর, অপমানজনক হুমকি তার কাছে আসছে বলে জানালেন শীর্ষস্থানীয় আরব-আমেরিকান সংগঠনের পরিচালক আজ সকালে। গতকাল প্রকাশিত এক জলদি-জরিপ জানাচ্ছে, শতকরা ৪৯ জন মার্কিন জনগণ এই প্রস্তাবে সম্মত (শতকরা ৪৯ জন অসম্মত) যে, আরবদের– যারা আমেরিকার নাগরিক, তাদেরও– বিশেষ সনাক্তকরণ চিহ্ন বহন করা উচিত; শতকরা ৫৮ জন এমন দাবি করেছেন (শতকরা ৪১ জন করেননি) যে, আরবদের, যারা আমেরিকার নাগরিক তাদেরও, সাধারণভাবে আরও কড়া, তীক্ষ্ণ নিরাপত্তা তল্লাশির মুখে পড়া উচিত।

তবে, অফিসিয়াল মারমুখিতা ধীরে ধীরে কমছে; যেহেতু জর্জ ডব্লিউ বুশ আবিষ্কার করেছেন যে, তার সাঙ্গপাঙ্গরা কেউ তার মতো লাগামছাড়া না; আর, সন্দেহাতীতভাবে, যেহেতু তার পরামর্শদাতাদের অনেকে– কলিন পাওয়েল যাদের মধ্যে মাথা, এবং যুগপৎ যাকে অধিক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্নও মনে হচ্ছে– এমন বলছেন যে, আফগানিস্তানে হামলা চালানো টেক্সাসে মিলিসিয়া পাঠানোর মতো সহজ না; এমনকি এই জন্য যে, তার এবং তার সহযোগীদের ওপর চেপে বসা বিপুলবিশৃঙ্খল বাস্তবতা উড়িয়ে দিয়েছে সেই সাধু বনাম শয়তান জাতীয় মনিসিয়ান ধারণা, যা তিনি তার জনগণের পক্ষ থেকে বরাবরই প্রচার করে আসছেন।

লক্ষণীয় যে, প্রকোপ কিছুটা কমতে শুরু করেছে; এখনও অবশ্য বানের মতো আসছে পুলিশ ও এফবিআই কর্তৃক আরব এবং মুসলিমদের হয়রানির খবর। বুশ ওয়াশিংটনের একটি মসজিদে গেছেন; হিংসাত্মক বক্তব্যের আঁচ কমাতে তিনি জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন; "আমাদের" আরব ও মুসলিম বন্ধুদের (যেমন জর্ডান, মিশর, সৌদি আরব) এবং এখনও অনাবিস্কৃত সন্ত্রাসীর মধ্যে একটা মৌখিক পার্থক্য অন্তত বানানোর চেষ্টা তিনি শুরু করেছেন।

কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে বুশ অবশ্য বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে না, কিন্তু যে সমস্ত উন্মত্ত ঘটনাস্রোতে, এবং তার অতিরঞ্জনে জর্জরিত দেশব্যাপী মুসলিম, আরব আর মধ্যপ্রাচ্যীয় চেহারার মানুষেরা, তাদের বিষয়ে দুঃখজনকভাবে তিনি কিছুই বলেননি। পাওয়েল এখানে সেখানে ইজরায়েল এবং শ্যারনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যে তারা এই সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে এখনও ফিলিস্তিনিদের ওপর দমননিপীড়ন চালাচ্ছে, কিন্তু সার্বিকভাবে এরকমই ধারণা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি এখনও ঠিক একই রকম আছে, বরাবর যেরকম ছিল– এখন কেবল এক ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রক্রিয়া চলছে।

কিন্তু সাধারণের ভেতর আরব ও ইসলাম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জানাবোঝা খুব সামান্যই যা তাদের অবলম্বন হতে পারে এবং যার মাধ্যমে চারদিকে প্রচারিত চূড়ান্ত বাজে ধারণাগুলো তারা যাচাই করে নিতে পারে; এরকম গৎবাঁধা চিত্র যে-কোনো ভাবেই হোক বজায় থাকে যে, আরব মানেই কামুক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংস্র, বিচারবুদ্ধিহীন, উগ্র, গোঁড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন নয় যে ফিলিস্তিন এ জাতীয় কল্পনায় প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষত ডারবান সম্মেলনের পরে তো নয়ই। এমনকি আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়, যা সত্যিই এর বুদ্ধিবৃত্তিক বহুমুখীতার জন্য এবং এর ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের বিষমজাতীয়তার জন্য বিখ্যাত, কদাচিৎ কোরান বিষয়ক কোনো

কোর্সের প্রস্তাব করে। ইংরেজি ভাষায় যে একখণ্ড বেশ ভালো একটা আধুনিক বই এ-বিষয়ে আছে সেটা হলো, ফিলিপ হিট্টি'র *আরব জাতির ইতিহাস*, এবং সেটাও ছাপা নাই। যেগুলো পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই কলহপ্রিয় এবং প্রতিপক্ষতামূলক; আরব এবং ইসলাম কেবল দীর্ঘ বাদানুবাদ চালিয়ে যাওয়ার উপলক্ষ মাত্র, অন্যদের মতো সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয় নয়। চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন বীভৎসরকম অনাকর্ষণীয়, বিবেচনাহীন হঠকারী আরব সন্ত্রাসীতে ঠাসা; কিন্তু হায়, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন-এর সন্ত্রাসীরা বিমানগুলো ছিনতাই করে সেগুলোকে এক ব্যাপক গণহত্যার হাতিয়ার বানানোর আগেও তারা সেখানে ছিল। এই নরহত্যা যে বিবমিষা ছড়াচ্ছে, তার উৎপত্তি কোনো ধর্ম থেকেই নয়, বরং অপরাধগ্রস্ততা থেকে তা উদ্ভূত।

পত্রপত্রিকাগুলোতে এমন মতামত মনে করিয়ে দেয়ার তৎপরতা দেখা যাচ্ছে যে, "আমরা সবাই এখন ইজরায়েলি" এবং বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে ও পেন্টাগন-এ হামলা আর ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী বোমা হামলা প্রায় কমবেশি একই ঘটনা। এবং এই প্রক্রিয়ায়, অবশ্যই, স্মৃতি থেকে স্রেফ মুছে যায় ফিলিস্তিনিদের নিপীড়ন আর অধিকারবঞ্চনার কথা, মুছে যায় যে, অনেক ফিলিস্তি নি আত্মঘাতী বোমাহামলার নিন্দা করে আসছেন, যাদের মধ্যে আমি নিজেও একজন। সার্বিক ফলাফল এরকম দাঁড়ায় যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ভয়াবহতার যে-কোনো পরিমাপ করতে গেলে তার ভেতরে পড়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ হামলা এবং প্রত্যাখ্যান, যা কোনো না কোনোভাবে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলাকে পুষিয়ে দেয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক-নৈতিক-এবং রাজনৈতিকভাবে এমন দৃষ্টিভঙ্গি দুর্ভাগ্যজনক যখন সমমর্মিতা ও না-দেখার ভান করার ভেতরের সমীকরণটি ভীষণভাবে ভুল, এবং সত্য থেকে বহুদূর। মধ্যপ্রাচ্যে এবং আরব বিশ্বে রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপ বেশিরভাগ আমেরিকানের পক্ষেই বিশ্বাস করা মুশকিল হবে– ইজরায়েলের পক্ষে নিঃশর্ত সমর্থন, ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ যা সাদ্দাম হোসেনকে আস্কারা দিয়েছে আর শত শত হাজার হাজার নিষ্পাপ ইরাকিদের ঠেলে দিয়েছে মৃত্যু, মারী ও অপুষ্টির মুখে, সুদানে বোমা হামলা, ১৯৮২ সালে লেবানন আক্রমণে ইজরায়েলের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের "সবুজ সংকেত" (যে হামলায় ২০,০০০ বেসামরিক লোক প্রাণ হারান, এর পরও আছে সাবরা ও শাতিলা'র নারকীয় হত্যাযজ্ঞ), সৌদি আরব এবং উপসাগরকে ঢালাওভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামন্ত উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করা, দমনমূলক আরব ও ইসলামী সরকারপদ্ধতিকে সমর্থন করা– এই সমস্তই ভীষণ অপমানের এবং এটা মিথ্যা না যে, এসবই ঘটানো হয়েছে আমেরিকার জনগণের দোহাই দিয়ে। গড়পরতা আমেরিকার নাগরিকেরা যে বিষয়টা জানেন, এবং তাদের জানিয়ে বা না জানিয়ে যে অনুচিত ও হৃদয়হীন বিদেশনীতিমালা গৃহীত হয় তার মধ্যে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। ইজরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা প্রস্তাবসমূহের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি ভেটো, অসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ ইত্যাদিকে হয়তো উপেক্ষা করা যেতে পারে; কিন্তু একটা ঘটনা আইওয়া বা নেব্রাস্কা'র বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে যা অগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সম্ভবত ঠিক কাজ, পক্ষান্তরে মিশ-রীয়, ফিলিস্তিনি বা লেবানিজ নাগরিকদের ক্ষেত্রে সেই একই ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় চূড়ান্তভাবে দমবন্ধকরা এবং খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা স্মরণ করা হয়।

অন্য কথায়, একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ এবং তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে, এ-দুয়ের মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিকতা বিদ্যমান যা আক্ষরিকভাবে খুব সামান্যই যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রযাত্রা, স্বাধীনতা আর দুনিয়াব্যাপী সর্বময় সাফল্যের প্রতি ঈর্ষাকাতরতা বা ঘৃণার সাথে সম্পর্কিত। অপরপক্ষে প্রত্যেক আরব অথবা মুসলিম যাদের সাথে আমি কথা

বলেছি ব্যক্ত করেছেন তাদের বিভ্রান্তবিমূঢ় অবস্থা যে, এমন অসাধারণভাবে সমৃদ্ধ ও প্রশংসনীয় একটি দেশ আমেরিকা (এবং তেমনি পছন্দনীয় ব্যক্তির সমষ্টি আমেরিকানরা) কেন আন্তর্জাতিকভাবে এত নিবপ্রজাতির মানুষের মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন, উদাসীন আচরণ করেন। অবশ্যই অনেক আরব এবং মুসলিম যুক্তরাষ্ট্রের নীতিমালায় ইজরায়েলপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন এবং ইজরায়েলপন্থী প্রকাশনা যেমন *দ্য নিউ রিপাবলিক* বা *কমেন্টারি*'র ভয়ঙ্কর জাত্যাভিমান ও তর্জনগর্জন বিষয়েও তারা সজাগ। চার্লস কুটহ্যামার, উইলিয়াম স্যাফির, জর্জ উইল, নরম্যান পাধোরেজ এবং এ এম রোজেন্থালদের মতো রক্তপিপাসু কলামলেখকদের সম্পর্কে কিছু বলার নেই যাদের কলম অনবরত উদগীরণ করে যাচ্ছে আরব এবং মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও বৈরিতা। শেষ পৃষ্ঠায় মার্জিনে কাটা পাড়ার বদলে এসব কলাম সাধারণত দেখা যাচ্ছে পত্রিকার প্রধান অংশসমূহে (যেমন *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর সম্পদকীয় পৃষ্ঠায়) যেখান থেকে সবাই সেগুলো ভালো করে পড়তে পারবে।

তাই আমরা বেঁচে থাকছি এক উচ্ছৃঙ্খল সময়ের ভেতর দিয়ে, ক্ষণপরিবর্তনশীল আবেগে আর গভীর আশঙ্কায়, এবং চেতনা শাসনকরা আরো বেশি সহিংসতা ও সন্ত্রাসের প্রতিজ্ঞায় পা রেখে, বিশেষ করে নিউইয়র্কে এবং ওয়াশিংটনে যেখানে ১১ই সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ নৃশংসতা এখনো জীবন্ত। আমি নিঃসন্দেহে এটা অনুভব করি, যেমন অনুভব করেন আমার চারপাশের আর সবাই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আশার কথা হচ্ছে, প্রচার মাধ্যমের ঢালাও আতঙ্কজনক ভূমিকার পরও, ব্যাপক বোমাবর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞের বিকল্প কিছু হিসাবে শান্তি প্রস্তাব ও তার বাস্তবায়নের আবেদন নিয়ে ধীরে ধীরে একটা ভিন্নমতের আবির্ভাবও যেন বোঝা যাচ্ছে, যদিও সে মত তুলনামূলকভাবে খুব ক্ষুদ্র এবং এখনো খুবই অস্পষ্ট। আমার বিচারে এ ধরনের চিন্তাভাবনা বিশেষ লক্ষণীয়। সবার প্রথমে, সরকারি চাহিদা মতো নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত গোপনতার অধিকার ছাঁটাছাঁটির রূপ কেমন হবে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ব্যক্ত হচ্ছে; এবং এমন ক্ষমতাও মনে হয় রাষ্ট্র পাচ্ছে যার ফলে ফোনে আড়ি পাতা যায়, সন্ত্রাসী সন্দেহে মধ্যপ্রাচ্যীয়দের গ্রেপ্তার ও আটকে রাখা যায়, এবং সর্বোপরি সংকেত, সন্দেহ আর হানাহানির মাধ্যমে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা যায় যা শেষ পর্যন্ত ম্যাকার্থিজম-এর মতো মানসিক বৈকল্যের সাথে তুলনীয় হতে পারে। অনেকে ভিন্নভাবে নিতে পারেন, কিন্তু সর্বত্র পতাকা উড়িয়ে দেয়ার মার্কিনি অভ্যাস হয়তো দেশপ্রেমের পরিচায়ক, পাশাপাশি এই দেশপ্রেম ব্যাপক অসহিষ্ণুতা, ঘৃণ্য অপরাধ এবং সব ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সামষ্টিক ভাবাবেগের দিকেও ধাবিত করে। অনেক ভাষ্যকার এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, এবং আমিও পূর্বে উল্লেখ করেছি, এমনকি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তার ভাষণে বলেছেন যে, "আমরা" ইসলাম অথবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি না। কিন্তু বিপদ সেখানেই, এবং আমি আনন্দিত যে, অন্যান্য ভাষ্যকার কর্তৃক এ বিষয়টা যথাসময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অনেক সভাসমিতি হচ্ছে সামরিক অভিযানের সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে, সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী শতকরা ৯২ ভাগ মার্কিন জনগণ অভিযানের পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ, যা-ই হোক না কেন, প্রশাসন এই যুদ্ধের লক্ষ্য ("সন্ত্রাস নির্মূলকরণ" যতটা না বাস্তব তারচে অনেক বেশি বিমূর্ত, অধিবাস্তব), প্রক্রিয়া বা পরিকল্পনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলেনি; এমন গ্রহণযোগ্য অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে যে, সমরসজ্জা নিয়ে আমরা কোথায় চলেছি। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, প্রলয়ঙ্করী এবং ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার অনেকটা কমেছে– ক্রুসেডের ধারণা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়েছে– এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোর দেয়া হচ্ছে

"ত্যাগস্বীকার", "এক দীর্ঘ যুদ্ধ, অন্যগুলোর থেকে আলাদা" ইত্যাদি শব্দের ওপর।

প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশের এখন কী করা উচিত এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, গীর্জা এবং সম্মেলনকেন্দ্রগুলোতে; এমনকি নিষ্পাপ হতভাগ্যদের পরিবারবর্গকে আমি জনসমক্ষে এমনও বলতে শুনেছি যে, সামরিক প্রতিশোধকে তারা যথাযথ প্রতিক্রিয়া বলে বিশ্বাস করেন না। বিষয় হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র যা করতে যাচ্ছে সাধারণভাবে তার একটা গ্রহণযোগ্য প্রতিফলন দেখা যায়, কিন্তু আমি এটা বলার জন্য দুঃখিত যে, মধ্যপ্রাচ্য এবং মুসলিম বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় এখনও আসেনি। আশা করি এটা আসবে।

কেবল যদি আরও বেশি আমেরিকানরা ও অন্যান্যরা এটা উপলব্ধি করে যে এই পৃথিবীর যা প্রধান, দীর্ঘ মেয়াদী আশার ব্যাপার তা হলো বিবেকবিবেচনাবান এই জাতি, যে-কোনো প্রকারে হোক, হতে পারে সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে, অথবা আমেরিকার ক্ষমতার নিষ্পাপ শিকারদের (যেমন ইরাকে) প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে অথবা মানবিক বিবেচনা এবং বিশ্লেষণের ওপর আস্থা রেখে আমরা আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু করতে পারি। অবশ্যই এসবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো সরাসরি পরিবর্তন আসবে না, প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ একটুও টলবে না, পরিবেশ এবং পরমাণু শক্তি কার্যক্রমে নতুন কোনো আলো পড়বে না: কিন্তু এই যথোচিত পিছিয়ে আসা ছাড়া আশা রাখার আর জায়গা কোথায়? হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে এরকম শাসনতান্ত্রিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে, কিন্তু একজন ফিলিস্তিনি হিসাবে আমি অবশ্যই আশা করবো যে আরব এবং মুসলিম বিশ্বেও যেন একই রকম শাসনতান্ত্রিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠে। আমাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা এবং নির্যাতননিপীড়ন যা আমাদের সমাজে কর্তৃত্ব করেছে, এবং ইহুদিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সহস্র নালিশ সত্ত্বেও আমরা আমাদের ভেতরে বাড়তে দিয়েছি যে দুষ্টচক্র, এইসব কিছুর জন্য যে আমরাও দায়ী এমন বিবেচনা শুরু করতে হবে। আমাদের মধ্যে কয়জন খোলা মনে ও সততার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং মুসলিম বিশ্বে ধর্মকে ব্যবহারের পথ পরিত্যাগ করেছেন তেমন ব্যাপক ও আন্তরিকভাবে যেমন আমরা অভিযোগ করে থাকি ইজরায়েলে ও পশ্চিমে ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে? আমাদের মধ্যে কয়জন সমস্ত আত্মঘাতী মিশনকে ভুল এবং অনৈতিক বলে বাতিল করেছি, যদিও আমরা বারবার ঔপনিবেশিক বহিরাগতদের ধ্বংসযজ্ঞ আর অমানবিক সামষ্টিক শাস্তি ভোগ করেছি? আমাদের ওপরে চাপানো অবিচারের আড়ালে আমরা আর লুকাতে পারবো না, যতদিন না আমাদের অ-জনপ্রিয় নেতাদের প্রতি আমেরিকার সমর্থনকে আমরা অন্তত অপ্রত্যক্ষ হলেও বিদায় জানাতে পারছি। জনতার যে জঙ্গী মনোভাব (এটা পাগলামি) নির্বিচারে মানুষ হত্যায় উৎসাহী তাকে এক মুহূর্তের জন্যও প্রশ্রয় না দিয়ে, সমর্থন না করে এখন এক ধর্মনিরপেক্ষ আরব রাজনীতিকে তার পরিচয় জানাতে হবে। এ-প্রসঙ্গে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকতে পারে না।

অনেক বছর ধরেই আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে আরব হিসেবে আজ আমাদের প্রধান হাতিয়ারগুলো সামরিক নয়, বরং নৈতিক, এবং তার একটা কারণ হলো, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মতো ইজরায়েলি নিপীড়নের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম বিশ্ববাসীর কল্পনাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, কেননা আমরা আমাদের লক্ষ্য এবং প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে দেখাতে পারিনি, এবং আমরা যথেষ্টভাবে বলিনি যে, আমাদের উদ্দেশ্য সহাবস্থান এবং অন্তর্ভুক্ত হওয়া, রক্ষণশীলতা এবং কোনো স্বপ্নালস পৌরাণিক অতীতে ফিরে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের স্পষ্টবাদী হওয়ার সময় এসেছে,

নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সময় হয়েছে, যেমন করছেন এখন অনেক আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ানরা। অন্যের কাছে আমরা যা দাবি করছি সেটা তো আমাদের নিজেদেরও থাকতে হবে। সব মানুষের যদি এটা ভেবে দেখার সময় থাকতো যে আমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুনর্মূল্যায়নপ্রবণতা হচ্ছে জরুরি আবশ্যকতা, বিলাসিতা নয়।

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

বন্দনা শিবা

সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একাত্মতা

তরজমা: মলয় কর্মকার

বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র-বিধ্বংসী সন্ত্রাসী হামলার পরপরই লিখিত এই রচনায় সারা দুনিয়ার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ এবং পাহাড়-সাগর-পৃথিবী-প্রকৃতি-গ্রহের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্র-সভ্যতার মর্মান্তিক আগ্রাসনও বন্দনা শিবার কাছে সন্ত্রাস, এবং তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র-বিধ্বংসী সন্ত্রাসের চেয়ে কোনো অংশে কম মারাত্মক তো নয়ই বরং অনেক বেশি গুরুত্বের দাবিদার। উড়িষ্যায় বসেও সন্ত্রাসবাদী হামলায় যুক্তরাষ্ট্রে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ যেমন তেমনি কর্পোরেট-সন্ত্রাস, দুর্ভিক্ষ-সন্ত্রাস, খনিজোত্তোলন-সন্ত্রাস ইত্যাদি সকল প্রকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংহতি জ্ঞাপনও তাঁর তৎপরতা। মূল লেখাটা ইন্টারনেট থেকে নেয়া: www.zmag.org

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করা হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং পেন্টাগনে আকস্মিক হামলায় নিহতদের উদ্দেশ্যে সেদিন সকাল ১০.৩০ মিনিটে দুই মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য লাখ লাখ মানুষের সঙ্গে আমিও তাতে অংশগ্রহণ করি। আমার সঙ্গে উড়িষ্যার কাশিপুর জেলার লোধিয়া শাহী গ্রাম থেকে আসা লক্ষ্মী, Rabeasri এবং Suvavam ছিলো। লক্ষ্মীর স্বামী কয়েক মাস আগে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে অন্য ২০ আদিবাসীর সঙ্গে অনাহারে প্রাণ হারায়। পরে আরো একজনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। বিলামাল গ্রামের সিঙ্গারী। একই দুর্ভিক্ষে সে তার স্বামীসহ দুই সন্তান এবং পুত্রবধুকে হারিয়েছে। সেই শোকাবহ অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং ভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসের শিকার আরো লাখ মানুষের বিষয়টিও ছিলো এবং সেখানেই সবধরনের সন্ত্রাস বন্ধে আমি আমার প্রতিশ্রুতিতে আবারো দৃঢ় হই।

বিশ্বব্যাঙ্কের কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির মূলে রয়েছে প্রকৃত ক্ষুধার্তদের খাদ্য দানে বরাবরের অনীহা। এক্ষেত্রে সরকারী (গণ) বিতরণ ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ফেলাটাই তাদের শর্ত। ব্যয় সংকোচনের কথা বলে এটা করা হয়। অথচ ১৯৯১ থেকে ২০০১-এ তাদের খাদ্য ভর্তুকি বাজেট

বৃদ্ধি করা হয়েছে দুই হাজার আটশো কোটি রুপি থেকে ১৪ হাজার কোটি রুপিতে। আবার এই ভর্তুকি তুলে নেয়ার প্রয়োজনে আরো অর্থ ব্যয় করা হয়েছে খাদ্য গুদামজাতকরণে, যা আসলে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিই ঘটাচ্ছে। আর এভাবে ভেঙ্গে পড়ছে রাষ্ট্রের খাদ্য নিরাপত্তা। আমি যখন আদিবাসী পরিবারগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে দুই মিনিটের নীরবতায় মৌন তখন যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া জনগণকে দারিদ্র এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলে দেয় তাকে সন্ত্রাসের আর একটা রূপ ছাড়া আর কিছুই মনে করা সম্ভব হয় নি। কেননা ছয় কোটি টন খাদ্য যখন গুদামে পড়ে পড়ে পচে তখন এই পরিবারগুলোকে হতে হয় দুর্ভিক্ষের শিকার। অনাহারে মরতে হয় তাদের আপনজনদের।

মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উড়িষ্যার অনাহারে মৃত্যু আসলে ভারতের খাদ্যব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার লক্ষণ। অন্তত কাশিপুরে যেখানে প্রকৃতি উজাড় হাতে দান করেছে সেখানে তো দুর্ভিক্ষ থাকারই কথা নয়। অথচ সেটা ঘটেছে। ঘটেছে সেখানকার প্রকৃতি এবং আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর ওপর দফায় দফায় আঘাত হানার কারণে– শিল্প-কারখানা এবং প্রাইভেট কর্পোরেশনগুলোর জন্য নিষ্ঠুরভাবে আদিবাসীদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পুনর্বাসন এবং নিরাপত্তা না-দেয়ার কারণে। কাশিপুর এবং অন্যান্য এলাকায় দুর্ভিক্ষ-মৃত্যু আসলে অবাধে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অধীনে খাদ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফসল।

বিশ বছর আগে মণ্ড এবং কাগজের কারখানা উজাড় করে দিয়েছে কাশিপুরের বনাঞ্চল। আজ সেখানকার অবশিষ্ট গাছপালাগুলো পত্রশূন্য। কাগজের কলগুলো পার্শ্ববর্তী অন্ধ্র প্রদেশ থেকে ইউক্যালিপটাস এনে মেটাচ্ছে তাদের চাহিদা। কাগজ এবং মণ্ড কারখানাগুলোর সন্ত্রাস এইভাবে ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে এই এলাকা। এখন শুরু করেছে খনিজ উত্তোলন কোম্পানিগুলো। নরওয়ের হাইড্রো, কানাডার এ্যালকান এবং ভারতের ইন্ডিকো, বেলকো, স্টারলিট সেখানে প্রসারিত করছে নতুন আর এক সন্ত্রাসের প্রবাহ। কাশিপুরের বড় বড় পাহাড়গুলোতে তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে বক্সাইট নামের এক ধরনের কাদামাটি, যা থেকে পাওয়া যাবে এ্যালুমিনিয়াম। আর এই এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হবে কোকাকোলার ক্যান কিম্বা যুদ্ধ বিমান তৈরিতে। চোখের সামনে ধ্বংস হবে এক একটি পাহাড়– প্রকৃতির অসীম মমতায় হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি এক একটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। চির অতৃপ্ত কারখানা এবং মার্কেটগুলোর হাঙ্গর পেটে কাঁচামালের যোগান দিতে এই যে ট্র্যাজেডি তৈরি হচ্ছে তাকি বিশ্ববাসীর ১১ই সেপ্টেম্বরের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বড় নয়? আমার আবাসিক এলাকা, ডুন ভ্যালিতে ১৯৮৩ সালে আমরা খনিজ উত্তোলন কোম্পানিগুলোর পরিবেশ-বিরুদ্ধ সন্ত্রাসকে রুখে দিয়েছি। সুপ্রীম কোর্ট যে ধরনের ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড জীবনের প্রতি হুমকি ডেকে আনে তা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এই মর্মে আইন করে সেখানকার খনিগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের ৮০'র সেই পরিবেশগত বিজয় বিশ্বায়ন নীতির সহগামী প্রাকৃতিক ধারা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অকার্যকর।

খনিজ উত্তোলনকে উদারীকরণ করা হয়েছে এবং কর্পোরেশনগুলো আকরিকের খোঁজে যেখানে পারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিগুলো এখন কাশিপুরের আদিবাসীদের তাদের আবাসভূমি ছেড়ে দিতে বলছে। তবে আদিবাসীরা এ ব্যাপারে নারাজ। তারা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন, "প্রকৃতি ও মানুষ রক্ষা আন্দোলন"-এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। কাশিপুরে ১৪ই সেপ্টেম্বর এক র‍্যালিতে মুক্তা যোধিয়া নামের একজন বয়স্কা মহিলা নেত্রী বলেছেন "পৃথিবী আমাদের মা। তিনি আমাদের

জন্মদাত্রী। আমরা তাদের সন্তান-সন্ততি। খনিজ কোম্পানিগুলো আমাদেরকে আমাদের জমি থেকে উঠে যেতে বাধ্য করতে পারে না। ঈশ্বর এবং সৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে আমরা এই জমি পেয়েছি, সরকার আমাদের তা দেয় নি। আমাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার সরকারের নেই।" এইভাবে মানুষের কাছ থেকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সম্পদকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করাটাও একটা সন্ত্রাস– কর্পোরেট সন্ত্রাস।

আমি গিয়েছিলাম কর্পোরেট সন্ত্রাসের শিকার নিরীহ মানুষগুলোর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করতে। এই সন্ত্রাস শুধু নিরীহ মানুষগুলোর বেঁচে থাকার আশ্রয় দুইশো গ্রাম কেড়ে নেবার হুমকিই নয় গত ১৬ই ডিসেম্বরের পুলিশের গুলি ইতিমধ্যেই তাদের জীবনও কেড়ে নিয়েছে। অভিলাষ ছিলো সেই নিহতদের একজন। তার স্ত্রী সুবর্ণা যোধিয়া সে সময় ছিলো সন্তানসম্ভবা। আমি যখন মাইকাঞ্চ গ্রামে তার সঙ্গে দেখা করি সে তখন কুঁড়ে ঘরের দোরগোড়ায় বসে ছিলো কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে। পিতার নির্মম হত্যার পর যার জন্ম হয়েছে। মায়ের কাছে শিশুটির নাম জিজ্ঞাসা করলে সে-ই আমাকে একটা নাম দিতে বলে। আমি মেয়েটির নাম দিলাম শক্তি। যেন সে 'শক্তি' ধারণ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে– যেন সে তার পিতা এবং আদিবাসী স্বজনদের সেই 'শক্তি'কে বহন করতে পারে নিজের ভেতরে যা তারা খনিজ উত্তোলন কোম্পানি এবং পুলিশি রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে আসছে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে– যেন সে বেড়ে ওঠে সবধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটা সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি হিসাবে।

এছাড়া জলবিদ্যুৎ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য জলাধার নির্মাণের কারণে ভিটে মাটি ছেড়ে বাধ্য হয়ে উঠে যেতে হয়েছে পাঁচ কোটি আদিবাসীকে। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তারাও শিকার হচ্ছে সন্ত্রাসের– প্রযুক্তি এবং ক্ষতিকারক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সন্ত্রাসের। অন্যদিকে উড়িষ্যার তিন কোটি লোক মারা গেছে বড় আকারের সাইক্লোন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবাশ্ম তেল দূষণের কারণে। এছাড়া বন্যা, অনাবৃষ্টি, সাইক্লোন মারাত্মক রূপ নিলে মারা যাবে আরো লাখ লাখ মানুষ। এইখানে প্রেসিডেন্ট বুশ নিজেই একজন পরিবেশ-বিরুদ্ধ সন্ত্রাসী। কেননা তিনি কিয়োটো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নি। আর সিয়াটলের জনগণের ভাষায় ডব্লিউ.টি.ও হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টেররিস্ট অর্গানাইজেশন। কেননা এর কায়দা-কানুন লাখ মানুষের জীবন এবং জীবন ধারণের বিরুদ্ধে।

১১ই সেপ্টেম্বরের ট্র্যাজেডি আমাদের সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ বন্ধের সুযোগ করে দিয়েছে। সেটা হোক সামরিক, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক কিম্বা রাজনৈতিক। সমর সজ্জিত মানসিকতা নিয়ে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা যাবে না। এ থেকে যে-ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয় তাই আসলে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শান্তি এবং নিরাপত্তার পরিবর্তে কেবলমাত্র অরাজকতার দুষ্টচক্রই তৈরি করবে। আমরা ইতিমধ্যেই মার্কিন মুল্লুকে ভারতীয়, এশীয় এবং আরবদের আক্রমণ ও হত্যার মধ্যে দিয়ে তাদের সম্বন্ধে একটা অহেতুক বিদেশিভীতির স্রোত বয়ে যেতে দেখছি। আমরা প্রত্যক্ষ করছি সব ধরনের মৌলবাদকে প্রতিশোধ স্পৃহায় জেগে উঠতে। সন্ত্রাসবাদ কেবলমাত্র শান্তি, গণতন্ত্র এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধানের সংস্কৃতি দিয়েই রুখতে হবে। ১১ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী পৃথিবীকে "সভ্যতা এবং বর্বরতা" অথবা "গণতন্ত্র এবং সন্ত্রাসবাদ"-এর মধ্যে যুদ্ধ হিসাবে দেখলে ভুল হবে। এটা আসলে একই সন্ত্রাসবাদের দুই চেহারার যুদ্ধ। এরা একে অপরের কাছে সন্ত্রাসী। ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এবং বৈচিত্রহীনতা থেকে এ ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়। এরা উভয়েই সন্ত্রাসের আধিপত্যমূলক সংস্কৃতির অংশীদার। এরা ব্যবহার করে একই অস্ত্র এবং প্রযুক্তি। সন্ত্রাসপ্রীতি এবং সন্ত্রাসী ব্যবহারের দিক থেকে দুই পক্ষই একে অপরের ক্লোন আর সব জায়গায় তাদের

শিকার হচ্ছে নিরীহ জনগণ। অথচ প্রকৃত দ্বন্দ্বটা হচ্ছে শান্তিপুর্ণ ও নির্ভয় জীবন-প্রত্যাশী পৃথিবীবাসী এবং তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে অস্বীকারকারী সন্ত্রাস ও সহিংসতার পক্ষের শক্তিসমূহের মধ্যে।

যোধিয়া শাহীর আদিবাসীদের আরাধ্য পাথর আমাকে একটা আলোকবর্তিকার সন্ধান দিয়েছে। তাদের এই পাথরগুলো আকৃতিগতভাবে হয়তো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তুলনায় নগণ্য কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে সেগুলো আমার কাছে গভীর অর্থবহ। কেননা এই পাথরগুলো বিশ্বজনীন শান্তির উদাত্ত প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে। এই শান্তি বিশ্বের শান্তি, মানুষে মানুষে শান্তি এবং মানুষের আত্মার অন্তস্থিত শান্তির সন্ধান দেয়। শান্তির এই সংস্কৃতি আমাদের বারবার তুলে ধরতে হবে এবং তা ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্বকে বিরামহীনভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ধ্বসে পড়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে কিন্তু এইসব লাখ লাখ পবিত্র পাথর, ঘরবাড়ি এবং খামার গায়ের জোরে ধ্বংস করে দেওয়ার অবিচার, লোভ এবং বিশ্বায়ন চলে যাচ্ছে সবার অলক্ষে।

কালো মঙ্গলবারের নিহতদের কথা স্মরণ করার সাথে সাথে এই গ্রহের খুব সম্ভাব্য ভবিষ্যতের হুমকিস্বরূপ অন্য সব ধরনের সন্ত্রাস এবং অরাজকতার অদৃশ্য শিকার আরো লাখ মানুষের প্রতিও আমাদের একাত্মতা দৃঢ় করতে হবে। আমরা এই ঐতিহাসিক নিষ্ঠুর বিয়োগাত্মক মুহূর্তকে শান্তির সংস্কৃতি তৈরির মুহূর্ততে রূপান্তরিত করতে পারি।

নোম চমস্কি

‘এই প্রথমবার বন্দুকের নল উল্টোদিকে ঘুরেছে। এটা এক নাটকীয় পরিবর্তন।’

তরজমা: আ-আল মামুন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত পেন্টাগনে ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পরের সপ্তায় মিডিয়া-বিশ্লেষক ও ভাষাতাত্ত্বিক নোম চমস্কির দেয়া সাক্ষাৎকার। www.zmag.org থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে। এই লেখাটি **মানুষ** এর জন্য তৈরি করা কিন্তু ইতঃপূর্বে মাসিক *সংস্কৃতি*-র জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল আমাদেরই সিদ্ধান্তক্রমে।

প্রশ্ন: বার্লিন প্রাচীরের পতনের ফলে কোনো হতাহত হয়নি কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব পড়েছিল; গত সপ্তায় মার্কিন দেশে হামলারও কী একই ধরনের প্রভাব পড়বে?

চমস্কি: বার্লিন প্রাচীরের পতন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ছিল এবং ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা পরিবর্তন এনেছিল, কিন্তু আমার মতে, যেমন পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল তেমনটি নয়। অন্যত্র আলোচনা করেছি, এখানে আর বিষয়টি নিয়ে আমার মতামত আলোচনা করছি না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা একেবারেই অভিনব, আঘাতের মাত্রা বা চরিত্রগত দিক থেকে নয়, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের দিক থেকে। ১৮১২ সালের যুদ্ধের পর এই প্রথমবার মার্কিন ভূখণ্ড আক্রমণের শিকার হয়েছে। অনেক ভাষ্যকার ১১ তারিখের ঘটনাকে পার্ল হারবার আক্রমণের সাথে তুলনা করছেন। কিন্তু এমন তুলনা একেবারেই বিভ্রান্তিকর। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর দুটি কলোনির সামরিক বেস আক্রান্ত হয়েছিল। মার্কিন জাতীয় ভূখণ্ড নয়, এই ভূখণ্ড কখনোই হুমকির সম্মুখীন হয় নি। তৎকালীন বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ স্বদেশী জনগণ হত্যা করেছিল, মেক্সিকোর অর্ধেক ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়েছিল, প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে প্রবলভাবে হস্ত-ক্ষেপ করেছিল, হাওয়াই ও ফিলিপাইন জয় করেছিল (লক্ষ লক্ষ ফিলিপিনোকে হত্যা করার মাধ্যমে)। এবং বিশেষ করে গত অর্ধশতক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে প্রায় পুরো বিশ্বব্যাপী। মার্কিন বলির সংখ্যা বিশাল। কিন্তু এই

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

প্রথমবার বন্দুকের নল উল্টোদিকে ঘুরেছে। এটা নাটকীয় এক পরিবর্তন।

ইউরোপের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ইউরোপ অনেক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু সেসব ধ্বংসযজ্ঞ ছিল অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কারণে। নির্মম বর্বরতার পরিচয় দিয়ে এক সময় ইউরোপ পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু দু-একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী দ্বারা কখনো আক্রান্ত হয় নি। ভারত ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করে নি, বেলজিয়ামকে কঙ্গো কিংবা ইতালিকে ইথিওপিয়া আক্রমণ করে নি। সুতরাং, এটা বিস্ময়কর নয় যে ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা ইউরোপকেও গভীরভাবে শোকাহত করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বলতে হবে যে তাদের শোকাচ্ছন্নতা হামলার ব্যাপকতার কারণে নয়।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা কীসের আলামত তা কেউই আন্দাজ করতে পারবে না। তবে ঘটনাটি যে চমক লাগানোর মতো অভিনব সেটা স্পষ্ট।

প্রশ্ন: আমার মনে হয় এই হামলার কারণে কোনো নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে না, তবে এটা "সাম্রাজ্যের" অভ্যন্তরের একটি সমস্যার বিরাজমানতাকেই নিশ্চিত করেছে। সমস্যাটি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার। আপনার মত কী?

চমস্কি: সম্ভাব্য হামলাকারীরা সাম্রাজ্যওয়ালাদেরই সৃষ্টি। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে-অঞ্চলে মার্কিন নীতি এবং তৎপরবর্তী ইউরোপীয় প্রভুদের কারণে ক্ষোভ ও তিক্ততার যে-পাহাড় গড়ে উঠেছে সেই উৎস থেকেই তারা সমর্থন পাচ্ছে। বিষয়টি অবশ্যই "রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা" সংশ্লিষ্ট। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের হামলার প্রাক্কালে *ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল* মধ্যপ্রাচ্যের "ধনবান মুসলমানদের" অভিমত জরিপ করেছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন ব্যাংকার, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী- যাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আছে। তারা কট্টর কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি মার্কিন সমর্থনদানের কারণে এবং "নিপীড়নকারী শাসকগোষ্ঠীগুলোকে" মার্কিন সরকার কর্তৃক ইন্ধন যোগানোর মাধ্যমে সে-অঞ্চলে স্বাধীন উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বিকাশে বাধাসৃষ্টি করার জন্য হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মূল উদ্বেগের বিষয় ছিল অবশ্য ইরাকের প্রতি এবং ইসরাইলের সামরিক দখলদারিত্বের প্রতি মার্কিন পলিসি প্রসঙ্গে। বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষদের মধ্যে মার্কিনীদের প্রতি এই ধরনের মনোভাব আরো তীব্র। এ-অঞ্চলের সম্পদ পশ্চিমে চলে যাওয়ার কারণে এবং পশ্চিমা-শক্তি-সমর্থিত দুর্নীতিগ্রস্ত এলিট ও বর্বর শাসকদের প্রতি তারা একেবারেই সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং, নিশ্চিতভাবেই এখানে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রকৃতি নিয়ে সংকট বিরাজমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গী হলো, ক্ষমতার মুষ্ঠি আরও শক্ত করার মাধ্যমে এসব সমস্যাকে মোকাবিলা করা। অবশ্যই, এমন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ অনিবার্য নয়। সমস্যাগুলোর ফলাফল কী হবে তা আগে থেকে বিবেচনার মাধ্যমে যেকোনো ভালো সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব।

প্রশ্ন: বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কি কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে? শুধু জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা গোয়েন্দা-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এটা জানতে চাচ্ছি না।

চমস্কি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্পোরেট-বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে না; যদিও এর প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই। এই বিশ্বায়ন কর্মসূচিগুলো ব্যাপক বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছিল। বিরুদ্ধতা করা হচ্ছিল মূলত দক্ষিণ থেকে– যেখানে গণ-প্রতিবাদ আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব কিংবা উপেক্ষাও করা সম্ভব। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এই প্রতিবাদের ধারা উন্নত দেশগুলোতেও শুরু হয়েছে। ফলে ক্ষমতাশালীদের কাছে বিষয়টি ব্যাপক মাথাব্যথার উৎস হয়ে

উঠেছে এবং তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছে। এমন অবস্থান গ্রহণ বিনা কারণে ঘটে নি। বিনিয়োগকারীর মুনাফা-সংরক্ষণমূলক এই বিশেষ ধরনের "বিশ্বায়ন" প্রক্রিয়া–যা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে–তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে ওঠার পর্যাপ্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। তবে, সে-কারণগুলোর সন্ধানে এখন যাচ্ছি না।

প্রশ্ন: ইরাকের ক্ষেত্রে "বিচক্ষণ বোমা" এবং কসোভোর ক্ষেত্রে "মানবিক হস্তক্ষেপ" প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব ক্ষেত্রে কখনোই "যুদ্ধ" শব্দটি ব্যবহার করে নি। এখন তারা নামহীন অবয়বহীন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন?

চমস্কি: প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "ক্রুসেড" (ধর্মযুদ্ধ) শব্দটি ব্যবহার করেছিল। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝতে পারলো যে ইসলামী বিশ্বের মিত্রদের সাথে পেতে চাইলে অনিবার্য কারণেই ক্রুসেড প্রত্যয় ব্যবহার করা হবে একটা মস্ত বড় ভুল। সুতরাং "যুদ্ধ" প্রত্যয়টিতে সরে আসতে হলো। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধকে "যুদ্ধ" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। সার্বিয়ায় বোমা-বর্ষণকে আখ্যায়িত করা হলো "মানবিক হস্তক্ষেপ" হিসেবে– তবে এমন আখ্যা আরোপন অভিনব নয়। উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী অভিযানগুলোকেও এভাবে বর্ণনা করাটা ছিল মজ্জাগত। এমন "মানবিক হস্তক্ষেপের" সাম্প্রতিক কিছু দৃষ্টান্তও তুলে ধরা যায়। সাম্প্রতিক বেশকিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তের তিনটি "মানবিক হস্ত ক্ষেপের" দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে: জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান, মুসোলিনির ইথিওপিয়া অভিযান এবং হিটলারের সুডেটল্যান্ড দখলের ঘটনা। অবশ্যই বলা যায়, লেখকগণ এসকল ঘটনাকে "মানবিক হস্তক্ষেপ" আখ্যা দানকে যথাযথ বলেন নি বরং এটাই বলেছেন যে, এসব অপরাধকে "মানবিক" আখ্যার মুখোশ পরিয়ে আড়াল করা হয়েছিল। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই "মানবিক হস্তক্ষেপের" অজুহাত খাড়া করা যাচ্ছে না। ফলে "যুদ্ধ" আখ্যাটিই ব্যবহার করতে হচ্ছে।

আর যেহেতু এই যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদকে লক্ষ্যবস্তু করছে না তাই "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" উপমা ব্যবহার করা একটা বড় ধরনের প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ-বিষয়টি, এক কথায় বলা যায়, গভীরভাবে ভাবা হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইকেল স্টোহল-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে পারি: "আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রথাগতভাবেই–এবং কেবল প্রথাগতভাবেই–পরাশক্তিধর দেশগুলোর সামরিক বাহিনী ব্যবহারকে এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকি প্রদানকে বলপ্রয়োগমূলক কূটনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়, সন্ত্রাসবাদ হিসেবে নয়", যদিও সচরাচর এধরনের কূটনীতিতে "হুমকি ও সন্ত্রাসের প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু মহাশক্তিধর দেশগুলো বাদে অন্য কোনো দেশ একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে তাকে সন্ত্রাসবাদী কৌশল হিসেবে অভিহিত করা হয়"– এবং প্রত্যয়টির একেবারে আক্ষরিক অর্থেই।

প্রশ্ন: ন্যাটো যতোক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে না পারছে যে, হামলাটি অন্তর্দেশীয় না বহির্দেশীয়, ততোক্ষণ নীরব হয়ে আছে। আপনি এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

চমস্কি: আমি মনে করি না যে ন্যাটোর দ্বিধাগ্রস্ততার এটাই কারণ। হামলাটি যে "বহির্দেশীয়" সে-ব্যাপারে বিশেষ সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমার মনে হয়, ন্যাটোর নীরবতা বিষয়ে ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ যে-সব কারণের কথা বলেছেন তাই ঠিক। ঐ অঞ্চল সম্পর্কে যাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে তাদের মতো করে ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দও স্বীকার করেছেন যে মুসলিম বিশ্বের ওপর ব্যাপক আঘাত হানা হবে বিন লাদেন ও তার সহযোগীদের প্রার্থনার প্রতি সাড়া দেয়া এবং এর ফলে, ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো বলাই যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা

একটি “শয়তানি ফাঁদে” পড়ে যাবে।

প্রশ্ন: আপনি কি মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের নীরব সমর্থন ও ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

চমস্কি: প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে হামলাটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের গোয়েন্দা বিভাগগুলোর জন্য একটি বিশাল বিস্ময় ও বেদনার ঘটনা। সিআইএ-র একটা ভূমিকা ছিল, সত্যি কথা বলতে কী একটা বড় ভূমিকাই ছিল। কিন্তু সেটা ১৯৮০'র দশকে, যখন সিআইএ পাকিস্তানী এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার (সৌদি আরব, বৃটেন ইত্যাদি) যোগসাজশে আফগানিস্তানের রুশীয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক “পবিত্র লড়াই” পরিচালনার জন্য সবচেয়ে কট্টর ইসলামী মৌলবাদীদেরকে খুঁজে বের করে নিয়োগ করেছিল, প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং অস্ত্রসজ্জিত করেছিল। এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেসব “আফগানীরা” (অনেকেই আফগান নন, যেমন বিন লাদেন) তাদের মনোযোগ অন্যত্র ফেরালো: যেমন ধরুন, চেচনিয়া এবং বসনিয়াতে– যেসব জায়গায় তারা অন্তত কৌশলগত মার্কিন সমর্থন পেতে পারে। এবং তারা প্রধান শত্রু হিসেবে সৌদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেও চোখ ফেরালো। বিন লাদেন মনে করলেন রাশিয়া যেমন আফগানিস্তান দখল করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি সৌদি আরব দখল করে রেখেছে। সে-এক বিশাল কাহিনী।

প্রশ্ন: সিয়েটল আন্দোলনের ভবিষ্যতকে আপনি কীভাবে দেখেন? আপনি কী মনে করেন যে এ-আন্দেলনকে হঠাৎ করেই গলা টিপে মেরে ফেলা হবে, নাকি এই আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ লাভ করার সম্ভাবনাও আছে?

চমস্কি: কর্পোরেট বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের এটা একটা বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু এ আন্দোলন, আবারও বলতে হয়, সিয়েটলে শুরু হয় নি। আজকের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পূর্বের সকল রকম নিষ্ঠুরতম ও দমনমূলক তৎপরতারই ফল। আর আজকের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ভাঙিয়ে– যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে– সামরিকায়ন, কঠোর নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক-গণতান্ত্রিক কর্মসূচিগুলোকে উল্টোমুখে প্রবাহিত করা, সম্পদকে সংকীর্ণ সেক্টরগুলোতে স্থানান্তর করা এবং সকলরকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে চেষ্টা করা হবে। কিন্তু কোনো রকম প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই ঘটবে না। এবং আমি মনে করি, তারা এমন তৎপরতায় সফল হবে বটে কিন্তু তা স্বল্প সময়ের জন্য।

প্রশ্ন: মধ্যপ্রাচ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশেষতঃ ইসরাইল-ফিলিস্তিনী সংকটের ওপর।

চমস্কি: সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের নৃশংসতা ছিল ফিলিস্তিনীদের জন্য এক বিধ্বংসী আঘাত, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা সেটা টেরও পেয়েছে। ইসরাইল প্রকাশ্যেই মহোল্লসিত চিত্তে সুযোগের সৎ-ব্যবহার করতে লেগে গেছে। এখন তারা কোনো অজুহাত ছাড়াই ফিলিস্তিনীদেরকে কচুকাটা করবে। মঙ্গলবারের হামলার পর প্রথম কয়েক দিনেই ইসরাইলী ট্যাংক ফিলিস্তিনী শহরগুলোতে (জেনিন, এবং এই প্রথমবার জেরিকোতে) ঢুকে পড়েছে, কয়েক ডজন ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে এবং ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর ওপর ইসরাইলের ইস্পাত-আঙ্গুলি-দৃঢ়-নিয়ন্ত্রণ অনেক বেড়ে গেছে, আর এমনটিই অনুমান করা গিয়েছিল। এটাও বলতে হবে যে প্রসারমান সহিংসতা-চক্রের সারা বিশ্বব্যাপীই এটা এক স্বাভাবিক প্রবণতা; নর্দান আয়ারল্যান্ড, ইসরাইল, ফিলিস্তিনী, বলকান অঞ্চল এবং অন্যত্রও এমন দেখা গেছে।

প্রশ্ন: মার্কিনীদের প্রতিক্রিয়াকে আপনি কীভাবে বিচার করবেন? এখনো পর্যন্ত মার্কিনীদেরকে বেশ মাথা-ঠাণ্ডা বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু সাসকিয়া সেসান এক সাক্ষাৎকারে বললেন, “আমরা ইতোমধ্যেই অনুভব করতে শুরু করেছি যে আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি”।

চমস্কি: তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল বেদনা, বিভীষিকা, ক্রোধ, ভীতি এবং প্রতিশোধস্পৃহার। কিন্তু জনগণের অভিমত ছিল মিশ্র এবং বিরুদ্ধ মত গড়ে উঠতেও বিশেষ সময় নেয় নি। এমনকি মূলস্রোতের ধারাভাষ্যেও এখন বিরুদ্ধ মতামতের কথা স্বীকার করা হচ্ছে। আজকের সংবাদপত্রই তার দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন: "লা জর্নাডা" পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছেন যে আমরা এক নতুন ধরনের যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছি। এর মাধ্যমে আপনি আসলে কী বুঝাতে চেয়েছেন?

চমস্কি: যে-প্রশ্নের জবাব হিসেবে এটাকে আমি নতুন ধরনের যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলাম তা হলো: বন্দুকের নল তাক করা হয়েছে এখন ভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে। ইউরোপ ও তার উত্তরসূরীদের ইতিহাসে যা একেবারেই অভিনব।

প্রশ্ন: আরবরাই কি– এখন যাদেরকে মৌলবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে– পশ্চিমের নতুন শত্রু?

চমস্কি: অবশ্যই না। প্রথমত, যার মাথায় যৌক্তিক ভাবনার সামান্য ক্ষমতা আছে সে আরবদেরকে "মৌলবাদী" হিসেবে চিহ্নিত করবে না। দ্বিতীয়ত,সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর ধর্মীয় মৌলবাদীতার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধানতম ধর্মীয় মৌলবাদী সংস্কৃতির একটি দেশ; রাষ্ট্র নিজে নয়, গণ-সংস্কৃতিটাই মৌলবাদী। ইসলামী বিশ্বে তালিবানদের পরে সবচেয়ে কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদের রাষ্ট্র হলো সৌদি আরব– যা সে-অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মক্কেল রাষ্ট্র। আমরা জানি, ১৯৮০'র দশকে ইসলামী মৌলবাদীরা ছিল মার্কিন সরকারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, কারণ তারা ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার খুনী। সেই বছরগুলোতে মার্কিন সরকারের প্রধান শত্রু ছিল ক্যাথলিক চার্চ। কারণ ল্যাটিন আমেরিকায় "অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে" ক্যাথলিক চার্চ বিশাল অপরাধ করেছিল, এবং এই অপরাধের জন্য চার্চকে মূল্যও দিতে হয়েছিল। শত্রু নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিম সব সময় একমত হয়ে কাজ করে। আর শত্রু নির্বাচনে একমত হওয়ার শর্ত হলো ক্ষমতার বশ্যতা স্বীকার ও সেবা করার প্রশ্নটি, ধর্ম নয়।

প্রশ্ন: মার্কিন জাতির এই কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে কি জয় লাভ করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে কীভাবে? আর যদি আপনার উত্তর 'না' হয় তবে নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে যে-হামলা হয়েছে ভবিষ্যতে তেমন হামলা রোধ করতে বুশ প্রশাসনের কী করা কর্তব্য?

চমস্কি: আমি এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাব না। কিন্তু আমরা যদি বুঝতে চাই তবে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে বিশ্বের বিপুল অঞ্চল জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধানতম সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এবং তার পর্যাপ্ত কারণও আছে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উদাহরণ স্বরূপ, আন্তর্জাতিক আদালত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "বেআইনীভাবে সামরিক শক্তি" (আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস) প্রয়োগের জন্য অভিযুক্ত করেছিল এবং নিরাপত্তা পরিষদে একটা রেজুলেশান নেয়া হয়েছিল যেন সকল রাষ্ট্র (মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে। অসংখ্য দৃষ্টান্তের এটি একটি মাত্র।

আর আমাদের দিকে তাক করা অন্যদের সন্ত্রাসী তৎপরতার মোকাবিলা কীভাবে করতে হবে– এমন প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, সন্ত্রাসবাদকে উস্কে না দিয়ে কমিয়ে আনার আগ্রহ যদি আমাদের থাকে তবে তার পথও আমাদের সকলেরই জানা। যখন আইআরএ লন্ডনে বোমা ফেলল তখন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোমা ফেলার দাবী ওঠে নি, যদিও আইআরএ'র অর্থনৈতিক সমর্থনের বৃহদাংশই যোগাতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বরং সন্ত্রাসের প্রশ্রয়দানের পেছনে কী কারণ ছিল তারই সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ওক্লোহামা শহরে একটি সরকারি ভবন বোমা মেরে

উড়িয়ে দেয়া হলে মধ্যপ্রাচ্যে বোমাবর্ষণের দাবী করা হতে থাকে; এবং ওক্‌লোহামাতে বোমা ফেলার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ দায়ী হলে সম্ভবত সেটাই করা হতো। কিন্তু যখন দেখা গেল যে মার্কিন মিলিশিয়ারাই ওক্‌লোহামা শহরে বোমা ফেলেছে তখন কিন্তু মন্টানা ও ইডাহো শহর ধ্বংস করার দাবী ওঠানো হলো না। বরং দোষীদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হলো। যাদের খুঁজে পাওয়া গেল, তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো এবং কারাগারে প্রেরণ করা হলো এবং এই সন্ত্রাসের পেছনে কী ধরনের ক্ষোভ কাজ করেছিল তা বুঝতে ও সমাধান করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। যেকোনো অপরাধই হোক না কেন– সে রাস্তায় ডাকাতি হোক কিংবা বড় আকারের নৃশংসতাই হোক– তার পেছনে কারণ থাকে এবং আমরা সচরাচর দেখি যে কিছু কিছু কারণ থাকে গুরুতর, যার সমাধান খুঁজে বের করা দরকার।

পরবর্তীতে এধরনের কোনো নৃশংসতার সম্ভাবনা হ্রাস করার ইচ্ছা থাকলে এমন গতিপথই অনুসরণ করতে হয়। আরেকটি কৌশল আছে: সহিংস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। এর মাধ্যমে সহিংসতা-চক্র ব্যপ্ত হওয়াটাকেই কেবল আশা করা যায় এবং যে-সহিংসতার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী উঠেছিল, তেমন সহিংসতা আরও বেড়ে যায়।

প্রশ্ন: মূলধারার প্রেসে ঘটনার কোন দিক বা দিকগুলো একেবারে কম আলোচিত হয়েছে, এবং কেন সেগুলোর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল?

চমস্কি: কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন হলো:

প্রথমত, আমাদের সামনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণের পথ খোলা আছে এবং তাদের সম্ভাব্য ফলাফল কী হবে তা বিচার করে দেখা। মার্কিন সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন ধরুন, নিকারাগুয়া আন্তর্জাতিক আদালতে এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিচার দাবী করেছিল (অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও এমন পদক্ষেপ নিতে কেউ বাধা দিতো না); আইআরএ'র ব্যাপারে ইংল্যান্ড যেমন বিচারের আশ্রয় নিয়েছিল কিংবা ওকলাহোমা বোমাবর্ষণ অন্তর্দেশীয় জানার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন পদক্ষেপ নিয়েছিল, সেরকমভাবে আইনের শাসনের আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনো আলোচনাই করা হয় নি। কিন্তু আইনের আশ্রয় নেয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই আছে। বরং প্রবল প্রতিঘাত হানার জন্য ঢাকের বাদ্য বাজানো হচ্ছে। বিবেচনায় আনা হচ্ছে না যে এতে করে একেবারে নিস্পাপ আফগান জনগোষ্ঠীকে গুরুতর মূল্য দিতে হবে, যাদের অনেকেই আবার তালিবানদের অত্যাচারেরও শিকার। তদুপরি, প্রবল প্রতিঘাত হানতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেন ও তার নেটওয়ার্কের পেতে রাখা "শয়তানী ফাঁদে" পা দিয়ে তাদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাকেই পূরণ করবে। কয়েকদিন আগে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরকম হুশিয়ারীই উচ্চারণ করেছেন এবং সকল ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষকও বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো: "কেন মিডিয়াগুলো আলোচনা করছে না?" আফগানিস্তান অঞ্চল সম্পর্কে খ্যাতিমান বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বেশ কিছু সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং লক্ষ করেছেন যে প্রায় কোনো সাক্ষাৎকারেই তাকে আইনের আশ্রয় নেয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে না। এমন প্রশ্নের মুখোমুখি না হতে চাওয়ার অর্থ হলো এ-ধরনের আরও সহিংসতার সম্ভাবনা বাড়ানোর পথকে বেছে নেয়া। মূলধারার মিডিয়াগুলোর ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। প্রশংসনীয়ভাবে *ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল* "অর্থবান মুসলমানদের"– ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী– অভিমত পর্যালোচনা করেছে, যারা মার্কিন সমর্থক কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিন নীতি নিয়ে প্রবলভাবে সমালোচনামুখর; আর তাদের সমালোচনামুখর হওয়ার কারণও ওয়াকিবহাল সকলেরই জানা। সাধারণ জনগণের মধ্যেও একই ধরনের ক্ষোভ রয়েছে, তবে তা অনেক বেশি

তীব্র ও বিক্ষুব্ধ।

বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক ভিন্নতর শ্রেণীভূক্ত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে গত বিশ বছর ধরে এই নেটওয়ার্কের তৎপরতা দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়েছে। কিন্তু তাদের নিয়ে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলোর কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে নেটওয়ার্কগুলো ভীতি, ক্ষোভ ও মরিয়া মনোভাবের এক বিশাল উৎস থেকে সমর্থন পাচ্ছে, যে-কারণে তারা মার্কিনীদের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিক্রিয়া কামনা করছে যাতে করে অন্যদেরকেও তাদের ভয়ানক পথে টেনে আনা যায়।

আমরা যদি সহিংসতা-চক্রের বিস্তার না ঘটিয়ে বরং কমিয়ে আনতে চাই তাহলে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত বিষয় প্রথম পাতায় আসা উচিত– অন্তত।

মার্ক স্টীল

‘তুমি হলে কী করতা?’

তরজমা: রেহনুমা আহমেদ এবং মানস চৌধুরী

আফগানিস্তানে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসন্ত্রাসী হামলার পরপরই লিখিত এই রচনায় কাবুলে পশ্চিমা বোমাবর্ষণ সেখানকার নাগরিকদেরকে যে অভিজ্ঞতা দিয়েছে তার বিবরণী লেখায় আছে। আর আছে আফগানিস্তানে আগ্রাসনের পেছনকার পশ্চিমা যুক্তির পাল্টা প্যারোডি। অনুবাদটার আদি শিরোনাম “আমরা ল্যাংরাচ্ছি (এবং তালিবান প্রতারণা করছে): ‘এগুলোর অবস্থা দেখ, ক্লাস্টার বোমাতে পাঁচ-শূন্য, পাঁচ-শূন্য’” এখানে বদলে দেয়া হয়েছে।

<u>অনুবাদকদের টীকা</u>: এই লেখাটি নেয়া হয়েছে যুক্তরাজ্যের *ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট* পত্রিকার ১লা নভেম্বর ২০০১ তারিখের সংখ্যা থেকে। মূল লেখাটিতে ব্যবহৃত নানা রূপক-প্রতিতুলনা ব্রিটেনের সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে এমনভাবে সংমিশ্রিত ছিল যে এই অঞ্চলে তার পাঠ করা অসম্ভব মনে হয়েছে। সে কারণে সেই অংশগুলোতে রূপক-প্রতিতুলনা ব্যবহারে আমরা স্ব-অঞ্চলের সংস্কৃতি-ইতিহাসের সঙ্গে মানানসই অনুবাদ করেছি। সাংস্কৃতিক অনুবাদ বলে লেখাপড়ার জগতে যে বিষয়টা বলা হয়ে থাকে এটা সেই ধারার। এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুবাদ প্রসঙ্গে কবি ব্রাত্য রাইসু খুবই সংশয়পূর্ণ। এক অনির্ধারিত সাক্ষাতে তিনি বলছিলেন অনুবাদে মূল লেখার সমাজ হাজির হওয়া, তার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকা খুবই জরুরী। টীকা বরং থাকতে পারে সেই স্বতন্ত্র বিষয় সম্পর্কে। আমরা তাঁর এই বক্তব্যটির গুরুত্ব উপলব্ধি করি।

তাহলে আমরা কি সকলে টনি ব্লেয়ারের “কখনো ভুলিব না” ভাষণে আস্থা বোধ করেছি? আচ্ছা, তিনি কি মনে করেছিলেন যে লোকজন সব ভুলে গেছে বলেই অস্বস্তিতে আছে? সারা দেশব্যাপী মানুষজন বলাবলি করছে, “খবরে কিজানি দেখালো? ওই যে আমেরিকার কোথায় জানি। আহা! নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার, বিমান নিয়ে কিজানি ঘটেছিলো।”

নাকি তিনি বিশেষভাবে গবেটদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন? সেক্ষেত্রে তাঁর অবশ্যই ক্যামেরার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলা উচিত ছিলো, “বুঝেছো– মি: বিন লাদেন। বিন লাদেন। ওই যে দাড়িওয়ালা লোকটা, যাকে তোমরা দু’চক্ষে দেখতে পারো না। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছি।”

যাকগে, ব্লেয়ার যখন বললেন, “কখনোই ভুলবেন না যে সেদিন আপনাদের কী অনুভূতি হয়েছিলো”, তখন নিশ্চয়ই তাঁর কিছু সমর্থকের মনে হয়েছে, “হ্যাঁ, আমার ঠিক মনে আছে,

অপরাপর দুঃসংবাদ দাফন করবার জন্য সেটি ছিল চমৎকার একটি দিন।"

যাহোক, এটি হচ্ছে "কখনো ভুলিব না" সপ্তাহ, অবশ্য দু সপ্তাহ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বলেছিল কাবুলে বোমা ফেলার "লক্ষ্যবস্তু ফুরিয়ে গেছে।" কিন্তু এই হপ্তা শেষে, তাঁরা ঘোষণা করলেন কাবুলের ক্ষেত্রে "গত দুই রাতের বোমাবর্ষণ ছিলো সবচাইতে ভারী।" তার মানে কি তারা হঠাৎ করে কিছু নতুন লক্ষ্যবস্তু পেয়ে গেছে? তারা তাদের মানচিত্র দেখে বললো, "হায়, হায়, আমরা কী গর্দভ। এখানে তো দেখা যাচ্ছে ৫০টা ট্যাংক বানাবার কারখানা আছে, আর আমরা সেগুলোকে ডাকঘর ভেবে ভুল করছিলাম, আর দেখো, একটা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী নিয়োগদানকেন্দ্র। আহ্ হা! ম্যাপের উল্টো দিকে বর্ণনাসূচিতে আছে, ভাঁজের কারণে ভালোভাবে পড়া যাচ্ছে না।"

অথবা এটা কি হতে পারে যে বিরোধী নেতা আব্দুল হককে তালিবান ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছে, এবং প্রতিশোধ হিসেবে আমাদের আরো কিছু জায়গায় বোমা ফেলতে হচ্ছে? সে কারণেই বোধহয় আমরা দেখতে পাই এতগুলো হতবিহ্বল সাধারণ নাগরিকের চেহারা। তবে এ প্রসঙ্গে টনি ব্লেয়ারের ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। "তালিবান ইচ্ছা করেই তাদের সমরাস্ত্র এমন সব জায়গায় রাখে যেখানে নিরুপায় হয়েই আমাদের বোমা ফেলতে হয়।" হারামজাদা প্রতারকের দল। তাদের যদি কোনও ভদ্রতা জ্ঞান থাকতো, তাহলে তারা তাদের সব সমরাস্ত্র একটা বিমানে ভরে সেটাকে মার্কিনী নৌযানের উপর ওড়াতে থাকতো, এবং তাদের সকল সৈনিককে একটি মেলার মাঠে নিয়ে জড়ো করতো– বাইরে লেখা থাকতো "একটি মৌলবাদী মারো, একটি পুরস্কার জিতে নাও।"

স্কাই নিউজের একজন প্রতিবেদক বলেছিলেন, বোমা হামলায় সাধারণ আফগানদের মৃত্যুর প্রতি মার্কিনী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, "নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে আমাদের হাজারো হাজারো নিরপরাধ মানুষ মারা গেছে।" তাহলে এই হচ্ছে বুদ্ধি: ওদেরও সমান সংখ্যক মারো, তাহলে সবার ভালো লাগবে। সিএনএন-এর একটা বড় চার্ট থাকা উচিত, চার্টে থাকবে যেমন 'কৌন বানেগা কড়োরপতি'তে থাকে স্কোর। তাহলে অমিতাভ বচ্চনজির মত জলদ-গম্ভীর গলায় বলতে পারবেন, "হ্যাঁলো, জি নমস্তে। কান্দাহার থেকে বলছেন? তো আরেকটা বোমাতে ছয়জন মারা গেছে? তার মানে আমরা হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কিন্তু এখনো আরো স্কোর পেতে হবে। দেন লেটস ক্যারি অন।"

যত সপ্তাহ যাচ্ছে, তত যুদ্ধ-সমর্থকেরা এ সকল মৃত্যু নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না। গতকাল *সান* পত্রিকা ফার্গাল কীন'কে "ভীতুর ডিম" হিসেবে নিন্দা জানালো কারণ তিনি "আফগানিস্তানে বোমা ফেলার খবর পড়তে পড়তে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন।" তিনি যদি সঠিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে ঝলসানো বাচ্চাদের দিকে আঙ্গুল তুলে সোল্লাসে চিৎকার করতেন, "সাবাশ, এগুলোর অবস্থা দেখো। ক্লাস্টার বোমাতে পাঁচ-শূন্যে, পাঁচ শূন্যে এগিয়ে গেছি।"

আমাদের আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে বোমা হামলার তলে লুকিয়ে আছে একটি সুসংহত কৌশল। যেমন ধরুন, জর্জ বুশ ঘোষণা দিলেন, "সন্ত্রাসবাদীদের সতর্ক করে দিচ্ছি– ভিসার মেয়াদ শেষ হবার পর তুমি যদি একদিনও বেশি থাকো তাহলে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হবে।" তার মানে তুমি যদি হও সন্ত্রাসবাদী, তাহলে তোমার ভিসার মেয়াদ শেষ হবার আগেভাগেই কিন্তু আক্রমণটা সেরে ফেলো বাপু! এমনিতে, গগণচুম্বী ভবন উড়িয়ে দেয়াকালীন অবস্থায় ধরা পড়লেই কিন্তু তুমি যথেষ্ট ঝামেলায় পড়ে যাবে।

সারাটা সময় ধরে, যুদ্ধে আগ্রহীরা একটি বাক্য আউড়ে চলেছেন– তুমি হলে কী করতা?

সে কারণে কলাম লেখকগণ জোর দেন যাতে আমরা আমাদের দৃঢ়তা না খোয়াই। তো কী সেই দৃঢ়তা? কলাম লেখা। মাঝপথে এসে যদিও লোভ হয় "ধরতে পারো কিনা আমার ধাপ্পা" দেখার। কিন্তু শেষাবধি শিরদাঁড়া সোজা করে, প্রত্যয় দৃঢ় রেখে শেষ বাক্য পর্যন্ত লিখে ফেলেন তাঁরা।

এবং নির্ঘাত দেখবা, কলামের কোথাও না কোথাও, এই শব্দগুলা পাবা, "তুমি হলে কী করতা?" এদের কথাবার্তা ওরকম লোকদের মতো শোনায়, যারা ঘরে আগুন লেগে গেলে পানি ছাড়া আসে, আর চেঁচায়, "তাহলে পেট্রোল ঢালো। অন্তত কিছু একটা তো করা হলো।" সমাজের একাংশের সমর্থন ছাড়া সন্ত্রাসবাদীরা কখনোই সন্ত্রাস করতে পারে না। কাশ্মীরে যদি কেউ একটি সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করে কেবলমাত্র একটি পাড়ার স্বাধীনতা দাবি করতো, সেটি কখনো সমর্থন পেতো না কারণ স্পষ্টতই শুধুমাত্র সেই পাড়া নয়, পুরো কাশ্মীর নিপীড়িত। সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসবাদী হয়ে জন্মায় না, তারা সন্ত্রাসবাদী হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদী জিন বলে তো কিছু নেই। যদি সেই আত্মঘাতী বৈমানিকেরা ইংল্যান্ডের কোনও গ্রামে বেড়ে উঠতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই ভাবতে ভাবতে বড় হয়ে উঠতো না: "কেন জানি না আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ফ্লাইং ক্লাবে গিয়ে ভর্তি হই, আর একটা প্লেন চালিয়ে গ্রামের গির্জার চূড়ায় ঢুকে পড়ি।"

বোমা হামলার আগে ওসামা বিন লাদেনের জনপ্রিয়তা এতটা ছিলো না। সে-কারণে যুদ্ধ-সমর্থকদের নিজেদের এই প্রশ্নটা করতে হবে: যুদ্ধের কারণে আগামীতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের সম্ভাবনা কমেছে নাকি বেড়েছে?

বোমা হামলার পেছনে যে পরিমাণ তৎপরতা দেখানো হয়েছে, তার ভগ্নাংশ দিয়ে জীবন ধ্বংসের বদলে জীবন রক্ষা করা যেতে পারতো, স্বৈরশাসককে স্থিত করার বদলে নড়বড়ে করা যেতে পারতো, এবং আল-কায়েদার মত বাতিকগ্রস্তদের সমর্থন কমিয়ে আনা যেতো। বরং যা দাঁড়ালো, দেখো হয়তো মধ্য-প্রাচ্যে এই মুহূর্তে কেউ চিৎকার করে বলছে: "তারা আমাদের ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে চুরমার করেছে, আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, স্বৈরশাসকদের সহায়তা করেছে, আর এখন নিরীহ মানুষজনদের বোমা মারছে। বিন লাদেনকে তোমরা নিন্দা করতে পারো– কিন্তু তোমরা হলে কি করতা?"

অরুন্ধতী রায়

যুদ্ধ মানে শান্তি

তরজমাঃ নাসিরুদ্দীন কবীর

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সবধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়িয়ে হিসাবে নিজের যে-পরিচয় অরুন্ধতী রায় দাঁড় করিয়েছেন তা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের যুগে ব্যক্তি হিসাবে একজন সাহিত্যিকের অঙ্গীকার ও কর্তব্যবোধের নতুন সুস্পষ্ট মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। অরুন্ধতীকে দেখে আমরা শিখলাম, আন্তরিক বিবেকবান মানুষ যিনি বিবেকের তাড়না দ্বারা পরিচালিত হন, তিনি সাহিত্যিক না রাজনীতিবিদ সেই প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর। আরও বোঝা গেল, মানবতার প্রতি নিজের কর্তব্যকে পাশ কাটিয়ে আরাম-আয়েশে সুখেভোগে যারা দিন কাটাতে চান, তাঁরাই 'সাহিত্য' ইত্যাদির নিরাপদ সংকীর্ণ সীমানা এঁকে 'সাহিত্য বনাম সমাজ'-এর ভূয়া বিতর্ককে জারি রাখেন।

গত ১৮ই অক্টোবর ২০০১ তারিখে ভারতের *আউটলুক* পত্রিকায় এই লেখাটা ছাপা হয়েছিল। *প্রথম আলো*-র ৯ই নভেম্বর ২০০১ তারিখের 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে এর অনুবাদ বের হয়। **মানুষ**-এ *প্রথম আলো*-র অনুবাদটা ছাপা হলো।

২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর রোববার যখন আফগানিস্তানে রাতের আঁধার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল তখনই সন্ত্রাসবিরোধী আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের (জাতিসংঘের নয়া বশংবদ প্রতিনিধি) মদদে আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র। টিভি চ্যানেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখানো হলো ক্রুজ মিসাইল, স্টিলথ বোমারু বিমান, টমাহক, বাংকারভেদী মিসাইল, মার্ক ৮২ প্রভৃতি মারণাস্ত্রের কম্পিউটার এনিমেটেড চিত্র। সারা বিশ্বে ছোট ছোট শিশুরা চোখ ছানাবড়া করে এসব ছবি দেখেছে। তাদের নতুন ভিডিও গেম কিনে দেওয়ার বায়না ধরা বন্ধ ছিল।

জাতিসংঘ, যা কিনা আজ শুধু এক অকার্যকর আদ্যক্ষরে পরিণত হয়েছে (UN), এমনকি এটির অনুমোদন নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। (মেডেলিন অলব্রাইট একদা যথার্থই বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যখন পারে তখন বহুপাক্ষিকভাবে কাজ করে, আর যখন আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে, তখন একপাক্ষিকভাবে কাজ করে') সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে 'তথ্যপ্রমাণ' শুধু কোয়ালিশনের মিত্রদেরই দেখানো হলো। তারপর তারা নিজেরা নিজেরা শলাপরামর্শ করে ঘোষণা করল, এসব 'তথ্যপ্রমাণ' আইনের আদালতে টিকবে কি টিকবে না, তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা আইনের বিচারকে মুহূর্তে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হলো।

সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের যথার্থতা কোনোভাবেই প্রতিপন্ন করা

যাবে না তা সেটা ধর্মীয় মৌলবাদীরাই ঘটাক, ব্যক্তিগত মিলিশিয়াই ঘটাক আর গণআন্দোলনের মুখেই ঘটানো হোক– কিংবা এ কর্ম স্বীকৃত সরকারের যুদ্ধের চেহারা নিয়ে উপস্থিত হোক না কেন। আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ঘটনার প্রতিশোধ নয়। এটা বিশ্বের মানুষের বিরুদ্ধে আরেক দফা সন্ত্রাসবাদী কর্ম। আফগানিস্তানে যারা মারা যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকটি লাশকে নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের ঘটনায় নিহতদের সংখ্যার সঙ্গে যোগ করে গুনতে হবে।

জনগণ কখনো যুদ্ধে জেতে না। সরকারও হারে না যুদ্ধে। শুধু যা ঘটে তা হলো নিরীহ মানুষের মৃত্যু। সরকার ভেঙে-চুরে নতুন রূপ নেয়, হাইড্রার অনন্ত মাথার মতো। তারা প্রথমে পতাকা নিয়ে জনগণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মুক্তচিন্তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। তারপর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণকারীদের লাশ ঢেকে দেয় মহাআড়ম্বরে কাফন পরানোর মাধ্যমে। আফগানিস্তান এবং আমেরিকা দুদিকেই তাদের নিজ নিজ সরকারের কর্মকাণ্ডের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে বেসামরিক লোকজন। উভয় দেশের মানুষ নিজেদের অজান্তেই এক অভিন্ন নিয়তিতে বাঁধা পড়ে গেছে– তাদেরকে অন্ধ, অনিশ্চিত সন্ত্রাসের মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আফগানিস্তানে পতিত প্রত্যেকটি বোমার বিপরীতে আমেরিকায় অ্যানথ্রাক্স জীবাণু, আরো ছিনতাই ও অন্য কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলার আতঙ্ক দ্বিগুণ হচ্ছে।

বিশ্বে আজ সন্ত্রাসবাদ আর পাশবিকতার যে পঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো সোজা রাস্তা নেই। এখন মানবজাতির ঘুরে দাঁড়ানোর যৌথ প্রজ্ঞার কূপ খননের সময় এসেছে। ১১ই সেপ্টেম্বর যা ঘটেছে, তা গোটা বিশ্বকে চিরকালের জন্য পাল্টে দিয়েছে। স্বাধীনতা, প্রগতি, সম্পদ, প্রযুক্তি, যুদ্ধ– এই শব্দগুলোর অর্থ আর আগের মত নেই। প্রত্যেক দেশের সরকারকে এ পরিবর্তন স্বীকার করে নিতে হবে। নিজেদের কর্তব্যকর্মে ন্যূনতম সততা এবং নম্রভাব বজায় রাখতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এ জাতীয় কোনো আত্মজিজ্ঞাসার স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি তালেবানের পক্ষ থেকেও।

আফগানিস্তানে হামলার ঘোষণা দেওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছেন, ‘আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি।’ আমেরিকার সবচেয়ে পছন্দের দূত টনি ব্লেয়ার (যার পদবি হচ্ছে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী) বুশের কথাটার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, ‘আমরা শান্তিপ্রিয় জনগণ।’

ও, তাহলে এই কথা! হাতি মানে তাহলে ঘোড়া! পুরষ মানে নারী! যুদ্ধ মানে শান্তি!

এর কয়েকদিন পর এফবিআইয়ের সদর দপ্তরে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, ‘এটাই আমাদের আহ্বান। এটাই হলো আমেরিকার, বিশ্বের সবচেয়ে মুক্ত দেশের আহ্বান। এ দেশ এমন সব মৌলিক মূল্যবোধের ওপর সৃষ্ট, যেসব মূল্যবোধ ঘৃণা, সহিংসতা, হত্যা আর মন্দকে প্রত্যাখান করে।’

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা যে-দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং যে-দেশগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ করেছে, এই নিন সেগুলোর তালিকা: চীন (১৯৪৫-৪৬, ১৯৫০-৫৩), কোরিয়া (১৯৫০-৫৩), গুয়াতেমালা (১৯৫৪, ১৯৬৭-৬৯), ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৮), কিউবা (১৯৫৯-৬০), বেলজিয়ান কঙ্গো (১৯৬৪), পেরু (১৯৬৫), লাওস (১৯৬৪-৭৩), ভিয়েতনাম (১৯৬১-৭৩), কম্বোডিয়া (১৯৬৯-৭০), গ্রানাডা (১৯৮৩), লিবিয়া (১৯৮৬), এল সালভাদর (১৯৮০-এর দশক), নিকারাগুয়া (১৯৮০-এর দশক), পানামা (১৯৮৯), ইরাক (১৯৯১-৯৯), বসনিয়া (১৯৯৫), সুদান (১৯৯৮), যুগোস্লোভিয়া (১৯৯৯) আর এখন আফগানিস্তান।

বোঝাই যাচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে মুক্ত এই দেশটি যুদ্ধ করতে মোটেও ক্লান্ত হয় না। কোন মুক্তি, কোন স্বাধীনতা তারা রক্ষা করে? নিজেদের দেশের সীমানার ভেতর তারা রক্ষা করে মত প্রকাশের, ধর্মের, চিন্তার স্বাধীনতা, শৈল্পিক বিবৃতি, খাদ্যাভ্যাস, যৌন পছন্দ (কিছু পরিমাণে) ইত্যাদির স্বাধীনতা এবং এরকম আরো বহু অনুকরণীয়, চমৎকার সব স্বাধীনতা। আর নিজেদের দেশের সীমানার বাইরে তারা রক্ষা করে পদানত করার, অপমান করার এবং অধীনস্থ করার স্বাধীনতা আর এ-কাজ তারা করে আমেরিকার প্রকৃত ধর্ম 'মুক্তবাজারের' সেবা করার স্বার্থে। কাজেই আমেরিকার সরকার যখন একটা যুদ্ধকে 'অপারেশন ইনফাইনিট জাস্টিস' কিংবা 'অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম' নাম রাখে, তখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের মানুষজন আতঙ্কে শিহরিত হই। কেননা আমরা জানি, কারো কারো ক্ষেত্রে 'ইনফাইনিট জাস্টিস' মানে অন্যদের ওপর 'ইনফাইনিট ইনজাস্টিস', কারো কারো 'এনডিওরিং ফ্রিডম' মানে অন্যদের 'এনডিওরিং সাবজুগেশন' (দীর্ঘস্থায়ী অধীনতা)।

সন্ত্রাসবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কোয়ালিয়শন আসলে বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশগুলোর একটা চিত্র। বিশ্বের প্রায় সমস্ত অস্ত্র এরাই তৈরী করে। দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাণঘাতী, সবচেয়ে ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্র– রাসায়নিক, জীবাণু ও পরমাণু অস্ত্র এদের হাতে রয়েছে। ইতিহাসের বেশিরভাগ যুদ্ধ এরাই করেছে, সবচেয়ে বেশি গণহত্যার রক্তে এদেরই হাত রাঙা। আধুনিক ইতিহাসে অপরকে পদানত করে রাখা, জাতিগত শুদ্ধি অভিযান, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম এদের হাত দিয়েই হয়েছে। অসংখ্য স্বৈরাচার আর নিপীড়নকে এরা মদদ দিয়েছে, অর্থ, অস্ত্র যুগিয়েছে। এরা সহিংসতা আর যুদ্ধের সংস্কৃতির পূজা করেছে। তালেবানরা যতই অপকর্ম করে থাক না কেন, এদের দলে ঢোকার মতো অপকর্মে সিদ্ধ তারা কখনোই হতে পারবে না।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রতিফল হিসেবে সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপ, হেরোইন আর ভূমি মাইনের বিশৃঙ্খলার শ্মশান থেকে উত্থান ঘটেছে তালেবানদের। এই আন্দোলনের সবেচেয়ে প্রবীণ নেতাদের বয়স এখনো ৪০-এর কোঠায়। এদের অধিকাংশই বিকলাঙ্গ। কারো চোখ উড়ে গেছে, কারো হাত নেই, কারো নেই পা। তারা এমন এক সমাজে বেড়ে উঠেছে, যে-সমাজ যুদ্ধের আতঙ্কে ডুবে আছে, যে-সমাজ যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় বিরান হয়ে গেছে। সেভিয়েত ইউনিয়ন আর আমেরিকার হাতে হাত বদল হতে হতে গত ২০ বছরে আফগানিস্তানের ভেতরে ঢুকেছে সাড়ে ৪ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র। মধ্যযুগীয় এক সমাজে আধুনিকতার সামান্য টুকরো বলতে এই অস্ত্রই প্রবেশ করেছে। পিতৃ-মাতৃহীন এতিম অবস্থায় যে-শিশু তখন বেড়ে উঠেছে, তারা খেলনা হিসেবে পেয়েছে সত্যিকারের বন্দুক। পারিবারিক জীবনের সন্দিগ্ধ নিরাপত্তা আর নির্ভরতা কী জিনিস তারা জানতে পারেনি, নারীর সঙ্গ জোটেনি তাদের কপালে। এখন বড় হয়ে তারা যখন দেশের শাসক হয়ে উঠেছে, এখন তারা মেয়েদের বেধড়ক মারে, পাথর নিক্ষেপ করে, ধর্ষণ করে, তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। তারা জানে না মেয়েদের দিয়ে আর কী করা সম্ভব। যুগের পর যুগ বিস্তৃত যুদ্ধ তাদের নম্রতা, ভদ্রতা কেড়ে নিয়েছে। চারপাশে বৃষ্টির মতো নেমে আসা বোমার উন্মাতাল তালে নাচাই তাদের জীবনের একমাত্র ছন্দ। এবার তারা তাদের দানব স্বভাব তাদের নিজেদের লোকজনের ওপর ফলাতে শুরু করেছে।

প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি, এ বিশ্বের মানুষের তালেবান আর মার্কিন সরকারের মধ্যে যেকোনো একটাকে বেছে নেয়ার দরকার নেই।। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার যতগুলো সুন্দর উপাদান আছে– শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য– এগুলো এই দুই মৌলবাদী ও মতাদর্শবাদী মেরুর বাইরে অবস্থিত। এই সম্ভাবনাও যেমন নেই যে, পৃথিবীর সব মানুষ একদিন

মধ্যবিত্ত ভোক্তায় পরিণত হবে, তেমনি এমন সম্ভাবনাও খুবই ক্ষীণ যে, পৃথিবীর সব মানুষ একটা একক ধর্ম গ্রহণ করবে। প্রশ্নটা ভালো বনাম মন্দ কিংবা ইসলাম বনাম খ্রিস্টান ধর্মের নয়। প্রশ্নটা জায়গা করে দেওয়ার। কীভাবে বৈচিত্র্যকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া যাবে, কীভাবে আধিপত্যবাদের মনোভাবকে প্রশমন করা যাবে– প্রশ্ন সেটাই। যেকোনো ইকোলজিস্ট আপনাকে জানাতে পারবে যে, একচ্ছত্র সংস্কৃতি কীরকম ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার। আধিপত্যময় পৃথিবী অনেকটা বিরোধী দলহীন সরকারের মতো। এক ধরনের একনায়কতন্ত্রই এটা। যেন একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে পৃথিবীকে মুড়ে দিয়ে এর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শেষে ব্যাগ ছিঁড়ে গিয়ে নিঃশ্বাসের বায়ু ঢুকবে।

এবারের এই নতুন যুদ্ধ শুরুর আগে গত ২০ বছরের সংঘাতে আফগানিস্তানে ১৫ লাখ মারা গেছে। আফগানিস্তান ধুলোয় মিশে গিয়েছিল। আর এবার সেই ধুলোকে আছড়ে আরো মিহি দানা তৈরি করা হচ্ছে। বিমান হামলার দ্বিতীয় দিনে মার্কিন পাইলটরা বোমাবর্ষণ না করে বিমান ভর্তি বোমা নিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। এক পাইলট এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, 'আফগানিস্তানে খুব বেশি টার্গেট নেই।' পেন্টাগনে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আফগানিস্তানে বোমা ফেলার মত লক্ষ্যবস্তুই কি ফুরিয়ে গেছে নাকি। জবাবে রামসফেল্ড বলেছিলেন, 'প্রথমত আমরা লক্ষ্যবস্তুগুলোয় দ্বিতীয় দফা আঘাত করছি। দ্বিতীয়ত আমাদের সামনে আঘাত করার মত লক্ষ্যবস্তু ফুরিয়ে আসছে না। আফগানিস্তান হলো ....।' তার কথা শেষ হয়নি। হাসাহাসিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল রামসফেল্ডের জবাব।

হামলার তৃতীয় দিনে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ গর্বোদ্যত গলায় ঘোষণা করেছিল, তারা 'আফগানিস্তানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।'

বোমাবর্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকেই বেসামরিক লোকজন নিহত হওয়ার, শহর উজাড় করে সীমান্তের পানে মানুষের কাফেলার খবর প্রকাশ হতে থাকল। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তানে কাজ করার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে তারা ঘোষণা করলেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ লাখ লাখ (জাতিসংঘের হিসেবে ৭৫ লাখ) আফগান শরণার্থীর কাছে খাদ্যবহর পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে শীত মৌসুমে কনকনে ঠাণ্ডার ভেতরে তারা স্রেফ না খেয়ে মারা পড়বে। তারা বলে দিয়েছে, শীত নামার আগের এ কয়েকটা দিন হয় যুদ্ধ চলবে নতুবা খাদ্য সরবরাহ করতে দিতে হবে। দুটো একসঙ্গে চালানো সম্ভব নয়।

মানবিক সহায়তার ইঙ্গিতস্বরূপ মার্কিন সরকার আফগানিস্তানে বিমান থেকে ৩৭ হাজার জরুরি খাবারের প্যাকেট নিক্ষেপ করেছে। লাখ লাখ লোক ক্ষুধার্ত পড়ে আছে। সেখানে এই খাদ্য বড়জোর ৫ লাখ লোকের এক বেলার উদরপূর্তি ঘটাতে পারবে। ত্রাণকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের এই খাদ্য নিক্ষেপের কাণ্ডটিকে পরিহাসময় ও বিপজ্জনক কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা বলেছে এ উদ্যোগ শুধু যে ব্যর্থ হবে তা-ই নয়, তার চেয়েও খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। যাদের প্রকৃতই প্রয়োজন, তাদের কাছে এ-খাদ্য পৌঁছাবে না। তা ছাড়া এসব খাবার কুড়াতে গিয়ে লোকজন মারা পড়বে ভূমি মাইনে।

খাদ্যের প্যাকেটগুলো এক দর্শনীয় জিনিস। পত্র-পত্রিকায় যে তালিকা ছাপা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এগুলোর মধ্যে আছেঃ ভাত, বাদামের ঘি, শিমের সালাদ, স্ট্রবেরির আচার, ক্র্যাকার, কিশমিশ, খাস্তা রুটি, আপেলের টুকরো, দেশলাই, প্লাস্টিকের চামচ এবং সচিত্র নির্দেশাবলী। হলুদ প্যাকেটগুলোর গায়ে আমেরিকার পতাকার ছবি। বলা হয়েছে, মুসলিম রীতি

অনুযায়ী আফগানরা নিরামিষাশী।

তিন বছরের একটানা খরার পর আফগানদের মাথার ওপর বিমানে পরিবেশিত এই বিদঘুটে খাবার! অদ্ভুত সাংস্কৃতিক দূরত্ব। মাসের পর মাস অভুক্ত থাকার অর্থ কী, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার কানাকড়িও বুঝবে না। তারা বরং এই দুর্দশাকে আমেরিকার ভাবমূর্তি বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করতে চায়।

এবার দৃশ্যটা এক মুহূর্তের জন্য উল্টে দিন তো। কল্পনা করুন, তালেবান সরকার নিউ ইয়র্ক শহরে বোমা ফেলছে আর বলছে তাদের আসল টার্গেট নিউ ইয়র্কবাসী নয়, টার্গেট মার্কিন সরকার এবং তার নীতি। এবং মনে করুন, বোমা ফেলার ফাঁকে ফাঁকে তালেবানরা আফগান পতাকায় মুড়ে কাবাব আর নান রুটির হাজার হাজার প্যাকেট আকাশ থেকে ফেলছে। নিউ ইয়র্কের বিবেকবান মানুষরা কি এই পাপের জন্য আফগানদের ক্ষমা করতে পারবে? ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লেও, কিংবা বাধ্য হয়ে সেই খাবারের প্যাকেট তুলে নিলেও তারা কি এই অপমান হজম করতে পারবে? নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র রুডি জুলিয়ানি এক সৌদি যুবরাজের পাঠানো ১ কোটি ডলার মূল্যের একটি উপহার গ্রহণ না করে সেটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা, ওই উপহারের সঙ্গে যুবরাজ মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতি বিষয়ে দু-এক ছত্র পরামর্শও পাঠিয়েছিলেন। তো অহংকার নামক বিলাসটিতে কি শুধু ধনীদেরই একচ্ছত্র অধিকার?

এ ধরনের ক্রোধই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। ঘৃণা আর প্রতিশোধ স্পৃহার বোতলের ছিপি একবার খুললে এই দৈত্য আর বোতলে ফেরানো যায় না। প্রতিটি 'সন্ত্রাসবাদী' অথবা তার 'সহযোগী'র মৃত্যুর পাশাপাশি শত শত নিরীহ লোক মরছে আফগানিস্তানে। আর প্রতি ১০০টি নিরীহ লোকের মৃত্যুর কারণে জন্ম নিতে পারে আরো বহু সন্ত্রাসবাদী।

এভাবে চলতে থাকলে এর শেষ কোথায়?

বাগাড়ম্বরতা পরিহার করে একবার ভালো করে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব, 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটার এখন পর্যন্ত একটা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা বিশ্ববাসী দাঁড় করাতে পারে নি। এক দেশের দৃষ্টিতে যা সন্ত্রাসবাদ, অন্য দেশের কাছে তা-ই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। এর মূলে রয়েছে সহিংসতার ব্যাপারে সারা বিশ্বের দ্বিমুখী নীতি। সহিংসতাকে বৈধ রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে একবারের জন্যে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হলো সন্ত্রাসবাদীদের (বিদ্রোহী অথবা মুক্তিযোদ্ধা) নৈতিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করে নেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিজেই বিশ্বজুড়ে বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অর্থ ও অস্ত্রের যোগান দিয়েছে, আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। মুজাহিদিনদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে সিআইএ ও আইএসআই। '৮০-র দশকে এই মুজাহিদিনদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করতো সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলাধীন আফগান সরকার। অথচ প্রেসিডেন্ট রিগান এই মুজাহিদিনদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষদের আদর্শের সঙ্গে তাদের আদর্শের মিল খুঁজে পেয়েছেন। সীমান্ত ডিঙিয়ে কাশ্মিরে প্রবেশকারী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদ দিচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তান তাদের 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে আখ্যায়িত করে। ভারত তাদের বলে 'সন্ত্রাসবাদী'। যারা সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়-মদদ দেয়, তাদের ঘৃণা করে ভারত? অথচ এই ভারতই অতীতে শ্রীলঙ্কার তামিল বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে (কার্যসিদ্ধি হয়ে যাওয়ার পর সিআইএ যে-রকম মুজাহিদিনদের পরিত্যাগ করেছে, ঠিক তেমনি ভারতও বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে তামিলদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর ক্ষুব্ধ এলটিটিইর আত্মঘাতী বোমা হামলার কারণে ১৯৯১ সালে জীবন দিতে হয়েছে রাজীব গান্ধীকে)।

সরকার ও রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে এ কথাটা অনুধাবন করা খুব জরুরি যে, একটা জনগোষ্ঠীর সুবিশাল ক্রোধের অনুভূতিকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করলে স্বল্প মেয়াদের হয়তো সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ নাগাদ এর বিপর্যয়কর প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার উপায় থাকে না। রাজনৈতিক সুবিধাবাদের খাতিরে ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দেওয়া এবং তা ব্যবহার করার মাধ্যমে সরকার অথবা রাজনীতিবিদরা জনগণের ওপর এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশ চাপিয়ে দেন। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক গোড়ামিতে ছেয়ে যাওয়া দেশের নাগরিকরা জানে, যে-কোনো ধর্মগ্রন্থ– তা সেটা *বাইবেলই* হোক আর *ভগবদগীতাই* হোক– এগুলোকে পারমাণবিক যুদ্ধ, গণহত্যা থেকে শুরু করে বিশ্বায়ন পর্যন্ত যেকোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যবহার করা যায়।

এর মানে এই নয় যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী কর্মটি যারা করেছে, তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে নিষেধ করছি। তাদের ধরতেই হবে। কিন্তু যুদ্ধই কি তাদের ধরার সবচেয়ে ভালো উপায়? খড়ের গাদা জ্বালিয়ে দিলে কি সূচ খুঁজে পাওয়া সম্ভব? এর ফলে কি ক্রোধের আগুন আরো বেশি করে জ্বলে বিশ্বটাকে একটা নরকে পরিণত করবে না?

পৃথিবীর যে স্থানেই আপনি থাকুন না কেন, মাটিতে কান পাতুন, শুনতে পাবেন ক্রমশ ফুঁসে ওঠা ক্রোধের যুদ্ধঢাক। দয়া করে এই মুহূর্তে যুদ্ধ থামান! যথেষ্ট লোকহানি ঘটেছে। চৌকষ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যে যথেষ্ট চৌকষ নয়, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। অবদমিত ঘৃণার বারুদস্তূপে কাঠি ঠুকবেন না।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সম্প্রতি গর্বভরে বলেছিলেন, 'যখন আমি দায়িত্ব নিয়েছি তখন আমি ১০ ডলারের ফাঁকা তাবুতে ২০ লাখ ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র মেরে ওপর ভেতরে একটি উটকে মিশিয়ে দিতে যাচ্ছি না। আমি অব্যর্থ সিদ্ধান্তই নেব।' প্রেসিডেন্ট বুশের এ-কথা জানা থাকা উচিত যে, তার ক্ষেপণাস্ত্রের টাকা উসুল করে দিতে পারে এমন কোনো টার্গেটই আফগানিস্তানে নেই। তবে নিজের জবানের ইজ্জত রাখতে তিনি তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর এসব শস্তা টার্গেট এসব শস্তা মানুষের জন্য আরো শস্তায় ক্ষেপণাস্ত্র বানালে হয়তো ভালো করবেন। কিন্তু তাহলে তো আবার কোয়ালিশনের অস্ত্র উৎপাদকদের ব্যবসায় পড়তা পড়বে না। কার্লাইল গ্রুপকে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি ইকুয়িটি ফার্ম' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের হাতে রয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের পুঁজি। কার্লাইল প্রতিরক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে। তাদের এই বিশাল পুঁজি গড়ে উঠেছে সামরিক সংঘাত আর যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে।

কার্লাইল চালায় রথিমহারথিরা। সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্রাঙ্ক কারলুচ্চি হলেন এটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (তিনি রামসফেল্ডের রুমমেট ছিলেন)। কার্লাইলের অন্যান্য পার্টনাররা হলেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস এ বেকার দ্য থার্ড, জর্জ সরোস, ফ্রেড মালেক (সিনিয়র জর্জ বুশের প্রচারাভিযান ম্যানেজার)। মার্কিন পত্রিকা *বাল্টিমোর ক্রনিকল অ্যান্ড সেন্টিনেল* জানাচ্ছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ কার্লাইল গ্রুপের এশিয়ান বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য ধরনা দিচ্ছেন। সম্ভাব্য ক্রেতা-সরকারকে রাজি করাতে তদবির করার জন্য বুশ ওই কোম্পানির কাছ থেকে টু-পাইস পেয়েছেন বলে খবর দেওয়া হয়েছে।

ও, তাহলে রসুনের কোয়া-সংক্রান্ত সেই প্রবাদটিই ঠিক!

এইসব রসুনের কোয়ার আরেক ধরণের ব্যবসাও আছে– তেলের ব্যবসা। আপনাদের ভুলে যাওয়ার কথা নয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র) ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি উভয়েই মার্কিন তেল শিল্পের ব্যবসা করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে প্রতিবেশী দেশ তুর্কমেনিস্তানে রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্যাস রিজার্ভ। সেই সঙ্গে সেদেশের মাটির নিচে রয়েছে ৬০০ কোটি ব্যারেল

তেল। এই রিজার্ভ যুক্তরাষ্ট্রের আগামী ৩০ বছরের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট (উন্নয়নশীল কোনো দেশের চাহিদা মিটবে কয়েক শতাব্দীর)। আমেরিকা তেলকে সব সময় নিরাপত্তার বিষয় হিসেবে দেখে এসেছে। যেকোনো মূল্যে হোক তারা এ তেল রিজার্ভকে রক্ষা করতে চেয়েছে। আমাদের কারোই বুঝতে বাকি নেই যে, উপসাগরে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতির সঙ্গে ওই এলাকার মানবাধিকার রক্ষার তাগিদের কোনো সম্পর্ক নেই। এর পেছনে পুরোদস্তুর কাজ করছে তেলের কৌশলগত স্বার্থ।

কাস্পিয়ান এলাকার তেল ও গ্যাস বর্তমানে উত্তরদিকে ইউরোপের বাজারে যাচ্ছে। ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিকভাবে ইরান এবং রাশিয়া মার্কিন স্বার্থের প্রধান বাধা। ডিক চেনি– তেল শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানী 'হলিবার্টন'-এর সিইও– ১৯৯৮ সালে বলেছিলেন, 'কাস্পিয়ান এলাকার মতো আর কোনো এলাকা কৌশলগতভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ রাতারাতি হয়ে উঠতে পারবে– এ কথা আমি কল্পনাই করতে পারছি না। মনে হচ্ছে সুযোগ মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে।' হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলেছেন চেনি।

আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাকিস্তান হয়ে আরব সাগর পর্যন্ত একটি দীর্ঘ তেলের পাইপ লাইন তৈরি করার জন্য কয়েক বছর ধরে তালেবানদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল আরেক বিশাল মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোকল। এই পাইপ লাইনের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোভনীয় 'এমার্জিং মার্কেটে' প্রবেশের আশা লালন করছিল ইউনোকল। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তালেবান মোল্লাদের একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল। তারা এমনকি হাউসটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও ইউনোকলের নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। তখন কিন্তু তালেবানদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কিংবা মেয়েদের প্রতি তাদের অমানবিক আচরণকে মানবাধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে কারো মনেই হয়নি। এই সাক্ষাতের পর টানা ছয় মাস ক্লিনটন সরকারকে শত শত নারীবাদী সংগঠনের গালিগালাজ, ক্ষোভ মাথা পেতে নিতে হয়েছে। তখন কোনোমতে চুক্তিটাকে পাশ কাটানো গেছে। এবার এসেছে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর মধুমাস।

আমেরিকায় অস্ত্রব্যবসা, তেলের ব্যবসা আর প্রধান মিডিয়া নেটওয়ার্কগুলো রসুনের কোয়ার মতো একই ব্যবসায়ী অক্ষে আবর্তিত হয়। এ-কারণে এই যুদ্ধকালে মার্কিন মিডিয়ায় অস্ত্র, তেল আর প্রতিরক্ষার উল্লেখ আশা করাই এক মহা বোকামি। সে যাই হোক না কেন, যে বিধ্বস্ত, বিহ্বল মানুষগুলোর আত্মাভিমান কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যার প্রিয়তমাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, যার ক্রোধ এখনো টগবগ করে ফুটছে, তাকে 'সভ্যতাসমূহের সংঘাত' এবং 'ভালো বনাম মন্দের যুদ্ধ' ইত্যাদি অর্থহীন তত্ত্ব খাইয়ে দেওয়া খুবই সহজ। ভিটামিন আর অবসাদনাশকের মতো তাদের নিয়মিত সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে এসব তত্ত্ব শুনিয়ে। নিয়মিত চিকিৎসা করিয়ে নিশ্চিত করা হচ্ছে, তাদের যুক্তরাষ্ট্র যেন আগের মতোই এক গোলকধাঁধার মতো দেখায়।

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

সলিমুল্লাহ খান

ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ

এই লেখাটা *সাপ্তাহিক ২০০০* এর ২০০১ সালের ঈদসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, লেখকের নাম ছিল ড. সলিমুল্লাহ খান। বাংলাদেশে যে অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বর্তমান দুনিয়াদারিতে ইঙ্গমার্কিন বড়লোক প্রভুর সাম্রাজ্য বিস্তারাকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার জোগান দিয়ে চলেছেন সলিমুল্লাহ খান তাঁদের একেবারে সামনের কাতারে সদাহাজির। বিশ্ববাণিজ্যবিধ্বংসী বিশ্বপরিস্থিতির সাথে যতটা আন্তরিকতা ও সততা বিস্তার করে যেভাবে বোঝাপড়া করলেন তা শেখার মতো। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিশ্লেষণী লেখা তিনি পেশ করেছেন পাঠকের প্রকাশ্য দরবারে। তাঁর লেখা থেকে আমরা চলমান বিশ্বজোড়া যুদ্ধকে বুঝতে শিখেছি। এই যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে আমরা *সম্ভবত* তার সব কটাই (সোজা বাংলায় ৪টা) **মানুষ** এর এই সংখ্যায় ছেপেছি।

'...... that right, as the world goes, is only in question between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what they must.– থুকিদিদিস

১.

আফগান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর কোনো কোনো ইঙ্গ-মার্কিন মহাত্মা দাবি করেছেন– 'ইট ইজ নট জাস্ট এ ওয়ার, ইট ইজ এ জাস্ট ওয়ার।' আমাদের বাংলায়ও কথাটা কম ঝংকার তোলে না– 'এ যুদ্ধ শুধু যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ শুদ্ধ যুদ্ধ।' যদি বলতে পারতাম, যুদ্ধ মানেই অন্যায় বা অশুদ্ধ তো কথাই থাকতো না। কেউ যদি আমার গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাধায় তখন তো আমাকে গা বাঁচানোর দায়ে হলেও যুদ্ধ করতে হয়। আত্মরক্ষার যুদ্ধ – অতএব – শুদ্ধ বা ন্যায় যুদ্ধ। যুদ্ধকে এই দুই ভাগে ভাগ করার রীতিটি কখন চালু হয়েছে আমরা তার পুরো খবর রাখি না। এ বিষয়ের শাখাজ্ঞানীরা বলেন, খ্রিস্টান জাতির মধ্যে অগস্তিন হিপোবি বা সাধু অগস্তিনই এই দুই কথা প্রথম অক্ষরে লিখেছিলেন। অগস্তিন খ্রিস্ট-পরবর্তী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের লোক। ইউরোপে বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' বিশেষণ দুটির জায়গায় 'আক্রমণ' ও 'আত্মরক্ষা' কথা দুটি চালু হয়েছিল। কিন্তু ন্যায় যুদ্ধ মানেই আত্মরক্ষামূলক এমন কোনো যুক্তি নাই। আক্রান্ত হবার ভয়ে কোনো দেশ আগেভাগেই আক্রমণ করে বসতে পারে। তাতে সেই যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ হয় না। এক কথায় আক্রমণ ও অন্যায় এবং আত্মরক্ষা ও ন্যায় সমার্থক

শব্দজোট নয়। (টেইলর ১৯৮২)

আমেরিকা ও বিলাতের জোট এই সুযোগটা পুরোদমে গ্রহণ করেছে। আফগান দেশের ওপর আক্রমণটা তারাই করেছেন। অথচ তারা একই সাথে দাবি করেছেন তাদের আক্রমণে ন্যায় আছে। তো 'ন্যায়' শব্দটার অর্থ কি? এই প্রবন্ধে আমরা এ-বিষয়ে কিছু খবর সংগ্রহের চেষ্টা করব। কোনো দুর্বল দেশের ওপর সবল দেশের আক্রমণকেও একটা না একটা যুক্তি বা ন্যায়ের ওপর দাঁড় করাতে হয়। মানুষের এই প্রয়োজন কেন? সে-কথারও একটা খোঁজ নেয়া সম্ভব কিনা আমরা দেখব। দেখা যাক আমেরিকা কোন যুক্তিতে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। এই মুহূর্তে যুদ্ধ চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মার্কিন মহাত্মাগণ যেসব যুক্তি প্রকাশ করেছেন সেগুলো বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু যে যুক্তি তারা শক্তিতেই প্রকাশ করছেন তারও একটা বিবেচনা প্রয়োজন। যবন জাতির অন্যতর প্রসিদ্ধ ইতিহাস পণ্ডিত থুকিদিদিসের ইতিহাস থেকে একটা উদাহরণ সংকলন করে আমরা দেখাতে চাই আমেরিকার আসল যুক্তিটা কি। আমাদের প্রস্তাব, দুর্বল দেশ মেলোসের বিরুদ্ধে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সের সেনাপতিরা যে-যুক্তি দিয়েছিলেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আজ আমেরিকার যুক্তিও তাই। এথেন্সের সেনাপতিদের যুক্তি নথিভুক্ত করেছেন যবন গৌরব মহাত্মা থুকিদিদিস। তাঁরা বলেছিলেন, 'যখন দুই খণ্ড দেশ শক্তিতে সমান নয়, তখন অধিকার কথাটি অবান্তর। দুনিয়ার রীতিই এই। শক্তিমান যতটা পারে ততটা মারে আর দুর্বল যতটা না খেলেই নয় ততটা মার খায়।' (থুকিদিদিস ১৯৯৪: ৫ম খণ্ড, রুকু ৮৯)

১.

খ্রিস্টান জাতির এক জ্যেষ্ঠ ধর্মগুরু সাধু অগস্তিনের নাম আমরা এমনিতেই নিয়েছি। তাঁর জগদ্বিখ্যাত পুঁথির নাম 'আল্লাহর বাদশাহি'। এই পুঁথির এক জায়গায় খুব মজার একটি বয়ান আছে। যবন বাদশাহ সেকান্দর একবার এক জলদস্যু পাকড়াও করেছিলেন। অগস্তিনের বয়ান অনুসারে বাদশাহ ডাকাতটিকে জেরা করলেন, 'কোন ধর্মজ্ঞানে তুমি দরিয়ার শান্তি নষ্ট করছ, বলো দিকি?' ডাকাত নির্ভয়ে বললেন, 'আপনার ধর্মজ্ঞানে। আপনি যে-জ্ঞানে সারা জাহানের শান্তি নষ্ট করেন সেই জ্ঞানে। আমার নৌকা ছোট্ট নৌকা, আপনার বহর মস্ত। তাই আমার নাম ডাকাত আর আপনার নাম বাদশাহ।' (অগস্তিন ১৯৮৪: ১৩৯)

ডাকাত নিছক ব্যক্তি আর বাদশাহ মানে জাতি বা সমাজ। পাছে এই যুক্তি কেউ পেশ করেন সেই ডরে অগস্তিন লিখে রেখেছেন, "ডাকাতদলও কি ছোটখাটো একটা বাদশাহি নয়? ডাকাতদলেরও 'নেতা' থাকে, থাকে 'নীতি'। দুয়ের বাঁধনও একের সাথে অপরের সমঝোতার বাঁধন। লুটের মাল চুক্তির বিধান মতে ভাগ-বাটোয়ারা তো ডাকাতদলেরও রীতি।" এই কথার পর অগস্তিন দেখান যথেষ্ট জনসমর্থন, নির্দিষ্ট এলাকা, ঘাঁটি, শহর আর শাসন করার মতো জনগোষ্ঠী জুটে গেলে ডাকাতদলও নিজেদের বাদশাহি ঘোষণা করতে পারে। বাদবাকি দুনিয়া সে-দাবি মেনে নেয়। এতে নতুন বাদশাহির লুটপাটের অধিকার লোপ পায় না, লোপ পায় তার শাস্তি ভোগের বিধান।

ঠিক এই বয়ানের সুতা ধরে নয়, আর কারণে প্রায় আশি বছর আগে কলকাতার উকিল, আমাদের রংপুরের ছোকড়া অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রশ্ন লিখেছিলেন– "ব্যক্তির পক্ষে যেটা দোষের সমাজ বা জাতি, অর্থাৎ ব্যক্তি সমষ্টির পক্ষে সেটিরই বর্ধিত সংস্করণ বা 'এনলার্জড এডিশন' কেন প্রশংসার?" (গুপ্ত ১৪০৬: ৪১১) ডাকাত-বাদশাহ আখ্যানের পরিভাষায়: ডাকাতের কাজ যদি দোষের, তবে বাদশাহ্‌র কাজ কোন যুক্তিতে আমাদের তারিফ কুড়ায়?

অতুলবাবুর জবাবটা বিবেচনার যোগ্য। তিনি দাবি করেন, জাতীয় আইন বলে কিছু যদি থেকেও যায় আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু নাই। তখন ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। গত আশি বছরে এই পরিস্থিতির উল্লেখ করার মতো উন্নতি হয়েছে বলতে পারলে আমরা উৎফুল্ল হতাম। তাই অতুল গুপ্তের কথায় ফের কান দেয়া যাক। বাবু লিখেছেন—

> কারো নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করাটা যে সমাজে নিন্দার কথা, তার কারণ ঐ এক অহং-এর খোঁচা আর সকল অহং-এর গায়ে লেগে তাদের ব্যথিত করে তোলে। কিন্তু একটা গোটা দলকে ধরে যখন এটি প্রকাশ হয়, তখন দোষটা আর থাকে না। এবং এতে দলের সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশ্য এক দলের অহংবোধটা অন্য আর এক দলের গায়ে লাগেই লাগে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা আমাদের যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি-নিষেধ, সেসবই হল ছোট হোক বড় হোক কোনো একটা দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে লক্ষ্য করে। এক দলের সঙ্গে আরেক দলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এসব কোনো কিছুরই লক্ষ্য নয়। সেজন্য লোকের সঙ্গে কথায় ও কাজে যে লোকের ভদ্রতার সীমা নাই। সেই লোকই একটা সমস্ত জাতির সম্বন্ধে কথায় বা ব্যবহারে কোনোরকম ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। যে-লোক জীবনে কাকেও কোনো দিন কড়া কথা বলেনি, সেও দল বেঁধে একটা গোটা দেশকে পেষণে ও শোষণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। (গুপ্ত ১৪০৬: ৪১১)

একই কথা অন্য কানে যদি শুনি তো বলা যায় আন্তর্জাতিক আইনের গোড়ায় আছে বলাজুরি। এর মানে আন্তর্জাতিক সমাজ আজও গড়া হয়নি। জাতিসংঘ নামে যে আপস ব্যবহার নীতি আছে তার নামও সমাজ নয়। ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স যখন প্রস্তাব করেন আদিম মানুষ সমাজবদ্ধ ছিল না, এক সময় চুক্তি লিখে তারা সমাজ গঠন করেছে তখন অনেকে আপত্তি করেছিলেন। হব্‌সের কল্পনা মনগড়া— বলেছিলেন বিবাদীরা। অতুল গুপ্ত বিবাদীর যুক্তি সংক্ষেপ এভাবে করেন:

> মানুষ কোনো দিনই সমাজ ছাড়া ছিল না, এবং কোনো রাষ্ট্র গড়ার মজলিসের প্রসিডিং, কি পাথরে কি তামায়, এ পর্যন্ত কোনো পুরাতত্ত্ববিদই আবিষ্কার করতে পারেননি। (গুপ্ত ১৪০৬: ৪১২)

তো হব্‌সের এই কল্পনার অজুহাত কি? রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখেই হব্‌স খুব সম্ভব আন্দাজ করেছিলেন লোকের সাথে লোকের সম্পর্কও একদিন নিশ্চয়ই এরকম ছিল। এই অবস্থার নামই হব্‌স রেখেছিলেন স্বাভাবিক অবস্থা। বল প্রয়োগই স্বাভাবিক। আইন প্রয়োগই অস্বাভাবিক তথা সভ্যতার কথা। এই হিসাব অনুসারে আন্তর্জাতিক সমাজ এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ইতিহাসেও ছিল। খ্রিস্টীয় **২১**শ শতকেও আছে। থুকিদিদিস পণ্ডিতের লেখায় পুরনো দিনের যে বিবরণ পাওয়া গেছে আমরা তারই অনুবাদ সংগ্রহ করছি।

২.

পঞ্চম শতাব্দীর এথেন্স সাম্রাজ্যের দুইজন সেনাপতির সঙ্গে ক্ষুদ্র দ্বীপ মেলোস সরকারের যে কথা কাটাকাটি হয় তার মোটামুটি পূর্ণ বিবরণ থুকিদিদিসের পঞ্চম খণ্ডে পাওয়া যায়। মেলোস দ্বীপটি একপর্যায়ে স্পার্তার প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক পর্যায়ে ঐ অঞ্চলে এথেন্সের নতুন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। আর সকলে এথেন্সের বশ্যতা স্বীকার করলেও মেলোস করেনি। মেলোস প্রথমে নিরপেক্ষ থাকার অধিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু এথেন্স বলেন: আমাদের অভিধানে 'নিরপেক্ষ' শব্দটির কোনো ভুক্তি নাই। যারা আমাদের পক্ষে নয়, তারা আমাদের বিপক্ষে। এই বলে এথেন্স তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধ চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে মেলোস পরাস্ত হয়। সে-দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে খুন এবং সকল শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে দাসবন্দী করা হয়। এথেন্সের লোক এসে দ্বীপে নতুন বসতি গড়ে। এই ঘটনা ঘটে

স্পার্তার সাথে এথেন্সের যুদ্ধের ষোড়শ বছরে। মনে করিয়ে দেয়া অবান্তর নয়, এই যুদ্ধ মোট ২৭ বছর স্থায়ী হয়েছিল। আরও স্মরণ করা অবান্তর নয় যে, এই পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধের পর এথেন্সের সাম্রাজ্য চিরতরে বিলীন হয়।

মেলোসের বিরুদ্ধে এথেন্সের অভিযান কূটনীতি লেখকরা যে-বস্তুকে পরবর্তীকালে আক্রমণমূলক যুদ্ধ নাম দেন সে-বস্তুরই সাক্ষাৎ উদাহরণ। থুকিদিদিস নিজে এথেন্স পক্ষের লেখক হয়েও কেন এই বিবরণ লিখেছেন তা অনেক পণ্ডিতের মাথাব্যাথার কারণ। মার্কিন দার্শনিক মাইকেল ওয়ালজার মনে করেন থুকিদিদিস এথেন্সের পক্ষে সাফাই গাইবার মতলবেই এত লম্বাচওড়া বিবরণের কষ্ট স্বীকার করেছেন। মেলোসের ওপর এথেন্সের হামলা, বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে, আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী যুদ্ধ। কিন্তু ভেতর দেখলে এই যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধই। (ওয়ালজার ১৯৯২: ৫) আমরা ওয়ালজারের এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে পারছি না। মেলীয় নেতাদের সঙ্গে এথেনীয় সেনানায়কদের কথা কাটাকাটি খুব ঠাণ্ডা মাথায় পড়লে অন্য সিদ্ধান্তও করা যায়। ঐতিহাসিক মোজেস ফিনলে মনে করেন, থুকিদিদিস একটু হতাশার কবলে পড়েছেন। এথেন্সের যুক্তিকে খেলো করার জন্যই– তথাকথিত নীতিবাগীশির গোড়ায় কি রকম হীন স্বার্থবুদ্ধি প্রকট তা দেখানোর জন্যই– সম্ভবত এই বিবরণ। (ফিনলে ১৯৭৭: ৪৮-৫৯)

এথেন্সের দুই সেনাপতি– ক্লেয়োমেদেস এবং তিসিয়াস– সভায় বসেছেন। সামনে মেলোসের প্রতিনিধিরা। এথেনীয় সেনাপতিদের ভাষণ কূটনীতির আড়াল ছেড়েছে। তাঁরা বললেন, এই আলোচনাটা দশের সামনে চলছে না, চলছে একান্তে। কাজেই আসুন, বক্তৃতা বাদ দিয়ে আসল কথা বলি। আমাদের কোন কোন কথায় আপনাদের আপত্তি তা এখানেই বলে দিন। আমাদের প্রস্তাব মেনে নিন।

মেলোসের প্রতিনিধি বললেন, দশের দৃষ্টির আড়ালে, এই একান্তের আলোচনায় আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আপনারা যে হারে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের আলোচনায় ডেকেছেন, তার সাথে কেনো মিল নাই আপনাদের কথার। আপনারা মুখে বলছেন আলোচনা, কিন্তু আপনারাই তো এ আলোচনার বিচারকও সেজে আছেন। এই আলোচনার ফলাফল শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াবে বলে আমরা আশা করতে পারি তা যুদ্ধ ছাড়া আর কি! যদি আমরা প্রমাণ করি ন্যায় আমাদের পক্ষে তখন আমরা আত্মসমর্পণ করছি না। তখন একমাত্র পথ যুদ্ধ। আর যদি তা না হয় অপর পথ যা খোলা আছে তার নাম দাসত্ব।

এথেন্সওয়ালা বললেন, আপনারা যদি ভবিষ্যতের পৃথিবী কি রকম দেখাবে তা নিয়ে কিংবা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান করুন। তো আমরা সে-আলোচনায় অংশ নেব না। তবে আপনাদের দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলতে যদি কোনো রকম আগ্রহ পোষণ করেন তো আমরা আলোচনা চালিয়ে যেতে রাজি।

জবাবে মেলোসওয়ালা বললেন, ‘আমরা এখন যে-দশায় এসে পৌঁছেছি সে-দশায় পড়লে চিন্তা ও কথার যতটা মুদ্রা আছে সব ক'টা বাজিয়ে দেখাই স্বাভাবিক এবং মার্জনীয়। তো আপনাদেরই কথা যদি সত্য হয় স্বীকার করি এই আলোচনা বৈঠকের মূল কথা আমাদের দেশের নিরাপত্তা। তো আলোচনা চলতে পারে। আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো।

এথেন্সওয়ালা বললেন, সত্যি কথা বলতে, আমরা কোনো প্রকার ভান করব না। আমরা মিদিয়া বা ইরানকে পরাজিত করেছি, তাই আমাদের একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার হক আছে– এই যুক্তি দিয়ে আপনাদের সময় নষ্ট করব না। অথবা আপনারা আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন, তাই আপনাদের ওপর হামলা করতে এসেছি– এই ছুতাও দেব না। আমরা এমন

কোনো বক্তৃতাও দেব না যা আপনাদের বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হবে না। বিনিময়ে আমরা আশা করব আপনারাও দয়া করে বাজে যুক্তি পেশ করবেন না। বলবেন না আমরা স্পার্তার উপনিবেশ ছিলাম তবে তাদের মিত্র ছিলাম না। কিংবা বলবেন না আপনারা আমাদের কোনো ক্ষতি করেননি। দয়া করে যা যা সম্ভব আলোচনা তার ভেতরই সীমিত রাখুন। দুই পক্ষেরই আসল মনোভাবটা হিসাবে নিতে ভুলবেন না। কারণ আপনারাও জানেন আমরাও জানি যখন দুই খণ্ড দেশ শক্তিতে সমান নয়, তখন অধিকার কথাটি অবান্তর। দুনিয়ার রীতিই এই। শক্তিমান যতটা পারে ততটা মারে আর দুর্বল যতটা না খেলেই নয় ততটা মার খায়।

এর উত্তরে মেলীয় প্রতিনিধিরা জানালেন, আপনারা যখন অধিকারের কথা তুলতে বারণ করছেন আমরা সে কথা আর তুলছি না। আপনাদের প্রস্তাব অনুসারে স্বার্থের কথাই পাড়ব। বিপদে পড়লে সকলেরই যা ন্যায়সঙ্গত ও সত্য তার দোহাই দেওয়ার এমনকি যেসব যুক্তি সচরাচর কাজে লাগে না তেমন সকল যুক্তির বলে ছাড়া পাওয়ার– অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। আশা করি আপনারা আমাদের এই যুক্তি দেয়ার অধিকারটা বিনষ্ট করবেন না। আপনারা আর দশ প্রস্তাবের মতো এই প্রস্তাবেও সম্মত হবেন বলে আশা করি। কারণ একদিন যদি আপনাদের পতন হয় তখন অন্যরা কি পরিমাণ প্রতিশোধপরায়ণ হবেন ভাবতে পারেন? এ নিয়ে সারা দুনিয়াকে কাতর হতে হবে।

এথেন্সের সেনাপতিরা উত্তর দিলেন, আমাদের সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে আমরা দুর্ভাবনায় ভুগছি না। ধরে নিচ্ছি স্পার্তাই আমাদের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। স্পার্তার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য পরাভূত পক্ষের জন্য অতটা ভয়ের নয়। যেসব প্রজা নিজ উদ্যোগে আক্রমণ করে শাসকগোষ্ঠীকে পরাস্ত করে তারা এর তুলনায় অনে বেশি ভয়ের। তবু এই ঝুঁকিটা আমরা নেব। এখন আমরা বলতে চাই, আমরা এসেছি আমাদের সাম্রাজ্যের স্বার্থ কোথায় সে কথা জানাতে। আর আমরা যা এখন বলছি তাতে আপনাদেরও স্বার্থ আছে। আমরা বিনা বাধায় বিনা ঝামেলায় আপনাদের দেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে চাই, তাতে আপনারাও হেফাজতে থাকবেন আমাদেরও স্বার্থ সাধিত হবে।

মেলীয় প্রতিনিধিরা বললেন: আমাদের ওপর শাসন ক্ষমতা বিস্তার করে আপনাদের স্বার্থ সাধিত হবে বুঝলাম। কিন্তু দয়া করে বলবেন কি আপনাদের দাসত্ব করে আমাদের স্বার্থটা সাধিত হবে কোন পথে?

এথেনীয়রা বললেন: উত্তর সোজা। চরম পরিণতির আগে আত্মসমর্পণের একটা সুযোগ আপনারা পাচ্ছেন। এটাই স্বার্থ আপনাদের। আর আপনাদের ধ্বংস করার কষ্টটা থেকে রেহাই পেলাম। এটাই আমাদের লাভ।

মেলীয় প্রতিনিধিরা বললেন: তো আপনারা আমাদের নিরপেক্ষ থাকার অধিকারটাও স্বীকার করবেন না? নিরপেক্ষ মানে শত্রু নয়, বন্ধু, যারা কোনো পক্ষেরই মিত্র নয়।

এথেনীয়রা বললেন: না। কারণ আপনারা শত্রুতা সাধন করলে আমাদের যে-ক্ষতি হবে তার তুলনায় আপনারা বন্ধু সাজলে ক্ষতি হবে অনেক গুণ বেশি। আপনারা শত্রু হলে প্রমাণিত হয় আমরা শক্তিমান। আর আপনাদের বন্ধু বলে স্বীকার করি তো আমাদের অধীনস্ত প্রজাদের চোখে তা হবে আমাদের দুর্বলতার প্রমাণ।

মেলীয়রা বললেন: আপনাদের প্রজারা ন্যায়বিচার বলতে মাত্র এইটুকুই বোঝেন? আপনাদের সাথে যাদের কোনো কায়কারবার নাই তারা আর যারা আপনাদের আপন উপনিবেশের লোক কিংবা আপনাদের হাতে পরাজিত বিদ্রোহী– সবাইকে এক সমান ভাব কি ঠিক?

এথেন্সের সেনাপতিরা জানালেন: আমাদের প্রজারা মনে করেন, যদি অধিকারের প্রশ্ন ওঠে তো সকলেরই অধিকার সমান। কেউ যদি স্বাধীন হয় তো সে তার শক্তির কারণে। আমরা যে তাদের পেষণ করি না তার কারণ আমরা ভয় পাই। অতএব আপনাদের যদি আমরা দাস বানাতে পারি আমাদের দুই লাভ– এক নম্বরে, আমাদের সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়লো; দুই, একটা উদাহরণ পাওয়া গেল যে আমরা শক্তিমান। আপনাদের দেশটা দ্বীপ এবং আপনারা অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় দুর্বল। তাই আমরা যারা সমুদ্রের অধীশ্বর আমাদের চোখের সামনে আপনাদের স্বাধীন না-থাকাটা বাড়তি গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য।

মেলোসের নেতারা মুখ খুললেন: কিন্তু আমরা যে-নীতি প্রস্তাব করছি তাতে কি আপনারা কোনো রকম সুবিধা দেখতে পাচ্ছেন না? এখানেও আপনারা যদি ন্যায়-অন্যায়ের কথা এক পাশে ঠেলে দিয়ে শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা তোলেন, আমরাও নিজেদের স্বার্থের কথা বলতে চাই। আপনাদের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন হতে পারে, সে-কথাটা আপনাদের বোঝাতে চাইছি। আমাদের মতো আরও নিরপেক্ষ দেশ আছেন। আমাদের যেমন এখন আপনারা আক্রমণ করছেন তাদেরও যে সে-রকম আক্রমণ করবেন না তার প্রমাণ কি, বিশেষ করে তারা যখন আমাদের ভাগ্য নিজ চোখে দেখবেন? বর্তমানে আপনাদের শত্রুসংখ্যা যত আছে এই নীতির ফলে তার বাড় বাড়া ছাড়া আর কি হবে? আর যারা কোনোদিন শত্রু হবার কথা চিন্তাও করেননি– এখন তারাও শত্রু তালিকায় নাম লেখাবেন।

এথেনীয়রা বললেন: তা হবে কেন? মূল ভূখণ্ডের দেশগুলো আমাদের অতটা দুর্ভাবনার কারণ নয়। ওরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করছেন, আমাদের বিরুদ্ধে তৈরি হবার কোনো প্রয়োজন ওদের নাই। বিপদ আসে আপনাদের মতন দ্বৈপায়নদের দিক থেকে। আপনারা রয়েছেন সাম্রাজ্যের বাইরে। বিপদ আসবে আমাদের অধীনস্ত জাতিগুলোর দিক থেকেও। তারাও সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে বসবেন আর স্পষ্ট বিপদের কারণ ঘটাবেন।

মেলোসবাসীরা বললেন: ধরে নিচ্ছি আপনাদের বিশ্লেষণই সঠিক। যদি আপনারা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এতখানি ঝুঁকি নিচ্ছেন আর অধীন জাতিগুলোও স্বাধীন হওয়ার জন্য এতখানি ঝুঁকি নিচ্ছেন তো আমরা যারা এখনও স্বাধীন আছি তারা যদি আত্মসমর্পণের আগে যতটুকু সাধ্য আছে সবটুকু প্রয়োগ করে স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টা না করি– সে কি ভয়াবহ নীচুতা ও কাপুরষতার পরিচায়ক হবে না?

জবাবে এথেন্স সেনাপতিরা বললেন: যদি স্বার্থের কথা বিবেচনা করেন, তবে না। যেখানে যুদ্ধ হয় সমানে সমানে সেখানে জয়ের পুরস্কার ইজ্জত আর পরাজয়ের দণ্ড গ্লানি। কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের লড়াই তো তেমন নয়। আপনাদের স্বার্থ কি করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবেন সে প্রশ্নে সীমিত। যারা আপাদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিমান তাদের প্রতিরোধ করার প্রশ্নই তো ওঠে না।

মেলীয় প্রতিনিধিরা বললেন: যুদ্ধের ভাগ্য মাঝে মাঝে অন্য রকমও হতে পারে সে-কথা আমরা জানি। দুই পক্ষের জনবল দেখে শক্তির যে-পরিমাপ লোকে করে থাকে অনেক সময় শক্তির ভারসাম্য ঠিক সে-রকম অনুপাতে নাও হতে পারে। আত্মসমর্পণ মানে হতাশার হাতে নিজেদের ভাগ্য নিবেদন করা। অথচ সংগ্রাম চালিয়ে গেলে অন্তত কিছুটা হলেও আশা থাকে যে, যদি সুযোগ আসে টিকে যাব।

এথেন্সের লোকেরা বললেন: আশা সে তো বিপদে সান্ত্বনাদাত্রী। আশার প্রশ্রয় দেওয়া তাদেরই সাজে কোমরে যাদের জোর আছে। এই অবস্থায় যারা আছেন, তারা আশা করতে পারেন কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয় তো হবে। পুরো ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাদের। কিন্তু

আশার স্বভাবই এমন যে সে সব সময়ই সীমা ছাড়িয়ে যায়। যখন সর্বনাশ এসে দরজায় দাঁড়ায়– মাত্র তখনই অতি আশাবাদীরা টের পান কোন জায়গায় তাদের ভুল হয়ে গেছে। যদি কেউ এই অতি আশাবাদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চায় তো সাহায্যের অভাব নাই। আশা করি আপনারা এই ঝুঁকিটা নেবেন না। আপনাদের ভাগ্য ঝুলে আছে একটা সুতার ওপর। আর কিছু লোক আছেন, যারা এই রকম অবস্থায় মানবিক চেষ্টায় যেটুকু নিরাপত্তা পাওয়া যেতে পারে সেটুকুও পরিত্যাগ করে ভাগ্যগণনা, দৈববাণী ইত্যাদির ওপর ভরসা করেন। এতে আশার নামে ধ্বংস ডেকে আনা হয়। আশা করি আপনারা সে পথে এগুবেন না।

মেলোসবাসীরা বললেন: আপনাদের সৈন্যসামন্ত আর ধনদৌলতের সামনে দাঁড়ানো যে কঠিন সে-সত্য আপনারা যেমন জানেন আমরাও তেমন জানি। সে-সত্যে সন্দেহ নাই। অবশ্য যদি আপনাদের এবং আমাদের শক্তি ও সম্পদ সমান সমান হতো তবে সে-কথা স্বতন্ত্র। তবে আমরা বিশ্বাস করি দেবতারা আপনাদের দিকে যে-রকম সে-রকম আমাদের দিকেও মুখ তুলে দেখতে পারেন। কারণ আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়পক্ষের যোদ্ধা। আর আমাদের সৈন্যসামন্তে আর অস্ত্রশস্ত্রে যেটুকু ঘাটতি পড়েছে তা স্পার্তার কাছ থেকে আমরা পাব। আমরা শুধু ওদের মিত্রই নই, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ও। সুতরাং স্বার্থে না-হলেও অন্তত লজ্জায় ওরা আমাদের পক্ষে লড়তে আসবেন। অতএব আমাদের আত্মবিশ্বাস অতখানি অযৌক্তিক নয়।

উত্তরে এথেন্সের সেনাপতিরা যা বললেন, তা'ই তাদের মূল দার্শনিক যুক্তি। তাঁরা উচ্চারণ করলেন– আপনারা যে-রকম দেবতার সাহায্য আশা করছেন, আমরাও সেরকম সাহায্য সমানে আশা করতে পারি। আর দশ মানুষ দেবতাদের যেমন বিশ্বাস বা পূজা করে আমরাও তা-ই করি। কোনো অন্যথা করি না। দেবতার কথা যদি ওঠে তো বলব আমরা বিশ্বাস করি আর মানুষের প্রসঙ্গ ওঠে তো বলব আমরা জানি– মানুষ ও দেবতা উভয় পক্ষই যেখানেই পারেন শাসন ক্ষমতা হাতে তুলে নেন– এটাই তাদের স্বভাব, এর কোন ব্যতিক্রম নাই। শাসন করা বিধির বিধান– এ বিধান আমরাই প্রথম আবিষ্কার করিনি বা প্রথম প্রয়োগ করছি না। আমরা দেখেছি আমরা আসার আগেও এ-বিধান বিদ্যমান ছিল আর আমাদের বিদায়ের পরও এ-বিধান জারি থাকবে। আমরা বিধানটার প্রয়োগ ঘটাচ্ছি মাত্র। আমরা পরিষ্কার জানি, আমাদের হাতে যে-ক্ষমতা সে-ক্ষমতা যদি আপনাদের বা আপনাদের মতো অন্য যে-কোনো শক্তিরও থাকতো, তো তারাও আমরা যা করছি তার চেয়ে কিছু কম করতেন না। অতএব, দেবতাদের বিচারে আমরা কোনো অন্যায় করছি না। ফলে আমাদের ভয়ের কিছুই নাই। ন্যায় আমাদের পক্ষেই। কিন্তু যদি স্পার্তার কথা তুলে আপনারা বলেন, তারা লজ্জার ভয়ে আপনাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবেন, তো আপনারা ভুল করছেন বলে আপনাদের করুণা করতে পারি। একই সাথে আপনাদের বোকামিতে মুগ্ধও হচ্ছি। যেখানে নিজ স্বার্থ বা নিজ দেশের বিধিবিধান নিয়ে বিবাদ বাধে সেখানে স্পার্তার তুলনা হয় না। অন্য জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। যা নিজেদের স্বার্থসম্মত তা-ই গৌরবের আর যা সুবিধাজনক তা-ই ন্যায়সঙ্গত– এই বিচার যারা করেন তাদের মধ্যে স্পার্তাবাসীরাই শ্রেষ্ঠ, সংক্ষেপে এটুকু বললে ওদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়। এই ধরণের চিন্তাভাবনায় যারা অভ্যস্ত তাদের সাহায্যের আশায় ঘর বাধা– নিরাপত্তার ভরসা করা– ঠিক হবে না। (থুকিদিদিস ১৯৯৪: ৫ম খণ্ড, ৮৫-১০৫ রুকু)

মেলোসবাসীদের সাথে এথেন্সের দুই সেনাপতির বাদানুবাদ আরও কিছুদূর লেখার পর থুকিদিদিস থেমে যান। আলোচনা, বলা বাহুল্য, ভেঙ্গে যায় এবং যা হবার তা-ই হয়। অনেক প্রতিরোধের পর শেষ পর্যন্ত মেলোস আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তার কি পরিণতি হয় সে কথা

ওপরেই লেখা হয়েছে। তখন খ্রিস্টপূর্ব ৪১৬ সাল। মেলোসের সকল পুরুষ হত্যা করে, সকল নারী ও শিশু বন্দী করে নিয়ে যায় এথেন্সে। সেই শূন্য দ্বীপে চাষাবাদ করার জন্য ৫০০ জন এথেন্সের নাগরিক পাঠানো হয়।

৩.

থুকিদিদিসের যুক্তি নিয়ে অনেক বিবাদ হয়েছে। এখনও হচ্ছে। এখানে মূল প্রশ্ন: ন্যায় কার পক্ষে? মেলোসের না এথেন্সের? অনেকে বলেছেন ন্যায় এথেন্সের পক্ষে। কারণ ন্যায় বিধির বিধান। এথেন্স শুধু বিধির নিয়ম পালন করছে। এ বিধিরই নাম ক্ষমতা, শক্তি বা সাম্রাজ্য। ওদিকে মেলোসের বিধির বিধান স্বাধীনতা। এই দুই বিধির যদি বিরোধ বাধে তো মধ্যস্থ কোনো বিধি কি আছে? ইতিহাসে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই। সচরাচর বলা হয়– বিধির বিধান মেনেই স্বাধীনতা স্থাপিত হয়। বিপরীতে একথাও বলা চলে– স্বাধীনতা স্থাপন করেই মাত্র বিধির বিধান গ্রহণ করা যায়।

মেলোসের পতনের পর থুকিদিদিস কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এথেন্সের পতনের আগেই সম্ভবত তিনি মারা যান। কারণ ঐ যুদ্ধের শেষ কথা তিনি লিখে যেতে পারেন নাই। মেলোসের পতন প্রমাণ করে স্বাধীনতা পরাভূত, আর ক্ষমতার বিধান জয়ী। ওদিকে এথেন্সের পতন– ১১ বছর পর– দেখায় বিধির বিধানও পরাভূত হতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে দুনিয়ার সকল সাম্রাজ্যই পরাভবের নিয়তি এড়াতে পারে না। এই বক্তব্য যদি সত্য হয় তো প্রশ্ন ওঠে: কেন? সম্ভবত মানুষের স্বাধীনতাই বিধির প্রকৃত বিধান। স্বাধীনতা ও বিধি হয়তো পরস্পরের শত্রু আদৌ নয়। তাই বলা চলে দাসত্ব নয়, বিদ্রোহই ন্যায়সঙ্গত।

আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড এখন বিধির নাম ভাঙিয়ে এসেছে। আফগান জাতি লড়ছে স্বাধীনতার নামে। এই বাক্য সংশোধন করে বলা যায়– আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বিধির অপর নাম মৃত স্বাধীনতা। আর আফগান স্বাধীনতার অপর নাম প্রাণবন্ত বিধি।

দোহাই

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'আর্য্যামি', সবুজ পত্র, ৫ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা (বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৪০৬)

M. Walzer, Just and Unjust Wars, 2nd ed. New York, 1992.

M. I. Finley, Aspects of Antiquity, Harmondsworth, 1977.

St. Augustine, City of god, H. Bettensontr., Harmondsworth, 1984.

T. Taylor, 'Just and Unjust Wars', in M.M. Wakin (ed) War, Morality, and the Military Profession, Fifth Printing, Boulder, Co., 1982.

Thucydides, History of the Peloponnesian War, R. Crawley tr., Chicago, 1994 (Great Books of the Western Worlds, M.J. Adler ed. Vol. 5)

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

সলিমুল্লাহ খান

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য

এই লেখাটা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ১৬ই নভেম্বর ২০০১ তারিখের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। বাংলাদেশে যে অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বর্তমান দুনিয়াদারিতে ইঙ্গমার্কিন বড়লোক প্রভুর সাম্রাজ্য বিস্তারাকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার জোগান দিয়ে চলেছেন সলিমুল্লাহ খান তাঁদের একেবারে সামনের কাতারে সদাহাজির। বিশ্ববাণিজ্যবিধ্বংসী বিশ্বপরিস্থিতির সাথে যতটা আন্তরিকতা সততা বিস্তারের সাথে যেভাবে বোঝাপড়া করলেন তা শেখার মতো। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিশ্লেষণী লেখা তিনি পেশ করেছেন পাঠকের প্রকাশ্য দরবারে। তাঁর লেখা থেকে আমরা চলমান বিশ্বজোড়া যুদ্ধকে বুঝতে শিখেছি। এই যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে আমরা *সম্ভবত* তার সব কটাই (সোজা বাংলায় ৪টা) **মানুষ** এর এই সংখ্যায় ছেপেছি।

On peut fonder ds empires glorieux sur le crime, et de nobles religions sur Limposture.
বোদলেয়ার ১৯৪৬: ২৫৬

জগদ্বিখ্যাত ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে লিখেছিলেন "খোদ অপরাধ মূলধন করে বড় বড় বাহাদুর সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে যেতে পারে, আর নিতান্ত জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েও মহামহিম ধর্ম প্রবর্তিত হতে পরে।" এই বক্তব্যের প্রথম অংশ কতখানি সত্য তলিয়ে দেখাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের হামলা কি সেই ধরনের অপরাধ যার ওপর একটা সাম্রাজ্য খাড়া করা যায়? এই প্রশ্নের তর্কাতীত জবাব লেখার সময় এখনও আসেনি। তবু আমার কি জানি মনে হয়েছে এই বিষয়ে আমাদের এখনই লেখা কর্তব্য।

আমেরিকা কি কারণে আফগানিস্তান আক্রমণ করল? মার্কিন সরকার প্রকাশ্যে যে-কারণ দেখাচ্ছে, সেটাই কি আসল অথবা একমাত্র কারণ? ভেতরের প্রকৃত ব্যাপার কি তা জানার জন্য আমাদের বিশ, পঁচিশ এমনকি পঞ্চাশ বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। এতদিন অপেক্ষা করার মতো সবুরশক্তি যাদের নেই তাদের দৃষ্টি আদ্যকালের গ্রিক ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদিসের লেখার দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করলে কেমন হয়? এই ভাবনা থেকেই বর্তমান লেখাটির জন্ম।

ইতিহাসবিদ থুকিদিদিস অনুমান করা হয় দার্শনিক

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

সক্রাতেসের চেয়ে বয়েসে আট-দশ বছরের ছোট হবেন। হযরত ঈসার আগের পঞ্চম শতকে তারা দু'জনেই প্রাণধারণ করতেন। থুকিদিদিস সক্রাতেসের মতন খ্যাতির অধিকারী নন। কিন্তু রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস বিষয়ে যাদের খানিক হলেও আগ্রহ, তারা তাঁর লেখার কদর করেন। ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স থুকিদিদিসের বই – পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধের ইতিহাস– ইংরেজিতে তর্জমা করেন। (শ্লাত্তার ১৯৭৫) এ কালের দার্শনিকদের কারও কারও মতে হব্‌সের রাষ্ট্রকল্পনা থুকিদিদিসের অনুগামী। (ওয়ালজার ১৯৯২: ৪) কেউ কেউ মনে করেন, থুকিদিদিসের চিন্তায় নতুন কথা নেই। তিনি মানুষের নীতি, সভ্যতা ও রাষ্ট্র বিষয়ে খালি হতাশা ও নিরাশার কথাই শুনিয়েছেন। (ফিন্‌লে ১৯৭৭: ৪৮-৫৯) আমাদের চোখে থুকিদিদিসের লেখার অন্য এক মূল্য ধরা পড়ছে। তাঁর বিশ্বাস, মানুষের ইতিহাসে একবার যা ঘটে তা হুবহু না হোক, আকারে প্রকারে আরও বহুবার ঘটতে পারে। কেতাবী ভাষায়, ইতিহাসের আবৃত্তি আছে (থুকিদিদিস ১৯৯৪: প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, ২২ রুকু) এই দাবি যদি আট আনাও সত্য হয়, তো থুকি সাহেবের লেখা ইতিহাসের একটি ঘটনার আলোকে আফগান মুলুকের ওপর মার্কিন জবরদস্তির বিচার যৎকিঞ্চিত করা যায়। আমার মনে হয়েছে প্রাচীন গ্রিক জাহানের পরাশক্তি এথেন্স এককালীন মিত্র ক্ষুদ্র মিতিলেনি রাজ্যের সঙ্গে যে-আচরণ করেছিলেন, বর্তমান দুনিয়ার বাদশাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সাবেক মিত্র আফগান দেশের সঙ্গে একই ব্যবহার করছে। এই তুলনা কতখানি আকাশকুসুম তার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের এই লেখার আসল উদ্দেশ্য পূরণের সম্ভাবনা। এথেন্স রাষ্ট্রে জননেতারা মিতিলেনির সকল সাবালক পুরুষ হত্যার এবং তাবৎ শিশু ও নারী বিক্রয়ের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিল থুকি সাহেব তা সম্পাদিত ভাষায় নকল করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি হিসেবেও এই বিবরণ পাঠ করা যায়– এ প্রস্তাব এই অধম লেখকের।

যুদ্ধের কারণ দুই প্রকার বলেছিলেন থুকিদিদিস। এক প্রকার কারণের নাম সাক্ষাৎ বা আশু, আরেক প্রকারের পরিচয় তিনি দেন– সত্য বা সুদূর। থুকিদিদিস যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বল করে এই বিচার প্রচার করেন, আজকাল ইতিহাস লেখকরা তারই নাম দিয়েছেন– পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধ। প্রাচীন যবন দেশের এক অংশ পেলোপোনেশিয়া নামে খ্যাত ছিল। সেই অংশের প্রধান ক্ষাত্রশক্তি স্পার্তা নামক রাষ্ট্র। এই স্পার্তার সঙ্গে নতুন পরাশক্তি এথেন্সের দীর্ঘ বছরের সংঘাতকেই ইতিহাসে পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধ বলার রীতি। নামেই প্রকাশ যাদের থুকিদিদিস এথেন্সপক্ষীয় মানুষ। তবে তাঁর সম্মানে বলা দরকার– তিনি নিরপেক্ষতার ভান করেননি। বইয়ের প্রথম রুকুতেই থুকি সাহেব বলেছেন, আমি এথেন্সের লোক, এই যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে বসেছি। নিজ দেশ বা নিজ দল বলে তিনি এথেন্সকে ছেড়ে কথা বলেননি। তাই আমরা তাঁর লেখার কদর করতে আজও কসুর করি না। মিতিলেনির ভাগ্য নির্ধারণ সভায় এথেন্সের দুই রাজনীতিবিদের যে-কাহিনী তিনি নকল করেছেন তা আমাদের মূল ও মূল্যবান ভরসা। বর্তমান যুগের আমেরিকান দার্শনিক মাইকেল ওয়ালজার দেখলাম থুকিদিদিসের এই দিলখোলা কথাবার্তা খুব একটা পছন্দ করেননি। (ওয়ালজার ১৯৯২: ৪-১৩)

কোন প্রকার রাখঢাক না করে বা চাতুরির আশ্রয় না নিয়ে থুকিদিদিস বলেছেন, পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধের সত্য কারণ এথেন্সের সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি। দুটি করদ রাজ্যের বিরোধ নিয়ে এই বিবাদ শুরু হলেও সেটিই সত্য কারণ নয়– থুকি সাহেব এই বিশ্লেষণে অটল। তাঁর ভাষায়, 'পণ্ডিতদের আলোচনায় যুদ্ধের যে-কারণটি সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায়, আমার বিচারে যুদ্ধের সত্যে কারণ সেটাই। এথেন্সের ক্ষমতার বাড়বাড়া এবং সেই বাড়ায় লাকিদেমনের (মানে স্পার্তার) ভয় পাওয়া– এই দুই কারণে যুদ্ধ না লাগা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

(থুকিদিদিস ১৯৯৪: রুকু ২৩) থুকি সাহেবের এই বিভাজন ইতিহাস লেখকরা পরকালেও বড় সহি জিনিস বলে আদর করেছেন– যেমন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের মার্কিন ইতিহাস লেখক ফে সাহেব থুকির ভূয়সী তারিফ করেন। (ফে ১৯৭৫: ১)

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সমিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরব্ধ সমর প্রয়াসের বেলায়ও থুকিদিদিসের বিভাজন খাটানো সম্ভব। প্রশ্ন তোলা যায়– এই যুদ্ধের সত্য বা সুদূর কারণ কি? খ্রিস্টীয় ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এক সুন্দর সকালের নির্মেঘ আকাশ ছেড়ে কয়েকটি অসামরিক বিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অসামরিক দালান ও একটি সামরিক সদর দফতরে হামলা চালালো আর ৭ই অক্টোবর নাগাদ কাবুল-কান্দাহারের মাটি মার্কিন বোমায় উড়ে গেল। ইতিহাস লেখক বা সংবাদ জগতের পরিচালকরা যদি এই সুবাদে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাকেই এই যুদ্ধের আশু বা সাক্ষাৎ কারণ বলেন তো অন্যায় হয় না। অন্যায় হয় যদি তারা দাবি করেন, এই ঘটনাই যুদ্ধের সত্য কারণ। ঈসায়ী ১৯১৪ সালের ২৮ জুন উপনিবেশ বসনিয়ার সারায়েভো শহরে মালিক সাম্রাজ্য অস্ট্রিয়ার ভাবী সম্রাট সস্ত্রীক রাজনৈতিক প্রতিবাদীর গুলিতে প্রাণ দিলেন আর আগষ্ট মাসের ৪ তারিখ নাগাদ দুই পরাশক্তি, জার্মানি আর ইঙ্গভূমি মহাযুদ্ধে নেমে গেল। সেই যুদ্ধ সাড়ে চার বছর স্থায়ী হল। দুই দলে তিন কোটির মতো মনুষ্য খুন কিংবা জখম হল। অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্রাটের জীবন মহান ও মূল্যবান। এ-সত্যে সন্দেহ করলেও গুনাহ হয়– সন্দেহ নেই। কিন্তু ইউরোপীয় মহাসমরের কারণ এইটুকুন বললে খুব সওয়াও হয় না। এ-কারণ অকিঞ্চিৎকর।

একই প্ররোচণায় আমরাও বলব, ১১ সেপ্টেম্বর মধ্য এশিয়ায় আমেরিকান অভিযানের সত্য কারণ নয়। আফগান শাসকরা সৌদি প্রজা ওসামা ইবনে লাদেনকে ঠাঁই দিয়েছে। মার্কিন উপরোধ উপেক্ষা করে তাঁকে রেহাই দিয়েছে, পাকড়াও করে তুলে দেয়নি– তাই আমরা আফগান বেটাদের ওপর চড়াও হয়েছি– যুক্তিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কৈফিয়ত দয়া করে দিয়েছে। না দিলেও কারো কিছু বলার ছিল না। ওদিকে আবার সাবেক রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন প্রচার করেছেন– ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের অনেক আগেই তিনি শ্রী লাদেনকে খুন করার হুকুম জারী করে বসেছিলেন। ক্লিনটন যে কখনও কোন মিথ্যা কথা বলেন না– পৃথিবী তা গ্রহণ করে। তার প্রমাণও আছে সুদানে, সোমালিয়ায়, ইরাকে এবং (বলা বাহুল্য) আফগান দেশে। তো বলা চলে, লাদেন বিরোধী অভিযানের ইতিহাসে ১১ সেপ্টেম্বর একটি বাড়তি অধ্যায় বৈ নয়। বাংলায় বলি, কারণ বোঝার শাকের আঁটি। প্রশ্ন থেকেই যায়: আফগান জাতির ওপর আমেরিকার এই মহা গোস্‌সার সত্য কারণ কি?

আমেরিকা বার বার বলেছে– তাদের যুদ্ধ ক্রুসেড বটে, তবে এ-ক্রুসেড সে-ক্রুসেড নয়। এর প্রতিপক্ষ আফগান জাতি নয়, তালেবান শাসকগণ। এর প্রতিপক্ষ ইসলাম ধর্ম নয়, (ইসলাম মার্কা) সন্ত্রাসবাদ মাত্র। আমেরিকার এই কথা ও তার যুদ্ধ প্রয়াসের মধ্যে সঙ্গতি আবিষ্কারের চেষ্টা শতাব্দীর মনীষার কাজ, সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রপতি বুশ বলেন: সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে তাঁর দেশের অভিযানের মাঝখানে দাঁড়াবার অধিকার কারও নেই। পয়গম্বর হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের বাক্য উদ্ধার করে তিনি বলেন, যারা আমাদের পক্ষে নেই তারা আমাদের শত্রু পক্ষের। (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ২০০০: ইঞ্জিল শরিফ, সিপারা মথি ১২:৩০)। এ কথার অর্থ ভয়াবহ। এমন ভয়াবহ যে, আমদের পক্ষে হজম করা কঠিন এর অর্থ। এ কথায় নির্গলিতার্থ– আমরা সারেজাঁহার বিরুদ্ধে জঙ্গ ঘোষণা করলাম। ভয়ে বা প্রলোভনে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্র এর মধ্যেই মার্কিন জোটে যোগ দিয়েছে। যারা দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র এখন ইচ্ছা করলে তাদের ঘাড়ে সিন্দবাদের দৈত্যের মতো লাফ দিয়ে চেপে বসতে পারে। তো

সামান্য লাদেনের শাক ঢাকতে কেন এত মাছ আমদানি? কেন আমেরিকা বনাম পৃথিবীর যুদ্ধ?

কারণ, আমাদের বিবেচনায়, বিদ্রোহ। আফগানরা একদিন মার্কিনদের মিত্র ছিল। এখন বিদ্রোহ করছে। এ-বিদ্রোহ মেনে নেয়া যায় না। আফগানিস্তানের মতো নগন্য দেশ জোটের বাইরে গেলে ছাইপাঁশ আসে যায়। কিন্তু উদাহরণের শক্তি অপরিমাপ্য। ক্ষুদ্র আফগান যদি উদাহরণ স্থাপনের সুযোগ পায়, তো কাল বড় সৌদি আরব যে সে-পথ ধরবে না তার শপথ কোথায়? মার্কিন সাম্রাজ্যের আজ আর প্রতিদ্বন্দী নেই। আজ সে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দী। তবু কেন এমন নিষ্ঠুরতা– যার স্মরণ নিতে আজ সে পিছপা হবে। দুনিয়ার আর দশ দেশেকে শিক্ষা দেয়াই আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের প্রধান কারণ। এই দরিদ্র দেশের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনায় বসাও আমেরিকার মার্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও তার মিত্রদের জবরদস্তির এবং আত্ম-গরিমার এই-ই আশু কারণ। এর সুদূর মূল এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে। সারা পৃথিবীর প্রাণ না নিয়ে আজ এ সাম্রাজ্য আয়ুর নিশ্চয়তা নিতে পারছে না। এথেন্সেরও এই রোগ হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ এবং ৪৮০ সালে– যথাক্রমে মারাথন ও সালাসিসের যুদ্ধে ইরানের বিরুদ্ধে গ্রিক জাতির যুদ্ধজোট জয়ী হয়। এই বিজয়ের নেতৃত্ব দেয় নতুন পরাশক্তি এথেন্স। যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু যুদ্ধজোট শেষ হয় না। এথেন্সের পতাকাতলে প্রায় ১৫০টি ছোট রাষ্ট্র সমবেত। এই মিত্রদের সঙ্গে এথেন্সের সম্পর্ক কেমন ছিল সে নিয়ে ইতিহাস লেখকরা এখনও তর্ক করেন। কিন্তু কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা কাউকে দেয়া হয়নি। যদি কোন রাষ্ট্র এথেন্সের জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তো তাকে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে শায়েস্তা করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৮ সালের দিকে এই জোটের আত্মপ্রকাশ। আর প্রায় ৪৬ বছর পর পুরনো পেলোপোনেশীয় জোটের সঙ্গে তার যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধার চার বছর পর একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র– মিতিলেনি জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন এথেন্স তার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করেছিল– আমাদের মনে হয় তার সঙ্গে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত প্রতিশোধ ও ত্রাসনীতির মিল আছে। আশা– আফগানিস্তানে মার্কিন-পাশ্চাত্য যুদ্ধের আসল কারণ কি তার কিছু ইঙ্গিত এই বিশ্লেষণের ভেতর পাওয়া যাবে।

অনেকদিন ধরে লড়বার পর মিতিলেনির সরকার এথেনি বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে। থুকিদিদিসের মতে, এথেনি বাহিনীর অবরোধের মুখে একদিকে খাদ্যবস্তুর ঘাটতি দেখা দেয়, অন্যদিকে স্পার্তার দলের প্রতিশ্রুত সাহায্য এসে পৌঁছে না। ওদিকে সশস্ত্র জনসাধারণ খাদ্য গুদাম খুলে দেয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সবমিলিয়ে আত্মসমর্পণ বাদে সরকারের অন্য গতি থাকে না। আত্মসমর্পণ চুক্তির শর্ত অনুসারে মিতিলেনির একদল দূত খোদ এথেন্স নগরীতে গিয়ে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত এথেনি বাহিনী কোন মিতিলেনি নাগরিকের প্রাণহানি করবে না। কিন্তু এথেনি বাহিনীর অধিপতি– পাখেস তার নাম– বিদ্রোহের নেতাদের বন্দি অবস্থায় এথেন্সে পাঠিয়ে দেন। বন্দিদের মধ্যে স্পার্তার একজন প্রতিনিধিও ছিলেন। (থুকিদিদিস ১৯৯৪: খণ্ড ৩, রুকু ৩৫)

বন্দিরা এথেন্স পোঁছামাত্রই স্পার্তার প্রতিনিধিকে হত্যা করা হয়। এথেন্সের জাতীয় পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়, শুধু যুদ্ধবন্দি হিসাবে আনীতদেরই নয়, মিতিলেনির সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষকেও প্রাণদণ্ড দিতে হবে। নারী আর শিশুদের করতে হবে দাস। এই দণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্যে একদল দূত তৎক্ষণাৎ নৌপথে মিথিলেনি যাত্রা করেন। কিন্তু পরদিন এথেনি নাগরিকদের একাংশ বিষয়টি পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব তোলে। কারণ দায়ী-নির্দায়ী নির্বিশেষে একটি রাষ্ট্রের সকল মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার এই সিদ্ধান্ত অনেকের কাছে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর মনে

হয়। পরদিনের এই বিতর্কে অংশ নেন কট্টরপন্থী সেনাপতি ক্লেয়ন (ইব্‌নে ক্লেয়েনেতুস) এবং নরমপন্থী পক্ষে দিওদোতুস (ইবনে ইউক্রাতেস)। শেষমেষ ভোটাভুটিতে গণমৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিল হয়। অনেক মিতিলেনির প্রাণ বাঁচে। (থুকিদিদিস ১৯৯৪: খণ্ড ৩, রুকু ৪৯) তবে প্রায় একহাজার বন্দির প্রাণদণ্ড কার্যকর হয় এবং দেশটি পুরোপুরি এথেন্সের উপনিবেশে পরিণত হয়।

মিতিলেনির সকল সাবালক পুরুষ নাগরিকের প্রাণদণ্ড কেন দেয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে সেনানায়ক ক্লেয়ন এথেন্সের জাতীয় পরিষদে যে-বক্তৃতা দেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায়ও দেয়া সম্ভব। শুধু মিতিলেনি শব্দটি কেটে তার জায়গায় আফগানিস্তান বা অন্য যে দেশের নাম ইচ্ছে হয় দিতে পারেন।

ক্লেয়ন বলেন: "যারা আমাদের সাম্রাজ্যের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কিংবা দুশমনদের উস্কানিতে মুগ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের না হয় আমরা ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু যারা সুরক্ষিত দুর্গসহ একটি দ্বীপে বসবাস করে আসছে, সমুদ্রপথ ছাড়া যাদের ওপর আমাদের শত্রুরা হামলা করতে পারে না, যাদের নিজস্ব নৌযুদ্ধযান মজুত আছে, যারা স্বাধীন এবং আপনাদের চোখে সম্মানের পাত্র ছিল– তারা যদি এমন কাজ করে তবে তাকে বিদ্রোহ বলা সত্যের অপলাপ। কারণ বিদ্রোহ বলতে অত্যাচারের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এদের কাজটিকে সজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আগ্রাসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এরা আমাদের শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে আমাদের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করেছে। তারা নিজেরা ক্ষমতাধর হওয়ার চেষ্টা করলে যে-অন্যায় হতো এ-অন্যায় তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। তাদের যে প্রতিবেশীরা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, তা থেকে তারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। নিজেদের ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা ঝুঁকি নিতে পিছপা হয়নি।"

ক্লেয়ন দাবী করলেন এদের এখন 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' দিতে হবে। পরিষদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: "অভিজাতদের শাস্তি দিয়ে সাধারণ নাগরিকেদের মাফ করবেন না। তারা সকলেই নির্বিচারে আপনাদের ওপর হামলা চালিয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তারা তো আমাদের পক্ষে যোগ দিয়ে, এতদিনে নিজেদের দেশের মালিক হতে পারত। কই তারা তো তা করেনি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে, অভিজাতদের পেছনে কাতার বেঁধেছে।" ক্লেয়নের এই যুক্তিকে একালের দার্শনিকরা বলবেন, 'জাতীয় অপরাধের যুক্তি'।

ক্লেয়নের অপর যুক্তি অপরাধ অনুসারে সাজা দিতে হবে। যদি না দিই তো সমূহ বিপদ। তিনি বললন: "ভেবে দেখুন। যে মিত্র শত্রুর চাপে বাধ্য হয়ে বিদ্রোহ করল এবং যে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় বিদ্রোহ করল– উভয়কেই যদি একই শাস্তি দেন তো ভাবতে পারেন!– সামান্যতম ছুঁতো পেলেই কে না বিদ্রোহে এগিয়ে আসবে! যেখানে সাফল্যের পুরস্কার স্বাধীনতা আর ব্যর্থতার শাস্তি তেমন ভয়ের কিছু নয়– সেখানে পরিস্থিতি কেমন হবে একবার ভেবে দেখুন না!"

ক্লেয়নের হিসাব মোতাবেক– "আমরা রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্রের বিদ্রোহ দমন করতে আমাদের পয়সা আর প্রাণ বাজি রাখব আর জিতলে পাব ধ্বংসপ্রাপ্ত এমন সব দেশ যা থেকে যুদ্ধের খরচটাও উঠে আসবে না। আর যদি ব্যর্থ হই তো– চিরস্থায়ী একটা শত্রু কামাই হবে। ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই শিকেয় তুলে আমাদের পুরনো মিত্রের সঙ্গে লড়ে লড়ে সময় কাটাতে হবে। (থুকিদিদিস ১৯৯৪: খণ্ড ৩, রুকু ৩৯)

ক্লেয়নের এই যুক্তিধারার বিরুদ্ধে যিনি পাল্টা যুক্তি পেশ করেন তিনি– দিয়োদোতুস– বললেন মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা যায় না। তার বক্তৃতার কিয়দংশ থুকিদিদিস এভাবে

পেশ করেন: "সে যাই হোক, আমি মিতিলেনির মামলায় পক্ষে বা বিপক্ষে সাফাই গাইতে আসিনি। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমাদের বিচার্য বিষয় ওদের অপরাধ নয়, আমাদের স্বার্থ। হাতে নগদ প্রমাণ পেলেও আমি ওদের প্রাণদণ্ড চাইবো না, যদি না তাতে আমাদের স্বার্থ সাধিত হয়। আর ওদের প্রশ্রয় দেয়ার পরামর্শ আমি দেব না, যদি না তাতে আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা পায়।" দিয়োদোতুস বললেন– "মনে রাখবেন আমাদের এই পরিষদ আদালতের কক্ষ নয়, আমাদের কাজ রাজনৈতিক। বিষয়টা ন্যায় বা অন্যায়ের নয়, বরং মিতিলেনিদের কিভাবে এথেন্সের কাজে লাগানো যায় তার।" (থুকিদিদিস ১৯৯৪: খণ্ড ৩, ৪৪)

৩

পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধ মোট সাতাশ বছর জারি ছিল। শুরু হয়েছিল হযরত ঈসার ৪৩১ বছর আগে, শেষ হয় ৪০৪ বছরে। মাঝখানে সাত বছরের একটা বিরতির হিসাবও এর ভেতর আছে। এই যুদ্ধের শেষ ফলাফল বাংলাদেশের জ্ঞানী পাঠক জানেন। এই যুদ্ধে যবন জাতির গৌরব এথেন্সের পতন ঘটে। তার সাম্রাজ্য নষ্ট হয়। যুদ্ধের শেষটা কী হয়েছিল সেকথা অবশ্য লিখে যাবার সময় থুকিদিদিস পান নি। কিন্তু এই হত লঙ্কার বিস্তর ইঙ্গিত তিনি তার বইয়ে দিয়েছেন। এর পেছনে মিতিলেনির মতো একটি হত রাষ্ট্রের কী ভূমিকা! রাজনীতি বা যুদ্ধনীতির মাপে হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু নীতিরাজ বা নীতিযুদ্ধের বিচারে এই ভূমিকা বিরাট।

সেবার– পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে– কপালগুণে মিতিলেনির বাদবাকি লোকজন প্রাণে রক্ষা পায়। মার্কিন দার্শনিক ওয়ালজার মনে করেন– এই কপালের জোর নিছক ভাগ্য নয়। এর পেছনে কারণ এথেন্সের গণতন্ত্র। প্রথমদিন অভিজাত-সাধারণ, বিদ্রোহী-শান্তিবাদী নির্বিশেষে সবাইকে প্রাণদণ্ড আর নারী ও শিশুদের দাসত্বদণ্ড বিধান করায় যারা ব্যথিত হয়েছিলেন তারা গণতান্ত্রিক এথেন্সের নীতিবাদী নাগরিক। এদের যুক্তির জোরেই মিতিলেনির প্রাণ রক্ষা পায়। (ওয়ালজার ১৯৯২: ১১) ওয়ালজার সাহেবের মতে, বিদ্রোহীকে শাস্তি দেয়া নিষ্ঠুরতা নয়, সেটা ন্যায়সঙ্গত। শুধু নির্বিচারে মানুষ মারাই নিষ্ঠুরতা। ক্লেয়ন সেই নিষ্ঠুরতার সাক্ষাত প্রতিমূর্তি। ওদিকে ক্লেয়নের বিরোধী দলের নেতা দিয়োদোতুসও নীতির দোহাই দিয়ে নয়, এথেন্সের স্বার্থের খাতিরে– স্বার্থ কা ওয়াস্তে– মিতেলেনির প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন। তাহলে নীতি কোথায়? আমরা কি এই কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য যে, এই ভূ-মণ্ডলে নীতি বলতে কিছু নেই? কেবলই স্বার্থ আছে অখিল ভুবনে, কিছু আর নেই?

যদি নাই থাকে নীতির বালাই– তো এত নীতিকথা কেন? আমেরিকা তো ইচ্ছা হয় বলতেই পারে, আমরা ক্ষমতাবান, তোমরা ক্ষমতাহীন– আমাদের আজ্ঞা পালনই তোমাদের কর্তব্য। তা না বলে আমেরিকা কেন বলে– ন্যায় আমাদের পক্ষে? বাঘ কেন ভেড়ার বাচ্চাকে বলে– "তুমি আমার পানি আউলা করছ?" বেকুব ভেড়ার বাচ্চা যদি বলে– "কই হুজুর, আমি কি কইরা আপনের পানি আউলা করুম, আমি তো এই দিকে নিচে খাড়াইয়া আছি?"– বাঘ মহাশয় কি শুনতে বাধ্য? আমাদের প্রশ্ন– বাঘেরও কেন একটা যুক্তি দরকার? সম্ভবত লা ফঁতেন নামক এক কবির পাল্লায় না পড়লে বাঘকেও এ দর্শন প্রচার করতে হতো না। (লা ফঁতেন ১৯৭৯: ১১) ক্লেয়নও করেননি। তিনি তার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় পরিষ্কার বলেন: "আমি এর আগেও বহুবার বলেছি কোনো দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু রেখে সাম্রাজ্য রাখা যায় না। মিতিলেনির বিষয়ে আপনারা এই যে দোমনা হচ্ছেন তা দেখে আমার এ-বক্তব্য আরও বলবান হলো।" (থুকিদিদিস ১৯৯৪: তৃতীয় খণ্ড, রুকু ৩৭) আমেরিকায় গণতন্ত্র আছে। কিন্তু সে গণতন্ত্র রাজার নতুন জামার মতো। খালি চোখে দেখা যায় না।

আফগানিস্তানে আমেরিকার নিষ্ঠুরতাকে অনেকের মনে হবে ন্যায় বিচার। সন্ত্রাস দমনের

অপরিহার্য আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি। আবার অন্য অনেকের মনে হবে এই সন্ত্রাসের সত্য কারণ আমেরিকার সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যটা কেটে বাদ দিলে আফগান আর আমেরিকান জনগণের কোন বিবাদ নেই। সাম্রাজ্য আছে। তাই যুদ্ধ আছে। কারো কাছে এই যুদ্ধ স্বাভাবিক, সুতরাং সঙ্গত। আর কারো কাছে এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যের ফল, অতএব নিষ্ঠুর।

আমেরিকার হাত থেকে আফগানিস্তান কি রেহাই পাবে? কিভাবে পাবে? হয় খোদ আমেরিকার নীতি বদলালে, নয় আফগান সরকারের পতন ঘটলে। আমেরিকার নীতি দুই, চার, দশ বছরে বদলানোর সম্ভাবনা যখন নেই– তখন ধরে নেয়া যায় আফগানিস্তানে সরকার বদলাবে। কিন্তু মার্কিন নিষ্ঠুরতার কি অবসান ঘটবে তাতে? ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণের বিলাসিতায় যদি আরও একটু গা ভাসানোর অনুমতি পাই তো বলি, পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ষোল নম্বর বছরে আরেক ক্ষুদ্র রাজ্য মেলোসের কপালে কি ঘটেছিল তার বিবরণ পড়া যায়। কিন্তু আমার আর লেখার সুযোগ নেই এখানে। সংক্ষেপে লিখি: মেলোস দ্বীপের সকল মনুষ্য হয় নিহত, না হয় দাস হয়েছিল। তবুও এথেন্সের সাম্রাজ্য রক্ষা পায়নি। এর গভীর কারণ থুকিদিদিস আলোচনা করেছেন।

জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস– সমকালীন বোদলেয়ারের কাছাকাছি সময় লিখেছিলেন, মনুষ্য জাতির ইতিহাসের ঘটনা একবারই মাত্র ঘটে না, বারবারই ঘটে। তবে তার মতে, প্রথমবার যদি ঘটে বিধির বিধান বা ট্রাজেডি আকারে, দোসরাবার ঘটে প্রহসন বা হাসির খোরাক হিসাবে। (মার্কস ১৯৭৯: ১২) মার্কস মন্তব্য করছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম ভাঙিয়ে তার ভাতিজার ক্ষমতা দখলের পর।

এথেন্স সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল বিধির বিধান অনুসারে। তবে কি মার্কিন সাম্রাজ্য নষ্ট হবে প্রহসনে? মার্কিন সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ আছে। খুব সম্ভবত আফগানিস্তান তার শেষ অপরাধ নয়। আরও আছে। প্রবন্ধান্তরে আমরা তার বিচার করব। আমিন। অতএব আমিন।

দোহাই

১. Charles Baudelaire, Flowers of Evils and their works, W. Fowlie ed. New York, 1964.

২. S.B. Fay, The Origins of the world war, Second ed., reprint, New Delhi: 1975

৩. M.I. Finley, Aspect of Antiquity: Discovaries and Controversis, Harmondsworth, U.K: 1977.

৪. La Fontaine, Selected Fables, J. Michie Tr. Harmondsworth, U.K: 1979.

৫. Richard Schlatter, (ed) Hobbes Thucydides: History of the Peleponnesian war, New Brunswick, N.J. 1975.

৬. Thucydides: History of the Peleponnesian war, R. Crawley Tr. in M.J. Adlar ed. great Books of the western world, Vol. 5, Chicago: 1994.

৭. Michael Walter, Just and Unjust wars 2nd ed. New York: 1992.

৮. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, কিতাবুল মোকাদ্দস, ঢাকা: ২০০০।

৯. কার্ল মার্কস, "লুই বোনাপার্টের আঠারই ব্রুমেয়ার" কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী বার খণ্ডে, খণ্ড ৪, মস্কো ১৯৭৯।

সলিমুল্লাহ খান

শুভ ও অশুভ নয়, প্রভু ও ভৃত্য

অথবা আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের আগাম ফলাফল

বাংলাদেশে যে অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বর্তমান দুনিয়াদারিতে ইঙ্গমার্কিন বড়লোক প্রভুর সাম্রাজ্য বিস্তারাকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার জোগান দিয়ে চলেছেন সলিমুল্লাহ খান তাঁদের একেবারে সামনের কাতারে সদাহাজির। বিশ্ববাণিজ্যবিধ্বংসী বিশ্বপরিস্থিতির সাথে যতটা আন্তরিকতা ও সততা বিস্তার করে যেভাবে বোঝাপড়া করলেন তা শেখার মতো। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিশ্লেষণী লেখা তিনি পেশ করেছেন পাঠকের প্রকাশ্য দরবারে। তাঁর লেখা থেকে আমরা চলমান বিশ্বজোড়া যুদ্ধকে বুঝতে শিখেছি। এই যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে আমরা সম্ভবত তার সব কটাই (সোজা বাংলায় ৪টা) **মানুষ** এর এই সংখ্যায় ছেপেছি।

এই লেখাটা নেয়া হয়েছে দৈনিক 'প্রথম আলো'র ৫ই অক্টোবর ২০০১ তারিখের সংখ্যা থেকে। শুভ-অশুভের ভুয়া দ্বিবিভাজনের যে-প্রচারণা পশ্চিমা মিডিয়া এবার চালালো তাতে আমাদের দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মীদের অনেককেই বিভ্রান্ত হতে দেখা গেছে। সলিমুল্লাহ খানের এই লেখা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করেছে এই সত্য যে, যুদ্ধটা আসলে মানুষের সাথে সাম্রাজ্যের, মানুষের স্বাধীনতা বনাম পুঁজির স্বাধীনতার।

জনসাধারণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না হলেও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আইনের বিধান অনুসারে গঠিত। তাই জাতির নিয়তি কাঁপানো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে এই সরকারেরও উচিত ছিল জনসাধারণের মত কী যাচাই করে দেখার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা। আফগানিস্তান বা অনির্দিষ্ট অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ দেশের জল, স্থল ও নভোমণ্ডল ব্যবহারে অনুমতি দান এমনই এক নিয়তি কাঁপানো সিদ্ধান্ত। আমাদের সরকার নজিরবিহীন দ্রুততার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধজোটে যোগদানের এই সিদ্ধান্ত সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমাদের আশঙ্কা, সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটায় নাই। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত থেকেই – ইতিহাসে দেখা যায় – অনেক দেশের সরকার জনসাধারণের সমর্থন বা বৈধতা হারাতে বাধ্য হন। তো কেন এই ঝুঁকি? সরকার নৈতিক অবস্থানের দোহাই দিয়েছেন।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

আমাদের বক্তব্য, এই দোহাই সৎ নয়।

সারা দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষও ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ব্যথিত। কিন্তু এই ঘটনার একমাত্র পরিণতি যুদ্ধ– এই সিদ্ধান্ত পৃথিবীরও নয়, বাংলাদেশের জনগণেরও নয়। যত ন্যূনতম পন্থায়ই হোক, আমাদের দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজোটে জড়িত করার আগে দেশের মানুষের সেন্টিমেন্ট কী ভেবে দেখা উচিত ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সরকার ও সরকারের অনুমোদক রাজনৈতিক (প্রধান) দলগুলি তা করেন নাই। এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। কারণ আমরা মনে করি– এ বিষয়ে জনমত সরকারি মতের অনুসারী নয়। শঙ্কার অন্য কারণও আছে। যুদ্ধ 'দীর্ঘস্থায়ী' হলে সাধারণের মধ্যে বিরাজমান ভিন্নমতই প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেবে। দেশের দায়িত্বশীল বুদ্ধিমানদের উচিত এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করা। অন্ধ হলেই কিন্তু প্রলয় বন্ধ হবে না। জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিপন্ন করার অধিকার শুধু তত্ত্বাবধায়ক কেন, কোনো সরকারেরই নাই।

১.

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্ যুদ্ধের সঙ্গে খারাপ আবহাওয়ার একটা তুলনা কেটেছিলেন। হব্‌স্ বলেছিলেন, যুদ্ধ মানে মাত্র ঘটনা নয়, আবহাওয়া। 'সময়' যুদ্ধে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। হব্‌সের উপমা অনুসারে, এক পশলা বৃষ্টি হলেই আবহাওয়া খারাপ হয় না। যেদিন থেকে আকাশে মেঘ জমতে থাকে, হাওয়া দম মেরে যায় সেদিন থেকেই আবহাওয়া খারাপ হলো বলা যায়। যুদ্ধও তেমনই। যখন দুই বিবদমান পক্ষের উভয়কে ঠাণ্ডা করার মতো কোনো মধ্যস্থ শক্তির অস্তিত্ব থাকে না তখনই বলা যায় যুদ্ধ শুরু হলো। দার্শনিকের ভাষায়: 'শুধু খণ্ড খণ্ড লড়াই বা সংঘাতকেই যুদ্ধ গণ্য করা হয় না। যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসার ইচ্ছাটা যখন থেকে পরিষ্কার ব্যক্ত হয়– সময়ের সেই পরিসরের সবটুকুকেই যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া যায়। যুদ্ধের সংজ্ঞার মধ্যেই এই 'সময়' বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত।' (হব্‌স ১৬৫১ : ৮৮) এই সংজ্ঞা অনুসারে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করেই দিয়েছে। এখন আমরা শুধু অধীর হতে পারি– এর শেষ কোথায়? ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার মতো ঘটনায় 'মানুষ' আদিম অনুভূতি ও আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। এটাই 'স্বাভাবিক'। কিন্তু অনুভূতির আগুনে যুদ্ধের আহুতি না দিয়ে শুভবুদ্ধির পতাকা ওড়াতে থাকাই তো সত্যের পরীক্ষা।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যুদ্ধমুখী নীতি শুভবুদ্ধির পতাকা মাটিতে নামানোর তেমন আর বাকি রাখে নাই। অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদ মার্কিন সরকারের বর্তমান নীতিকে মার্কিন মহাকবি হেরমান মেলভিলের 'মবি ডিক' গদ্যকাব্যের নায়ক তিমি মাছের বিরুদ্ধে প্রতিনায়ক ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধপরায়ণতার তুলনা বলে উল্লেখ করেছেন (সাঈদ ২০০১)। আমরাও এ তুলনা যথার্থ মনে করি। সেই সঙ্গে আমরা এইটুকু যোগ করতেও ভুলি না, মবি ডিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আহাব জয়ী হন নাই। শুধু তাঁর নিজেরই নয়, তিমি শিকারী দলসুদ্ধ 'পেকুড' জাহাজেরও সাগর সমাধি হয়েছিল।

সারা পৃথিবীতে তিমি এখন একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। এই ফলাফল নিশ্চয় অকারণ নয়। বিশেষত, উনিশ শতকে তিমি শিকারের ব্যবসা ছিল খুবই বাড়ন্ত। মার্কিন দেশের উত্তর-পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন শিকার কেন্দ্রের একটি– নান্টাকেট– থেকে ক্যাপ্টেন আহাবের জাহাজও তিমি শিকারে বেরুত। তিমি তেল দিয়ে সভ্যতার প্রদীপ জ্বলত। এই ছিল প্রধান আকর্ষণ। এরকম

এক অভিযানে 'মবি ডিক' নামে পরিচিত এক সাদা স্পার্ম তিমির কামড় খেয়ে একটি পা হারান ক্যাপ্টেন আহাব। তারপর থেকে প্রতিশোধের নেশায় তিনি 'পাগল' হয়ে যান। আহাবেরই আপন জবানিতে শুনি:'আই অ্যাম ডেমোনিয়াক, আই অ্যাম ম্যাডনেস ম্যাডেন্ড' অথবা 'আমি শুধু পাগল নই, আমি দানব, আমি উন্মত্ত প্রমত্ততা।' (মেলভিল ১৮৫১: ১৭১)

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই অশুভ শক্তি তিমি মাছের পেছনে তিনি দুনিয়ার তাবৎ জলসীমার মধ্যে ঘুরতে থাকেন। প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে তার বুকে। শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের এক দূর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে মবি ডিকের সঙ্গে মোলাকাত হয় ক্যাপ্টেন আহাবের। পর পর তিনদিন আক্রমণ করেও তিনি বধ করতে ব্যর্থ হন মবি ডিককে। আক্রমণের তৃতীয় ও শেষ দিনে পলায়নরত তিমির গায়ে হার্পুন গেঁথে দিতে সক্ষম হন আহাব। সে-আক্রমণ ছিল আহাবের জন্যেও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু আহাব কোনো যুক্তি মানবেন না। তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান তিমি বধ, প্রতিশোধ। শেষ মুহূর্তের একটু আগে, আহাবের দলসঙ্গী অফিসার স্টারবাক তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন– 'ফিরে আসুন'। স্টারবাকের যুক্তি– 'মবি ডিক নিজের প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে, সে তো আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে না, পাগলপারা আপনিই তাকে অতিষ্ঠ করছেন।' (মেলভিল ১৮৫১ : ৫৭৭) কিন্তু– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই বলা চলে– যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে।

মবি ডিক শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ায়। আক্রমণ করে জাহাজ। এই দৈত্যাকার শাদা তিমির মাথার আঘাতে 'পেকুড' জাহাজ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয় ধীরে ধীরে। 'পাঁচ হাজার বছর আগে যেরকম সমুদ্রের বিশাল ফেনা গড়িয়ে গড়িয়ে যেত তেমনি গড়িয়ে যেতে শুরু করে।' (মেলভিল ১৮৫১ : ৫৮২)

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে পরিচিত হারমান মেলভিল এ কাহিনী প্রকাশ করেন ১৮৫১ ইংরেজি সালে। তখন তখনই বুদ্ধিমান সমালোচকরা ধরতে পেরেছিলেন মবি ডিকের গল্প যেমন তিমি শিকারের একটা বাস্তব আখ্যান তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ধিষ্ণু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীকী কাহিনীও। যুক্তরাষ্ট্র তখন স্পেনের কলোনি ফ্লোরিডা আর মেহিকোর খণ্ড টেক্সাস অঞ্চল কেড়ে নিয়েছে। ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধপরায়ণতা শেষ পর্যন্ত নিজের এবং নিজের জাহাজেরই ধ্বংস ডেকে আনে। মেলভিল এই সাবধানবাণী নিজের দেশবাসীর গোচরে আনার জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন।

২.

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন আহাব পৃথিবীকে যে চোখে দেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আজও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃশ্রেণী পৃথিবীকে সেই চোখেই দেখছেন। আহাব দুনিয়ার সব বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। একভাগে কালো, অন্ধকার, মন্দ– এক কথায় 'অশুভ'। অন্যভাগে শাদা, আলো, ভালো– এক কথায় শুভ। আহাবের বিচারে সমুদ্রের তিমি সেই অশুভের আর তিনি নিজে শুভের মূর্তি। অন্তর্দ্রষ্টা মেলভিল তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন নাই। মেলভিল দেখিয়েছেন, বেচারা তিমির নামে – হিংস্রতা ও মৃত্যুপরায়ণতার– যে বদনাম আহাব সাহেব করেছেন আসলে তার বেশির ভাগ আহাবের নিজেরই গুণ। জীবন – মেলভিলের চোখে – অতখানি বিশুদ্ধ শাদা-কালোয় বা শুভ-অশুভে বিভাজনযোগ্য নয়। হিংসা ও প্রতিশোধ আহাবের – মানুষের – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূষণ। আহাব সেই ভূষণ সমুদ্রের তিমির গায়ে চড়িয়ে

প্রসাদ লাভ করেছেন। তার একটা পা কর্তন করার অপরাধ মবি ডিক করেছে– এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আহাবের পক্ষেও এই কথা ভাবা সম্ভব হয় নাই যে, এ-পদ কর্তন ব্যাপারটি ঘটানোর জন্য মবি ডিক ডাঙায় উঠে আসে নি। আহাবই তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করার জন্য মাঝ সমুদ্রে হার্পুন হাতে ছুটে গিয়েছিলেন।

আহাবের শিকারী জাহাজ ডোবার কথা আমরা জেনেছি মেলভিলের মুখপাত্র ইসমাইলের মুখে। ওই জাহাজডুবির একমাত্র সাক্ষী, একমাত্র জীবিত নাবিক, এই ইসমাইল। মবি ডিকের ভাগ্যে এর পর কী ঘটেছিল সে-কাহিনী আর আমাদের জানার সুযোগ হয় নাই। সামুদ্রিক তিমির কোনো কোনো প্রজাতি আজ যে বিলুপ্তপ্রায় সে-ঘটনাই গল্পে অকথিত অংশ বলে দিচ্ছে। সব গল্পই কখনো না কখনো শেষ হয়।

আহাব তাঁর খালাসীদের বোঝানোর কোশেশ করেছিলেন– মবি ডিকের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অশুভের বিরুদ্ধে শুভের লড়াই। মেলভিল দেখিয়েছেন খোদ আহাবই অশুভের প্রতিমূর্তি। আজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও আর আর নেতা তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধর্মীয় পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। 'অশুভ' ও 'ক্রুসেড' শব্দ দুটি খুব ঘন ঘন প্রচার করা হচ্ছে। মেলভিলের সন্দেহই কি তা হলে সঠিক? এ-অশুভ কি যুক্তরাষ্ট্রেরই অভ্যন্তরীণ অশান্তির অপর নাম? হয়তো তাই।

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বলছে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ সেরকম 'অশুভের বিরুদ্ধে শুভের যুদ্ধ' যদি না হয় তো আমাদের সরকার কি তাঁর জাতীয় স্বাধীনতা সমর্পণের নীতি পরিবর্তন করবেন? আমাদের সামনে এই প্রশ্নটা এখন উত্তরের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে।

সন্ত্রাস ও যুদ্ধ দুটোই রাজনীতির বর্ধিত সংস্করণ। রাজনীতির প্রশ্নকে শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতির আলোকেই বিচার করতে হবে। আমরা – সারা পৃথিবীজুড়ে – আজ যে-রাজনীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি সে-রাজনীতি শুভ ও অশুভের নয়। এ-যুদ্ধ খ্রিস্টান পাশ্চাত্য আর ইসলামি প্রাচ্যের নয়। এ-রাজনীতি শেষ বিচারে প্রভু ও ভৃত্যের। পৃথিবী যে এখন আরো বেশি করে প্রভু ও ভৃত্যে বিভক্ত সে-সত্য চাপা দিয়ে আমরা সন্ত্রাসের ব্যাকরণ বা যুদ্ধের অভিধান কোনোটাই পড়তে পারব না। আরো যুদ্ধ, আরো মৃত্যু, আরো হত্যার পরও রাজনীতি থাকবে।

মনুষ্য সমাজে প্রভু ও ভৃত্যের, দাসমালিক ও দাসের উদ্ভব হলো কী করে? মানুষ ঠিক যেভাবে তিমি শিকার করে ঠিক সেভাবে দাস শিকার করে না। বনের পশুকে গৃহস্থ মানুষ যেভাবে পোষ মানায়, মানুষ মানুষকে ঠিক সেভাবে পোষ মানায় নাই। দুজন মানুষের মধ্যে লড়াই বাধল। ধরা যাক, একজন আত্মসমর্পণ করল। দাস হলো। অন্যজন প্রভু হলো। কিন্তু এতে প্রভুর মনে শান্তি আসে না। যখন একজন মানুষ আত্মসমর্পণ করে, 'স্বাধীনতা' বিসর্জন দিয়ে শুধু 'প্রাণ' বাঁচায় তখন সে আর 'মানুষ' থাকে না। সেই অমানুষের স্বীকৃতি – দাসত্ব স্বীকার করা মানুষের – প্রভুর মনতুষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়। কারণ সে প্রভুর সমান নয়। সমানের স্বীকৃতিই শুধু গণনার যোগ্য।

দাসের কাছে তাহলে কী চায় প্রভু? চায় কাজ। কাজের মধ্য দিয়ে আবার দাসও আপনকার হারানো মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইতিহাস এই অর্থে দাসেরই সৃষ্টি। কিন্তু এই ইতিহাসের ওপর তার মালিকানা নাই। নিজেও সে মানুষ এই প্রমাণ দেওয়ার জন্য তাকে বিদ্রোহ করতে হয়। বিদ্রোহ মানে 'হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু'। কথিত আছে দার্শনিক মহাত্মা হেগেল বলেছিলেন, একমাত্র মানুষই আত্মহত্যার ঝুঁকি নিতে পারে এবং তখনই তার দাসত্বের অবসান ঘটে। তখনই সে 'মানুষ' হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনার পূর্বশর্তস্বরূপ এই সত্যটি হজম করা দরকার।

৩.

মানুষ এক ধরনের পশু। তবে অন্য পশুর সঙ্গে মানুষের এক ভেদ নির্দেশ করেছিলেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তার মতে, মানুষ 'রাষ্ট্রায়ত্ত পশু'। রাষ্ট্র গড়ে তোলা মানুষের স্বভাব। দার্শনিক হব্‌স্‌ এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে, মানুষ রাষ্ট্র গড়ে স্বভাবের কারণে নয়, ঠেলায় পড়ে। কী সেই ঠেলা? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বভাবের জগতে বাস করে, ততক্ষণে মানুষ যুদ্ধাবস্থায় থাকে। এ-যুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে সবার। স্বভাবের জগৎ নয়, শান্তির অভাবই মানুষের 'রাষ্ট্র সমাজ' গড়ার আসল কারণ। যুদ্ধ মানেই তাই সভ্যতার পরাজয়, স্বভাবের জয়। মানুষ স্বভাবে প্রভুও নয়, দাসও নয়– নিতান্ত পশু। যুদ্ধে মানুষ পশু পরিচয়েই ফিরে যায়। চিরকাল পশু থাকা তার পক্ষে অসম্ভবও। তাই সে সমাজ গড়ে। শান্তির কথা বলে।

হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান নয় তেমনি সমাজের সব মানুষও সমান নয়। পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘোরে এ কথা যেমন সত্য, উপরের কথাটিও তেমনই সত্য মাত্র। এর বেশি নয়। হব্‌স্‌ বলেছিলেন অন্য কথা। তাঁর মতে, মানুষ মাত্রেই সমান। কারণ পৃথিবীর দুর্বলতম মানুষটিও হয় কৌশলে বা সমানমনা অন্যদের সহায়তায় সফলতম মানুষটিকে হত্যা করতে পারে। (হব্‌স্‌ ১৬৫১ : ৮৭) হব্‌সের মতে, মানুষে মানুষে সমতার দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। প্রত্যেক মানুষই মনে করে সে আর সকলের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ। আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান, বেশি বুদ্ধিমান, বেশি বাকপটু লোক আছে, এ-কথা স্বীকার করি। কিন্তু আমার যে ন্যায়-অন্যায় বোধ, শুভ-অশুভ বিচার তা অন্যের চেয়ে উত্তম– এই ধারণা প্রায় সব মানুষেরই। নিজেকে বড় করে দেখার এই প্রবণতা – এই নৈতিক অহঙ্কার – যখন সবারই সমান তখন, হব্‌স্‌ সিদ্ধান্ত করেন, মানুষ মাত্রেই সমান। (হব্‌স্‌ ১৬৫১ : ৮৭)

মানুষ তিমি নয়। কিন্তু কোনো কোনো তিমি মানুষের মতো রুখে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এই পড়না পড়বেন কিনা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের পড়না হওয়া উচিত এই বাক্য: আসন্ন আমেরিকার যুদ্ধে আফগানিস্তানের অবস্থান অশুভের দলে নয়, ভৃত্যের কাতারে।

উল্লেখ

Thomas Hobbes, Leviathan, Richard Tuck ed., Cambridge : Cambridge University Press, 1996. (Frist Published 1651)
Herman Melville, Moby Dick, Tony Tenner ed., Oxford : Oxford Unieversity Press, 1988. (First Published 1851)
এডওয়ার্ড সাঈদ, 'অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ', *প্রথম আলো*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১

তারিক আলী

সামরিক নয়– রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য

এই লেখাটা *প্রথম আলো* (শুক্রবার ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০১) ইন্টারনেট থেকে নিয়ে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে ছেপেছিল। কিন্তু অনুবাদকারীর নাম দেয়া ছিল না। বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস হবার মাত্র কদিন পরই তারিক আলী এই লেখাটা লিখেছিলেন। বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র-পরবর্তী বিশ্বপরিস্থিতি বুঝতে লেখাটা সাহায্য করে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-উন্মত্ততা এবং তার অসারতা এই লেখা থেকে বোঝা যায়।

কয়েক বছর আগে পাকিস্তান সফরের সময় সেনাবাহিনীর একজন সাবেক জেনারেলের সঙ্গে এলাকার জঙ্গি ইসলামি গ্রুপগুলোর ব্যাপারে কথা বলছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্নায়ুযুদ্ধের পুরোটা সময় এ-ধরনের গ্রুপগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আনন্দের সঙ্গে অর্থ ও অস্ত্র নিলেও রাতারাতি এত চরমভাবে মার্কিনবিরোধী হয়ে গেল কেন? জেনারেল মহোদয় আমাকে জানালেন, কেবল তারা নয়, সেই ১৯৫১ সাল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মার্কিনিদের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু পরে ওয়াশিংটনের উদাসীনতায় তারা নিজেদের অপমানিত মনে করেছে।

সাবেক জেনারেল বাঁকা মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, আফগাস্তিানে ঢোকার জন্য আমেরিকানদের পাকিস্তান নামক কনডমটির প্রয়োজন হয়েছিল, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যটি পূরণ করে দিয়েছিল। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছে, ব্যবহৃত কনডমটিকে টয়লেটে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিলেই তো হয়ে যায়।

পুরনো কনডমটিকে এখন খুঁজে নিয়ে আবার ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা কি কোন কাজে আসবে? নতুন 'সন্ত্রাসবাদবিরোধী কোয়ালিশন'–এর দরকার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্য। কিন্তু জেনারেল মোশারফকে এ-ব্যাপারে খুবই সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলতে হবে। ওয়াশিংটনের প্রতি কোনো অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি দিলে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে এবং এ-দেশটির সশস্ত্রবাহিনীও বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। গত দুই দশকে সেখানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আর ইতিহাসের পরিহাসের কলেবর বৃদ্ধিও অব্যাহত রয়েছে।

পাকিস্তানে ইসলামপন্থীরা জনগণের সমর্থন নিয়ে নয়, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তি অর্জন করেছে। দেশটিতে ধর্মীয়

মৌলবাদের উত্থান হয়েছে সাবেক সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হকের আমলে। ওই সময় ওয়াশিংটন ও লন্ডন এ-স্বৈরশাসককে দীর্ঘ ১১টি বছর জোর সমর্থন দিয়ে গেছে। জিয়াউল হকের শাসনামলেই (১৯৭৭-৮৯) দেশজুড়ে সৌদি অর্থ সাহায্যে মাদ্রাসার একটি বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়।

পাকিস্তানের যে-তরুণ ও কিশোরদের মুজাহেদিন হিসেবে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছিল তাদের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব নির্বাসন দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, শাস্ত্রোক্ত বিষয়ই একমাত্র সত্য। ইমামের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। মাদ্রাসাগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইসলামের নামে শেকড়হীন কিছু গোঁড়া লোক সৃষ্টি করা। মাদ্রাসার উর্দু বর্ণপরিচয়ে অক্ষর 'জিম'–এর জন্য 'জেহাদ', 'তে'–এর জন্য 'তোপ' (কামান), 'কাফ'–এর জন্য 'কালাশনিকভ' এবং 'খে'–এর জন্য 'খুন' (রক্ত) এর পাঠ দেওয়া হয়েছে।

আড়াই হাজার মাদ্রাসায় সোয়া ২ লাখ তরুণ ও যুবককে অন্ধ গোঁড়া হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশে। তারা এখন হত্যা করতে কিংবা নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যাদের প্রকৃত মুসলমান নয় বলা হবে ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ছুটে যাবে। তালেবান নামে পরিচিত এই উগ্র জঙ্গি গ্রুপ সৌদি আরবের শাসকদের মতো ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারী। আফগান মোল্লাদের এ-কট্টরপন্থার নিন্দা করেছেন কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্নী আলেম ও ইরানের কোম নগরীর শিয়া আলেমরা।

কেবল ধর্মীয় অনুভূতির জিগির তুলে তালেবানরা কাবুল দখল করতে পারত না। প্যাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্র ও 'স্বেচ্ছাসেবক' দিয়ে সাহায্য করেছে। ইসলামবাদ সিদ্ধান্ত নিলেই কোনোরকম বড় ধরনের সমস্যা ছাড়াই তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। কাবুলে তালেবানদের ক্ষমতা দখলই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একমাত্র বিজয়। তাই বুঝি আজ সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিগনিউ ব্রেঝিনস্কিও অসন্তুষ্টচিত্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও মধ্য ইউরোপের মুক্তি, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান কিম্বা কিছু মুসলিম গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে সৃষ্ট তালেবানের উদ্ভবের মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন রাখছেন।

যদি যুক্তরাষ্ট্রের এ-নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে হলিউডি ছবির কায়দায় একটি সংক্ষিপ্ত ও তীব্র যুদ্ধ চালাতে হয় তাহলে ওয়াশিংটনের উচিত এতে অংশ নিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর চাপ প্রয়োগ না করা। পাকিস্তান যদি এতে অংশ নেয় তাহলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। দেশটিতে একটি নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ প্রকৃতির গৃহযুদ্ধ যেমন দেখা দেবে তেমনি ব্যক্তিগত পর্যায়ের আরো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উৎসাহ পাবে। আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানে বাধা দিতে ইসলামাবাদ সব কিছুই করতে পারে। কারণ কাবুল ও বাগরামসহ আরো অনেক ঘাঁটিতে বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য, বৈমানিক ও সেনা কর্মকর্তা রয়েছে। ওই সময় কে তাদের নির্দেশক, তারা কার কথা মানবে? বৃহত্তর স্বার্থে ওসামা বিন লাদেনকে বলি দেওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় তার সাবেক নিয়োগকর্তা ওয়াশিংটনের হাতে হয়তো তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট হবে?

এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাধানই হচ্ছে একমাত্র প্রকৃত সমাধান, অসন্তোষ সৃষ্টিকারী সমস্ত কারণ দূর করাও প্রয়োজন। ক্ষোভই অন্ধ গোঁড়ামির পালে বাতাস যোগায়। মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য স্থানে ওয়াশিংটনের অনুসৃত নীতির জন্যই আজ এ-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমে সর্ববিদ্যাবিশারদ, কলামলেখক এবং মার্কিন সরকারের পরিষদবর্গ কূটতর্কের ক্ষেত্রেও যে অন্ধ গোঁড়ামি পোষণ করে থাকেন তার প্রতীকী উদাহরণ হচ্ছে ব্রিটেনের এক

সাবেক কূটনীতিক রবার্ট কুপারের সাম্প্রতিক এক মন্তব্য। কুপার এখন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্বও পালন করছেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই লিখেছেন:'দ্বৈত মানদণ্ডের (ডবল স্ট্যান্ডার্ড) ধারণাটির সঙ্গে আমাদের সহজ হয়ে উঠা দরকার'। উন্নাসিকতার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, আমরা আমাদের শত্রুদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেব। আর আমাদের বন্ধুদের তাদের কৃত অপরাধের জন্য পুরস্কৃত করব। তো এর চেয়ে সবাইকে সব অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিলেই কি ভালো হতো না? শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে মানসিকতা যদি এরকমই হয় তাহলে অপরাধ কখনো কমে না, বরং যারা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে আসে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা বাড়তে থাকে।

উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং বলকান যুদ্ধ হচ্ছে নির্বাচিত কিছু এলাকায় মার্কিনিদের স্বঘোষিত নৈতিক পুলিশি ভূমিকা পালনের কেতাবি উদাহরণ। জাতিসংঘ-প্রস্তাব অস্বীকার করে ইসরায়েল সব শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে, ভারত কাশ্মীরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারবে, রাশিয়া গ্রোজনি ধ্বংস করে দিতে পারেবে, কিন্তু শাস্তি পাবে কেবল ইরাক আর ফিলিস্তিনিদেরই সকল ভোগান্তির শিকার হতে হবে।

গোটা যুক্তরাষ্ট্র এখন উন্মত্তের মতো আচরণ করছে। দেশটির দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ঘটনাকে 'সভ্যতার' ওপর আঘাত বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যে সভ্যতা রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করে সেটা কোন ধরনের সভ্যতা? গত ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র তিনটি মহাদেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অনেক রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, অনেক দেশে ব্যাপক বোমা হামলা চালিয়েছে, জাপানের বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহার করেছে, কিন্তু হামলা ও ক্ষয়ক্ষতি হলে তার বেদনাটা কী কোনোদিন বোঝেনি। তবে এখন তা অনুভব করছে। ঘটনায় হতাহতদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা গভীর শোক ও সমবেদনা জানাই, যেমনটি বিভিন্ন দেশে মার্কিন হামলার শিকার হওয়াদের ব্যাপারে জানিয়েছিলাম। কিন্তু রুয়ান্ডা, যুগোস্লাভিয়া, কোরিয়া, জাপান কিংবা ফিলিস্তিনের একজন নাগরিকের জীবনের চেয়ে একজন মার্কিন নাগরিকের জীবনের মূল্য অনেক বেশি– এমন কথা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না।

অরুন্ধতী রায়

‘ইনফিনিট জাস্টিস’-এর বীজগণিত

তরজমা: জিকরুল ইসলাম

> এই লেখাটা *দি গার্ডিয়ান* পত্রিকায় ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে ছাপা হয়েছিল। এটা পরে আমাদের দেশের *প্রথম আলো* পত্রিকার ৫ই অক্টোবর ২০০১ তারিখের সাহিত্য সাময়িকীতে অনুবাদ করে ছাপানো হয়। পরে এটা সৈকত হাবিবের সম্পাদনায় *‘আক্রান্ত আমেরিকা বনাম লাদেন ও আফগান: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শঙ্কা’* নামক বইতে (কথাপ্রকাশ, ঢাকা, অক্টোবর ২০০১) প্রকাশিত হয়। এরও পরে অনুবাদটা ফের পাক্ষিক *চিন্তা*-র (বছর ১০, সংখ্যা ৯–১৩, ১৫ই ডিসেম্বর ২০০১/১লা পৌষ ১৪০৮) ‘ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম’ শীর্ষক সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তারপর রবীন আহসান কর্তৃক সম্পাদিত *যুদ্ধ ও যুদ্ধের রাজনীতি: প্রসঙ্গ আফগানিস্তান* (শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০১) নামক গ্রন্থে আবারো অনুবাদটা ছাপা হয়। আমরা *প্রথম আলো* থেকেই অনুবাদটা ছাপছি।

পেন্টাগন ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১১ই সেপ্টেম্বরের অবিবেকী আত্মঘাতী হামলার পর এক আমেরিকান সংবাদগ্রাহক বলেছিলেন, ‘গত মঙ্গলবারের মতো এত পরিষ্কারভাবে শুভ এবং অশুভ নিজেদেরকে এর আগে আর কখনই প্রকাশিত করেনি। যেসব মানুষদের আমরা চিনি না তারা আমাদের চেনাজানা মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। আর এ-কাজ তারা করেছে ঘৃণার উল্লাসে।’ এ-কথা বলেই ওই সংবাদগ্রাহক কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এবার তার সান্ত্বনা: অচেনা লোকগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে লোকগুলো অচেনা, কারণ তাদেরকে টিভিতে দেখা যায় না ঘন ঘন। শত্রুকে ঠিকমতো শনাক্ত করা বা তাদের প্রকৃতি ঠিকমতো অনুধাবন করার আগেই প্রচার আর বাগাড়ম্বরতার আতিশয্যে যুক্তরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং মিডিয়াকে যুদ্ধের জন্য সচল করেছে।

সমস্যা হলো, আমেরিকা একবার যুদ্ধে যাওয়া মানেই সেই যুদ্ধ শেষ না করে ফিরে আসার তার আর সুযোগ নেই। আর যুদ্ধে গিয়ে যদি সে শত্রু খুঁজে না পায় সেক্ষেত্রে দেশের বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার খাতিরে তাকে একটা শত্রু বানিয়ে নিতে হবে। যুদ্ধ একবার শুরু হয়ে গেলে এটি বেগ পাবে। তৈরি হবে এর নিজস্ব যৌক্তিকতা। আর একসময় আমরা ভুলেও যাব যুদ্ধটা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

ঠিক কী কারণে শুরু হয়েছিল। আমরা এবার চোখের সামনে যা দেখছি, তা হলো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী একটি দেশ প্রতিক্রিয়াবশত, ক্রোধোন্মত্ত হয়ে এক নতুন ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পুরনো সহজাত প্রবণতার আশ্রয় নিচ্ছে। আর এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের সারিবদ্ধ যুদ্ধজাহাজ, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র আর এফ-১৬ বোমারু বিমানগুলোও তার আত্মরক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত, সেকেলে, অকেজো মনে হচ্ছে। এই মহাশক্তির পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারও যেন এক অর্থহীন ভার মনে হচ্ছে। নতুন শতাব্দীর যুদ্ধ শুরু হবে বক্সকাটার, ছোট্ট ছুরি আর শীতল ক্রোধের মতো অস্ত্র দিয়ে। ক্রোধ এক লুকানো অস্ত্র। বিমানবন্দরের শুল্ক কর্মকর্তার চোখকে তা ফাঁকি দিয়ে অনায়াসে দেশের ভেতর চালান হয়ে যায়। বাক্সপেটরা ঘেঁটেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এ অমোঘ অস্ত্রকে।

কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমেরিকা? ২০শে সেপ্টেম্বর এফবিআই জানায়, বিমান ছিনতাইকারীদের কয়েকজনের পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের মনে দ্বিধা আছে। আর ওই একই দিনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি কারা এরা এবং কোন কোন রাষ্ট্র এদের মদদ দিচ্ছে। এ-কথা শুনে মনে হয়েছে, প্রেসিডেন্ট সাহেব এমন অনেক কিছু জানেন, যা এফবিআই এবং আমেরিকার জনগণ জানে না।

মার্কিন কংগ্রেসে তার ২০শে সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট বুশ আমেরিকার শত্রুকে 'মুক্তির শত্রু' বলে অভিহিত করেন। আমেরিকাবাসী এখন জিজ্ঞেস করছে 'ওরা কেন আমাদের ঘৃণা করে?' বুশ বলেন, 'ওরা আমাদের স্বাধীনতাগুলোকে ঘৃণা করে– আমাদের ধর্মের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা, ভিন্নমত পোষণের স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে।' বুশ জনগণকে দুটো কথা বিশ্বাস করতে বলেছেন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাদেরকে শত্রু বলে চিহ্নিত করছে, তারাই প্রকৃত শত্রু, যদিও এর পেছনে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। দ্বিতীয়ত, এই শত্রুর প্রকৃত মোটিভ যুক্তরাষ্ট্র সরকার যা শনাক্ত করেছে– তাই। এই দাবির পক্ষেও খুব একটা প্রমাণ নেই।

কৌশলগত, সামরিক এবং অর্থনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের এ-কথা বোঝানো মার্কিন সরকারের জন্য খুব জরুরি যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর অঙ্গীকার এবং 'আমেরিকান ওয়ে অফ লাইফ' আজ হুমকিগ্রস্ত। শোক, সংক্ষোভ আর ক্রোধের এই বাতাবরণে এই তত্ত্ব খাওয়ানো খুব সহজ। কিন্তু তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে খটকা লাগে হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে কেন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্বের প্রতীক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আর পেন্টাগন বেছে নেওয়া হলো? কেন বেছে নেওয়া হলো না 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি?' হতে কি পারে, হামলার পেছনে এই নারকীয় ক্ষোভের শেকড় আমেরিকার মুক্তি আর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণায় প্রোথিত নয়, বরং প্রোথিত এ দুটোর ঠিক বিপরীত জিনিসে অর্থাৎ সামরিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ, অভ্যুত্থান, সামরিক একনায়কতন্ত্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অকল্পনীয় গণহত্যা ইত্যাদির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে?

যুক্তরাষ্ট্রের শোকার্ত জনসাধারণের পক্ষে অশ্রুসজল চোখ তুলে একবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এ-কথা অনুধাবন করা কঠিন হবে যে, তাদেরকে যা ঘিরে রেখেছে তার নাম অমনোযোগ। হ্যাঁ, এটা অমনোযোগই বটে। এটা বিস্ময়ের অনুপস্থিতি। সেই পুরনো প্রবাদ নতুন করে শেখা যে, নিজের খোঁড়া গর্তে একদিন নিজেকেই পড়তে হবে। আমেরিকাবাসীর এ কথা জানা উচিত। তাদেরকে নয়, তাদের সরকারের নীতিকে এত তীব্রভাবে ঘৃণা করা হচ্ছে।

মার্কিনিরা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, তারা নিজেরা, তাদের অসাধারণ সরকার, তাদের লেখক, তাদের অভিনেতা, খেলোয়াড় আর তাদের সিনেমাকে সর্বত্র স্বাগতম জানানো

হয়। তাদের দমকলকর্মী, উদ্ধারকর্মী আর চাকুরেরা ওই হামলার দিন থেকে যে সাহসিকতা আর মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তাতে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি।

যা ঘটেছে তা নিয়ে আমেরিকার সন্তাপ ছিল অঢেল। অঢেলভাবেই তা রাষ্ট্র করা হয়েছে। এই যন্ত্রণার গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কিন্তু এই শোককে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে ব্যবহার না করে যুক্তরাষ্ট্র যদি গোটা বিশ্বের শোককে লুণ্ঠন করে শুধু নিজের প্রতিশোধ চরিতার্থ করার কাজে এটিকে ব্যবহার করে, তাহলে এর চেয়ে আফসোসের আর কিছুই থাকবে না। কেননা, তখন আর আমেরিকাবাসীদের নয়, আমাদের কাঁধে চাপবে এসব অপ্রিয় প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং সেগুলোর ততোধিক অপ্রিয় উত্তর খুঁজে বের করা। আর এ অসময়ে এসব কথা বলে আমরা হয়ে যাবো অপ্রিয় পাত্র। আমাদের কথা উপেক্ষা করা হবে কিংবা করে দেওয়া হবে স্তব্ধ।

বিশ্ববাসী হয়তো কখনই জানতে পারবে না, কী ছিল সুনির্দিষ্ট ছিনতাইকারীদের অভিপ্রায়, যারা আমেরিকার সুনির্দিষ্ট ভবনগুলোয় বিমান চালিয়ে আঘাত হেনেছে। ওরা নিজেদের নাম অমর করে রাখার জন্য কাজটা করেনি। আত্মহননের আগে ওরা কোনো বিদায় সম্ভাষণমূলক চিরকূট রেখে যায়নি। রেখে যায়নি কোনো রাজনৈতিক বার্তা। কোনো সংগঠনও এ হামলার কৃতিত্ব দাবি করেনি। আমরা শুধু এটুকুই জানতে পেরেছি যে, নিজেদের কর্মের যথার্থতা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস বেঁচে থাকার প্রতি মানুষের সহজাত আকুতি আর নিজেকে স্মরণীয় করে রাখার প্রবণতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছে, তাদের ক্রোধের বিশালত্বের কাছে ওই আত্মঘাতী কাজটি ছাড়া আর সবকিছুই যেন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। আর ওই বিমানের ধাক্কা আমাদের এতদিনকার চেনাজানা পৃথিবীটায় একটা চিরস্থায়ী ফুটো সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। এই ছিনতাইকারী আর তাদের মোটিভ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য যেহেতু আর কখনই জানা যাবে না, তাই রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক ভাষ্যকার আর লেখকরা (আমার মতো) এটিকে সবসময় তাদের নিজস্ব রাজনীতি, নিজস্ব বিশ্লেষণের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করবে। সে কারণে যে রাজনৈতিক পরিবেশে এই হামলা সংঘটিত হয়েছে তার বিশ্লেষণে যাওয়াই সবচেয়ে শ্রেয়।

কিন্তু যুদ্ধ একেবারে দোরগোড়ায়। যা বলা বাকি রয়ে গেছে, তা এখনই বলে ফেলতে হবে। আমেরিকা নিজেকে সন্ত্রাসবাদবিরোধী এক আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের নেতা বানিয়ে ফেলার আগেই এবং 'অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস' নামক প্রায় দেবতুল্য এক মিশনে আমেরিকা সব দেশকে আমন্ত্রণ (কিংবা জবরদস্তি করে অন্তর্ভুক্ত) করার আগেই তাদেরকে এ-বিষয়টি বোঝাতে হবে যে, এ-মিশন মুসলমানদের কাছে এক অবমাননা হিসেবে প্রতিভাত হবে। কেননা মুসলমানরা বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহই 'ইনফিনিট জাস্টিস' বা 'চূড়ান্ত ইনসাফ' দিতে পারেন। তাই এ-মিশনের নাম পাল্টে 'অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম' অর্থাৎ 'অটল মুক্তির অভিযান' নাম রাখা উচিত। এ-অভিযান চালানোর আগেই কিছু বিষয় খোলাসা করে নিলে সবার মঙ্গল হবে। যেমন ধরা যাক নাম 'ইনফিনিট জাস্টিস'ই হোক আর 'এনডিওরিং ফ্রিডম'ই হোক– কার জন্য ন্যায়বিচার, কার জন্য মুক্তি? এটা কি আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের জন্য যুদ্ধ, নাকি সামান্য অর্থে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ? এখানে কীসের প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে? এটা কি সাত হাজার মানুষের মৃত্যুর, ম্যানহাটানে ৫০ লাখ বর্গফুট আয়তনের একটি ভবন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার, পেন্টাগনের একটি অংশ ধ্বংস করে ফেলার, লাখ লাখ চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের, কয়েকটি বিমান পরিবহন কোম্পানির দেউলিয়াত্বের, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারের মূল্যপতনের প্রতিশোধ? নাকি এ-প্রতিশোধের চেয়েও বড় কিছু? ১৯৯৬ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইটকে জাতীয় টেলিভিশনে জিজ্ঞেস করা

হয়েছিল এই যে, মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে ৫ লাখ ইরাকি শিশু মারা গেছে, এতে তার প্রতিক্রিয়া কী? অলব্রাইট জবাব দিয়েছিলেন, এটি খুবই কঠিন একটি সিদ্ধান্ত, তবে যে-লক্ষ্য পূরণে এ-কাজ করা হচ্ছে, তার দাম হিসেবে এটি ঠিকই আছে। এ কথা বলার জন্য অলব্রাইটের চাকরি যায়নি। তিনি মার্কিন সরকারের মনোভাব প্রচার করতে একের পর এক দেশভ্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। ইরাকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরো পাকাপোক্তভাবে বলবৎ আছে। শিশুরা এখনো সেভাবেই মারা যাচ্ছে।

কাজেই এবার আমরা জবাব পেয়েছি। সভ্যতা আর বর্বরতার মধ্যে, নিরীহ মানুষজনের ওপর গণহত্যার মধ্যে অথবা 'সভ্যতাসমূহের সংঘাত' এবং সামরিক পরিভাষায় 'প্রয়োজনীয় ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে' তফাৎ আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপিত। এই হলো চূড়ান্ত ইনসাফের কুতার্কিক, অতি সূক্ষ্ম বীজগণিত। বিশ্বটাকে শয়তানমুক্ত করতে আর কতো ইরাকি মানুষ মেরে ফেলতে হবে? প্রতিটি নিহত মার্কিন নাগরিকের জন্য কতোটি আফগানের লাশ চাই? প্রতিটি নিহত পুরুষের বিপরীতে কতোটি নারী ও শিশুর মরদেহ? প্রতিটি নিহত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারের লাশের বিপরীতে শুইয়ে দিতে হবে কতোটি মুজাহিদিনের লাশ? আমরা যখন ইনসাফের এই বীজগণিতের ধাঁধা মেলাতে ব্যস্ত, ততোক্ষণে সারা বিশ্বের টেলিভিশনের পর্দায় উন্মোচিত হচ্ছে অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম। বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর জোট আফগানিস্তানকে ঘিরে ফেলছে। ঘিরে ফেলছে বিশ্বের সবচেয়ে গরিব, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে, যার ক্ষমতাসীন তালেবান সরকার ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য দায়ী বলে শনাক্ত ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিচ্ছে।

আফগানিস্তানে হামলা হলে সামরিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় মানুষ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না (এদের মধ্যে ৫ লাখই এতিম হয়ে গেছে। প্রত্যন্ত, দুর্গম গ্রামগুলোয় বিমান থেকে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফেলা হলে রীতিমতো হুড়োহুড়ি শুরু হয় বলে রিপোর্ট বেরিয়েছে)। আফগানিস্তানে অর্থনীতি শ্মশান হয়ে গেছে। আগ্রাসী কোনো সেনাদলের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে– তারা আঘাত করার জন্য আফগানিস্তানে কোনো লক্ষ্যবস্তু কিংবা নিজেদের কৌশল নির্ধারণের জন্য কোনো উপকরণই খুঁজে পাবে না। এখানে কোনো বড় শহর নেই, নেই মহাসড়ক, শিল্পকারখানা, উঁচু ভবন কিংবা পানি শোধনাগার। খামারগুলো এতোদিনে সেখানে কবরখানা হয়ে গেছে। পল্লী এলাকার খেতখামার থিকথিক করছে স্থলমাইনে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ১ কোটি স্থলমাইন পোঁতা আছে। নিজেদের সৈন্যবহরকে ভেতরে ঢোকাতে আমেরিকান সেনাবাহিনীকে প্রথমে এসব মাইন সাফ করতে হবে, তারপর রাস্তাঘাট তৈরি করতে হবে।

আমেরিকার হামলার আশঙ্কায় ১০ লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর ফেলে পাকিস্তান সীমান্তে ভিড় করেছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ৮০ লাখ আফগান নাগরিকের এই মুহূর্তে জরুরি ত্রাণ প্রয়োজন। অথচ রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই খাদ্য ও ত্রাণ সংস্থাগুলোকে দেশত্যাগ করতে বলা হয়েছে। বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে আফগানিস্তানে। চোখের সামনে নতুন শতাব্দীর এই চূড়ান্ত ইনসাফ প্রত্যক্ষ করুন। না খেয়ে মরোমরো হয়ে যাওয়া লোকগুলোকে সামরিক হামলার হুমকির সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আফগানিস্তানে বোমা ফেলে সেটিকে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা আমেরিকায় বলাবলি হচ্ছে। কেউ একজন দয়া করে ওদের জানিয়ে দিন যে, তার আর দরকার হবে না। আফগানরা ইতিমধ্যেই ওই যুগে চলে গেছে। আর যদি তাতেও মন না ভরে, তাহলে জানিয়ে দিন, এ-দুরবস্থা তৈরির পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কম কিছু নয়। মার্কিন জনগণ হয়তো

ঠিকমতো জানেই না আফগানিস্তান নামক দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রের কোন জায়গায় আঁকা আছে, তবে মার্কিন সরকার আর আফগানিস্তান অনেক পুরনো মিত্র।

১৯৭৯ সালে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান দখলের পর সিআইএ এবং পাকিস্তানের আইএসআই সিআইএর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গোপন তৎপরতা চালিয়েছে। তাদের কাজ ছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধকে মদদ যুগিয়ে যাওয়া আর এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে জেহাদে রূপান্তরিত করা। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান দেশগুলো কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শুরু হবে অস্থিতিশীলতা। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছে ছিল এটিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য একটি 'ভিয়েতনামে' পরিণত করা। কিন্তু শেষ নাগাদ এটি হয়ে উঠলো তার চেয়েও অনেক বড় ব্যাপার। ১০ বছরে আমেরিকার এই ছদ্মবেশী যুদ্ধে ৪০টি মুসলমান দেশ থেকে ১ লাখ চরমপন্থী মুজাহিদিনকে অর্থ আর প্রশিক্ষণ দিয়েছে সিআইএ। আর এ-কাজটি তারা করেছে আইএসআই-এর মাধ্যমে। মুজাদিহিন নেতা আর সৈন্যরা জানত না যে তাদের এই জেহাদ তারা আসলে লড়ছে আঙ্কেল স্যামের পক্ষে। (ভাগ্যের পরিহাস এটাই যে, আমেরিকাও একইভাবে টের পায়নি, তারা তাদেরই বিরুদ্ধে এক ভবিষ্যতের যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরিপুষ্ট করে তুলছে।)

১০ বছরের টানা লড়াই শেষে ১৯৮৯ সালে রুশরা তল্পি গুটিয়ে চলে যায়। পিছনে রেখে যায় ধুলোয় মিশে যাওয়া এক সভ্যতা।

এরপর আফগানিস্তানে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। জেহাদের আগুন এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে চেচনিয়া, কসোভো এবং কাশ্মীরে। সিআইএ অর্থ আর সামরিক সরঞ্জাম ঢেলে যেতে থাকে। কিন্তু জেহাদিদের সংখ্যা বেড়ে গেছে বহুগুণ। আগের অর্থে কুলোচ্ছে না। আরো অর্থ দরকার। মুজাহিদিনরা কৃষকদের নির্দেশ দিলো, জেহাদের কর হিসেবে আফিম চাষ করো। আফগানিস্তানজুড়ে হাজার হাজার হেরোইনের ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিলো আইএসআই। দুবছরের মধ্যে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত হয়ে দাঁড়ালো বিশ্বের সবচেয়ে বড় হেরোইন উৎপাদনকারী এলাকা এবং আমেরিকার পথে পথে হেরোইনের ছড়াছড়ির প্রধান উৎস হয়ে উঠলো তা। এই মাদক ব্যবসার বার্ষিক আয় ছিল ১০ হাজার কোটি থেকে বিশ হাজার কোটি ডলার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের একটি অংশ জঙ্গিদের প্রশিক্ষণে ব্যবহার হতে লাগলো।

১৯৯৫ সালে কট্টর মৌলবাদীদের একটি বিপজ্জনক অংশ তালেবানরা গৃহযুদ্ধের ভেতর লড়াই করতে করতে আফগানিস্তানের বড় একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ দখল করে। এদের পেছনে মূল মদদ ছিল আইএসআই-এর। পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক দলেরও সমর্থন ছিল এতে। তালেবানরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। তাদের প্রথম শিকার হলো দেশেরই জনগণ– বিশেষত মেয়েরা। তালেবানরা মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দিল। সরকারি চাকরি থেকে মেয়েদের ছাঁটাই করা হলো। চালু হলো শরিয়া আইন। নীতিবিরুদ্ধ কাজ করলে মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান রয়েছে এ আইনে, বিধবার পরকীয়া প্রেমের শাস্তি জীবন্ত কবর। তালেবান সরকারের মানবাধিকারের যে-রেকর্ড, তাতে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে কিংবা বেসামরিক লোকজন হতাহত হওয়ার আশঙ্কার কথা শুনিয়ে তাদেরকে হতোদ্যম করা যাবে না।

এতো কিছুর পরও আফগানিস্তানকে আবার ধ্বংস করতে রাশিয়া আর আমেরিকরা এবার পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে– এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কীই বা হতে পারে? প্রশ্ন হলো ধ্বংসস্তুপকে আপনি কি ধ্বংস করতে পারবেন? আফগানিস্তানে বোমা ফেললে কেবল ধ্বংসস্তুপের জিনিসগুলো ওলটপালট হবে, কবরখানা প্রকম্পিত হয়ে কেবল মৃতদের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে।

আফগানিস্তানের শূন্য প্রান্তর সোভিয়েত কমিউনিজমের গোরস্থান হয়েছে। এখান থেকেই তৈরি হয়েছে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন একমেরুর বিশ্ব। এই একমেরুর বিশ্বে নব্যপুঁজিবাদ আর করপোরেট বিশ্বায়নের জয়জয়কার। এরও প্রভু আমেরিকা। আর এবার এই আফগানিস্তান সেইসব সৈন্যদের কবরস্থানে পরিণত হতে যাচ্ছে, যারা আমেরিকার হয়ে এ-যুদ্ধে লড়াই করেছে এবং আমেরিকাকে জিতিয়েছে।

আর আমেরিকার সবচেয়ে আস্থাভাজন মিত্রের অবস্থা? পাকিস্তানকেও ভীষণ পস্তাতে হয়েছে। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিকাশকে কণ্ঠরোধ করেছে যেসব সামরিক একনায়ক, তাদেরকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে এতটুকুও লজ্জিত হয়নি মার্কিন সরকার। সিআইএর আগমনের আগে পাকিস্তানে আফিমের একটি ছোট্ট গ্রাম্যবাজার ছিল। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানে হেরোইনসেবীর সংখ্যা শূন্য থেকে বেড়ে ১৫ লাখে দাঁড়ায়। ১১ই সেপ্টেম্বরের আগে পাকিস্তান সীমান্তে ৩০ লাখ আফগান শরণার্থী বসবাস করছিল। পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। গোষ্ঠীগত সংঘাত, বিশ্বায়নের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট কর্মসূচি এবং মাদক ব্যবসায়ীরা দেশটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বানানো সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ শিবির আর মাদ্রাসাগুলো এখন ড্রাগনের দাঁতের মতো মুখব্যাদান করে আছে। এখান থেকে যেসব মৌলবাদী বেরুচ্ছে, তারা এখন পাকিস্তানেই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। যে তালেবানদের অর্থ আর সমর্থন দিয়ে গড়ে তুলেছে পাকিস্তান সরকার, সেই তালেবানদের সঙ্গে এখন পাকিস্তানের নিজেদের রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশলগত সখ্য তৈরি হয়েছে।

এখন মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে বলছে এতোদিন ধরে বাড়ির উঠানে লালন-পালন করা পোষা শ্বাপদটাকে আবার খাঁচায় ভরতে। যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট মুশাররফ এখন দেখছেন তার নিজ দেশে গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

কিছুটা এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আর কিছুটা এর সাবেক নেতাদের দূরদৃষ্টির কারণে ভারত সৌভাগ্যবশত এই পাশার দান থেকে দূরে ছিল। ভারতও যদি এই খেলায় শামিল হতো আমদের গণতন্ত্র এতোদিন টিকতো না। আজ আমরা মহা আতঙ্কে প্রত্যক্ষ করছি, ভারতের সরকার ক্রমাগত হাত কচলাচ্ছে। পাকিস্তানে ঘাঁটি না গেড়ে ভারতে ঘাঁটি গাড়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অনুনয় করছে। পাকিস্তানের বীভৎস পরিণতি দেখার পরও ভারত এ-কাজ করতে আগ্রহী হবে– এটা শুধু অবাক করা ঘটনাই নয়, এটা রীতিমতো অচিন্ত্যনীয়। ভঙ্গুর অর্থনীতি আর জটিল সামাজিক ভিত্তির যে-কোনো তৃতীয় বিশ্বের দেশমাত্রই এতোদিনে স্পষ্ট জেনে গেছে, আমেরিকার মতো এক পরাশক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো (তা আমেরিকা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে বলুক আর যাত্রাবিরতিই করবে বলুক) হবে আপনার জানালার কাঁচের মধ্যে একটা ইট ছুঁড়ে মারতে অনুরোধ করা।

বাইরে থেকে বলা হচ্ছে অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম আমেরিকান জীবনযাত্রাকে রক্ষার জন্য এক লড়াই। কিন্তু শেষ নাগাদ এটি আমেরিকান জীবনযাত্রাকে পর্যুদস্ত করে ছাড়বে। এই যুদ্ধের পরিণামে বিশ্বময় ক্রোধ আর সন্ত্রাসবাদের দাবানল আরো ছড়িয়ে যাবে। আমেরিকার আমজনতার ক্ষেত্রে এটা হবে অনিশ্চয়তার এক অসুস্থ পরিবেশে বসবাস : আমার শিশু কি স্কুলে নিরাপদ থাকবে? পাতাল রেলে কি কেউ বিষাক্ত নার্ভ গ্যাস ছড়িয়ে দেবে? সিনেমা হলে কেউ বোমা পেতে রাখেনি তো? এবারের হামলার সময় জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারের চেষ্টাও হয়েছিল বলে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ সারা বিশ্ব সাধুসন্তদের দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু তার পক্ষে বিশ্ব

থেকে মন্দ লোক দূর করতে পারা সম্ভব নয়। সহিংসতা আর নিষ্পেষণের মাধ্যমে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করার স্বপ্ন যদি মার্কিন সরকার দেখে থাকে, তবে এর চেয়ে বাস্তবতাবর্জিত আর কিছু হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ নিজে কোনো রোগ নয়, এটি রোগের লক্ষণ। সন্ত্রাসবাদের কোনো দেশ নেই। এটি কোক, পেপসি বা নাইকির মতোই এক বহুজাতিক এন্টারপ্রাইজ। সংকটের প্রথম লক্ষণেই সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কারখানা এক দেশ থেকে সরিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যেতে পারে ঠিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মতোই।

সন্ত্রাসবাদ পৃথিবীর বুক থেকে হয়তো কখনো বিদায় নেবে না। তবে এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো মেনে নিতে হবে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর মতোই তারাও একটি দেশ। তাদের মতোই বাকি সবাই এ-পৃথিবীরই মানুষ, এমনকি যদি তাদেরকে টিভিতে দেখানো নাও হয়। তাদের মতো অন্য মানুষদেরও প্রেম আছে, দুঃখ, কাহিনী, গান এবং অধিকার আছে। কিন্তু এ-কাজ না করে যুক্তরাষ্ট্র কী করেছে– প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে জিজ্ঞেস করা হলো কখন আমেরিকার বিজয় হয়েছে বলে তিনি মনে করবেন? জবাবে রামসফেল্ড বললেন, যখন সারা বিশ্বকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হবেন যে, আমেরিকানদের তাদের নিজস্ব জীবনধারা চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত– তখনই তার বিজয় হয়েছে বলে তিনি মনে করবেন।

১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা ভীষণরকম উচ্ছন্নে যাওয়া এক বিশ্বের কাছ থেকে আসা এক সাবধানবাণী। বার্তাটা হয়তো লিখেছে বিন লাদেন এবং পৌঁছে দিয়েছে তার বার্তাবাহকরা। কিন্তু আমেরিকার পুরনো যুদ্ধের লাশগুলোর প্রেতাত্মারাও এ-বার্তা লিখে থাকতে পারতো। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার লাখ লাখ লোককে মারা হয়েছে, ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মদদে লেবাননে আগ্রাসন চালিয়ে ইসরায়েল সাড়ে ১৭ হাজার মানুষ মেরেছে, অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে হত্যা করা হয়েছে ২ লাখ ইরাকিকে, হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মারা গেছে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে। আমেরিকার সরকারের মদদে, প্রশিক্ষণে, অর্থে লালিত সন্ত্রাসবাদী, স্বৈরাচারী শাসক ও গণহত্যাকারীদের হাতে যুগোস্লাভিয়া, সোমালিয়া, হাইতি, চিলি, নিকারাগুয়া, এল সালভেদর, ডোমিনিকান রিপাবলিক আর পানামায় লাখ লাখ লোক মারা গেছে। এ-তালিকা আরো বহুগুণে দীর্ঘ করা যায়।

এতো বিপুল যুদ্ধবিগ্রহে যে-দেশের হাত রঞ্জিত, তার মানুষগুলো কতো না সৌভাগ্যবান। ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মাত্র দ্বিতীয় আক্রমণ। প্রথম হামলাটি হয় পার্ল হারবারে। এর প্রতিশোধ গ্রহণে অনেক বিলম্ব করা হলেও হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার মাধ্যমে এই শোধ তোলা হয়েছে। এবার কোন রোমহর্ষক ঘটনা তাদের সামনে ঘটতে যাচ্ছে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় আছে বিশ্ব।

সম্প্রতি কেউ একজন বলেছে, ওসামা বিন লাদেনের অস্তিত্ব না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র একটা ওসামা বানিয়ে নিতো। কিন্তু এক হিসেবে দেখলে যুক্তরাষ্ট্রই কিন্তু তাকে বানিয়েছে। ১৯৭৯ সালে সিআইএ যখন আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলো তখন সেখানকার জেহাদিদের একজন ছিলেন লাদেন। সিআইএ তাকে তৈরি করেছে, আর এফবিআই তাকে দাগী আসামি হিসেবে খুঁজছে। মাত্র এক পক্ষকালের মধ্যে লাদেন যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহভাজন তালিকা থেকে শীর্ষ সন্দেহভাজন এবং কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই সেখান থেকে সরাসরি জীবিত অথবা মৃত ধরে আনার তালিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু কে এই ওসামা বিন লাদেন? প্রশ্নটা আসলে এভাবে করা উচিৎ– কী এই ওসামা বিন লাদেন, তিনি আমেরিকার ফ্যামিলি সিক্রেট। তিনি আমেরিকার সকল প্রেসিডেন্টের যমজ ভাই।

একটা ভাই সভ্যতার পোশাক পরে সুশ্রী চেহারা নিয়ে থাকে, অন্য ভাইটা বর্বর। লাদেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কারণে পচে যাওয়া বিশ্বের একটা বাড়তি বুকের হাড় থেকে তৈরি মূর্তি। সেই পররাষ্ট্রনীতিতে রয়েছে বন্দুকের নলের কূটনীতি, পরমাণু অস্ত্র, করায়ত্তবাদ, অ-আমেরিকান জীবনযাত্রার প্রতি অশ্রদ্ধা, বর্বর সামরিক হস্তক্ষেপ– এইসব। এখন যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের এই গোপন ফ্যামিলি সিক্রেট প্রকাশ হয়ে পড়েছে, দুই যমজ ভাই একে অপরের প্রতি রাগে গড়গড় করছে আর পরস্পর পোশাক পাল্টে একে অন্যের চেহারা নিয়ে নিচ্ছে– তাদের দুজনার বন্দুক, বোমা, অর্থ আর মাদকদ্রব্য সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। (আফগানিস্তানে মার্কিন হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে তালেবানরা যে স্ট্রিংগার মিসাইল ছুঁড়বে, সেগুলো এককালের সিআইএ-র দেওয়া)।

এখন বুশ আর লাদেন এমনকি একে অন্যের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন। একে অন্যকে সর্পকুলের রাজা বলে অভিহিত করছেন। দুজনেই ঈশ্বরের দোহাই দিচ্ছেন এবং দুজনেই শুভ ও অশুভের লড়াই হিসেবে এটিকে শনাক্ত করছেন। দুজনেই একই রকম রাজনৈতিক অপরাধ করে চলেছেন। একজনের হাতে পরমাণু অস্ত্র, অন্যজনের হাতে ধ্বংসকামী হতাশার অস্ত্র। একজনের হাতে আগুনের গোলা, অন্যজনের হাতে সুঁচালো বরফখণ্ড।

সারা বিশ্বের মানুষের প্রতি বুশের আল্টিমেটাম, 'আপনারা আমাদের সঙ্গে না থাকার অর্থ আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে আছেন।' এ এক চরম ঔদ্ধত্য।

রামজি বারুদ

আমেরিকা, তোমার দুঃখ আমরা বুঝি, আমাদের দুঃখ তুমি বোঝ?

তরজমা: গাউস রহমান পিয়াস

মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরিণামজনিত শোকাবহ আবেগ উপলব্ধি করে না– এই অভিযোগ অসার প্রতিভাত হয় এই লেখাটা পড়লে। অত্যন্ত দরদী হৃদয় নিয়ে করা এই বিশ্লেষণ মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের বেদনার মর্মসুরটা আমাদের শুনিয়েছে। লেখাটা *মিডল ইস্ট নিউজ অনলাইন* থেকে নিয়ে *প্রথম আলো* পত্রিকায় ৫ অক্টোবর ২০০১ তারিখে ছাপা হয়। লেখাটি আমরা পুনর্মুদ্রণ করলাম।

ছয় বছর বয়সী মেয়েটি খানিকটা নুয়ে, আলতো করে ফুলটি রাখল। ইতিমধ্যে কয়েকশ ফুল পড়েছে। পোড়ানো হচ্ছে মোমবাতি। ব্যানার উড়ছে হাওয়ায়। ফিলিস্তিনি শিশুটি এবার দৌড়ে ছুটে এসে মায়ের হাত ছোঁয়। তার চোখেমুখে ভয়। মুখ শিশুতোষ লজ্জায় রাঙা। তারপর মা-মেয়ে দুজনেই হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ– মোমবাতির পুড়ে যাওয়া দ্যাখে।

ছোট্ট এই শোক অনুষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া ও ওয়াশিংটনে নিহত কয়েক হাজার মানুষের স্মরণে। তবে এই সংবাদ যোগাড়ের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন গুটিকয়েক সাংবাদিক। তাও বিদেশী কোনো সংবাদ মাধ্যমের নয়, তারা সবাই স্থানীয় আরব ও ফিলিস্তিনি।

মার্কিন জাতি তাদের হতাহতদের স্মরণে বিশ্বকে কাঁদতে দেখেছে। তবে তারা ভুলেও অনুভব করেনি ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে অনেক ফিলিস্তিনির মনেও ওই সময় কী তীব্র সমবেদনা অনুভূত হচ্ছে। তবে মার্কিনিরা আতঙ্ক আর হতাশা নিয়ে ঠিকই দেখেছে হামলার ঘটনায় উৎফুল্ল কটি ফিলিস্তিনি শিশু জীর্ণ গাড়ির ছাদে চড়ে গান গাইছে। শূন্যে গুলি ছুড়ে উল্লাস করছে দুজন লোক। পুরো চশমা নাড়িয়ে স্বস্তি ব্যক্ত করছেন এক বৃদ্ধা।

প্রতিটি বৃহৎ মার্কিন সংবাদ নেটওয়ার্কই এক্সক্লুসিভ ভিডিওচিত্র ও সংবাদ প্রতিবেদন প্রচারে পরস্পর পাল্লা দিয়ে থাকে। কিন্তু এই ডজনখানেক ফিলিস্তিনির উল্লাসের সংবাদটির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। মার্কিন গণমাধ্যমগুলো সোৎসাহে খবরটি

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

নিজেদের মধ্যে, সেই সঙ্গে সারা বিশ্বের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্ববাসীকে জানানো হয়ে যায়: মার্কিন জাতির দুঃখে ফিলিস্তিনিরা উল্লাস করে।

কিন্তু ছোট্ট এই খবরটি বস্তুনিষ্ঠও যদি হয়, গুটিকয়েক শিশু ও একজন বৃদ্ধা মহিলা কয়েক লাখ ফিলিস্তিনির, যাদের মধ্যে হাজার হাজার মার্কিন নাগরিকত্বধারীও আছেন, প্রতিনিধিত্ব করে না।

আমেরিকা! এই দুঃখ, এই যন্ত্রণার মধ্যেও যদি সম্ভব হয় স্মৃতির ক্যাসেটটা একটু পেছনে ঘোরাও। ১৯৯১ সালে উপসাগর যুদ্ধোত্তর নিউ ইয়র্ক সিটির কিছু টুকরো দৃশ্য মনে আনার চেষ্টা করো। মার্কিন সেনাদল মধ্যপ্রাচ্য মিশন শেষে সবে দেশের মাটিতে পা রেখেছে। টেলিভিশনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ টানটান ভঙ্গিতে, সরল বাক্যে বললেন, 'বোমা মেরে মেরে ইরাককে পাথর যুগে ফেরত পাঠানোর মিশন আমাদের শেষ হলো।'

এই মার্কিন বাহিনীই উপসাগর যুদ্ধে মিত্রশক্তির নেতৃত্ব দেয়, দিনের পর দিন ইরাকে অবিরাম বোমা ফ্যালে, নির্লিপ্তভাবে হত্যা করে। মার্কিনিরা, সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীও এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে, যেমন সেদিন তারা দেখল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের মাটিতে আছড়ে পড়ার দৃশ্যটি।

ইরাকে যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের সিংহভাগই ছিল অসামরিক, নির্দোষ নারী-পুরুষ। কদিন আগে দৃশ্যত দারুণ সুন্দর এক সকালে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে যেসব নিউ ইয়র্কবাসী মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তুলনায় ওই ইরাকিরা কম বা বেশি নির্দোষ ছিল না।

ইরাকের দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি নগর শহর গ্রামে টনকে টন বোমা ফেলে, অসামরিক নাগরিকদের রক্তে হাত ধুয়ে ঘরে ফিরেছিল মার্কিন সেনারা। তারা ইরাকে সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। একটি অরক্ষিত জাতির বিরুদ্ধে সর্বাধিক মারণপ্রযুক্তির গবেষণা চালিয়েছে। তারা বোমা মেরেছে। হত্যা করেছে। কখনো কখনো ইরাকিদের অসহায়ত্বকে উপহাস করেছে।

টিভিতে দেখা গেছে, মার্কিন সৈন্যরা যুদ্ধবিমানে ক্ষেপণাস্ত্র বোঝাই করছে। সেগুলোতে লেখা 'আহমেদ, বিদায় জানাও', 'শুভ রমজান', 'আল্লাহকে হাই বলো'। এরপরও দেশে ফেরার পর তাদের কেউ ভর্ৎসনা করেনি। গায়ে পচা ডিম ছুড়ে মারেনি। উল্টো উষ্ণ সংবর্ধনা জুটেছে। কারণ মার্কিন স্বার্থ উদ্ধার হলেই 'আমাদের ছেলেমেয়েরা' একেকটি বীর সৈনিক।

এবং এই এখনো নিউ ইয়র্কে, যে-নগরীর অর্ধেকই এখন তলিয়ে আছে ধুলো আর ধ্বংসস্তূপে, হাজার হাজার লোক রাজপথে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্ধারকাজ সেরে ফেরত আসা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে গাইছে, 'স্পারকল্ড স্টারস'। উল্লাসে হর্ষধ্বনি করছে 'ইউএসএ, ইউএসএ'।

একদিন এই যুক্তরাষ্ট্রেই বিজয়ের মৌতাত জমে উঠেছিল। প্রায় প্রতিটি মার্কিন সংবাদপত্র, টিভি স্টেশন, ছেলে থেকে বুড়ো লাখ লাখ মার্কিনি ও তাদের প্রতিনিধিরা ইরাকিদের মৃত্যুতে মৌজ-ফুর্তিতে মজেছিল। আজকের মতো সেদিনও যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের বলা হয়েছিল আমাদের লড়াই ছিল শুভর সঙ্গে অশুভের। আর এতে শুভরই জয় হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওই আনন্দ-উৎসব দেখার সুযোগ সেদিন ইরাকিদের হয়নি। তাদের ঘরদোর তখন ধ্বংসস্তূপ। সামান্য রুটি ও দুধ কেনার জন্য জলের দরে বেচতে হয়েছে প্রিয় সব সংগ্রহ। নেই বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ। হাসপাতালগুলো নিশ্চিহ্ন।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ওই হামলা অবশ্যই নিন্দনীয়। যখন কয়েকটি ব্যক্তি মনে করে রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার জন্য অন্যের প্রাণ হরণ করার অধিকার তারা রাখে, তখন আদতে মানবতাকেই পদদলিত করা হয়।

তবে এ হামলার স্থায়িত্ব ছিল ঘণ্টাকয়েক। আর এর তিন দিন পরই কংগ্রেস দেশ পুনর্গঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহ, হামলায় বিপন্নদের সহায়তা এবং ভবিষ্যৎ হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ৪০০ কোটি ডলার অনুমোদন করে।

ফিলিস্তিনের ট্র্যাজেডি কিন্তু এরকম এক-দুই ঘণ্টার নয়। এটি চলছে কয়েক প্রজন্ম ধরে। ৫৩ বছর ধরে ফিলিস্তিনিরা বিশ্বের কুখ্যাতমত একটি সেনাবাহিনীর নির্যাতন সহ্য করছে। ৫৩ বছর ধরে তাদের বন্দীশিবিরে বাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাদের খাওয়ানো হচ্ছে দূষিত পানি। তাদের প্রিয়জনদের খুন করা হচ্ছে। ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করা হয়েছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে ঈশ্বরপ্রদত্ত সব সুবিধা। জাতিসংঘ ঘোষিত সব অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। জেলে পোরা হচ্ছে। নির্মমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। খুন করা হচ্ছে। তাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য করা হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

ফিলিস্তিনিদের দিনপঞ্জীতে এমন একটি দিনও আসে না যেদিন একটি বা দুটি হত্যাকাণ্ড তারা দেখে না। একটি শিশুর খুনের প্রতিবাদ জানাতে তারা রাজপথে নামে। বিক্ষোভ করার সময় গুলিতে মারা যাওয়া আর একজনের লাশ কাঁধে করে ঘরে ফিরে।

তুমি যুক্তি দেখাতে পারো, আমেরিকা, আজ আপন বেদনায় আমি আর্ত, খামাখা তোমাদের কষ্ট নিয়ে কেন ভাবতে যাব? উত্তরটা সোজা। ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে যেসব বুলেট, সেগুলো 'মেড ইন ইউএসএ'। প্রতিটি গোলা, প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র, প্রতিটি ট্যাংক 'মেড ইন ইউএসএ'। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডেরও খরচ যুগিয়েছে এই আমেরিকাই।

১৯৮২ সালে বৈরুতের একটি শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়ে তিন হাজার ফিলিস্তিনিকে খুন করা হলো। খুনিরা শিবির ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দেখা গেল বিকৃত মৃতদেহের স্তূপ জমেছে। লাশের চামড়া খুবলে নেয়া হয়েছে, সম্ভ্রম হারিয়েছে নারীরা। অসংখ্য লাশের পাশে পড়ে আছে হাজার হাজার গুলির খোসা। আমেরিকায় তৈরি গুলির খোসা। লাশ গণকবর দেওয়ার পর অপরাধের চিহ্ন মুছে দিতে যে বুলডোজারটি গোরস্থানে ঢুকে তারও সরবরাহকারী ছিল আমেরিকা।

১৯৪৮ সালে দখলিকৃত আরব ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। সেই থেকে আজ অবধি ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গঠন ও অবৈধ বসতি নির্মাণ কাজে যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে সাড়ে বার হাজার কোটিরও বেশি ডলার। সেই থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিপীড়িত একটি জনগোষ্ঠীর নামে টিকে থাকা বর্ণবাদী একটি দেশকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে।

এই সেদিন নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসিতে হামলার ৪৮ ঘণ্টা আগে একটি ডিক্রি জারি করেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। বলেন, ফিলিস্তিনিদের খুন করতে ইসরায়েল যে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করে এটি মার্কিন অস্ত্র রপ্তানিনীতিকে লঙ্ঘন করে না।

এত কিছুর পরও মাত্র ডজনখানেক শিশু মার্কিনিদের মৃত্যুতে উৎসব করতে রাজপথে ছুটেছে। এত কিছুর পরও সিংহভাগ ফিলিস্তিনি আমেরিকানদের মৃত্যুতে শোকার্ত হয়েছে। কারণ একটাই। কয়েক দশক ধরে নিজেদের ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছে, মৃত্যু কত মর্মান্তিক।

১৯৯১ সালে লাখ লাখ মার্কিনি ইরাকের বিরুদ্ধে 'বিজয়' উৎসবে মেতেছিল। সেদিন কিন্তু ফিলিস্তিনিরা 'ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন' বলে গান ধরেনি। রঙিন বেলুনও ওড়ায়নি। শ্যাম্পেনের বোতল খুলে গলা ভেজায়নি। বরং তারা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেরই তৈরি অস্ত্রেশস্ত্রে বিধ্বস্ত শহর রামাল্লায়, গাজায়। স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছে।

ছয় বছর বয়সের ফিলিস্তিনি বালিকাটি শোক অনুষ্ঠান শেষে মায়ের হাত ধরে বাড়ির পথ ধরছে। রামাল্লা থেকে জেরুজালেম আধঘণ্টার পথ। তবে এই মা ও শিশুর কয়েক ঘণ্টাও লাগতে পারে। কারণ অসংখ্য ইসরায়েলি সেনাচৌকি পথে। একের পর এক। এসব ডিঙিয়েই তারা এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রে হতাহতদের স্বজনদের সঙ্গে সংহতি জানাতে।

মায়ের সঙ্গে ঘরে ফিরছে মেয়েটি। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ইসরায়েলি সৈন্য। তাদের চোখে সন্দেহ, অবিশ্বাস। আর দশজনের মতো এই মেয়েটিকেও ফিলিস্তিনি পতাকা রাখতে দেওয়া হয়নি। তার হাতে এখন দুলছে ছোট্ট একটি মার্কিন পতাকা। মেয়েটির চোখে-মুখে স্বস্তির অভিব্যক্তি, সৈন্যরা অন্তত এই পতাকাটি কেড়ে নেবে না।

ওদিকে ঠিক এই সময়ে পশ্চিম তীরের শহর জেনিনে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মরিয়া হয়ে নিজেদের ঘরদোর, স্বজন-পরিজনকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। ইসরায়েলি সেনাদের কয়েক দিনের বোমা হামলায় ভিটেমাটি ধসে গেছে, মারা পড়েছে ১১ জন।

আচমকা একজন ফিলিস্তিনি তরুণের চিৎকার শোনা যায়: পালাও সবাই, হেলিকপ্টারগুলো আবার আসছে। তরুণটির অস্ত্র বলতে বুকপকেট ভর্তি পাথর, হাতে গুলতি। আতঙ্কিত লোকজন ততক্ষণে সংকীর্ণ গলি ধরে ছুটছে। এরই মধ্যে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে দুটি আমেরিকা-মেইড হেলিকপ্টার। পলায়নপর মানুষগুলোর ওপর বৃষ্টির মতো গুলি চালায়। স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলি। আমেরিকায় তৈরী গুলি।

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

নোয়াম চমস্কি

মেরে ফেলা হলে লাদেন পাবে শহীদের মর্যাদা

তরজমা: জুয়েল মাজহার

নোম চমস্কির এই সাক্ষাৎকারটা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের লোক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে ছেপেছে *প্রথম আলো* গত ২২শে সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে। কোন ওয়েবসাইট থেকে এই সাক্ষাৎকারটা সংগ্রহ-করা তা উল্লেখ করা ছিল না এবং অনুবাদকের নামও দেয়া ছিল না। অনুবাদটা পরে সৈকত হাবিবের সম্পাদনায় *'আক্রান্ত আমেরিকা বনাম লাদেন ও আফগান: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শঙ্কা'* নামক বইতে (কথাপ্রকাশ, ঢাকা, অক্টোবর ২০০১) এবং রবীন আহসান কর্তৃক সম্পাদিত *যুদ্ধ ও যুদ্ধের রাজনীতি: প্রসঙ্গ আফগানিস্তান* (শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০১) নামক গ্রন্থে আবারো ছাপা হয়। উল্লেখ্য, সৈকত হাবিবের সম্পাদনা-করা বইয়ে অনুবাদক হিসাবে জুয়েল মাজহারের নাম মুদ্রিত ছিল। আমরা *প্রথম আলো* থেকেই অনুবাদটা ছাপছি। *প্রথম আলো* এই সাক্ষাৎকারটার 'ভূমিকা' হিসাবে যে-কথাগুলো পেশ করেছিল তা-ও এখানে হুবহু দেয়া হলো, তারপরই থাকল অনুবাদটা। *প্রথম আলো*-র দেয়া 'নোয়াম' বানানটাও আমরা বদলাই নাই।

*'প্রথম আলো'*র নোট: বিশ্বখ্যাত মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও কর্মী নোয়াম চমস্কি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের চেহারাটাই আদ্যন্ত বদলে দিয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানের বাইরেও সমাজ, রাজনীতি, পুঁজিবাদ, বিশ্বায়নসহ নানাবিধ বিষয়ে তার অভিনিবেশ ও পর্যবেক্ষণ রীতিমতো ঈর্ষণীয়। ধনবাদী পশ্চিমা বিশ্বের যাবতীয় দাদাগিরির কট্টর সমালোচক অ্যাব্রাম নোয়াম চমস্কির জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়াতে। ভাষাবিজ্ঞানের নতুন এক ক্ষেত্র তৈরি করে তাকে প্রতিষ্ঠিত ছাঁচ দিয়েছেন চমস্কি। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত *সিনট্যাকটিক্যাল স্ট্রাকচারস* গ্রন্থে তিনি যে ভাষাদর্শন তুলে ধরেন সেটির পোশাকি নাম ট্রান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার। জাতিতে ইহুদি এই ভাষাবিজ্ঞানী বরাবরই যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি মনে করেন, এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর, সমালোচনা করার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীরা কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না । যুক্তরাষ্ট্রে গত ১১ সেপ্টেম্বরের অভাবনীয় সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বিশ্ব রাজনীতিতে এর সম্ভাব্য প্রভাব সন্ত্রাসবাদের কারণ ও এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের বর্তমান ও অতীত ভূমিকা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন রেডিও বি-৯২, বেলগ্রেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

কী কারণে এসব হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করেন?

প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার আগে প্রথমেই অপরাধের হোতাদের

শনাক্ত করতে হবে। আপ্ত ধারণাটি হচ্ছে, এসব হামলার শেকড়টা রয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে। আর সম্ভবত এ হচ্ছে ওসামা বিন লাদেনের সংস্থারই কাজ। সন্দেহ নেই বিন লাদেনই হচ্ছেন ব্যাপক বিস্তৃত আর জটিল এই সংস্থাটির মূল প্রেরণা। তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে, বিন লাদেনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণেই এটা কাজ করছে। ধরা যাক ব্যাপারটা সত্য। তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যেকোনো বিবেকবান মানুষই বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরো এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তার বিশাল সমর্থকগোষ্ঠীর ভাবাবেগের ব্যাপারটিকেও খতিয়ে দেখতে চাইবেন। এসব ব্যাপারে আমাদের হাতে ভূরি ভূরি তথ্য আছে। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে খুবই নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞরা বছরের পর বছর বিন লাদেনের একের পর এক সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এদের মধ্যে রবার্ট ফিস্ক এ অঞ্চলে সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রতিনিধি (*দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট*, লন্ডন)। পুরো এলাকাটির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য, জ্ঞান তার নখদর্পণে। পাশাপাশি অঞ্চলটি নিয়ে তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও কয়েক দশকের। সৌদি কোটিপতি বিন লাদেন রুশদের আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করার যুদ্ধে অংশ নিয়ে এক জঙ্গিবাদী মুসলিম নেতা বনে গেলেন। রাশিয়ার ওপর মোক্ষম আঘাত হানার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সিআইএ এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থায় তাদের মিত্ররা অনেক ধর্মীয় চরমপন্থীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থকড়ি দিয়ে মাঠে নামিয়ে দিল। সৌদি কোটিপতি বিন লাদেন ছিলেন এদেরই একজন। এতে করে শুধু রুশ বাহিনীর প্রত্যাহারটাই বিলম্বিত হয়েছিল। অনেক বিশ্লেষক এমনটাই মনে করেন। তবে সিআইএর সঙ্গে লাদেনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল কিনা সেটা পরিষ্কার নয়। আর সেটা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারও নয়। সিআইএ যে নিজেদের পক্ষে সংগঠিত করার জন্য সবচেয়ে ধর্মোন্মাদ, সবচেয়ে নিষ্ঠুর যোদ্ধাদেরই বেছে নিয়েছিল তাতে আর আশ্চর্য কি! শেষমেশ উদ্দেশ্যটা ছিল 'একটি মধ্যপন্থী সরকারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মার্কিনিদের ঢালাও অর্থায়নপুষ্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকে ধর্মোন্মাদ একটি গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসানো' (*লন্ডন টাইমস*-এর প্রতিবেদক সাইমন জেনকিন্স, যিনি ওই এলাকা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ)। ওই সময়টায় 'আফগানিরা' (লাদেনসহ অনেকেই যা নন) রুশ সীমান্তজুড়ে সন্ত্রাসের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাশিয়া যখন নিজেদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নিলো তখন এরাও এসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিলো। মানে যুদ্ধটা এদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছিল না; ছিল বরং রুশদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের ওপর রুশদের অপরাধের বিরুদ্ধে।

'আফগানিরা' অবশ্য তাদের লড়াকু কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি ইতি টানে নি। বলকান যুদ্ধে এরা বসনিয়ার মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রও তখন তাতে বাদ সাধে নি। বসনিয়ার পক্ষে ইরানের সমর্থন-সহযোগিতাকে যেমনটি সহ্য করেছিল তারা। জটিল সব কারণ ছিল এর পেছনে। এখানে সেগুলো তুলে ধরার দরকার নেই। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বসনীয়দের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) তেমন কোনো মাথাব্যাথা আদতেই ছিল না।

'আফগানিরা' চেচনিয়াতেও রুশদের বিরুদ্ধে লড়ছে। খুব সম্ভবত মস্কোসহ রুশ ভূখণ্ডের অন্যান্য স্থানে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে এরা জড়িত। বিন লাদেন এবং তার 'আফগানি' বন্ধুরা তখনই কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল যখন তারা দেখল মার্কিনিরা সৌদি আরবে স্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। লাদেনের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র ছিল রুশদের আফগানিস্তান দখলের বিরোধী পক্ষ। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা ইসলামের পবিত্র স্থানগুলোর হেফাজতকারী হিসেবে সৌদি আরবের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

বিন লাদেন সেখানকার নিপীড়ক আর দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের ঘোর বিরোধী। এসব শাসককে তিনি 'ইসলাম পরিপন্থী' বলে মনে করেন। সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠী এদেরই

দলে, যেটি কিনা তালেবানের পর দুনিয়ার সবচেয়ে কট্টর মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠী। আর গোড়া থেকেই এরা যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাছের মিত্র। ওই শাসকগোষ্ঠীকে বিন লাদেন ঘৃণা করেন। আর যুক্তরাষ্ট্রকে ঘৃণা করেন সে ওইসব শাসকগোষ্ঠীকে অকাতরে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে বলে। ইসরায়েলের বর্বর দখলদারিত্বের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে চলা মার্কিন সমর্থনও ওই অঞ্চলের অন্য অনেকের মতো তাকেও যারপরনাই ক্ষেপিয়ে তুলল। ৩৫ বছর ধরে এটা চলছে। গণহত্যা, বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা নির্মম আর সর্বনাশা দখলদারিত্ব, নিত্যদিন ফিলিস্তিনিদের লাঞ্ছনার শিকার হওয়া, অধিকৃত অঞ্চলটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে পুরো সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ইহুদি বসতির বহর ক্রমশ বাড়িয়ে চলা, জেনেভা সনদকে বুড়ো আঙুল দেখানো , সেই সঙ্গে আরো যেসব কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের সর্বত্রই অপরাধ বলে স্বীকৃত – সবই সমানে চালিয়ে যাওয়া।

ওয়াশিংটন এ জাতীয় সকল কুকর্মের পক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় কূটনৈতিক, সামরিক আর অর্থনৈতিক মদদ যুগিয়ে গেছে। এসব কিছুর জন্য যুক্তরাষ্ট্রই মূলত দায়ী। ব্যাপকসংখ্যক মানুষের মনে কষ্টের অনুভূতিটা অভিন্ন। *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* (১৪ সেপ্টেম্বর) উপসাগর এলাকার ধনাঢ্য আর হোমরা-চোমরা লোকদের মধ্যে চালানো এক জনমত জরিপের ফল প্রকাশ করে। এদের মধ্যে ছিলেন ব্যাংকার, পেশাজীবী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এমন সব ব্যবসায়ী। সবার প্রায় একই মত: ইসরায়েলের অপরাধ আর যাবতীয় কুকর্মের পক্ষে জানবাজি মার্কিন সমর্থন অন্যদের মতো লাদেনও মেনে নিতে পারেন নি। পুরো একটা দশক ধরে ইরাকের বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা চলছে লাগাতার। এসব হামলায় পুরোটা দেশ হয়ে উঠেছে ধ্বংসস্তূপ। খুন হয়েছে লাখো লাখো মানুষ। অন্যদিকে সাদ্দামের শক্তির ভিত হয়েছে আরো মজবুত। বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের পুরোটা সময় জুড়ে সে তো ছিল যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের আশকারা পাওয়া মিত্র। সাদ্দাম কী না করেছে, বিষাক্ত গ্যাস হামলা চালিয়েছে কুর্দিদের ওপর। এসব বাস্তবতাকে পশ্চিমারা যতই ভুলে থাকার ভান করুক, ওই অঞ্চলের মানুষের তা বিলকুল মনে আছে। এই মার্কিনি নীতির প্রতি ধিক্কার। যে যুক্তরাষ্ট্র কিনা বছরের পর বছর ধরে সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সমাজের ঐকমত্যের সকল রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। অন্যদিকে ইরাকের বেসামরিক সমাজটাকে ছারখার করে দিয়েছে, পুরো এলাকাটায় নির্মম আর উৎপীড়ক অগণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ঢালাও মদদ যুগিয়ে এসেছে, উৎপীড়ক শাসকদের 'নির্লজ্জ আশকারা দিয়ে' অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। জনগণের বড় অংশটা দারিদ্র আর অত্যাচারে জর্জরিত। এদের মনে ক্ষোভের আগুনটা আরো গনগনে। এসব অন্যায় অবিচারের কারণে জন্ম নেওয়া হতাশা আর ক্রোধের বশবর্তী হয়েই এরা আত্মঘাতী বোমা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে । এসব ব্যাপার নিয়ে যারা মাথা ঘামান তারা সবাই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশই স্বস্তিদায়ক একটা গল্প দাঁড় করাতে চায়। *নিউইয়র্ক টাইমসের* (১৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেখানে লেখা হয়েছে, 'স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা, সমৃদ্ধি, ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের মতো যেসব মূল্যবোধকে পশ্চিমা দুনিয়া লালন করে এসেছে সেসবের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাবোধে তাড়িত হয়েই দুর্বৃত্তরা এই ভয়াবহ অপকর্ম করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর কোনো যোগসুত্র আদতেই নেই। অতএব এসব ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না।' (সার্জ শমোমান)

এটা হচ্ছে স্বস্তিদায়ক চিত্র। আর এ ব্যাপারে এদের গড়পরতা অবস্থানটা কী, ইতিহাস ঘাঁটলে তা আলবৎ আঁচ করা যাবে। বলতে কি, এটা হচ্ছে মূল্যবোধের ব্যাপার। আমরা সবাই

যা জানি, এরা ঠিক তার উল্টো ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির। তার ওপর নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়া আর ক্ষমতার পক্ষে গদগদ সমর্থনের বেলায় তো এদের জুড়ি মেলাই ভার।

এই ধারণাটাও ব্যাপকভাবে চালু যে, বিন লাদেন এবং তার মতো অন্যরা মুসলিম দেশগুলোর ওপর বড় ধরনের 'হামলা চালানোর জন্য' মুখিয়ে আছে। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল ধর্মান্ধ এক জোট হতে চলেছে। (জেনকিন্সসহ অন্য অনেকেই এমন ধরাণা পোষণ করেন) এ ধারণাও কম-বেশি চাউর হয়েছে বাজারে। উভয়পক্ষেই সবচেয়ে কঠোর আর সবচেয়ে অশুভ নির্মম যে অংশটি আছে সন্ত্রাস-সহিংসতার ক্রমবিস্তারে এরাই সব সময় বগল বাজায়। ভূরি ভূরি নজিরের মধ্যে একটা বাস্তব নজির বলকান অঞ্চলের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

অভ্যন্তরীণ মার্কিন নীতি এবং নিজেদের ব্যাপারে মার্কিনিদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এসবের প্রভাবটা কেমন হবে?

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে তার পলিসি ঘোষণা করেছে। দুনিয়ার সামনে এখন দুটো মাত্র পথ খোলা: 'হয় আমাদের দলে নাম লেখাও, না হয় অনিবার্য মৃত্যু আর তাণ্ডবের মোকাবিলা করো'। যেকোনো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ওপর ইচ্ছেমতো হামলার সার্বিক ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টকে দিয়েছে কংগ্রেস। অর্থাৎ মার্কিন নীতিটা হলো এই যে, যারা এদের সমর্থন করবে তারা সবাই বদমায়েশের হাড্ডি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন, নিকারাগুয়ায় অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্র অমান্য করার পর নিকারাগুয়াও যদি একই পদক্ষেপ নিতো সেক্ষেত্রে ওরা কী করত? মনে রাখতে হবে প্রচার মাধ্যম আর অভিজাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিশেষ ধরনের এজেন্ডা থাকে। আর সেটা আমরা ভালো করেই জানি।

হামলার প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার পর সবার মনে আশঙ্কা দেখা দিলো: এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র কী করবে? আপনিও কি ভয় পেয়েছিলেন?

যেকোনো সুস্থ মানুষের মনেই এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে আতঙ্ক জাগাই স্বাভাবিক। আর সে প্রতিক্রিয়া তো জানাই গেছে। সন্ত্রাস আর সহিংসতার ব্যাপক বিস্তার ঘটার সম্ভবনা খুবই বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে সংঘাত-সহিংসতা ছড়াবে আরো ব্যাপক, সর্বব্যাপী আকারে।

যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে পাকিস্তানকে বলে দিয়েছে, সব খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। অথচ এই সরবরাহই তো আফগানিস্তানের অন্তত কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দাবিটা যদি মানা হয়, তাহলে সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই– এমন নিরীহ লাখো লাখো মানুষকে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে। আমি আবারও বলব: যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে বলেছে লাখো লাখো মানুষ মেরে ফেলতে। অথচ এই মানুষগুলোই তালেবানি নির্মমতার সবচেয়ে বড় শিকার। প্রতিশোধ নাও ভালো কথা, কিন্তু সেটা ওই মানুষগুলোর ওপর কেন? মার্কিন জনগণের যদি সামান্যতম ধারণাও থাকত যে, তাদের নাম নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করা হচ্ছে, তাহলে তারা আতঙ্কে শিউরে উঠত। এই যখন অবস্থা তখন এমন এক বিনাশী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। এটা মানব সমাজের একটা বড় অংশের জন্য ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনবে।

যুক্তরাষ্ট্র যদি আফগানদের ওপর হামলা চালায় তাহলে বিরূপ ফলটাই ফলবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এতে করে আরো বেশি বেশি মানুষ লাদেনের সমর্থনে নাম লেখাবে। আর যদি তাকে মেরে ফেলা সম্ভব হয়, তাতেও কোনো ইতরবিশেষ হবে না। পুরো মুসলিম বিশ্বে ক্যাসেটে তার কণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। আর লোকে তাকে দেবে শহীদের মর্যাদা। স্মরণ

করিয়ে দিতে চাই, ২০ বছর আগে লেবাননে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে একটা ট্রাক নিয়ে ঢুকে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। আর তাতেই দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিধর মার্কিন বাহিনীকে লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছিল। এ ধরনের হামলা চালানোর সুযোগের কি আর শেষ আছে? আত্মঘাতী হামলা মোকাবিলা করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!

১১ সেপ্টেম্বরের পর এই পৃথিবী কখনোই আর সেই পৃথিবী থাকবে না। আপনি কি তেমনটাই মনে করেন?

মঙ্গলবার যে ভয়াবহ হামলাটা হলো সেটা একদমই নতুন। মাত্রা ও ধরনের দিক থেকেই শুধু নয় বরং লক্ষ্যের দিক থেকেও অভিনব। আর যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় ১৮১২ সালের যুদ্ধের পর তার মূল ভূখণ্ডে হামলার ঘটনা এটাই প্রথম। এর আগে এর উপনিবেশগুলোর ওপর হামলা হলেও মূল ভূখণ্ডের ওপর হামলা আর কখনোই হয় নি। উপনিবেশের পুরো সময়টায় যুক্তরাষ্ট্র আদিবাসীদের মেরে সাবাড় করেছে, মেক্সিকোর অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে, আশপাশের অঞ্চলজুড়ে ভয়াবহ সহিংস হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটিয়েছে, হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দখল করেছে (লাখ লাখ ফিলিপিনোকে হত্যার মধ্য দিয়ে)। আর বিশেষ করে গত আধা শতাব্দী জুড়ে বাকি দুনিয়ায় শক্তি প্রয়োগের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। কত মানুষ যে এর অসহায় শিকার হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। এবারই প্রথম বন্দুকের নলের মুখ ঘুরে গেছে অন্যদিকে। আর ইউরোপের ব্যাপারটা আরো নাটকীয়। ইউরোপও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে। তবে সেগুলো ছিল অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা বিশ্বের বেশির ভাগ অংশ দখল করেছে চরম নৃশংসতা আর পাশবিকতার জোরে। যাদের ওপর সে এত অবিচার-নির্যাতন চালিয়েছে তাদের তরফ থেকে সে আক্রান্ত হয় নি। বিরল ব্যতিক্রম অবশ্য আছে (যেমন, ইংল্যান্ডে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি)। তাই মার্কিনিদের সাহায্যে ন্যাটোর একাট্টা হওয়ার ব্যাপারটা তো খুবই স্বাভাবিক। শত শত বছরের ঔপনিবেশিক সহিংসতা বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সংস্কৃতির ওপর রেখে গেছে ব্যাপক প্রভাব।

এটা বলাই যথার্থ যে, বিশ্ব ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা। নৃশংসতার ব্যাপকতার জন্যই নয়, বরং লক্ষ্যের দিক থেকেও। এখন পশ্চিমা দুনিয়া কী করে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিত্তশালী আর ক্ষমতাগর্বী দেশগুলো যদি শত শত বছরের চিরাচরিত চরম সহিংস পথে এগোয়, তাহলে সহিংসতার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। এর দীর্ঘমেয়াদি ফলটা হবে বিভীষিকাময়। তবে তা এমন নয় যে সেটা ঘটবেই ঘটবে। অনেক বেশি মুক্ত আর গণতান্ত্রিক সমাজের সচেতন মানুষেরা চাইলে রাজনীতির গতিমুখকে আরো মানবিক ও সম্মানজনক পথে ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

রবার্ট ফিস্ক

আমেরিকায় সন্ত্রাস

তরজমাঃ জুয়েল মাজহার

> এই লেখাটা প্রথম ছাপা হয়েছিল ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে বৃটেনের *দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট* পত্রিকায়। এর বঙ্গানুবাদ ছাপা হয় *প্রথম আলোয়*, ৫ই অক্টোবর ২০০১ তারিখে। *প্রথম আলোর* পাঠ এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাব্য ফলাফল এই লেখায় বিশ্লেষিত হয়েছে।

ব্যাপারটা তাহলে এই। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন, বেলফোর ঘোষণা, লরেন্স অব অ্যারাবিয়াকে ঘিরে মিথ্যার বেসাতি, আরব বিদ্রোহ, ইসরায়েল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, চার চারটি আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ আর টানা চৌত্রিশ বছর ধরে আরব ভূমিতে ইসরায়েলের পাশবিক দখলদারিত্ব– মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসের পুরোটাই মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার ব্যবধানে এক ফুৎকারে চোখের আড়াল হয়ে গেল একটি ধ্বস্ত, অপমানিত জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ বলে দাবিদার একদল লোকের হঠকারী আর ভয়াবহ পাল্টা আঘাতের বদৌলতে। কোনো প্রমাণ ছাড়াই এত তড়িঘড়ি করে শেষ কথাটা বলে ফেলাটা কতটা যথার্থ, কতটা ন্যায়সঙ্গত? অথচ ওকলাহোমায় সর্বশেষ বর্বরোচিত অপকর্মের হোতাটির জন্ম তো খোদ আমেরিকার মাটিতেই? আমি ভয়ে ভয়ে আছি। আমেরিকা এ মুহূর্তে যুদ্ধোন্মাদনায় মেতে উঠেছে। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তাহলে বলতে পারি মধ্যপ্রাচ্যে মারা যাবে আরো হাজার হাজার আদম সন্তানঃ সম্ভবত আমেরিকাতেও। অতীতে আমাদের কেউ কেউ ‘অনাগত বিস্ফোরণের’ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। কিন্তু আমরা কস্মিনকালেও এমন দুঃস্বপ্নের কথা ভাবিনি।

আর হ্যাঁ, মনে উঁকি দিচ্ছে ওসামা বিন লাদেনের কথা– তার অর্থকড়ি, তার ধর্মবোধ, আমেরিকার ক্ষমতার দর্পচূর্ণ করে দিতে তার ভয়াবহ আত্মনিবেদনের কথা। বিন লাদেনের সামনে বসে আমি তার মুখে শুনে যাচ্ছিলাম কীভাবে তার লোকেরা আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, চূর্ণ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্প। সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের কারণেই তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পেরেছে। তবে আগামী দিনগুলোতে বিশ্ববাসীকে যেমনটি বিশ্বাস করতে বলা হবে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের যুদ্ধ আদতে তা নয়। ফিলি-স্তিনিদের বাড়িঘরের ওপর মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার, কানা নামের একটি গ্রামের ওপর আমেরিকানদের নির্বিচার কামান

দাগার ঘটনাও প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় আমেরিকা ও ইসরায়েলের অর্থপুষ্ট একটি লেবাননি জঙ্গি গোষ্ঠী কীভাবে শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানুষকে কচুকাটা করেছে, রক্তগঙ্গা বইয়েছে, মেয়েদের সম্ভ্রম লুটেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় যে একটি অশুভ অবর্ণনীয় ঘটনা ঘটে গেছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের হত্যাযজ্ঞের পর ফিলিস্তিনিদের আনন্দ-উল্লাস তাদের হতাশার বহিঃপ্রকাশই শুধু নয়, একই সঙ্গে এটা তাদের রাজনৈতিক অপরিপক্কতারও প্রমাণ। এতদিন ধরে তারা তাদের ইসরায়েলি দুশমনদের যে দোষে দোষী করে এসেছে, নিজেদের বেলায় তারা সেটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের উল্লাসটা তাই কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই পরিচয়। বছরের পর বছর ধরে লাগাতার হুমকি আমেরিকার বুকের মধ্যে গিয়ে আঘাত হানার, 'আমেরিকান কালসাপের' মুণ্ডু কেটে ফেলার যাবতীয় প্রতিশ্রুতিকে এতদিন আমরা অসাড়ের তর্জন-গর্জন বলেই ধরে নিয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম একটি পশ্চাদপদ, গোঁড়া, অগণতান্ত্রিক দুরাচার চক্র এবং ক্ষুদে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর এতসব হঠকারী প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার মুরোদই বা কতটুকু? কিন্তু এবার আমরা ঠকে শিখলাম!

১১ই সেপ্টম্বরের বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের ঘণ্টা কয় পর আমার মনে পড়তে লাগল আমেরিকা ও তার মিত্রদের ওপর আরো কতো অভাবনীয় হামলার কথা। ১১ই সেপ্টেম্বরের ধ্বংসযজ্ঞের তুলনায় সেগুলো ছিল নস্যি। ১৯৮৩ সালের ২৩শে অক্টোবরে বৈরুতে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে যারা ২৩৯ জন আমেরিকান নৌ-সেনা ও ৫৮ জন ফরাসি ছত্রীসেনাকে হত্যা করেছিল, তারা যে সময়টা বেছে নিয়েছিল তা কি বিস্ময়করভাবে নিখুঁত ছিল না?

আমেরিকান নৌসেনাদের ওপর বোমা হামলা এবং তিন মাইল দূরে ফরাসি ছত্রীসেনাদের ওপর হামলা– এ দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৭ সেকেন্ড। তারপর সৌদি আরবে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা হলো। আর গত বছর এডেন বন্দরে মার্কিন রণতরী ইউএসএস কোলেকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও প্রায় সফল হলো। আর মধ্যপ্রাচ্যের নতুন এই বিভীষিকাকে অনুধাবন করতেও আমরা বরাবরের মতোই ব্যর্থ হলাম। এই হতাশাতাড়িত জানবাজি-রাখা আত্মঘাতী হামলাকারীদের সামাল দেওয়ার মুরোদ আমেরিকা এবং তাদের পশ্চিমা মিত্রদের কারোরই নেই।

আর অনিবার্যভাবেই এই সর্বনাশা আগুনে–ঝড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে যে ঐতিহাসিক ভুলচুক ও অন্যায়-অবিচার সেগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কতো মরিয়া চেষ্টাই না চালানো হবে। আমাদের বলা হবে 'বর্বর সন্ত্রাসবাদের' কথা। বলা হবে 'মোক্ষম' জবাব দেওয়াটা যে কত জরুরি সে কথা। অথচ আমেরিকার প্রতি প্রধান তিনটি ধর্মের উৎপত্তিস্থলের মানুষের মনের পুঞ্জিভূত ঘৃণার কথাটাও আমাদের বুঝতে হবে।

একজন আরবকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া কী। যে কোনো সজ্জন ব্যক্তির মতো তিনিও একে এক মারাত্মক অপরাধ বলেই আখ্যা দেবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নটাও ছুড়ে দেবেন: যে অবরোধ আর নিষেধাজ্ঞা প্রায় পাঁচ লাখ ইরাকি শিশুর জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে সেটির বেলায় আমরা এরকম আপ্তবাক্য ব্যবহার করছি না কেন, ১৯৮২ সালের ইসরায়েলি দখলদারিত্বের সময় সাড়ে ১৭ হাজার বেসামরিক লোক যখন খুন হলো তখন আমরা কেন প্রতিবাদে ফুঁসে উঠিনি? গত সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে হিংসার আগুন জ্বললো। আমরা তার মৌলিক কারণগুলোকে সুকৌশলে ধামাচাপা দিতে চাইলাম। পাছে ১১ সেপ্টেম্বরের নৃশংস ঘটনার পক্ষে এগুলোর ফাঁকফোকর থেকে মোক্ষম কোনো যুক্তি বেরিয়ে পড়ে! আরব ভূমিতে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব, ফিলিস্তিনিদের সহায়-সম্পত্তি

কেড়ে নিয়ে পথে বসিয়ে দেওয়া, একের পর এক বোমাবর্ষণ আর রাষ্ট্রপরিচালিত নিধনযজ্ঞ–সবকিছুই আমরা ধামাচাপা দিতে চাইলাম।

আমাদের চোখে ইসরায়েল হচ্ছে ধোয়া তুলসি পাতা। সাদ্দাম হোসেনসহ অন্যসব দুরাচার স্বৈরশাসক যে ইসরায়েলের ঘাড়েই দোষ চাপাবে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তবু ইতিহাসের দুষ্ট প্রভাব এবং এতে আমাদের নিজেদের পাপের বোঝা ওই আত্মঘাতী হামলাকারীদের পাশেই তো অন্ধকারে এক কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিশ্রুতি যাবতীয় ফাঁকা বুলি আর আমাদের হাতে অটোমান সাম্রাজ্যের বিনাশও সম্ভবত আজকের এই ভয়াবহ ট্র্যাজেডির অনিবার্য পথেই আমাদের ঠেলে দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে ইসরায়েলের অন্যায় লড়াইয়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থের শ্রাদ্ধ করেও আমেরিকা ভেবেছিল তার গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগবে না। সেটা আর হলো না। তবু আমেরিকা যে 'বিশ্বসন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানবেই, সে তো জানা কথা। কিন্তু ঘৃণাব্যঞ্জক আর সময়বিশেষে 'সন্ত্রাসবাদ' নামের এই বর্ণবাদী শব্দটা ব্যবহারের অপরাধে খোদ আমেরিকার দিকেই আঙুল তোলে, কার তেমন বুকের পাটা?

আট বছর আগে আমি একটা টিভি সিরিজ তৈরিতে সহায়তা করেছিলাম। পশ্চিমাদের প্রতি মুসলমানদের কেন এত বিদ্বেষ, ওই সিরিজটিতে তার কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। ওই ফিল্মে যেসব মুসলমানদের সচিত্র আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছিল আজ তাদের কথাই আমার খুব মনে পড়ছে। আমেরিকায় তৈরি বোমা ও মারণাস্ত্র দিয়ে ওই লোকগুলোর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা বলাবলি করছিল, আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো সহায় নেই। প্রযুক্তি বনাম ধর্মবোধ, পরমাণুশক্তির বিরুদ্ধে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী। এখন আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি এর মানে।

ইসলাম পশ্চিম নারী

মাহমুদুল হাসান সুমন
নাজনীন আখতার

আফগানিস্তানে নারীর লড়াই সংগ্রামের ভাষা: কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্ন

> লেখকদের টীকা: এই লেখায় ব্যবহৃত দু'একটি শব্দকে আমরা যেভাবে বুঝি তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো। এপিস্টেমলজি শব্দের বাংলা করা হয়েছে জ্ঞানতত্ত্ব। এবং জ্ঞানতত্ত্ব বলতে পশ্চিমের বিদ্যায়তনিক চর্চাকেই বুঝানো হয়েছে। আবার ডিসকোর্স শব্দটিকে নামিয়ে আনা হয়েছে যুক্তি ও পাল্টা-যুক্তির পরিসরে। এরকম একটি ভাবনার সুবিধা হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর (যেগুলোকে অনেক সময় সমাজকাঠামোর উর্ধ্বে অবস্থিত কোনোকিছু বলে মনে করা হয়) আপাত অস্থিতিশীল (ডিসকার্সিভ) অবস্থাটা স্পষ্ট হয়। একারণেই তখন আলাদা আলাদা করে বলা সম্ভব হয় যে এটা হলো ধর্মীয় ডিসকোর্স, এটা বৈজ্ঞানিক ডিসকোর্স। এভাবে বলা সহজ হয়ে ওঠে একটা অখণ্ড সত্য বলে কিছু নেই সবই ভিন্ন ভিন্ন ডিসকোর্স-এর অংশ, সবই সত্য অথবা কোনোটাই নয়।

প্রাককথন

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা এখনও অব্যাহত এই লেখা অব্দি। এই যুদ্ধে সেখানকার নারীসমাজ, তাদের লড়াই-সংগ্রাম এবং তাদের লড়াই-সংগ্রামের রূপরেখা কী হবে অর্থাৎ কী হবে তার ভাষা এ-সব প্রশ্ন থেকেই এই লেখা। কিন্তু এরকম একটি বিষয়ে লিখতে যেয়ে গোড়াতেই যে পদ্ধতিগত সমস্যাটিতে পড়তে হয়– সেটা শুরুতেই বলে রাখা দরকার।

গোড়াতেই যে সমস্যাটি প্রকট হয়ে ওঠে: (ক) কী লেখা যায় আফগান নারী বিষয়ে; কী বলা সম্ভব? (খ) কী জানা যায় আফগান নারী বিষয়ে? বা ধরুন, যা জানা যায় সেগুলোর লেখক কে এবং কোন্ পাঠকের জন্য সেই লেখা? (গ) আফগান নারী, তার জীবন ও সংগ্রাম প্রশ্নে এই লেখাগুলো কতক গৎবাঁধা ধারণাকেই কি উস্কে দেয় না?

পদ্ধতিতত্ত্বের জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা জরুরি। প্রথম থেকেই এই উপলব্ধিটুকু থাকা দরকার যে, কতগুলো শক্তিশালী ক্যাটাগরির মধ্যে আফগান নারী বন্দী। আবার, তৃতীয় বিশ্বের নারী বিষয়ক আলোচনার পরিসরে এই ক্যাটাগরিগুলোই প্রভাবশালী ডিসকোর্স-এর অংশ। এই ডিসকোর্স-এর মধ্যে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

থেকেই আমরা হরহামেশা নারী-প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হতে দেখি মূলধারার মিডিয়া বা নারী- ও উন্নয়ন- বিষয়ক আলোচনায়। তাই আফগান নারীর লড়াই-সংগ্রাম নিয়ে কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই এই 'উচ্চতর ভাষা' বা ডিসকোর্সকে বর্জন করা জরুরি হয়ে পড়ে, প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচ্যুতির, অর্থাৎ পূর্বতন প্রভাবশালী ডিসকোর্স থেকে সরে আসা। কী লিখবো বা কী ভাবা যাবে তার চেয়েও এই মুহূর্তের জরুরি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এই শক্তিশালী ডিসকোর্সটিকে চিনে নেয়া।

জগত বিচারের পশ্চিমা চশমা: প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্স

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। আমাদের চারপাশে অনেকে আছেন যারা আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা প্রশ্নে সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকার আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নেবার কথা উঠছে, যারা এই বিষয়ে একটু আধটু ভাবছেন; কিন্তু মোল্লা ওমর কিংবা 'তালেবান বাহিনী' প্রশ্নে অবস্থানটা স্পষ্ট নয় অনেকেরই। কেন এমন হচ্ছে তা বুঝতে প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্স- এর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটটি বোঝা জরুরি। আমরা যখন এই লেখা নিয়ে বসি, ততোদিনে জর্জ বুশের 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন' বক্তৃতা হয়ে গেছে। ইরাক, ইরান এবং উত্তর কোরিয়াকে তিনি 'শয়তানের অক্ষ' বলেছেন। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার অব্যবহিত পর এই বুশের মুখেই শোনা গিয়েছিল আরও কিছু শব্দ বা ক্যাটাগরি। যেমন, কথাবার্তার মধ্যে তিনি 'পশ্চিম', 'ইসলাম' এই শব্দগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যা থেকে মনে হয়েছে এদের মধ্যে অনিবার্যভাবেই একটা বৈপরীত্যমূলক সম্পর্ক রয়েছে। মনে করে দেখুন আফগানিস্তানে হামলা প্রসঙ্গে বুশ বলেছেন, এই যুদ্ধ শুভ বনাম অশুভের, ভাল বনাম মন্দের, গণতন্ত্র বনাম সন্ত্রাসবাদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব শব্দ প্রয়োগে বুশ স্বদেশে বাহবা পেলেও বিদেশে বিশেষ করে প্রাচ্যের কিছু দেশে সমালোচিত হয়েছেন। (সাম্প্রতিক জনমত জরিপ থেকে মনে হয় বুশ তাঁর কাউবয় ইমেজকে কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি এখন বেশ জনপ্রিয়। জনমত জরিপ হচ্ছে পশ্চিমা গণতন্ত্রের আরেক ফালতু বিষয়, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনতাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা। কিছু হ্যাঁ -না জাতীয় প্রশ্ন দিয়ে এই জরিপগুলো পরিচালনা করা হয়। মিডিয়াগুলোই এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। কিন্তু এ দ্বারা প্রতারিত হয় সাধারণ জনগোষ্ঠী। এই শব্দগুলোর একটা বিশ্লেষণের জন্য প্রাচ্যবাদকে বোঝা দরকার।

প্রাচ্যবাদ হচ্ছে সেই বিদ্যা, যার সাহায্যে পশ্চিমের মানুষজন প্রাচ্যকে বুঝে-চিনে নেয়। যুগে যুগে এই বিদ্যা ছিল। প্রাচ্যকে নিয়ে রোমান্টিকতায় ভুগেছেন অনেক লেখক-কবি-সাহিত্যিক। চসারের (১৩৪৩?-১৪০০) লেখাতেও প্রাচ্যবাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিদ্যাটি সংগঠিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে এসে। এই বিষয়ে যার কাজের কথা উল্লেখ না করলেই নয় সেই এডওয়ার্ড সাঈদ বলেছেন, ১৮ শতকের শেষভাগে এসে প্রাচ্যবাদ একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো কাজ করতে থাকে। সাঈদের বিখ্যাত বই 'অরিয়েন্টালিজম'এ তিনি দেখাচ্ছেন কীভাবে এই বিদ্যার পরিসর নির্মিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, প্রাচ্যবাদ আসলে ইউরোপের মানুষজনের 'আমি' কেন্দ্রিক জাত্যাভিমানের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর আলোচনায় এসেছে কীভাবে একটা দুর্বল, অসম্পূর্ণ 'অন্য' পাশ্চাত্যের আলোকপ্রাপ্ত 'আমি'র নির্মাণে সহায়ক হয়েছে এবং একই সাথে কীভাবে এই বিদ্যা উপনিবেশ বিস্তারে ব্যবহৃত হয়েছে। এই 'অন্য' নির্মাণ ক্ষমতা সম্প্রসারণের সাথে যুক্ত। লিঙ্গীয় পরিসরে এই নির্মাণে 'অন্য' হয়ে পড়ে নারী। নিশ্চয়ই মনে পড়ে সিমোন দ্য

বোভোয়ার বলেছিলেন, "Evil is necessary to good, Matter to idea and Darkness to light (Simne de Beauvoir, *The Second Sex*. Trans . H.M. Parishley New York Knopt. 1953) নারীবাদীরা একারণেই বাইনারী-অপজিশনের নির্মাণকে প্রত্যাখ্যান করে, কেননা লিঙ্গীয় পরিসরে এই নির্মাণ পুরুষের ক্ষমতাকে সংহত করে।

বুশ এবং তাঁর লটবহরদের মুখে এই পরিচিত অপজিশনগুলোর ব্যবহার থেকে আমাদের মনে হয়েছে প্রাচ্যবাদের এক ধরনের সম্প্রসারণ যেন ঘটছে; নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো ক্যাটাগরিগুলোর ব্যবহার। উদ্দেশ্য: বিভ্রান্তি তৈরি করা, প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তার করা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

যে-কথা আগেই বলেছি, অনেকেই আফগানিস্তানে মার্কিনিদের এই অন্যায্য হামলাটি নিয়ে একটা সুস্পষ্ট অবস্থানে আসতে পারেন না এবং প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্স-এর মধ্যেই ঘুরপাক খান। আফগানিস্তান তাদের মননে-চিন্তনে একটা অখণ্ড ক্যাটাগরি; কখনো এটা 'সন্ত্রাস' কখনো 'মৌলবাদ' কখনোবা এটা 'মুসলিম পুরুষের হাতে নারী নির্যাতনের' চিত্রকল্প। এভাবে প্রাচ্যবাদী ধারণা আফগানিস্তান প্রশ্নে একটা অনড়, অপরিবর্তনীয় ও অকাট্য চিত্রকে আমাদের সামনে হাজির করে। এই হচ্ছে প্রাচ্যবাদ। জগৎ বিচারের একটা দ্বি-বিভাজিত রূপ, যা ব্যক্তির চিন্তায়-চেতনায় আরোপ করে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা, ফলে সে এর বাইরে আর কিছু ভাবতে পারে না।

প্রাচ্যবাদের মধ্যে এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক অহমিকা রয়েছে। এ থেকে মনে হয় জগৎটা যেন শুধু তাদের। লক্ষ করুন, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে মিডিয়াতে বার বার বলা হয়েছে: 'দ্য ওয়ার্ল্ড উইল নেভার বি দ্য সেইম এগেইন আফটার সেপ্টেম্বর দ্য ইলেভেন্থ'। পশ্চিমা মিডিয়া সূত্রেই বুঝি এই বক্তব্য একজন কোনো ব্যক্তির নয়। প্রশ্নোত্তর পর্বই বলি কিংবা সংবাদ-সম্মেলন– এই বক্তব্য বের হয়ে আসছে অনেকের মুখ থেকেই। কখনো রামস্‌ফেল্ড (আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী), কখনোবা রাস্তার সাধারণ মানুষ, যার সাথে মূলধারার রাজনৈতিক সমাজের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। সবার মুখেই একই কথা, শেয়ার্ড এবং কমনসেন্সের বিষয়। প্রাচ্যবাদের মূলেও রয়েছে এই বোধ।

পশ্চিমা এপিস্টেমলজিতে ভিন্নতার (Difference) তাত্ত্বিক পরিসর

মারনিয়া লাজরেগ-এর একটি লেখা Feminism and Difference: The Perils of Writing as a Woman on Women in Algeria, (*Conflicts in Feminism*, Edited. M. Harsch and K. fox, p.324-343, London, Routledge)। লাজরেগ কাজ করেছেন আলজেরিয়াতে। একজন আলজেরিয় নারী হিসেবে আলজেরিয়ার সমাজ এবং সেই সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে কী বলা যায়– এই মৌলিক প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য: কী পূর্ব, কী পশ্চিম নারীবাদী কাজের কেন্দ্রীয় জায়গাটি হচ্ছে কীভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে এমন একটা ব্যবস্থা পুন-র্নির্মাণ করা যায় যাতে নিজেদের একটা জায়গা হয়।

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্মরণ করিয়ে দেন এই কাজে পূর্ব ও পশ্চিমা নারীবাদী তাত্ত্বিকদের অবস্থানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। একজন পশ্চিমা নারীবাদীর জন্য তার প্রতিপক্ষ তারই সমাজের পুরুষ। সে ধরেই নেয় যে বাকি সব কিছু অর্থাৎ যেই সমাজ বা যেই সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে তিনি ধারণ করেন তা মোটের ওপর ঠিকই আছে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমের নারীবাদী তাত্ত্বিক কাজ করেন তার নিজের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার বিপরীতে একজন আলজেরিয় নারীবাদী তার

কাজ শুরু করেন একটা বহিঃতাত্ত্বিক পরিকাঠামোর ভেতর থেকে এবং একইভাবে বহিস্থঃ মূল্যসম্পন্ন ধারণা অনুযায়ী। অর্থাৎ তাকে ভাবতে হয়, ক) লিঙ্গীয় ভিন্নতার পুরুষালী ডিসকোর্স-এর কথা খ) উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের ডিসকোর্স-এর কথা এবং গ) নারী বিষয়ক বিদ্যায়তনিক ডিসকোর্স-এর কথা। একারণেই লাজরেগের মতো আলজেরিয় নারীবাদীকে এই উপলব্ধির ভেতর দিয়ে যেতেই হয় যে তাঁর জীবনবোধ, চৈতন্য কীভাবে বাইরের কিছু ধারণা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বা হয়।

আফগানিস্তানে নারীর লড়াই সংগ্রাম বুঝতে লাজরেগের এই দাবী প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে (কিছু মিলও রয়েছে এদুটি দেশের ক্ষেত্রে; দুটি দেশই দীর্ঘদিন যাবৎ বহিঃশক্তি দ্বারা আক্রান্ত ছিল। দুটি দেশই মুসলিম অধ্যুষিত এবং 'তৃতীয় বিশ্ব' হিসেবে পরিচিত)। আলজেরিয়ার প্রেক্ষাপটে লাজরেগ দেখালেন কতগুলো থিমেটিক যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে আলজেরিয় নারীবাদী জ্ঞানকাণ্ড এবং পশ্চিমা নারীবাদী জ্ঞানকাণ্ড সম্পর্কযুক্ত । দুটো সুর এখানে স্পষ্ট। প্রথমতঃ ধরে নেয়া যে, ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিযুক্ত বিশ্বাস-ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, ইসলাম একটি অধঃগামী সভ্যতা। (ইতিহাসের মূল সুরও তাই, ইসলামকে দেখা হয় একটি হেরে যাওয়া সভ্যতা হিসেবে, যার পতন হয়েছে ১২শ খৃষ্টাব্দের আগেই)।

আফগান নারী, তার লড়াই, তার নির্যাতন বিষয়ে যে সমস্ত লেখাপত্র পাওয়া যায়, তাও কি এই এক সুরে বাঁধা নয়? একটু সতর্ক হলেই দেখতে পাবেন তালেবানদের দুঃশাসন এবং নারী বিষয়ে তাদের 'কট্টরপন্থী' মনোভাব নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে পত্রিকার পাতায়, বইপত্রে, জার্নালে। আধিপত্যশীল প্রচারমাধ্যমে এ-বিষয়ে কীভাবে একপেশে বক্তব্য আসে তার উদাহরণ বরং এখন দেখা যাক। *বিবিসি* এবং *সিএনএন*-এর নিয়মিত দর্শকমাত্রই জানেন আফগানিস্তানের নারী প্রসঙ্গে কোন্ খবরগুলো গুরুত্ব পায়। লক্ষ করুন সেই অসংখ্য ইমেজ যেখানে পরিবেশন করা হয়েছে আফগান নারীর বোরখা পরবার দৃশ্য। আফগান নারীর অবগুণ্ঠন বোঝাতে এই বোরখা; প্রচ্ছন্নে এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে তালেবানদের সমাজ কতো রক্ষণশীল, কতো পিছিয়ে পড়া। আবার তালেবানরা কাবুল থেকে সরে যাবার পর পশ্চিমা মিডিয়ার ক্যামেরা আফগান নারীর অনাবৃত মুখ ফ্রেইমবদ্ধ করতে ভুল করে নি। (দেখুন *টাইম* ম্যাগাজিনের ৩রা ডিসেম্বর ২০০১-এর সংখ্যা)। প্রচ্ছদের পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে একজন আফগান নারীর ইষৎ আলোকিত মুখ আর নিচে বড় বড় হরফে লেখা 'লিফটিং দ্য ভেইল'। যেন আফগান নারীর আকাঙ্খাই হচ্ছে বোরখার 'আড়াল' থেকে বের হয়ে আসা। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় নারী-মুক্তির এজেন্ডা কীভাবে মিডিয়াই নির্ধারণ করে দেয়। প্রসঙ্গত, এখানে বলে রাখা ভাল যে, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; পাশ্চাত্যের বিদ্যায়তনিক জগতে পর্দা নিয়ে এই বাড়াবাড়ির ইতিহাস দীর্ঘকালের। এই বিষয়ে এবং প্রায় একই ধরনের শিরোনামে গবেষণা-কাজের সংখ্যাও প্রচুর। আসলে এটা সমাজবিজ্ঞানের দীনতা যে পশ্চিমের গবেষক, লেখক, সাংবাদিক যখনই ইসলামী সমাজে কাজ করেছেন, তাদের চোখ যেয়ে পড়েছে হয় পর্দার ওপরে নয়তো ধর্মের ওপরে– গবেষণার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। নিজ সমাজের ধর্মকে সঠিক-সঙ্গত বিবেচনা করে এই সমাজবিজ্ঞান এবং এভাবে "ইসলাম"-ই হয়ে পড়ে "অন্য", "আংশিক" বা "অসম্পূর্ণ"। আর একারণেই 'মাথা খালি করে' (সচরাচর গবেষণা করতে গেলে এমনই বলা হয়, গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতার খাতিরে!) যাওয়া গবেষক ইমপিরিক্যাল গবেষণার নামে 'মাঠে' যান এবং ভুরি ভুরি তথ্য হিসেবে নিয়ে আসেন একই তথ্য– পর্দা, বোরখা, নারী-অধস্তনতা অথবা ইসলামী সমাজে পুরুষতন্ত্র ইত্যাদি। অনেকের মতে গবেষণা-ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে 'এ্যাবস্ট্রাক্টেড ইমপিরিসিজম'; ইসলামী সমাজ যার শিকার।

আবারও *টাইম*-এর নভেম্বর সংখ্যার বরাত দিয়ে লিখছি। আফগান নারী বিষয়ক এই সংখ্যায় রিচার্ড লাকায়োর-এর লেখায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এমন অনেক নারী বলছেন "পর্দা মূল সমস্যা নয়"। তাঁর লেখা শুরু হয়েছে এভাবে: 'কাবুলের রাস্তায় আজকাল তুমি এমন কিছু দেখতে পাবে যা গত পাঁচ বছরে তুমি দেখ নি; সেটা হচ্ছে নারীর মুখ' (পৃ, ২৮)। প্রশ্ন হচ্ছে কে দেখতে চাচ্ছে? এই লেখা থেকেই জানতে পাই: 'উত্তর-আফগানিস্তানের গ্রামীন এলাকাগুলোতে, যা উত্তর-জোটের দখলে, মেয়েরা এখনও বোরখা পরে; এর জন্য কোনো আইনের দরকার হয় না। এমনকি কাবুলেও যেখানে তালেবানদের আসার আগে পশ্চিমী ঢঙের স্কার্ট খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল সেখানেও অনেক মহিলারাই বললেন, পর্দা নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা নেই'।

রাবিয়া বসরী হাসপাতালের একজন ডাক্তারের বরাত দিয়ে এই লেখক জানাচ্ছেন, মাথা ঢেকে না চলার জন্য তাকেও তালেবানদের আক্রোশের শিকার হতে হয়েছে; তথাপি তিনি মনে করেন, 'মেয়েরা কী গায়ে চড়াবে সে অনেক দূরের প্রশ্ন'। প্রথমত, আমাদের শান্তি দরকার। আমাদের দরকার একটি কেন্দ্রীয় সরকার। প্রয়োজন শিক্ষার। এসব কিছুর পর আমরা বোরখা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো'।

আফগানিস্তানের নারী প্রশ্নে আরেকটা থিম 'ইনভিজিবিলিটি'। এ-প্রসঙ্গে সম্প্রতি খুব বাজার পেয়েছে এমন একটা বই 'তালিবান' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। রশিদের বইয়ে মোট ১৬টি অধ্যায়। তার মধ্যে একটি অধ্যায় বরাদ্দ করা হয়েছে নারী বিষয়ে, যার শিরোনাম 'এ ভ্যানিশড জেন্ডার: উইমেন চিলড্রেন এন্ড দ্য তালিবান কাল্চার'। আফগানিস্তানে মার্কিন তেল-গ্যাস স্বার্থটাকে তিনি যেভাবে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন ততোটা পারেন নি নারী বিষয়ে লিখতে যেয়ে। উল্লেখিত অধ্যায়ের গোড়াতেই তিনি তালেবান শাসনামলে আফগানিস্তানে নারীর জীবনে কীভাবে পরিবর্তন এল, কীভাবে শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, জনজীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল নারীরা তা জানাচ্ছেন। এই তথ্য-বর্ণনার সমস্যা কিছু নেই। কিন্তু তাঁর লেখা পড়লেই আঁচ করা যায় পশ্চিমা পাঠককে মাথায় রেখেই তিনি লিখছেন। এটা স্পষ্ট হয় যখন মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে তিনি তালেবানদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মৌওলভি কামালুদ্দিনের সাথে তাঁর কথাবার্তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি লিখেছেন:

> I nervously asked Quamaluddin what justifed the Talibani ban on women from working and going to school; we will be blamed by our people if we don't educate women and we will provide education for them eventually but for now we have serious problems, he replied . (p. 116)

লক্ষ করুন এই অনুচেছদটি পশ্চিমা পাঠকের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লেখক যদিও পাকিস্তানি তথাপি তাঁর উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন এবং পশ্চিমা পাঠকের প্রশ্ন এখানে একাকার হয়ে যায়। পশ্চিমা পাঠকের কথা মাথায় রেখে আফগানিস্তানের নারী প্রশ্নকে দেখলে এই প্রাচ্যবাদী/ উন্নয়নবাদী ডিসকোর্স-এর মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে। এতে গল্প লেখা যাবে অনেক। হাওয়া বাতাসের কথাও বলা যাবে কিন্তু কাজ কিছু হবে না। আফগান নারীর লড়াই-সংগ্রামের রূপরেখা আঁকতে হবে আফগানিস্তানকে মাথায় রেখেই, ইউরোপ-আমেরিকাকে নয়।

আফগান নারীর লড়াই কী হবে, কোন্ পথে এগোবে সেই সংগ্রাম, তা বুঝতে হলে পশ্চিমা

জ্ঞানতত্ত্বের শক্তিশালী কিছু নির্মাণ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কেননা অনেক আগেই এই নির্মাণের মধ্যে আফগান নারীর তথা তৃতীয় বিশ্বের নারী-পুরুষের ভাষা আত্মসাৎকৃত হয়েছে। মিশেল ফুকো এটাকে বলেছেন কর্তাসত্তার গায়েব হয়ে যাওয়া বা 'অবজেক্টিফিকেশন অব সাবজেক্ট'। তাঁর মতে, ক্যাটাগরিগুলো এই গায়েবী সত্তাকে (গায়েব হয়ে যাওয়া কর্তাসত্তা) জারি রাখে, পুনরুৎপাদন করে।

ভিন্নতার আন্তবিষয়গত ভিত্তির উন্মোচন

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে 'গায়েবী কর্তাসত্তা' কীভাবে জারি থাকে, কীভাবে পুনরুৎপাদিত হয় ফুকো তা দেখিয়েছেন। কিন্তু আর কিছু নয়। আমরা এখানে গায়েব হয়ে যাওয়া কর্তাসত্তাকে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সে-সম্বন্ধে বলছি। এবিষয়ে লাজরেগ বলছেন, "প্রয়োজন এমন একটি উপলব্ধির যা থেকে বোঝা সম্ভব তৃতীয় বিশ্বের নারীর জীবনও অর্থবহ, সংহত এবং 'আমাদের' ভাবনার বাইরে অনুমেয় বা অনুমানযোগ্য। এর একটি অর্থ দাঁড়ায় তাদের জীবনও 'আমাদের' জীবনের মতো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানের সাহায্যে কাঠামো লাভ করে। এ-ভাবনার আরেকটি অর্থ এই নারীদের জীবনেও নিজেদের চারপাশকে গড়ে তুলবার সুস্পষ্ট তাগিদ রয়েছে। আর আমাদের মতো করে সেও কখনও তার পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে নিজের মতো করে। নিজের মতো করে ভাববার অবকাশ তাদেরও রয়েছে এবং তারা তাদেরই জন্য, আমাদের জন্য নয়। পদ্ধতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এমন একটি উপলব্ধি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকলেরই নিজ নিজ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্য থেকে ভাব প্রকাশের অধিকার আছে। সংহতির সাধারণ সূত্রগুলোও বের হয়ে আসে এরকম একটি উপলব্ধি থেকে।

উপলব্ধির এ-স্তর থেকে দেখলে আফগান নারী বিষয়ক অধিকাংশ লেখালেখি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট অবস্থান তৈরি করা সম্ভব বলে আমাদের মনে হয়।

শেষ কথা

এই প্রবন্ধে আলোচিত পদ্ধতিতত্ত্বের সংকটের কথা মাথায় রেখেই ধরে নেই, আফগানিস্তানের নারী প্রশ্নে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। লেবেল আঁটার যে বিষয়টা বলা হলো, এটা পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যা। এই লেবেল করাটা নিজেদের সুবিধার জন্যই বাদ দিতে হবে। বোরখার সাথে নারীমুক্তির সম্পর্ককে যেভাবে অনিবার্য করে তোলা হয়– সেটা সমস্যাজনক। পাল্টা যুক্তি একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যাবে। (বলা বাহুল্য মিডিয়াতে এই মতগুলোর জায়গা হয় না।)

আফগানিস্তানের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত সাইয়ীদ রাহমাতুল্লাহ হাশেমীর একটি বক্তৃতা থেকে জানতে পাই, তিনি যুক্তি দিচ্ছেন:

> সত্য, নারীরা এখানকার মতো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) প্রতিরক্ষা-মন্ত্রণালয়ে কাজ করে না। আমরা চাই না যে আমাদের নারীরা যুদ্ধ-বৈমানিক হোন কিংবা তারা বিজ্ঞাপনে দর্শনীয় বস্তু আকারে ব্যবহৃত হোন। তারা কাজ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ে, সমাজকল্যাণমন্ত্রণালয়ে এবং এরকম। (যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ই মার্চ ২০০১ তারিখে দেয়া বক্তৃতা 'অদৃশ্য আফগানিস্তান' নামে ছাপা হয় *প্রথম আলোর* ২৬শে অক্টোবর ২০০১ সংখ্যায়; অনুবাদক: মানস চৌধুরী)।

সুতরাং আফগান নারীকে তার লড়াইটা করতে দিন।

বারবারা এরেনরিখ

নারীবিদ্বেষের রহস্য

তরজমা: নাজনীন আখতার ও মাহমুদুল হাসান সুমন

এখানে অনূদিত লেখাটা আমরা নিয়েছি Alternet.org নামের ওয়েবসাইট থেকে। লেখাটা আদিতে বেরিয়েছিল *দ্য প্রগ্রেসিভ* পত্রিকায় ৩০শে নভেম্বর ২০০১ তারিখে।

অনুবাদকদের টীকা: তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নারী বিষয়ে লিখতে যেয়ে পশ্চিমের নারীবাদী তাত্ত্বিকরা, কিংবা ধরুন সমাজবিজ্ঞানীরা, যে-সংকটের মধ্যে পড়েন, তা এই লেখাটিতেও রয়েছে। বিদ্যায়তনিক পরিসরে এটা একটি পদ্ধতিগত সংকট, যাকে মোকাবেলা না-করে এক পা-ও এগোনো ঠিক হবে না বলে আমাদের মনে হয়। (দেখুন: মাহমুদুল হাসান সুমন ও নাজনীন আখতার, "আফগানিস্তানে নারীর লড়াই সংগ্রামের ভাষা: কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্ন"; **মানুষ**-এর বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত) তালেবানদের শাসনামলে নারীদের স্থান 'গবাদি পশুরও নিচে'– এই বক্তব্য ঠিক কি বেঠিক সেই প্রশ্নের কথা হচ্ছে না এখানে। বরং আমরা বলতে চাচ্ছি, কী তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিতত্ত্বের সাহায্যে এই বক্তব্য বা বক্তব্যসমষ্টি নির্দিষ্ট/নির্ধারিত হয় তা উন্মোচন করা। এটা করতে পারলেই আমরা কীভাবে এই আলোচনা/বক্তব্য 'প্রাচ্য'কে দেখবার শক্তিশালী ডিসকোর্সে প্রোথিত তা বুঝে উঠতে পারব। লেখাটিতে মৌলবাদ শব্দটির অসতর্ক ব্যবহার ও 'মিডিয়ার প্রচারণা' বিষয়ে কোনো ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিও আমাদের চোখে পড়েছে।

তবে লেখাটির অন্য একটি গুরুত্ব রয়েছে। লেখাটি লিঙ্গ কীভাবে একটি প্রতিরুদ্ধ (কনটেস্টেড) ইমেজ তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্যারা হোয়াইটের একটি কাজের কথা যেখানে মেরি পুভি'র একটি গবেষণা-কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। পুভি'র কাজ সম্পর্কে হোয়াইট বলছেন (White, 1992: 11): "পুভি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন সমাজে লিঙ্গ কীভাবে একটি প্রতিরুদ্ধ ইমেজ হিসেবে কাজ করে। লিঙ্গের মতাদর্শগুলো স্থির নয়, বরং তারতম্যযুক্ত; তারা নিজেরাই একটি বিতর্কের বিষয়, এবং এই বিতর্কগুলো অপরাপর দ্বন্দ্বসমূহের ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করে।"

এরেনরিখের লেখায় একাধিক জায়গা থেকে স্পষ্ট হয় লিঙ্গের বিবিধ মতাদর্শ কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পরিচয় হিসেবে কাজ করে। লক্ষ করুন, এরেনরিখের লেখায় যখন বলা হচ্ছে, "হলিউড-সংস্কৃতি জুড়ে রয়েছে শক্তিশালী বা নিজের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারে এমন নারীর চিত্র এবং তাই ইসলামী মৌলবাদীদের তাগিদটা হয়ে দাঁড়ায় নারীকে দাসী বানিয়ে এর মোকাবেলা করা" একটা পর্যায় পর্যন্ত এই উদাহরণগুলো লিঙ্গীয় ভিন্নতার বটে। তবে একই সাথে উদাহরণগুলো দেখায় সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ দ্বন্দ্বের নির্মাণে লিঙ্গ কীভাবে একটি মাধ্যম বা উপায় হিসেবে কাজ করে।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

নারীবাদীরা এটা ভেবে খানিকটা হলেও স্বস্তি বোধ করবেন যে, তালেবানদের কুখ্যাত/চরম নারীবিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত খবরের বিষয় হিসাবে গণ্য হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই মে মাসেও ওয়াশিংটনের এজেন্ডার ওপরের দিকে বিষয়টি ছিল না। উদাহরণ হিসেবে, যখন প্রেসিডেন্ট বুশ তালিবান সরকারকে আফিম চাষ বন্ধ করার জন্য অভিনন্দিত করেন এবং ৪৩ মিলিয়ন ডলারের একটি চেক তাদের হাতে তুলে দেন তখনও যে তালেবান শাসনামলে নারীদের স্থান গবাদিপশুরও নিচে ছিল সে প্রশ্নটি আসে নি। যাহোক, ১১ই সেপ্টেম্বরের পরের সপ্তাহগুলোতে, আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া আফগান নারীদের সাথে অপরা (উইনফ্রে অপরা কর্তৃক পরিচালিত অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি টিভি-টক্‌শো–*অনুবাদক*) এবং বহুদিনের তালিবান-বিরোধী কর্মী ম্যাভিস লিনোর ক্যবল টিভির আলোচনা অনুষ্ঠান। সিএনএন ‘পর্দার অন্তরালে’ নামে তথ্যচিত্র দেখিয়েছে, এমনকি বুশও নারীদের ওপর তালিবানদের হিংস্রতাকে গুরুত্বের সাথে দেখছেন, যদিও এখনও পর্যন্ত ওসামা বিন লাদেনের প্রতি তালিবানদের আতিথেয়তাকে আরো বড় অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে। নারীর অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিতে বড় কোনো জায়গা করতে পারে নি, তবে সম্ভবত আমাদের খুশি হওয়া উচিত যে, যুদ্ধের কারণে মিডিয়ার প্রচারণায় বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

বিশ্লেষণ করে দেখলে তালিবানদের নারীবিদ্বেষ এবং তারও বাইরে সাধারণভাবে ইসলামী মৌলবাদীদের নারী বিদ্বেষ রয়ে গেছে প্রায় পুরোটা অবহেলিত। নারীর মাত্রাতিরিক্ত বিচ্ছিন্নকরণ এবং নিপীড়ন যদি কোরআন থেকে না এসে থাকে, যেমনটা অমৌলবাদী মুসলমানরা দাবী করে, যদি সেটা নতুন কিছুই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে আবির্ভূত হলো কেন? উদারনৈতিক এবং বাম-ঘরানার ভাষ্যকাররা, কেন মৌলবাদীরা আমেরিকাকে ঘৃণা করে সে বিষয়ে ব্যাপক কাজ করেছেন, কিন্তু মৌলবাদীরা কেন নারীদেরকে ঘৃণা করে সে বিষয়টি কেউ খতিয়ে দেখতে দায়বোধ করেন নি।

এখানে ঘৃণা শব্দটাই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলবাদীরা দাবী করতে পারে যে, নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন এবং পর্দার অন্তরালে রাখাটা দুর্বল, নাজুক যৌনবস্তু হিসেবে তাদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু এই রক্ষা করার যুক্তি কাশ্মির এবং পাকিস্তানের মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে কমই খাটে, যারা পর্দাবিহীন নারীদের মুখে এসিড মারতে পারদর্শী। সুরক্ষা এবং সুরক্ষা-জাল নিয়ে হৈ চৈ এর মধ্যে পার্থক্য আছে।

মৌলবাদীদের নারীবিদ্বেষের রহস্য হয়ে ওঠে আরো গভীর যখন আপনি তৃতীয় বিশ্বের ৪০-৪৫ বছর আগের সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলোর দিকে তাকাবেন। এই আন্দোলনগুলোর অধিকাংশই নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, অন্তত কাগজেপত্রে, অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। মাও সেতুং-এর লংমার্চে নারীরা অংশগ্রহণ করেছে, তারা আলজেরিয়ার বিপ্লবে লড়েছে এবং মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, এল-সালভাদরের গেরিলা বাহিনীতে তারা যুদ্ধ করেছে। এইসব আন্দোলনের মতাদর্শে নারী অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অন্তত তাত্ত্বিকভাবে সমতার ধারণাটি ছিল। ওসামা বিন লাদেনকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের যোগ্য উত্তরসুরী বলা অবশ্যই কঠিন, তবে তিনি নিপীড়িত মানুষজনের কথা বলতে চান এবং পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও সমরবাদের বিরুদ্ধে, এটুকু বাদ দিলে তার আন্দোলন সবচেয়ে নিপীড়িত লিঙ্গের জন্য কেবল বোরখা এবং ঘরের চৌহদ্দীর মধ্যে বন্দী একটি জীবন ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।

ভাষ্যকারদের মধ্যে যারা এই বিষয়টি নিয়ে একটু আধটু ভাবেন তাদের অধিকাংশই নারীবিদ্বেষকে মৌলবাদীদের ‘আধুনিকতা’ বা ‘পশ্চিম’-কে ঢালাওভাবে বর্জনের অংশ হিসেবে

দেখেন। হলিউড-সংস্কৃতি জুড়ে রয়েছে শক্তিশালী বা নিদেনপক্ষে যৌনক্ষেত্রে নিজের আকাঙ্খাকে প্রকাশ করতে পারে এমন নারীর চিত্র এবং এভাবে, যুক্তি হিসেবে, ইসলামী মৌলবাদীদের তাগিদটা হয়ে দাঁড়ায় নারীকে দাসী বানিয়ে এর মোকাবেলা করা। অন্যথায়, এই ব্যাখ্যাটির একমাত্র সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমকে প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে মৌলবাদীরা লক্ষণীয়ভাবে নৈর্বাচনিক। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় যুক্ত ১৯ জন সন্ত্রাসী বিমান-চালনা শিখেছিলেন এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতেন ই-মেইল এর সাহায্যে। ওসামা বিন লাদেন এবং তালিবানরা একধারি তলোয়ার এর বদলে স্ট্রিংগার এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রপাতি পছন্দ করেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তুমি পশ্চিমা প্রযুক্তি গ্রহণই করতে পারো তাহলে জনজীবনে নারীর অংশগ্রহণ, যা পশ্চিমা অর্থনৈতিক সফলতার ক্ষেত্রে বড়মাপের অবদান রেখেছে তাকে ছুঁড়ে ফেলো কীভাবে?

এর উত্তর পাওয়া যাবে সম্ভবত যে-প্রক্রিয়ায় বিশ্বায়ন পুরুষের জন্য সুনির্দিষ্ট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে। পশ্চিমা শিল্প নারীপুরুষ উভয়ের সনাতন শিল্পকৌশলকে সরিয়ে দিয়েছে এবং বৃহদাকার বহুজাতিক কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত কৃষি স্বাধীন কৃষককে পরিণত করেছে ভাড়াটে মজুরে। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত এই প্রবণতাসমূহের ফলাফল হিসেবে পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্থানান্তরকরণ ঘটেছে এবং বেকারত্ব দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের নারীর জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে রপ্তানীমুখী উৎপাদনের ক্ষেত্রে; যেখানে নারীর হাত বেশি সচল ধরে নিয়ে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, এবং সম্প্রতি ধনী দেশসমূহে ঘরের কাজ করার জন্যও।

অবশ্যই এগুলো বড়সড় ক্যারিয়ার গড়বার কোনো সুযোগ নয়, বরং প্রায়শই তাদের অল্প বেতনে এবং অপমানজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। তথাপি বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে নারী শ্রমের চাহিদা এবং ধনীদের ঘরে কাজ করার সুযোগ একটা বৈশ্বিক লিঙ্গীয় বিপ্লব এনে দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। যেখানে পুরুষরা কৃষক এবং উপার্জনক্ষম হিসেবে তাদের ঐতিহ্যগত মর্যাদা হারিয়েছে, সেখানে নারীরা বাজার অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করছে এবং এই সামান্য উপার্জন তাদের একটু হলেও স্বাধীনতা দিচ্ছে।

এই সমস্যা বিশ্বায়নের প্রভাবে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক বিচ্যুতিসমূহের সাথে যদি পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ইমেজাবলী যোগ করি তবেই আর্লি হসচাইল্ড যাকে ‘বৈশ্বিক পুরুষতন্ত্রের সংকট’ বলেছেন, সেটা দেখতে পাব। যে লোক আয়-পাত্তি করতে পারে না, যাকে নির্ভর করতে হয় স্ত্রীর আয়ের ওপর, সে পাইরেটেড ভিডিওতে হলিউডি ছবি দেখে ভাবতেই পারে যে, পৃথিবীটা এখন উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। সোজাভাবে বললে সুজান ফালুডির ১৯৯৯-এ প্রকাশিত বই *Stiffed*-এ বলা হয়েছে আমেরিকাতে ঐতিহ্যবাহী পুরুষত্বের প্রত্যাখান ঘটেছে বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে।

অথবা এমনও হতে পারে বিশ্বায়নের এই ধারাক্রম ইসলামপন্থী মৌলবাদের নারীবিদ্বেষ তৈরিতে খুব সামান্যই ভূমিকা রেখেছে। হাজার হউক তালেবানদের নিজের দেশ আফগানিস্তান কখনই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য জনপ্রিয় ক্ষেত্র ছিল না। এক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনভিত্তিক ব্যাখ্যার স্মরণাপন্ন হতে পারি এবং যুদ্ধের পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে পারি। গত বিশ বছরের বেশীরভাগ সময় আফগানরা হয় নিজেদের মধ্যে নয়তো সোভিয়েত-বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, যেমনটা ক্লস থিওলেট (Klaus Theweleit) তার ১৯৮৯ সালে লিখিত *Male Fantacies* -এ বলেছেন, দীর্ঘ সময়ের, যোদ্ধাদের মধ্যে নারীদেরকে অনৈতিক, দুর্বলকারী শক্তি হিসেবে দেখার প্রবণতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সম্ভবত পাকিস্তানের সব পুরুষ-প্রধান মাদ্রাসাগুলোর

কথা বলা যায়, যেখানে ৬ বছরের ছোট্ট শিশুও জেহাদের জন্য প্রশিক্ষিত হয়, মা-বোনদের সম্ভাব্য কোমলতাসুলভ প্রভাব থেকে দূরে সরে বা সন্ত্রাসী মোহাম্মদ আতাহ্‌র নির্দেশকে মনে করা যেতে পারে, তার ওয়ারিশনামাতে বলা হয়েছে, কোনো নারীই যেন তার লাশ না ছোঁয় এবং কবরে না আসে।

কিন্তু তারপরেও ইসলামী মৌলবাদকে অপরাপর মৌলবাদের প্রেক্ষাপট অর্থাৎ খৃষ্টবাদী ও ইহুদীপন্থী মৌলবাদ থেকে আলাদা করে দেখার ভুলটা রয়েই গেল। এই তিনটি পন্থাই সুদূর প্রাচীন মধ্য-পশ্চিম ট্রাইবদের মাঝে নারীদের যে অবস্থা ছিল বা যে অবস্থা তাদের ছিল বলে তারা বিশ্বাস করে, তাকে সংরক্ষণ করার পক্ষে।

ধর্মীয় মৌলবাদকে সাধারণভাবে আধুনিক, পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে একধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং প্রত্যেক জায়গাতেই মৌলবাদ নারীর প্রতি বিদ্বেষী। ১১ই সেপ্টেম্বরে পর থেকে যে সকল হুমকির মুখোমুখি আমরা তার সম্পূর্ণ প্রকৃতি বুঝতে হলে আমাদেরকে এর উত্তর খুঁজতে হবে। বুঝতে হবে নারী গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

White, Sara (1992). *Arguing with the Crocodile*. Dhaka: UPL.

সোনালী কোলহাৎকর

আফগান নারীদের 'উদ্ধারকার্য'

তরজমা: সায়দিয়া গুলরুখ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেড-নেট (http://www.zmag.org) ই-মেইলে যেসব আপডেট ও ভাষ্য পাঠায় তার অংশ হিসাবে ৯ই মে ২০০২ তারিখে পাওয়া যায় এই লেখাটা। **মানুষ**-এ যখন এটা তরজমা করার কথা আমরা ভাবছিলাম ঠিক তখনই সায়দিয়া গুলরুখের স্বতঃপ্রণোদিত-হয়ে-পাঠানো এই অনুবাদটা আমাদের হাতে আসে।

যখন প্রস্তুত হলাম হেলেন ক্যালডিকটকে সাক্ষাৎকার দেবার জন্য, বিখ্যাত হেলেন ক্যালডিকট, এক্টিভিস্ট এবং নারীবাদী, তখন সতীর্থ অপরাপর সাক্ষাৎকারদাতাদের বলছিলাম আমার হিরোদের মধ্যকার একজনার সাথে কথা বলব ভেবে কতটাই না আমি উত্তেজিত। আমি হেলেনকে রেডিওতে শুনেছি, তাঁকে নিয়ে লেখা এবং তাঁর লেখা পারমাণবিক অস্ত্র ও পরিবেশ বিপর্যয় বিরোধী প্রবন্ধ পড়েছি। হেলেন দেরী করে এসেছিলেন কিন্তু তাতে কী – আমি ভীষণ আলোড়িত ছিলাম তিনি আমার সাক্ষাৎকার নেবেন। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে আমরা শুরু করতে পারলাম, আমরা শেষ পর্যন্ত শুরু করলাম। তিনি আরম্ভ করলেন আফগান উইমেন্স মিশন এবং আফগান নারীদের অধিকার নিয়ে আমার কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আমার নার্ভাসনেস সত্ত্বেও, আমি শান্তভাবে জবাব দিলাম, কিন্তু হেলেন আমাকে বাক্য শেষ করতে দিলেন না। তিনি আমাকে তাগাদা দিতে থাকলেন কেন আফগান পুরুষেরা আফগান নারীদের সাথে এমনতর ব্যবহার করে সে বিষয়ে বলার জন্য। আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম আফগানিস্তানের নারী বিদ্বেষী মৌলবাদীদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতায়ন প্রসঙ্গে এবং আরও বলতে চাইলাম কিভাবে মার্কিনী সহযোগিতায় এক প্রজন্মের আফগান পুরুষ প্রতিপালিত হয়েছে যারা কিনা তাদের অস্ত্রের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছে নারীদেরই উপর। কিন্তু তিনি উৎসুক ছিলেন অন্য একটি উত্তরের প্রতি এবং আমাকে ঠেলতে লাগলেন যেন আমি তাঁর মাথার মধ্যে কী আছে সেটা বুঝে নিয়ে তিনি যা শুনতে চান তাই তাঁকে বলতে শুরু করি। তাঁর আক্রমণাত্মক প্রশ্নের তোড়ে শেষ পর্যন্ত আমি হাল ছেড়ে দিলাম, আর তিনি অগ্রসর হলেন নারীর খৎনা বিষয়ে বিস্তারিত আমাকে জানাবার জন্য যা দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটি[১] আন্দাজী তাঁকে বলেছেন যে তা আফগান নারীদের ক্ষেত্রেও ঘটে। এই তথ্যে আমি হতবিহ্বল, আফগান নারীদের অধিকার

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

বিষয়ে দীর্ঘ বছরের সূক্ষ্ম পড়াশোনা সত্ত্বেও বিষয়টি আমার কানে আসেনি, আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, এইটা এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে আমি অবগত নই। সাক্ষাৎকার শেষ হ'ল যখন আমি হেডফোন খুলে ফেললাম এবং যখন নারীর যৌনাঙ্গ সেলাইকরণ এবং ফলতঃ আফগান পুরুষেরা আফগান নারীদের শীর্ষসুখ (orgasm) দিতে অনাগ্রহী এহেন বর্বরতার কথা বলতে বলতে হয়রান হেলেনের উপর ক্রুদ্ধ, হতাশ আমি ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম।

আমি ছুটে গেলাম আমার কম্পিউটারের কাছে, কিছু খোঁজ খবর করার জন্য। আমিই কি ভুল হতে পারি? সত্যিই কি আফগান নারীদের মধ্যে এর প্রচলন আছে? আমি ভাবতেই পারছিলাম না। আমি জানতাম এটি আফ্রিকার কিছু দেশের নারীদের ক্ষেত্রে সত্য। নিশ্চিতভাবেই আমি নারীর খৎনার কথা শুনেছিলাম আমার স্বদেশ ভারতের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে নিকটতম দেশগুলোর ক্ষেত্রে, একটি দেশ যার সম্পর্কে আমি নিবিড়ভাবে পড়াশোনা করেছি? শেষমেষ মিস. ক্যালডিকটই ভুল সাব্যস্ত হ'ল। নারীর খৎনা আফগানিস্তানে প্রচলিত নয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে দুটো জিনিস আমি শিখলাম: ১) কোনও প্রশংসিত অধিষ্ঠাই প্রাপ্য হিসেবে যথাযথ নয় – মহত্ত্ব হ'ল একটি অতিরঞ্জিত ধারণা, এবং ২) হেলেন ক্যালডিকটের মতন নারীবাদী, এবং দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটি, নারীবাদ সম্পর্কে সংকীর্ণ পূর্বানুমান এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অটুট রেখেই দক্ষিণ বিশ্বে নারীদেরকে আহ্বান করে থাকেন সাধারণতঃ। যে শক্তিগুলো (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পশ্চিমা পুরুষাধিপত্যশীল সরকার) আফগান নারীদের অধিকারের মূল্যে নারী বিদ্বেষী ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রতিপালন করে সেগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণের থেকে, হেলেন ক্যালডিকট বেশী আগ্রহী ছিলেন আফগান পুরুষদিগের আফগান নারীকে মাটির দলার মতন ব্যবহারের কামনাকে উন্মোচিত করার ব্যাপারে।

আফগানিস্তানের "বর্বর" পুরুষদের দোষী সাব্যস্ত করা আর আফগান নারীদের করুণা দেখানোর কাজটা সহজ। এই প্রেষণাই দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটিকে আফগান নারীদের জন্য "জেন্ডার এপারথিড"[২] প্রচারণায় ধাবিত করে। অনেক বেশী আগ্রহী পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবৃত নির্বাক সৃষ্টি হিসেবে আফগান নারীদের রূপকল্প দাঁড় করাতে, দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটি হিংস্রভাবে একে প্রচার করে, তাদের প্রচারাভিযানের একটুকরো জালি কাপড় বিক্রির মাধ্যমেও, ঠিক যে রকম জালির ভেতর দিয়ে আফগান নারীরা বাহিরটাকে দেখতে পায়, যখন তারা ঐতিহ্যবাহী আফগান পোশাক পরিধান করে থাকেন। যে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে নেটের টুকরোটি বিক্রি হয় সেটাতে লেখা থাকে, "আফগান নারীদের জন্য স্মৃতির প্রতীককে পরিধান কর", যেন আফগান নারীরা ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এর বিকল্প হতে পারত "আফগান নারীদের প্রতিরোধকে উদযাপন করা"র নামে একটা পিনবিদ্ধ মুষ্টিবদ্ধ হাত, যে প্রকৃত লড়াই আফগান নারীরা নিত্যদিন জারী রেখেছেন তাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে, বিশেষভাবে রেভুলিউশনারী এসোসিয়েশন অব উইমেন অব আফগানিস্তানের নারীরা, যাঁরা আছেন সংগ্রামের একেবারেই প্রথম সারিতে। মজার ব্যাপার হ'ল, যাঁরা এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে ৫০% গিয়ে হাত লাগান দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটির এই আফগানিস্তানের জন্য "জেন্ডার এপারথিড" প্রচারাভিযানে।

পশ্চিমের মূলধারায় আফগান নারীদের প্রায় প্রতিটি রূপকল্প এমনকি বিকল্প ধারাতেও, অবয়বহীন নীল পোশাকে সজ্জিত বোরখা আবৃত আফগান নারীর রূপকল্পগুলোই প্রভাবশালী (এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পোষ্টারে আফগান নারী, শেরিল বার্ণাডের RAWA-এর উপর লেখা বইয়ের প্রচ্ছদে, ইত্যাদি)। বোরখার রূপকল্প কী প্রতিক্রিয়া তৈরী করে তা আমরা সবাই জানি এবং বুঝি, বিশেষ করে পশ্চিমা নারী এবং নারীবাদীদের কাছে। রক্তাক্ত গাড়ীর ধ্বংস্তূপের মধ্যকার দৃশ্য উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখবার সেই ভয় মেশানো আতঙ্ক এবং কদাকার

আগ্রহের মতন যা দেখে তোমার বমি বমি ভাব হবে, কোনও না কোনওভাবে তুমি তা করবেও। কার কাজে আসবে এটি? কতটা "কার্যকরী" হ'ত দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটি-র এই প্রচারাভিযান যদি তারা জেনে নিত যে আফগান নারীরা সক্রিয়ভাবেই লড়াই করছে এবং ওদের কেবল টাকা পয়সা আর নৈতিক সমর্থন দরকার, কোনও নির্দেশনামা নয়? হয়তো এটাই কারণ, শুনেছি, দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটি RAWA-এর সাথে কাজ করতে আগ্রহী নয় – RAWA হ'ল মাত্রাতিরিক্ত স্বনির্ভর এবং রাজনীতিকৃত। আফগান নারীরা কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে, বাতাসে মুষ্টিবদ্ধ হাত, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সেক্যুলার সরকার বিষয়ক ব্যানার বহন করছে, এমন রূপকল্প প্রচার করে কিইবা মহত্ত্ব জাহির করার আছে? সেইসব নারীদের তো উদ্ধার করার দরকার পড়ে না যতটা বোরখা পরিহিত নারীদেরকে উদ্ধার করার প্রয়োজন পড়ে বলে মনে হয়। আমরা সম্ভবত অনুধাবন করতে পারছি যে বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন, দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটির বাতলে দেয়ার দরকার নেই যে কী উপায়ে আফগান নারীরা তাদের অধস্তনতা মোকাবেলা করবে? আমরা সম্ভবত এটাও ধারণা করতে পারছি, আফগান নারীরা নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ যদি কেবল আমাদের সরকার সমাজের সবচাইতে সহিংস অংশের অস্ত্রকরণ এবং মতায়ন বন্ধ করে। হাজার হোক, ঐটিতো সি.আই.এ যে কিনা ১৯৭০-এর দিকে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের মতনদের অস্ত্রসজ্জিত এবং প্রশিক্ষিত করেছে, এমনকি তাদেরকে সমর্থন যুগিয়েছে যারা এসিড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করত নারীকে যে নারী নিজেকে ঢেকে-ঢুকে রাখতে ব্যর্থ হ'ত। হেকমতিয়ার সি.আই.এ.-এর নিকট পরিচিত হয়েছিলো "ফ্যাসিবাদী" হয়ে উঠতে পারার কারণেই। আফগান নারীদের নিয়ে হেলেন ক্যালডিকটের বক্তব্যে সি.আই.এ.-এর বর্বরতার সমালোচনা কোথায় গেল?

কেবল মার্কিনী সাদা নারীবাদীরা দক্ষিণ বিশ্বের নারী আন্দোলনের ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তা নয়। এই মার্চে, আফগান উইমেন্স মিশনের বোর্ড হতে বিশ্ব নারীদের ধর্মঘটে (Global Women's Strike) যোগদানের অনুমোদন আদায় করে আমি ভীষণ আলোড়িত ছিলাম, যা কিনা প্রতি বছর আন্তজার্তিক নারী দিবসে উদযাপিত হয়। ধর্মঘটটি তিন বছরের একটা আন্দোলন দশের অধিক দেশের নারীদের মধ্যে বিস্তৃত যেখানে নারীরা ঘর ও কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসে সমান মজুরী এবং সন্তান লালনের ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য দাবী নিয়ে। এই বছরের প্রসঙ্গ ছিল "যতনের জন্য বিনিয়োগ কর, হত্যার জন্য নয়" এবং যর্থাথই ধর্মঘটটি নিয়োজিত ছিল আফগানিস্তানের মার্কিন যুদ্ধকে ধিক্কার জানানোর জন্য। স্থানীয় সংগঠক, মার্গারেট প্রেসকোড, প্রাথমিক পর্যায়ে আফগান উইমেন্স মিশনের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে খুশী ছিলেন। তারপরও, প্রেসকোড এবং ধর্মঘটের প্রধান সংগঠকগণ যাদের নিবাস ইংল্যান্ড, আমাদের সম্মুখ ব্যানারের ভাষা নিয়ে আপত্তি তুললেন লস এঞ্জেলসের ডাউন টাউনে নির্ধারিত মিছিলের ঠিক দুইদিন আগে। সম্মুখ ব্যানারের একটিতে ছিলো মৌলবাদকে নিন্দা জ্ঞাপন এবং অপরটিতে মৌলবাদকে সমর্থনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্তকরণ, সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিলো একজন RAWA সদস্যের উদ্ধৃতির মাধ্যমে। এই বাক্যটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল: "আমরা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধকে স্বাগত জানাই। কার্যত এই আঘাত আরও আগেই হানা উচিত ছিলো সেপ্টেম্বর ১১ এর মতন ঘটনাকে প্রতিহত করার কথা ভাবলে। কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে এই অথবা সেই দেশে বোমা ফেলে জয়ী হওয়া যাবে না। যারা মৌলবাদী শাসনব্যবস্থা বা আন্দোলনসমূহকে অস্ত্র বিক্রি করে বা আর্থিকভাবে সমর্থন করে এমন দেশগুলোকে থামানোর প্রচারাভিযান হতে হবে এটাকে।" সন্দেহাতীতভাবেই আফগান উইমেন্স মিশন এবং RAWA, যার সহযোগিতায় আমরা কাজ করে আসছি তাদের দুশ্চিন্তার বড় অংশ জুড়ে ছিল এবং আছে

আফগানিস্তানে বোমা নিক্ষেপ (আফগান উইমেন্স মিশন এবং RAWA উভয়েই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এই বোমা নিক্ষেপকে নিন্দা জানিয়ে)। কিন্তু মৌলবাদ এবং তালেবান ও উত্তর জোটের প্রকৃত সন্ত্রাস চলমান সমস্যার একটি বিশদ অংশ যাতে আফগান নারী বসবাস করে প্রতিদিন, যা আফগান নারীদের হত্যা করে প্রতিদিন, বোমা নিক্ষেপের আগে এবং পরে। আমাদের যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বলে বিরক্ত হয়ে ধর্মঘটের আয়োজকেরা আফগান উইমেন্স মিশনকে অন্তর্ভূক্তি অনুমোদন না-করার ধামকী দিল। এই নারী ঐক্য সমান মজুরী এবং সন্তান লালনের ক্ষতিপূরণের দাবীর পাশাপাশি বোমা নিক্ষেপকে নিন্দা জানিয়েছিল কিন্তু পারল না তলিয়ে দেখতে বা স্বীকৃতি দিতে যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের কিছু নারীর সমস্যা কিছুটা ভিন্ন। আমাদের ফেস্টুনগুলোকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখেই শেষমেষ আফগান উইমেন্স মিশন এই মিছিলে অংশ নিয়েছিল।

বাম প্রগতিবাদীদের তরফ হতেও RAWA বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখল প্রশ্নে RAWA-র সমালোচনায় আহত হয়ে কিছু দল যেমন ইন্টারন্যানাল একশন সেন্টার, দ্য ওয়ার্কারস ওয়ার্ল্ড পার্টি নীরবে RAWA-র ভূমিকা অবহেলা করে এসেছে। ওয়ার্কারস ওয়ার্ল্ড পাটির একজন বন্ধু কয়েক বছর আগে দাবী করছিলেন যে ১৯৭০-এর দিকে আফগান মৌলবাদীরা কিরূপে নারীদের মারধর করছে সেই চিত্র তিনি দেখেছিলেন এবং তিনি খুবই হালকা বোধ করেছেন যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ওদের (আফগান নারীদের) সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছে। শুনতে জর্জ বুশের দাবী "আফগান নারীদের উদ্ধার করছি"র মতনই শোনায়। যদি কেউ বিগত দশকগুলোতে আফগানিস্তান দখল বৈধ করার লক্ষ্যে যে বিবিধ প্রচার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা নিরীক্ষা করেন, তাহলে দেখবেন একই ধরন এখনও বর্তমান: আফগান নারীদের উদ্ধার করছি এই কথা বলেছে রাশিয়ানরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট মুজাহেদীন যুদ্ধপ্রভু এবং তালেবানরা (!)। প্রকৃতপক্ষে, আফগানদের বিরুদ্ধে গোটা মার্কিন যুদ্ধটাকেই আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে মার্কিনীদের কাছে যাদেরকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির বরাতে জানানো হয়েছে বোমা ফেলা হচ্ছে আফগান নারীদের উদ্ধার করার জন্যই। ফার্স্ট লেডি লরা বুশ অকস্মাৎ আফগান নারীদের অধিকার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং অনর্গল এই ব্যাপারে দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটি ঘরানার বাগাড়ম্বর করে চলেছেন। আফগানিস্তানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নয়া প্রধান, জর্জ বুশের পোস্টার-শিশু সিমা সামারকে প্রদর্শিত করে বুশ দাবী করেন যে আমরা আফগান নারীদের অধস্তনতা হতে উদ্ধার করেছি। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্টের পররাষ্ট্র অধিদপ্তর RAWA-র ওয়েবসাইটের ছবি ব্যবহার করেছেন অনুমতি ছাড়াই সেই প্রচারপত্রে যেগুলো আফগানিস্তানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল বোমাবাজিকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য।

অবশ্যই এটা এমন নয় যে কেবল মার্কিনী নারীরাই RAWA-র বক্তব্য ভুল বুঝেছে বা স্বার্থমত ব্যবহার করেছে। সম্প্রতি একটা যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে, আমি বক্তব্য রেখেছিলাম খ্যাতনামা এক্টিভিস্ট এবং লেখক মাইকেল প্যারেন্টির পাশাপাশি যিনি দাবী করেন ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তানে দাওয়াত করে আনা হয়েছিল এবং আসলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের বিশদ উল্লেখ করে, আমি তার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করার পর, আলোচনা শেষে রেগেমেগে মাইকেল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের কৃত ভালকর্মকে কেন RAWA স্বীকার করছে না। বাহ, চমৎকার। যদিওবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে কোনও ভালকর্ম করে থাকে আমরা কি কখনও তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করি? কিভাবে তিনি জিজ্ঞেস করেন এমন একটা সংগঠনকে যে

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নেত্রীকে[৩] দখল প্রশ্নে সোচ্চার এবং নারী অধিকারের জন্য লড়াইরত থাকার কারণে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল রাশিয়ান কে.জি.বি. আফগান মুজাহেদীনদের সহযোগিতায়?

আজকে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকীকৃত আফগান সরকার, যা বৈধ করছে সেই একই আফগান মৌলবাদী যুদ্ধপ্রভুদের যাদের পুরো ৮০'র দশক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন যুগিয়েছিল, প্রস্তুতি নিচ্ছে একটি সরকার গঠনের জন্য, তখন হাজারের অধিক আফগান শরণার্থী নারীরা আফগান গ্রান্ড এ্যাসেম্বলির কাছে মাত্র কয়েকটা সংরক্ষিত আসনের জন্য আবেদন করেছে! স্পষ্টতই আফগান নারীরা অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে চলেছে একটা মৌলবাদী সরকারের মুখে দাঁড়িয়ে– যে-সরকার গঠনের দিক দিয়ে নারীবিদ্বেষী, যে-সরকার এমনকি আইন পরিষদ মিলিত হওয়ার পূর্বেই ইসলামী শরি'য়া আইনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছে।

হেলেন ক্যালডিকট থেকে মাইকেল প্যারেন্টি, এটাই কি সঠিক ও খানিকটা অনিবার্য নয় যে আমরা যখন আফগান নারী এবং তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলি, আমাদের উচিত সতর্কভাবে শোনা ওদের নিজেদের এই ব্যাপারে কি বলার আছে? কালো-বাদামী-হলুদ নারীদের, বিশেষত দক্ষিণ বিশ্বের নারীদের, প্রশংসনীয় লড়াই যখন পশ্চিমের গোচরেও এসেছে, তখন আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, ওদের কী বলা বা করা উচিত, ওরা কী রকম পোশাক পরিধান করতে পারে, এবং ওদের অধস্তনতা শীর্ষসুখ লাভ করতে পারা বা না-পারা থেকে উৎপন্ন হয় কিনা ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের ধারণার বাইরে তাদের মতামত ও প্রত্যাশার নায্যতা আছে।

অনুবাদকের টীকা

[১] Feminist Majority Foundation's Campaign তালেবান শাসন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে মার্কিনের দুই শতাধিক মানবাধিকার এবং নারী সংগঠনের একটি যৌথ প্রচারাভিযান। সোনালী এই লেখাতে যখন উল্লেখ করেছেন Feminist Majority/সংখ্যাগুরু নারীবাদী তখন এই মূলধারার সংহতি-আয়োজন-উদ্দেশ্যকেই ইঙ্গিত করেছেন।

[২] apartheid একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুশীলিত হতো দক্ষিণ আফ্রিকাতে সাদা শ্রেষ্ঠত্বকে অটুট রাখার জন্য। আইনগত ভিত্তি ছিল এই ব্যবস্থার। gender apartheid ধারণাটি কঠোর লিঙ্গভিত্তিক বিভেদকে বোঝাতে উল্লিখিত হয়, ১৯৯৬-এ তালেবান কর্তৃক আফগানিস্তানের শতকরা ৮৫ ভাগ অঞ্চলের ক্ষমতা দখলের পর তারা এই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের প্রচলন ঘটান বলে বলা হয়ে থাকে। এই ধারণাটি ব্যাপকতা লাভ করে দ্য ফেমিনিস্ট মেজরিটি ফাউন্ডেশনের "Stop Gender Apartheid in Afghanistan" প্রচারাভিযানের মাধ্যমে।

[৩] মীনা (১৯৫৬-১৯৮৭) Revolutionary Women's Association of Afganistan-এর প্রতিষ্ঠাতা কর্মী। ১৯৭৭ সালে তিনি আফগান নারীদের রুদ্ধ এবং নির্যাতিত কণ্ঠের সোচ্চার এই মোর্চাটি গঠন করেন। রাশিয়ান বহর এবং তাদের সাজানো সরকারের বিরুদ্ধে মীনা প্রচারণা শুরু করেন ১৯৭৯-তেই, সংগঠিত করেন একের পর এক মিছিল, সভা, সমাবেশ, বক্তৃতা কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায়। মৌলবাদী এবং পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার অবস্থান রাশিয়ান ও মৌলবাদী চক্রকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ করে তোলে এবং আফগানিস্তানের KGB-শাখা KHAD ও তাদের মৌলবাদী সহচরেরা ১৯৮৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, পাকিস্তানের কোয়েটাতে মীনাকে হত্যা করে।

তারিক আলী

দুর্নীতির বাদশাহী: সৌদি সখ্যতা

তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী ও সেলিম রেজা নিউটন

> এই লেখাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেড-নেট (http://www.zmag.org) থেকে নেয়া। এটা আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা-আয়োজনের প্রথম দিকের একটা প্রতিক্রিয়া।

১১ই সেপ্টেম্বরের হত্যাযজ্ঞের জন্য দায়ী ছিনতাইকারীরা আফগানিস্তানের পাহাড়ী গ্রামের নিরক্ষর, দাড়িওয়ালা ধর্মান্ধ ছিল না। তারা সবাই ছিল শিক্ষিত, অতিশয় দক্ষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশাজীবী। যে-উনিশজন যুক্ত ছিল তাদের মধ্যে তেরজন ছিল সৌদি আরবের নাগরিক। তাদের নাম শনাক্ত করা সম্ভব। আলঘামদি (Alghamdi) তিনজন স্পষ্টতই এ-বাদশাহীর হিজাজ প্রদেশের লোক। হিজাজ হলো পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীর জায়গা। মিশরে জন্ম নেয়া মোহাম্মদ আতা ভ্রমণ করেছিলেন সৌদি পাসপোর্ট নিয়ে। হুকুমটা তিনি দিয়েছেন কিনা সেটা প্রশ্ন নয়; যে-ব্যাপারটা তর্কাতীত তা হলো ওসামা বিন লাদেনের আসল ক্যাডারদের বেশিরভাগটাই (পদাতিক সেনারা নয়) থাকে মিশরে অথবা সৌদি আরবে। দেশ দুটো হলো (ইসরায়েল বাদ দিলে) এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দোস্ত। সৌদি আরবে বিন লাদেনের প্রতি শক্ত সমর্থন আছে। তিনি ছিলেন সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান শাহজাদা তুর্কি বিন ফয়সাল আল সাওদ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই যুবরাজ সাওদকে গত মাসে বরখাস্ত করা হয়েছে রিয়াদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের উপর হামলা দমনে তার ব্যর্থতার জন্য। আসল কারণ সম্ভবত পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাদশা ফাহাদের মৃত্যুর পর কে বাদশা হবেন তা ঠিক করা নিয়ে ভয়ঙ্কর উপদলীয় লড়াইয়ে পক্ষাবলম্বন না করা। উভয়পক্ষই জানে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। সেই জন্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তার সমর্থন সত্ত্বেও সৌদি বাদশাহী তার 'নিজের ঘাঁটিগুলোকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে না।'

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমা মিডিয়া সৌদি বাদশাহী সম্পর্কে খুব কমই খবরাখবর জানায়। রাষ্ট্রদূতরা নিজ নিজ দূতাবাস-কার্যালয়ে রিপোর্ট করেন যে, সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে এবং এই বাদশাহীর ধারাবাহিকতাকে হুমকির সম্মুখীন করা হয় না। রিয়াদের বাদশাহীর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হবার জন্য দরকার পড়ে একজন মার্কিন বা বৃটিশ নাগরিকের কয়েদ হওয়ার ঘটনা বা একজন ব্রিটিশ নার্সকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে

ফেলার মতো ঘটনা। এমনকি, রাষ্ট্র-ধর্ম সম্পর্কেও কমই জানা থাকে। এ রাষ্ট্র-ধর্ম কিন্তু সুন্নী বা শিয়া ইসলামের প্রতিদিনকার ভাষ্য নয়, বরঞ্চ এটা হলো ওয়াহাবিবাদ নামে পরিচিত। এটাই হলো সৌদি বাদশাহজাদাদের ধর্ম– আর রাজদরবারের আমীর-ওমরাহদের, সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর, এবং অবশ্য-অবশ্যই ওসামা বিন লাদেনের যিনি সারা দুনিয়ার সবচে মশহুর সৌদি নাগরিক, বর্তমানে আফগানিস্তানের বাসিন্দা।

ব্রিটেনে এর মোটামুটি একটা তুলনা পাওয়া যেতো যদি ইংল্যান্ডের চার্চকে সরিয়ে সেখানে ড. আয়ান পেইসলী'র সংযুক্ত পুনর্গঠিত চার্চকে বসানো যেতো– তো রাজপরিবার জ্বলন্ত আবেগময় পেইসলীপন্থী হয়ে পড়তো এবং রাজপ্রশাসন ও সামরিক দপ্তরগুলো অ-পেইসলীয়দের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতো।

এই গোষ্ঠীর অনুপ্রেরণাদাতা শেখ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ছিলেন অষ্টাদশ শতকের একজন কৃষক যিনি খেজুর চাষ করতে করতে ও পশু চরাতে চরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সপ্তম শতকের বিশুদ্ধ বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান স্থানীয়ভাবে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। তিনি নবী মুহাম্মদের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের বিরোধিতা করেন এবং পবিত্র স্থানসকল ও মাজারসমূহের উপাসনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বলতে থাকেন এবং এক আল্লাহর একত্বের ওপর জোর দিতে থাকেন। নিজের ভেতরকার দিক দিয়ে এটা যথেষ্ট নিরীহ ছিল, কিন্তু যেটা এমনকি সেই ১৭৪০ এর দশকে সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো সেটা ছিল তার সামাজিক নির্দেশনাসমূহ। তিনি জোর দিয়েছিলেন ইসলামী শাস্তি, প্রহার এবং আরো বহু কিছুর ওপর: জেনাকারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা, চোরের হাত কেটে ফেলা এবং অপরাধীদেরকে প্রকাশ্যে হত্যা করা উচিত। যা তিনি প্রচার করছিলেন সেটা যখন আমল করা শুরু করলেন তখন এ অঞ্চলের ধর্মীয় নেতারা আপত্তি উত্থাপন করলেন এবং উরায়উয়া (Uyayua)-এর স্থানীয় প্রধান তাকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। ওয়াহাব পালিয়ে গেলেন দেরাইয়্যা (Deraiya)-য়। সেটা ১৭৪৪ সাল। সে বছর তিনি ওখানকার শাসক মোহাম্মদ ইবনে সৌদের আনুকুল্য লাভ করলেন। যে রাজবংশ এখন সৌদি আরব শাসন করে ইবনে সৌদ ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ওয়াহাবের পুনরুজ্জীবনবাদী শক্তিমত্তাকে কাজে লাগালেন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একটা শৃঙ্খলার ধারণা প্রোথিত করার ক্ষেত্রে। এরপর তিনি তাদের ছুঁড়ে দেন অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। ইস্তাম্বুলের সুলতানকে তিনি একজন ভণ্ড মনে করতেন এবং মনে করতেন যে ইসলামের খলিফা হওয়ার কোনো অধিকার তার নাই। ওয়াহাব কাফের, ভণ্ড এবং ইসলামী সংস্কারকদের বিরুদ্ধে স্থায়ী জিহাদ (পবিত্র যুদ্ধ) এর গুণাবলী প্রচার করতে থাকেন। অটোমানরা পাল্টা আঘাত করে, হিজাজ দখল করে নেয় এবং মক্কা ও মদীনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু ওয়াহাবি প্রভাব থেকেই যায়। আর তাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলো স্থানীয় ফোকলোরের অংশ হয়ে যায়। সৌদের উত্তরাধিকারীরা পুরো উপদ্বীপ জুড়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য এই আদি জাতীয়তাবাদকে কাজে খাটায়।

দুই শতাব্দী পরে আজকে যা সৌদি আরব বলে পরিচিত তারা তার ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু এ অঞ্চলকে যা বদলে দেয় চিরদিনের জন্য তা হলো তরল সোনার আবিষ্কার। ব্রিটেনের দিক থেকে প্রতিযোগিতার ভয়ে এসো (Esso), টেক্সাকো (Texaco) এবং মবিল (Mobil) কোম্পানিকে একত্রীভূত করে আরব-মার্কিন তেল কোম্পানি (ARAMCO) গঠন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে আর শক্তিশালী হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন দাহরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর ঘাঁটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য। সৌদি বাদশাহীকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দেয়া হলো এই

রাজত্বের উন্নয়নে সাহায্য হিসেবে। এই রাজত্ব ছিল একটা স্বৈরাচার কিন্তু এটাকে এই অঞ্চলে সাম্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ একটা রক্ষাপ্রাচীর হিসেবে দেখা হয়েছিল। সেজন্যে এর সীমান্তের অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা উপেক্ষা করতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করতো। এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ এবং সৌদি বাদশাহী প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো বুদ্ধিদীপ্তভাবে চিত্রায়িত হয়েছে নির্বাসিত সৌদি ঔপন্যাসিক আবদেল রহমান মুনিফ বিরচিত "লবণের নগরমালা" নামক পঞ্চখণ্ড আরবীয় উপন্যাসে। এটা আরবীয় সাহিত্যের সবচে বড় অবদানগুলোর একটা। মুনিফের জন্ম হয় ১৯৩৩ সালে যা নতুন রাষ্ট্রটির জন্মসালের সাথে মিলে যায়। মুনিফের বহুস্তরায়িত উপন্যাস– যা বর্বর, পরাবাস্তব ও প্রহসনমূলক– রাজপরিবারকে ক্রুদ্ধ করে। তাঁকে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং চিরকালের জন্য তাঁর দেশে ফিরে আসা নিষিদ্ধ হয়। তাঁর বইগুলো সুস্বাদু বেআইনি দ্রব্যে পরিণত হয়– সেগুলো ঘুরতে থাকে সর্বত্র; রাজপ্রাসাদগুলোতেও। লন্ডনে এক বিরল সফরে তাঁর সাথে আমার দেখা হয় বছর দশেক আগে। তখনও তাঁর ভাষা সবসময়ের মতোই প্রাঞ্জল:

> বিংশ শতক শেষ-প্রায়, কিন্তু পশ্চিম যখন আমাদের দিকে তাকায় তখন তারা যা দেখে তা হলো তেল আর পেট্রোডলার। সৌদি আরবে এখনও শাসনতন্ত্র নাই, জনগণ সকল প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনকি আগে থেকে অনুমতি প্রার্থনা করা ছাড়া বাদশাহীটাকে সমর্থন করার অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। ব্যক্তিগত সয়সম্পদের ব্যাপক অংশ যাদের মালিকানায় সেই নারীদের সাথে ৩য় শ্রেণীর নাগরিকদের মতো আচরণ করা হয়। পুরুষ আত্মীয়ের লিখিত পারমিট ছাড়া কোনো নারীকে দেশত্যাগ করতে অনুমতি দেয়া হয় না। এ ধরনের পরিস্থিতি নাগরিকদের বেপরোয়া বানায় যাদের কোনো মর্যাদাবোধ বা অংশীদারিত্বের বোধ থাকে না ...।

এমন একটা সমাজ যার সেকুলার কোনো জানলা নেই, যার রাজপরিবার আসলে এমন একটা গোত্র যা বহুবিধ দল-উপদলে বিভক্ত, সেই রাজপরিবার আর তার পোষা মোল্লামৌলবীরা দৈনন্দিন জীবনের সকল দিকে দাপট দেখায় যে-সমাজে, ৬০ ও ৭০-এর দশকে সেখানে অনেকগুলো বিদ্রোহ হয়েছিলো। মুনিফের অন্যতম উপন্যাস দ্য ট্রেঞ্চ বা খন্দক-এ আছে একটা অত্যাশ্চর্য শেষাংশ। দুটো বিপ্লবের প্লট তৈরি করা হচ্ছে, তাদের একটা ঘটছে রাগী তরুণদের দ্বারা যারা আধুনিক ভাবধারায় উজ্জীবিত। অন্যটা ঘটছে অদৃশ্যভাবে, প্রাসাদের ভেতরে। সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে অশ্রুর সাথে কারফিউ আর রাজপথের ট্যাঙ্ক-সহযোগে। তরুণ বিপ্লবীরা আবিষ্কার করে যে, ভুল বিপ্লব সাফল্য পেয়েছে। ইঙ্গিতটা ছিল ১৯৭৫ সালে আপন ভাগ্নে শাহজাদা ফয়সাল ইবনে মুসাইদ কর্তৃক বাদশাহ ফয়সালের হত্যার ঘটনার প্রতি। দশ বছর আগে ইবনে মুসাইদের ভাই শাহজাদা খালিদ (একজন আবেগপরায়ণ ওয়াহাবি) রাজ্যের মধ্যে টেলিভিশনের প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সৌদি পুলিশ তার বাসায় প্রবেশ করে এবং তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। আজকের দিন পর্যন্ত কট্টর বিশ্বাসীরা শাহজাদা খালিদকে তমিজ দেখায় এবং অনেক বছর পরে তালিবান সরকার তাদের নিজস্ব শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে প্রকাশ্যে অডিও ক্যাসেট পোড়ানো এবং ভিডিও ও টেলিভিশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার মাধ্যমে।

কিন্তু ওয়াহাবি মতবাদ এখনও সৌদি আরবের রাষ্ট্রধর্ম থেকে গেছে। সাথে আমদানি ঘটেছে পেট্রোডলারের, দুনিয়ার নানান জায়গায় চরমপন্থাকে তবিল জোগানোর জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা একজন সৌদি শাহজাদাকে চেয়ে অনুরোধ জানায় যার কাজ হবে আফগানিস্তানে জেহাদের নেতৃত্ব দেয়া। নিজের ইচ্ছায় কেউ এগিয়ে এলেন না। এবং সৌদি নেতারা প্রাচীন অভিজাত এক ধনী

পরিবারের এক তরুণ সদস্যকে মনোনীত করে যিনি বাদশাহীর কাছের লোক। ওসামা বিন লাদেনকে পাঠানো হয় পাকিস্তান-সীমান্তে। এবং তিনি ঠিক সময়মতো এসে পৌঁছেন প্রেসিডেন্ট কার্টারের মাথায় উষ্ণীষপরা জাতীয় নিরাপত্তা-উপদেষ্টা বিগনিউ ব্রেঝিনস্কির এই চিৎকার শোনার জন্য যে: "আল্লাহ্ আপনাদের পক্ষে আছেন"।

পাকিস্তানের যে-ধর্মীয় স্কুলগুলোতে তালেবানদের পয়দা করা হয়েছিলো সেগুলোর পয়সাকড়ি দিয়েছিল সৌদিরা, এবং ওয়াহাবি প্রভাব ছিল প্রবল। গত বছর তালেবানরা যখন পুরাতন বৌদ্ধমূর্তিগুলো উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল তখন কিউওএম (QOM) ও আল্ আজহারের প্রাচীন শিক্ষা মন্দিরগুলো থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয় এই যুক্তিতে যে ইসলাম সহিষ্ণু। রাজ্যের একটা ওয়াহাবি প্রতিনিধি দল তালেবানদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার উপদেশ দেয়। তারা সেটা পালন করেছিলো। মুসলিম ও অমুসলিম সকল শত্রুর বিরুদ্ধে লাগাতার জেহাদ করার ব্যাপারে ওয়াহাবিদের জেদ, পরে যারা কাবুল দখল করে নিয়েছিলো সেই তরুণ ছেলেদের ওপর গভীর ছাপ ফেলেছিলো। সেইসব দিনগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ছিলো দরদী। খ্রিষ্টীয় প্রথাসমৃদ্ধ একটা রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা খুবই কঠিন এবং ক্লিনটন আর ব্লেয়ার দুজনেই নিজেদের খ্রিষ্টানত্বের ঢেঁড়া পেটাতে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন।

মাত্র গত বছর, পাকিস্তান বিষয়ে পররাষ্ট্রদপ্তরের প্রাক্তন উদার বিশেষজ্ঞ, স্টিফেন পি. কোহেন ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে (এশীয় সংস্করণ, ২৩ অক্টোবর ২০০০) লিখেছিলেন: 'কিছু মাদ্রাসা বা ধর্মীয় স্কুল চমৎকার।' তিনি স্বীকার করেন যে, 'অন্যগুলো জিহাদী ও গোঁড়া ইসলামী আন্দোলনের উর্বর জমি, কিন্তু সেগুলো মোট সংখ্যার মাত্র বারো শতাংশের মতো।' এগুলোকে, তিনি বলেন, উন্নত করা দরকার 'তাদের ছাত্রদেরকে আধুনিক শিক্ষা দেয়ার স্বার্থে'। এই পরিতোষণ হলো **১১**ই সেপ্টেম্বরের আগেকার সরকারি মনোভাবের সঠিক প্রকাশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অভ্যন্তরীণ বিরোধী দলগুলো ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সম্পূর্ণ আধিপত্যের অধীনে আসে। এই খাঁটি ওয়াহাবিরা এবার বাদশাহীটাকে অধঃপতিত হিসেবে দেখলো এর মার্কিন-সখ্যতার কারণে আর অন্যেরা হতাশ হয়ে পড়লো। প্যালেস্টাইনিদেরকে রক্ষা করার বেলায় রিয়াদের ব্যর্থতায় উপসাগরীয় যুদ্ধের পর দেশে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন ছিলো সৈন্য ও ঘাঁটিগুলোর ওপর সন্ত্রাসবাদীদের হামলার জন্য একটা সংকেত। যারা এসবের হুকুম দিয়েছিলো তারা সবাই ছিলো সৌদি। কিন্তু পাকিস্তানী ও ফিলিপিনো বিদেশীদের মাঝেমধ্যে অভিযুক্ত ও হত্যা করা হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রোধকে প্রশমিত করার স্বার্থে।

যে অভিযাত্রী বাহিনীকে পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে ওয়াহাবি অক্টোপাসের শুঁড়গুলোকে ছেঁটে ফেলার জন্য তারা সফল হতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু এর মাথাটা বহাল তবিয়তে নিরাপদ আছে। তেলকূপগুলো পাহারা দিচ্ছে, আর নতুন অস্ত্র বাড়াচ্ছে এবং মার্কিন সৈন্যদল ও দাহরানে মার্কিন বিমানঘাঁটির নিরাপত্তায় থাকছে। সৌদি বাদশাহীর নিয়তি থেকে নিজের অপরিহার্য স্বার্থকে পৃথক করতে ওয়াশিংটনের ব্যর্থতা আরো বেশি প্রত্যাঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাদের দরকার দশম শতকের সেকুলার আরব কবি আবুল আলা আল-মারি'র প্রথম উচ্চারণ করা সতর্কবাণী, যা এখনও যথাযথ:

> আর, যে-স্থান থেকে শাহজাদা হুকুম জারি করতেন, সেই দরবারের ভেতর এখন ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ার তীক্ষ্ণ চিৎকার– সে-হাওয়া এলান করছে: 'এখানে থাকত এক বাদশাহ, যে শুনতে পেতো না দুর্বলের আহাজারি।'

ক্যাথারিন ফিনার

নারীবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদ

তরজমা: নাসিমা সেলিম অলিক

> *প্রথম আলো*'র নোট: 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর সঙ্গে নারীর কী সম্পর্ক? সাম্রাজ্যবাদ নারীবাদ ও নারীবাদী ভাষাকে সুবিধা মতো ব্যবহার করেছে বারবার। *দি গার্ডিয়ান* পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২১, ২০০২ সংখ্যায় ক্যাথারিন ফিনার তার 'ফেমিনিজম অ্যাজ ইমপিরিয়ালিজম' লেখায় পশ্চিম-নির্ভর নারীবাদকে ঘিরে ক্ষমতার অতীত ও সাম্প্রতিক আখের গোছানোর প্রক্রিয়াকে বিশদ করেছেন। লেখাটি অনুবাদ করেছেন নাসিমা সেলিম অলিক।

'মহিলাদের সম্মান ... জয়ী হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে আর সবখানে!' মুক্ত বিশ্বের নেতা গলা কাঁপিয়ে বললেন। গত সপ্তাহে জাতিসংঘে। ইরাকের মেয়েদের জন্যই নাকি পশ্চিমা বিশ্বের উচিত ইরাকে আক্রমণ চালানো। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর কাছে বুশ তার এই তত্ত্ব আউড়ে আরো বললেন, 'নারীর ওপর দমন-পীড়ন সর্বত্র, সব সময়ের জন্যই এ অন্যায়।'

ঠিক যেমন করে আফগানিস্তানে বোমা মারা হয়েছে মহিলাদের বোরকা থেকে মুক্তি দেবার জন্য (বা, বুশের ভাষায় 'ঢেকে রাখা মেয়েদের' স্বাধীন করতে), আফগান মেয়েরা শুধু নখ পালিশের জন্য কেমন অত্যাচারিত সেটা বলতে পাঠিয়েছেন স্ত্রী লরাকে, তেমনি এখন বুশ উঠেপড়ে লেগেছেন ইরাকি মেয়েদের স্বপক্ষে। আগে-তো-জানা-ছিল-না ইরাকের মেয়েদের এই অবস্থা! আসলে বুশের বক্তব্যগুলো একটু খেয়াল করলে দেখা যায় সর্বত্র নারীর জয়জয়কার! আরো একটা যুদ্ধ সমর্থনের জন্যই তো। এর পরের লড়াইটা তাহলে বাধবে কোথায়? চীনে তার মেয়েবিদ্বেষী এক-বাচ্চা নীতির কারণে? বিধবা-হত্যার জঘন্যতার জন্য ভারতে? নাকি খোদ ব্রিটেনে, যেখানে ধর্ষণমামলায় আসামিরা খুব কমই অভিযুক্ত হয়?

নিজের দেশে, বুশ সাহেব মোটেই নারীবাদী লোক নন। ওভাল অফিসে তার প্রথম কার্যদিবসেই গর্ভপাত সেবা অথবা গর্ভপাত বিষয়ে পরামর্শদানকারী সকল আন্তর্জাতিক পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার অর্থ বরাদ্দ কমানো হয়েছে (হাজার হাজার নারী ও শিশুর জীবন বিপন্ন করে)। 'রো বনাম ওয়্যাড' রায়ের (কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা চাইলেই গর্ভপাত অনুমোদন করতে এই মামলার রায় সহায়ক ছিল) বছরপূর্তিতে গত ২২ জানুয়ারি দিনটির পুনর্বার নামকরণ করেছেন বুশ – 'মানব জীবনের জাতীয় পবিত্রতা দিবস'।

গর্ভপাতকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তুলনা করে ওই একই দিনে তার বক্তব্য:

> ১১ সেপ্টেম্বর আমরা জেনেছি এই পৃথিবীতে 'শয়তান'- এর অস্তিত্ব আছে, যার কাছে জীবনের কোনো মুল্য নাই ... আর আজকে আমরা শয়তানি আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে আরো একটা যুদ্ধে যোগ দিয়েছি। জীবন বাঁচানোর, জীবন রক্ষা করার যুদ্ধ।

যাই হোক, নারীবাদের ভাষা চুরি করে এ ধরনের বোলচাল মারা কোনো নতুন ঘটনা না। বিশেষত জাতিগত আগ্রাসনের জন্য বারবার এই কাজ করা হয়েছে; সত্যি বলতে কী (বুশের বক্তব্যের সঙ্গে) আরেক প্রজন্মের পুরুষদের কথার চমৎকার মিল পাওয়া যায়। নারী স্বাধীনতায় এদের কারোরই আদতে কিচ্ছু যায় আসে না। ভিক্টোরীয় যুগের পুরুষতন্ত্র উনিশ শতকের বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী অভিযানগুলি পরিচালনা করেছিল। তারাই আবার মেয়েদের ক্রমশ উচ্চকিত নারীবাদী দাবিদাওয়া আর মাঝেমধ্যে পাওয়া সাফল্যের (হাতেগোনা কয়েকজনের বিশ্ববিদ্যালয় পড়া বা নুতন আইনে বিবাহিতা মহিলাদের নিজের সম্পত্তি রাখার অধিকার) তিক্ত বিরোধিতা করেছে। একই সময়ে নারীবাদেরই ভাষা ব্যবহার করে পৃথিবীজোড়া তাদের উপনিবেশগুলিতে চালিয়েছে অবাধ লুটতরাজ।

এই ধারার ঔপনিবেশিক শাসকদের একটা মোক্ষম নিদর্শন লর্ড ক্রোমার। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত মিসরে অবস্থানকারী ব্রিটেনের কনসাল জেনারেল। লায়লা আহমেদ তাঁর *ইসলামে নারী ও জেন্ডার* নামের যুগান্তকারী গ্রন্থে ক্রোমারের কথা বলেছেন। লর্ড ক্রোমারের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ইসলাম ধর্ম আর ইসলামী সমাজ নিকৃষ্ট। 'প্রাচ্যের মনমানসিকতা'র অনেক নিন্দা করার পাশাপাশি মেয়েদের প্রতি ইসলামের আচরণ নিয়েই সবচেয়ে বেশি সমালোচনা ছিল তার। ইসলাম মেয়েদের অসম্মান করে – ইসলামের পর্দাপ্রথা মেয়েদের আলাদা করে রাখার ওপর জোর দেয়। আর সেটাই তো 'পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও চরিত্রের যে উৎকর্ষতা অর্জন করা' প্রয়োজন তার পথে 'মারাত্মক বাধা'। অতএব, মিসরীয়দের 'বোঝাতে বা বাধ্য' করতে হবে যাতে তারা ঘোমটা ফেলে 'সভ্য' হয়।

অথচ ব্রিটেনে বাড়ি ফিরে, নারীবাদের ধুয়া তোলায় পারদর্শী ও পর্দা-জ্বালানোর পক্ষপাতী এই অগ্রসর-চিন্তার পুরুষপুঙ্গবই হলেন 'মেয়েদের ভোটাধিকারবিরোধী পুরুষ লীগ'- এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তার নেতৃত্বে এই পুরুষ দলটি যে কোনো মূল্যে মেয়েদের ভোট বন্ধ করতে চেয়েছিল।

ক্রোমারের মতোন উপনিবেশবাদী পুরুষতন্ত্রীদের ধারণা ছিল ভিক্টোরীয় প্রথাই সভ্যতার শীর্ষের প্রতিনিধিত্বকারী। তারা যেখানে গেছে সেখানেই ওই এক মডেল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। আর অবশ্যই মেয়েদের রেখেছে যেখানে তাদের মানায়, পুরুষের অনুগত করে। তারা শুধু চাইছিল প্রাচ্য নারীবিদ্বেষের পরিবর্তে পশ্চিমা নারীবিদ্বেষীদের অধিষ্ঠান। আর ঠিক বুশের মতোই দেশজ সংস্কৃতিকে হেয় করার জন্য নারীবাদের ভাষা চুরি করেছে। লায়লা আহমেদের ভাষ্য মতে, এমনি করেই নারীবাদ হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকদের 'হাতের বাঁদী-দাসী'। তিনি লিখেছেন,

> পিতৃতন্ত্রী পুরুষের মাধ্যমে হোক বা নারীবাদীরা নিজেই করুক, পশ্চিমা নারীবাদের ভাবনাচিন্তাগুলি আদতে দেশীয় সমাজের ওপর আক্রমণকে নীতিগতভাবে সমর্থন দানের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, ইউরোপের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা চালু রাখতে সহায়তা করেছে।

নারীবাদের ভাষা চুরি করে যারা কথা বলে, তারা এমনকি ভান করার চেষ্টা করেনি বা করার প্রয়োজনও মনে করে না যে, তাদের উপনিবেশ অথবা তাদের বোমা হামলায় আক্রান্ত দেশের

মেয়েদের অবস্থা নিয়ে তারা যেনবা সত্যি সত্যি চিন্তিত। মেয়েদের অবস্থার যাতে উন্নতি না হয় মিসরে থাকাকালীন ক্রোমার সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন: স্কুলের বেতন বাড়িয়ে দিয়ে (যাতে মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়), মেয়ে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণকে অনুৎসাহিত করে। আর 'নারীবাদী' জর্জ বুশ তো আফগানিস্তানের মেয়েদের ফেলে রেখে চলে গেলেন: আজকে দেশ চালাচ্ছে যেসব মারদাঙ্গা মুজাহেদীন – অনেক দিক থেকে তালেবানের চেয়েও তারা বেশি অত্যাচারী। তাদের ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা আফগান মেয়েদের জন্য বুশের (অথবা, লরা বুশ, বা টনি ব্লেয়ার, বা স্বামীর প্ররোচণায় চেরি ব্লেয়ারের) দরদ কোথায় গেল? এই গ্রীষ্মে, পশ্চিম-প্রতিষ্ঠিত হামিদ কারজাই সরকারের মাত্র দুজন মহিলা মন্ত্রীর একজন – মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী সীমা সামিরকে যখন মৃত্যুর হুমকির মুখে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হল তখন কোথায় ছিল তাদের প্রতিবাদ?

পড়ে থাকা মেয়েদের তোয়াক্কা না করে নারীবাদের সাফাই গাওয়ার পরিণাম ভালো না। তবে অনুমান করাই যায় যে, তাতে উপনিবেশবাদীদের ভুগতে হয় না। আহমেদ লিখেছেন,

> উপনিবেশবাদী কুলাচার প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশজ সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে উপনিবেশবাদীরা ব্যবহার করেছে নারীবাদ ... তাই অপশ্চিমা সমাজে নারীবাদ কলঙ্কিত – ঔপনিবেশিক স্বার্থঘনিষ্ঠতার অভিযোগের সামনে নারীবাদ নাজুক হয়ে পড়ে।

আসলে ঠিক এই কারণেই অনেক মুসলিম নারী পশ্চিমা ধারার নারীবাদ সম্পর্কে সন্দিহান। ক্রোমারের মতোন পর্দা খুলে ফেলাকেই সর্বময় স্বাধীনতার পথ ঘোষণা দেওয়ার আগে পশ্চিমা নারীবাদের এই বিষয়টা বুঝতে পারা খুবই জরুরি। আরব সমাজগুলিতে ইসলামীকরণের হার ক্রমশ বাড়ছে। আর সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নব্য উপনিবেশবাদী অভিঘাতসহ তার মানে যা দাঁড়ায় তাতে করে বিদূষী শেরিন সাদুল্লাহর মত হচ্ছে,

> আরববিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদ আর পশ্চিমানুসারী নারীবাদ দুই-ই পড়েছে সংকটে।

আরব নারীরা পশ্চিমা ধারার নারীবাদ প্রত্যাখ্যান করছে, তার মানে এই নয় যে তারা পুরুষের অধীনতা মেনে নিয়েছে। মুসলিম নারীরা পশ্চিমা নারীকূলের মতোই ঘেন্না করে পুরুষের এই নারীবিদ্বেষ। আর তারা বিলকুল ওয়াকেফহাল যে ইসলামী সমাজও নারীর ওপর নিপীড়ন চালায়; না করারই বা কী কারণ? কিন্তু নারীমুক্তির অর্থ তাদের কাছে এমন নয় যে, নিজের পরিচয়, ধর্ম বা সংস্কৃতিকে নির্মূল করতে হবে। অনেকে নিজেরাই পর্দা করতে চায়।

এসব অনুধ্যানের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিম নারীবাদের একটা নির্দিষ্ট ধরন গড়ে উঠেছে। তাতে না আছে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতা, না অতি সনাতন ইসলামপন্থা। বরং এরা চাইছেন ইসলামী কাঠামোর ভেতরে নারীর অধীনতা চাপিয়ে দেয় যে যে উপাদান সেসব উপড়ে ফেলতে। ক্রমশ আরো প্রাসঙ্গিক ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছেন লায়লা আহমেদ এবং ফাতিমা মারনেসি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক স্বর আজকে তাঁদেরই।

আর পশ্চিমে নারীবাদের কাছে এই সত্য উপস্থিত হয়েছে যে, তাদের নারীবাদী বিশ্বাসগুলিকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এমন কিছুর নামে ফলাও করে বেড়াচ্ছে যা মেয়েদের রক্ষার ভান করে ঠিকই কিন্তু আদতে কিছুই করে না। নারীবাদের অপপ্রয়োগ অপব্যবহারই শুধু। আরববিশ্বে, এমনকি এখানেও পশ্চিমা নারীবাদকে তা আরো খেলো করবে। কেননা জর্জ বুশ যখন নারীবাদের বুলি আওড়ান, তখন নারীবাদই তার শক্তি হারায়।

অবশ্য এ জাতের জুয়াচুরি এই সময়ের সঙ্গে মানানসই। আজকাল সবকিছুতেই চলছে নারীবাদ। শুধু সত্যিকার সাম্যের জন্য কোনো যুদ্ধে তাকে পাওয়া যায় না। প্রশিক্ষক/ট্রেনার

(ব্যায়াম সহায়ক) বিক্রির বেলায় নারীবাদ, শরীরের অঙ্গহানিতে নারীবাদ। মেয়েরা পর্ণো ছবি করবে আর ধর্ষণ মামলা থেকে পুরুষ নিস্তার পাবে সেখানেও সাহায্য করবে নারীবাদ। আত্মমর্যাদা বর্ধক ব্রান্ডের শ্যাম্পু ব্যবহার করে মেয়েদের মর্যাদাবোধ নিশ্চিত করছে নারীবাদ।

শিশু ও নারীর ওপর বোমা হামলার কারণও যে নারীবাদ-ই হবে, এতে আর অবাক হবার কী আছে?

ফরিদা আখতার

বেগম রোকেয়া, বোরকা ও আফগান নারী

এই কথা সবারই জানা, ইসলাম ও নারী নিয়ে আলাপ উঠলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিত লোকেরা সবার আগে যা নিয়ে মেতে ওঠেন তা হলো বোরকা। এবারে আফগানিস্তান-ডিসকোর্সেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফরিদা আখতার সংক্ষিপ্ত-কিন্তু-মূল্যবান যে-বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তা আমরা ছাপছি। লেখাটা **মানুষ**-এর জন্যই বিশেষভাবে লিখিত নয়। মনীষী রোকেয়ার মৃত্যুদিবসকে উপলক্ষ করে এটা লেখা। আমরা ফরিদা আখতারের কাছে প্রাসঙ্গিক লেখা চাইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবেই বলতে গেলে বেশ কটা লেখা পাঠান। সেখান থেকে আমরা এই লেখাটা ছাপছি। কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় গিয়ে লেখাটা ফরিদা আপার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমাদের বন্ধু রফিকুল ইসলাম।

৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু দিবস একই সাথে পালনের দিন। বেগম রোকেয়ার জন্ম সাল (১৮৮০) জানা থাকলেও তার দিনক্ষণ জানা নাই। কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তিনি নারী জাগরণের একজন পথিকৃত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর আজ সকলেরই জানা। অবশ্য রোকেয়া খুবই কম বয়সে, মাত্র ৫২ বছর, মৃত্যুবরণ করেছেন। এই স্বল্পকালীন জীবনের মধ্যেও বেগম রোকেয়া শতাব্দির কাজ করে রেখেছেন। আমরা এক শতাব্দি ছেড়ে আর এক শতাব্দিতে এসেও রোকেয়ার কাজের গুরুত্ব যেন আরো বেশি করে উপলব্ধি করছি। আজ ২০০১ সালের ৯ই ডিসেম্বরে তাঁর প্রতি জানাই অগাধ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

এখন রোকেয়ার জন্ম-মৃত্যু দিবস একই দিন পালনের এই উদ্যোগ সকলেই মেনে নিয়েছে। তবে গত কয়েক বছর ধরে রোকেয়া দিবস পালনে কিছুটা ভাটা পড়েছে কারণ এই সময় রমজান মাস পড়ে গেছে। কাজেই কোনো বড় ধরণের কর্মসূচী নেয়া যাচ্ছে না। এবারের ৯ই ডিসেম্বর ঈদের প্রায় কাছাকাছি সময়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে এবারও রোকেয়া দিবস পালনে কিছু ঘাটতি হয়ে যেতে পারে। তা হোক, রোকেয়ার প্রকৃত মূল্যায়নই আমাদের কাম্য। এতে যেন কোন কমতি না হয়।

এবারের রোকেয়া দিবস সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান রচনার মধ্যে বোরকা লেখাটি আমার বারে বারে মনে পড়ছে। এই সময় আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলছে। সেখানে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

মার্কিন বোমা হামলায় প্রতিদিন মানুষ মরছে, আহত হচ্ছে, সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। আমাদের মতো আরাম করে ঘরে বসে রমজান মাসের রোজা রাখা হচ্ছে না। তালিবান সরকার প্রায় পতনের মুখোমুখি। আফগানিস্তানের প্রশ্ন যখনই আসে তখন দেখা যায় আফগান নারীদের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রহ খুবই বেশি। মার্কিন বোমা হামলার পর যেদিন প্রথম কাবুলের পতন ঘটলো এবং নর্দার্ন এলায়েন্স কাবুল দখল করলো তখন বিশ্বের সকলের দৃষ্টি ছিল আফগান নারীদের মুখ দেখা যায় কি না। বিবিসি ও সিএনএন বারে বারে মহিলাদের খোঁজ করেছে। শেষে তারা দেখালো আফগান নারীর অবগুণ্ঠনমুক্ত চেহারা! ভাবখানা এমন, আহ, কি সুন্দর! আফগান নারীদের কালো বোরকার ভেতর থেকে তাদের মুখখানা দেখার জন্যে কাতর পশ্চিমা বিশ্ব। যখন একটি দুটি মুখ দেখা গেলো এটাকে বিশাল ব্যাপার হিসাবে ফলাও করে বারে বারে প্রচার করা হোল। বিদেশে অবস্থানরত আফগান নারীদের সাক্ষাতকার নেয়া হোল তারা এখন কি চায়, তারা কেমন খুশি ইত্যাদি কথা জানার জন্যে। সুখের কথা বিদেশে অবস্থানরত সকল আফগান নারী কিন্তু পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের হাতে নিজেদের তেমন করে সঁপে দেন নি। তাঁরা বলেছেন, তালিবানরা তাদের ওপর নিপীড়ন করেছে ঠিকই কিন্তু পশ্চিমা মদদপুষ্ট নর্দার্ন এলায়েন্স এখন তাদের কব্জা করবে, এটা কোনোমতেই তাঁদের কাছে কাম্য নয়। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম যেভাবে আফগান নারীদের জন্যে মায়াকান্না দেখায় তার মধ্য দিয়ে তারা তাদের যুদ্ধবাজ কার্যকলাপকে জায়েজ করতে চায়। তারা যেন বা নারীমুক্তির জন্যে ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করছে! আফগানিস্তানের নারী সংগঠন বিপ্লবী আফগান নারী বা রেভুলুশনারী আফগান উইমেনস্ এসোসিয়েশন সংক্ষেপে রাওয়া পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চান। তাঁরা কারো খবরদারি চান না।

এই কথা সত্যি যে আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের সবচেয়ে খারাপ ঘটনার মধ্যে ছিল নারীদের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ। এ সম্পর্কে তালিবানদের নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের এই নীতি কেউ ভালভাবে গ্রহণ করে নি। তালিবানদের অসভ্য এবং উন্নয়ন বিরোধী ভাববার জন্যে আফগানিস্তানের বোরকায় ঢাকা মহিলাদের ছবিই যথেষ্ট, এমন একটি মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বে। বাংলাদেশেও তালিবান সংক্রান্ত যে ভীতি আছে তা প্রধানত 'নারী বিরোধ' আচরণকে কেন্দ্র করেই।

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার সময় নভেম্বর মাসে বিদেশী সাহায্য সংস্থার দুজন মহিলা কর্মী দীর্ঘদিন তালিবানদের হাতে বন্দি ছিল। তারা যখন মুক্তি পেলো তখন তাদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। জানার বিষয় ছিল তালিবানরা তাঁদের প্রতি কত বর্বর ব্যবহার করেছে। সিএনএন-এ এই সাংবাদিক সম্মেলন দেখার সুযোগ আমারও হয়েছিল। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশে আরো অনেকেই দেখেছেন। অবাক হলাম যে এই দুজন মহিলা তালিবানদের সম্পর্কে কোনো খারাপ মন্তব্য করলেন না। এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন তালিবানরা তাদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছে এবং তাদেরকে কেবলমাত্র নামাজের সময় ছাড়া অন্য সব সময়ই গান বা আনন্দ করতে বলেছে। এই দুই মহিলা কর্মী তরুণ বয়সের। তাঁদের কাছ থেকে তালিবানদের সম্পর্কে কোনো ভীতিজনক তথ্য উদ্ধার করা যায়নি। বরং তারা বললো, তালিবানরা তাদের বলেছে আপনারা আমাদের বোন। আমাদের প্রাণ দিয়ে হলেও আপনাদের আমরা রক্ষা করবো। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের জন্যে এটা একটা বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে গেলো। তারা এর পরে আর সেই মুক্তিপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে কোনো হৈ চৈ করে নি। যদি তারা বলতো যে তালিবানরা বর্বর আচরণ করেছে তাহলে এখন প্রতিদিনই একবার করে তা প্রচার করা হোত, সন্দেহ নেই।

এই সব ঘটনা দেখে রোকেয়ার বোরকা লেখাটির কথা খুবই মনে পড়ছে। প্রায় এক শত বছর আগে রোকেয়া পশ্চিমাদের এই চরিত্রকে যেন দেখে ফেলেছিলেন। বেগম রোকেয়া নিজে সরাসরি 'বোরকা' না পড়লেও তাঁর পোষাক ছিল আপাদমস্তক ঢাকা। লম্বা হাতা ব্লাউজ, মাথায় কাপড় দিয়ে তিনি চলতেন। তবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে এই পোষাকের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। যেকোনো কারণেই হোক, সেই সময় সরাসরি বোরকার পক্ষ নিয়ে 'বোরকা' শিরোনামে একটি লেখা তাঁকে লিখতে হয়েছিল। মনে হচ্ছে পশ্চিমাভাবাপন্ন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের যন্ত্রণাতেই লিখেছেন। এই লেখার মধ্যে সেই বিষয়টি পরিষ্কার। পাঠককে লেখাটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। রোকেয়া লিখছেন, 'আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের জঘন্য অবরোধ-প্রথাই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরে থাকে?' অর্থাৎ ধরেই নেয়া হয় বোরকার সাথে উন্নতির একটা বিরোধ আছে এবং তালিবানমুক্ত আফগান নারীদের প্রথম কাজ হচ্ছে বোরকা ছাড়া। তাদের মুখটি বিশ্ববাসীকে দেখানো।

রোকেয়া আরো লিখিয়াছেন, "কেহ বলিয়াছেন যে, সুন্দর দেহকে 'বোরকা' জাতীয় এক কদর্য ঘোমটা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার জীব সাজা যে কি হাস্যকর ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন" ইত্যাদি। তাহা ঠিক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই। বরং কুলকামিনীগণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দেখাইয়া সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করাই দোষণীয় মনে করিবে'। রোকেয়া সম্ভ্রান্ত নারীদের কথা বিশেষভাবে বললেও আমার মনে হয় না কোনো নারীই চান নিজেদের প্রদর্শনযোগ্য করে তুলতে। গরিব যারা তাঁরা নিজেদের শরীর ঢাকার মতো যথেষ্ট কাপড় পান না বটে, তাই বলে তাঁরাও নিশ্চয়ই অহেতুক দর্শক আকর্ষণ করতে চান না। রোকেয়ার কাছে নারী মুক্তি কেবল বাইরের বিষয় নয়। এটা সত্যিকার অর্থে মুক্তি। তিনি নারীদের অবরোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাই তিনি পর্দাকেও ন্যায় এবং অন্যায় পর্দা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বোরকার পক্ষ নিলেও তিনি অন্যায় পর্দার বিরুদ্ধে পরিষ্কার ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, '... সকল নিয়মের একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। ... নব বধুদের অন্যায় পর্দাও উল্লেখযোগ্য। ... আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈল্যবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। ...' রোকেয়ার কথা হচ্ছে নারীদের স্বাধীনভাবে বাইরে বের হতে পারার অধিকার ও ক্ষমতা অর্জন করাই বেশি দরকার, বোরকা পড়লো কি পড়লো না সেই বিতর্ক ফালতু বিতর্ক ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর ভাষাতেই বলি, 'যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমত পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়'। তিনি একই সাথে যেমন তথাকথিত আধুনিক হওয়ার সমালোচনা করেছেন, তেমনি নারীর ওপর অহেতুক ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুশাসনেরও বিরোধিতা করেছেন।

পশ্চিমা নারীরা বোরকা পরেন না, তাই বলে কি তাঁরা বেশি স্বাধীন? এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তবে আফগানিস্তানের নারীদের যখন বোরকা খোলা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ হচ্ছে তখন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন লেখিকা জোয়ান জেকবস এবং জেকুলিন জ্যাকস 'দি বোরকা এন্ড দি

বিকিনি' শিরোনামে একটি লেখা লিখেছেন ২০০১ সালের নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখে। এই লেখাটি ই-মেইলের মাধ্যমে আমার হাতেও এসেছে। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আফগান নারীর বোরকা ও মার্কিন নারীর বিকিনি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জোয়ান এবং জ্যাকুলিন বলছেন তালিবানরা আফগান নারীদের রাস্তায় বের হতে দেয়নি, স্কুলে যেতে দেয়নি, কোনো প্রকার সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি, এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু মার্কিনীরা নিশ্চয়ই আফগান নারীকে মুক্ত করার জন্যে সেখানে যায় নি। বরং এখন বোঝা দরকার মার্কিন দেশের উলঙ্গ সংস্কৃতিতে নারীর শরীর থেকে কাপড় সরিয়ে সেখানে কিভাবে নারীরা দিনে দিনে আরো বড় ধরনের শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাঁরা তুলনা করে দেখিয়েছেন তালিবানরা মেয়েদের শরীর ঢাকতে বাধ্য করছেন আর আমেরিকায় টিভি বিজ্ঞাপনে নারীকে প্রায় উলঙ্গ করে দেখাচ্ছে। গত শতাব্দিতে মার্কিন সংস্কৃতিতে নারীকে প্রায় উলঙ্গ করে ফেলেছে। ভিক্টোরিয়ান আমেরিকায় নারীকে মূল্যায়ন করা হোত, তাঁর কাজ দিয়ে, বর্তমান সময়ে নারীকে মূল্যায়ন করা হয় সে দেখতে কেমন, তার ভিত্তিতে। মার্কিন নারীদের সুন্দর দেখাবার জন্য ব্যবসা শুরু হয়েছে ১৯২০ সালের হেয়ার রিমুভাল ক্রিম নিয়ে, আর এখন এসেছে ডায়েট কন্ট্রোল সামগ্রি নিয়ে। মার্কিন মহিলাদের শরীর থেকে চর্বি সরিয়ে তাঁকে সুন্দর হতে হবে, এটাই এখন সেই সমাজের চাহিদা। ছায়াছবি, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন পত্রিকা যেখানেই দেখেন না কেন, হাড় জিরজিরে মার্কিন নারীর সৌন্দর্যই এখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য। জোয়ান এবং জ্যাকুলিনের মতে মার্কিন নারীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনে তাদের হাতে মার্টিনি এবং সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে কোটি ডলারের ব্যবসা হচ্ছে। মার্কিন মহিলারা বছরে ৩০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেন শুধুমাত্র শরীরকে চিকন করার জন্যে। পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির বাৎসরিক আয় ৫৬ বিলিয়ন ডলার। টাকার অংকে হিসাব করে দেখলে বোঝা যাবে কত বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। জোয়ান এবং জ্যাকুলিন বলছেন তাহলে দূরদেশের তালিবানরা নারীদের বোরকা পরাচ্ছে বলে চেঁচামেচি করার আগে নিজ দেশের নারীকে বিকিনি পরিয়ে কী সর্বনাশ করছে তা দেখা দরকার।

নারীকে সুন্দর দেখাবার নাম করে কর্পোরেট ব্যবসা কি এখন বাংলাদেশের মতো দেশেও নেই। রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেখি মোটা শরীর চিকন করা হয়। বোঝানো হয় এটা সুন্দর হওয়ার জন্যে জরুরী। নারীর ফর্সা হওয়াটাও জরুরী। তাই ফেয়ার এন্ড লাভলী আজ ঘরে ঘরে ব্যবহার হচ্ছে। ভরসা দেয়া হচ্ছে তাহলে রাজকুমার এসে বিয়ে করবে। এটাই কি নারীমুক্তি? এর জন্যে কি আমরা এতোদিন লড়াই সংগ্রাম করেছি? রোকেয়া কি আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন? এখন আমরা আধুনিক হতে চাই কিন্তু আধুনিকতার সাথে মুক্তি কতখানি আসছে তা যাচাই করে দেখছি না। মিথ্যে বিতর্ক করছি বোরকা ভাল, না উলঙ্গ থাকা দরকার। যেনবা শরীর থেকে কাপড় সরালেই মুক্তি আসে।

শেষ কথা হচ্ছে, কোন পর্দা অন্যায়ভাবে এবং জোর করে চাপিয়ে দেয়া আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের নামে কিংবা অন্য যেকোনো যুক্তিতে নারীর ওপর এই শাসন আর চলবে না। কিন্তু একই সাথে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে, অনেকটা ব্রেইন ওয়াশ বা মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে ব্যবসার ফাঁদে পড়ে নারীর নিজের শরীরের ওপর অত্যাচার করাও কোনো মুক্ত মনের লক্ষণ নয়। এটা বুঝতে হবে প্রচার মাধ্যম আরোপিত সৌন্দর্য এবং 'মুক্তি' সত্যিকারের মুক্তি নয়। নারীর সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে মনের দাসত্ব থেকে মুক্তি। সমাজের পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজাল ভেঙ্গে দেয়া। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। রোকেয়ার কথা যদি মনে রাখি তাহলে শুধু এতটুকু বুঝলেই হবে।

এডোয়ার্ড সাঈদ

ইসলাম এবং পশ্চিম ব্যানার হিসেবে অপর্যাপ্ত

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন

> এই লেখাটা ছাপা হয়েছিল *দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ১৬, ২০০১ তারিখে। আমরা তা জোগাড় করেছি The Edward Said Archive, (http://tesa.leb.net/)। পরে আমরা লক্ষ করেছি, *প্রথম আলো* এই লেখাটারই অনুবাদ 'অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ' শিরোনামে ছেপেছিল। যাই হোক, আমরা নতুনভাবে এটা অনুবাদ করে এখানে পেশ করলাম।

যে-ধরনের জমকালো বিভিষীকা নিউ ইয়র্ককে (এবং খানিকটা কম পরিমাণে ওয়াশিংটনকে) আঘাত করেছে তা সূচনা ঘটিয়েছে অদৃশ্য অজানা হামলাকারী, রাজনৈতিক বার্তাবিহীন সন্ত্রাস-মিশন এবং অর্থহীন ধ্বংসের এক নতুন দুনিয়ার।

এই জখম শহরের বাসিন্দাদের মনে আতঙ্ক, ভয়, অব্যাহত ক্রোধের অনুভূতি এবং প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অবশ্যই দীর্ঘ দিন ধরে জারি থাকবে, যেমন বহাল থাকবে অকৃত্রিম বিষাদ এবং দুঃখদুর্দশা যা ব্যাপক এক হত্যাযজ্ঞ এতো বেশি লোকের ওপর এতো নিষ্ঠুরভাবে চাপিয়ে দিয়েছে।

নিউ ইয়র্কের লোকেরা ভাগ্যবান যে স্বাভাবিকভাবে কঠোর ও অপ্রীতিকরভাবে লড়াকু একজন মানুষ, বলা চলে হাল না-ছাড়া এক ব্যক্তিত্ব মেয়র রুডি জিউলিয়ানি দ্রুততার সাথে অর্জন করেছেন চার্চিলের মর্যাদা। শান্তভাবে, নিরাবেগভাবে এবং অসাধারণ সমবেদনার সাথে তিনি শহরের বীর পুলিশ, দমকলবাহিনী ও জরুরী সেবাসমূহকে প্রশংসা করার মতো কার্যকর নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং হায়, প্রচুর প্রাণহানির মধ্য দিয়ে। আতঙ্ক সম্পর্কে এবং শহরের বৃহৎ আরব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর উগ্র জাতীয়তাবাদী হামলা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণের ক্ষেত্রে, নিদারুণ মনোযন্ত্রণা প্রকাশের ক্ষেত্রে, এবং ধ্বসিয়ে-দেয়া আঘাতের পর জীবন আবার শুরু করার চেষ্টা করার জন্য প্রত্যেকের ওপর চাপ দেয়ার ক্ষেত্রেও জিউলিয়ানির কণ্ঠস্বরটি ছিল প্রথম।

ভালো হতো, যদি এটুকুই হতো সব। জাতীয় টেলিভিশন-রিপোর্টিং অবশ্যই ঐ ভয়ঙ্কর পাখাওয়ালা অপ্রতিরোধ্য মহা-বিনাশী শক্তিকে প্রত্যেক বাসায় পৌঁছে দিয়েছে কোনো কিছুকে রেয়াত না-দিয়ে, নাছোড়বান্দার মতো করে– সবসময়

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

গঠনমূলকভাবে নয়। বেশিরভাগ ধারাভাষ্য জোর দিয়েছে, আসলে বড়ো করে দেখিয়েছে, প্রত্যাশিত এবং পূর্বানুমেয়কে, যা প্রায়-সব মার্কিনী অনুভব করে: চরম ক্ষতি, ক্রোধ, নির্মমতা, আক্রান্ত হওয়ার অনুভূতি, সমুচিত প্রতিহিংসা পূরণের অভিলাষ, এবং লাগামহীন প্রতিশোধ। শোক ও দেশপ্রেমের নিয়মমাফিক প্রকাশের জন্য প্রত্যেক রাজনীতিবিদ এবং সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞরা কর্তব্যপরায়নতার সাথে পুনরাবৃত্তি করে জানিয়েছেন আমরা পরাজিত না-হবো কীভাবে, বাধাগ্রস্ত না-হবো কীভাবে, সন্ত্রাসবাদ সমূলে উৎপাটিত না-হওয়া পর্যন্ত আমরা নিরস্ত না-হবো কীভাবে। এটা হলো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রত্যেকেই বলছে, কিন্তু কোথায়, কোন কোন ফ্রন্টে, কী কী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে? কোনো উত্তর দেয়া হচ্ছে না, কেবল এই অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া ছাড়া যে, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইসলাম হচ্ছে সেই জিনিস 'আমরা' যার বিরুদ্ধে, এবং সন্ত্রাসবাদকে ধ্বংস হতেই হবে।

যাই হোক, সবচে যা খেদের তা হলো, পৃথিবীতে আমেরিকার ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার পেছনে দেয়া হচ্ছে খুবই অল্প সময়, এবং উপকূলদ্বয়ের ওপারের জটিল বাস্তবতায় তার (অর্থাৎ আমেরিকার) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বহু দিন ধরে দুনিয়ার বাকি অংশকে তার কাছ থেকে চরম দূরবর্তী করে ও প্রকৃতপক্ষে গড় মার্কিনীদের মনের বাইরে রেখে দিয়েছে। আপনার বরঞ্চ মনে হবে, আমেরিকা ছিল একটা ঘুমন্ত দৈত্য– যেন ইসলামি জগৎ জুড়ে নিরন্তর যুদ্ধে বা নানান সংঘাতে লিপ্ত একটা পরাশক্তি নয়। জনগণের সমষ্টিগত কল্পনা ঘৃণা ও অপছন্দ করে এমন সকল কিছুর প্রতীকে পরিণত হবার আগে তাঁর ও তাঁর ছায়া-অনুসারীদের সকল ইতিহাস কার্যত মুছে যায় এমন হতবুদ্ধিকরভাবে ওসামা বিন লাদেনের নাম ও চেহারা মার্কিনীদের কাছে পরিচিত। সুতরাং, অপরিহার্যভাবে, সমষ্টিগত আবেগ-অনুভূতিকে যুদ্ধোন্মাদনার দিকে পরিচালনা করা হচ্ছে। যা ঘটে চলেছে – প্রথম বারের মতো নিজ দেশে জখম হয়ে একটি সাম্রাজ্য-শক্তি সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে তার স্বার্থকে এগিয়ে নিচ্ছে সহসা বদলে-যাওয়া সংঘাতপূর্ণ একটা ভূগোলে, যার স্পষ্ট সীমানা নেই, বা দৃশ্যমান কোনো ব্যক্তি নেই – তার তুলনায় এর সঙ্গে বরঞ্চ মবি ডিকের সন্ধানরত ক্যাপ্টেন আহাবের গা-ছমছমানো প্রচেষ্টার মিল বেশি। মনি-ধর্মমতের[১] প্রতীকসমূহ এবং রহস্য-উদ্ঘাটনমূলক দৃশ্যপট নিয়ে লোফালুফি করছে ভবিষ্যত-পরিণামেরা এবং বাগাড়ম্বরের সংযম ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে বাতাসে।

এখন যা দরকার তা হলো পরিস্থিতির যৌক্তিক উপলব্ধি; আর ঢাক-পেটানো নয়। জর্জ বুশ ও তাঁর দল চান পরেরটি, আগেরটি নয়। তথাপি, ইসলামি ও আরব-এলাকাগুলোতে আনুষ্ঠানিক অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটি উদ্ধত ক্ষমতার সমার্থক, শুধু ইসরাইল নয় অসংখ্য নিপীড়ণমূলক আরব শাসকের প্রতি পবিত্রতার ঢং-দেখানো মহাদানশীল সমর্থনের জন্য, এবং সেকুলার জনগণ ও আন্দোলন (যাদের সকলেরই সত্যিকারের দুঃখদুর্দশা আছে) এর সাথে সংলাপের সম্ভাবনার প্রতি অমনোযোগের জন্য দেশটি সুবিদিত। এই প্রেক্ষাপটে মার্কিন-বিরোধিতার মতবাদ আধুনিকতার প্রতি ঘৃণা বা প্রযুক্তি-ঈর্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এটা দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ-বিশেষ হস্তক্ষেপ ও সুনির্দিষ্ট লুণ্ঠনের বয়ানের ওপর, এবং মার্কিন-আরোপিত নিষেধাজ্ঞার অধীনস্ত ইরাকী জনগণের ভোগান্তি ও প্যালেস্টাইনি অঞ্চলগুলোতে ৩৪ বছরের পুরোনো ইসরাইলি দখলদারিত্বের প্রতি মার্কিন সমর্থনের মতো ঘটনাগুলোর ওপর। সামরিক দখলদারিত্ব তীব্রতর করা এবং প্যালেস্টাইনিদের ওপর নির্যাতনের মাধ্যমে ইসরাইল এখন মার্কিন বিপর্যয়কে ছিদ্রান্বেষীর মতো কাজে লাগাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'সন্ত্রাসবাদ' এবং 'স্বাধীনতা'র মতো শব্দের ছররা-ছোটানো রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর এসব বিষয়কে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, যেখানে এসব বৃহৎ বিমূর্ত ধারণারাজির পেছনে আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গোপন ও

নোংরা বস্তুগত স্বার্থ, ও তেল, প্রতিরক্ষা ও ইহুদিবাদী লবিগুলোর প্রভাব (যারা এখন পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নিজেদের মুঠি শক্ত করে গুছিয়ে আনছে), এবং 'ইসলাম' সম্পর্কে যুগ-যুগ-পুরোনো বৈরিতা ও অজ্ঞতা যা প্রতিদিন নতুন নতুন রূপ ধারণ করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বশীলতা অবশ্য প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আরো বেশি বিচার-বিশ্লেষণমূলক বোধবুদ্ধি দাবি করে। সন্ত্রাস অবশ্যই আছে, প্রায় প্রত্যেক সংগ্রামী আন্দোলন একটা স্তরে এসে সন্ত্রাসের ওপর নির্ভর করেছে। ম্যাণ্ডেলার এএনসি'র[২] বেলায় যেমন অন্যদের বেলায়ও তেমনি এটা সত্য ছিল, ইহুদিবাদও[৩] এর মধ্যে পড়ে। এবং তথাপি এফ-১৬ ও হেলিকপ্টার গানশিপ দিয়ে প্রতিরক্ষাহীন বেসামরিক লোকজনের ওপর বোমাবর্ষণ আর প্রথাগত জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসের কাঠামো ও পরিণাম একই।

সমস্ত সন্ত্রাস সম্পর্কে যা খারাপ তা হলো যখন এটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণা আর সরলায়িত মিথ (যা ইতিহাস ও বোধবুদ্ধির দিক থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়)-এর সাথে যুক্ত হয়। এই হলো সেই জায়গা যেখানে সেকুলার চেতনাকে চেষ্টা করতে হবে যেন তার অস্তিত্ব অন্যেরা টের পায়– সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোক বা মধ্যপ্রাচ্যে। কোনো কারণ, কোনো ঈশ্বর, কোনো বিমূর্ত ধ্যানধারণা নিরীহ লোকজনের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞকে জায়েজ করতে পারে না– অন্তত বিশেষত যখন নাকি ছোট একটা গ্রুপ এরকম কাজের দায়িত্বে থাকে এবং সত্যিকারের কোনো ম্যাণ্ডেট না-থাকা সত্ত্বেও নিজেরাই নিজেদেরকে ঐ উদ্দেশ্যের প্রতিনিধি মনে করে।

এছাড়া – মুসলমানরা এটা নিয়ে প্রচুর ঝগড়াফ্যাসাদ করেছে – একক একটা ইসলাম বলতে কিছু নেই: আছে ইসলামসমূহ, ঠিক যেমন আছে আমেরিকাসমূহ। সকল ঐতিহ্য, ধর্ম বা জাতির বেলায়ই এটা সত্য, এমনকি যদিও তাদের কোনো কোনো অনুসারী তাদের নিজেদের চারপাশে সীমা এঁকে দেয়ার এবং তাদের ধর্মমতকে নিখুঁতভাবে একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তথাপি, জনপ্রিয় রাজনৈতিক বক্তারা যেভাবে তুলে ধরে থাকে ইতিহাস তার চে অনেক বেশি জটিল এবং বৈপরিত্যপূর্ণ। তাদের অনুসারীরা এবং বিরোধীরা যতটা দাবি করে এসব বক্তা তার চে অনেক কম প্রতিনিধিত্বশীল। ধর্মীয় ও নৈতিক মৌলবাদীদের নিয়ে ঝামেলা হলো, বিপ্লব ও প্রতিরোধ সম্পর্কে তাদের আদিম ধ্যানধারণা (যার মধ্যে খুন করার ও নিহত হওয়ার আগ্রহ অন্তর্ভূক্ত থাকে) দেখে মনে হয় যে, জটিল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে আজকাল সেগুলো অতিশয় সহজভাবে যুক্ত হতে পারে, এবং দেখে মনে হয় সেগুলো ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়ার সন্তোষজনক পন্থা। নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের আত্মঘাতী বোমারুরা সম্ভবত মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ, গরিব উদ্বাস্তু নয়। একটি উদ্দেশ্য অর্জনের কাজে বিজ্ঞ নেতৃত্ব (যা দাম দেয় শিক্ষাকে, জনগণের একত্রীকরণকে এবং ধৈর্যশীল সংগঠনের কাজকে) গড়ে তোলার বদলে অধম ও বেপরোয়া লোকেরা প্রায়শ ঝুঁকে পড়ে ঐন্দ্রজালিক চিন্তনের দিকে এবং রক্তাক্ত আর মিথ্যা ধর্মীয় সস্তা হাততালিতে মোড়ানো ঝটিকা-সমাধানের দিকে যা এই আতঙ্কজনক মডেল সরবরাহ করে থাকে।

অন্যদিকে, বিপুল সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা জ্ঞান বা নৈতিক দূরদৃষ্টির কোনো গ্যারান্টি নয়। 'আমেরিকা' যখন কোথাও কোনোখানে দীর্ঘ একটি যুদ্ধের জন্য নিজেকে সজ্জিত করছে, সঙ্গে আছে মিত্ররা, যাদেরকে চাপ দেয়া হয়েছে যেন খুবই অনিশ্চিত ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ও খুবই অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে তারা সার্ভিস দেয়; অথচ বর্তমান এই সংকটে সংশয়ী ও মানবিক কণ্ঠস্বর এখনো ব্যাপকভাবে অশ্রুত। আমাদের দরকার কাল্পনিক মানুষকে-মানুষের-কাছ-থেকে-পৃথক-করা লক্ষণসীমা থেকে ফিরে আসা, এবং দরকার ছাপ্পামার্কাগুলোকে আবার পরীক্ষা করে দেখা, বিদ্যমান সীমিত সম্পদসমূহকে পুনর্বিবেচনা করা, এবং আমাদের নিয়তিকে

একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া যার বেশিরভাগটাই, মারমুখো চিৎকার ও ধর্মমত থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন কালচার নিষ্পন্ন করেছে।

অন্ধভাবে অনুসরণ করার মতো ব্যানার হিসেবে 'ইসলাম' এবং 'পশ্চিম' স্রেফ অপর্যাপ্ত। এগুলোর পেছন-পেছন কেউ-কেউ দৌড়াবে, কিন্তু নতুন প্রজন্মের পক্ষে অবিচার ও নিপীড়নের পরস্পরনির্ভরশীল ইতিহাসসমূহের দিকে না-তাকিয়ে, সাধারণ মুক্তি ও পারস্পরিক আলোকায়নের জন্য চেষ্টা না-করে নিজেরা নিজেদেরকে বিরতিবিহীন দীর্ঘায়িত যুদ্ধের অভিশাপে অভিশপ্ত করাটা যতটা না প্রয়োজন তার চে বেশি তারা সেটা করতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে। 'অপর'কে দানবে পরিণত করাটা কোনো প্রকার শোভন রাজনীতির ভিত্তি হতে পারে না; এখন অবশ্যই না যখন অবিচারের ভেতরকার সন্ত্রাসের শেকড়গুলোকে ধরতে পারা এবং সন্ত্রাসবাদীদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বাধাগ্রস্ত করা বা দৈনন্দিন জীবনের বাইরে ফেলে দেয়া সম্ভব। এতে ধৈর্য ও শিক্ষা লাগবে, কিন্তু আরো বড়ো মাপের ব্যাপকভিত্তিক সহিংসতা ও ভোগান্তির চেয়ে তা বেশি মূল্যবান বিনিয়োগ।

অনুবাদকের টীকা

[১] মনি-ধর্মমত: মনি-ধর্মমতের উৎপত্তি ঘটে ৩য় শতকের পারস্যে। মনি নামে একজন 'নবী' এর প্রচার করেন। তাঁর জন্ম বর্তমান-ইরাকের অন্তর্ভূক্ত দক্ষিণ ব্যাবিলনিয়ার সম্ভ্রান্ত এক পারসীয় পরিবারে ২১৬ খ্রিস্টাব্দে। অল্প বয়সে তিনি তাঁর প্রথম ধর্মযাত্রায় ভারত সফর করেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধমতে প্রভাবিত হন। পারসীয় সম্রাট ১ম শাপুর-এর ভরসায় তিনি সারা সাম্রাজ্যে তার ধর্ম প্রচার করেন। প্রচুর সাফল্য আসে। অতঃপর তাঁর ধর্মপ্রচারকদের দল পাঠান তিনি রোমান সাম্রাজ্যে। তৎকালীন খ্রিস্টান ধর্মমতের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল মনিশিজ্‌ম্। বস্তু ও শক্তি, আলো ও অন্ধকার, শুভ ও অশুভ এবং শয়তান ও ঈশ্বরের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে এটা গড়ে উঠেছিল। এই ধর্মে সমন্বয় ঘটানো হয় জরোয়াস্ত্রীয়, বৌদ্ধীয়, খ্রিস্টীয় ও নস্টিসিজ্‌ম্-প্রভাবিত ধর্মমতসমূহের মধ্যে। নস্টিকগণ একপ্রকার গূঢ় দিব্যজ্ঞান বা ওহি-জ্ঞানের কঠোর সাধনা করতেন। তাঁরা মনে করতেন জ্ঞান একটা স্বর্গীয় ব্যাপার। জরোয়াস্ত্র, বুদ্ধ, খ্রিস্ট সকলেই, এই ধর্মমতানুসারে, নবী। পরের সম্রাট ১ম বাহরাম সিংহাসনে আরোহন করলে জরোয়াস্ত্রবাদীরা মহাত্মা মনিকে সম্ভবত মেরে ফেলে, মতান্তরে তিনি বন্দী অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরের শতকে চীন থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত তাঁর ধর্ম প্রচারিত হয়। ধর্মতাত্ত্বিক সেন্ট অগাস্টিন খ্রিস্টান হওয়ার আগে ৯ বছর মনিশিজ্‌ম্-এ আস্থা রেখেছিলেন। পাশ্চাত্যে একটা পৃথক ধর্ম হিসেবে মনিশিজ্‌ম্ এখন অদৃশ্য। কিন্তু তার চিন্তাধারায়, দর্শনে ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব এখনো টের পাওয়া যায়। (সূত্র: *এনকার্টা সিডি-রম এনসাইকোপিডিয়া* ২০০২ এবং *এনসাইকোপিডিয়া ব্রিটানিকা সিডি-রম* ২০০২)

[২] এএনসির সন্ত্রাস: আপাতত অল্প সামান্য কটি কথা জেনে রাখা দরকার এ-প্রসঙ্গে। ১৯৬৪ সালে ম্যাণ্ডেলার বিচার শুরু হয় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, এএনসি'র 'আম্‌কন্‌তো উই সেয্‌ওয়ে' বা 'জাতির বর্শা' নামক 'সন্ত্রাসবাদী' শাখা-সংগঠনের নেতাদের সাথে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের স্যাবোটাজ-কর্মকাণ্ডকে তাঁরা নিজেরা বলতেন "যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত সহিংসতা"। এই সংগঠনটি সহিংস তৎপরতা চালাচ্ছিল ১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৬৩-৬৪ এর দিকে। তো, ১৯৬৪ এর এপ্রিল মাসে ম্যাণ্ডেলা যে-জবানবন্দী দেন, তাতে তিনি বলেন, যাঁরা ঐ সামরিক সংগঠনটি গড়ে তোলেন তিনি নিজে তাঁদের একজন ছিলেন এবং ১৯৬২ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এর তৎপরতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বলেও জানান। অর্থাৎ, এএনসি'র 'সন্ত্রাসী' তৎপরতা এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পর্যায় থেকেই পরিচালিত হতো। পরিহাসের ব্যাপার হলো, ম্যাণ্ডেলাদের এই সংগঠনের কর্মকর্তাদের পদবী-নামগুলো তাঁরা নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ ইহুদি বর্ণবাদী ও 'সন্ত্রাসবাদী' সংগঠন 'আরগান্‌য় ভেয় লিউমি'র সংগঠন-পরিচালনা-পদ্ধতির কাছ থেকে। আর, নিজেদের সহিংসতার পক্ষে ম্যাণ্ডেলা ঐ জবানবন্দীতেই বলেছিলেন: "... we felt that without violence there would be no way open to the African people to succeed in their struggle ..." (সূত্র: *এনকার্টা সিডি-রম এনসাইকোপিডিয়া* ২০০২)

[৩] ইহুদিবাদীদের সন্ত্রাস: ইহদিবাদী সংগঠনসমূহের 'সন্ত্রাসী' তৎপরতার কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করা যেতে পারে। দুনিয়ায় সন্ত্রাসী তৎপরতার শুরু খোদ ইহুদিদের হাতে ১ম শতকে, যখন জিলট নামের একটা ইহুদি ধর্মীয় গোষ্ঠী রোমানগণ কর্তৃক বর্তমানে যেটাকে ইসরায়েল বলা হয় সেটার দখলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। এই হলো শুরু। তারপর ব্রিটিশদের হাত থেকে প্যালেস্টাইন কেড়ে নিয়ে ইহুদিদের দেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গড়ে ওঠে উচ্চ মাত্রায় সশস্ত্র 'আত্মপ্রতিরক্ষা' বা 'হাগানাহ্', 'ইসরাইলের স্বাধীনতা-যোদ্ধা' বা 'লোহামী হেরাত ইসরাইল' (সংক্ষেপে 'স্টার্ন গ্যাং' বলে অধিকতর পরিচিত) এবং 'জাতীয় সামরিক সংগঠন' বা 'আরগান্য্ ভেয় লিউমি'র মতো চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠান। ইসরাইলের ভাবী কালের প্রধানমন্ত্রী ও পরে নোবেল-শান্তি-বিজয়ী মেনাচেম বেগিন ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইরগান গেরিলাবাহিনী। পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হওয়া ইৎয্হাক শামিরও এই ইরগান-এর সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁকে দু-বার গ্রেপ্তার করেছিল। ১৯৪০ এর দশকে আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই 'সন্ত্রাসবাদী' দলগুলোর তৎপরতা ছিল বলার মতো। বহু ব্রিটিশের প্রাণহানি ঘটে সেসব ঘটনায়। ১৯৪৬ সালে কিং ডেভিড হোটেলে ব্রিটিশ সরকারের অফিসে মারাত্মক বোমাহামলায় মারা যায় ১০০ জনেরও বেশি লোক। 'হাগানাহ্'র দুই সদস্য খুন করেছিল মিসরের কায়রোয় আবাসিক ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড ময়েন-কে। (সূত্র: *এনকার্টা সিডি-রম এনসাইকোপিডিয়া ২০০২* এবং *এনসাইকোপিডিয়া ব্রিটানিকা সিডি-রম ২০০২*)

ফরহাদ মজহার

ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন-ইউরোপীয় হামলা বিশ্বব্যাপী নিন্দা ও প্রতিবাদ-আন্দোলনের আলোড়ন তুললেও বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর বিশেষত বামপন্থীদের মধ্যে দ্বিধার দুলুনি তৈরি করে। এই দুলুনির এক দিকে আগ্রাসনের সুস্পষ্ট অন্যায্যতা, অন্য দিকে 'মৌলবাদী' তালেবানের সমর্থক বলে পরিগণিত হওয়ার আশঙ্কা। এরকম পরিস্থিতিতে 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'র উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'ক্রুসেড জেহাদ শ্রেণীসংগ্রাম' সেমিনারে (২৩.১১.০১) ফরহাদ মজহার যে-প্রবন্ধ তুলে ধরেন তা যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করে। প্রবন্ধটা আমরা সংগ্রহ করেছি পাক্ষিক *চিন্তা* (১৫.১২.০১) থেকে।

কয়েকটি পদ্ধতিগত প্রশ্ন

লড়াকু আহমদ ছফা আর কাছে নেই কিন্তু তার নাম ধারণ করে বানানো "আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা"-র প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠান "ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম"। আফগানিস্তানে সম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও হিংস্র যুদ্ধ এবং আমাদের কর্তব্য বিষয়ে এই সভা। আরও বড়ো পরিসরে বললে দুনিয়া জুড়ে পুঁজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি, জনগোষ্ঠি, রাষ্ট্র কিংবা নারী ও পুরুষের মধ্যে যে-লড়াই চলছে তাকে শ্রেণীসংগ্রামের দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করা। লড়াইয়ের বাস্তব রূপ যেমন আছে, তেমনি তার বাস্তব ভাষাও আছে, কেতাবি ভাষা নয়। স্থানকালপাত্র বা ইতিহাস ভেদে আবার তার ফারাকও কম নয়। সংগ্রামের ভাষা সবসময় কেতাবি কায়দায় ব্যক্ত হয় না। তাহলে শ্রেণীসংগ্রামের দিক থেকে বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই অনুধাবন মানে স্থানকালপাত্র ও ইতিহাস ভেদে তার বিভিন্ন রূপ ও ভাষার মধ্যে ঐক্যের জায়গাটা ধরতে শেখা। কেন? পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুনিয়ার নিপীড়িত শ্রেণী, নারীপুরুষ, জনগোষ্ঠি, জাতি বা সাধারণ জনগণকে ক্রমাগত বিভক্ত, পরস্পর থেকে আলাদা এবং পরস্পরকে দুশমনে পরিণত করে। এই ক্রমাগত বিভক্তি ও পরস্পরের দুশমন বানানোর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য শ্রেণীসংগ্রামের নানান ঐতিহাসিক রূপের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান এই সময়ে রাজনৈতিকভাবে অতিশয় জরুরী। এই কাজটা আমরা করতে চাই বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনীতিকে শক্তিশালী ও বিকশিত করবার দরকারে। বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্দার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে

ও অন্যত্র যে সাম্রাজ্যবাদী হামলা চলছে তার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

শ্রেণী সংগ্রাম দিয়ে ইতিহাস বিচারের প্রস্তাব ও চর্চার কথা তো বহুকাল থেকেই আমরা জানি। মার্কসেরও আগের। পুরনো। এমনকি তার অনিবার্য ফলাফল কী হয় সেই সম্পর্কে তার নিজের ভাষ্য ছাড়া ধারণাটা মার্কসের নিজেরও নয়, মার্কস সেটা নিজেই আমাদের বলে রেখেছেন। পুঁজিতান্ত্রিক (বিশ্ব) ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সর্বস্ব হারায়, বেঁচে থাকার জন্য শুধু নিজের গতরের শক্তি বিক্রি করার সম্পর্কটুকু ছাড়া। শ্রেণী সংগ্রামের ফলাফল এই শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র হয়ে ওঠে– এই প্রস্তাবটি তার মৌলিক। কিন্তু এখানে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবার মওকা পাব না।

শ্রেণীসংগ্রাম অনেকের কাছে হয়তো সেকেলে। অতিশয় ব্যবহারে ব্যবহারে জীবনানন্দের প্রতীকী জবানে "শুকরের মাংস" হয়ে গিয়েছে বোধহয়। বাংলাদেশে যার-যেমন-খেয়াল তেমন খোশহাল ব্যবহারে এইরকম মুশকিল হয়েছে। ধারণাটি ও তার চর্চার বিরুদ্ধে নানান কিসিমের মতাদর্শিক লড়াই তো আছেই। ফলে ধারণাটির উপযোগিতা কাজে খাটিয়ে দেখানোর দায় আমাদের কাঁধে নতুন করে চেপে বসেছে। আগে শ্রেণীসংগ্রামীদের বুদ্ধিবৃত্তিক জিন্দেগি আরামের ছিল। শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কি বলা হচ্ছে সকলেই যেনো বুঝে যেতো। এতই আয়নার মতো ফর্শা ছিলো ধারণাটি। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নও নেই। সেই চীনও নেই। লেনিনের মূর্তি টেনে ভেঙে নামানো হয়েছে। জার্মানির ট্রিয়ের শহরে গিয়ে কার্ল মার্কসের বাড়ির কথা শুধালে রাস্তায় অনেকে হা করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় 'এযাবতকালের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস'– এই আপ্তবাক্য হাঁকলে ওতে ঈমান আনবার লোকের অভাব হোত না। যে আয়নায় একসময় সহজেই মুখ দেখা গিয়েছিলো সেই আয়নার পেছনের কবেই পারদ ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনো প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না। অতএব কাজ বেড়েছে। এখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাকে সপ্রাণ করে তোলা এবং কাজে খাটিয়ে তার উপযোগিতা প্রদর্শন করে নানান সংশয়, প্রশ্ন ও কৈফিয়ত মেটাবার দায় এড়ানো সম্ভব নয়। এই আলোচনাতে সেইকারণে বিশ্লেষণ ও পদ্ধতিগত অনেক প্রশ্ন কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে ঢুকে পড়বে। কিন্তু পদ্ধতিগত সেইসব আলোচনা সবসময় পুরোপুরি পরিচ্ছন্নভাবে হাজির করার ফুরসত হয়তো হবে না। কারণ হচ্ছে আমরা খুবই সুনির্দিষ্ট একটি বিষয় ধরে আলোচনা করবো। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের ঘটনা এবং তার ছুতোয় আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক হামলা। আফগান জনগণের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বে যুদ্ধের যে নমুনা আমরা দেখছি তার বিচার ও কর্তব্য নির্ধারণ নিয়ে কিছু কথা বলবো। কিন্তু সেটা করবো শ্রেণীসংগ্রামের জায়গায় দাঁড়িয়ে 'জেহাদ' ও 'ক্রুসেড' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন পেশ করবার তাগিদে।

আমরা কারা? যারা মানি যে সমাজে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদ থাকে। সব মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বা দেখতে এক রকমও যদি ভাবি তাহলেও তাদের সামাজিক রূপের মধ্যে ধনী-গরিব, মনিব-মজুর পার্থক্য ও বিরোধ থাকে। যাকে আমরা শ্রেণীভেদ বলি। তার মানে 'মানুষ' নামক কোন বিমূর্ত জন্তু নেই। আমরা চাই বা না চাই শ্রেণীভেদের কারণে সমাজে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম চলে। চলছে। এখন বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্ফীতি, পুঞ্জিভবন ও বিস্তৃতির কারণে বিশ্বব্যাপী শ্রেণীসংগ্রামেরও বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার চরিত্রও ক্রমে ক্রমে বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে। এই প্রাথমিক চিন্তা কাঠামোর জায়গায় দাঁড়িয়ে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা– যাকে মানুষের একমাত্র ও শেষ সভ্যতা বলে হামেশা বর্ণবাদী প্রচারণা চালানো হয়– তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই চালানো ছাড়া

দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বেঁচে থাকার উপায় নেই। মানবেতিহাস অনন্ত সম্ভাবনাময়। সেই অনন্ত সম্ভাবনার দরোজাও খোলা যাবে না। এই ন্যূনতম কথাগুলো যারা মানেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে সেইভাবে শ্রেণীসংগ্রামের জায়গা থেকে গড়ে তোলেন তাঁদেরকেই মোটাদাগে সকর্মক রাজনৈতিক-দার্শনিক অর্থে এখানে "আমরা" বলে শনাক্ত করছি।

এই "আমরা"-র কোন "তোমরা" নেই। কার্ল মার্কস একটা দুর্ধর্ষ কথা বলে গিয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর জয় মানে শ্রেণী হিশাবে তার জয় নয়। কারণ তার জয়ের মধ্য দিয়ে যেহেতু সকল শ্রেণীভেদের অবসান ঘটে, শ্রেণীভেদমূলক সম্পর্কাদি যেহেতু নির্মূল হয়ে যায়– অর্থাৎ বিশ্বব্যবস্থা মনিব/মজুর বা পুঁজিপতি/শ্রমিক ইত্যাদি তৈরি করে সেই ব্যবস্থাটাই খোদ ভাঙে অতএব শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য কেবল মনিব বা পুঁজিপতি শ্রেণী নয়। সর্বহারা নিজেও নিজের শ্রেণীসত্তার বিরুদ্ধে লড়ে। কারণ লড়াইয়ের ফলাফল হিশাবে শ্রমিক বা সর্বহারা শ্রেণী তো নিজেরই বিলয় ঘটায়। লড়াইটা তাহলে শুধু "অপর" শ্রেণীর বিরুদ্ধে– শুধু সামন্ত, বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়। শ্রমিক শ্রেণীর "আমার"/"তোমার" ভেদ নেই। লড়াইটা আসলে তার নিজ শ্রেণীর বিলয় সাধনের তাগিদেই। পোস্টমর্ডানিজম/পোস্ট কলোনিয়ালিজম নামে যেসব কথাবার্তা কানে আসে তাদের ভালোমন্দ যারা হজম করেন না তাদের জন্য শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম সংক্রান্ত এই কথাগুলোকে পুরনো মনে হতে পারে বলে আপাতত নোক্তা দিয়ে রাখলাম।

কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম কংক্রিট রাজনৈতিক অর্থে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বাইরের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই হিশাবে হাজির হয়। শ্রমিক শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক শ্রেণী শত্রু থাকে। আছে। শত্রুমিত্র নির্ধারণের মধ্য দিয়েই শ্রেণী সংগ্রাম রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ করে। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় নিপীড়িত শ্রেণী তার শ্রেণীদুষমণ ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারছে কিনা তার মধ্য দিয়ে তার নিজের চরিত্রও প্রকাশিত হয়। লড়াইটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কোন ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম বা গায়ের চামড়ার পার্থক্য থাকা জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে নয়। পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের লড়াই নয়। ধনী দেশগুলোর বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রাম নয়। ইহুদি-খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াই তো নয়ই। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে এই ধরনের রূপ পরিগ্রহণ করে বলেই বাস্তবতা আমাদের ভাষার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। কি করে ভাষার ঐতিহাসিকতার অন্দরমহলে আমরা তাকাবো এই প্রবন্ধে সেই পদ্ধতিগত সমস্যাটাই মোকাবিলার চেষ্টা আছে।

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভায় আমরা যখন "পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা বলছি তখন "পশ্চিমা" কথাটিকে তার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি দ্বারা শনাক্ত করেই বুঝতে হবে, কোন শাশ্বত বা অনন্তকালীন ধারণা হিশাবে নয়। ঠিক তেমনি "জেহাদ" বা "ক্রুসেড" কথাগুলোকেও তার কংক্রিট ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি দিয়েই মালুম করা জরুরী। নিছকই মুসলমানদের আর খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ হিশাবে বুঝলে বিসমিল্লাতেই আমরা গলদ করবো। সাবধান।

আরেকটি ছোট কিন্তু দরকারি কথা। 'মানবেতিহাসের অনন্ত সম্ভবনা' কথাটিকেও হাওয়াই আওয়াজ ভাবার কারণ নেই। কৃৎকৌশলের বৈপ্লবিক ও নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং মানুষের জ্ঞান, জীবনযাপন বা ভাবনার দিগন্তে পুঁজি নিত্যনতুন যে রূপান্তর ঘটাচ্ছে তার মধ্যেও মানুষের অসাধারণ সম্ভাবনা আমরা টের পাই। এখনই– এখানকার বাস্তবতার মধ্যেই অন্বেষণ করতে হবে, কল্পজগতে নয়।

এতো গেলো মানুষকে বাহ্যিক বা প্রকৃতিগতভাবে যদি একইরকম বা একই ক্যাটাগরি জ্ঞান করে আমরা ভাবি। মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস তার প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই ধারবাহিকতা বলে একটা ইঙ্গিত মার্কস দিয়েছিলেন। সেই প্রাকৃতিকতার সূত্র ধরে অর্থনৈতিক

সম্পর্কের মধ্যে তার শ্রেণীভেদ ও চেতনা নিয়ে কথাগুলো বলা হোল। কিন্তু মানুষ তো কেবল অর্থনৈতিক সত্তা নয়। প্রকৃতিগতভাবে যেখানে দেখতে একরকমও নয়। প্রকৃতিজগতের সঙ্গে তার বৈষয়িক বা বস্তুগত সম্পর্কও একরকম নয়। নারী সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম, কিন্তু পুরুষের পেটে বোমা মারলেও সেই কর্মটি ঘটবে না। বনবাসী, আদিবাসী, বা কৃষক জনগোষ্ঠির সম্পর্কও প্রকৃতির সঙ্গে শ্রমিকের মতো নয়। তখন? নারী/পুরুষ, বাঙালি/আদিবাসী, কিম্বা সাদা/কালো/বাদামি মানুষ, ইত্যাদির কথা উঠলে আমাদের সাবধানে ভাবতে হয়। তখন প্রথাগত অর্থে শ্রেণীপার্থক্যের কথাকে আমরা শুধুই অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে বিচার করলে ভুল করবো। আরও নানান কিসিমের ভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শ্রমিক বা নিপীড়িত শ্রেণীর চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে সজ্ঞানে গড়ে ওঠা সংগ্রামগুলোর বাইরেও নারীআন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন এই কালে এই পার্থক্যগুলোর রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সুবিশাল অবদান রেখেছে। সেটা মনে রাখতে হবে। দুটো আন্দোলনই আমাদের কালে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু যে-তর্ক এখনো চলছে সেটা হোল কখন কোথায় কিভাবে প্রকৃতিগত পার্থক্য আর্থ-সামাজিক পার্থক্যের নিয়ন্তা হয়ে ওঠে, কিম্বা আর্থ-সামাজিক পার্থক্যই প্রকৃতিগত পার্থক্যের নিয়ন্তা হয়। বিয়েশাদি কাবিননামা করে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যের দ্বারা নির্ণিত ভূমিকা মেনে সন্তান "জন্ম দেওয়া" আর টাকার বিনিময়ে জরায়ু ভাড়া নিয়ে কিম্বা টেস্টটিউবে সন্তান উৎপাদন কি এক জিনিস? দুটো ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা ক্রিয়াশীল। প্রশ্ন হোল এই কালে পুঁজিতন্ত্রই কি পুরুষতন্ত্রের চরিত্র নির্ণয় করে, নাকি উল্টা? এই তর্কগুলো বিপ্লবী রাজনীতির আভ্যন্তরীণ তর্ক এবং সেটা চালিয়ে যাওয়া অতিশয় জরুরী। আমরা কার্ল মার্কসের অনুসারী থেকে মেনে নেব যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক আর আর সকল সম্পর্ক হয় ধ্বংস করে, কিম্বা তার আমূল রূপান্তর ঘটায়। তখন পুরুষতন্ত্র, আদিবাসী প্রশ্ন বা পরিবেশের সম্পর্ককে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের অভ্যন্তর থেকে দেখাই পদ্ধতিগতভাবে সঠিক। অতএব পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের গতিপ্রক্রিয়ার মধ্যে নারীপুরুষের সম্পর্ক ও ক্ষমতার প্রশ্নটিকে অনুধাবন করা দরকার। কিন্তু নারী ও পুরুষের সংগ্রাম, আদিবাসীদের সংগ্রাম– এমনকি কৃষকদের সংগ্রামকেও পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব হিশাবে দেখা কিম্বা শ্রেণী সংগ্রাম মাত্রই পুরুষের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি বা শ্রমিকদের রাজনৈতিক দলকেই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়ার কেচ্ছাগুলো বেশ ম্লান হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবী রাজনীতিকে নারী, আদিবাসী, বনবাসী, কৃষি ও কৃষিসভ্যতার প্রশ্নকে তার প্রাপ্য তাৎপর্য দান করে যথাযথভাবে ভাববার তাকৎ অর্জন করতে হবে।

শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর লড়াইকে এই নিবন্ধে প্রধান গণ্য করে আলোচনা করলেও এই দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। এই সকল প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রেও বিপ্লবী রাজনীতি যথাসম্ভব নিজেদের দরোজাজানালা খুলে রেখে নির্ভয়ে খোলা হাওয়া আসতে দেয়– এটাই নারী, আদিবাসী, পরিবেশ ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বৈপ্লবিক মৈত্রীর প্রাথমিক পদক্ষেপ। এখানে সেই দিকগুলো নিয়েই আমরা এখন কথা বলব যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্নটাই মুখ্য। এই আলোচনা সভা ঘোষণার পর "শ্রেণী সংগ্রাম কথাটি দেখে অনেকেই যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই ধরনের দরকারি পদ্ধতিগত প্রশ্ন তুলেছেন বলে নিবন্ধের শিরোনামে কেন অন্য সংগ্রামের কথা নেই তার একটা কৈফিয়ত আপাতত দিয়ে রাখলাম। বলাবহুল্য, আলোচনা যদি সেইসকল বিতর্কের দিকে যায় তাহলে আরও কথা বলা যাবে।

এবার পদ্ধতিগত প্রশ্নে আরেকটি পয়েন্ট। মানুষকে বাইরে থেকে একইরকম দেখতে মনে হলেও ভেতরে সে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণে নিজেকে একটি বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে কল্পনা করে, ভাবতে অভ্যস্ত হয় এবং তাকেই বাস্তব বলে জ্ঞান করে।

শ্রেণী সংগ্রামের জায়গা থেকে আত্মপরিচয়ের এই কাল্পনিক নির্মাণ কিন্তু ইতিহাসের সক্রিয় উপাদান। একে বিচারের সঠিক পদ্ধতি কি? শ্রেণী সংগ্রাম দিয়ে গোষ্ঠি, জাতি, রাষ্ট্রচেতনা ও লিঙ্গ সম্পর্কের বিচারের সরলীকরণ সম্পর্কেও তাহলে সাবধান থাকা জরুরী। কিন্তু এই পদ্ধতিগত প্রশ্নগুলো এখানে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় নয়। ফলে সেই বিষয়ে আলোচনা বিস্তারের ফুরসত এখানে নেই। কিন্তু এখানে সে বিষয়ে আমরা সতর্ক এই আশ্বাসটুকু পাঠকদের দিয়ে রাখতে চাই। সতর্ক থেকেই আমরা শ্রেণী সংগ্রাম কথাটি মোটামুটি চেনা বয়ানে এবং যতোটুকু খাটে ততোটুকুই এখানে ব্যবহার করব।

শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা

বন্ধু ছফা আমাদের জন্য যে প্রেরণা রেখে গেছেন তার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ বুদ্ধিবৃত্তিক সাহস। নির্ভয়ে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্ন তোলা। এটা পরিষ্কার যে আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চলছে। কিন্তু এতোটুকু বোঝাটাই কি বিপ্লবী রাজনীতির জন্য যথেষ্ট? যদি সত্যি সত্যি একে আমরা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বলে গণ্য করে থাকি এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হিশাবেই রুখে দাঁড়ানো সঠিক মনে করি তাহলে এই যুদ্ধে আফগানিস্তানের জনগণের পক্ষে লড়বার জন্য কোন বিপ্লবীকে তো আমরা সরাসরি শামিল হতে দেখি না। সেটা তালেবানদের সমর্থন করা হয়ে যায় বলে? বাংলাদেশে বামপন্থীরা রাস্তায় নেমেছেন, সেই গৌরবটুকু তাদের প্রাপ্য। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ঘৃণাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির কাজ করবার শর্ত অনুসন্ধানের কোন প্রয়াস আমরা লক্ষ করি নি। আদৌও কি এটা করা উচিত? সেটাও তো প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদকে ইসলামী মতাদর্শ দিয়ে যারা প্রতিরোধের কথা বলেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তার, আলাপ আলোচনার বা কাজের কি কোনই সুযোগ নেই?

তালেবান বা যে কোন ইসলামপন্থী দল সম্পর্কে এতো ঘৃণা, শঙ্কা, ভীতির কারণ কি? বাংলাদেশের একাত্তর সালের ইতিহাস একটা কারণ অবশ্যই এবং তাকে যথারীতি মনে রাখা দরকার। কিন্তু তালেবানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ষোল আনা না হোক সাড়ে আট আনা কি পশ্চিমা প্রপাগান্ডার ফল নয়? বিশেষত "আধুনিকতা", "প্রগতি", কিম্বা সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার কি একটা বড়ো কারণ নয়? যে "সভ্যতা"-কে আমরা সভ্যতা জ্ঞান করি আসলেই কি সেটা "সভ্য"? তাহলে উন্নত সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো আসলে কি? যুদ্ধ, হত্যা ও বিপুল সমরাস্ত্রের ভার ছাড়া যে-সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না, মুনাফা উৎপাদনই শুধু নয়, নিত্যদিন সারা দুনিয়ার অনাহার, মহামারী এবং ন্যূনতম বেঁচে থাকার শর্তসমূহের ক্ষয় ঘটানোই যে সভ্যতার ধর্ম তাকে আমরা প্রতিদিন মেনে নিচ্ছি কোন যুক্তিতে? তালেবান কি জিনিস আমরা কি তা সত্যি সত্যিই জানি? নাকি সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রপাগান্ডাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছি? ধর্ম কী জিনিস, ইসলাম কি, কিম্বা অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস ও মতাদর্শটাই বা কি? এই সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ থাকাই পছন্দ করি। এটাই আমাদের অধিকাংশের কাছে "প্রগতিশীলতা"। অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো আমাদের আছে। আমরা নির্ভয়ে প্রশ্নগুলো তুলতে চাই। "আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা"-য় আশা করি ক্রমে ক্রমে সেই সুযোগ আমরা করে নিতে পারব।

সাধরণভাবে এই আকুতি আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে যে ভুক্তভোগী খেটে খাওয়া শ্রেণী (শ্রমিক ও কৃষক) এবং অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর লড়াইকে আমরা কীভাবে শনাক্ত

করবো, বুঝবো, ব্যাখ্যা করবো এবং তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে নিজেদের রাজনীতি ও সংস্কৃতি কিম্বা তত্ত্ব ও তৎপরতার সঙ্গতি বিধান করবো তার সার্বক্ষণিক অনুসন্ধান দরকার। কিন্তু একটা দিক বিস্ময়করভাবে আমাদের এন্টেনার বাইরে থাকে। নিপীড়িত শ্রেণী নিশ্চয়ই সদা সর্বদা কার্ল মার্কস, লেনিন বা মাও জে দংয়ের ভাষায় কথা বলে না। অর্থাৎ মার্কস-লেনিনের অনুসারী বা কমিউনিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামের ভাষায় সকলকেই কথা বলতে হবে এটা কেমন আব্দার? মার্কসের নামে সংগ্রাম হলেই কি সেটা শ্রেণী সংগ্রাম হয়, নাকি যারা মার্কসের নাম শোনেনি তারা যদি আল্লার পথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে ও অকাতরে প্রাণ দেয়, গরিবের পক্ষে ধনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়– সেটাও শ্রেণীসংগ্রামের একটা রূপ। আমাদের চোখে সেটা আদর্শ নয়। কারণ আমরা পরলোকের জন্য লড়ি না, লড়ি ইহলোকের জন্য। ঠিক আছে। কিন্তু লড়াইটাতো ইহলোকেই হচ্ছে, পরলোকে নয়। তাহলে সেটা শ্রেণী সংগ্রাম নয় অস্বীকার করি কী করে? খ্রিস্টিয় চার্চ ল্যটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় নিপীড়িত মানুষ ও জনগোষ্ঠীর পাশে লড়েছে। ঐ লড়াই থেকে লিবারেশন থিওলজি নামে একটা মতাদর্শিক ধারাও গড়ে উঠেছে। সেটা কি শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে।

তাহলে প্রশ্ন হোল শ্রেণী সংগ্রাম দেশকালপাত্র ভেদে যে-ভাষা ও তৎপরতা তৈরি করে তাকে বোঝার জন্য বিপ্লবী জ্ঞান, সংস্কৃতি ও তৎপরতার প্রস্তুতি কতোটুকু? নিপীড়িত শ্রেণী বা জনগোষ্ঠী কখনো ধর্ম, কখনো ভক্তি, কখনো অহিংসা, কখনো শান্তি কিম্বা কখনো নৈরাজ্য ইত্যাদি নানান ভাষায় কথা বলে। কখনো ইসলামের ভাষায়, কখনো হিন্দু, কখনো বৌদ্ধ কখনও খ্রিস্টান ইত্যাদি নানান ধর্মের ভাষায় কথা বলে, ঠিক যেমন ধর্ম নিপীড়িত শ্রেণীর নিপীড়ণকে বৈধতা দেবার ভাষাতেও কথা কয়। ধর্ম মাত্রই নিপীড়ণমূলক এই থিসিস যে মার্কস, লেনিন বা এঙ্গেলসের নয় সেটা “মোকবিলা” নামে একট দীর্ঘ রচনায় আমি আলোচনা করেছি।

এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু আমাদের থাকা উচিত যে নিপীড়িত শ্রেণী বা জাতি মাত্রই নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নয়। নাকি শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা একটাই? যে-ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণী নিজেদের প্রকাশ করে ও পরস্পরের সঙ্গে লড়ে সেই ভাষা তাহলে আমরা বুঝব কেমন করে? নিপীড়িত শ্রেণী বা জনগোষ্ঠি যে-ভাষায় স্থানকালপাত্র ভেদে কথা বলে সেই ভাষা কি আমরা বুঝতে সক্ষম? কাজের দিক থেকে আরও গুরুতর প্রশ্ন হোল যদি নিপীড়িত শ্রেণীর ভাষা এবং নিজেদের আত্মপরিচয়বোধে বা শ্রেণীচেতনায় এতো ভেদ ও বৈচিত্র থাকে তাহলে বিপ্লবী রাজনীতির দিক থেকে তাদের রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার নীতি ও কৌশল কি হবে? নাকি কখনোই সেটা সম্ভব নয়। দুনিয়ার মজদুর এক হও কথাটা কি তাহলে হাওয়াই আওয়াজ হয়ে থাকবে?

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার উদ্দেশ্য আগে থেকেই তৈয়ারি প্রশ্ন তোলা বা ছকবাঁধা উত্তর পেশ করা নয়। প্রথাগত চিন্তাকে প্রশ্নসংকুল করে তোলা প্রথম কাজ। এই প্রেরণায় এখানে আমারও চেষ্টা হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যথাসাধ্য আন্তরিকতা এবং সাহসের সঙ্গে তোলা। অবিলম্বে উত্তর পেশ করা নয়। প্রশ্নটা কি সেটা একবার স্পষ্ট হলে উত্তর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। জ্ঞানচর্চা ও বিপ্লবী রাজনীতির এটাই তো পথ।

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্মের ভূমিকা

একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে “লা-মজহাবি”, “ফরায়জি” বা “ওয়াহাবি”-দের ইতিহাস আমরা ভুলে গিয়েছি, কিম্বা জানা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি না। তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার ইতিহাস কেচ্ছা আকারে আমাদের কানে আসে, কিন্তু ইতিহাস আকারে আসে না। আফটার অল এগুলো মুসলমানদের লড়াই এবং তা সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য।

এটাই প্রথাগত ধারণা। ঠিক তেমনি "তালেবান" নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে, বিশেষত মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব জাগে। তালেবান মাত্রই ঘৃণার যোগ্য। মধ্যযুগীয়, বর্বর ও হিংস্র। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছে সেটাই আমরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে গ্রহণ করি। জন্মসূত্রে আমরা মুসলমানের ঘরে জন্মেছি বলে অনেকে হয়তো লজ্জাও বোধ করেন। যাঁরা অতোটা হীনমন্যতায় ভোগেন না কিন্তু নিজেদের সভ্য ও আলোকিত বোধ করেন তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের জঙ্গী রূপকে, বিশেষত পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াকু রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে তাঁদের দারুণ ভয়। ইসলাম যেহেতু পশ্চিমা সভ্যতা বা সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সমার্থক নয়, অতএব পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইসলামের একটা সুশীল ব্যাখ্যাও তাঁরা খাড়া করেন। সাম্রজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা যতোই হুংকার করি না কেন, নিপীড়িত শ্রেণী নানান কায়দায় নানান রূপে সেই সংগ্রাম করে। কিন্তু তাকে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতে আমরা নারাজ। নিশ্চয়ই নিপীড়িত শ্রেণী বা জনগোষ্ঠি কার্ল মার্কস বা লেনিনকে গুরু গণ্য করতে বাধ্য নয়। তাহলে তাদের সংগ্রাম কি তাদের শ্রেণীর সংগ্রাম হবে না? নবী মুহম্মদ অনেকের লড়াকু আদর্শের নেতা হতেই পারেন। বিচারটা হবে তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য বা চরিত্রটা কেমন? জার্মানের কৃষক-যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, কী করে নিপীড়িত শ্রেণী ধর্মকে তাদের লড়াইয়ের মতাদর্শ আকারে গ্রহণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গোড়াতেও ধর্মের ভূমিকা আছে। আল্লার চোখে সকলে সমান, অতএব মানুষের মধ্যে রাজা-প্রজা বা সামন্ত ও শাসিতের ভেদ নাই– এই ধারণার উৎপত্তি প্রথমে ধর্মতত্ত্বে। চার্চের বিরুদ্ধে লুথারের লড়াই– যার ফলে রাষ্ট্র থেকে চার্চ বাহ্যিক অর্থে আলাদা হয়ে গিয়েছে– সেখানেও ধর্মই প্রেরণা । কিন্তু সেটা খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে আমরা মানতে রাজি, এমনকি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা সেটা মানতে রাজি নই। কেন এই অবস্থা তারও নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা দরকার। কেন ইসলাম বা মুসলমানদের সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্ব এবং "আধুনিক মানুষ" এমন একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে যার ফলে স্যামুয়েল হান্টিংটনের Clash of Civilisation বা সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য বলেই অনেকের কাছে মনে হয়। আসলেই। ইসলাম কি সভ্যতার শত্রু? কার সভ্যতা? আর সভ্যতা ব্যাপরটাই বা আসলে কি?

'তালেবান'-দের আমরা নিছকই মধ্যযুগীয়, বর্বর ও সভ্যতার দুষমণ বলে গণ্য করতে শিখেছি। আমরা যারা অতি প্রগতিশীল তারা জানি যে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক বাহিনী উচ্ছেদের জন্য ওসামা বিন লাদেন ও তালেবান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর বিশদ ভূমিকা আমাদের জানা। এই জানার বরাতে আমরা বলি, যেহেতু আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অতএব তাদের সৃষ্ট তালেবানদেরও বিরোধী। কিন্তু মার্কিনীদের তৈয়ারি হয়েও ওসামা বিন লাদেন ও তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছে কেন? প্রাণ দিচ্ছে কেন অকাতরে? সেই প্রশ্ন কিন্তু তুলি না। উঠলেও সেটা বিস্ময়করভাবে চেপে যাই। এই ধরনের বহু যুক্তি ও কুযুক্তি, আবেগ ও ঘৃণা, নানাবিধ হীনমন্যতা এবং দিশাহারার মধ্যেই আমরা আছি।

তালেবানরা যখন বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙল তখন তাদের অসভ্য ও বর্বর বলে সারা পৃথিবীতে রব উঠল। তখনও আহমদ ছফা জীবিত। যখন আফগানিস্তানের শিশুরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে তখন তালেবানরা মানবিক সহায়তা চেয়েছিল "সভ্য" দুনিয়ার কাছে। "সভ্য" দুনিয়া শিশুদের অনাহার, অপুষ্টি ও মৃত্যু রোধের জন্য এগিয়ে এলো না। কিন্তু বুদ্ধের মূর্তি রক্ষার জন্য কাঁড়ি

কাঁড়ি ডলার নিয়ে হাজির হোল। তালেবানরা বলল আমরা অন্তত কিছুটা অর্থ শিশুদের জন্য ব্যয় করি। "সভ্য" দুনিয়া রাজি হোল না। ওটা নাকি মৃত মূর্তির জন্য ব্যয় হবে, জীবিত শিশুদের জন্য নয়। তালেবানরা তখন মূর্তি ভেঙে দিল। চতুর্দিকে মূর্তিবাদী সভ্যতার জয়জয়কার শুরু হোল এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে বর্ষিত হোল ঘৃণা। কেউই কিন্তু ব্যাপারটা আর খতিয়ে দেখল না। "সভ্যতা"-রই জয় হোল। "অসভ্য" ও "বর্বরদের" ওপর নির্বিচারে বোমা মারা এবং নারী ও শিশুদের ধ্বংস করাসহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতো অবিশ্বাস্য ও নির্মম ঘটনা আর ঘটে নি। তালেবানদের সন্ত্রাসী ও বর্বর প্রমাণ করে অভাবনীয় মানবিক সংকট সৃষ্টির যুক্তি ও বৈধতা তৈরি করা হোল। এইভাবেই। ধীরে ধীরে। অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকি শিশুদের মৃত্যু এবং ইরাকি জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশা 'সভ্যতা'-র কলিজায় কোন দয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। এখন আমাদের চোখের সামনেই আমরা আফগান জনগণের ওপর নারকীয় বোমাবর্ষণ লক্ষ করলাম। এই হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতা। যাকে রক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধের দিকে তাকালে আমরা বুঝব ক্রমশ যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছে ও মেরুকরণও তীব্র হচ্ছে। এই যুদ্ধ, জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার ঠিকই বলেছেন ক্রুসেডের মতো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

বৌদ্ধমূর্তি ভাঙার পক্ষে তালেবানদের যুক্তি সম্পর্কে আহমদ ছফা আমাকে প্রথমে অবহিত করেন এবং 'সভ্যতা' রক্ষার জন্য তালেবানদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে বাংলাদেশে যারা বিবৃতি দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে তার স্বভাবসুলভ হাসিতামাশা করেছেন। পরে এ সম্পর্কে দুজনেই আরও খোঁজ খবর নেই এবং পশ্চিমা প্রপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত না হয়ে এই দেশের জনগণের জন্য সঠিক অবস্থান অনুসন্ধানের তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু এই কাজটি হবার আগেই ছফা চলে গেলেন। এই সম্পর্কে ছফার সঙ্গে আমি ছাড়াও আরও অনেকেরই কথা হয়েছে নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে নানান আলোচনার মধ্যে যে দিকটা প্রাসঙ্গিক আমি সেই দিকটা এখন খানিকটা তুলে অন্য প্রসঙ্গে যাব।

মূর্তি বনাম জীবন্ত শিশু

আহমদ ছফা "আধুনিক সভ্যতা"-র সমালোচক ছিলেন সত্যি, কিন্তু বিদ্যমান সভ্যতার দিগন্ত বা মূল জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি বড়ো ধরনের কোন সন্দেহ তাঁর ছিল না। আধুনিকতা বা এই যুগের অগ্রগামিতা তিনি মানতেন। "প্রগতি"-র ধারণার মধ্যেই যে একটা মুশকিল আছে এটা তিনি সম্ভবত টের পেতেন কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতা ছাড়া বিষয়টি খোলাখুলি লিখিত ভাবে মোকবিলা করেছেন বলে আমার চোখে পড়ে নি। কোন্ সভ্যতা বা জীবনযাপন পদ্ধতি "আধুনিক", "প্রগতিশীল" বা "সভ্য" আর কোন্ জীবনযাপন "মধ্যযুগীয়", "পশ্চাতপদ" বা "বর্বর"। কে, কীভাবে, কোন্ মানদণ্ড দিয়ে সেটা ঠিক করে? এই প্রশ্ন তারও ছিলো। তবুও তিনি "রেনেসাপন্থী" ছিলেন। সংস্কার ও নব জাগরণে তাঁর আস্থা ছিলো। বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ছিলো, কিন্তু সশস্ত্রতা বা রক্তপাতকে সহজে মেনে নিতে পারতেন না। বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে "আলোকিত" পথে নেবার একটা কর্তব্য রয়ে গিয়েছে, এটা মানতেন। তাদের "মধ্যযুগীয়" ধ্যানধারণা ও পশ্চাতপদতা থেকে তাদের "যুগোপযোগী" করে গড়ে তোলাটা তার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্তব্য। এই জ্ঞান তাঁর ছিল। কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও তালেবানদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই রকমই ছিল। তাঁর বরাতে এর বেশী কিছু বলার এখন দরকার নেই।

কিন্তু বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙার বিষয়টা তাঁকে "সভ্যতা" সম্পর্কে দারুন ভাবিয়েছে। তেমনি হয়তো আরও অনেককেও। মূর্তি বনাম জীবন্ত শিশু। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দুনিয়ায়

লড়াইটা কার সঙ্গে কার সেই প্রশ্নের উত্তর বিমূর্ত কায়দায় তুলতে ছফা নারাজ ছিলেন। ঝগড়াটা কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামের সঙ্গে কেন? পশ্চিমা বিশ্ব ইহুদিবাদী ইসরাইলী রাষ্ট্রকে মানতে পারে কিন্তু ফিলিস্তিনী জনগণের জন্য স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না কেন? সেটাও যদি মেনে নেওয়া যায় তবুও দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় আমরা দেখলাম গুলতি দিয়ে যে-ফিলিস্তিনী কিশোর ইসরাইলী ট্যাংকের বিরুদ্ধে লড়ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে "সন্ত্রাসী" কর্মকাণ্ড। মুসলমান কিশোর মাত্রই "সন্ত্রাসী" হয়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধে জেহাদ করবার জন্য প্রশিক্ষিত হচ্ছে। মাদ্রাসা মানেই জেহাদি মুসলমান তৈরির কারখানা। অসভ্যতা, বর্বরতা ও হিংস্রতা শেখাবার জন্যই নাকি মাদ্রাসা। আর 'আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষা'-য় শিক্ষিতরা ও পশ্চিমা সভ্যতায় বিশ্বাসীরা সুশীল। তাঁরা সন্ত্রাস করেন না। যুদ্ধ করেন না। কাউকে মারেন না। তাহলে দুনিয়ায় এই যে বোমাবাজি, বিপুল সমরাস্ত্র, মানুষ হত্যার অবিশ্বাস্য আয়োজন একমাত্র মাদ্রাসার ছাত্রদেরই জন্য ঘটেছে। নয় কি? আধুনিক শিক্ষা বা বিজ্ঞান চর্চার জন্য নয়। মুসলমানরাই পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়েছে, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণ করেছে। একমাত্র সাদ্দাম হোসেনই বায়োলজিক্যাল যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করছে। মুসলমান ছাড়া এই বদ কাজগুলো করবেটা কে?

জীবিত শিশু নাকি মৃত মূর্তি? আমাদের আলোচনার শুরুতেই এই প্রশ্নটা তুলতে চাইছি এই সভ্যতার চরিত্র সম্পর্কে তর্ক আরও খোলাসা করে তোলার জন্য। এই প্রসঙ্গে "দি ইকনমিস্ট " পত্রিকার (৩ নভেম্বর ২০০১) একটি ছবির প্রতি নজর দেবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব। একটি শিশু আরেকটি শিশুকে কাঁধে করে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে প্রাণে বাঁচবার জন্য ছুটে যাচ্ছে। এই ছবির পাশে ইকনমিস্টের ঘোষণা হোল, "এতে আমাদের প্রাণ কাঁদে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধটা খুবই দরকার (A heart-rending but necessary war)"। কথাটা পরিষ্কার। বলা হচ্ছে, আমাদের স্বার্থের জন্য আমরা এই শিশুদের হত্যা করবই। আমাদের মন খারাপ লাগবে। কিন্তু "In this war, there will be no going back" । মরুক নারী, শিশু আর সাধারণ মানুষ– কিন্তু এই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যাবে না।

এই হোল পশ্চিমা সভ্যতা। তথাকথিত "আধুনিক সভ্যতা"। ইকনমিস্ট যেমন তেমন পত্রিকা নয়। ব্যপারটিকে নিছকই একটি পত্রিকার ব্যাপার গণ্য করলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। এখানে খেয়াল করতে হবে এই কথাগুলো লিখিতভাবে বলা হচ্ছে। এই যুদ্ধ ও সহিংসতার পক্ষে এই নীতিবর্জিত ও নির্মম সিদ্ধান্ত। এই হচ্ছে "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"। ছবি ছাপিয়ে, এমনকি যে-ধরনের শিশুদের মারা হবে তাদের ছবি ছেপে দিয়ে অনায়াসে ও অকাতরে শিশুদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়েছে। হচ্ছে। বলছে ইকনমিস্ট, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অতি সামনের সারির মতাদর্শিক প্রতিনিধি। প্রধান প্রধান পশ্চিমা পত্রপত্রিকায় এই ভাবেই হত্যার কথা বলা হয়। শুধু সাদ্দাম হোসেন, মোল্লা ওমর বা ওসামা বিন লাদেন নয়– শিশু ও নিরীহ মানুষও তাদের টার্গেট। নিরীহ অবোধ শিশু মরুক কিন্তু আমাদের স্বার্থই বহাল থাকবে। অতএব যুদ্ধ মাত্রই সকলকেই আমাদের অধীনস্ত করা– এই হচ্ছে এই ধরনের কভার স্টোরির মর্মার্থ।

ক্লিন্টন প্রশাসনের সেক্রেটারি ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল ইরাকে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে পাঁচ লক্ষ ইরাকি শিশু মারা গিয়েছে, এই সম্পর্কে তাঁর মতামত কি? তিনি বললেন, "এটা শক্ত সিদ্ধান্ত"। তবে সবদিক বিবেচনা করে we think the price is worth it। 'আমরা সবকিছু বিবেচনা করে যা করেছি তার জন্য পাঁচ লাখ ইরাকি শিশুর মৃত্যু এমন কিছু নয়। ঠিকই আছে।

এটাই যখন বাস্তবতা তখন এর বিপরীতে ওসামা বিন লাদেন বা তালেবানদের কর্মকাণ্ডের

নৈতিক মূল্যায়ন রীতিমতো হাস্যকর ও তুমুল তামাশা ছাড়া কিছুই না। কে সন্ত্রাসী আর কে সন্ত্রাসী নয় সেটা বৃথা বাহাস। "সন্ত্রাস" সম্পর্কে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব ও নীতিকথাও বাজে ও ফালতু তর্ক। প্রশ্নটা আসলে অতি সহজ ও সরল। জর্জ বুশ সেটা খুব সুন্দর ভাষায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমরা এবং তোমরা। হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে অথবা তোমরা ওদের পক্ষে– অতএব আমাদের দুষমণ। সন্ত্রাসী। তোমাদের বরাতে ওদের মতোই ধ্বংস অবধারিত। আমাদের শত্রু হবার শাস্তি তোমাদের ভোগ করতেই হবে। হয় তোমরা আমাদের আধিপত্য ও অধীনস্ততা মেনে নাও– অথবা ধ্বংস হয়ে যাও। এই হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত। এখানে এসে "আধুনিক সভ্যতা"-র দিগন্ত হঠাৎ প্যান্ট এমনকি প্যান্টের তলের আন্ডারওয়ার খুলে ল্যাংটা হয়ে আমাদের সামনে ঝুলে পড়েছে। এখন আমাদের কী কর্তব্য? বৌদ্ধ মূর্তি বনাম অফগান শিশু নিয়ে আহমদ ছফার উদ্বিগ্নতাই আরও তীব্রভাবে ইকনমিস্টের ছবির মধ্য দিয়ে হাজির হয়েছে। আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার প্রথম আলোচনার জন্য আমরা যে-বিষয় স্থির করেছি তার গোড়ায় এই গুরুতর প্রশ্নগুলো রয়েছে।

ক্রুসেড, জেহাদ বা শ্রেণী সংগ্রাম শিরোনামে আমাদের আলোচনার প্রস্তাব অবিলম্বে কোন একটা শেষ, চরম বা পরম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য নয়। বরং এই কালে বিপ্লবী রাজনীতি পুনর্গঠনের জন্য জরুরী মূল প্রশ্নগুলোকে ঠিকভাবে তুলবার চেষ্টা। প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা আলোচনা শুরু করছি না। বরং এই কালে বিপ্লবী রাজনীতি পুনর্গঠনের জন্য জরুরী মূল প্রশ্নগুলোকে ঠিক ভাবে তুলবার চেষ্টা। প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা আলোচনা শুরু করছি না। বরং প্রশ্ন তুলতে পারছি কিনা সেটা পরখ করবার জন্যই আলোচনা। আমাদের আশা এই আলোচনা আমরা চালিয়ে যেতে পারব এবং বাংলাদেশে আমাদের বাস্তব কর্তব্যগুলো সম্পর্কে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণের একটা দিশা আমরা খুঁজে পাব।

পুঁজি ও শ্রেণী সংগ্রাম

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বহু জনগোষ্ঠী, ছোটবড়ো জাতি ও জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও ইতিহাস ঝাড়ে বংশে বিলকুল খতম করে কিম্বা নামেমাত্র বহাল রেখে "আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা" (সভ্যতা?) গড়ে উঠেছে। অনেকেই চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অনেকের জন্য অপেক্ষা করছে সর্বনাশী ভবিষ্যত। উপনিবেশিকরণ এবং পুঁজির স্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ফল এই "আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা"। গত কয়েক দশকে এই ব্যবস্থার গতরে নয়া কিছু উপাদান বা চেহারাসুরতে নতুন ভাবসাব খেয়াল করে অনেকে একে "বিশ্বায়ন" বা "গোলকায়ন" বলে চিহ্ন দান করছেন। কিন্তু পুঁজির খাসিলত সম্পর্কে মার্কসের একটা মৌলিক অর্থশাস্ত্রীয় বোঝাবুঝি আছে। সেখান থেকে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে দাবি করা কঠিন। ডিম ও ডিম থেকে বেরিয়ে আসা ছানা কি চরিত্র বা গুণগতভাবে আলাদা? নাকি সেটা তাদের গড়ে ওঠার দুটো ঐতিহাসিক স্তর মাত্র? কিম্বা ছানা আর তার বয়স্ক অবস্থা? ইত্যাদি। হয়তো ব্যাপারটি অনুধাবনের জন্য 'স্বভাব' ও "গুণ" নামে দুটো ধারণা আমাদের দরকার। ডিম আর মুরগির ছানার স্বভাবে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু ডিমের গুণ আর মুরগির গুণ এক নয়। কিন্তু মার্কসের কথা হোল মোরগের ডিম হলে সেটা যে মোরগই হবে তার জন্য ডিম ফুটিয়ে মোরগের গুনাগুণ বিচারের দরকার নাই। পণ্য-টাকা-পণ্য– পণ্যের এই বিচলন চক্র যখন টাকা-পুঁজি-টাকায় পরিণত হয়েছে এবং টাকা দিয়ে যখন উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তি কেনা যাচ্ছে তখনই মার্কস বলে ফেলতে পেরেছিলেন "পুঁজি বিশ্ব-ঐতিহাসিক "। তাকে ২০০১ সাল অবধি বেঁচে

থেকে পুঁজির গুণ বিচার করতে হয় নি। তবুও পুঁজিতন্ত্র নাকি দুনিয়াব্যাপী পরিব্যাপ্তি লাভের এই কালে স্বাভাবেও বদলে গিয়েছে এই রটনা আমরা শুনি। প্রমাণ কেউই সফলভাবে দাখিল করতে পেরেছে বলে দেখি নি। গুণে আর স্বভাবে গোলমাল পাকিয়ে বলা হয় যেহেতু পুঁজি আমূল বদলে গিয়েছে ফলে শ্রেণী সংগ্রাম পুরনো ব্যাপার। এখন উত্তরাধুনিকতার যুগ। যদি সত্য বলে কিছুই নির্ণয় করা না যায় তাহলে তো কোন রাজনীতিই সম্ভব নয়। কোন সত্যের ভিত্তিতে মানুষ সংগঠিত হবে? পুঁজির বিরুদ্ধে লড়বে?

ঔপনিবেশিকতার নির্মম প্রক্রিয়া, প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক জীবনযাপন ও অপরাপর পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো পুঁজি নির্মম ভাবে ধ্বংস করে নিজের পথ করে নিয়েছে। নিচ্ছে। এই ঘটনাটি যে আসলেই ঘটে এবং ঘটবার কারণ পুঁজির চরিত্রের মধ্যে নিহিত সেটা যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বেশ কিছু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণসহ কার্ল মার্কস আমাদের শিখিয়েছেন। ইতিহাসের কথা বললে এই গোড়ার কথাটাই এসে পড়ে। তার কাছে আমাদের এই ঋণখানা আজও রয়ে গেল। শোধ হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়েছে। সম্প্রতি কাতারের দোহা শহরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মোটামুটি বীরের বেশেই প্রবেশ করেছে। “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে” আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনকে চীন সমর্থন করেছে। এতে মার্কসের প্রতি আমাদের ঋণ আরও বাড়ে। কারণ কেন সেটা ঘটে তার ভেতরের কেচ্ছা আমরা পুঁজির অর্থশাস্ত্র থেকে বেশ খানিকটা মালুম করতে পারি।

সারা দুনিয়াকে পুঁজি তার লজিক, তার গতিপ্রক্রিয়া বা তার অপ্রতিরোধ্য শাসন ও শোষণের অধীনস্ত করবে। এটাই নিজের শক্তির বাইরে অন্য শক্তির কাছে মানুষের শেষ দাসত্ব। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাস একদিন এই দাসত্ব থেকে নিজেই মুক্তি লাভ করবে– এই প্রতিশ্রুতি আমরা মার্কসের কাছ থেকে পেয়েছি। সেটা আপনা আপনি বা আপসে আপ ঘটবে এই কথা মার্কস বলেন নি। পুঁজির প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ এবং কাজে কাজেই শ্রেণীসংগ্রামের কথাটা সেই কারণে এসে যায়। মানুষ তো নিছকই বস্তু বা প্রকৃতিমাত্র নয়। পুঁজির ইতিহাস যদি প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা হয় সেখানে ছন্দপতনের, অর্থাৎ পুঁজির বিনাশ এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস থেকে সত্যিকারের মানুষের ইতিহাসে গুণগত উল্লম্ফনের সম্ভাবনা শ্রেণীসংগ্রামের মধেই নিহিত। শ্রেণীসংগ্রামের কথাটা রাজনৈতিক ভাবে আমরা বিস্তর শুনেছি, কিন্তু তার জ্ঞানগত বা দার্শনিক দিগন্তে ওড়াউড়ির বরাত আমাদের খুব একটা হয় নি। বাইরের আর মনের দাসহাল থেকে মুক্তির জন্য নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা রক্তাক্ত সংগ্রাম চালাতে হয়। সেখানে আমরা সকলে পাশ করতে পারি না, পাখা গজায় না।

মার্কস এবং শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে শুরতেই এই কথাটুকুন না বললেও সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ এবং সেই ছুতায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ভয়াবহ যুদ্ধ সম্পর্কে এই নিবন্ধের ভাবনা ও উচ্চারণের পেছনে মার্কসের প্ররোচণা আছে, সেটা পাঠক হয়তো নিজেই বুঝতেন। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস কিম্বা দিনানুদিনের ঘটনা পরম্পরা বুঝবার জন্য অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণীর পরিগঠন (class-in-itself) এবং কাজে কাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক তৎপরতা বা ভূমিকা (Class-for-itself) বা ভূমিকার সম্ভাবনা সম্পর্কে মার্কসের বয়ান মনে রেখে দেখা যেতে পারে কতোটা তা খাটে। তদুপরি সেই আলোকে নিজের কর্মপরিকল্পনা নির্ণয় কিম্বা রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ ও তা আমল করার জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের পদ্ধতিগত প্রয়াসও প্রয়োজনে এখন আমাদের কাজে লাগবে।

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা দুনিয়াব্যাপী একটা সংগ্রাম চলছে। বিশ্ব বাণিজ্য

সংস্থার বিরুদ্ধে সিয়াটলের বিক্ষোভ এবং বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং ধনী দেশগুলোর জোটের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক নানান কিসিমের লড়াই দেখতে দেখতে হঠাৎ নিউ ইয়র্কের ঘটনা ঘটল। বিশ্বব্যবস্থার দুই প্রধান প্রতীক নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের ওপর হামলা হোল। যে ইমারত বা স্থানগুলোর ওপর হামলা হয়েছে তাদের প্রতীকী তাৎপর্য আছে। হামলার লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্য দিয়েই একটা প্রতীকী ভাষ্য তৈরি হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এই লড়াই। এটা কোন ধর্মযুদ্ধ নয়। সংগ্রামের শ্রেণী চরিত্রও ওর মধ্য দিয়ে যথেষ্ট পরিষ্কার। এই লড়াইয়ে নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে অবশ্যই। ওকে কেন্দ্র করে বিস্তর নীতিকথা ও "সন্ত্রাস" সম্পর্কে নানাবিধ তত্ত্ব এবং সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক চলছে। এই ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিতর্ক নিছকই নীতিবাগীশতায় পর্যবসিত হচ্ছে। নীতিবাগীশতারও শ্রেণীভিত্তি নিয়ে কোন আলোচনা আমার চোখে পড়ে নি।

এখনকার বিশ্বব্যবস্থায় যাদের জন্য করুণ ও রক্তাক্ত বিলয় অপেক্ষা করছে বা যারা আমাদের চোখের সামনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তারা তাদের পরিণতির খবর একদমই টের পায় নি এমন নয়। অতীতের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী ও জাতিসমূহের করুণ ও নির্মম পরিণতির ইতিহাস দেখে হয়তো তারা নিজেদের নিয়তির আগাম খবর পেয়ে গিয়েছেন। ভুক্তভোগী জাতি, জনগোষ্ঠী বা নিপীড়িত শ্রেণীগুলো তাদের নিজেদের জীবন থেকেই টের পায়। যদি তাই হয় তাহলে কি এই সর্বনাশ, এই বিলয় এই ধ্বংস বিলীয়মান জনগোষ্ঠী বা জাতিগুলো নিয়তি জ্ঞান করে মেনে নেয়? নিশ্চয়ই নয়। ব্যাপারটি কি প্রতিবাদ, বিদ্রোহ বা রক্তাক্ত প্রতিরোধ ছাড়া শেষ হয়? নিশ্চিয়ই না। তাহলে ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর বা তালেবানরা নিশ্চয়ই খামাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণা করে নি। তারা একটা জীবনযাপন পদ্ধতিও রক্ষা করতে চায়। "আধুনিকতা"-র নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচারের মানদণ্ডে তালেবানদের চিন্তা, আদর্শ, জীবনচর্চা ইত্যাদি একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। সেটা "মৌলবাদী" বলে নিন্দিত ও ঘৃণিত। ঠিক আছে। কিন্তু এই ধরনের আদর্শ ও জীবনযাপন পদ্ধতি মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মে ও অন্যান্য সংস্কৃতিতেও তো ভূরি ভূরি আছে। এই জায়নিজম বা ইহুদিবাদ তো "আধুনিক সভ্যতা" বা সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে নিন্দিত বা ঘৃণিত নয়। ইসরাইলকে ধ্বংস করা দূরের কথা, তাকে রক্ষা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার অঙ্গীকার। কিন্তু কেন ওসামা বিন লাদেনকে মরতেই হবে? কেন আফগানিস্তানে তালেবানী শাসন ধ্বংস করতে হবে? কেন একটি গরিব ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে বৃষ্টির মতো বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিতে হবে? কেন? আসলে সেটাই তো মূল প্রশ্ন।

আইরিশ রেভিউলিশনারি আর্মিও পশ্চিমা মানদণ্ড অনুযায়ী সন্ত্রাসী হবার কথা। কিন্তু যেসকল সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড খাড়া করেছে সেখানে আইআরএ- এর নাম নাই। ইংল্যন্ডের বিরুদ্ধে আইআরএ-র সন্ত্রাসী বোমা হামলা ও রক্তপাতের ঘটনা বহু। বহু নিরীহ মানুষ সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছে। কই টনি ব্লেয়ার বা তার আগের কোন প্রধানমন্ত্রী আয়ারল্যান্ডকে বোমা মেরে গুড়িয়ে দেবার কথা তো বলেন নি? তাহলে আফগানিস্তান কেন?

এটা কি আসলেই ক্রুসেড?

জর্জ বুশ প্রথমেই বলেছিলেন ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়িদার ইসলামী সন্ত্রাস বা জেহাদের

বিরুদ্ধে এটা "ক্রুসেড"। নিজের কথা নিজে গিলে খেতে তার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যারা ক্রুসেডের ভয়াবহতা ও হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে জানেন তারা প্রমাদ গুনেছিলেন। পোপ জন পলও এতে বিব্রত হয়েছিলেন তার নীতি নির্ধারকরা তাকে বলেছিলেন বিশ্বের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং মুসলমান দেশগুলোর ওপর এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে "গ্লোবাল কোয়ালিশন" করার পরিকল্পনা তিনি হাতে নিয়েছেন, সেটাও কাজ করবে না। কিন্তু কথাটা বলে জর্জ বুশ ভাল করেছেন। তার দিক থেকে যুদ্ধের চরিত্রটা কেমন এবং তার "নতুন বিশ্বযুদ্ধ" সম্পর্কে ধারণাটা কি সেটা আমরা বুঝতে পারলাম।

অনেকের ধারণা রাষ্ট্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞতা এবং মাথায় মগজের চেয়ে মাংশের পরিমাণ বেশী বলে জর্জ বুশ মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছেন। এই যুক্তি মানা যেতো যদি ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু "ক্রুসেড" সংক্রান্ত ধারণাটাই আবার নতুন ভাবে তিনি হাজির করলেন Infinite Justice বা "অনন্ত ন্যায়বিচার"-এর জন্য যুদ্ধের কথা কয়ে। ঈশ্বরই অনন্ত ন্যায়বিচার করেন, মানুষ নয়। তাহলে তিনি ঈশ্বর নির্ধারিত বা প্রদত্ত বিচারই ইহলোকে ইশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে সন্ত্রাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাস্তবায়ন করছেন। এটা ক্রুসেড ছাড়া আর কি? সেখানেই তিনি আবার ধরা পড়ে গেলেন। তারপর তার যুদ্ধের নাম বদলিয়ে রাখা হোল অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম।

টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন হামলার পেছনে ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়িদাকে নিছকই সন্দেহ করে "বিশ্বযুদ্ধ" শুরু করে দেবার নজির "সভ্য" জগতে নাই। শুরু থেকেই ওসামা এই হামলার সঙ্গে জড়িত নন বলে দাবী করেছেন। তার সম্পৃক্তির কোন প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজও দাখিল করতে পারে নি। পরবর্তীতে এনথ্রাক্স বা বায়োলজিক্যাল যুদ্ধাস্ত্রের হামলা যখন শুরু হোল, দেখা গেল তার উৎপত্তি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রথমত এনথ্রাক্স হামলার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেন জড়িত বলে এই যুদ্ধ সম্প্রসারিত করার প্রয়াস চালিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু তার পরিণতি মন্দ হতে পারে বলে প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি করে নি।

ওসামা বিন লাদেন কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নন, এমনকি তিনি আফগান নাগরিকও নন। যদি এই হামলা ওসামা করেও থাকে তাহলে তা বড়োজোর একজন ব্যক্তি বা সংগঠনের ক্রিমিন্যাল এক্ট হতে পারে। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরেকটি রাষ্ট্রের যুদ্ধ হতে পারে না। সেটা Crime Against Humanity বা "মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ" হতে পারে। জাতিসংঘ সনদের ৫১ নম্বর চার্টার অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরেকটি রাষ্ট্রের যুদ্ধ হতে পারে না। তাহলে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ঘটনার কারণে একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোন আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পড়ে? তাও এমন এক রাষ্ট্র ও এমনই জনগোষ্ঠী যারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধে বিধ্বস্ত। সবচেয়ে প্রহসন হোল এমনই রাষ্ট্র যারা এই কিছুদিন আগেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে লড়েছে এবং জান দিয়েছে। আফগানিস্তানে নির্বিচারে বোমাবর্ষণের যে-নৃশংসতা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি দেখিয়েছে তার কোন নজির নেই।

একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিজেকে আত্মরক্ষার বৈধতা ৫১ অনুচ্ছেদ দেয়। কিন্তু জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখেই জাতিসংঘের ৫১ সনদ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই বৈধতা দিয়েছে। এরই অনুসরণে একই দিনে নর্থ আটল্যান্টিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ধরনের "সন্ত্রাসী" হামলা ন্যাটো ওয়াশিংটন চুক্তির ৫ নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এটা ব্যক্তি বা কোন সংগঠনের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। এটা একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অতএব নিজের প্রতিরক্ষার জন্য এর পাল্টা যে-কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। এই প্রথম উত্তর

আটল্যান্টিক আঁতাতের ইতিহাসে পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করবার তড়িঘড়ি উদ্যোগ আমরা লক্ষ করলাম।

পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করবার মধ্য দিয়ে ন্যাটো তাদের "Principle of collective defence"-কে সক্রিয় করল। এর অর্থ কি এই যে ইসলামী হামলার বিরুদ্ধে খ্রিস্টিয় দেশগুলোকে যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ করা? পাঁচ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী যদি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সদস্যভুক্ত এক বা একাধিক দেশের ওপর সামরিক হামলা হয় তাহলে সেটা সকল দেশের বিরুদ্ধে হামলা হিশাবে বিবেচিত হবে এবং সকলে মিলে তার পাল্টা সামরিক ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একজন "সন্ত্রাসী"-র বিচ্ছিন্ন হামলার অভিযোগে জাতিসংঘের আর্টিকেল ৫১ ব্যবহার করার ব্যাপরটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এভাবেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার অবাধ ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেলো। এর পাল্টা পদক্ষেপ হতে পারেতো জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার মেরি রবিনসনের প্রস্তাব। সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মেরি রবিনসন যে কথাগুলো বলেছিলেন সেটা হোল, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের ঘটনা কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়। এটা "মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ"। তার বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে হতে পারে। প্রয়োজনে "সন্ত্রাসী" অপরাধের জন্য একটি বিশেষ আদালতও গঠন করা যেতে পারে। কিন্তু তার কথা বাতাসে মিলিয়ে গেল। এই ধরনের অপরাধ বিচারের জন্য একটি International Criminal Court গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। তবে সেটা গঠিত হবে ২০০১ বা ২০০৩ সালে। সেই আদালতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার বিচার করা যাবে না। আদালত গঠিত হবার পরে এই ধরনের ঘটনা বিচার হতে পারে।

জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ার ও খ্রিস্টিয় জগতের অধিপতি শক্তির দিক থেকে আসলেই তাহলে এটা ক্রুসেড। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ। ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম বা পরবর্তী ক্রুসেডের সঙ্গে এখনকার ক্রুসেডের অমিল নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মিল কম নাই। আরবে ইসলাম আবির্ভাবের অতি অল্প সময়ের মধ্যে হযরত ঈসা যে ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ ও বসবাস করেছিলেন সেটা মুসলমানদের দখলে চলে আসে। সেটা ঘটে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ক্রুসেডের যোদ্ধারা তাদের "পবিত্র ভূমি" মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যায়। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের "পবিত্র ভূমি" জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকার থেকে উদ্ধার করবার জন্য দ্বিতীয় পোপ আরবান যে War of the Cross বা ক্রুসেডের ডাক দেন তারই প্রতিধ্বনি যেন এই যুগেও শোনা যাচ্ছে। খিস্টান ধর্মযোদ্ধারা দ্বিতীয় ক্রুসেডে জেরুজালেম দখল করে নেয়। ক্রুসেডে শুধু সৈনিক নয়, নারী পুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই হত্যাযজ্ঞের নিষ্ঠুর ইতিহাস স্মরণ করেই পোপ জন পল জর্জ বুশের ক্রুসেডের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। সেই কালে ক্রুসেডের নেতা ছিলেন পোপ স্বয়ং। এই কালে তার সর্দার হচ্ছে জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ার।

আদি ক্রুসেড আর ২০০১ সালের ক্রুসেডের মধ্যে পার্থক্য কি? তখনও যুদ্ধটা ছিল জমি দখল নিয়ে। এখনও মামলা ভূখণ্ড নিয়েই। আদি ক্রুসেডে জমি ছাড়া প্রকাশ্য কোন দাহ্য পদার্থ ছিল না। যীশুর জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের পেছনে কিম্বা মুসলমানদের জেরুজালেম দখল করে রাখার পেছনে আত্মার দাহ্যিক ভূমিকা থাকতে পারে। দুই হাজার এক সালের ক্রুসেডকে শুধু জমি দিয়ে বোঝা যাবে না। ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা এবং তার পেছনে খ্রিস্টিয় বিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থনের মধ্য দিয়ে এক প্রকার হাসিলই হয়েছে বলা যায়। এবারের ক্রুসেডের দাহ্য পদার্থ আসলে তেল এবং গ্যাস। প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতায় ভূখণ্ড বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনের

অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করবার লড়াইয়ের বৈষয়িক ও আত্মিক কারণ পুরো মাত্রায় বর্তমান ছিল।

ক্রুসেড বা জেহাদকে ধর্মযুদ্ধ জ্ঞান করে তার বিচার বা বিশ্লেষণ ওখানেই সমাপ্ত করে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। মার্কসীয় বিচার জেহাদ বা ক্রুসেডের বাহ্যিক রূপ দেখে সন্তুষ্ট নয়। সেটা ধর্মযুদ্ধ ঠিকই কিন্তু অভ্যন্তরের বৈষয়িক কারণটা অনুসন্ধান করা জরুরী। যে-বিশ্বাসে বা যে-মতাদর্শের ভিত্তিতে ধর্ম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার সঙ্গে মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি সেই যুদ্ধের বৈষয়িক কারণ গুলিয়ে ফেলে না। যুদ্ধের মতাদর্শ এক জিনিস আর তার অন্তর্লীন কারণ অন্য কথা।

প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা এখনকার আধুনিক বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা হয়ে উঠলেও পুরনো ক্রুসেডের সঙ্গে এখনকার ক্রুসেডের এক বিস্ময়কর মিল আছে। পুরনো ক্রুসেডের সময় হজরত ঈসার জন্মস্থান ও জেরুজালেম ছিল মুসলমানদের দখলে। প্রবল ধর্মের সেই যুগে এটাই ছিল সর্বোচ্চ সম্পদ, যার জন্য জান দিতে দুই পক্ষই প্রস্তুত ছিল। বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি। তেল ও গ্যাস। যাকে আমরা বিশ্বসভ্যতা বলি তার বৈষয়িক ভিত্তির মূল উপাদান তেল এবং গ্যাস। এই তেল ও গ্যাসের নিশ্চয়তা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না।

কিন্তু ইতিহাসের প্রহসন এই যে হজরত ঈসার জন্মস্থান বা পবিত্র ভূমি যেমন তখন মুসলমানদের দখলে ছিল, ঠিক তেমনি তেল গ্যাস কী এক অজ্ঞাত কারণে মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তূর্কমেনিস্তান ইত্যাদি ইসলাম প্রধান দেশগুলোর দখলে। ক্রুসেডের পুরনো আধ্যাত্মিক স্বার্থের জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে তেলের স্বার্থ। তেলই বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার ঈশ্বর। অতএব এই ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য। যেহেতু এই তেল প্রধানত ইসলাম প্রধান দেশগুলোতেই বেশিরভাগ মজুদ, অতএব যুদ্ধটার রূপ ধর্মযুদ্ধের আকার পরিগ্রহণ করছে। আরও করবে। এটাই স্বাভাবিক। স্যামুয়েল হান্টিংটন তার “সভ্যতার সংঘর্ষ” নামক থিসিসে খুব একটা ভুল করেন নি। তেলই যেহেতু বর্তমান বিশ্বসভ্যতার প্রাণ অতএব তার “সভ্যতার সংঘর্ষ” কথাটিকে পাঠ করতে হবে তেলের সংঘর্ষ হিশাবে। এই তেল আছে ইসলাম প্রধান দেশগুলোতে। কিন্তু খ্রিস্টান প্রধান শিল্পসভ্যতা এই তেল ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তেল শিল্পসভ্যতার অতিশয় আবশ্যিক, অতএব পরম পবিত্র জিনিস। সেই কারণে যুদ্ধের রূপটা আমরা চাই বা না চাই ধর্মযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহণ করতে বাধ্য। সেই কারণে জর্জ বুশের ক্রুসেডের ডাক কিম্বা ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের জেহাদ পবিত্র তেলের লড়াই ছাড়া আর কি? ক্রুসেড ও জিহাদ দুটোই তৈলাক্ত।

মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৯৬ সালে যখন তালিবানরা সরকার গঠন করলো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানদের সম্পর্ক বেশ ভালো। তালিবান নেতারা টেক্সাসের হিউসটনে তেল কোম্পানি ইউনোকেল (Unocal)-এর কর্মকর্তাদের সাথে চা-নাস্তা খেতে গিয়েছিল। কোম্পানির তেল এবং গ্যাস উত্তোলন থেকে মুনাফার একটা বড় অংশ তালিবানদের দেওয়া হবে বলে তাদের লোভ দেখানো হয়। কোম্পানি চেয়েছিল তেল এবং গ্যাসের জন্যে সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আফগানিস্তান হয়ে একটি পাইপলাইন বসাতে। একজন মার্কিন কূটনীতিক এই কথা বলতেও দ্বিধা করেন নি যে আফগানিস্তান একটি আমেরিকার তেল কলোনি হয়ে উঠবে, সেখানে পশ্চিমা দেশ থেকে আসা বিরাট অংকের মুনাফা থাকবে, কিন্তু কোন গণতন্ত্র থাকবে না। নারীদের কোন আইনগত অধিকার না থাকলেও অসুবিধা নেই।

খবর হোল চুক্তিটি হয় নি। এখন এই তেলের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করা বুশ

প্রশাসনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বুশের গোপন ইচ্ছা হচ্ছে কাসপিয়ান বেসিনের (Caspian basin) মাটির নীচের সর্ববৃহৎ তেল এবং গ্যাসের মওজুদের সন্ধান করা। যে তথ্য আমাদের পরিষ্কার খেয়াল রাখা দরকার সেটা হোল এই তেল ও গ্যাস পেলে আমেরিকার আরও একটি জেনারেশন অনায়াসে চলতে পারবে। জীবাশ্ম ভিত্তিক সভ্যতার আয়ু আরও দীর্ঘকাল বাড়বে।

কিন্তু যদি এটা পেতে হয় তাহলে পাইপলাইনগুলো আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তালেবানরা বাধা হয়ে উঠলো। এখন তেল ও গ্যাস পেতে হলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতেই হবে। মার্কিনীরা আফগানিস্তানে একটু মডারেট বা মাঝারি ধরনের তালিবান সরকার চায়, তারা যেন আফগানিস্তানে একটি ঢিলেঢালা ফেডারেশন চালাতে পারে। তাই জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের "সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ" নিছকই একটা ভূয়া কথা। নেহায়েতই লোক দেখানো।

"বিন লাদেন: যে সত্য নিষিদ্ধ"

তেল ও গ্যাসের ব্যাপারটা আরও প্রমাণপত্রাদিসহ হাজির করা যাক। "বিন লাদেন: যে সত্য নিষিদ্ধ" *(Bin Laden, Le Verite Interdite)* নামে একটি বই সম্প্রতি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন জাঁ শার্ল ব্রিসকা (Jean-Charles Briscard) এবং গিওম দাসকি (Guillaume Dasqui)। সেই বইয়ের মূল কথা হোল, "সন্ত্রাসী তালেবান বা আল কায়িদা নেটওয়ার্ক ধ্বংসের যে চোটপাট আমরা বুশ-ব্লেয়ার চক্রের মুখে শুনছি সেটা ভূয়া। লড়াইটা আসলেই তেল-গ্যাসের জন্য। কথাটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য নতুন নয়। কিন্তু এই দুজনেই পৃথিবীর বিখ্যাত "intelligence analyst" অর্থাৎ গোপন গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষক। বইটি বেরুবার পর অনেকেই দাবি করছেন বিপুল তথ্যে সমৃদ্ধ এই বই বুশ আর ব্লেয়ারকে বিপদেই ফেলবে এবং তাদের dirty Afghan War বা নোংরা আফগান যুদ্ধের গোমর ফাঁস করে দেবে।

নব্বই দশকের শেষের দিক অবধি ব্রিসকা ছিলেন ভিভেনদি (Vivendi) নামে একটি ফরাসি কোম্পানির অর্থনৈতিক বিশ্লেষক। ব্রিসকা ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার (DST) জন্যও কাজ করেছেন এবং ১৯৯৭ সালে ফরাসি গোয়েন্দাদের জন্য বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল কায়িদা নেটওয়ার্কের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন। দাসকি একজন গোয়েন্দা বিষয়ক সাংবাদিক এবং Intelligence Online নামে একটি পত্রিকা বের করেন।

এগারোই সেপ্টেম্বরের আগে তালেবানদের সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সদয়, এমনকি দোস্তির। তালেবানদের দেখা হোত, "মধ্য এশিয়ার স্থিতিশীলতার উৎস হিশাবে যারা মধ্য এশিয়া ভেদ করে তেলের পাইপ লাইন নির্মাণ করার জন্য জরুরী। ...তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কাজিকিস্তানের সমৃদ্ধ তেল ক্ষেত্রগুলো থেকে তেল টেনে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে ভারত মাহাসাগর অবধি পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়ার" জন্য তালেবানদের ওপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর করছিলো। কিন্তু তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তেল কোম্পানির লুটপাটের প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। সেখানেই গোলমাল দেখা দিল।

কাসপিয়ান সাগর অঞ্চলের ভূগোলে বা দেশগুলোতে (আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানে) যে তেলের রিজার্ভ আছে তার পরিমাণ কম পক্ষে দুইশ বিলিয়ন ব্যারেল। পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেলের পরিমাণের তুলনায় এটা হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ। এই বিপুল তেল সম্পদ লুটের জন্যই আজ আফগানিস্তানের যুদ্ধ।

এই তথ্যগুলো যার বরাতে বলা হয়েছে তার নাম ও নীল (O Neill)। ইনি একজন

আইরিশ আমেরিকান। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তেল কোম্পনিগুলো তালেবানদের কাছ থেকে আপোসে তেল পেয়ে যেতো তাহলে তেলের বিশাল বিকল্প উৎসের ওপর তাদের একচেটিয়া দখল কায়েম হয়ে যেতো। ব্রিসকা ও দাসকি বলছেন, "রাশিয়া মধ্য এশিয়ার এই তেল ও গ্যাস খবরদারি করত। বুশ সরকার সেটা বদলে দিতে চেয়েছেন এবং বদলাতে গিয়েই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া।"

নভেম্বর ১৯ তারিখের *Irish Times*-এর একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, ও নীল ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বোমার ঘটনা, ১৯৯৬ সালের সৌদি আরবের মার্কিন ঘাঁটির হামলা, ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দার-এস-সালামে মার্কিন দূতাবাসের আক্রমণ এবং ২০০০ সালে ইএসএস কোলের ঘটনা তদন্ত করেছেন। এই তদন্ত করার কাজ করতে গিয়েই তার মনে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে "সন্ত্রাস" সংক্রান্ত কোন তদন্তে মোটেও উৎসাহী নয়। বরং তদন্তে তাকে পদে পদে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিরক্ত হয়ে তিনি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে নিরাপত্তা প্রধান হিশাবে নতুন চাকুরি গ্রহণ করেন। এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ও নীলও মারা যান। ব্রিসকা ও দাসকি ও নীলের সঙ্গে যে-সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রেখেছিলেন তার মূল্য অতএব অপরিসীম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষির এক পর্যায়ে মার্কিন প্রশাসন তালেবানদের বলেছে, "হয় আমাদের সোনার কার্পেটে তোমাদের মুড়ে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ কর অথবা অবিরাম বোমা বর্ষণের কার্পেট বিছিয়ে আমরা তোমাদের কবর রচনা করব"। এই লেখা যখন লিখছি তখন নর্দার্ন এলায়েন্স, আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাজা জহির শাহ এবং তালেবান পন্থী নয় এমন পশতুন নেতাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের তালেবান-উত্তর সরকার গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। প্রহসন হোল এই শহরেই তালেবানদের সঙ্গেও দর কষাকষি হয়েছিলো।

বইটির তথ্যানুসারে বুশ প্রশাসন তালেবানদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করে ২০০১ সালের শুরুর দিকে। ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদেও কথাবার্তা হয়। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে এশিয়া বিভাগের দেখাশোনা করেন ক্রিস্টিনা রকা (Christina Rocca)। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের ঘটনার আগে ক্রিস্টিনা পাকিস্তানে তালেবান রাষ্ট্রদূত আব্দুল সালাম জায়িফের সঙ্গে অগাস্টের দুই তারিখে কথা বলেন। জেনে রাখা ভাল যে ক্রিস্টিনা রকা হচ্ছেন এককালে আফগানিস্তানে "মৌলবাদী" গেরিলাদের পক্ষে কাজ করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি অভিজ্ঞ প্রশাসনিক ব্যক্তি। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র অধীনে "মৌলবাদী" ইসলামী গোষ্ঠীকে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করার দায়িত্বে ছিলেন। বিশেষত আফগান মুজাহেদিনদের স্টিংগার মিসাইল হস্তান্তরের দায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন। তার মাধ্যমে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুজাহেদিনরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়ছে।

ব্রিসকা এবং দাসকির তথ্য থেকে এটাও জানা যায় যে তালেবানদের অতি গোঁড়া বা অতিশয় "মৌলবাদী" বলে যে ধারণা তৈরি হয়েছে সেটাও পুরোপুরি সত্য নয়। সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল থাকার সময় এই সত্য নানা ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। তালেবানরা পশ্চিমা বিশ্বে তাদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন করার জন্যও সচেষ্ট ছিলো। তারা লায়লা হেলমস (Laila Helms) নামে একজন বিশেষজ্ঞকে এই কাজের জন্য নিয়োগ দেয়। লায়লা হেলমসের আবার আরেকটি পরিচয়ও ছিলো। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কী করে কাজ করে তিনি সেই বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার কাজ ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তালেবানদের স্বীকৃতি আদায় করা। লায়লার চাচা হলেন রিচার্ড হেলমস (Richard Helms) ইনি হলেন সিআইএ-র প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং তেহরানের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

কী করে কাজ করে তার খবরাখবর লায়লা তার চাচার মাধ্যমেই জানতেন।

ও নীল দাবি করেছেন যে ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়িদা নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সকল তথ্যই সৌদি আরবের কাছে পাওয়া যাবে। কিন্তু সৌদি রাজপরিবারকে বিব্রত করতে যুক্তরাষ্ট্র রাজি নয়। দাহরানে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে বোমা হামলায় ১৯ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হবার তদন্ত করতে গিয়ে এফবিআই অভিযুক্ত সন্দেহভাজনদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এই বিষয়ে কোন হৈচৈ করতে রাজি হয় নি। সৌদি সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য সন্দেহভাজনদের নিজেরাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। ও নীল তার তদন্ত টিম নিয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন কিন্তু নভেম্বরের ১৯ তারিখে প্রকাশিত *Irish Times*-এর তথ্য অনুযায়ী তাদের ভূমিকা বোমা হামলার জায়গা থেকে কিছু জিনিসপত্র কুড়িয়ে আনার অধিক কোন কাজের সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন করে দেয় নি।

ইরান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরাবিয়া, আরব আমীরাত ও উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো সবসময়ই তেলের অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে পাক খাচ্ছে। প্রথমে ইংরেজ এই অঞ্চলের তেলের ওপর দখলদারি কায়েমের জন্য লড়েছে। তরপর হামলা করেছে ফরাসী-রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তেলের থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়েছে। জীবাশ্মভিত্তিক শিল্পসভ্যতা ততোদিনে যে-অবস্থায় পৌঁছেছে তার কারণে তেল সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং তেলের উৎসের নিরাপত্তা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এবং সৌদি বাদশা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ ১৯৪৫ সালের মার্চে একটি গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে দীর্ঘকালীন সামরিক-ভৌগলিক কৌশলগত মৈত্রীর দাসখৎ বলা যায়। জর্জ বুশের অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম সম্পর্কে এমনকি তেল সম্পদ বিশেষজ্ঞদের অভিমত হোল, এর দুটো লক্ষ্য। এক নম্বরে "সন্ত্রাসী"-দের পাকড়াও করা, সেটাই ফলাও করে বলা হয়। দুই নম্বরে পারস্য উপসাগর ও কাসপিয়ান সাগর সন্নিহিত ভূগোল তেল ও গ্যাসের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারিত্ব পাকাপোক্ত করা। প্রথম কথাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতোই জোড় গলায় মুখ্য ব্যাপার বলে হৈহল্লা করুক, দুই নম্বর লক্ষ্যটার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। এই কথা নোয়াম চমস্কি বা এডওয়ার্ড সায়িদের মতো বাম ঘেঁষা মানুষদের নয়। বলছেন আমহার্স্ট শহরের হ্যাম্পশায়ার কলেজের প্রফেসর মাইকেল টি ক্লেয়ার (Michael T Clare)-এর মতো তেল বিশেষজ্ঞ, যিনি Resources Wars: The New landscape of Global Conflict নামক বই লিখে বিখ্যাত।

বুশ প্রশাসনের বহু কর্মকর্তাই তেল কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। গত বছর পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ছিলেন হেলিবার্টন (Halliburton) নামে কোম্পনির প্রেসিডেন্ট। এই কোম্পানি তেল কোম্পানিগুলোর জন্য কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলেজা রাইস (Condoleezza Rice) ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শেভরন (Chevron) তেল কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। বাণিজ্য সেক্রেটারি ডোনাল্ড ইভানস (Donald Evans) এবং স্টানলি আবরাহাম (Stanley Abraham) টম ব্রাউন (Tom Brown) নামে আরেকটি তেল কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন।

তাহলে অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম তালিবান ও আল কায়িদাকে ধ্বংস করতে চায় কেন?

এক: মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর প্রকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য যেসব ইসলামপন্থী দলগুলো লড়ছে তাদের "মৌলবাদী" বলে বর্বর ও অসভ্য প্রমাণ করা ও তাদের ধ্বংস করে মার্কিন দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দুই: বিন লাদেন ও তালেবানরা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বাধা এবং মাতাদর্শিক ভাবেও বিপজ্জনক হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং এই ধরনের প্রতিটি সামরিক সংগঠনকে উচিৎ শিক্ষা দান করা।

তিন: মধ্য এশিয়ায় মার্কিন তাবেদার সরকার উৎখাত করে জঙ্গী ইসলামপন্থী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সরকার কায়েমের সম্ভাবনা নস্যাৎ করা।

লক্ষ করার বিষয় যে যুদ্ধ শুরুর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরগিজস্তানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বুশের চেয়ে ব্লেয়ার কোন অংশে কম নয়। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি নিরপরাধ মানুষ হত্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যারা ক্লাস্টার বোমা মেরে বলে ভুল হয়েছে এটা তাদের ভাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। হত্যা মানে হত্যা। এটা একটি প্লেন নিয়ে একটি বিল্ডিং-এর ওপর ধাক্কা মারলে যেমন অপরাধ তেমনি হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস কিংবা লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিটে বসে হুকুম দিলেও একই ধরনের অপরাধ হয়। যদি ব্লেয়ার আসলেই সন্ত্রাসের বিরোধিতা করতে চান তাহলে তাকে প্রথমেই অস্ত্র ব্যবসা থেকে সরে আসতে হবে। ব্লেয়ার যদি আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হন তাহলে তাকে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ থেকে সরে আসতে হবে।

ওসামা বিন লাদেনের দুর্ভাগ্য হোল তিনি ধনী এবং সৌদি। সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে লড়ে দেশে ফিরে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন তার নিজের দেশটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে রেখেছে। সেটাও তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করবার জন্য। ফলে তার বন্দুকের নল ঘুরে গেল। কিন্তু সৌদি হবার কারণে ওসামা হয়ে উঠলেন রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। কারণ সৌদি আরবে ও মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত তার অনুসারীর সংখ্যা বেড়েই চলল। তার কারণে সৌদি আরবের রাজতন্ত্রের যদি পতন ঘটে তবে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সভ্যতার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মধ্য প্রাচ্যে ক্ষমতার সমীকরণে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। অতএব ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত ধরতেই হবে। এখন প্রচার করা হচ্ছে তিনি নাকি বলে গিয়েছেন যে তিনি শত্রুর হাতে ধরা দেবেন না। তার দেহরক্ষীরাই যেন তাকে ধরা পড়বার আগে মেরে ফেলে। অর্থাৎ নিজেদের হাতে ওসামা বিন লাদেনকে মারবার দায়দায়িত্ব পশ্চিমা দেশগুলো নিতে চাইছে না। তাকে গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটাও হবে বিপজ্জনক। এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ওসামা বিন লাদেন আদৌ যুক্ত ছিলেন তার কোন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না। ওসামা নিজেও তা অস্বীকার করেছেন।

ক্রুসেড ও জেহাদ

তেল ও গ্যাসের যুদ্ধটাই ধর্ম যুদ্ধের রূপ নিচ্ছে এবং আসলেই এই দাহ্য পদার্থগুলোই সভ্যতার প্রধান সংকট। গোড়ার এই কথাটা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। সভ্যতার সংকট কথাটা আমরা এখানে উল্লেখ করছি সভ্যতা সম্পর্কে হাওয়ায় ধারণা থেকে নয়। আমরা বলছি শিল্পসভ্যতার গোড়ায় রয়েছে জ্বালানি। তেল এবং গ্যাস। যদি এই জ্বালানি শিল্পসভ্যতা নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে তার পতন বা ধ্বংস অনিবার্য। লড়াইটা কিন্তু এখন শুরু হয় নি। শুরু হয়েছে সত্তর দশকের গোড়া থেকে।

যদি সভ্যতার সংকটের এই বিশেষ চরিত্রের দিকে আমরা মনোযোগ দেই তাহলে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথাগত শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার ক্ষেত্রে নতুন কিছু বিষয়

আমাদের ভাবার দরকার আছে। পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা কথাটা আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিচার থেকে বলি, প্রাকৃতিক বা সভ্যতার বস্তুগত উপাদানের দিক থেকে বিচার করে বলি না। "আধুনিক সভ্যতা"-র জীবাশ্ম ভিত্তি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের ধারণা দুর্বল। এই সম্পর্কে মূল সংগ্রামের ধারাটা পরিবেশ ও নারী আন্দোলন থেকে এসেছে।

ধরা যাক পশ্চিমা সভ্যতার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটল। কিন্তু এতে জীবাশ্ম-ভিত্তিক শিল্পসভ্যতার কোন পরিবর্তন হবে না। এতে তেল ও গ্যাসের ওপর দখলদারিত্বের দ্বন্দ্ব কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান না করে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে নজর ফেরানো দরকার ।

জর্জ বুশের এই ক্রুসেড একই সঙ্গে বর্ণবাদী যুদ্ধ। সেই কারণে আরব, আফগান ও ইসলাম প্রধান দেশের জনগোষ্ঠীকে বর্বর, ট্রাইবাল ও পশ্চাৎপদ প্রমাণ তাকে করতেই হচ্ছে। কারণ কাউকে অমানুষ বা সভ্য জগতের অংশ নয় প্রমাণ করা গেলেই তাকে সহজে বোমা মেরে হত্যা করলে কোন দয়া বা মায়ামমতা জাগে না। এই যুদ্ধ ক্রুসেড এই কারণে যে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে একটি মতাদর্শ হিশাবে জঙ্গী ইসলামের ও জঙ্গী মুসলমানদের মোকাবিলা করতেই হবে। তেল ও গ্যাসের দখল থেকে মুসলমানদের উৎখাত করতেই হবে। তারা সেটা জানেন এবং আগে থাকতেই এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে তারা বারবার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিভক্ত রাখবার জন্য তাদের বলতে হচ্ছে এই যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। এই যুদ্ধ নাকি "সন্ত্রাসী"-দের বিরুদ্ধে। মনে আছে কিনা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ও বলা হয়েছিলো এই যুদ্ধ ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে নয় বরং সন্ত্রাসী "কমিউনিস্টদের" বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতা ও সভ্যতার শত্রু। ইরাকে অর্থনৈতিক অবরোধ ঠিকই জারী রয়েছে। ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হয় নি। চলছে। ক্রুসেড হলেও জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে এই যুদ্ধ চালাতে হবে "সভ্যতা", "মুক্তি" বা সন্ত্রাস বিরোধিতার নামে। ভূতের মুখে রাম নাম।

অন্যদিকে ওসামা বিন লাদেনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ফাঁকি খুঁজে আমরা কুটতর্ক করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি তারা ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে পিছু হটে আসে নি। এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যায় সংগ্রামীকে একত্র করার জন্য তারা "জেহাদের" ডাক দিয়েছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" বলে এই কালে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আদৌ সম্ভব হোত কিনা সেটা বিচক্ষণ যে কেউই ভেবে দেখতে পারেন। বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণী, জাতি ও জনগোষ্ঠীর লড়াই পরিগঠিত করে তোলার ব্যর্থতার জন্য ক্রুসেডের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ জেহাদের রূপ নিচ্ছে। ফলে ওসামা বিন লাদেন বা তালেবানদের "মৌলবাদী" বলে আমাদের সুখানুভূতি হতে পারে, কিন্তু সেটা আমাদের ইতিহাসবোধের ঘোরতর অভাবেরই পরিচয়। যে-লড়াই বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল ভুক্তভোগী শ্রেণী, জাতি ও জনগোষ্ঠীর লড়াই হবার কথা তাকে মুসলমানদের জেহাদি লড়াইয়ে সংকীর্ণ করে এনে ওসামা নিজের ধ্বংস যেমন ত্বরান্বিত করেছেন, তালেবানরাও নিজেদের নিশ্চিহ্ন করার বাস্তবিক শর্ত তৈরি করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন পরিস্থিতি কি আদৌ সম্ভব ছিল?

যুদ্ধের মতাদর্শ দুই ক্ষেত্রেই উল্টোভাবে হাজির হচ্ছে। বুশ আর টনি ব্লেয়ার তাদের ক্রুসেডকে বলছেন, ইনফিনিট জাস্টিস, বলছেন অপরেশন এনডিউরিং ফ্রিডম– সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অন্যদিকে ওসামা, মোল্লা ওমর আর তালেবানরা একে বলছেন "জেহাদ"-আল্লার পথে সংগ্রাম। যদি এটা জ্বালানি যুদ্ধ হয় এবং তেল ও গ্যাস যদি ইসলামপ্রধান দেশগুলোতেই থেকে

থাকে তাহলে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠণের বিরুদ্ধে লড়বার আর কি মতাদর্শ তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর জনগণের কাছে রয়েছে? কি বলে তারা এই যুদ্ধে সৈনিক সংগ্রহ করবে? যে-যুদ্ধ বৈশ্বিক, তার যোদ্ধাও নিশ্চিয়ই এক দেশের হবে না। সত্যি যে আফগানিস্তানে বাংলাদেশের তরুণরাও লড়তে গিয়েছে। কি ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করলে সেটা আমাদের কাছে "মৌলবাদ" বলে মনে হবে না। এই কালে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বর্তমান কালপর্বে শ্রেণী সংগ্রামের ভাষা কি হবে?

এর উত্তর আমি দেব না। শুধু সকলকে ভাববার আহ্বান জানিয়ে শেষ করবো। কিন্তু শেষ করবো করাচির উম্মত পত্রিকায় ওসামা বিন লাদেনের একটি সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে:

> আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে আক্রমণের সাথে আমি যুক্ত নই। একজন মুসলমান হিশেবে আমি মিথ্যে কথা যেন না বলতে হয়, তার চেষ্টা করি। আমি এই আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানি না এবং আমি মনে করি নিষ্পাপ শিশু, নারী এবং অন্যান্য মানুষকে হত্যা করা কোন প্রশংসা করার মতো কাজ নয়। ইসলামে শিশু, নারী এবং অন্যান্য মানুষদের হত্যা করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের সময়ও এমন হত্যাকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই নারী, শিশু এবং অন্য ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের মানুষের, ওপর এমন হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১১ মাস ধরে ফিলিস্তিনে যা ঘটছে তাতেই যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের ওপর আল্লাহর গজব পড়ার কথা। যে সকল মুসলমান রাষ্ট্র এই অত্যাচার নীরবে দেখেছে তাদেরও এই ঘটনা দেখে সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। এর আগে ইরাক, চেচনিয়া এবং বসনিয়ার নিরপরাধ মানুষের ওপর কী হয়েছে? এই সকল ঘটনায় আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশের নিস্পৃহতা এবং সন্ত্রাসীদের প্রতি তাদের সহযোগিতা দেখে একটি কথাই বলা যায়, তা হচ্ছে আমেরিকা একটি ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং তারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে মদদ দিচ্ছে। আমেরিকার সাথে মুসলিম বিশ্বের যে সখ্য তা নিছক লোভ দেখানো এবং প্রতারণামূলক। যুক্তরাষ্ট্র এসব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একদিকে ভয় দেখিয়ে অন্যদিকে লোভ দেখিয়ে তার মতো কারে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আপনি চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন যুক্তরাষ্ট্রের দাস রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদের শাসক কিংবা শত্রু।

সলিমুল্লাহ খান

না ক্রুসেড ও না জেহাদ

বাংলাদেশে যে অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বর্তমান দুনিয়াদারিতে ইঙ্গমার্কিন বড়লোক প্রভুর সাম্রাজ্য বিস্তারাকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার জোগান দিয়ে চলেছেন সলিমুল্লাহ খান তাঁদের একেবারে সামনের কাতারে সদাহাজির। বিশ্ববাণিজ্যবিধ্বংসী বিশ্বপরিস্থির সাথে যতটা আন্তরিকতা সততা বিস্তারের সাথে যেভাবে বোঝাপড়া করলেন তা শেখার মতো। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিশ্লেষণী লেখা তিনি পেশ করেছেন পাঠকের প্রকাশ্য দরবারে। তাঁর লেখা থেকে আমরা চলমান বিশ্বজোড়া যুদ্ধকে বুঝতে শিখেছি। এই যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে আমরা সম্ভবত তার সব কটাই (সোজা বাংলায় ৪টা) **মানুষ** এর এই সংখ্যায় ছেপেছি। ‘আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা’র উদ্যোগে গত বছরের ২৩শে নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ‘ক্রুসেড জেহাদ শ্রেণীসংগ্রাম’ শীর্ষক সেমিনারে ফরহাদ মজহার যে-প্রবন্ধ তুলে ধরেন তা যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করে। ফরহাদের প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সলিমুল্লাহ খানের বর্তমান লেখাটা প্রকাশিত হয় *প্রথম আলো*-র ১৮ই জানুয়ারি ২০০২ তারিখে। এখানে *প্রথম আলো*-র পাঠ পুনর্মুদ্রিত হলো।

১৯৭২ সালে আহমদ ছফা লিখেছিলেন:

> আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন আমাদের রক্ত দিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে।

অন্য সময়ে কি আমরা মাংস দিয়ে চিন্তা করি? সম্ভবত না। তবুও বলা যায় এখনো আমরা রক্ত দিয়েই চিন্তা করছি। যুদ্ধ শুধু আফগানিস্তানেই হচ্ছে না। আমাদের ভেতরেও রক্তপাত হচ্ছে।

আমেরিকা ও ইংল্যান্ডসহ পুরো পাশ্চাত্য জগৎ আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। সে আক্রমণের বিরোধিতা করতে আমাদের বাধছে কোথায়? আমরা শক্তিহীন বলে? না, আরো কারণ আছে। আমাদের ভয় পাছে আমরা তালেবানের—তথা ইসলামের—সমর্থক হওয়ার অপবাদ পাই। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ভয়ের একটা ইতিহাস আছে। আসলে কি আমরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বলেই ইসলামকে ভয় পাই, না ইসলামকে ভয় পাই বলেই সাম্রাজ্যবাদের তল্পি বহন করি? আজ এই প্রশ্ন আমাদের তুলতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের ভদ্রলোক সমাজে যে-পিছুটান তার বিচার প্রয়োজন। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুখে বলেন অথচ ইসলামের ভয়ে কার্যকর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চা গড়তে চেষ্টা করেন না তাদের কাছেও আমার বক্তব্য একই। ফরহাদ মজহার যে-জেহাদকে শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটা বিশেষ রূপ বলেছেন

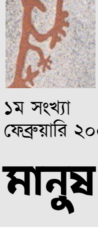

আমি সে-কথার সঙ্গে একমত। আমি ইতিহাস দ্বারা আমার বক্তব্য সমর্থন করব। বলব আফগানিস্তানে বর্তমান পশ্চিমা আগ্রাসনও শ্রেণী-সংগ্রামেরই এক ইতর রূপ বিশেষ।

প্রথমে ক্রুসেড সম্পর্কে বলি। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তাঁর সংগ্রামকে 'ক্রুসেড' নাম দিয়েছিলেন। কেন? কিছু পরে আমেরিকার প্রচারবিশারদরা বললেন: তাদের সংগ্রাম ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, শুধু ইসলামী ত্রাসনীতির বিরুদ্ধে। তো ক্রুসেড কথার ব্যবহার কেন? ক্রুসেড কী জিনিস? আমেরিকা দেশের অধ্যাপক ফিলিপ হিট্টি ১৯৩৭ সালে লেখা আরব জাতির ইতিহাস বইতে ক্রুসেডের ভালো সংজ্ঞা দিয়েছেন। হিট্টির মতে: 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘর্ষের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ট্রয়ের বিরুদ্ধে গ্রীসের এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে ইরানের পুরাতন যুদ্ধ এই সংঘর্ষেরই প্রথম অধ্যায়ের আগের অধ্যায়। এ সংঘর্ষের মাঝখানকার অধ্যায়ের নাম ক্রুসেড। একালে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টা এই সংঘর্ষেরই সর্বশেষ অধ্যায়।' (হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৫) হিট্টি সাহেব আরও বলেন: "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দেশভেদ আছে এ কথা সত্য। কিন্তু তাতে কিছু আসতোও না যেতোও না। দেশভেদ যে গুরুত্ব লাভ করল তার একমাত্র কারণ দুই জগতের ধর্ম, জাতি ও ভাষাভেদ। আরো খোলামেলা যদি বলা চলে তো বলব 'মুসলমান প্রধান' এশিয়ার বিরুদ্ধে 'খৃষ্টান প্রধান' ইউরোপের আক্রমণের নামই ক্রুসেড। মুসলমানরা ৬৩২ ঈসাবি সালের পর থেকে শুধু সিরিয়া আর পশ্চিম তুরস্কেই (এশিয়া মাইনর) নয়, স্পেনদেশ আর সিসিলি দ্বীপেও রাজ্য বিস্তার করে আসছিলেন।" (হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৫) ক্রুসেডের অন্যান্য উস্কানির মধ্যে অধ্যাপক হিট্টি উত্তর ইউরোপের টিউটন জাতির লোকদের দেশান্তরগমন আর যুদ্ধজয় মানসিকতার কথাও উল্লেখ করেন। ক্রুসেডের আরও কারণ উল্লেখ করেছেন হিট্টি সাহেব। ১০০৯ খৃষ্টীয় সালে খলিফা আল-হাকিম জেরুজালেমে স্থিত পয়গম্বর ঈসার সমাধিস্থল কথিত স্থানের গির্জা ধ্বংস করেন। হাজার লক্ষ ইউরোপীয় হাজী এই জায়গায় হজ্ব করতে আসতেন। ৮০০ সালে ফরাসি দেশের বাদশাহ মহাশার্লের (শার্লেমান) কাছে এই গির্জার চাবি উপহার পাঠানো হয়। পাঠিয়েছিলেন জেরুজালেমের প্রধান ধর্মযাজক। তা ছাড়া হজ্জে যাওয়ার পথে বিশেষত পশ্চিম তুরস্ক পার হওয়ার সময় ইউরোপীয় হাজীদের নানা প্রকার জুলুম করা হতো। এইসব ছাড়াও শেষ কারণ হিসাবে হিট্টি সাহেব ধর্মপিত্য দ্বিতীয় আরবানের নাম নিয়েছেন।

তখন খৃষ্টান জগত দুই কেন্দ্রে ভাগ হয়ে গেছে। ১০০৯ থেকে ১০৫৪ সাল পর্যন্ত ঘরোয়া সংগ্রামে খৃষ্টানসমাজের কেন্দ্র রোম ভেঙে নতুন কেন্দ্র কনস্তানতিনের শহর (কনস্তান্তিনোপাল, কনস্তান্তিনাবাদ, একালের ইস্তাম্বুল) তৈরি হয়েছে। কনস্তান্তিনাবাদ শহরের বাদশাহ আলেক্সিয়ুস কোমনেনুসের রাজ্য তুরস্কের সেলজুক বংশের রাজারা কিছু কিছু কেড়ে নিচ্ছেন। এই সময় রোমের ধর্মপিতা দোসরা আরবান দুই খৃষ্টানসাম্রাজ্য এক করার সুযোগ দেখতে পেলেন। ১০৯৫ সালে তিনি কনস্তান্তিনাবাদের বাদশাহর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সমগ্র 'খৃষ্টান জগৎ' একজোট হয়ে 'মুসলমান জগৎকে' আক্রমণ করুক— এই ছিল সেই প্রার্থনার সারাংশ।

এশিয়া খণ্ডের নাম কেন 'মুসলমান জগৎ' আর ইউরোপ মহাদেশের নাম কেন 'খৃষ্টান জগৎ' সে মীমাংসায় যাবার আগে দেখতে পাই ধর্মপিতা দুই নং আরবান ক্রুসেডের ডাক দিয়েছেন। তার বক্তৃতার একটি বাক্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। তিনি বললেন: 'আল্লাহর ইচ্ছা এ যুদ্ধ বাধুক' লাতিন জবানে মাত্র দুই শব্দে বলা হয়: 'দিউস ভুলত'— ভগবান চাহেন। কী চাহেন তিনি? 'শয়তান জাতটার হাত থেকে পবিত্র কবর ছিনিয়ে নাও।'— বললেন পোপ মহোদয়। ইতিহাসবিদ হিট্টি লিখেছেন

> মানবজাতির সমস্ত ইতিহাসেও সম্ভবত এই বক্তৃতার সমান কাজের বক্তৃতা দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

(হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৬)

এশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কেন ধর্মের জিগির তুলেছিল তার উত্তর প্রথম ক্রুসেডে পাওয়া গেল। আরবান ডাক দেন ১০৯৫ সালের ২৬শে নভেম্বর। বছরখানেক পর—১০৯৭ সাল নাগাদ—উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের নরমান ও ফিরিঙ্গি জাতির দেড় লক্ষ যোদ্ধা কনস্তান্তিনাবাদে হাজির। বিনা খরচায় এত বড়ো বাহিনী গঠনে ধর্মই প্রধান সেনাপতির অধিক ভূমিকা পালন করে।

এই ক্রুসেড দুইশত বছর চলেছিল। ইতিহাস-ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে সাত থেকে নয় দফা ক্রুসেডের কথা বলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রুসেড কখনও থেমে থাকে নাই। শেষ পর্যন্ত সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ইউরোপ পিছু হটে। খৃষ্টের দুই জগৎ— গ্রীক ও রুমী গির্জা— এক হয় নাই। ঈসাবি ১৬ শতকের গোড়ায় পশ্চিমা খৃষ্টজগৎ আরেক দফা বহুধা বিভক্তির মুখোমুখি হয়। ক্রিস্তোবাল কোলনের আমেরিকা আর ভাস্কো-দা-গামার ভারত আবিষ্কার এই নতুন ক্রুসেডেরই অংশ। এই ক্রুসেডের শেষ পর্যায় এখনও চলছে। সবে পাঁচশ বছর পার হয় হয়। এর মধ্যে কী ভূমিকা পশ্চিম এশিয়ার? একাদশ শতকের ক্রুসেডের সময় মুসলমান জগৎ একখণ্ড ছিল না। তখন মিসরের ফাতেমিয়া বংশ আর ইরাকের আব্বাসিয়া বংশ লড়াই করছিল ফিলিস্তিনের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য। মাঝখানে সিরিয়া অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য। বর্তমানে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরও ক্রুসেড শেষ হয় নাই। ইতিহাস রসিক পুরুষ। প্রথম ক্রুসেডের সময় ইহুদিরা ছিলেন শয়তানের জাত। এখন তারা দেবতার দলে।

২.

১০৯৭ সালে কনস্তান্তিনাবাদে সমবেত ধনী-গরীব সকল খৃষ্টান যোদ্ধাই বুকে ক্রুশচিহ্ন ধারণ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাই সে যুদ্ধের নাম ক্রুসেড। ইউরোপে এখনও ক্রুসেড মানে শুধু ধর্মযুদ্ধ নয়, জনযুদ্ধও। কাজেই ক্রুসেডকে নিছক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এর জনপ্রিয়তা বা গণ-আবেদনের তাৎপর্য কী তাও ভেবে দেখতে হয়। হিট্টির বক্তব্য আমরা শুনেছি। তিনি বলেন ক্রুসেড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী যুদ্ধ (হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৫) পশ্চিমের কোনো কোনো অধ্যাপক দেখানোর প্রয়াস পান ক্রুসেড মানে নিতান্ত স্বার্থের সংঘাত, অর্থনৈতিক সংঘাত। ধর্ম এখানে সাধারণ ছুতা মাত্র। (লামন্তে ১৯৪৬) আমরা দ্বিমত করি। ধর্মের নাম নিলে— প্রভু যিশুর মাজার-শরীফ দখলের ডাক দিলে— লাখো মানুষ নাচে, তাই ঐ ডাক দেয়া হয়। কিন্তু মানুষ নাচে কেন?

এই প্রশ্নটা আমরা জেহাদের বেলায়ও তুলতে পারতাম। অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের বই পড়েও জানা যায়, জেহাদ আর আরবী মূল ক্রিয়া 'জহদ'। মানে চেষ্টা করা। অধ্যাপক আহমেদ আবদুল কাদের লিখেছেন শব্দটি 'জুহুদ'। (কাদের ১৯৯৭: ৭, ভদ্র ১৯৯৪: ২৮৬) ইতিহাসে জেহাদের অর্থও দাঁড়িয়েছে জনযুদ্ধ। এর সচরাচর বাংলা অনুবাদ ধর্মযুদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এর তাৎপর্য কী? ইংরেজের অধীনে থাকার সময় ভারতবর্ষে এই তর্ক বিশেষ উঠেছিল আমরা তার সার গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

প্রথমে বাংলাদেশের এবং পরে ভারতের অন্যান্য এলাকায় রাজা মহারাজারা ইংরেজের হাতে পরাজিত হয় অথবা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে। অভিজাত শ্রেণীর একাংশ ইংরেজের সহযোগী হয়, অন্য অংশ ধ্বংস হয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যখন বাংলায় এবং অন্যত্র ভদ্রলোক শ্রেণী— বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতি— ইংরেজের সহযোগিতা করছেন তখন

বাংলাদেশের কৃষক সমাজ— বিশেষত মুসলমান কৃষক সমাজ— ইংরেজের সহযোগী ও ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। এ লড়াইয়ের নাম তাঁরা দেন জেহাদ। বাংলাদেশে বারাসতের মীর নিসার আলি প্রকাশ তিতুমীর এমনই এক জেহাদের নেতা। তিতুমীরের ভাবগুরু পাঞ্জাব অঞ্চলের সৈয়দ আহমদ বেরেলভী। সৈয়দ আহমেদের সংগ্রাম প্রথমে পাঞ্জাবের শিখ রাজার বিরুদ্ধে চালিত হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারি কর্মচারীদের লেখা থেকেও প্রমাণ হয় তাঁর লড়াইয়ের আসল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ কর্তব্য কিনা— এই বিচার পাওয়ার জন্য সৈয়দ আহমদ মক্কা সফর করেন। সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীরের লড়াইকে আজও আমাদের দেশের ভদ্রলোক লেখকরা কীভাবে দেখবেন মন ঠিক করতে পারেন নাই। ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখকরাও এইসব কৃষক বিদ্রোহকে 'পশ্চাৎপদ কৃষক চেতনার চিহ্ন' জ্ঞানে বিচার করেন। প্রকৃত প্রস্তাব এও হতে পারে যে এসব চেতনা অগ্রসর চিন্তারই পূর্বঘোষণা। তা নির্ভর করে আপনি কোথায় আছেন তার উপর। ইতিহাস অতীত নয়, বর্তমান।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস এবং মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণীর আন্দোলন যাদের বিচারে সমার্থক তাঁরা সৈয়দ আহমদ বা তিতুমীরের স্থান নির্ণয় করতে সফল হবেন না। তাঁদের চোখে এদের আন্দোলন বা সংগ্রাম আসল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নয়, তার প্রাগিতিহাস মাত্র। বামপন্থী ভদ্রলোকদেরও সমস্যা এই ধর্ম জিনিসটা। কৃষকরা আন্দোলনের জন্য মসজিদ ব্যবহার করেছেন— কোনো কোনো ইতিহাস লেখক তা জেনে লজ্জায় ভোগেন। (সেনগুপ্ত ১৯৭৪) বিখ্যাত রণজিৎ গুহ এমন লজ্জা পান না। তবু তাঁর গুরুতর পরাধীন ভারতে কৃষক বিদ্রোহের গোড়ার কথা বইয়ে তিনি সৈয়দ আহমেদের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা বলতে গেলে করেনই নাই। (গুহ ১৯৮৩) গৌতম ভদ্র তিতুমীরের লড়াই নিয়ে গবেষণা করেছেন কিন্তু সৈয়দ আহমেদ নিয়ে বিশেষ বলেন নাই। আমার প্রস্তাব তা করা গেলে ভালো হতো। সৈয়দ আহমেদ সম্পর্কে ইংরেজ লেখকরা কী বলেছেন তা আলোচনা করলে জেহাদ কী বস্তু ভালো জানা যায়। সে-আলোচনায় আমরা রণজিৎ গুহের পদ্ধতি অনুসরণ করব।

অধ্যাপিকা গায়ত্রী চক্রবর্তীর কথা অনুসারে 'সাব অলটার্ন কথা বলতে জানে না'— গরীবের ভাষা নাই। কিন্তু গরীব সম্পর্কে ধনিক যা বলে তা থেকে লুকানো ইতিহাস বের করে আনা যায়। রাজকর্মচারী উইলিয়াম উইলসন হান্টারের নামকরা আমাদের ভারতীয় মুসলমান বইটির উপশিরোনাম 'তারা কি রাণীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দায়বদ্ধ?' এই বইয়ের মোট চার অধ্যায়। শেষ অধ্যায়ে ভারতের মুসলমান সমাজের প্রতি ইংরেজ সরকার কী কী অবিচার করেছে তার একটা ফর্দ আছে। হান্টার সাহেব মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করেছেন এই দুর্নামও তাকে দেয়া হয়। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৫) তবে হান্টারের বইয়ের পয়লা তিন অধ্যায়ে মুসলমান সমাজের ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মুসলমান তোষণের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। (দে ১৯৯৮: ২) পরবর্তী মুসলমান নেতাদের শুভবুদ্ধির তারিফ করার তাড়নায় এই দুরাচার নেতাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মাত্র। আবদুল লতিফ বা কারামত আলির ফতোয়ার সাথে তুলনার জন্য আগের ফতোয়ার উল্লেখ করা। শেষের এই নেতারা ইংরেজ শাসনকে জায়েজ ঘোষণা করেছিলেন। আলিগড় খ্যাত সৈয়দ আহমদ বা চেরাগ আলি প্রভৃতিও এই সহযোগিতা পথেরই পথিক।

অসহযোগীদের নেতা বেরিলির সৈয়দ আহমদ। নিজেদের অসহযোগ আন্দোলনকে তারা 'জেহাদ' নাম দেন। 'জেহাদ' শব্দটির প্রতি এ কালের সাম্রাজ্যবাদপন্থী বা সহযোগী ঐতিহাসিকদের ন্যাক্কার এমনই তীব্র যে তারা স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিধান থেকে এই

অধ্যায়টি পুরোপুরি খারিজ করে দিতেও কসুর করেন না। এই আন্দোলন ও সংগ্রামকে নিতান্ত 'সাম্প্রদায়িক' বলেও নিন্দা করা হয়। পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার পর একজন বর্ণহিন্দু পণ্ডিত লিখেছিলেন: ভারতে ওয়াহাবি-আন্দোলনকে শুধু বিদেশী-রাষ্ট্র-বিরোধী না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মী বা অমুসলমান-রাষ্ট্র-বিরোধী বলাই সঙ্গত। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩) শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী মনে করেন:

> হয় বল প্রয়োগে বিধর্মী রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা বিধর্মী রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া কোনো মুসলিম-রাষ্ট্রে গিয়া বাস করিতে হইবে, মুসলমানের পক্ষে এ ছাড়া তৃতীয় কোন পন্থা নাই। ইহাই ছিল ওয়াহাবিদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব ওয়াহাবি আন্দোলনকে ভারতে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না। মুসলমান-সম্প্রদায়কে 'জাতি' আখ্যা দিলে ইহাকে ভারতে মুসলিম-জাতির জাতীয় আন্দোলন বলা যাইতে পারে। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩)

বিনয়েন্দ্রবখাবুর এই মত শুধু জনৈক বর্ণহিন্দু ইতিহাস-লেখকের মত হলে কথা ছিল না। এই মত 'আধুনিক' 'প্রগতিশীল' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' সকল লেখকেরই। কখনও ব্যক্ত কখনও অব্যক্ত। একালের 'মৌলবাদ' কথাটির মতো 'ওয়াহাবি' কথাটাও গালি মাত্র। সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীরের লোকেরা নিজেদের দলকে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া বলতেন। ঘৃণায় ও ন্যাক্কারে ইংরেজ-সরকার সে নাম মুখে আনেন নাই বর্ণহিন্দু লেখকরাও আনেন না। প্রগতিশীলরাও তাই। তারপরও সত্য গোপন করা সম্ভব হয় না। বর্ণহিন্দু লেখকের লেখা আর একটু উদ্ধার করা যাক। পাঠক বিচার করার অধিকার রাখেন। চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন:

> এই আন্দোলন প্রধানত ধর্মসংস্কারমূলক হইলেও শুধু ধর্মের সীমানাতে আবদ্ধ ছিল না। আরবদেশে ইহার উৎপত্তি এবং রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ভারতে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মসংস্কারের দিক দিয়া ইহাকে 'পিউরিটান'-আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ধর্মে অনাড়ম্বর সরলতা, বিলাসব্যসন পরিত্যাগ, আর্থিক সাম্য এবং বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ-প্রচারই ওয়াহাবিদের কাজ ছিল। বিধর্মী শিখ এবং বিধর্মী খৃষ্টান-রাজশক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই ওয়াহাবিরা ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহারা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ধনীর শত্রুতাসাধন করিয়াছে এবং ইসলাম রাষ্ট্র স্থাপিত করিতে না পারিলে প্রকৃত মুসলমানের ভারতে স্থান নাই, এই বিশ্বাসে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বিধর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ চালাইয়াছে। ইহাদের শক্তি সাহস নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় অসাধারণ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ইহাদের ঘাঁটি ছিল: ইংরেজ শাসকেরা ইহাদের শক্তি এবং কর্মকুশলতাকে প্রথমদিকে অবহেলার চোখে দেখিয়াছিলেন। পরে ইংরেজদের আদালতে বিচারকালে ইহাদের কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে অনেকের চোখ খুলিয়া গিয়াছিল। বিধর্মী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইবার জন্য সারা দেশের মুসলমানের নিকট হইতে ইহারা এক প্রকার খাজনা আদায় করিয়াছে এবং ধনী মুসলমানেরা, বিশেষ করিয়া চর্ম ব্যবসায়ী মুসলমানগণ, ইহাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছে। যে-সমস্ত মুসলমান ইহাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে রাজি হয় নাই তাহাদের শাস্তি বিধান করিয়া তাহাদের মসজিদ পর্যন্ত ইহারা পোড়াইয়াছে। (চৌধুরী ১৩৫৬: ২-৩)

এই বিবরণীর প্রত্যেকটি শব্দ যদি সত্যি হয় তবে ঘোর লাগে 'জেহাদ' কী বস্তু? ধনীর বিরুদ্ধে গরীবের, ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর, বিধর্মীর বিরুদ্ধে মুসলমানের, জমিদারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান প্রজার, নারাজ মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদী মুসলমানের– সকলের বিরুদ্ধে সকলের লড়াই? বিনয়েন্দ্রবাবু মনে করেন:

> ওয়াহাবিরা মোটের উপর ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে ছিল এ কথা সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ইসলাম-নিয়ন্ত্রিত হইতেই হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান সাধনা। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩)

সৈয়দ আহমদের মুরিদরা বৃটিশ কোম্পানির শাসনাধীন ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হার্ব' ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় একেই বলে 'স্টেট অব নেচার' বা সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধচিহ্নিত 'স্বাভাবিক দেশ'। স্বভাব শব্দের অর্থ যুদ্ধও হয়, শত্রুও হয়। অন্তত এই স্থলে। তার

বিপরীত অবস্থার নাম সভ্য দেশ-বা সিভিল সোসাইটি। দারুল আমান বা দারুল ইসলাম শব্দেরও একই অর্থ। সৈয়দ আহমদের অনুসারীগণ সভ্যতার শাসন কায়েম করার জন্য লড়েছিলেন। তাঁদের চোখে সভ্যতা ও ইসলাম একার্থক শব্দ। গোলমালটা এই জায়গায়। সভ্যতা ও ইসলাম একার্থক কিন্তু এক শব্দ নয়। এই গোলমাল ভাবের নয়, ভাষার। গণ্ডগোলটা মেটাফর ওরফে রূপকথার। সাম্প্রদায়িকতা মেটাফরনির্ভর। ইতিহাসে তার আরও নজির পাওয়া যায়।

৩.

যখন ভারতে জাতীয় আন্দোলন জেহাদের রূপ ধারণ করেছিল তখন জাতীয় আন্দোলনকারীদের নাম হয় ওয়াহাবি। পরবর্তী সময়ে যখন জাতীয় আন্দোলন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির রূপ গ্রহণ করে তখন তাদের নাম হয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। এই দুই পর্যায়ের তুলনায় অনেক উপকারী কাজ হবে। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি জনসাধারণকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে বাধ্য ছিল, তারা ভদ্রলোকের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু জেহাদী আন্দোলন ছিল কৃষক সমাজে বিস্তৃত এবং সরাসরি বিদেশী শাসন বিরোধী। ১৮৬৪-র পর চার দফা বিচার হয়েছে এই জাতীয় বিপ্লবীদের। সেই বিচারের নথিপত্র উইলিয়াম হান্টার বিখ্যাত প্রচার প্রবন্ধ— আমাদের ভারতীয় মুসলমান— মুসাবিদা করেন। হান্টারের বয়ান অনুসরণ করলেই বোঝা যায় তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল সারা ভারতের মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলন চরিত্র কৃষক বিদ্রোহ। এর ব্যাপ্তি পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম অবধি। ওয়াহাবি বিপ্লববাদীরা লড়াই করেছেন উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে কিন্তু তাদের টাকা আর যোদ্ধা গিয়েছে সারাদেশ থেকে।

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে তালেবানরা এখন লড়াই করছেন তাদের সাথে ওয়াহাবিদের অনেক মিল চোখে পড়ে। তালেবানদের সম্পর্কে মার্কিন প্রচারে আমাদের দেশের মার্কিন বন্ধুরাও মজেছেন। আমেরিকার অন্যায় যুদ্ধ যারা সমর্থন করেন, যারা বলছেন তালেবানদের হত্যা করা দরকার, আমি তাদের তারিফ করি। তবে যারা আফগানিস্তানের জন্য দুঃখ করছেন অথচ মার্কিন আগ্রাসনের চরিত্র বুঝতে সক্ষম নন, কৃষক বিদ্রোহের ভাষায় তারা বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক। কৃষক বিদ্রোহীর চৈতন্যে তারাও সমান ন্যাক্কার পাওয়ার যোগ্য। (গুহ ১৯৮৩:১৯৯-২১৯)

উইলয়াম হান্টারই ভালো সাক্ষী। তিনিই বরং শেষ কথা বলুন কেমন বিপ্লবী ছিলেন ওয়াহাবিরা। শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসই মানব জাতির ইতিহাস— অন্তত আমাদের জন্য ইতিহাস— বলেছিলেন কার্ল মার্কস। সেই বিচারে জাতীয় আন্দোলনও শ্রেণীসংগ্রামেরই এক বিশেষ রূপ। এই রূপে একগুচ্ছ শ্রেণী আর এক গুচ্ছ শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ে। জাতীয় সংগ্রামে একপক্ষে দেশী ও বিদেশী শক্তি জোট বাঁধতে পারে। অপরপক্ষেও তাই। তবু সেই লড়াইয়ের চরিত্র মার্কস প্রস্তাবিত শ্রেণী-সংগ্রামের বিধি বর্হিভূত হয় না। এই প্রস্তাব নারী আন্দোলন বা অন্য কোনো পীড়িত, মজলুম শক্তির আন্দোলনের বেলায়ও কার্যকর। ওয়াহাবি আন্দোলনকে আমরা যে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া বলি না, তার কারণও শ্রেণী-সংগ্রামই। এই ভাষার মধ্যেই শ্রেণীসংগ্রাম জারি আছে। দেখা যাক ইংরেজ কর্মচারী মহাত্মা হান্টার কোন প্রকারে তার ক্রুসেড অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ জেহাদ চালিয়েছিলেন। হান্টার লিখেছেন:

> পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ। (তিনি ছিলেন রায় বেরিলির বাসিন্দা। ১২০১ হিজরীর মুহররম মাসে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়) যাদেরকে আমরা পিন্ডারী শক্তির নির্মূলকালে অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তিনি ছিলেন সেই সাহসী ব্যক্তিদের

> অন্যতম। একজন মশহুর দস্যু সর্দারের অধীনে অশ্বারোহী সিপাহী হিসাবে তার জীবন আরম্ভ। বহু বৎসর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলির উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান শিখ শক্তির নায়ক রণজিৎ সিংহ পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চলসমূহে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে সকল মুসলমান দস্যুর পক্ষে নিজের পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তার উপর শিখদের অত্যধিক হিন্দুয়ানীতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের ধর্মান্ধতা আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সৈয়দ আহমদ বুদ্ধিমানের মতো নিজেকে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর একজন মশহুর আলেমের নিকট (শাহ আবদুল আজিজ ১৭৪৬-১৮২৩) শরিয়তী শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বৎসর সেখানে সাগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যেসব অনাচার বা বেদা'ত ঢুকে পড়েছে, সেগুলির প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। (হান্টার ১৯৭৪: ৪। অনুবাদ ঈষৎ সংশোধিত)

হান্টার আরো জানাচ্ছেন:

> ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চল সফর করে ফিরলেন। তখন তার মুরীদান তাঁর ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করে সাধারণ নফরের মতো খিদমত করতো এবং বহু দেশমান্য আলেম খিদমতগারের মতো খালি পায়ে তাঁর পালকির দুধারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। পাটনায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের ফলে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা এতোদূর বেড়ে গেল যে, একটা সাধারণ সরকারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়ে পড়লো।তাঁর সফরকালে যেসব শহর পথে পড়তো সেগুলিতে নায়েব পাঠিয়ে তিনি তেজারতি থেকে জাকাত সংগ্রহ করতে লাগলেন। মুসলমান বাদশাহদের সুবাহদার নিযুক্ত করার মতো হুকুমনামা জারি করে তিনি চারজন খলীফা ও একজন বড় খতিব নিযুক্ত করলেন। এভাবে পাটনায় একটা স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে গঙ্গা নদীর গতিপথ বেয়ে এবং পথিমধ্যে বড়ো বড়ো শহরে অসংখ্য মুরীদ ও তাদের নায়েব নিযুক্ত করে তিনি কলকাতার দিকে রওয়ানা হলেন। কলকাতায় সাধারণ মুসলমানেরা তাঁর কাছে এমনভাবে দলে দলে জমায়েত হতে লাগলো যে, প্রত্যেকের হাতে হাত দিয়ে বয়েত দান করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। তখন তিনি মাথার পাগড়ি খুলে জমায়েতে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন যে কেউ তার পাগড়ি ছুঁয়ে দেবে সেই তাঁর মুরীদ হয়ে যাবে। ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান এবং এভাবে তার পূর্বতন দস্যুবৃত্তি হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুম ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। সেখানেও ধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা কলকাতার মতোই সাফল্যমণ্ডিত হলো: কিন্তু ইঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এই প্রেসিডেন্সি শহরের চেয়ে আরও উর্বর ক্ষেত্র এই দস্যু-দরবেশের অপেক্ষায় ছিল। উত্তর ভারতে ফেরার পথে বেরেলি জেলার তার জনপল্লীতে এক বিরাট হাঙ্গামাবাজ অনুচরের দল তাঁর সহগামী হলো। ১৮২৪ সালে তিনি পেশোয়ার সীমান্তের বুনো পাহাড়ীয়াদের মধ্যে উদিত হয়ে সরাসরি পাঞ্জাবের সম্পদশালী শিখ শহরগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।" (হান্টার ১৯৭৪: ৪-৬ অনুবাদ ঈষৎ পরিবর্তিত)

জার্মানীর ১৬শ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহ, ১৭ শতকে ইংল্যান্ডের পিউরিটান বিপ্লব এবং চীনে ১৯ শতকের তাইপিং বিদ্রোহের ইতিহাসও একই চরিত্রের। আমরা যে এই সব বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ইতিহাস এখন যত পারি তত কম জানার সংগ্রাম করছি তাকে যদি শ্রেণীসংগ্রাম না বলি তো শ্রেণীসংগ্রাম কি গাছে ধরে না বাঁশে ধরে? আমরা চাই বা না চাই শ্রেণীসংগ্রাম দীর্ঘজীবী হয়েছে। মজার ব্যাপার ২১ শতকের গোড়াতেও এই সংগ্রাম পৃথিবীর মালভূমি বরাবর আবার জেহাদ নামে দেখা দিয়েছে। ফরহাদ মজহার জেহাদকে জেহাদ বলে সঠিক কাজটিই করেছেন। জেহাদই এখানে শ্রেণী সংগ্রামের, কৃষক যুদ্ধের রূপক। মাও জে দং ভুল বলেন নাই যখন তিনি দুনিয়ার শহরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার গ্রামের লড়াইকে শ্রেণীসংগ্রামের সম্মান দিয়েছিলেন। আমরা আফগান দেশে বা বাংলাদেশে কি দুনিয়ার গ্রাম হয়েই বসে থাকছি না? মাও জে দং-এর জেহাদ আর মোহাম্মদ ওমরের শ্রেণীসংগ্রাম এখানেই মিত্রভাব স্থাপন করেছে।

দোহাই

১। আহমদ আবদুল কাদের, *জিহাদ কি ও কেন*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৭।

২। উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আবদুল মওদুদ অনুদিত, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৭৪।

৩। গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান: বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়*, কলিকাতা ১৯৯৪।

৪। ফরহাদ মজহার, 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম'; *চিন্তা*, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৫, ২০০১।

৫। শ্রী বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বিভক্ত ভারত*, কলিকাতা, ১৩৫৬।

রেহনুমা আহমেদ

মালেক আল্লুলা’র *দ্য কলোনিয়াল হারেম*

পাশ্চাত্য-প্রভুর ফ্যাণ্টাসিতে উপনিবেশের নারী

এই লেখাটা আলজিরীয় লেখক মালেক আল্লুলার একটা পুস্তকের পর্যালোচনা (মালেক আল্লুলা, *দ্য কলোনিয়াল হারেম: থিওরি এ্যান্ড হিষ্টরি অফ লিটারেচার*, ভলিউম ২১, ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬। ফরাসী হতে ইংরেজিতে অনুবাদ মির্না গডজিচ্ এবং উলাদ গডজিচ্, ভূমিকা, বারবারা হারলো, xxii + ১৩৫ পৃষ্ঠা)। লেখাটা প্রথমে ছাপা হয়েছিল *প্রথম আলো*-য়, ‘পরিবেশনের রাজনীতি’ নামে, ৪ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে।

পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য বা ওরিয়েন্ট হচ্ছে স্টিরিওটাইপ এবং ফ্যান্টাসি, দুটোই। পাশ্চাত্য-সৃষ্ট গৎবাঁধা ধারণায় প্রাচ্য হচ্ছে উদ্ভট রং-এ রাঙানো, কামনাময়ী। প্রাচ্য হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে রহস্য বসবাস করে, নিষ্ঠুর এবং বর্বর উপাখ্যান ঘটে। প্রাচ্য ইউরোপকে করে তোলে মুগ্ধ, এবং বিচলিত। প্রাচ্য হচ্ছে ইউরোপের ঝলমলে কল্পনা একইসাথে, এটি ইউরোপের মরীচিকা। চার শতকেরও অধিক সময়কাল ধরে পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে নিয়ে ফ্যান্টাসি রচনায় লিপ্ত। প্রাচ্যকে নিয়ে পাশ্চাত্যের এই গৎবাঁধা ধারণা নির্মাণ এবং ফ্যান্টাসি হচ্ছে প্রাচ্যবাদ। চিত্র এবং সাহিত্য প্রাচ্যবাদ গঠন করে। যৌনতা বাদে ফ্যান্টাসি সম্ভব নয় এবং এই প্রাচ্যবাদে, কেন্দ্রীয় যে মূর্তিটি ধরা পড়ে, তা হচ্ছে “হারেম”। হারেমের ধারণায় মূর্ত হয় প্রাচ্যকে নিয়ে পাশ্চাত্যের আচ্ছন্নতা। এই শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্রই পাশ্চাত্যীয় মানসে নানান মায়াবী, অলীক মূর্তি ছাড়া পায়, ছুটে বেড়ায়। এককাট্টা মূর্তিগুলির স্রোতে পাশ্চাত্যীয় কল্পনাজগৎ ভেসে যায়। কথাগুলো মালেক আল্লুলার। তিনি ফ্রান্সে বসবাসরত আলজিরীয় কবি এবং লেখক ।

আল্লুলার *দ্য কলোনিয়াল হারেম* বইটির বিষয় হচ্ছে রেপ্রেজেন্টেশন বা পরিবেশনের রাজনীতি: ঔপনিবেশিকতা ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টি, ঔপনিবেশিক দৃষ্টি গঠনে চিত্রের গুরুত্ব, এবং বিশেষ করে, ফ্যান্টাসি তৈরীতে আলোকচিত্রী ও পোস্টকার্ডের (ভিউকার্ড) ভূমিকা। বইটির মোট দশটি অধ্যায়ে রয়েছে ৯০টি পোস্টকার্ডের ছবি এবং আল্লুলার বিশ্লেষণ। বইটির ভূমিকা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

লিখেছেন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বারবারা হারলো। আল্লুলার বইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে আলজিরীয় নারীর আলোকচিত্র। তাঁর ভাষায়, "ইতিহাসে আর অন্য কোন সমাজের নারী গোষ্ঠী এমন বৃহদাকারে আলোকচিত্রের বিষয় হয়ে জনদৃষ্টির জন্য অর্পিত হয় নি" (পৃঃ ৫)। আল্লুলা বলেন, ১৯০০ হতে ১৯৩০ পর্যন্ত ছিল ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ডের স্বর্ণযুগ; এই বইয়ের পোস্টকার্ডগুলো সেই সময়কালের। যেই পরিস্থিতি ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ডের জন্ম দেয়, তা হতে এটিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায় উপনিবেশ অনুসন্ধান করার বিশাল প্রকল্পে পোস্টকার্ডের অংশগ্রহণ। পন্থা হিসেবে পোস্টকার্ড প্রস্তাব করে অধিক নৈকট্য; এটি প্রত্যক্ষভাবে আরো দৃষ্টিগত (visual)। ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ডের প্রবাহ ১৯৩০এর পর থেমে যায়। ততদিনে অর্জিত হয়ে যায় এটির লক্ষ্য। চলে আসে ঔপনিবেশিক সিনেমা এবং পর্যটন। আল্লুলার দৃষ্টিতে, পোস্টকার্ড যদিও আলোকচিত্রের অংশ, প্রথমটি নির্ভর করে দ্বিতীয়টির বাস্তবতা পরিবেশনের সামর্থ্যের উপর; সেটির প্রযুক্তির উপর। পোস্টকার্ড আলোকচিত্রকে স্বীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। কার্ড হচ্ছে একটি খালি ছবি যেটিতে ডিসকোর্স ভরা হয়। তাঁর ভাষায়, "পোস্টকার্ড হচ্ছে আলোকচিত্রীত ডিসকোর্স" (টীকা ১৪, পৃঃ ১৩০)। ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ড হচ্ছে সেই কালের যখন ঘটে নি গণমাধ্যমের আবির্ভাব; এটির অস্তিত্ব পূরণ করে ফাঁকা জায়গা। ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সে পোস্টকার্ড জোগায় অনুপ্রাণিত "খোশগল্প"। এটি ক্রেতার চাহিদামত আইকন প্রদান করে; নেক্ এবং নৈতিকভাবে উৎকর্ষ-অভিপ্রায়ে পোস্টকার্ড ভরপুর।

আল্লুলা বলেন, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হতে পাশ্চাত্য ক্রমশ পৌঁছে যায় প্রাচ্যের নিকট। উপনিবেশবাদ প্রাচ্যের নিকট থাবা মারে, যুদ্ধের মাধ্যমে তাকে কব্জা করে, শোষণের বিবিধ বন্ধন দ্বারা তার হাত-পা বেঁধে ফেলে, এবং কাঁচা মালের রাক্ষুসে ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাকে মহান মাতৃভূমির নিকট উৎসর্গ করে। এধরনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ৫ই জুলাই ১৮৩০ সালের সুন্দর এক প্রভাতে ফরাসী সেনাবাহিনী পূর্ব আলজিরীয়ায় পৌঁছায়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিল ধর্মযাজক এবং পণ্ডিত, চিত্রশিল্পী এবং আলোকচিত্রীর দল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ক্যাম্পের আশে-পাশে থাকে ফ্রান্সের সুশীল মানুষজন যাদের দৃষ্টি সর্বদা উদ্ভটতাবাদ (exoticism), লোকজগল্প ও প্রাচ্যবাদের অন্বেষণে তৃষ্ণার্ত।

বিদেশী চোখে প্রথম যে জিনিসটি ধরা পড়ে তা হলো, আলজিরীয় নারীর অদৃশ্যমানতা। আল্লুলা বলেন, আলজিরীয় নারী নিজেকে লুকান্ না, তিনি লুকোচুরির খেলা করেন না। কিন্তু চোখ তাকে দেখতে পায় না। আলোকচিত্রীর কাছে নারীর অভেদ্য চাদর একটি প্রত্যাখ্যান স্বরূপ। এই পরিস্থিতিতে আলোকচিত্রী বোধ করেন হতাশা এবং প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যান তিন ধরনের: প্রথমত, তার ছবি তোলার কামনার প্রত্যাখ্যান; দ্বিতীয়ত, তার "শিল্পচর্চার" প্রত্যাখ্যান। এবং তৃতীয়ত, এমন একটি পরিবেশে তার স্থানের প্রত্যাখ্যান, যেটি তার নিজের নয়। নারীর জগতের বুনোট – হারেম, চাদর – এতোই ঠাঁসা যে, কোন ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে লেন্স গলিয়ে আলোকচিত্রী অনুপ্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন না। এক-একটি সাদা বোরখা হচ্ছে এক-একটি ফটোগ্রাফের অনুপস্থিতি। এগুলি হচ্ছে হোয়াইট-আউট। এক বোরখা-আচ্ছাদিত নারী হতে আরেক বোরখা আচ্ছাদিত নারীকে আলাদা করা যায় না। মুখের অবগুণ্ঠন হচ্ছে মুখোশের মতন। কিন্তু এই মুখোশ কোন বিশেষ দিনের জন্য তুলে রাখা নয়। এগুলো রোজদিনই পরা হয়, এগুলো ইউনিফর্মের মতন। আলোচনার এই পর্যায়ে পৌঁছে আল্লুলা একটি "কিন্তু" যোগ করেন। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, আবরণ আরেকটি কার্য সম্পাদন করে। আবরণ হচ্ছে, ব্যক্তিক ঢং-এ, প্রাইভেট পরিসরের একটি ঘের। এই ঘের অলঙ্ঘনীয়। আবার, এই ঘের যখন জন-পরিসরে, অর্থাৎ আলোকচিত্রীর বিচরণের পরিসরে, সম্প্রসারিত হয়

তখন সেটি আলোকচিত্রীকে মনে করিয়ে দেয় হারেমের অপ্রবেশ্যতার কথা। এই জগতে তার অনুপ্রবেশ যে নিষিদ্ধ, সে কথা। আরো মনে করিয়ে দেয়, মুসলমানদের কপট নিষেধাজ্ঞা: মনুষ্য শরীরকে অবয়ব দান ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। আলোকচিত্রী যেখানে ভেবেছিলেন উদ্ভটতাবাদ সহজেই সামালযোগ্য হবে, বাস্তবে ঘটতে দেখা যায় তার বিপরীত। এতে ব্যাহত হয় তার শিল্পচর্চা। জন্ম নেয় প্রহসনের এক বিষমসঙ্গতি: আবৃত নারীকে অনাবৃত করা হয়ে উঠে আবশ্যিক।

আল্লুলা বলেন, আলোকচিত্রীর জন্য আচ্ছাদিত নারী কোন লজ্জাকর রহস্য নয়। বরং, তার উপস্থিতি মাত্রই আলোকচিত্রীর প্রতি আক্রমণাত্মক। বোরখার জালের সুক্ষ ফোঁকরের ভিতর থেকে যে নারীসুলভ দৃষ্টি নিক্ষেপিত হয় তা অনেকখানি আলোকচিত্রীর দৃষ্টির মতন। লেন্সের ভিতর থেকে নিক্ষেপ করা দৃষ্টি। আলোকচিত্রী এই দৃষ্টি চেনেন। এবং এ কারণে বোরখা-পরিহিতা নারীর সম্মুখে গেলে, আলোকচিত্রী অস্বস্তি বোধ করেন। তার মনে হয় তিনি নিজে আলোকচিত্রের বস্তু। বোরখার ফোকরের ভিতর থেকে নিক্ষেপ করা দৃষ্টি তার নিজ দৃষ্টির বে-দখল ঘটায়। আলজিরীয় সমাজ, বিশেষ করে সে সমাজের নারী-জগৎ, আলোকচিত্রীর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি-স্বরূপ। এই সমাজ তাকে সহজ প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই সমাজ তার কামনার বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই নিঃশব্দ চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরে আলোকচিত্রী একটি প্রতীকী প্রকল্প হাতে নেন। তিনি দু'দফা বলাৎকার করেন: তিনি আবৃতকে অনাবৃত করেন। এবং, তিনি অবয়ব পরিবেশন করেন। যা কিনা নিষিদ্ধ।

আল্লুলা বলেন, ঔপনিবেশিক আলোকচিত্রীর স্টুডিও হয়ে ওঠে তার কামনা পূরণের স্থান (আল্লুলার নিকট "স্টুডিও"র অর্থ প্রথাগত অর্থের তুলনায় ব্যাপক। তার মতে, মডেলের ব্যবহার স্টুডিওকে গঠন করে। সেই অর্থে, আলোকচিত্রী যদি প্রাকৃতিক পরিবেশে, আউটডোরে মডেলের ছবি তোলেন, সে স্থানটিও হয়ে পড়ে আলোকচিত্রীর স্টুডিও)। যেসকল নারীর কাছে আলোকচিত্রী সহজ প্রবেশাধিকার পান না, তিনি তাদের প্রতিরূপ জড়ো করেন। এরা হচ্ছেন মজুরীপ্রাপ্ত মডেল। উপনিবেশে পরিণত হওয়া, এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানাদির ভাঙ্গন আলজিরীয় নারী ও পুরুষ, দুইকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের ঠেলে দেয় সমাজের প্রান্তে। নারীর জন্য প্রান্তিকীকরণের অবধারিত অর্থ হচ্ছে, বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ (এখানে উল্লেখ্য যে, ফরাসী শব্দ mouquere-এর অর্থ হচ্ছে "আরব নারী" এবং "বেশ্যা," দুটোই)। আলোকচিত্রী প্রয়োজনমাফিক তার স্টুডিওটিকে সাজান। জড়োকৃত নারীদের যে কোন একজনকে ঘোমটা পরার নির্দেশ দেন। এরপর, ঘোমটা ফেলার নির্দেশ দেন। আল্লুলার বক্তব্য হচ্ছে, যন্ত্র (mechanism), কিংবা ষড়যন্ত্রের (machination), সূত্রপাত ঘটে এই মুহূর্ত হতে। পোস্টকার্ডের মূলত বিকৃতিকরণ প্রকল্পের ছক এই অঙ্গভঙ্গিগুলোতে অন্তর্নিহিত। ঘোমটা পরা এবং ঘোমটা ফেলা। এই অঙ্গভঙ্গি পালিত হয় আলোকচিত্রীর নির্দেশ-মোতাবেক। এই নির্দেশ পালন অন্যদের কপালেও লিখিত। আল্লুলা বলেন, এই নির্দেশ পালনের পর, আলজিরীয় নারীর লুকোনোর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

অনুপস্থিতকে উপস্থিত করে, এবং শব্দবিহীনভাবে, পোস্টকার্ড দাঁড় করায় আলজিরীয় নারীকে পরিবেশনের সত্যতার মাপকাঠি। আলজিরীয় নারী-সংক্রান্ত ডিসকোর্সের মাপকাঠি। প্রতিকল্পিত নারী হিসেবে মডেলের রয়েছে তিনটি সুবিধা: তিনি আলোকচিত্রীর নাগালের ভিতরে; দ্বিতীয়ত, তিনি হচ্ছেন বিশ্বাসযোগ্য; তৃতীয়ত, তিনি হচ্ছেন মুনাফাযোগ্য। মডেলের উপস্থিতি এবং তার কার্য-উপযোগিতা, পোস্টকার্ড তৈরীর ব্যবসায়িক, তার মুনাফাভিত্তিক দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

আলোকচিত্র শিল্পের কল্যাণে, পূর্ণ সাজে সজ্জিত (এমনকি গহনাসহ) এই মডেলরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে মূর্ত করেন সেই নারীদের যারা আলোকচিত্রীর নাগালের বাইরে। যারা আলোকচিত্রে অনুপস্থিত। অনুপস্থিত নারীর সাদৃশ্য বহনকারী মডেল হচ্ছে একইসাথে অনুপস্থিত নারীর উপস্থিতি, এবং তার কাল্পনিক স্থলাভিষিক্ত। আলোকচিত্র হচ্ছে ইলিউশন তৈরীর শিল্প – ফরাসী আলোকচিত্রীদের উপস্থাপিত আলজিরীয়দের মনে হবে নিখুঁত, মনে হবে বিশ্বাসযোগ্য। এই খুঁত-বিহীনতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরী হয় যেহেতু যে নারীরা অনুপস্থিত, যারা "অন্য," তারা নাগালের বাইরে, আলোকচিত্রী তাদের কাছে সহজ প্রবেশাধিকার পান না। একইসাথে, তাদের পরিবেশনের প্রতি তাঁরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে পারেন না।

মডেলের চারপাশে আলোকচিত্রী সাজান ক্ষুদ্র, ক্ষেত্র বিশেষে তুচ্ছ, অংশ যা অর্জন করে বাস্তবের উপস্থিতি। যেমন আসবাবপত্র, ব্যাক্ড্রপ, নানাবিধ সরঞ্জামাদি (মাদুর, মৃৎশিল্প, দেয়ালে কার্পেট, হুকো, পিতলের ট্রে, পাত্র)। মডেলকে পরান আঞ্চলিক পোশাক, গহনা। এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ফ্রেমের ইঙ্গিত করা। "বাস্তবতার" ভান প্রত্যাশা করে "খাঁটিত্বের" ছোঁয়া। এভাবে ফ্যান্টাসির ক্রিয়াশক্তির নিকটে পৌঁছে দেয়া হয় "বাস্তবতা," তথাপি প্রতিস্থাপিত বাস্তবতা। একই ঢং-এর যুক্তি অনুসারে, অর্থাৎ, উল্টো (ঔপনিবেশিক) যুক্তি অনুসারে তৈরী হয় আলজিরীয় নারীর গৃহবন্দী হওয়ার থিম। এটি একটি আরোপিত থিম। আলোকচিত্রীর প্রাথমিক হতাশা থেকে তৈরী হয় এই থিম। যুক্তিটি এরূপ: নারী যদি দর্শনযোগ্য না হ'ন (যেহেতু তিনি বোরখা-আচ্ছাদিত), তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বন্দী। বোরখা এবং বন্দীদশার এই নাটকীয় সমরূপতা তৈরী করা জরুরি। এটা নির্মাণ করে কাল্পনিক দৃশ্য, এই নির্মাণে বাস্তব সমাজ – সেই সমাজ যেটি কিনা আলোকচিত্রীর হতাশার জন্ম দেয় – মিলিয়ে যায়। এর পরিবর্তে তৈরী হয় ফ্যান্টাসি: হারেমের ফ্যান্টাসি। অল্পবয়স্ক মেয়েদের, যুবতীদের, প্রাপ্ত-বয়স্ক নারীদের ছবি দেখা যায় একাধিক পোস্টকার্ডে। তারা জানালার গরাদের পিছনে বন্দী। তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপিত ঔপনিবেশিক দৃষ্টির প্রতি। সেই দৃষ্টি এই নারীদের বন্দীদশার সাক্ষী।

কিন্তু খুব সুক্ষ্মভাবে, বন্দীদশার অর্থ হারায় তার অনঢ়তা। এই ফ্যান্টাসির যৌন প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই নারীদের পোশাক সত্যিকার অর্থে খোলানো হবে; লক্ষ্য হচ্ছে, তাদের দেহকে কামনাময়ী করে তোলা। আলোকচিত্রীর যৌন ফ্যান্টাসি কোন ব্যক্তি বিশেষের ফ্যান্টাসি নয়। এটি একটি যৌথ ফ্যান্টাসি। এই ফ্যান্টাসি ঔপনিবেশিকতার উপযুক্ত; তারই সৃষ্ট। আলোকচিত্রীর কাছে "অন্দরমহল"-এ, "ঘরের ভিতর"-এ এই নারীদের ছবি তোলা, প্রাচ্য জগতের অতীব কামুক বাস্তবতার নিকটে পৌঁছার সমতুল্য। সেটি হচ্ছে হারেম। সেটি তাকে ভূতের মত তাড়া করে। হারেম হচ্ছে অলস নারীর একটি কামুক জগৎ। শুয়ে-বসে থাকা এই নারীরা সাজসজ্জাপূর্ণ। মনে হয় অন্তহীন উৎসব পালনের জন্য তারা সর্বদা প্রস্তত। হারেম মোহ-নীয়, একইসাথে হারেম উত্তেজনা তৈরী করে। কম্পোজিশনে ধরা পড়ে আলোকচিত্রীর এই উত্তেজনা এবং তার উল্লসিত দ্বিধাগ্রস্ততা। আলোকচিত্রীর আজ্ঞামতে এই নারীরা স্বর্ণালংকারে আবৃত; এই নারীদের হতে হবে অসীম সুন্দরী, হতে হবে আকর্ষণীয়, স্বপ্নীল এবং দূরের, অবনত এবং রাজকীয়। হারেমের এই বিশদ মঞ্চায়ন পূর্ব হতে ধরে নেয় যে, আলোকচিত্রী বন্দীশালার ভিতরে অনুপ্রবেশ করেছেন। আল্লুলা বলেন, এটি খুবই অর্থপূর্ণ। আলজিরীয় সমাজে ভিতর এবং বাহিরকে যে দূরত্ব পৃথক করে, সেটির কাল্পনিক সমাধান হচ্ছে আলোকচিত্রীর এই অনুপ্রবেশ। গরাদের ওপারে অনুপ্রবেশ; হারেমের ভিতরে অনুপ্রবেশ। আল্লুলার দৃষ্টিতে, এটি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতাকে উৎরানোর সবচাইতে শক্তিশালী প্রতীকী রূপ। অবশেষে পোস্টকার্ড, তার

পরিবেশনের ক্ষুদ্র পরিসরে, আলোকচিত্রীকে দেয় তার ফ্যান্টাসির চারণভূমিতে বেড়ানোর সুযোগ। আল্লুলা বলেন, আলোকচিত্রীর অর্জিত নৈকট্যের চিহ্ন বহন করে তিনটি অবয়ব: (শ্বেতাঙ্গরা যেটির নামকরণ করেছেন) কফি পান অনুষ্ঠান, হুক্কা-টানা এবং দাসী। এই তিনটি অবয়ব মিলিত হয়ে ইঙ্গিত করে হারেমের অবসর এবং ইন্দ্রিয়পরায়ন দৈনিক বিধিব্যবস্থা। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় চতুর্থ একটি অবয়ব: নর্তকী।

বইটির শেষ অধ্যায়। আল্লুলা বলেন, হারেমের মূর্তিগুলো অন্তহীন নয়, কিন্তু হারেমের অনুসন্ধান ঠিক তাই। এই অনুসন্ধান হচ্ছে আচ্ছন্নতার (অব্‌সেশন) অঙ্গ। তিনি বলেন, পোস্টকার্ডের ভিতরের এবং পোস্টকার্ড-সম্পর্কিত আচ্ছন্নতা প্রবলভাবে, এবং অধিকভাবে, প্রদর্শিত হয়েছে স্তন-সিরিজের পোস্টকার্ডে। এখানে যা পাওয়া যায় তা স্তনের সংকলনের সমতুল্য। এবং সংকলন যেহেতু পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে চায় সেকারণে দর্শক জানতে পারেন নানান ধরনের স্তনের অস্তিত্বের কথা: প্রথমত, বেদুঈন, তারপর কাবিল, তারও পর, 'উলেদ-নায়েল, ইত্যাদি। এই সংকলন হতে অর্ধ-নান্দনিক গোছের একটি প্রত্যয় বেরিয়ে আসে: মুরীয় (Moorish) স্তন। এটি উদ্ভট পোস্টকার্ডের একচ্ছত্র সম্পত্তি। মুরীয় স্তনের উর্ধ্বে সাধারণত পাওয়া যায় একটি মৃদুহাস্যরত অথবা স্বপ্নীল মুখ, যার আহ্বান স্পষ্ট, যেটি এক হাত থেকে আরেক হাত ঘুরে পৌঁছে যাবে তার লক্ষ্যস্থলে। প্রেরক হতে প্রাপক, সমগ্র এই যাত্রাপথে, এটি দর্শনের জন্য প্রদর্শিত হবে, কোন খাম একান্ত বার্তা আদান-প্রদানের গোপনীয়তা নিশ্চিত করবে না। এই সিরিজ, যেটির উদ্দেশ্য এবং বিষয় খুবই স্পষ্ট, ব্যবহার করে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় মডেলদের। কয়েকজনের সৌন্দর্য পিছনে-ফেলে আসা দিনের জন্য মনকে করে তুলতে পারে আকুল; আলোকচিত্রীর শিল্পবোধ পেতে পারে মরণোত্তর প্রশংসা। এধরনের নান্দনিক প্রবণতার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে এই লাভজনক ব্যবসা; যেটি বর্তমানেও সাফল্যজনক। সংক্ষেপিতরূপে, এবং তার প্রথাগত হিংস্র ভাষায়, ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ড বলে: এই নারীরা, যারা ছিলেন অদৃশ্য এবং লুক্কায়িত, এবং এখন পর্যন্ত চোখের আড়ালে, এখন হতে সর্বসাধারণের (public)। কয়েকটি পয়সার জন্য, এবং যে কোন সময়, তাদের অন্তরঙ্গতা ভাঙ্গা যেতে পারে, এটি অবমানিত হতে পারে। তাদের লুকোনোর আর কিছু নেই, এবং তারা তাদের দেহের যা কিছু প্রদর্শন করেন – যা আলোকচিত্রীর শিল্পবোধের সাহায্যে করে তোলা হয়েছে নান্দনিক – সেটি প্রদান করা হচ্ছে প্রত্যক্ষ আহ্বানস্বরূপ। দর্শনের জন্য তারা তাদের দেহ প্রদান করছেন দখল-করা-যেতে-পারে দেহ হিসেবে। যে দেহ, পর্ণোগ্রাফির মতনই "ভারী কামনা" দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

আল্লুলার মতে, সাধারণ আলোকচিত্রীর বিপরীতে, পোস্টকার্ডের আলোকচিত্রী যে মুহূর্ত হতে আলজিরীয় নারীর মতন একটি থিম বাছাই করেন, সেই মুহূর্ত হতে কেবলমাত্র প্রতিরূপ (মডেল) এবং প্রতিমূর্তিকে (স্টুডিও এবং অপরাপর আসবাবপত্র, সরঞ্জামাদি) ঘিরে হয় তার কারবার। তার অর্থ হলো, ছবি তোলার পূর্বে আলোকচিত্রীর সেটিকে কম্পোজ করতে হবে। এবং সেটি, তার করতে হবে বাস্তবিক অর্থে, স্টুডিওতে। সেটিকে তার মঞ্চস্থ করতে হবে। রঙ্গমঞ্চ তৈরী এবং এধরনের একটি প্রডাক্ট তৈরী আলোকচিত্রীর কাজকে পর্যুদস্ত করে, যেহেতু তার উৎপাদন হচ্ছে এমন একটি দৃশ্যের পুনর্মুদ্রণ যেটি সাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লুলা বলেন, নিশ্চয়ই পোস্টকার্ডের রচয়িতা হিসেবে আলোকচিত্রী এই সত্যের মুখোমুখি হ'ন যে, তিনি প্রক্সি হয়ে, অন্যের হয়ে, তার ফ্যান্টাসি যাপন করেন। তাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব তার খদ্দেরদের; তারা অচেনা-অজানা, সংখ্যায় অগুণতি। চূড়ান্ত অর্থে, অপরকে আনন্দ দান করা ছাড়া তার আর অন্য কোন পথ নেই। এই আনন্দের উদ্রেককারী তিনি, এই আনন্দ বজায়কারী

তিনি। তার ভূমিকা হচ্ছে মধ্যস্থতাকারীর, তার ভূমিকা হচ্ছে দালালের। হারেমের পর্দা উঠানোর পর, আলোকচিত্রী খোলাখুলিভাবে নিশ্চিন্ত মনে সেখানে ঘুরে বেড়ান, অবকাশপূর্ণ ঢং-এ অবিবেচকের দৃষ্টিতে তিনি আড়াল-করে রাখা জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন। যদিও আলোকচিত্রী হারেমে অনুপ্রবেশ করেছেন, প্রতীকীভাবে হারেমে থাকতে হবে বন্ধ, আবদ্ধ। ফ্যান্টাসির স্বার্থে, কারণ সর্বসাধারণের হারেম অকল্পনীয়।

এভাবে প্রাচ্যবাদে শরিক হয় আলোকচিত্র শিল্প। পোস্টকার্ডের সুবিধা হচ্ছে, এটি গরীব মানুষের ফ্যান্টাসি। কয়েক পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যায়, এবং সর্বত্র। এটি আবৃত করে পুরো ঔপনিবেশিক পরিসর। পর্যটক, সৈনিক, ঔপনিবেশিক – পোস্টকার্ড একই সাথে এদের কবিতা এবং বিজয়-গৌরব। এটি উপনিবেশের কপট-জ্ঞান। আল্লুলা বলেন, উদ্ভট পোস্টকার্ড এবং ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ড একই জিনিস নয়। উদ্ভট পোস্টকার্ড যখন হিংস্রতার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হয় তখন জন্ম লাভ করে ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ড। ঔপনিবেশিকতা হচ্ছে উদ্ভটতাবাদ এবং হিংস্রতার সম্মিলন। দ্বিতীয় ধরনের পোস্টকার্ডটি ঔপনিবেশিক হিংস্রতায় শরীকী। এটি বৃদ্ধি করে হিংস্রতার ফলশ্রুতি; আবার এটি সেই হিংস্রতার প্রকাশিত রূপও বটে। প্রতীকী হিংস্রতার অপর একটি দিক হচ্ছে সেটি, যেটি ব্যক্তিদের উপর সংগঠিত, পোস্টকার্ড যাদের করে তুলেছে আদর্শ ও অনুকরণীয়। মডেলকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে আলোকচিত্রী নিজকে মুক্ত করেন এই দায়ভার থেকে। আল্লুলা বলেন, পোস্টকার্ডের হিংস্রতা প্রতীকী কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এ কারণে এর কার্যকারিতা কোন অংশে কম।

নারী দেহের প্রতি আসক্তির কারণে এই দেহটিকে পোস্টকার্ডে রঙ করা হয়। এটিকে তৈরী করা হয়। এটিকে করা হয় কামনাময়ী। যাতে দেহটি যে কোন বা সকল খদ্দেরের, যারা দ্ব্যর্থহীনভাবে দখলে আগ্রহী, তাদের প্রতি উৎসর্গকৃত হতে পারে। এটি যথেষ্ট নয় যে, ঔপনিবেশিক পোস্টকার্ড হচ্ছে হাটে-বাজারে খদ্দের যোগাড় করার হট্টগোলি ঢঙ; এটির হতে হবে প্রতীকী বে-দখলের চতুর প্রকাশরূপ। মডেল, তার দেহের ইমেজ বিক্রী করে (পারিশ্রমিকের মাধ্যমে বে-দখল), একইসঙ্গে বিক্রী করেন, দৃষ্টান্তের গুণপনায়, সামগ্রিকভাবে আলজিরীয় নারী দেহের ইমেজ (সম্প্রসারিত বে-দখল)।

আল্লুলা মনে করেন, আলজিরীয় নারীর ঔপনিবেশিক পরিবেশনের মধ্যে ফ্যান্টাসির অনুসন্ধান করতে হলে দুটি কাজ করা জরুরি: একটি হচ্ছে, ঔপনিবেশিক দৃষ্টির প্রকৃতি এবং অর্থ উদ্ধার; অপরটি হচ্ছে, নারী দেহের সঙ্গে যে গৎবাঁধা ধারণা আঁঠার মতো লেগে আছে, সেটিকে উল্টে দেয়া। আল্লুলা বলেন, উপনিবেশিতের দৃষ্টিতে উপনিবেশকারী কেমন, তার কোন আলোকচিত্রীয় চিহ্ন যদি পাওয়া যেত তাহলে তার এই কাজটির প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু বিরুদ্ধ দৃষ্টির সংঘাত অনুপস্থিত। সেকারণে তিনি, যিনি ইতিহাসের বহু-পিছনে পড়ে গেছেন, এই বিশাল পোস্টকার্ডটি (অর্থাৎ, বইটি) ফেরৎ পাঠাচ্ছেন। এর প্রেরকের কাছে। আল্লুলা বলেন, আমরা, আলজিরীয়রা বিশ্বাস করি অশুভ দৃষ্টি অকল্যাণ বয়ে আনে। হাতকে পাখার মতন প্রসারিত করে আমরা অশুভ দৃষ্টি ডেকে আনি। ফরাসী ঔপনিবেশিকদের অশুভ দৃষ্টি তাড়ানোর জন্য আমি হাতকে কলমের উপর বন্ধ করছি। আমার লেখা এই বইটি হচ্ছে ভূত ঝাড়ার প্রচেষ্টা।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

এডোয়ার্ড সাঈদ

অজ্ঞতার সংঘাত

তরজমা: আমীনুর রহমান

স্যামুয়েল হান্টিংটনের হালবাজারে হালে পানি পাওয়া 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের উপযুক্ত পর্যালোচনা করেছেন এডোয়ার্ড সাঈদ তাঁর এই লেখায়। এই লেখাটা ২১শে অক্টোবর ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *দ্য নেশন* পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশের *প্রথম আলো* পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় ৭ই ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে। এখানে আমরা *প্রথম আলো*-র পাঠ পুনর্মুদ্রিত করছি।

১৯৯৩ সালের গ্রীষ্ম সংখ্যায় স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত: দি ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন্স্?' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয় *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* পত্রিকায়। লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা বিপুলসংখ্যক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে: লেখাটি সম্পর্কে নানা জায়গায় আলোচনা হতে থাকে এবং অনেকে লেখাটি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেন। লেখাটি যে কারণে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা হলো, ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্ব রাজনীতির একটি 'নতুন অধ্যায়' সম্পর্কে লেখক আমেরিকানদের সামনে একটি মৌলিক চিন্তা উপস্থাপন করেছিলেন ওই লেখায়। হান্টিংটন লেখাটিতে তাঁর চিন্তা বেশ বিশদভাবে, সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে দূরদর্শিতা তো ছিলই। সেখানে তিনি নীতিনির্ধারক, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার মতো তাত্ত্বিক– যিনি 'ইতিহাসের সমাপ্তি' এন্ড অফ হিস্টরি ধারণার জন্য খ্যাতিমান– কিংবা রাষ্ট্রের ডিসিপেইশন তত্ত্ব নিয়ে মাতামাতি করেন তাঁদেরকে একহাত নিয়েছেন লেখাটির মাধ্যমে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, হান্টিংটন তাঁর সকল প্রতিপক্ষকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন বর্তমান কালের কয়েকটি মাত্র সত্য সূত্র দিয়ে। তিনি ওই লেখায় সোচ্চারভাবে ঘোষণা করে ফেলেছেন যে, 'কঠিন কিন্তু কেন্দ্রীয় বিষয়' যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 'বিশ্ব রাজনীতি প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে' তা হলো:

> এটা আমার বিশ্বাস যে, নতুন এই পৃথিবীতে আগামী সংঘাতগুলো আদর্শ বা অর্থনীতির জন্য হবে না, হবে সাংস্কৃতিক। মানুষে-মানুষে পার্থক্য এবং সংঘাতের প্রধান কারণ হবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা। জাতীয় রাষ্ট্রগুলো হয়তো আগামীতেও শক্তিশালী ভূমিকায় অবিচল থাকবে কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারী জাতিতে-জাতিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সংঘাত সৃষ্টি হবে। আগামীতে সভ্যতার এই সংঘাতই বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাধান্য পাবে। বিভিন্ন সভ্যতার পারস্পারিক পার্থক্যের রেখাগুলোই হবে আগামী যুদ্ধরেখা।

হান্টিংটনের পুরো লেখাটি 'মানবসভ্যতার পরিচয়' সূচক সাত বা আটটি প্রধান ধারার ওপর ভিত্তি করে রচিত, যদিও সেগুলো তিনি পরিচ্ছন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। তিনি বলেছেন, সাত বা আটটি প্রধান সভ্যতার ধারক মানবগোষ্ঠীর মধ্যকার পারস্পরিক 'আদান-প্রদান' বা পার্থক্যের ভিত্তিতেই ঘটবে আগামী দিনের সকল সংঘাত। তবে ওই সাত বা আটটির মধ্যকার দুটো সভ্যতা, ইসলাম এবং পাশ্চাত্য হচ্ছে তাঁর আলোচনার কেন্দ্র। হান্টিংটন তাঁর যুদ্ধংদেহী ধরনের থিসিস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধানত নির্ভর করেছেন ১৯৯০ সালে লেখা বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বার্নাড লুইসের একটি প্রবন্ধের ওপর। লুইসের লেখার শিরোনাম থেকেই তাঁর প্রত্যয় ও প্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে: লেখাটির শিরোনাম হচ্ছে 'মুসলমানদের ক্রোধের কারণ'। দুটো লেখাতেই, হান্টিংটন এবং লুইসের, যেভাবে 'পাশ্চাত্য' এবং 'ইসলাম' অভিধা দুটো অবহেলার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়েছে তাতে যে-কারো কাছে মনে হতে পারে জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতির মতো বিরাট ও ব্যাপক দুটো বিষয় আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়: ওগুলো কার্টুন জগতের চরিত্রগুলোর মতোই সহজলভ্য। যে জগতে দেখা যায় পাপাই আর ব্লুটো দুজন দুজনকে নির্দয়ভাবে প্রহার করছে, কিন্তু একজন অযৌক্তিকভাবেই সবসময়ই তার শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে হান্টিংটন এবং লুইস কারোরই প্রতিটি সভ্যতার অভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতি কিংবা বৈচিত্র্য সম্পর্কে ব্যয় করার মতো সময় নেই। সময় নেই আধুনিককালে সংস্কৃতিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় কিংবা তাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় সে ব্যাপারে মনোযোগ দেবার। উন্নাসিকতা বা অবজ্ঞা নিয়ে যে কোনো সম্পূর্ণ ধর্ম বা সভ্যতা সম্পর্কে চটজলদি মন্তব্য না করার মতো সৌজন্য দেখানোরও তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁরা ভুলে গেছেন, পাশ্চাত্য সবসময়ই পাশ্চাত্য আর ইসলাম সবসময়ই ইসলাম, এমন নয়। পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, যেমনটি বলেছেন হান্টিংটন, পাশ্চাত্য যেন সবসময়ই অন্যদের থেকে শক্তিমান থাকে এবং অন্যদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, বিশেষত ইসলাম থেকে, সেটা নিশ্চিত করা। হান্টিংটনের ধারণার আরেকটি বড় ভ্রান্তি হচ্ছে তিনি সমগ্র পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন একটি অবস্থান থেকে যাতে করে, তাঁর চিন্তায় কোনোভাবেই মূল্যবান হয়ে ওঠে নি সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের গভীরতর বিশ্বাস। তাঁর বিশ্বাস, তিনি যেভাবে দ্রুত একটি ধারণায় পৌঁছেছেন, সকলেই ততোধিক দ্রুততায় একটি উত্তর পেতে আগ্রহী। আসলে হান্টিংটন হচ্ছেন এমন এক ধাঁচের মানুষ যাঁরা 'সভ্যতা' এবং 'জাতিসত্তা'র মতো বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা বা জাতিসত্তাকে ধারণ করতে পারে না। এঁরা রুদ্ধ করে দেন, মোহর মেরে দেন সেই গতি ও স্বাতন্ত্র্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে, যা রচনা করেছে মানবেতিহাস এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী সম্ভবপর করে তুলেছে, ইতিহাসকে রক্ষা করেছে কেবল ধর্মের নামে যুদ্ধের বা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের দিনপঞ্জি রচনা থেকে। প্রকৃত ইতিহাস রচনা করে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া, নানা সৃষ্টিশীলতা এবং অংশগ্রহণের প্রমাণপঞ্জি। ইতিহাসের এই দূরবর্তী কিন্তু মূল্যবান উপাদান সবসময়ই অবহেলার শিকার হয়েছে: কারণ যুদ্ধের অনুপুঙ্খ বিবরণ রচনায় ইতিহাসবিদেরা যত উৎসাহী, মানবসমাজের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণে তাঁরা ততটাই অনুৎসাহী। আর যুদ্ধক্রিয়ার বিবরণ রচনার ওই উৎসাহই বর্তমানকালের চিন্তনক্রিয়ায় রূপ নিয়েছে 'সভ্যতার সংঘাত' নামে। ১৯৯৬ সালে হান্টিংটন এই একই শিরোনামে যখন তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন তাঁর বক্তব্যের যথার্থ্য প্রমাণের জন্য তিনি প্রচুর পরিমাণে পাদটীকা সন্নিবেশ করেন কিন্তু তাতে আরো বেশি করে এটাই প্রমাণিত হয়েছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে ণ-ত্ব ষ-ত্ব জ্ঞানহীন একজন অপরিপক্ব লেখক, যাঁর চিন্তার কোনো পরিচ্ছন্নতা নেই।

পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম (ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হয়ে যাবার পর নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রতিপক্ষ) এই মৌলিক প্যারাডাইমটি কিছুদিন আগেও তেমন জনপ্রকাশ্যে, জোরেশোরে উচ্চারিত হয় নি: ভেতরে ভেতরে ছিল– সন্তর্পণে ও সংগোপনে: কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত ও সংঘটিত, হয়তো পার্থিব ও অপার্থিব কোনো প্রাপ্তির লোভে উদ্বুদ্ধ আত্মঘাতী বোমা হামলার মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র, সুস্থ চিন্তারহিত জঙ্গি গোষ্ঠীর তৎপরতা প্রকারান্তরে হান্টিংটনের প্রতিপাদ্যকেই প্রমাণ করেছে। ঘটনাটিকে কতিপয় উন্মাদপ্রায় লোকের কৃত অপরাধ হিসেবে না দেখে, একে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোকেরা যেভাবে ইসলামের সমস্যা হিসেবে দেখছেন– সেভাবে দেখলে প্রকাশিত হবে অন্য সত্য ও তাৎপর্য। এখানে আমি সেই সব বিখ্যাত লোকদের কথা বলছি, যাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকোনিও রয়েছেন। বার্লুসকোনির সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যে হান্টিংটন কথিত পাশ্চাত্যের 'সুপিরিয়রিটি'র ধারণাটিই প্রতিফলিত হয়েছে। বার্লুসকোনি মন্তব্য করেছেন 'আমাদের' মোজার্ট আর মিকেলেঞ্জেলো রয়েছে কিন্তু 'তাদের' তেমন কেউ নেই ('ইসলামকে অসম্মান করায় বার্লুসকোনি অবশ্য যেনতেনভাবে এ কথার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন)।

কিন্তু পাশ্চাত্য এবং ইসলাম– এ বিষয় দুটোকে কেন আলাদা করে দেখা হয়? কেন ভাবা হয় না এতে করে সংঘাত ক্রমশ বাড়বে বই কমবে না? কেন ওসামা বিন লাদেন এবং তাঁর অনুসারীদের এমন একটি সম্প্রদায় হিসেবে দেখা হয় না যেমন দেখা হয় গায়ানার রেভারেন্ড জিম জোন্স কিংবা জাপানের ওম শিনরিকিও এবং তাঁদের অনুসারীদের? এমন কি ভদ্র-দুরস্ত বলে খ্যাত যে ব্রিটিশ সাপ্তাহিক *দি ইকনমিস্ট* তারাও ২২-২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সব কিছুকে এক পাল্লায় ওজন করতে দ্বিধা করে নি। হান্টিংটন ইসলামকে যেভাবে 'নিষ্ঠুর এবং মারাত্মক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তারাও একই সুরে সুর মিলিয়েছে। জার্নালটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে হান্টিংটনের ভাষ্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছে এভাবে, 'আজ পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান তাঁদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করেন: কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন।' তাঁরা কি এ কথা বলার আগে ১০০ জন ইন্দোনেশিয়ান, ২০০ জন মরোক্কান, ৫০০ জন মিশরীয় এবং ৫০ জন বসনীয় মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের বক্তব্য? আর করে থাকলে আমাদের জানতে ইচ্ছা হয় গবেষণার ক্ষেত্রে এটা কোন ধরনের নমুনায়নের নিদর্শন?

সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের পর আমেরিকা এবং য়্যুরোপের অসংখ্য পত্রপত্রিকায় যেসব সম্পাদকীয় ও মন্তব্য প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে তাতে মূল সুরের কোনো পার্থক্য নেই। ওই সকল পত্রপত্রিকার একটিই মোদ্দাকথা ছিল, আর তা পাঠকের ক্রোধকে প্রশমিত করার পরিবর্তে তাতে ঘৃতাহুতিই প্রদান করেছে। তাঁরা সকলেই 'পশ্চিম'-এর একজন সদস্য হিসেবে কাজটা করেছে এবং নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। চার্চিলীয় রেটরিকের ভ্রান্ত প্রয়োগ ঘটিয়ে নিজেরাই পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ তৈরি করে, বিশেষত আমেরিকার প্রতিপক্ষ তৈরি করে, যুদ্ধ শুরু করা হলো। যুদ্ধ শুরু করা হলো আমেরিকার ঘৃণাকারী, বিনষ্টকারী এবং ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর আগে একবারও চিন্তা করা হলো না, ইতিহাসের সেই শিক্ষাকে, যা এ ধরনের হঠকারী কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। কারণ এ ধরনের কাজের ফলে দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, সীমা থেকে অসীমে ছড়িয়ে পড়ে সেই সর্বপ্লাবী ঘৃণা, যা কেবল আমাদেরকে ক্রমশ বিভক্ত করে অসংখ্য অস্ত্রের আবাসে।

অজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে পাশ্চাত্য এবং ইসলাম সম্পর্কে মার্কা এঁটে দেওয়ার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ওই এঁটে দেওয়া তকমা মনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে। আর এমন

সব বিভ্রান্ত বিষয়কে সত্য হিসেবে আমাদের সামনে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় যে যথার্থ সত্যের উপলব্ধি আমাদের হয় না। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ১৯৯৪ সালের একটি ঘটনার কথা। ওয়েস্ট ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দেবার পর দর্শকসারি থেকে একজন লোক দাঁড়িয়ে 'পাশ্চাত্য' সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে আক্রমণ করতে শুরু করল। যেমনভাবে গোঁড়া ইসলামপন্থীরা পাশ্চাত্যকে আক্রমণ করে তেমনি। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করলাম এক পর্যায়ে সে রাগত স্বরে বলল, 'তাহলে আপনি স্যুট টাই পরেছেন কেন, ওগুলো তো পশ্চিমাদের?' কথাটা বলেই সে বসে পড়ল। তখন তার সারা মুখে ছড়িয়ে আছে বিব্রতকর হাসি। ১৯৯৪ সালের ওই ঘটনার কথা আমার মনে পড়ল যখন আমি ১১ তারিখের খবর পেতে শুরু করি। পোশাকের মধ্যে যারা পশ্চিমা গন্ধ পেয়ে তাকে বর্জন করতে চায় তারা কীভাবে সূক্ষ্মতার সঙ্গে সকল রকম যান্ত্রিক বিষয় সম্পন্ন করল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বা পেন্টাগনে আত্মঘাতী বোমা হামলার জন্য! এখানে 'পশ্চিমা' টেকনোলজি এবং বার্লুসকোনি ইসলামের 'আধুনিক' হওয়ার ক্ষেত্রে যে অন্তরায় নির্দেশ করেছিলেন তার মধ্যে কীভাবে আপনারা বিভাজন করবেন?

কারো পক্ষেই এত সহজে বিভাজন করা সম্ভব নয়। ফলে চূড়ান্তভাবে 'পাশ্চাত্য' বা 'ইসলাম'– জাতীয় তকমাগুলো এবং তাদেরকে সাধারণীকরণ করা কিংবা 'আমাদের' সংস্কৃতি 'অন্যদের' থেকে উন্নততর এ ধরনের ধারণা পোষণ করা যে কতটা মূল্যহীন তা সহজেই বোঝা যায়। 'পাশ্চত্য' বা 'ইসলাম' এ ধরনের বিভাজন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কেবল বিভেদের দেয়ালই সৃষ্টি করা হয় না, বরং জাতিসত্তা এবং জাতীয়তার মধ্যে কেবল সীমাহীন বিতর্ক এবং অমোচ্য পার্থক্যই সৃষ্টি করা হয়। মরুভূমির বালিতে একটি রেখা এঁকে ক্রুসেড শুরু করা যায়, বলা যায় তাদের মিথ্যাকে আমরা সত্য দিয়ে প্রতিহত করছি কিন্তু তাতে মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না: জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের সূচকগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না। পল উলফোউইজ নেতির সুরে যেভাবে জাতিসত্তার স্মারকগুলোকে মুছে ফেলার কথা বলেছিলেন, কিংবা প্রচলিত নিয়মে জাতীয়তার সামগ্রিক আবেগগুলোকে যেভাবে পরীক্ষা, শ্রেণীকরণ বা বিবেচনা করা হয় তাতে 'আমাদের' এবং 'তাদের' মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্যগুলোকেই কেবল জিইয়ে রাখে, কোনো মীমাংসায় পৌঁছে দেয় না।

পাকিস্তানের সবচেয়ে নামকরা পত্রিকা ডন-এর ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি ও মার্চের মধ্যে তিন সংখ্যায় মরহুম ইকবাল আহমেদের তিনটি মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়। ইকবাল আহমেদ মূলত মুসলমান পাঠকদের উদ্দেশ্য করে তাঁর লেখাটি লিখেছিলেন: ধর্মীয় অধিকারের প্রকৃতি অনুসন্ধান এবং তাকে বিশ্লেষণ করাই ছিল তাঁর লেখার প্রতিপাদ্য। লেখাটিতে তিনি দেখিয়েছিলেন সম্পূর্ণ একটি ধর্মের অঙ্গহানি করে তাকে জঙ্গি বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ফলে কী ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মধ্যে লেখাটি তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি দেখিয়েছেন, 'ইসলামকে ব্যক্তির অধিকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যেভাবে সামাজিক অপরাধ হ্রাস, মানবতাবোধ সৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ বা বৌদ্ধিক বিকাশে'র কথা বলা হয় তা কতটা অকার্যকর। এতে করে বরং ধর্মের সামগ্রিক বোধকে ক্ষুণ্ন করা হয়, ঐতিহ্যের অধপতন ঘটানো হয় এবং রাজনীতিতে তালগোল পাকিয়ে তোলা হয়। এই অধপতনের জলজ্যান্ত উদাহরণ দিতে গিয়ে আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং বহুস্তরবিশিষ্ট একটি শব্দ 'জিহাদ'কে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আজকের দুনিয়ায় বাছ-বিচারহীনভাবে মুসলমানদের ওপর যে আক্রমণ করা হচ্ছে, তাতে করে 'ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, তার সংস্কৃতি, সমাজ কিংবা রাজনীতি কোনোটিকেই অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এমনকি মুসলমানেরাও বহুকাল যাবৎ যেভাবে ইসলামের মধ্যে

বসবাস করছে বা ইসলামকে যেভাবে যাপন করছে তার মধ্যেও প্রকৃত ইসলাম খুব কমই ছিল।' আধুনিককালের ইসলামের সম্পর্ক হচ্ছে ক্ষমতার সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে নয়: জনগণকে বর্তমানে ভাগ করে নেওয়া বা প্রত্যাশাগুলোকে পূরণ করার জন্য নয়। বরং উদ্বুদ্ধকারীদের থাকে স্বল্পসময়ে পূরণযোগ্য কোনো রাজনীতিক এজেন্ডা। এ অবস্থাকে যা আরো বেশি অসহনীয় করে তুলেছে তা হচ্ছে ইসলামের মতো একই বিকৃতি, ধর্মান্ধতা দেখা দিচ্ছে 'ইহুদি' ও 'খ্রিস্টান' বিশ্বের চিন্তাচেতনায়।

জোসেফ কনরাড উনিশ শতকের শেষে তাঁর পাঠকের চেয়ে অনেক বেশি প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির সাহায্যে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সভ্য লন্ডন এবং 'হার্ট অব দ্যা ডার্কনেস' এর মধ্যে চূড়ান্ত বিবেচনায় কোনো পার্থক্যই নেই। কারণ য়্যুরোপীয় সভ্যতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তও মুহূর্তের মধ্যে আবিল হয়ে উঠতে পারে। কনরাড তাঁর অন্য একটি উপন্যাস *স্যাকরেড এজেন্ট (১৯০৭)*-এ দেখিয়েছেন যে, সন্ত্রাসবাদের প্রধান আগ্রহ হচ্ছে 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান' নিষ্কাষণ আর সন্ত্রাসীর নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করা।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা যতটা ভাবতে অভ্যস্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি নৈকট্য আছে বিবদমান সভ্যতাগুলোর মধ্যে। ফ্রয়েড এবং নিটশে দুজনেই দেখিয়েছেন আমাদের ভেতরকার অনুভূতিগুলোর বাইরের কোনো চাপ না থাকলে কত স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে পারে। কিন্তু যখনই সেগুলো ভীতি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই তা বিচলিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে আমরা যে ধরনের সময়ের মধ্যে বসবাস করছি তাতে রয়েছে প্রচুর স্ববিরোধ এবং সংশয়। ফলে মানুষের মন একটি আদর্শ পরিবেশে যে ধরনের আচরণ করে, আমরা তার থেকে বর্তমানে অনেক দূরে অবস্থান করছি। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে যুদ্ধের ক্রমধারায় (ক্রুসেড, ভালো বনাম মন্দ, ভীতি ও মুক্তি ইত্যাদি) হান্টিংটন ইসলামকে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন এবং যে প্রতিপক্ষের প্রকাশ দেখা গেল ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায়। ওই দিনের ঘটনার পর হান্টিংটনের ডিসকোর্সের অবদমন ঘটেছে কিন্তু তার উপস্থিতি রয়ে গেছে পরস্পরের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া ঘৃণামিশ্রিত বাক্যাবলি ও কর্মের মাধ্যমে। যার অনিবার্য প্রতিফল হিসেবে আমেরিকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো প্রতিপক্ষ করে তুলেছে আরবদের, মুসলমানদের, ভারতীয়দের। ফলে ডিসকোর্সের অবনমন ঘটলেও প্যারাডাইমটি এখনো উন্মুক্ত।

মুসলমানদের এভাবে প্রতিপক্ষ করে তোলার আরেকটি কারণ হচ্ছে য়্যুরোপ এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ব্যাপক হারে মুসলিম উপস্থিতি। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, স্পেন, ব্রিটেন, আমেরিকা এমনকি সুইডেনের জনসংখ্যার হার বিশ্লেষণ করলে দেখবেন ইসলাম এখন কেবল পশ্চিমের নাকের ডগায় নয়, একেবারে বুকের ভেতর ঠাঁই নিয়েছে। কিন্তু এতে ভয় পাবার কী আছে, আমি বুঝি না! সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে আরব-ইসলামিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরের বেলাভূমিতে চিরদিনের মতো খ্রিস্টান-রোমান মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতির পতন ঘটেছে। আর সেখানে ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করেছে উত্তর য়্যুরোপের (জার্মানি ও ক্যারোলিংগিয়ান ফ্রান্স) সাংস্কৃতিক ধারা। আর এই নতুন সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঐতিহাসিক শত্রুদের হাত থেকে 'পাশ্চাত্য'কে রক্ষা করা। বেলজিয়ামের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরি পিরেনি যার ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁর Mohammed and Charlemagne (১৯৩৯) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পিরেনি পশ্চিমের আত্মরক্ষার যে রেখা অঙ্কন করলেন তা আরোপিত হয়ে গেল আমাদের মানবতার চর্চায়, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান এমনকি ইসলামের ইতিহাসতত্ত্বের চর্চায়ও। আর পিরেনি-অঙ্কিত বিভেদ রেখা এখন Charlemagne-এর পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যের ধারা থেকে। কিন্তু ইসলাম কখনো

য়্যুরোপের বাইরে ছিল না, সবসময়ই ভেতরে ছিল এবং সবসময়ই শত্রু হিসেবেই ছিল। আর এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়, দান্তে যখন তাঁর সৃষ্ট নরককুণ্ডের কেন্দ্রে মোহাম্মদকে অবস্থান দেন, তখনই।

এরপর যা থাকে তা হচ্ছে একেশ্বরবাদী ধর্মের– চার্লস মেসিগনন যাকে ইব্রাহিমের থেকে উদ্ভূত ধর্ম বলেছেন– পারস্পরিক সংঘাতের উত্তরাধিকার। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের যাত্রা থেকে শুরু করে প্রতিটি ধর্মই পূর্ববর্তী ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কেবল মুসলমানদের বেলাতেই পরবর্তী কাউকে আক্রমণ করার সুযোগ ঘটেনি, কারণ সেখানেই নবুয়তের সমাপ্তি ঘটেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই তিন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যকার পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিষয় নিয়ে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি, হলে ভালো হতো। যে তিনটি ধর্মের কথা আমরা বললাম, সেগুলো আবার নানা মজহাবে বিভক্ত। এই পার্থক্যের বিষয়টি পরিচ্ছন্ন হবে যদি আমরা প্যালেস্টাইনের দিকে তাকাই। দেশটির মুক্তির ব্যাপারে সকল গোষ্ঠীর সদিচ্ছা থাকলেও তারা তাদের মজহাব ভুলে গিয়ে একটি জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারছে না। এজন্য মুসলমান ও খ্রিস্টানেরা প্রায়ই যে জিহাদ ও ক্রুসেডের কথা বলে তার কারণ অবচেতন মন থেকে এখনো তাঁরা ইহুদিবাদের আক্রমণের স্মৃতিকে বিস্মৃত হতে পারেনি। এ কথাটিই ইকবাল আহমেদ তাঁর লেখায় জোর দিয়ে বলেছেন এভাবে: 'এ রকম একটি পরিস্থিতিতে অসংখ্য নরনারী ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে এমন একটি তটরেখায়, যার একদিকে ঐতিহ্যের গভীর জলধি আর অন্যদিকে আধুনিকতা।'

আমরা আসলে সবাই ওই জলেই সাঁতার কাটছি– পাশ্চাত্য, মুসলমান এবং তাঁদের মতো অন্য সবাই। কিন্তু ওই জলরাশি যেহেতু বিশাল সমুদ্রেরই একটি অংশ ফলে তাকে কর্ষণ করা বা বিচ্ছিন্ন করে তোলা পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর। এখন আমরা এমন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি যেখানে সামান্য জ্ঞান ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সম্প্রদায়গুলোকে শক্তিমান ও শক্তিহীন, সেক্যুলার রাজনীতির যুক্তি ও অজ্ঞতা দিয়ে, ন্যায়-অন্যায়ের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি দিয়ে মানব সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছি। এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা স্বল্পস্থায়ী প্রশান্তি প্রদান করবে, চিরস্থায়ী নয়। 'সভ্যতার সংঘাত' শব্দবন্ধ আসলে 'পৃথিবীর লড়াই' (দি ওয়ার অফ ওয়ার্ল্ড) শব্দগুচ্ছের মতোই তাৎপর্যহীন এক ধাঁধা, যার সাহায্যে কেবল আত্মরক্ষার অহমিকাকেই নতুন করে চাগিয়ে তোলা হয়েছে। অথচ এখন প্রয়োজন আত্মসমালোচনামূলক এমন এক সুস্থ বোধ, যা আমাদের বহুজটিল এবং পরস্পর নির্ভরশীল সময়কে বুঝতে সাহায্য করবে, আমাদেরকে আরো বিচ্ছিন্ন করবে না।

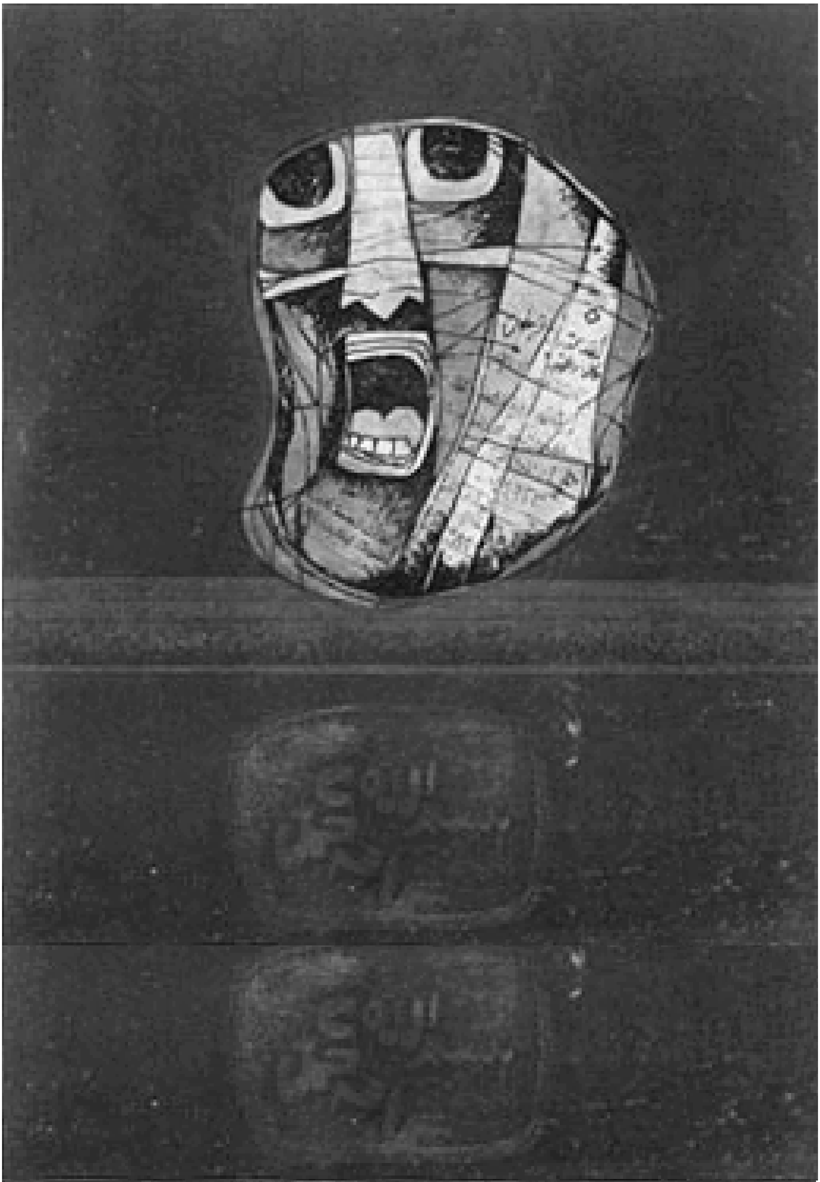

প্রচারণা, পুঁজিবাদ, যুদ্ধ

আ-আল মামুন

মক্কেল রাষ্ট্রের একটি সংবাদপত্রে মার্কিন ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’

মানুষ এর কাজ করার বেলায় আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণাপ্রণালীকে ব্যক্তিগতভাবে পরখ করা, মোকাবেলা করা। এই প্রচারণাসিস্টেমের কাঠামোগত দিকগুলা বিচার করলে বোঝা যায়, সারা দুনিয়ার সংবাদ- ও সংবাদপত্র-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা প্রচারণার সম্প্রসারণ-মাত্র। আমাদের মতো দেশগুলার যাবতীয় ‘আন্তর্জাতিক’ তথ্যসংবাদ ইত্যাদির উৎস হচ্ছে পশ্চিমা বৃহৎ কিছু সংবাদ-এজেন্সি। এবারে আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন হামলাকে আমাদের সংবাদপত্রগুলা কীভাবে পরিবেশন করে তা বিচার করে দেখার যে সুযোগ ছিল আ-আল মামুন সেটা করেছেন। পরিষ্কার দেখা গেল, *প্রথম আলো*-র মতো পত্রিকা অবলীলাক্রমে পশ্চিমা সংবাদ-চশমা চোখে দিয়ে বিশ্বপরিস্থিতিকে পাঠ করছেন। বোঝা গেল, প্রায় পাশের দেশে একটা ভয়াবহ অন্যায্য সন্ত্রাসী আগ্রাসন চলার মতো ঘটনাও বাজারমুখী সংবাদপত্রের বাণিজ্যিক রুটিনের বাইরে বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার স্নায়ুকেন্দ্র পেন্টাগন এবং কর্পোরেট-স্বার্থসংরক্ষণমূলক বিশ্বায়নের চাকা বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে পরিচালিত হামলা নিঃসন্দেহে পশ্চিমা অহংকারে আঘাত হানার মতো কয়েক শতকের মধ্যে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ঘটনা। সাড়া জাগানো ঘটনা বলছি একারণে যে, নোম চমস্কির ভাষায় বলতে হয়, “এই প্রথমবার বন্দুকের নল উল্টোদিকে ঘুরেছে। এটা নাটকীয় এক পরিবর্তন” (দেখুন: “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে নোম চমস্কি,” মাসিক *সংস্কৃতি*, জানুয়ারি ২০০২)। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যেমন তাদের পদানত ‘নেটিভদের’ দ্বারা কয়েকটি দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া কখনো আক্রান্ত হয় নি তেমনি বর্তমান বিশ্বে পাগলা ষাঁড়ের মতো ঢুঁষিয়ে বেড়ানো মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর আগে নিজ ভূখণ্ডে অন্য কারো দ্বারা আক্রান্ত হয় নি; যদিও গত অর্ধ শতকে বিশ্বজুড়ে মার্কিন আক্রমণ-আধিপত্যের বলির সংখ্যা অপরিমেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই হামলার কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করার চেষ্টা করে নি, চেষ্টা করে নি আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নিয়ে অপরাধীদের শনাক্ত ও বিচারের। সন্ত্রাস মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নেয়ার দৃষ্টান্ত কিন্তু

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

আমাদের সামনে আছে। নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে রিগ্যান-মার্কিনি যুদ্ধ দেশটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। নিকারাগুয়া এর জবাব দিয়েছিল। তারা ওয়াশিংটনে বোমা ফেলার মাধ্যমে জবাব দেয় নি বরং জবাব দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে– আন্তর্জাতিক বিচারালয়, বিশ্ব আদালত ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিল। বিশ্ব আদালত নিকারাগুয়ার পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'বেআইনীভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগের'– যার অর্থ সন্ত্রাসবাদ– জন্য তিরস্কার করেছিল এবং ব্যাপক ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রায় অবজ্ঞার সাথে খারিজ করে দেয়।

> এযাবৎকালের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে-দেশ একই সাথে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্য বিশ্ব আদালত কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করেছে ("সন্ত্রাস কাজে আসে", নোম চমস্কি, **মানুষ**-এর বর্তমান সংখ্যায় সংকলিত)।

অথচ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে এবং নিচ্ছে। *ওয়াশিংটন পোস্ট* দাবী করেছিল, 'ন্যায় অন্যায় জানিনে আমরা চাই প্রতিশোধ' (*প্রথম আলো*, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০১)। এক মুহূর্তও দেরি না করে যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে অভিযুক্ত করেছে। হেইকেলের ভাষায়, "দেশীয় জনগণের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তৎক্ষণাৎ আঘাত করার মতো একটা শত্রুর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের"। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলেছিলেন, লাদেন যদি ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য দায়ী নাও হয় তাতে কিছু এসে যায় না। ইতোমধ্যে সে অনেক অপরাধ করেছে যে-জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ("আফগানিস্তানে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের মিসাইল-তুল্য একটিও লক্ষ্যবস্তু নেই", মোহাম্মাদ হেইকেল, তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত সম্মানিত রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং মিশরের কর্নেল নাসেরের মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, www.znet.org.)। লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার জন্য স্বাধীন স্বার্বভৌম আফগানিস্তানের ওপর ৭ই অক্টোবর ২০০১ থেকে সামরিক হামলা চালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সেখানকার তালেবান সরকারকে উৎখাত করে নিজেদের পছন্দের সরকার বসিয়েছে। অবশ্য যে-লাদেনকে হস্তগত করার অজুহাতে এতো বড় সামরিক অভিযান চালানো হলো সেই লাদেন এখনো মার্কিনিদের নাগালের বাইরে। অথচ কার্পেট বম্বিং-এ আফগানিস্তান গোরস্তানে পরিণত হয়েছে। আসলে লাদেনকে পাকড়াও করার কথা ছিল বাহানা মাত্র, মার্কিন স্বার্থ এর চেয়েও বড়। এজন্যই হয়তো মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড বলেছিলেন, "... সমস্যাটা লাদেনের চেয়ে অনেক বড় এটা পরিষ্কার" (*প্রথম আলো*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১)।

বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলা এবং তার প্রতিশোধ হিসেবে একটি দেশকে বোমা-বর্ষণের মাধ্যমে 'প্রস্তরযুগে পাঠিয়ে দেয়ার' ঘটনা সম্পর্কে আমাদের যে বোধ-ধারণা-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে তা মিডিয়াবাহিত। মিডিয়া কেমন বোধ-ধারণা-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছে, কীভাবে গড়ে তুলেছে এবং কার স্বার্থে মিডিয়া প্রকাশ্যে-গোপনে এমন কাজ করে যায় সেটা বিচার-বিবেচনা করা জরুরি। কারণ, গণঅভিমত নিজ পক্ষে রাখার জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার এক গুরুতর ভয়াবহ খবর আমরা পাই উপসাগরীয় যুদ্ধের পর। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া-স্যান দিয়াগোর অধ্যাপক হার্বার্ট শিলার তার *ম্যাস কমিউনিকেশন্স এন্ড এ্যমেরিকান এম্পায়ার* (ওয়েস্টভিউ প্রেস, পৃ. ১, ১৯৯২) গ্রন্থে জানাচ্ছেন

যে, মার্কিন মুলুকে এবং সারা বিশ্বে উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য ও ভাষ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে একটা মাত্র টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। আর সেই নেটওয়ার্ক হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (সিএনএন)। সিএনএন কেবল দুটি উৎস থেকে– পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউস– তার তথ্য-ভাষ্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিল। অর্থাৎ, উপসাগরীয় অঞ্চলে কী ঘটেছিল এবং তার তাৎপর্য কী প্রায় পুরো বিশ্বব্যপী সে-সম্পর্কিত ধারণা গড়ে উঠেছিল একটি মাত্র মার্কিন সূত্রের মাধ্যমে এবং এভাবেই মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন দেশের সংবাদ-মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সুকৌশলে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে উপসাগরীয় যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবং এই নিবন্ধের আলোচ্য ঘটনাপ্রবাহও ছিল মার্কিন নেতৃত্বাধীন। মার্কিন আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়া 'পোষা কুকুরের মতো' মার্কিন সরকারকে সদাসর্বদা অনুসরণ করে। এই তুলনা চমস্কি ও হারম্যানের (দেখুন তাদের লেখা *ম্যানুফ্যাক্চারিং কনসেন্ট* গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়; ভিন্টেজ, ১৯৯৪)।

হার্বার্ট শিলার তার গ্রন্থে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আরও জানাচ্ছেন যে মার্কিন সাংস্কৃতিক পণ্যের দাপটের কাছে নতি স্বীকার করে নিয়েছে অন্য সকল দেশের সাংস্কৃতিক পণ্য। যেকারণে মার্কিন সাংস্কৃতিক পণ্যে যে মূল্যবোধ-বিশ্বাস-জীবনাচরণ-ঢঙ তুলে ধরা হয় সেই একই ঢঙ অনুকরণ করা হয় অন্য সকল দেশের সাংস্কৃতিক পণ্যের বেলায় (দেখুন, পৃ ১২-১৩)। সংবাদ-মিডিয়ার ক্ষেত্রেও কি একই কথা প্রযোজ্য? আমাদের দেশের সংবাদ-মিডিয়াও কি জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে পশ্চিমা 'প্রচারণা-মাধ্যম' (প্রচারণা-মাধ্যম কেন বলছি সে-ব্যাখ্যা পরে দেব) অনুকরণ করে তাদেরই মূল্যবোধ-বিশ্বাস-দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে? আমাদের সংবাদ-মিডিয়া কি পশ্চিমা এবং দেশীয় কর্পোরেট-স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে?

বাংলাদেশের একটি সংবাদপত্র *প্রথম আলোর* এক মাসের বিষয়বস্তু বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নিবন্ধ তৈরি করা হয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ১১ই অক্টোবর ২০০১ সময়কালের *প্রথম আলোর* প্রতিটি সংখ্যার খবর-মন্তব্যপ্রতিবেদন-সম্পাদকীয়-কলাম এই প্রবন্ধের মসলা হিসেবে কাজ করেছে। *প্রথম আলো*কে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য বেছে নেয়ার কারণ, পত্রিকাটি 'গ্রহণযোগ্য' হয়ে উঠেছে; বাণিজ্যিক সংগঠনগুলোর সাথে 'তারকা জরিপ' ও অন্যান্য আয়োজনের মাধ্যমে *প্রথম আলো* বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর বক্তব্যও সাফল্যের সাথে প্রচার করছে; বিভিন্ন তহবিল গঠনের মাধ্যমে 'দায়িত্বশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে এবং বিভিন্ন আলোচনা-সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে পলিসি পর্যায়েও ভূমিকা রাখছে। *প্রথম আলো* কর্তৃপক্ষের প্রতিদিনের ঘোষণা অনুযায়ী এই পত্রিকাটি 'সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক', যদিও বাংলাদেশের অন্য দৈনিক সংবাপত্রও একই দাবী করে। (তথ্যমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে দেয়া তথ্য অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক হলো *দৈনিক যুগান্তর*; *প্রথম আলোর* অবস্থান দ্বিতীয়, দেখুন, *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৪ই মার্চ ২০০২)। শুধু তাই নয় তাদের একটি প্রমোশনাল বিজ্ঞাপনে হরহামেশাই প্রচার করা হচ্ছে: 'চোখ খুললেই *প্রথম আলো*, চোখ খুলে দেয় *প্রথম আলো*'। আমার প্রস্তাব, আসুন বিচার করে দেখা যাক *প্রথম আলো* পত্রিকাটি আমাদের জগত দেখার চোখ খুলে দেয় না কি আমাদের চোখ ঢেকে নেয়।

কেন মক্কেল রাষ্ট্র?

প্রসঙ্গত বলে নেয়া দরকার এই লেখার শিরোনামে বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মক্কেল রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করার একটা মাজেজা আছে। আমাদের দেশের এমন অবস্থা হয়েছে যে

মার্কিন মোড়লের হুকোয় তামাক সেজে দেয়ার জন্য বিনয়ানুগত্যে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকে। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে যেমন মার্কিন প্রেসক্রিপশন ছাড়া বাংলাদেশ সরকার একপাও এগোয় না তেমনি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোও মার্কিন চোখে দেখতে নিরাপদ বোধ করে। সেকারণেই বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো রকম গণমতের তোয়াক্কা না করে আফগানিস্তানে হামলার প্রয়োজনে আকাশসীমা ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের মার্কিন প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বসে। আধিপত্যশীল রাজনৈতিক দলগুলোও সেইসাথে সুর মেলায়।

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ তার আকাশসীমা ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হয়েছে। ... প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি স্পষ্ট করেই বলেছে, এব্যপারে বাংলাদেশের ইতিবাচক সাড়া দেয়া উচিত (*প্রথম আলো*, ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১)।

বাংলাদেশের পক্ষে হয়তো বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এমন নতজানু অবস্থান নেয়ার কোনো বিকল্পও নেই। বৃহৎ পুঁজিনির্ভর বর্তমান কর্পোরেট 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র কালখণ্ডে বাংলাদেশের মতো একটি প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে মুখ উঁচিয়ে কথা বলা দূরের কথা; মার্কিন প্রভুর তুষ্টির জন্য সবসময় লেজ নাড়তে হয়। করণ, বৈদেশিক লোন আর অনুদান-মুখাপেক্ষিতা। অবশ্য ইসরাইল, পাকিস্তান, সৌদি আরব কিংবা ফিলিপাইন যেমন সাচ্চা মক্কেল রাষ্ট্র বাংলাদেশ অতোটা ঈমানদার মক্কেল এখনও হয়ে ওঠে নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও সজাগ জনগণ এক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে। তবে আর বাকিও নেই। বাংলাদেশের তেল-গ্যাস উত্তোলন ও রপ্তানি বিষয়ে মার্কিনি খবরদারি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

"অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধ, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ"

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী আক্রমণ মোকাবিলায় অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে"। *প্রথম আলোর* ১৩ তারিখের সংখ্যাটি হাতে নিন; দেখবেন প্রথম পাতায় আট কলামব্যাপী এক শিরোনাম "অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধ"। এই শিরোনামের খবরটির শুরু হয়েছে যেভাবে এই অনুচ্ছেদটি শুরু করলাম ঠিক সেইভাবে। কিন্তু কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন "অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধে" জড়িয়ে পড়েছে? কারণ, তাদের ২ গুনন ১১০ তলার অহংকার এবং পঞ্চভূজ সান্ত্রীভবনে হামলা চালানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নিয়ে হামলাকারীদের শনাক্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করলেই তো হয়। সেটাই তো 'সভ্য' সমাজের রীতি যে আক্রান্ত হলে সেই রাষ্ট্র আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারের আশ্রয় নেবে। না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমন সাদামাটা স্বাভাবিক পথে এগোয় না, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার একদিন না যেতেই "অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধে" জড়িয়ে পড়ে।

ক) মার্কিন সরকারের একটা এজেন্ডাকে মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দেয়ার তৎপরতা

মার্কিন প্রশাসন কেবল একা এই "অবিশ্বাস্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে" তা কিন্তু নয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুনের সারথি ছিলেন যেমন কৃষ্ণ তেমনি মার্কিন সরকারের এই "অবিশ্বাস্য যুদ্ধে" সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে মতাদর্শিক যুদ্ধ চালানোর দায়িত্ব নেয় মিডিয়া (সচরাচর এমনটাই দেখা যায় এবং মিডিয়ার এমন দায়িত্বগ্রহণের পর্যাপ্ত বস্তুগত স্বার্থও আছে)। সেকারণেই হামলার পর একদিন পার না হতেই পশ্চিমা আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়ার মতো আমাদের *প্রথম আলোর* প্রথম পাতায় আট কলামব্যাপী শিরোনামে এবং বিষয়বস্তুতে "অবিশ্বাস্য যুদ্ধ" শুরু হয়ে যায়– একটা

এজেন্ডা নির্ধারিত হয়ে যায়।

তারপর চলে মিডিয়ার পাতায় যুদ্ধের মাঠ প্রস্তুতের কাজ, টার্গেট নির্ধারণের কাজ। এবং তারই অংশ হিসেবে এই একই রিপোর্টে বলা হয়

> বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আঘাত করা একটি বিমানের পাঁচজন আরব যাত্রীকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিষয়ে খোঁজ নেয়া হচ্ছে।

আরও বলা হয়

> যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একাধিক হামলার মূল হোতা বলে কথিত ওসামা বিন লাদেন এই ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততা অস্বীকার করলেও মার্কিন কর্মকর্তাদের বড় সন্দেহ তার ওপরই।

লক্ষণীয় যে আফগানিস্তান ছাড়া অন্য কোনো দেশের, অন্য কোনা জাতিসত্তার কারো বিরুদ্ধে সন্দেহের আঙ্গুল তোলা হলো না। আমরা দেখবো এই সন্দেহই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, মার্কিনি হামলার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের যুক্তিভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। অবশ্য এই রিপোর্টেই লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বলা হয়,

> ম্যাসাচুসেট্স কর্তৃপক্ষ পাঁচজন আরবকে সন্দেহভাজন বিমান ছিনতাইকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ... দু'টো লক্ষ্যবস্তুতে হামলার ব্যাপারে ওসামা বিন লাদেনের সমর্থকদের মধ্যে টেলিযোগাযোগের এবং অন্তত একজন পাইলট এ্যাটেন্ডেন্ট ও দুই বিমানযাত্রীর মধ্যকার সেলফোন কল ইন্টারসেপ্ট করার পর তদন্তকারীরা ঘটনার সঙ্গে লাদেনের সম্ভাব্য একটি যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছেন।

প্রথম আলোর পাতায় পরবর্তী একমাসে হামলার সাথে আর অন্য কারো যোগসূত্র খুঁজে দেখা হয় না এবং এভাবেই *প্রথম আলো* কোনোরকম প্রশ্ন না তুলে আনুগত্যের সাথে মার্কিন সরকারের একটা এজেন্ডাকে মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দেয়ার কাজে নিজেকে লিপ্ত করে। *প্রথম আলোর* এই মিশন সফল করতে ১৩ তারিখের পত্রিকাতেই প্রথম পাতায় ছাপা হয় "বিন লাদেনের প্রতি সন্দেহ বাড়ছে" শিরোনামের তিন কলামের খবর। হামলার একদিন পরই ওসামাকে অভিযুক্ত করে বড়ো আকারের একটি সংবাদ-কাহিনী নির্মাণ এবং ছবি প্রকাশ করা, বিভিন্ন উদ্ধৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে ওসামার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করার চেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ। *প্রথম আলো* শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয় না। একজন আরবের মুখ দিয়ে লাদেনের সংশ্লিষ্টতার কথা বলানো গেলে সন্দেহকে আরো পোক্ত করা যায়। তাই লন্ডনভিত্তিক *আল্-কুদস আল আরাবী* পত্রিকার সম্পাদক আবদেল বারী আতওয়ানকে উদ্ধৃত করে এই সংবাদ-কাহিনীতে বলা হয়,

> তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এই হামলার সাথে লাদেন জড়িত। উল্লেখ্য, আল-কায়েদা দলের সাথে আতওয়ানের যোগাযোগ আছে।

না হয় বোঝা গেল যে আল-কায়েদার সাথে আতওয়ানের যোগাযোগ থাকার কারণে তিনি এসম্পর্কে বলার অধিকারী। কিন্তু কোন প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি এমন রায় দিলেন? আর আল-কায়েদার সাথে আতওয়ানের সম্পর্ক শত্রুতাপূর্ণ না মিত্রতাপূর্ণ সেরকম কোনো তথ্য স্বাধীন বিচারের জন্য পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয় না। বরং এই উদ্ধৃতির পরই সংবাদ-কাহিনীতে বলা হয়,

> গত তিন মাস আগেও তিনি হুমকি দিয়েছিলেন, অচিরেই যুক্তরাষ্ট্রে বড় ধরনের হামলা চালানো হবে।

পাঠক দেখুন, কী চমৎকার একরৈখিক যুক্তিশৃঙ্খলে *প্রথম আলোতে* হামলার মাঠ নির্মাণকাজ এগিয়ে চলেছে।

খ) হামলার সমর্থনে জনমত নির্মাণ

লক্ষ্যবস্তু নির্ধারিত হয়েছে। এবার এই লক্ষ্যবস্তুতে হামলার সমর্থনে জনমত গড়ে তুলতে হবে। *প্রথম আলো* এগিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা সম্পর্কে মর্মস্পর্শী মানবিক আবেদন সৃষ্টি করে, লাদেন ও আফগানিস্তান সম্পর্কে কেবল নেতিবাচক মনোভাব প্রচার করে এবং বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক মার্কিন সরকারকে সমর্থন করাকে *প্রথম আলো* জনমত গড়ে তুলতে কাজে লাগায়। ১৩ তারিখের পত্রিকার 'সারা বিশ্ব' পাতায় সাত কলামব্যাপী লাল কালির "যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলায় বিশ্বজুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড়" শিরোনামের খবরটি লক্ষ করুন। এমন হামলার ঘটনায় নিন্দা-প্রতিবাদ জানানো খুব স্বাভাবিক, সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছি না। মৃত্যু মৃত্যুই। বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলার ফলে যে-মৃত্যু ঘটেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হামলায় তৃতীয় বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মৃত্যুও একই রকম বেদনাদায়ক। তবু ইঙ্গ-মার্কিন হামলা এবং নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকে ১৫০০০০০ মানুষ মারা গেলেও আমাদের পত্রিকায় কোনো ঝড় ওঠে না; ইরাকের পক্ষ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ইংল্যান্ডে হামলার জন্য জনমত গড়ে তোলা হয় না। ইরাকে গণহত্যার পক্ষে কোনো সাত কলামের লাল কালির শিরোনাম থাকে না। কিন্তু মার্কিন দেশে ৩০০০ মানুষ নিহত হলে মিডিয়াতে এমন "নিন্দা-প্রতিবাদের" ঝড় ওঠে এবং এই হামলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রণদামামা বাজানো হয়। এই বৈপরিত্যটাই লক্ষ করতে বলছি। ন্যাটোকে উদ্ধৃত করে এই সংবাদ-প্রতিবেদনে বলা হয়,

> ন্যাটোর যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিনিদের লড়াইয়ে জোর সমর্থনদানের অঙ্গীকার করেছে। ন্যাটোর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিশ্বের সকল সভ্য দেশকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে হবে।

ন্যাটোকে আমরা মার্কিন সরকারেরই সম্প্রসারণ বলতে পারি। সাম্প্রতিককালে কসোভোতে কিংবা ইরাকে মার্কিন হামলার সময়ই আমরা সেটা লক্ষ করেছি। কিন্তু ন্যাটোর সেই ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলা হয় না। বরং "সভ্য দেশগুলোকে"– পাশ্চাত্যের ন্যাটোভুক্ত যে দেশগুলো শত শত বছর ধরে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন-আমেরিকা এবং পূর্ব-ইউরোপে তলোয়ারের জোরে অসংখ্য দেশকে পদানত করে নির্বিচার হত্যা ও লুণ্ঠণ চালিয়েছে এবং এখনও নব্য-সাম্রাজ্যবাদী কালখণ্ডে সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে– আরও একবার এগিয়ে আসার আহ্বানকে *প্রথম আলো* ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে।

গ) নমস্য পাশ্চাত্য আধিপত্যশীল মিডিয়া

পাশ্চ্যাত্যের আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়া মার্কিন হামলার পক্ষে যেভাবে কাজ করে যায় *প্রথম আলোও* সেভাবে কাজ করতে চায়। সেকারণে ১৩ তারিখের *প্রথম আলোর* 'সারা বিশ্ব' পাতায় ছাপা হয় "বিশ্বের শীর্ষ দৈনিকগুলোতে হামলার ঘটনাই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে" শিরোনামের খবর। খবরটিতে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়, যেখানে বলা হচ্ছে,

> ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা প্রতিহত করতে এবং দেশকে রক্ষা করার জন্য বুশ প্রশাসনকে অবশ্যই আগ্রাসী ভূমিকায় নামতে হবে। আর পুরো জাতিকে শান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে নতুন শতাব্দীর এই প্রথম যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ... সন্ত্রাসবাদের সকল উৎসের মূল উৎপাটন না হওয়া

পর্যন্ত দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অঘোষিত যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য আগের চেয়েও শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

মার্কিন সরকারের পলিসির সাথে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। মূলত মার্কিন সরকারের পলিসিগুলোকে আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়াগুলো এভাবেই গ্রহণযোগ্য করে তোলে, জনগণকে যুদ্ধের পক্ষে উস্কে দেয়। পেন্টাগন-গবেষণা প্রকল্পের প্রথম পরিচালক হার্বার্ট ইয়র্ক তার *রোড টু অবলিভিয়ন* গ্রন্থে এজন্যই বলেছেন, ১৯৪৫ সালের পর থেকে মার্কিন সমরশক্তি খারাভাবে বাড়তে থেকেছে এবং প্রতিটি সংকটজনক মুহূর্তে মার্কিন প্রশাসন অস্ত্র প্রতিযেগিতায় ইন্ধন জুগিয়েছে। (উদ্ধৃত, "আক্রমণের বাজেট", এডওয়ার্ড এস. হারম্যান, **মানুষ**-এর এই সংখ্যায় অনুদিত)। এমন বক্তব্যকে *প্রথম আলোর* পাতায় স্থান দেয়ার মাধ্যমে এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কোনো মিডিয়ার বক্তব্য উদ্ধৃত না করার মাধ্যমে *প্রথম আলো* মার্কিন সরকারের পক্ষেই কাজ করে যায় এবং "অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধের" পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

জনমত গড়ে তোলায় *প্রথম আলোর* অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সম্পাদকীয় পাতায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে। লেখাটি আর ডব্লিউ এ্যাপল জুনিয়র-এর; শিরোনাম "এ যুদ্ধ এমন শক্তির বিরুদ্ধে যাকে শনাক্ত করা কঠিন"। দেখুন, শিরোনামেই যুদ্ধর প্রস্তাব করা হচ্ছে। লেখাটিতে বিভিন্ন রণকৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনে সম্ভাব্য হামলাকারী কারা কারা হতে পারে তা আলোচনা করা হয় নি, কেবল ওসামার নাম উঠে এসেছে এবং প্রতিশোধ হিসেবে আফগানিস্তানে হামলা চালাতে হলে কীভাবে এগোতে হবে সেই পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ্যাপল জুনিয়র লিখেছিলেন ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে হামলার পরপরই। আর তৎক্ষনাৎই তিনি লাদেনকে হামলাকারী হিসেবে শনাক্ত করে ফেলেছেন এবং তার আশ্রয়স্থল আফগানিস্তানে হামলার প্রস্তাব করে বসেছেন! হামলা প্রতিকারের অন্য কোনো বিকল্পের কথা তিনি বলেন নি। আমাদের মনে রাখা দরকার যে মার্কিন সরকারের সাথে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর স্বার্থ এক তারে বাঁধা। নোম চমস্কি এবং হারম্যান তাদের *ম্যানুফ্যাক্চারিং কনসেন্ট* গ্রন্থে প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবৈধভাবে নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা সরকারকে অস্থিতিশীল করার উদ্যোগ নিলে যেমন *নিউ ইয়র্ক টাইমস* মার্কিন সরকারের পক্ষে প্রচারণা চালানোর দায়িত্ব নেয় তেমনই গুয়েতেমালা ও এল সালভাদরে মার্কিন মদদপুষ্ট সরকারের ব্যাপক গণহত্যাযজ্ঞের পক্ষেও মার্কিন সরকারের সাথে সাথে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*ও সাফাই গাইতে থাকে (দেখুন, *ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট* গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)। এবং সেকারণেই এ্যাপল জুনিয়রের অন্য কোনো বিকল্পের কথা না-বলাটাই স্বাভাবিক। সিআইএ'র কাউন্টার টেরোরিস্ট অপারেশনের সাবেক প্রধান ভিনসেন্ট ক্যানিস্ট্রারো'র *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ছাপা মূল লেখা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে *প্রথম আলো* ছেপেছে ১৫ই সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় পাতায়। লেখাটির শিরোনাম যদিও "প্রতিশোধ সমাধান হতে পারে না"। তবু বিনা প্রমাণেই লেখাটিতে লাদেনকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা পুরো লেখা জুড়েই প্রস্তাব করা হচ্ছে 'সন্ত্রাস' দমনের জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানোর কথা এবং "তালেবানকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে লাদেনকে তুলে দিতে। তালেবানরা তা না করলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত সেনাবাহিনী ব্যবহারসহ একটি সামরিক অভিযান চালানো। তখন সামরিক অভিযান চালিয়ে জঘন্য হামলার পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের সমর্থনকারী সরকার উভয়কে ধ্বংস করা উচিত কাজ হবে"। কিন্তু *প্রথম আলো* কেন *নিউ ইয়র্ক টাইমস* কিংবা *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ছাপানো

এসব কলাম পুর্নমুদ্রণ করে? সে কি কেবল মার্কিন সরকারের অবস্থান জানানোর জন্য? না। বরং আমরা বলতে পারি *নিউ ইয়র্ক টাইমস* কিংবা *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর সাথেই *প্রথম আলো* স্বার্থগত ও মতাদর্শিক কারণে একাত্বতা বোধ করে।

ঘ) এগিয়ে চলেছে যুদ্ধ মুসলমানের দেশে

"যুক্তরাষ্ট্রে ৭ হাজার গোয়েন্দা তৎপর" শিরোনামের খবরটি ছাপা হয়েছে ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায়। কত গোয়েন্দা তৎপরতা চালাচ্ছে সেটা কি পাঠককে জানানোর প্রয়োজন ছিল? গোয়েন্দাদের তো তৎপর হওয়ারই কথা। তবে কেন এই গোয়েন্দা-সংখ্যাকে খবর বানানো হচ্ছে? একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যাবে, খবর বানানো হচ্ছে গোয়েন্দা সূত্র যেসব তথ্য দেবে তা যেন পাঠক নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে সেই উদ্দেশ্যে। খবরের বিষয়বস্তুতে তাই বলা হচ্ছে, "৫০ ব্যাক্তিকে এপর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে যারা গত মঙ্গলবারের ঐ ভয়াবহ হামলার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত"। কোনো সন্দেহ নয় হামলায় সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে। ব্যতিক্রমহীনভাবেই এরা সকলে আবার আরব মুসলমান। এবং "বিধ্বং-সী ঐ হামলা চালানোর জন্যই তারা সেখানে বিমান চালানো শিখেছিল বলে মনে করা হচ্ছে"। মানুষ কি শুধুই হামলা চালানোর জন্য বিমান চালানো শেখে? অন্য কোনো কারণ কি থাকতে পারে না? *প্রথম আলো* এমন অদ্ভুত উপায়ে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার পর একই সংবাদ-কাহিনীতে বলে, "পশ্চিমী উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন সংহতি প্রকাশ করেছে"। 'উন্নত', 'গণতান্ত্রিক' 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দগুলো পাঠক মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করবেন। আরো দেখুন এই রিপোর্টেই যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় রিপাবলিকান প্রতিনিধির উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলা হচ্ছে, "লাদেনই একমাত্র ব্যক্তি যার পক্ষে এমন হামলা চালানো সম্ভব"। কোনো রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো মহলের পক্ষে কি এমন হামলা চালানো সম্ভব নয়? আমরা জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা সিটিতে দুটি সরকারি ভবন বোমা হামলার মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়া হলেও মার্কিন আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে হামলা চালানোর কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি মিলিশিয়া বাহিনী সে হামলা চালিয়েছিল। তবে কেন কেবল লাদেন সম্পর্কে এমন নিশ্চিত করে বলা হচ্ছে? হেইকেল কী বলছেন শুনুন:

> যে সামান্য তথ্য-প্রমাণ তার সংশ্লিষ্টতার পক্ষে উপস্থাপন করা হয়েছে তা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আল কায়েদা সম্পর্কে বুশ এমনভাবে কথা বলছেন যে শুনে মনে হয় তিনি যেনবা নাজী জার্মানী কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কথা বলছেন। এসব দেখে আমি হাসি। কারণ আল কায়েদা সম্পর্কে আমি জানি। বেশ কয়েক বছর ধরে লাদেন নজরবন্দী অবস্থায় রয়েছেন। তার প্রতিটি টেলিফোন কল মনিটর করা হয়; আল কায়েদাতে মার্কিনি, পাকিস্তানী, মিশরীয় এবং সৌদি গোয়েন্দা বিভাগ চর ঢুকিয়ে রেখেছে। ফলে তার পক্ষে এমন বিশাল মাপের হামলার জন্য যে সাংগঠনিক তৎপরতা ও সুক্ষতা দরকার গোপনীয়তা রক্ষা করে সেটা করা সম্ভব নয় (মোহাম্মদ হেইকেল, প্রাগুক্ত)।

এমন তথ্য *প্রথম আলো*র পাতায় খুব একটা উঠে আসে না। *ফ্রি প্রেস নেটওয়ার্ক*-এর একটি খবর, "যুক্তরাষ্ট্রে হামলার জন্য দায়ী লাদেন না কি ইসরাইল?" শিরোনামের, ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ছাপানো হয়েছে ১৯ তারিখের 'সারা বিশ্ব' পাতায়। এই একটি মাত্র রিপোর্টে *প্রথম আলো* সন্দেহের আঙুল লাদেন ভিন্ন অন্য কোনো লক্ষ্যের দিকে তুলেছে।

এই সূত্র ধরেই ১৪ তারিখে 'সারা বিশ্ব' পাতায় ছাপা হয় "প্রতিশোধমূলক হামলার আশঙ্কায় কাবুলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা" শিরোনামের খবর। এখবরে বলা হয়, "মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ শুভ ও অশুভের মাঝে ব্যাপক লড়াইয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন"। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'শুভ' এবং লাদেন, লাদেনকে আশ্রয়দানকারী দেশ আফগানিস্তান 'অশুভ' এমন ধারণাও আমাদের জেনে নিতে হয় *প্রথম আলোর* কাছ থেকে। বুশের এমন যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য বার বার উঠে আসে *প্রথম আলোর* পাতায় এবং সেই উন্মাদনাকে জায়েজ করা হয় অন্যান্য রিপোর্ট ও কলামের মাধ্যমে। লাদেন মুসলমান, আফগানিস্তান মুসলমানদের দেশ, হামলার জন্য দায়ী মুসলমানরা এই ধারণাগুলোকে দৃঢ় করতে এই পাতায় প্রকাশিত হয় "সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম গ্রুপগুলো" শিরোনামের খবর। এখবরে বলা হচ্ছে, "এই দুঃখজনক দিনে মুসলমানরা আমেরিকানদের পাশাপাশি গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছে"। ভাষা লক্ষ করুন। আমেরিকান মুসলমানদেরকে আর আমেরিকান হিসেবে স্বীকার করা হচ্ছে না। তাদের আলাদা ক্যাটাগরিতে ফেলা হচ্ছে। তারা এখন শুধুই মুসলমান। আর, কোনো খৃস্টান, ইহুদী কিংবা অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রুপ নিন্দা করেছে কিনা সে তথ্যও দেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ, কোনো প্রকার প্রমাণ ব্যতিরেকেই *প্রথম আলো* এভাবে মুসলমানদের প্রতি বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরছে। এপ্রসঙ্গে ১৭ তারিখের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত ভারতীয় প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদিপ নায়ারের লেখার ভাষা লক্ষ করুন, "নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি কিংবা কয়েকটি গ্রুপ নয় পুরো সম্প্রদায়কে (মুসলমান) এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, যে-কয়েকজন গোঁড়া লোক তাদের পুরো সম্প্রদায়কে আজ ছিনতাই করতে উদ্যত হয়েছে সেখানে তাদের কোনো প্রশ্রয় নেই"। মুসলমানদের মধ্যে কেন এমন গোঁড়া মৌলবাদীদের প্রাদুর্ভাব হলো সে প্রশ্ন একবারও উত্থাপন না করে তিনি পুরো মুসলমান সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করে বসলেন। শুধু তাই নয়। মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু করে কুলদিপ নায়ার তার লেখায় প্রস্তাব করছেন, "দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছে ওয়াশিংটন। ঘোষণাটি ১০০ ভাগ সমর্থনযোগ্য...। সারা বিশ্বকে এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিকল্পিত উপায়ে এ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়তে হবে"। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসবাদের প্রধান উৎস তা একবারও বলা হলো না। (আগ্রহী পাঠক মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ এ প্রসঙ্গে নোম চমস্কির *পাইরেট্স এন্ড ইম্পেররস* গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন)। যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ আদৌ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কি না তাও বিচার না করে সমর্থন করা হলো। লাদেনের যে ইমেজ তৈরি করা হয় সেটাও ভয়াবহ এবং সেই ভয়াবহ ইমেজকেই ব্যবহার করা হয় আফগানিস্তানে হামলার বৈধতা প্রতিপন্ন করতে। ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় ছাপা লাদেনের দৈত্যাকৃতির কার্টুনটি দেখুন। মার্কিন সরকার যে দৃষ্টিতে লাদেনকে দেখতে চায় তেমনই প্রতিফলন ঘটে এই কার্টুনে এবং পূর্ববর্তী-পরবর্তী রিপোর্টগুলোতে।

আমরা বলতে পারি, এমন তৎপরতার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্য হলো একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে হামলা চালাবে তার পথ প্রশস্ত করা। এভাবেই *প্রথম আলোর* পাতায় "অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধ" এগিয়ে চলে আফগানিস্তানের দিকে। আফগানিস্তানে গত তিন বছর ধরে খরার কারণে যে দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, লোকজন শুধু ত্রাণ-সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সে-সংক্রান্ত কোনো খবর উঠে আসে না *প্রথম আলোর* পাতায়। বরং উঠে আসে "তালেবান রক্ষীরা প্রকাশ্যে ডাকাতি ও লুটতরাজ চালাচ্ছে?" শিরোনামের খবর (*প্রথম আলো* ২১শে সেপ্টেম্বর)। ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় প্রকাশিত, "লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দাও, তালেবান সরকারের প্রতি পাকিস্তানের চরমপত্র"

শিরোনামের প্রধান সংবাদটিতে বলা হয়, "মার্কিন সামরিক হামলা এড়ানোর সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে পাকিস্তান ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের জন্য তালেবান প্রশাসনকে চরমপত্র দিতে যাচ্ছে"। *প্রথম আলো*র পাতায় এভাবেই আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে ওঠে।

ঙ) 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ', নাকি সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধকে– যাকে এক কথায় তেল উত্তোলনের যুদ্ধ বলা যায় (দেখুন, **মানুষ**-এর এই সংখ্যায় সংকলিত ফাহমিদুল হক ও ফরহাদ মজহারের লেখা দুটো)– *প্রথম আলো*র পাতায় সবসময় "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন আখ্যাদানের মাধ্যমে আসলে এই সত্য গোপন করা হয়েছে যে, যুদ্ধটা আসলে মার্কিন আগ্রাসনের। রবার্ট ফিস্কের নিবন্ধের শিরোনামে বলা হচ্ছে "এটা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ নয়, এ-যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শত্রুর বিরুদ্ধে" (www.znet org)। নোম চমস্কি বলছেন:

> যেহেতু এই যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদকে লক্ষ্য করছে না তাই 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' উপমা ব্যবহার করা একটা বড় ধরনের প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এবিষয়টি গভীরভাবে ভাবা হচ্ছে না। এ-প্রসঙ্গে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইকেল স্টোহল-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে পারি: 'আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রথাগতভাবেই পরাশক্তিধর দেশগুলোর সামরিক-বাহিনী ব্যবহারকে এবং সামরিক-শক্তি প্রয়োগের হুমকি প্রদানকে বলপ্রয়োগমূলক কূটনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, সন্ত্রাসবাদ হিসেবে নয়', যদিও এ-ধরনের কূটনীতিতে 'হুমকি ও সন্ত্রাসের প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু মহাশক্তিধর দেশ বাদে অন্য কোনো দেশ একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে তাকে সন্ত্রাসবাদী কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়'– এবং প্রত্যয়টির আক্ষরিক অর্থেই (চমস্কি, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে নোম চমস্কি," মাসিক *সংস্কৃতি*, জানুয়ারি ২০০২)

সুতরাং, আমরা বলতে পারি পেন্টাগন ও বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রে হামলাকে যদি সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তবে সকল রকম আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে আফগানিস্তানে চালানো মার্কিন হামলাকেও সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা উচিত। কিন্তু *প্রথম আলো* তা করে না। চমস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' সম্পর্কে প্রচলিত মিথের জারিজুরিও ফাঁস করে দিয়েছেন। ১৮ই অক্টোবর ম্যাসাচুসেট্স ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন:

> শীর্ষপর্যায়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বর্ণনা করা হয় বর্বর এবং 'সভ্যতার বিকৃত বিরুদ্ধতাকারীদের' ছড়িয়ে দেয়া ক্যান্সার বা প্লেগ এর বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে। বিশ বছর আগে রিগ্যান প্রশাসন ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। 'সভ্যতার বিকৃত বিরুদ্ধতাকারীদের দ্বারা ছড়ানো প্লেগের' বিরুদ্ধে রিগ্যান প্রশাসন সাড়া দিয়েছিল একটি নজিরবিহীন সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে। আকারের দিক থেকে যা ছিল বিশাল এবং এই নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে ব্যাপক নৃশংসতা চালিয়েছিল।
>
> ...সন্ত্রাসকে দুর্বলদের অস্ত্র হিসেবে সচরাচর যেভাবে বলা হয় সেভাবে বললে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক ভুল থেকে যায়। সহিংসতার অন্যান্য হাতিয়ারগুলোর মতো সন্ত্রাসও প্রধানত ক্ষমতাশীলদেরই অস্ত্র– অভাবনীয়ভাবে। সন্ত্রাসকে দুর্বলের অস্ত্র বলা হয় এ-কারণে যে ক্ষমতাশীলরা মতাদর্শিক ব্যবস্থাটিকেও নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের সন্ত্রাসকে কখনোই সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য করা হয় না ("সন্ত্রাস কাজে আসে", নোম চমস্কি, **মানুষ**-এর এই সংখ্যায় সংকলিত)।

তবু *প্রথম আলোর* পাতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নিজস্ব যুদ্ধকে সবসময় 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে মহিমান্বিত করা হয়।

"সারা বিশ্ব" বলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার টার্গেট আফগানিস্তানকে বুঝিবে

প্রথম আলোর 'সারা বিশ্ব' নামে একটা পাতা আছে। পাতার নামকরণ দেখেই আন্দাজ করা যায়, সারা বিশ্বের খবরাখবর এই পাতায় উঠে আসার কথা। কিন্তু পুরো একমাস ধরে এই পাতা দখল করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে হামলা, তার 'ফলো-আপ' এবং আফগানিস্তানে মার্কিন রণসজ্জার প্রস্তুতি সংক্রান্ত খবরে। এমনকি বাংলাদেশে ১লা অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও প্রথম পাতার 'আপার ফোল্ড' (পত্রিকার মাঝখানের ভাঁজের ওপরের অংশ) প্রায় পুরোপুরি এসকল সংবাদেই ঠাসা থাকে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি সাড়া জাগানো ঘটনা এবং ঘটনাটি ব্যাপক কাভারেজ পাওয়ারই উপযোগী। কিন্তু অন্য কোনো দেশে এমন ঘটনা ঘটলে *প্রথম আলো* যে এরকম ব্যাপক কাভারেজ দিতো না সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এক্ষেত্রে আমরা জন পিলজারের স্মরণাপন্ন হতে পারি। তিনি বলছেন, "১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার দুদিন আগেই দক্ষিণ ইরাকের সিভিলিয়ান এলাকায় ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় আট জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। আমার জানা মতে, বৃটেনের আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়াগুলোতে সে-সম্পর্কে একটা কথাও আসে নি ("ইনভিজিবল রিং টু দ্য আনইমাজিনেবল", www.znet org.)। আমরা জানি, আমাদের *প্রথম আলোতেও* সে-সম্পর্কে একটা কথাও লেখা হয় নি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা হলে পরে শব্দ-উপমা-ছবি-ইমেজের বন্যা বয়ে গেছে। হারম্যানের ভাষায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রয়েছে সবচেয়ে দক্ষ মিডিয়া-প্রচারণার হাতিয়ার ("আক্রমণের বাজেট", এডোয়ার্ড এস হারম্যান, **মানুষ**-এর এই সংখ্যায় সংকলিত)। এই হাতিয়ারের সাহায্যে তারা একদিকে সংবাদের সূচি নির্ধারণ করে দেয়, নিজেদের স্বার্থানুকূল খবরগুলোকে সামনে ঠেলে দেয় এবং অন্যদিকে, ভিন্নমত প্রকাশকারী বক্তব্যগুলোকে কোনঠাসা করে ফেলে। তাছাড়াও এই মিডিয়া প্রচারণায় নিজেদের পক্ষের বক্তব্য বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় এতো বেশি পরিমাণে মিডিয়ার সামনে তুলে ধরা হয় যে মিডিয়াগুলোও সেই বক্তব্যগুলোকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। *প্রথম আলোর* ক্ষেত্রেও আমরা এমনটি লক্ষ করি। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' পক্ষে যতোটা কাভারেজ দেয়া হয় তার কণা ভাগও দেয়া হয় না যুদ্ধের বিরুদ্ধতাকারীদের, মার্কিন ভাষ্য যতোটা উঠে আসে তার তুলনায় আফগান সরকারের ভাষ্য নিতান্তই নগন্য। আর আফগান ভাষ্যকেও দেখা হয় পশ্চিমা সংবাদ-নির্মাতাদের চোখে। সংবাদ উপস্থাপনের পশ্চিমা ফ্রেমকে *প্রথম আলো* প্রশ্নাতীতভাবে মেনে চলে।

"পড়তে পড়তে মন ভেঙে যায় চোখে পানি চলে আসে"

পাঠককে আমি ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানের লেখা "আফগানিস্তানের জন্য দুঃখ" শিরোনামের মন্তব্যপ্রতিবেদনটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে অনুরোধ করবো। প্রথম পাতায় প্রকাশিত এই মন্তব্যপ্রতিবেদনে তিনি আফগানিস্তানের মানবিক বিপর্যয়ের কথা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এবং অভিযোগ উঠিয়েছেন যে "মহাশক্তিধর আমেরিকার আক্রমণে আফগান জনজীবনের ওপর নেমে আসবে আরও চরম দুর্দশা, ধ্বংস আর হত্যাযজ্ঞ, এটা এখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে"। কিন্তু আফগানিস্তানের ওপর চাপিয়ে দেয়া এই অন্যায় যুদ্ধের– যাকে মার্কিনি রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়– তিনি বিরুদ্ধতা

করলেন না কেন? কেন তিনি আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার অনিবার্যতাকে মেনে নিলেন?

আমি এখন তার প্রতিবেদনের, এদিকে নয়, অন্য একটা দিকে আলোকপাত করতে চাই। তিনি প্রতিবেদন শুরু করেছেন এভাবে,

> বিগত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে টেলিভিশন যত দেখছি আর খবরের কাগজ যত পড়ছি ততই মন বিষণ্ন হয়ে পড়ছে। নিউইয়র্কের বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, সেই সুউচ্চ ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে যাওয়া মানুষের ছবি আর নিহতদের আকুল ক্রন্দন ভোলা যায় না। আর সেই সন্ত্রাস কবলিত বিশাল উড়োজাহাজগুলোর যাত্রীদের শেষ সময়ে টেলিফোনে প্রিয়জনদের সঙ্গে সংলাপ, ভালো থেকো, ভালবাসি– পড়তে পড়তে মন ভেঙে যায়, চোখে পানি চলে আসে।

মতিউর রহমান চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। মিডিয়াতে ঘটনার যেভাবে প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে তাতে করে পাঠকের এমন অনুভূতিই হওয়ার কথা। আসলে, পশ্চিম 'নিজেদের' মৃত্যু সম্পর্কে প্রচারণা-মিডিয়ার মাধ্যমে এমন অনুভূতিই জাগ্রত করতে চেয়েছিল এবং সফলও হয়েছে; মতিউর রহমানের ভাবাবেগ দেখেই সেটা মালুম করা যায়। তবে, মুদ্রার উল্টো পিঠ মতিউর রহমান দেখেন না, তার *প্রথম আলো* দেখে না। বরং, পশ্চিমা প্রচারণা মাধ্যমের সাথে সাযুজ্য রেখে *প্রথম আলো* বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলার ঘটনাকে সর্বোচ্চ মানবিক আবেদনসম্পন্ন কাভারেজ দেয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর "অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধ" শিরোনামের খবরে আবেগঘন বর্ণনা দেয়া হয় এভাবে, "মৃত্যু, ধ্বংস, শোক, আহতের আর্তনাদ, এ্যাম্বুলেন্সের ছোটাছুটি, হাসপাতাল থেকে রক্তের জন্য আবেদন, ধ্বংসস্তূপ অপসারণের চেষ্টা, শক্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী– সবমিলিয়ে চাকচিক্যময় মেগাসিটি নিউইয়র্কের বিরাট অংশে এখন ভূতুড়ে পরিবেশ"। চাইলে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম পাতায় মুদ্রিত "শোক যখন মানুষকে কাছে আনে" খবরটিও দেখুন। পরবর্তী একমাসে এরকম অসংখ্য ছোট-বড় সংবাদ-কাহিনী, মন্ত ব্যপ্রতিবেদন, উপসম্পাদকীয়তে এমন আবেগময় বর্ণনা দিয়ে পাঠকের মন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে টেনে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ৭ই অক্টোবর থেকে আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন 'কার্পেট বম্বিং' শুরু হলে পরে এমন কোনো বর্ণনা আমরা *প্রথম আলো*তে পাই না। এবং একারণেই আমরা বলতে পারি যে নির্বিচার বোমাবর্ষণের মাধ্যমে আফগানিস্তানকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করা হলেও তার বর্ণনা পড়ে আমাদের 'মন বিষন্ন হয়ে' ওঠে না, 'পড়তে পড়তে মন ভেঙে যায়' না, 'চেখে পানি চলে আসে' না।

১৫ লাখ ইরাকীর তুলনায় ৬ হাজার মার্কিনীর জীবনের দাম অনেক বেশি

প্রথম আলো কেন একই রকম মৃত্যু-ধ্বংসকে দুই মানদণ্ডে বিচার করে? ব্যাপারটা খোলসা করে বুঝতে আমি হারম্যানের "মূল্য হিসেবে এটি ঠিকই আছে" প্রবন্ধ থেকে একটা বড় উদ্ধৃতি দেব। হারম্যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডিলিন অলব্রাইটের এক টিভি-সাক্ষাৎকার দিয়ে শুরু করেছেন:

> ১৯৯৬ সালের ১২ই মে '৬০ মিনিট' অনুষ্ঠানে লেসলি স্টহল-এর সাথে অলব্রাইটের আলাপচারিতার একটা অংশ এরকম:
>
> স্টহল: আমরা শুনেছি পাঁচ লক্ষ শিশু মারা গেছে (ইরাকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে)। আমি বলতে চাচ্ছি যে হিরোসিমার চেয়েও এই মৃত শিশুর সংখ্যা বেশি। আপনি কি মনে করেন, মূল্য হিসেবে এটি ঠিকই আছে?
>
> অলব্রাইট: এ প্রশ্নের জবাব দেয়া খুবই কঠিন। মূল্যটা---আমরা মনে করি, লক্ষ্য পূরণের মূল্য হিসেবে এটি ঠিকই আছে।
>
> ইরাকের ক্ষেত্রে যদিও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ভির্মি খাওয়ার মতো– সেকেলে হয়ে যাওয়া ১৯৯৬ সালের

ইরাকী শিশুমৃত্যুর সংখ্যাকে হিসেবে নিলেও বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র/পেন্টাগনে বিমান হামলায় মৃতের সংখ্যার চেয়ে সেই সংখ্যা ৮০ গুণেরও বেশি ছিল– তবু প্রধান্যশীল ধারার গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীরা এরকম গণহত্যাকে ম্যাডিলিন অলব্রাইট কর্তৃক ন্যায়সঙ্গত হিসেবে উপস্থাপন করার বিষয়টিতে আর মনোযোগ দিলেন না। প্রধান্যশীল ধারায় অলব্রাইটের এই শব্দবন্ধ কালেভদ্রে উপস্থাপন করা হয় এবং কখনোই তাদের মনে বিক্ষোভ জেগে ওঠে না কিংবা এরকম ইঙ্গিত করা হয় না যে কিছু পলিসি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এরকম গণহারে শিশু হত্যা অনৈতিক ও অমার্জনীয়।

১১ই সেপ্টেম্বর সকালে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র/পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে সাধারণ নাগরিক হত্যার বিষয়টি সবচে তীব্র, বিস্তারিত এবং মানবিক আবেদনসম্পন্ন কাভারেজ পেয়েছে, যা এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটিকে সুস্পষ্ট এবং নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করে জনগণের মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে প্ররোচিত করে। কিন্তু উল্টোদিকে, ইরাকের লক্ষ লক্ষ শিশুমৃত্যুর ঘটনা প্রায় অদৃশ্য থেকে যায়, তাদের দুর্ভোগ ও মৃত্যু চোখের আড়ালে পড়ে থাকে।

নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকার কারণে ইরাকী শিশুর মৃত্যুর হার বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র/পেন্টাগনের মৃত্যুর তুলনায় ৮০ গুণের চেয়েও বেশি হলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র/পেন্টাগনের ক্ষুদ্র প্রাণহানীর পক্ষে যে পরিমাণ মিডিয়া-কাভারেজ দেয়া হচ্ছে তা ইরাকী শিশুদের তুলনায় ৫০০ গুণেরও বেশি" (**মানুষ**-এর এই সংখ্যায় সংকলিত)।

মার্কিন পলিসি যেহেতু ইরাকের শিশুহত্যা সমর্থন করে তাই এটা নিয়ে মিডিয়াতে উচ্চবাচ্য করা হয় না। একইভাবে আফগানিস্তানে 'কার্পেট বম্বিং' নিয়েও *প্রথম আলো* কোনো হিউম্যানাইজড কাভারেজ দেয় না, কারণ মার্কিন পলিসি, মিডিয়ার কাছ থেকে তেমনটাই প্রত্যাশা করে। কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনের বেলায় উল্টো ঘটনা ঘটে।

আক্রান্ত আমেরিকা

প্রথম আলোর ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রধান সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল "আক্রান্ত আমেরিকা"। যুক্তরাষ্ট্রে এই হামলা চালানোকে সভ্যতাবিরোধী, কাপুরুষোচিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। "সন্ত্রাসীরা যে অমানবিক, সভ্যতা বিধ্বংসী জঘন্য অপরাধ করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। ধিক্কার জানাই এই কাপুরুষোচিত হামলার"। আরও বলা হচ্ছে, "ওরা সভ্যতার পথের কাঁটা। ওদের ক্ষমা নেই"। কিন্ত কেন সন্ত্রাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন হামলা চালালো? *প্রথম আলো* আমাদের বলে না। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'সভ্যতা', 'প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশ', 'সুস্থ বর্ণবাদী নীতির দেশ' প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করে ধোয়া তুলসি পাতা করে তোলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে গত এক শতকে অসংখ্য দেশে আক্রমণ চলিয়েছে, নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করেছে এবং এখনও অবৈধ আধিপত্য কায়েম করে রেখেছে বিশ্বে বিভিন্ন এলাকায় তা আড়াল করা হয়। দেশে দেশে মার্কিনি হামলার একটি খসড়া তালিকা পেতে দেখুন, জোলটান গ্রসম্যান সংকলিত "এ্য সেন্চুরী অব ইউএস মিলিটারি ইন্টারভেনশন: ফ্রম ওউনডেড নী টু আফগানিস্তান" লেখাটি (www.zmag.org.)। জন পিলজার বলছেন, "মিডিয়া কাভারেজে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপরাধ লুকানো হয়" (প্রাগুক্ত)। আমার মতে, শুধু লুকানো হয় বললে অর্ধেক সত্য বলা হয়। বরং বলা ভালো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপরাধ লুকোনোর সাথে সাথে তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক ইমেজ গড়ে তুলতেও মিডিয়া তৎপরতা চালায়।

"টুইন টাওয়ার ছিল আমেরিকার গর্ব" শিরোনামের খবরটি ছাপা হয়েছে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে। এখবরটির শুরু হয়েছে এভাবে, "স্বপ্নের আমেরিকা বলতে সবার আগে যে ছবিটি..."। যুক্তরাষ্ট্র মানে *প্রথম আলোর* কাছে যেন শুধুই স্বপ্ন আর ইতিবাচকতা। এ-খবরের

একখানে বলা হচ্ছে, "নির্মাণকারীদের ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছিল ভবন দু'টিকে ঘিরে। তারা বলতেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটিকে অবশ্যই এমন হতে হবে যেন এটি তার গুরুত্বের জন্য মানুষের মানবতার এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে গড়ে ওঠে। আর এটা প্রয়োজন অন্যান্য ভবনের সাথে স্বাতন্ত্রের জন্য, মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তার উদারতা খুঁজে পাওয়ার জন্য"। অর্থাৎ, বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষা করা ও অনুন্নত দেশগুলোকে নিছক বাজারে পরিণত করে পশ্চিমা দেশগুলোর সম্পদ শোষণ ও লুণ্ঠনের অবাধ পরিবেশ তৈরি করায় বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রের যে-ভূমিকা এমনকি বিশ্বব্যাংকও স্বীকার করে নিয়েছে তার সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র আমাদের পেতে হলো *প্রথম আলো*র কাছ থেকে। একই দিনে "পেন্টাগন: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অফিসভবন" শিরোনামের খবরটি দেখুন। এই সংবাদ-কাহিনীতে পেন্টাগনের বিশালতা, আভিজাত্য ও কর্মতৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে। একখানে বলা হয়েছে, "(পেন্টাগনের) সেনা লাইব্রেরী নিজস্ব উদ্যোগে তিন লাখেরও বেশি প্রকাশনা বের করে। আর তা করে এক ভাষায় নয়, বহু ভাষায়"। কেন পেন্টাগন এটা করে? জনকল্যাণের জন্য? *প্রথম আলো*র বর্ণনা পড়ে আমাদের কি তাই মনে হয় না? আসুন নোম চমস্কি ও এডওয়ার্ড এস হারম্যান তাদের *ম্যানুফ্যাক্চারিং কনসেন্ট* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পেন্টাগনের প্রকাশনা সম্পর্কে কী বলছেন তা শুনি, "পেন্টাগনের একটি জনতথ্য কার্যক্রম রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার লোক কাজ করে, প্রতিবছর লাখ লাখ ডলার ব্যয় করা হয় এবং শুধু ভিন্নমতাবলম্বী কোনো ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী নয় বরং এরকম সকল ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীর সমন্বিত জনতথ্য সম্পদও সে তুলনায় অতি নগণ্য"। তাঁদের মতে, পেন্টাগন মূলত এই প্রকাশনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মিডিয়াগুলোর নিয়মিত সংবাদ-চাহিদা পূরণ করে। মিডিয়াগুলো আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে পেন্টাগনের মতো সংবাদ-উৎসের ওপর নির্ভর করে। আর এভাবেই পেন্টাগন নিজস্ব ভাষ্য মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরে। এই প্রকাশনাগুলো পেন্টাগনের প্রচারণা-মেশিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনের ওপর যে মহত্ব ও আভিজাত্য আরোপ করা হচ্ছে তার অন্তরালে এক গুরুতর সত্য আছে যা আমাদের চোখের আড়ালে রাখা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা এবং তার অজুহাতে আফগানিস্তানের ওপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় সে সংক্রান্ত যতোগুলো লেখা সম্পাদকীয় পাতায় ছাপা হয়েছে– সে লেখা মার্কিন সরকারের পক্ষে যাক কি বিপক্ষে যাক– *প্রথম আলো* সবসময় 'আক্রান্ত আমেরিকা' শব্দযুগল ভগ্নোদ্যত বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রের ছবির ওপর সুপার ইমপোজ করে সবগুলোর সাথে লোগো হিসেবে ব্যবহার করেছে। ৭ই অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা চললেও কিন্তু 'আক্রান্ত আফগানিস্তান' শব্দযুগলের এমন কোনো ব্যবহার আমরা দেখি নি।

"দুনিয়ার এক নম্বর মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী"

পাঠক, মনে আছে, বুশ "শুভ ও অশুভের মাঝে ব্যাপক লড়াইয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন" এমন তথ্য *প্রথম আলো* আমাদের জানিয়েছিল? তো সেই অশুভ নির্মাণের কাজও *প্রথম আলো* বেশ দক্ষতার সাথেই পালন করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যাকিছু ছাপা হয়েছে সবখানেই তাকে "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী", "দুনিয়ার একনম্বর মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী" বিশেষণে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বলে রাখি, মূল নাম ওসামা হলেও পশ্চিমা মিডিয়ার অনুকরণে *প্রথম আলো* তাকে বিন লাদেন (অর্থাৎ, লাদেন পুত্র) বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কোনো আদালতে কিন্তু ওসামা সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত হন নি। যদিও আদালতের প্রমাণ ব্যতিরেকে এমন অবমাননাকর বিশেষণ প্রয়োগ মানহানীমূলক, তবু ওসামা সম্পর্কে একটা

শয়তানী ইমেজ তৈরি করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন বিশেষণ হরহামেশা ব্যাবহার করা হয়। শুধু এমন বিশেষণ ব্যবহার করেই *প্রথম আলো* ক্ষান্ত হয় না। আগেই যেমনটা বলেছি, ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় লাদেনকে নিয়ে দৈতাকৃতির এক কার্টুন ছাপা হয়েছে। ছাপা হয়েছে না বলে আমরা বলতে পারি, ওসামাকে দৈত্য বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই কার্টুনের নিচে দু'কলামের "মহাশক্তিধর আমেরিকার টার্গেট যে-ওসামা" শিরোনামের সংবাদে ওসামার সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার এক কাহিনী নির্মাণ করা হয়েছে। সংবাদ-কাহিনীতে বলা হচ্ছে, "বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের শীর্ষ পরিকল্পক ও সংগঠক হিসেবে খুব অল্প সময়েই খ্যাতি বা অপখ্যাতি অর্জন করেন সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন"। কার্টুন এবং সংবাদ-কাহিনী মিলিয়ে লাদেনের একটি ভয়ানক ইমেজ দাঁড়িয়ে যায় আমাদের সামনে। পরদিন ১৬ অক্টোবর প্রথম পাতায় প্রকাশ করা হয় একটি মানচিত্র "সারাবিশ্বে লাদেন" ক্যাপশন ব্যবহার করে। ওসামা বিন লাদেনের তথাকথিত 'সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক' এই মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়। মিছেমিছি *প্রথম আলো* লাদেনের এমন ইমেজ তৈরি করে ভাবলে ভুল হবে। এভাবেই লাদেন সম্পর্কে অডিয়েন্সকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাকে 'টার্গেটে' পরিণত করা হয়। ওসামার নেতিবাচকতা এখানেই শেষ হয় না। ১৬ অক্টোবর ওসামা সম্পর্কে আরেকটি সংবাদের শিরোনাম ছিল, "লাদেনের অপকীর্তিতে তার পরিবারের সদস্যরা ক্ষুব্ধ"। সংবাদ-কাহিনীর নির্মাণ দেখুন, "আন্ত র্জাতিক শীর্ষ সন্ত্রাসী... ওসামা বিন লাদেনের পরিবার গতকাল শনিবার তাদের ছেলের অপকীর্তির তীব্র নিন্দা এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিহতদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে"। প্রথমে ওসামাকে 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং তারপর তার পরিবারের সমবেদনার কথা বলে প্রচ্ছন্নভাবে তার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, লাদেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছেমাফিক এক নেতিবাচকতার প্রতীকে রূপান্তর করা হচ্ছে। ২রা অক্টোবর "কম্পিউটারে আঁকা লাদেনের নানা রূপ", ৯ই অক্টোবর প্রকাশিত "লাদেনের ধ্বংস চান মুসলিম নেতারা" শিরোনামের খবরও দেখতে পারেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রথম পাতার "ওসামা ও ওমর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়" শিরোনামের খবরটিতে বলা হয়েছে, "১৯৯৮ সালে লাদেন তার বড় মেয়েকে ওমরের সাথে বিয়ে দেন। এরপর লাদেন চতুর্থ বিয়ে করেন। ধারণা হয়, এই চতুর্থ স্ত্রী ওমরের কন্যা"। পশ্চিমী 'আধুনিকতা' আমদের যে মূল্যবোধের মধ্যে বেঁধে রাখে সেই মূল্যবোধের কাছে ওপরে উদ্ধৃত তথ্যগুলো ভয়ানক অভিঘাত তৈরি করে। তাই এই তথ্যগুলো সংবাদমূল্যহীন হলেও *প্রথম আলো* আমাদেরকে জানিয়ে রাখে। কারণ, বুশ "শুভ ও অশুভের মাঝে" যে "ব্যাপক লড়াইয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন' সেই অশুভকে যেন পাঠক তাদের মতো করে চিনতে পারে।

"গত রোববার ছিল বারনির জন্মদিন"

বারনিকে চিনতে পারছেন না? চিনতে না পারাটা নিশ্চয় আপনার অপরাধ। রোববার বারনির জন্মদিন ছিল আর আপনি সে খবর রাখবেন না? এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা আপনি বেমালুম ভুলে থাকবেন? আফগানিস্তানের খরা-দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কথা, ইরাকে গত দশ বছরে ইঙ্গ-মার্কিন অবরোধের কারণে নিহত ১৫ লক্ষ মানুষের কথা, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের কথা কিংবা পৃথিবীর নানা প্রান্তে কী ঘটছে তা আপনার না জানলেও চলবে। *প্রথম আলো* তাই সেই সংবাদগুলো আপনাকে দেবে না। কিন্তু বারনির জন্মদিন আপনাকে পালন করতেই হবে। *প্রথম আলো* সেই আয়োজন করেছে। ২রা অক্টোবর *প্রথম আলো* 'সারা বিশ্ব' পাতায় ওপরের দিকে একটা ছবি ছেপে তার নিচে ক্যাপশন লিখেছে, "মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ

বুশ ও তার স্ত্রী ফাস্ট লেডি লরা বুশের সাথে তাদের পোষা কুকুর বারনি। গত রোববার ছিল বারনির জন্মদিন" ইত্যাদি ইত্যাদি!

প্রথম আলোর আনুগত্য এত গভীর যে বুশের কুকুরও সংবাদ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর অসংখ্য মৃত্যু-ধ্বংসের ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে *প্রথম আলোর* পাতায় জায়গা করে নেয় বুশের কুকুর।

"মার্কিনিরা মুরগি চিবোচ্ছে আর আমরা খুঁজছি এক টুকরো রুটি"

গত তিন বছর ধরে আফগানিস্তানে খরা চলছে এবং বৃহত্তর আফগান জনগোষ্ঠী অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। জাতিসংঘ পরিচালিত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির হিসেব অনুযায়ী ২০০১ সালের শেষের দিকে ৫৫ লক্ষ লোক সম্পূর্ণভাবে খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মার্কিন হামলার ভয়ে খাদ্য-সাহায্য-সংস্থাগুলো ত্রাণকর্মীদের সরিয়ে নেয় যা অনাহারক্লিষ্ট মানুষের পরিস্থিতি আরো নাজুক করে তোলে। কিন্তু এসংক্রান্ত কোনো রিপোর্ট *প্রথম আলোতে* নেই। বরং আফগান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এক শয়তানী ইমেজ তৈরি করা হয়েছে মিডিয়াগুলোতে। ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত "ওসামা ও ওমর ঘনিষ্ট আত্মীয়" শিরোনামের সংবাদ-কাহিনীতে বলা হচ্ছে, "এখন ওমরের কড়া নির্দেশে আফগানিস্তানের মহিলাদের আপাদমস্তক ঢাকা বোরকা পড়তে হয়, ছবি তোলা নিষেধ, চোরের হাত কেটে নেয়া হয় এবং হত্যাকারীদের প্রণদণ্ড নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের দ্বারাই কার্যকর করা হয়। আর জেনাকারী মহিলাদের পাথর ছুঁড়ে এবং সমকামীদের ইটের দেয়ালের নিচে গুঁড়িয়ে মারা হয়। গত বছর তিনি বলেছিলেন, আফগানিস্তানের কিছু লোক ইসলামী সরকার ও ইসলামী ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয় বলেই দেশে তীব্র খরা দেখা দিয়েছে"। সৌদি আরব, কুয়েত প্রভৃতি ধর্মীয় মৌলবাদের দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নিবিড়। আমরা জানি, আফগানিস্তানের তালেবানদের সাথেও মার্কিন প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তখন কিন্তু এসব কথা বলা হতো না। এখন যেহেতু টার্গেট আফগানিস্তান তাই এই ইমেজ দাঁড় করানো।

কিন্তু প্রকৃত আফগানিস্তান সম্পূর্ণ ভিন্ন। আফগানিস্তানকে চিনতে ক্রিস বার্কলির "টু পানিশ ইনোসেন্ট আফগান উড বি ইমমোরাল" লেখা থেকে একটা উদ্ধৃতি দিই। তিনি বলছেন:

> "আফগানিস্তানের জনগণের ৮৫ শতাংশ কোনোরকম দিনাতিপাত করা কৃষক। অধিকাংশ আফগানের সংবাদপত্র, টেলিভিশন বা রেডিও সেট নেই। তারা কখনোই বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র বা পেন্টাগনের কথা জানবে না এবং তারা এটাও জানে না যে কোনো এক গোঁড়া গোষ্ঠী পশ্চিমা সভ্যতার এই আইকনগুলোকে আক্রমণ করেছে। আফগানিস্তানে ডাকব্যবস্থাও ঠিকমতো নেই।
>
> বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে অসংখ্য পরিবার তাদের শেষ কয়েক মুঠো খাবার নিয়ে প্রতীক্ষায় আছে। খরাক্রান্ত এলাকা অতিক্রম করে কোনো ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রাক ভাড়া দেয়ার মতো অর্থও তাদের কাছে নেই। অনেক পরিবার গ্রামে বসেই মৃত্যুর প্রহর গুনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (www.znet. org)।

বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলার পর থেকে আহত, উদ্ধারপ্রাপ্ত কিংবা যারা নিহত হয়েছে তাদের প্রতি *প্রথম আলো* ব্যাপক মানবিক আবেদনসম্পন্ন কাভারেজ দেয়। কিন্তু আফগানিস্তানের এই মানবেতর পরিস্থিতি সম্পর্কে টু শব্দটি উচ্চারণ করে না। কেবল আফগানিস্তানে তলেবানরা কী করছে, কোথায় কোথায় কয়টা ক্ষেপণাস্ত্র পড়লো, মার্কিন হামলা কতোদূর অগ্রসর হলো সেই খবরগুলো আমাদের জানানো হয়। আফগান জনগণের দুঃখ-যন্ত্রণা-আঘাত পত্রিকার পাতা থেকে উধাও হয়ে যায়। কেবল মিই মিই সুরের 'মহৎ' সম্পাদকীয় রচনা করা হয় "আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা: বেসামরিক প্রাণহানী এড়াতে

হবে"। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "অন্তত এটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে বেসামরিক মানুষ যেন প্রাণ না হারায়, বেসামরিক স্থাপনাগুলো যেন আক্রান্ত না হয়"। আর, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে যারা পথে নামে *প্রথম আলো*তে তাদের ছবি দেখে মনে হয় কেবল 'কট্টর', মৌলবাদী', 'ইসলামী' সংগঠনগুলোই মার্কিন হামলার বিরোধিতা করছে। কিন্তু মার্কিন হামলার বৈধতা নিয়ে, অমানবিকতা নিয়ে একবারও প্রশ্ন তোলা হয় না।

তবে, আফগানিস্তান সম্পর্কে মার্কিন ভাষ্য কিন্তু আমরা কিছুটা পাই। *প্রথম আলো*র ৬ই অক্টোবর 'সারা বিশ্ব' পাতায় দেখুন, "আফগান উদ্বাস্তদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৩২ কোটি ডলার সাহায্য দেবে" শিরোনামের খবর। আফগানিস্তানের জনগণের কথা, উদ্বাস্তদের কথা একবারও বলা হলো না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের খবর ঠিকই দেয়া হলো। সংবাদ কাহিনীটিতে কী বলা হচ্ছে দেখুন, "প্রেসিডেন্ট বুশ পররাষ্ট্র দপ্তরে এক বক্তব্যে আফগানিস্তানের দরিদ্র মানুষের জন্য সাহায্যের অঙ্গীকার করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যা ঘটেছে তাতে আমরা খুবই ক্রুদ্ধ কিন্তু এই ক্রোধের কারণে ভুলে গেলে চলবে না আমরা সহানুভূতিশীল মানুষ"। আমাদের মনে পড়ে যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার বলেছিলেন, 'নিজের ঢাক নিজেকেই পিটাইতে হইবে অন্যকে দিলে ফাটাইয়া ফেলিতে পারে'। এমন বক্তব্য প্রচার করে *প্রথম আলো* বুশের ব্যক্তিগত ঢাক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে না কি? যদি এখনও সংশয় থাকে তবে ১১ই অক্টোবর 'সারা বিশ্ব' পাতায় প্রকাশিত "বিমান থেকে ফেলা খাদ্য নষ্ট করে ফেলছে আফগানরা" শিরোনামের খবরটি পড়ুন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে আফগানদের বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত খাবার নষ্ট করে ফেলাটাই যেন খবর। কিন্তু আরেকটু গভীরে তাকালেই দেখতে পবেন, শুধু ক্ষেপণাস্ত্র নয় খাদ্য ফেলে মার্কিনিরা একটি মহৎ (?) কাজ করছে এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করাটাই এখবরের আসল উদ্দেশ্য। তাই বলা হচ্ছে, "মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা জানান, আফগানিস্তানে সরবরাহ করার জন্য তাদের কাছে ২০ লাখ প্যাকেট খাবার মজুদ আছে। এসব প্যাকেট খাবারের মধ্যে আছে শিম, চাল, ফল, বাদাম, কিশমিশ, মাখন, স্ট্রবেরী ইত্যাদি"। আগেও বলেছি, এসব খবর যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ইমেজ টিকিয়ে রাখার জন্যই। তবু *প্রথম আলো*র পাতায় ঝলক দিয়ে ওঠে "মার্কিনিরা মুরগি চিবোচ্ছে আর আমরা খুঁজছি এক টুকরো রুটি" শিরোনামের খবর, যদিও কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই এই খবরটিতে (*প্রথম আলো* ৯ই অক্টোবর)।

অন্য হাওয়ার জানালা

*প্রথম আলো*র সম্পাদকীয় পাতায় একমাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা ও পরে আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের ওপর চারটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয়গুলো নতজানু মনোভাবের। কোনো সম্পাদকীয়তেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেদেশে কেন হামলা করা হলো তার কারণ খুঁজে দেখতে বলা হয় নি। সারা বিশ্বব্যাপী মার্কিন চালিত সন্ত্রাস বিষয়েও কিছু বলা হয় নি। সেইসাথে সংবাদগুলোতে কাছা খুলে মার্কিন সরকারের পক্ষে প্রচারণায় নামা হয়েছে। তবু, একথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে *প্রথম আলো*র সম্পাদকীয় পাতায় এবং সাময়িকীতে নোম চমস্কি, রবার্ট ফিস্ক, তারিক আলি, অরুন্ধতি রায়, এডওয়ার্ড সাইদের লেখাসহ বেশকিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এই লেখাগুলো আমাদের সামনে পুরো ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে একটা ভিন্ন ভাষ্য নির্মাণ করে। কিন্তু অন্যান্য লেখার তুলনায় এই ভিন্ন ভাষ্য-নির্মাণকারী-লেখা পরিমাণে এতই কম যে সংবাদ-কাহিনীগুলোতে এবং সংবাদ-কাহিনী সমর্থনকারী অন্যান্য লেখাগুলোর শক্তিশালী ভাষ্যের কাছে সেই ভাষ্যকে আফগানিস্তানের মতোই এক মুমূর্ষু টার্গেট বলে মনে হয়। আমাদেরকে একথাও বলতে হবে যে ভিন্ন ভাষ্য নির্মাণের চেষ্টাকারী যে লেখাগুলো *প্রথম*

*আলো*তে প্রকাশিত হয়েছে তার অনেকগুলোই মার্কিন আধিপত্যশীল ধারার সংবাদপত্রে প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করতো না। কারণ, কর্পোরেট অধীনস্ত অগ্রসর পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধিপত্যশীল ধারার মিডিয়া এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে সবসময় পুঁজির মালিক ও ক্ষমতাবনদের ভাষায় কথা বলে এবং ভিন্ন ভাষ্যকে দমিয়ে রাখে। তবু বিকল্প মিডিয়ার ধারা শক্তিশালী হওয়ায় ভিন্ন ভাষ্যটা সেখানে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ এখনও প্রান্তিক পুঁজিবাদী একটা দেশ বলে এদেশের মিডিয়া সাংস্কৃতিক-শিল্প (কালচার ইন্ডাস্ট্রি) হিসেবে এখনও পূর্ণাঙ্গ-বিকশিত হয় নি। তাদের পলিসি এখনও কিছুটা ধুসরতা-আচ্ছন্ন। তাই *প্রথম আলো*র পাতায় ভিন্ন ভাষ্য উঠে আসে। তাছাড়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবও এদেশে প্রবল। সেই মনোভাবের পাঠককে তুষ্ট করতেও *প্রথম আলো*কে এমন লেখা প্রকাশ করতে হয়। ইন্টারনেট নামক নতুন মিডিয়া-প্রযুক্তির থেকে লেখা ছেপে চমক দেখানোর একটা বাসনার সুযোগেও এই ভিন্নমতের লেখাগুলো উঠে আসে বলে অনুমান করা যায়।

যেকারণেই ছাপা হোক না কেন *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত এই লেখাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে বিকল্প মিডিয়া বিকশিত হয় নি। তাই *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত লেখাগুলো বুদ্ধিমান পাঠককে পুরো ঘটনাপ্রবাহ স্বাধীনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়। এরকম লেখা যতো বেশি প্রকাশিত হবে পাঠকের স্বাধীনতার সীমাও ততোটাই বাড়বে।

সংবাদ উৎসের কামান

আমার আলোচনার প্রথম দিকে প্রশ্ন তুলেছিলাম, আমাদের দেশের সংবাদ-মিডিয়াও কি জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে পশ্চিমা 'প্রচারণা-মাধ্যম' অনুকরণ করে তাদেরই মূল্যবোধ-বিশ্বাস-দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে? আমাদের সংবাদ-মিডিয়া কি পশ্চিমা এবং দেশীয় কর্পোরেট-স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে? আমরা দেখতে পাচ্ছি, *প্রথম আলো* তার সংবাদ-উপকরণের জন্য নির্ভর করেছে মূলত সিএনএন, বিবিসি, এপি, এএফপি এবং রয়টার্সের ওপর। অনুন্নত সকল দেশেই এই নির্ভরতা অত্যন্ত প্রকট। বড় বড় সংবাদ-মাধ্যমগুলোর ওপর এই কাঠামোগত নির্ভরতার কারণে চোখ-কান খোলা না রাখলে অনিবার্যভাবেই তাদের প্রচারণা তৎপরতার ফাঁদে পা দিতে হয়। *প্রথম আলো* সেটাই করেছে। সংবাদ-উৎসগুলো কামানের গোলার মতো করে নিজেদের স্বার্থানুকূল অজস্র সংবাদ-কাহিনী নিক্ষেপ করে *প্রথম আলো*কে একবারে কুপোকাত করে ফেলেছে। ইন্টারনেটকেও *প্রথম আলো* সংবাদ-উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে। (কিন্তু 'সূত্র এজেন্সি' বললেই যেমন সঠিকভাবে সূত্র উল্লেখ করা হয় না তেমনি সূত্র ইন্টারনেট বললেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ইন্টরনেটের ঠিক কোন্ ওয়েবসাইটকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হলো সেটা বলা দরকার ছিল।) তাছাড়া উনিবিশের ঔরসে প্রাপ্ত 'আধুনিক' দাস-মনোভঙ্গিও আমাদেরকে পশ্চিমা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈধ, যুক্তিসঙ্গত, বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে মেনে নিতে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছে। (দেখুন: এডোয়ার্ড সাইদ-এর *ওরিয়েন্টালিজম* গ্রন্থটি।)

নোম চমস্কি এবং এডওয়ার্ড এস হারম্যান তাদের *ম্যনুফ্যাক্চারিং কনসেন্ট* গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারণা তৎপরতা কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে একটা মডেল খাড়া করেছেন। তাঁদের মতে,

> এ-মডেল সেই পথের সন্ধান করে যে-পথে সম্পদ ও ক্ষমতা ছাপা-যোগ্য সংবাদকে ছেঁকে ফেলে দিতে, ভিন্নমতকে কোনঠাসা করে ফেলতে এবং সরকার ও প্রভাবশালী স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলোকে তাদের বার্তা নিয়ে জনগণের কছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

তাঁরা এই মডেলে পাঁচটি ফিল্টারের কথা বলেছেন। তাঁরা আরও বলছেন:

> সংবাদের কাঁচামালকে অপরিহার্যভাবেই একে একে এই ফিল্টারগুলো অতিক্রম করতে হয়। ফলে ছাপার জন্য কেবল পরিশোধিত অবশিষ্টটুকুই টিকে থাকে। ফিল্টারগুলোর তৎপরতার ফলে মিডিয়ার ওপর এলিটদের আধিপত্য এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের কোনঠাসা হয়ে পড়ার ঘটনা এমন অবলীলায় ঘটে যে মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা– সচরাচর যারা পূর্ণ সততা এবং সুনাম নিয়ে কর্মরত– নিজেদেরকে বলে-বুঝিয়ে তুষ্ট রাখতে পারে যে পেশাগত সংবাদমূল্যের মানদণ্ডের ভিত্তিতেই তারা "বস্তুনিষ্ঠভাবে" সংবাদ নির্বাচন ও ব্যাখ্যার কাজ করে।

ফিল্টারবিশিষ্ট পশ্চিমা সংবাদ-মাধ্যমগুলোর ওপর কাঠামোগত নির্ভরতা, সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে একধরনের মোহাবিষ্টতা এবং নিজেদের অনুসন্ধিৎসার অভাবের কারণে *প্রথম আলো* পশ্চিমা সংবাদ-মাধ্যমগুলো বাহিত মার্কিন সরকারের পক্ষের প্রচারণায় সামিল হয়ে যায় অবলীলায়।

বেন ব্যাগডিকিয়েনের *দ্য মিডিয়া মনোপলি* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে চমস্কি ও হারম্যান আরও বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিডিয়ার বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকলেও সংবাদপত্র প্রকাশনার অর্ধেকের বেশি, এবং ম্যাগাজিন, (টেলিভিশন) সম্প্রচার, বই ও চলচ্চিত্রের অডিয়েন্স ও বিক্রির বেশিরভাগই মাত্র উনত্রিশটি অতিকায় মিডিয়া সংস্থার হাতে। এই অতিকায় সংস্থাগুলো মিলে গড়ে উঠেছে "তথ্য ও সংস্কৃতির নতুন মন্ত্রণালয়" যা জাতীয় এজেন্ডা নির্ধারণের মতো ক্ষমতাধর। চমস্কি-হারম্যান আরও বলেছেন, "সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে– সম্পদ, মর্যাদা ও অডিয়েন্সের সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছে– দশ থেকে চব্বিশটি মিডিয়া সংস্থা। সরকার ও বার্তাসংস্থাগুলোর সহযোগে এই মিডিয়াসংস্থাগুলো নির্ধারণ করে দেয় সংবাদের এজেন্ডা" (দেখুন, গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধকে' *প্রথম আলো* যেভাবে তুলে ধরে তা তদন্ত করে আমরা একথাও বলতে পারি যে ক্ষমতা ও সম্পদের দিক থেকে প্রান্তিক এই দেশের আধিপত্যশীল ধারার একটি সংবাদ-মিডিয়া পশ্চিমমুখো নির্ভরতায় কর্পোরেট-অর্থনীতির শীর্ষস্থানীয়দের স্বার্থকেই রক্ষা করে চলে।

সেলিম রেজা নিউটন

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানের মুখ

শ্বেতাঙ্গ-খ্রিস্টান-সমাজে ‘সংখ্যালঘু’ অপর-এর সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার কায়দাকানুন

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ-খ্রিস্টান-সমাজের প্রচারণামাধ্যম যেভাবে বিধর্মী ‘সংখ্যালঘু’দের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করে থাকে তার কায়দাকানুনগুলা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে আমি করেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগণে ‘অজানা’ ব্যক্তিবর্গের সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন-ইয়োরোপীয় আগ্রাসন এই প্রবন্ধের পটভূমি।

প্রবন্ধটা প্রণয়নে এই উপলব্ধি আমাকে প্ররোচিত করেছে যে, বাংলাদেশে আদিবাসী, পাহাড়ী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং গরিব মুসলমানসহ সকল নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার সীমাকে প্রসারিত করার লড়াই করতে যেয়ে যে-প্রশ্নগুলা ওঠে সেইগুলার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়া করার বেলায় আমরা যেন অতি-স্থানীয়তা-দোষে দুষ্ট না-হয়ে পড়ি, যেন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি পশ্চিমের রাষ্ট্র-পরিগঠনের ইতিহাসজাত অভিজ্ঞতাকে আমাদের চিন্তা পরিষ্কার করার কাজে লাগাতে পারি সেই জন্যেও পশ্চিমের তথাকথিত ‘সংখ্যালঘু’ – তথা নিপীড়িত – জনগোষ্ঠী-সমূহের প্রান্তিকীকরণ বা অপরায়ন-এর বিদ্যমান প্রক্রিয়া-গুলাকে অধ্যয়ন করা দরকার।

পশ্চিমা সমাজে ‘সংখ্যালঘু’-নির্মাণের প্রক্রিয়াটাকে নিয়ে কথাবার্তা বলা এই জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ যে, পশ্চিম আজকের দুনিয়ার ‘রাজধানী’ই শুধু নয়, ‘আধুনিকতা’ নামক ঐতিহাসিক-ঔপনিবেশিক বচনবাচন-ডিসকোর্সকে বিচার-বিবেচনা না-করেই উন্নতির পবিত্র ধারা হিসাবে গ্রহণ করার মাহাত্ম্যে পশ্চিমকে আমরা মানবজাতির সব চাইতে অগ্রসর সমাজ বলেও বিশ্বাস করে আসছি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ থেকেই। শেষোক্ত এই কারণেও ইহা গুরুত্বের দাবিদার যে, মানবজাতির সবচে অগ্রসর বলে ‘বিশ্বস্ত’ সমাজে ‘সংখ্যালঘু’ মানুষের হাল কী প্রকার। অর্থাৎ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার চ্যাম্পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তথা পশ্চিমা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

দেশগুলো, তাদের নিজেদের ‘সংখ্যালঘু’ নাগরিকদের সাথে কেমন আচরণ করে, এবং কেনই বা তা করে, সেটা দেখাই এই প্রবন্ধের প্রধান মতলব। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলে রাখতে চাই, ইসলাম ধর্ম বা তার অনুসারী মুসলমানদের সম্পর্কে কোনো বিশেষ অনুভূতি তৈরি করা কোনো ক্রমেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না।

অবশ্য, একদা-প্রাচ্যের, তথা বঙ্গের, মসলিন যেমন চিক্কন বলে কথিত হয় তেমনই মিহি কিন্তু তেমনই পরাস্বচ্ছ মিডিয়াপর্দা সরিয়ে এই প্রবন্ধে ঘোষিত লক্ষ্য হাসিল করার কাজটা কঠিন অতিশয়। আর, গ্রামে বসে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ বোঝা কঠিন সেই হেতু অসম এই সংগ্রাম বা অভিযানে দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি নিয়েছি শুধু মুসলমান ‘সংখ্যালঘু’দের ব্যাপারটাকে। (অন্য অন্য দৃষ্টান্তকে এই প্রবন্ধে দাওয়াত দিতে গেলে লেখকের অবস্থা যে বেহাল হয়ে পড়বে সেই কথা বলা সত্যি বাহুল্য।) আরো কিছু কারণ আছে। সাম্প্রতিক একটা কেস হিসেবে মুসলমানদের ব্যাপারটাকে নিলে বাংলাদেশের মানুষদের মগজে-আক্কেলে সহজেই প্রবেশ করতে পারার সম্ভাবনা থাকে। পরিণামে ইঙ্গ-মার্কিন-ইওরোপের ‘আধুনিক’ সমাজে আর-সমস্ত ‘অনাধুনিক’ ‘সংখ্যালঘু’দের (যেমন এশীয়, কালো, আফ্রিকীয়, হিন্দু, ভারতীয়, পূর্ব ইওরোপীয়, আর নারীর কথা তো আছেই, এখানে আবার উঠবেও) সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার পদ্ধতিপ্রণালীগুলা বেশ খানিকটা হেফ্‌জো করার মওকা পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে এই সত্য, পশ্চিমে শুধু মুসলমানরাই মিডিয়া-প্রচারণার শিকার নয়, অন্যরাও আছে। এছাড়া, মুসলামানদের ব্যাপারটাকে কেস হিসাবে নিলে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মনের মধ্যে এ-দেশের হিন্দু-খ্রিস্টান-সাঁওতাল-চাকমাদের মনের ভেতরকার তথাকথিত ‘সংখ্যালঘু-কমপ্লেক্সের’ বেদনা সামান্য সঞ্চারিত করে দেয়ার কিসমতও আমাদের ঘটে।

সর্বোপরি, পশ্চিমা দুনিয়াতে বিধর্মী শত্রু ‘সংখ্যালঘু’ হিসাবে মুসলমানরাই এখন প্রচারণামাধ্যমের সবচে বড় টার্গেট। একটা তথ্য জানালেই সেটা টের পাওয়া যাবে। ডেনমার্কে গত বছরের ১৫ই মে থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ৩ মাসের ৬টা জাতীয় সংবাদপত্র এবং ২টা টিভি চ্যানেলের ওপর জরিপে দেখা গেছে, সেখানকার মিডিয়া-কাভারেজের ৭৫ শতাংশই ইসলাম সম্পর্কিত এবং তার মধ্যে ৬০ শতাংশই নেতিবাচক [Quraishy, 2001]। পশ্চিমের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি ডেনমার্কের চেয়ে খুব একটা কমবেশি না, খারাপই বরঞ্চ, আমরা তা দেখব। এইখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, ইতালি ও ডেনমার্কের ‘সভ্য’ রাষ্ট্রসমুচয়ের কতিপয় মামলা দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজে খাটিয়েছি (তার চে বেশি আপাতত পারি নি)। সুতরাং এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই মুহূর্তে যে মুসলমানরাই হবে, সেটা স্বাভাবিক।

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের কর্মকাণ্ডসমূহকে নিয়মিতভাবে তদন্ত ও অধ্যয়ন করেন এবং এ-ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার কাজ করেন এমন নানান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পুস্তক ও ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া বিদ্যা এই প্রবন্ধের কাজে ব্যবহার করেছি বিচারমূলক পর্যালোচনার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে। ঐ বিদ্যা, সত্যি কথা বলতে গেলে, ইতোমধ্যে এতোটা বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে (যার অনেকটাই অবশ্য বিদ্যাজঞ্জাল) যে, সবটা কাজে লাগাতে পারি নি এই প্রবন্ধে। গণমাধ্যমের পঠনপাঠনের সাথে দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয়ভাবে যুক্ত একজন লোক হিসেবে এই প্রবন্ধের লেখকের নিজের পর্যবেক্ষণও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ যেমন পশ্চিমাপ্রচারণামাধ্যমের গ্রাহক হিসাবে তেমনি বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেও। অর্থাৎ, জায়গায় জায়গায়, বাংলাদেশের ‘সংখ্যালঘু’দের প্রসঙ্গও পর্যবেক্ষণজনিত তুলনার আওতায় এসে পড়েছে প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে।

'সংখ্যালঘু' সামাজিক পরিচয় নির্মাণের সময় পশ্চিমা শাসক শ্রেণীর মনে শ্রেণী-প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে থাকে। পশ্চিমের সমাজ এবং বাকি দুনিয়াকে আধিপত্য করাই এই শ্রেণীর আসল লক্ষ্য। উদ্দেশ্য তাঁদের দুনিয়াজোড়া বৃহৎ পুঁজির ব্যবসাকে রক্ষা ও সম্প্রসারণ করা। অধিপতির চোখ দিয়ে সে তার নয়া অর্থনৈতিক উপনিবেশের লোকসমাজকে পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী চোখ দিয়ে দেখা অব্যাহত রাখে। ফলে, 'সংখ্যালঘু'দের সামাজিক পরিচয় নির্মাণের বেলায় অধিপতি শ্রেণী তাদেরকে এমনভাবে পরিবেশন করে যেন তাদেরকে সুস্থ, স্বাভাবিক, সভ্য, আধুনিক, শিক্ষিত, সাধারণ মানুষ বলে কারো মনে না-হয়, কোনো-না-কোনোভাবে তাদেরকে যেন বিকৃত ও খাটো দেখায়।

একটা বিষয় লক্ষ করা জরুরী যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অপরায়নের যে-প্রক্রিয়ার কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হচ্ছে তা কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে বড়লোক-গরিবের বেলায়ও জারি থাকে। বড়লোক শ্রেণীর জীবনাচরণ ও মতাদর্শই সমাজে 'আচরণীয়' 'গ্রহণযোগ্য' 'স্বাভাবিক' বলে বিবেচিত হয়, বাকিদের (যাদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে গরিবরা সবচে বড়ো জনগোষ্ঠী) জীবনাচরণ ও মতাদর্শকে মনে করা হয় অনাচরণীয় অগ্রহণযোগ্য ও অস্বাভাবিক। পশ্চিমের বাইরের দুনিয়া ঐতিহাসিক ক্যারিকেচারে পড়ে গরিব থাকার কারণে সেই জগতের জীবনাচরণ ও মতাদর্শসমূহ হয়ে ওঠে 'অস্বাভাবিক'-'অপর'। কিন্তু, পশ্চিম-বহির্ভূত জগতেও বড়লোক আছে, গরিবও আছে। এখন, খেয়াল করলে দেখা যাবে সারা দুনিয়ার বড়লোকদের একই চাল। এর একটা কারণ হলো, ব্যবহৃত সম্পদ, সুবিধাদি ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে, অর্থাৎ কাঠামোগতভাবেই, সারা দুনিয়ার বড়লোকদের জীবনযাপন-প্রণালী কমবেশি একইরকম। আরেকটা কারণ হলো, ঐ কাঠামোর সাথে আরও আরও ফ্যান্টাসি ও রঙ মাখিয়ে সেটাকে মানবজীবনের সর্বজনীন আদর্শ প্রণালী হিসাবে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তুলে ধরার বিরতিহীন প্রবাহ-পদ্ধতি-প্রচারণা – এরই নাম মিডিয়া; এই জন্যেই তাকে প্রচারণামাধ্যম নামে ডাকা। (সারা দুনিয়ার সব দেশেরই বলতে গেলে অধিপতি শ্রেণীর অধিপতি মিডিয়ার এই একই হাল। বলা সম্ভবত বাহুল্যই যে, আন্তর্জাতিক মিডিয়া-সিস্টেম আসলে পশ্চিমা অধিপতি মিডিয়া-সিস্টেমের সম্প্রসারণমাত্র।) সুতরাং, পশ্চিমের যে-অপরায়নের কথা বলছি, নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, অঙ্গাঙ্গিভাবেই তা সামগ্রিক প্রচারণাপ্রণালীর সাথে যুক্ত। অপরাপর মতাদর্শিক ব্যবস্থার পাশাপাশি (যেমন শিক্ষাব্যবস্থা) মূলত প্রচারণামাধ্যমই বলে দেয়, এবং 'করে দেখায়' কী 'স্বাভাবিক' আর কী নয়। এবারে আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অরুন্ধতি রায় যখন বলেন, "... যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো মেনে নিতে হবে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর মতোই তারাও একটি দেশ ... তাদের মতোই বাকি সবাই এ পৃথিবীরই মানুষ, এমনকি যদি তাদেরকে টিভিতে দেখানো নাও হয়..." [রায়, ২০০১] তখন তিনিও পশ্চিমা টেলিভিশন তথা প্রচারণামাধ্যমের এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অপরায়নের দিকেই ইঙ্গিত করেন। তো, এই ইলেক্ট্রনিক টেলিভিশন ও প্রিন্ট-টেলিভিশনে (পশ্চিমের এবং সেই আদলে গড়ে-ওঠা অপশ্চিমের প্রবল ধারার সংবাদপত্রকে 'মুদ্রণ-টেলিভিশন' বলা ছাড়া আর উপায় কী?) যা প্রচারিত হয় না তা, কখনো কখনো, 'স্বাভাবিক' তো দূরের কথা, এমন-কি 'মানবীয়' বলেও বিবেচিত হয় না। তাই যদি না-হতো, আফগানিস্তানের যুদ্ধপীড়িত, না-খেতে-পাওয়া, গরিব ও নিরীহ শত শত (কত শত কে জানে?) বেসামরিক মানুষের ওপর নির্বিচার বোমা হামলা করে

দেশটাকে তামা-তামা করে ফেলার পক্ষে দুনিয়াজোড়া জনমত তুলতে পারা সম্ভব হলো কীভাবে, কোন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায়? তা কি ঐ টেলিভিশন নামক ভীষণ জাদুর বাক্সর ভেল্কিই নয়, যার সাথে তাল-লয়ে সঙ্গত করল ঐ মুদ্রণ-টেলিভিশন?

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম বলতে এই প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের ব্যবসায়ী-বড়লোক শাসকশ্রেণীর কর্পোরেট 'মিডিয়া' বা তথাকথিত 'গণমাধ্যম'সমূহকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে সর্বত্র-প্রায় এই 'বিশ্বাস' প্রচলিত যে, ইওরো-মার্কিন-উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র অত্যন্ত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক; এবং সমাজের মানুষদের জন্য দরকারি 'তথ্য' সম্প্রচার বা লেনদেন করা এবং সরকারের ও সমাজের ওপরতলার প্রেসারগ্রুপসমূহের নানারকম অপরাধ-দুর্নীতি ফাঁস করে দেয়ার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা এদের কাজ। কিন্তু বাস্তবে তারা দেখে বড়লোকদের স্বার্থ, কেননা বড়লোকরাই ঐগুলার মালিক এবং তাদের স্বার্থই 'জনগণের স্বার্থ' এবং উহাই স্বাভাবিক। কোটি কোটি ডলারের বিনিয়োগ ছাড়া যেখানে পত্রিকা-ব্যবসা চলে না সেখানে মালিকের স্বার্থের চেয়ে আর কার স্বার্থ বড় করে দেখা হবে? আবার, মালিকের আব্বাহুজুরের নাম হলো বিজ্ঞাপনদাতা। মার্কিন পত্রিকাগুলার আয়ের শতকরা ৬৫ ভাগ আসে ওনাদের কাছ থেকে; কানাডার বেলায় এই হার ৭০ ভাগ; এবং বিজ্ঞাপনদাতারা পত্রিকাওয়ালাদের কী পরিমাণ টাকাপয়সা দেন তার একটা নমুনা দেয়া যেতে পারে: ১৯৯৯ সালে *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর একটা পূর্ণ-পৃষ্ঠা-বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা দিতেন ১,৫০,০০০ মার্কিন ডলার বা পৌনে এক কোটি টাকা প্রায় [*মাইক্রোসফট্ এনকার্টা এনসাইকোপিডিয়া ২০০২*]। মাত্র একদিনে এক পাতায় এক কোটি টাকা! এর সাথে মনে রাখুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকাগুলা গড়ে মোটামুটি ৬৫ পৃষ্ঠার হয়ে থাকে। ছুটির দিনে এগুলা ২০০ পৃষ্ঠার ঢাউশ আকার ধারণ করে। একটা পত্রিকা ২০০ পৃষ্ঠার! অতো মোটা কি খবরের জন্য? অবশ্যই না – বিজ্ঞাপনের জন্য। এই মালিক-বিজ্ঞাপনদাতা-বড়লোকদের স্বার্থই পত্রিকার স্বার্থ। কিন্তু পশ্চিমা প্রচারণা-সিস্টেম এতো বেশি দক্ষ ও সূক্ষ্ম যে, সারা দুনিয়ার লোকে ঐ সিস্টেমটাকে অত্যন্ত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও দায়িত্ববান 'তথ্যব্যবস্থা' বলে মনে করে এবং সেইটাকে গরিব দেশগুলার জন্য নকলযোগ্য মডেল বলেও ভাবেন। অনেকেই লক্ষ করেন না যে, পশ্চিমের বড়লোকেরা তাদের নিজেদের মতো করে নিজেদের সুবিধানুযায়ী যে-সাংবাদিকতা-শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন সেইটাই পবিত্রতার সাথে পড়ানো হয় সাংবাদিকতা/গণযোগাযোগ-বিভাগগুলাতে। শাস্ত্রের মূল্যবোধগুলাকে এসব বিভাগের শিক্ষকগণ স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে ইতিহাসের ধ্রুব সত্য বলে গণ্য করেন। মার্কিন এই মিডিয়ার প্রচারণার স্বরূপ দেখিয়েছেন এডওয়ার্ড এস. হারম্যান ও নোম চমস্কি:

> সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা ও প্রতীকসমূহ কম্যুনিকেট করার একটি সিস্টেম হিসেবে ম্যাস-মিডিয়া কাজ করে থাকে। তাদের কাজ হলো মানুষকে আমোদ-প্রমোদ-বিনোদন দেয়া, তথ্যজ্ঞাপন করা, এবং তাদের মনের মধ্যে এমনসব মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ও আচরণবিধি প্রোথিত করে দেয়া যা তাদেরকে বৃহত্তর সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সমগ্রতার মধ্যে সমন্বিত করে। যে-জগতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত এবং যে-জগত শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে আকীর্ণ সেই জগতে মিডিয়ার ঐ ভূমিকা পালন করতে গেলে সিস্টেমেটিক প্রচারণা প্রয়োজন হয়।
>
> যেসব দেশে ক্ষমতার হাতলগুলা রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের হাতে সেসব দেশে মিডিয়ার ওপর একচেটিয়া ধরনের নিয়ন্ত্রণ (প্রায়শ সরকারী সেন্সরশিপসহ) এই সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে যে, মিডিয়া আধিপত্যশীল এলিটদের হয়ে কাজ করছে। কিন্তু যেখানে মিডিয়া ব্যক্তিমালিকের খাতে থাকে এবং সরকারী সেন্সরশিপ যেখানে অনুপস্থিত সেখানে যে-প্রচারণা-সিস্টেম

> ক্রিয়াশীল থাকে তাকে দেখতে পাওয়া অনেক বেশি দুরূহ। মিডিয়া যেখানে সক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা করে, এবং কর্পোরেশান ও সরকারের দুষ্কর্ম ফাঁস করে দেয়, এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের মুখপত্র হিসেবে নিজেদেরকে সাংঘাতিকভাবে তুলে ধরে সেখানে ঐ দুরূহতা আরও বিশেষভাবে সত্য হয়ে ওঠে। [Herman and Chomsky, 1994: 1] (অনুবাদ আমার – স.র.ন.)

পশ্চিমে সরকার ও মিডিয়ার সম্পর্কসূত্র অধ্যয়ন করলে প্রচারণার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। মার্কিন সরকার কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বড়লোকদের সরকার। প্রধান দুটো পার্টিই বড়লোকদের পার্টি। বড়লোক হওয়া ছাড়া সেখানে নির্বাচিতই হওয়া যায় না। তাই বড় বড় সংকটাভিযান পরিচালনার সময় (যেমন হাল আমলে আফগানিস্তানে 'অপারেশান এনডিউরিং ফ্রিডম') সরকার এবং মিডিয়ার একই সুর আবিষ্কার করা চলে। অথচ সাংবাদিকতা-শাস্ত্রে আছে, মিডিয়ার কাজ নাকি সরকারের কর্মকাণ্ডের কুত্তা-নজরদারি করা। আফগানিস্তানে সামরিক হামলা পরিচালনার দায়িত্ব পেন্টাগনের নাকি *সিএনএন*-এর সেটা তার টিভি-কাভারেজের ক্যাপশান দেখে বোঝা মুশকিল; যেন তারাই মার্কিন সরকারের তথ্যপ্রচার-বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছে। ইঙ্গমার্কিন সরকারের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' বা ঘোষিত ক্রুসেডের রণদামামার তালে তালে ঢোল-বাজানো *সিএনএন*-এর ক্যাপশান প্রথমে ছিল "অ্যামেরিকা আণ্ডার অ্যাটাক"। কদিন পর সেটা বদলে হলো "অ্যামেরিকা ইজ অ্যাট ওয়ার"। তারপর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে এক নম্বর শত্রু হিসাবে এলান করার পরে *সিএনএন*-এর ক্যাপশান হলো "অ্যামেরিকা'জ নিউ ওয়ার"। তারও পরে সেটাকে 'সঠিকভাবে' পরিশুদ্ধ করে লেখা হলো "অ্যামেরিকা'জ ওয়ার অন টেররিজ্‌ম্"। ওদিকে *ফক্স নিউজ চ্যানেল*-এ চলল প্রায়-সার্বক্ষণিক "আমেরিকা অ্যাট ওয়ার", *বিবিসি*-তে "ওয়ার অফ টেররিজ্‌ম্"। যুদ্ধটা তাহলে কার? ইঙ্গমার্কিন সরকারের, নাকি তাদের মিডিয়ার? তারপরও সব শেয়ালের সুর মেলানো সহজ নয়, বিশেষত শেয়ালসাহেবরা পরস্পর যদি পয়সালোভী প্রতিযোগিতায় 'স্বাধীনভাবে' মত্ত থাকেন। তাই মিডিয়া কখনো-বা টুকটাক বাড়াবাড়ি করে ফেলে তাহলে মিডিয়ার লোকজনকে ডেকে এনে সাংবাদিকতা শেখায় সরকার এবং 'গাইডলাইন' দেয় যে, তোমরা কিন্তু ওসামার ভিডিও টেপ হুবহু প্রচার করবে না, সংক্ষিপ্ত করে নিজেদের ভাষায় গুছিয়ে লিখবে, কেননা ঐ লোকটার মর্মভেদী উচ্চারণ অতিশয় বিষজ্বালাময় [FAIR, 2001], এবং আমরা দেখি যে, 'স্বাধীন' নামে নন্দিত মিডিয়া সত্যি সত্যি তা মেনেও নেয়। এই রকম 'প্রেস অ্যাডভাইস'-মার্কা মিডিয়াকেই সদানন্দ পশ্চিমভক্তরা বলেন যে, উহা সরকারী সেন্সরশিপমুক্ত। সরকার-ও-মিডিয়া-যেন-তামাক-ও-ফিল্টার-দুজনে-দুজনার ধরনের এই পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ পুরস্কার পুলিৎজার-জয়ী মার্কিন সাংবাদিক বেন বাগডিকিয়ান ঠিকই খেয়াল করেছেন, বড়লোকদের এই কর্পোরেট-মিডিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের 'তথ্য ও সংস্কৃতির প্রাইভেট মন্ত্রণালয়' গঠন ও পরিচালনা করে। বাগডিকিয়ান দেখিয়েছেন, মিডিয়ার সংখ্যা আপাত দৃষ্টিতে অনেক হলেও তাঁর গবেষণা-পর্বে মাত্র ২৯টা বৃহৎ মিডিয়া-সিস্টেমের হাতে ছিল মোট সংবাদপত্র-আউটপুটের অর্ধেকটা এবং ম্যাগাজিন, ব্রডকাস্টিং, বই ও চলচ্চিত্রের বিক্রয় এবং অডিয়েন্সের বেশিরভাগটা। এই ২৯টা প্রতিষ্ঠান মিলে যা গড়ে উঠেছে, তা হলো একটা নতুন 'প্রাইভেট মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অ্যাণ্ড কালচার', এরা জাতীয় এজেণ্ডা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। [Bagdikian, 1997]

'মিডিয়া' বা বড়লোকদের ব্যক্তিগত তথ্য মন্ত্রণালয় মার্কিন মুসলমানদের বেলায় কীভাবে সিস্টেমেটিক প্রচারণা চালায় সেটাই এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

পশ্চিমা সমাজে 'সংখ্যালঘু'র অপরায়ন-প্রক্রিয়া যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে অন্য একটা বিষয়ের প্রতিও আমি পাঠকের মনোযোগ টানতে চাই। এ-কথা ঠিকই, পশ্চিমা সমাজের স্বরূপ বোঝার সময় ভুলে যাওয়া যায় না যে, সেটা একটা পুঁজিবাদী সমাজ। বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক কর্পোরেট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজধানী এই সমাজ; সর্বব্যাপী ব্যবসামুখী স্বয়ংক্রিয় ধাঁচের টেকনোলজি-নির্ভরতা এই সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি। এই সমাজের অধিপতি শ্রেণীর সামাজিক আধিপত্যের রূপকাঠামো বিশ্লেষণে তাই অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচার করা স্বাভাবিক হলেও তাতে করে সেখানকার অধিপতি শ্রেণীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আধিপত্য সম্পর্কে জানা যায় ঠিকই, কিন্তু ঐ শ্রেণীর ধর্মীয়-বর্ণগত-জাতিগত-সাংস্কৃতিক আধিপত্যের চেহারাটা আড়ালে থেকে যায়। আড়ালে চলে যায় এই সত্য, পশ্চিমা সমাজ শুধু পুঁজিবাদী সমাজই নয়, এটা একটা খ্রিস্টান-সমাজও বটে। পশ্চিমা সমাজে মুসলমান ও অপরাপর সংখ্যালঘুর অপরায়নের মাজেজা পুরোপুরি বুঝতে গেলে ঐ সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠনের দিকটা বিশ্লেষণ করাও তাই জরুরী হয়ে পড়ে।

সত্যি কথা বলতে কি, চোখ-ধাঁধানো চোখ-রাঙানো মার্কিন মুল্লুকের বেহেস্তে পদার্পন ঘটানোর মতো পূণ্য অর্জন করতে এখনও যেহেতু পারি নি, পশ্চিমের সমাজকে আদৌ 'খ্রিস্টান-সমাজ' বলে ডাকা যায় কিনা সেটা নিয়ে আমি একটু চিন্তিতই ছিলাম, বিশেষ করে এই প্রবন্ধের উপশিরোনাম লিখতে যেয়ে থেমে থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ। শিরোনামের প্রধান অংশটা ঠিক করে ফেলতে পারার পরে ভাবলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকসংখ্যার হিসাবনিকাশ পেশ করতে পারলে মন্দ হয় না। খুলে বসলাম *এনসাইকোপিডিয়া ব্রিটানিকা সিডি-রম ডিলাক্স সংস্করণ ২০০২*। দেখা গেল, পশ্চিমা সমাজটাকে সত্যি-সত্যি 'খ্রিস্টান-সমাজ' হিসেবে নাম ধরে ডাকা যেতে পারে, পশ্চিমা বিদ্যা-মহাজনদের বিদ্যাই সেই কথা বলে। নির্দ্বিধায় তাঁরা সারা দুনিয়াটাকে খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখেন। *ব্রিটানিকা*-র পণ্ডিতদের কথা বলছি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কাদের সংখ্যা কত তা জানানোর জন্য ওঁদের বানানো জনসংখ্যা-টেবিলটা কম্পিউটারে খুলে দেখেন: সারা দুনিয়ার লোককে অবলীলাক্রমে (কর্তাদের এই লীলা বোঝা ভার হলেও একটা বোঝাপড়া তো করা চাই!) তাঁরা খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান এই দুই মোটা দাগে কীভাবে ভাগ করে নেন তা বুঝায়ে বলার দরকার পড়ে না [Britannica, 2002-b]। ঐ যে ওঁরা বললেন অ-খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচে বেশি হচ্ছে মুসলমানরা। আস্তে আস্তে এই প্রবন্ধে আমরা দেখব, এদেরকেই পশ্চিমওয়ালারা তাঁদের সমাজের 'মহাসর্বনাশ'-এর উৎস বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছে, এবং তা অনেক দিন থেকেই। কেন? পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলমানরা কি ঐ সমাজের দৈনন্দিন স্বাভাবিকতায় বিঘ্ন ঘটিয়ে চলেছে? তা কিন্তু মোটেও নয়। তাঁরা আসলে শ্বেতাঙ্গ-খ্রিস্টান নয় বলেই পরিত্যাজ্য, নিন্দনীয়, এখনও-সভ্য-হয়ে-না-ওঠা, অপর। পশ্চিমা সমাজের ভাঁজে-ভাঁজে খেলতে থাকে এই অপরায়নের, তথা দানবায়নের, হাওয়া – খোলা হাওয়া, মুক্ত হাওয়া যার নাম।

পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগাঠনিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য এবারে কতকগুলা উদাহরণ পেশ করতে চাই। অতি সাম্প্রতিক কয়েকটা উদাহরণ নিয়েছি বেলজিয়ামভিত্তিক *ইওরোপিয়ান নেটওয়ার্ক এগেইন্স্ট রেসিজম্*-এর সহসভাপতি, এবং *মিডিয়া*

ওয়াচ এর সম্পাদক ব্যাশি কুরায়শির কাছ থেকে। ভারতে জন্ম-নেয়া, পাকিস্তানে বড়-হওয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে পড়ালেখা-করা, বর্তমানে ডেনমার্কে বসবাসকারী, জাতিগত 'সংখ্যালঘু'দের ওপর একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা কুরায়শি বলছেন:

> যেকোনোভাবেই হোক পশ্চিমা দুনিয়ায় বসবাসের পর একটা জিনিস আমার কাছে খুবই পরিষ্কার যে, যতোই কেন-না আমি সেক্যুলার হই, যতোই কেন-না আমি ধর্মচর্চাকারী না-হই তাতে কিছু যায়-আসে না। আমার চারপাশের মিডিয়া, রাজনীতিবিদরা এবং লোকজনেরা সবসময়েই আমাকে মনে করিয়ে, দেবে যে আমি একজন মুসলমান এবং সেই জন্যেই আমি ডেনমার্কীয়, ইওরোপীয় এবং/অথবা পশ্চিম-ইওরোপীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক অংশ নই। এটা ভাবতে আমার মন খারাপ হয়ে যায় এবং আঘাত লাগে যে, ডেনমার্কের আইনমান্যকারী, ট্যাক্সপ্রদানকারী, শান্তিকামী ও সাধারণ-স্বাভাবিক শরীক একজন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্যে আমার সমস্ত প্রচেষ্টার কোনো দামই এই সমাজের কাছে নেই। আমাকে আমার ধর্মপরিচয়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা হয়। আমি জানি আমার একারই শুধু এই অবস্থা নয়। পশ্চিমা জগতের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের একই অবস্থা। [Quraishy, 2001] (অনুবাদ আমার – স.র.ন.)

কুরায়শির উদ্ধৃতির অক্ষরগুলার অর্থ-তাৎপর্য ঠিকমতো পাঠ করতে পারার দরকার আছে। একজন মুসলমান শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই 'স্বাভাবিক ইওরোপীয়' হতে পারেন না। কেন? কী হতে পারে এর কারণ? কারণ হলো, আগেই বলেছি, পশ্চিমা সমাজ একটা খ্রিস্টানসমাজ আর মুসলমানরা খ্রিস্টান নন। ভুলে গেলে চলবে না, কালোরাও কিন্তু 'স্বাভাবিক' মার্কিন বা ইওরোপীয় নাগরিক বলে বিবেচিত হন না। কারণ তাঁরা 'স্বাভাবিক' শ্বেতাঙ্গ নন। খ্রিস্টানরা 'স্বাভাবিক', মুসলমানরা 'অস্বাভাবিক'; শ্বেতাঙ্গরা 'স্বাভাবিক', আর কৃষ্ণাঙ্গরা 'অস্বাভাবিক'। (পাঠককে একটু মনে করিয়ে দিই, হিন্দুরাও কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমান-মনোগাঠনিক বুননসম্পন্ন সমাজের 'স্বাভাবিক' নাগরিক নন; আর ভারতের পরিস্থিতিও তাই – তবে ঠিক উল্টো দিক থেকে।) এইভাবে, পশ্চিমাসমাজে 'বিধর্মী' 'অস্বাভাবিক' 'অপর' 'সংখ্যালঘু'র তথা মুসলমানের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার কায়দাকানুন বা সামাজিক প্রকৌশল জারি থাকে।

পশ্চিমের 'সুশীল' সমাজের পণ্ডিতেরা মুসলমানদের কীরকম 'বহিরাগত' 'অপর' হিসাবে দেখেন তার আরও নমুনা দেখা যাক:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপীয় দেশগুলাতে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি বিভিন্ন উপায়ে নজরে আনা যেতে পারে: ওয়াশিংটন ডিসি-র পাবলিক স্কুল-সিস্টেমকে জানুয়ারি মাসে রোজার সময় মুসলমান স্কুলশিশুদের চাহিদার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। জুন মাসে নিউ ইয়র্ক শহরের শিক্ষাবোর্ড কতিপয় স্কুল-সেটিংস্-এ মুসলমানদের নানা প্রতীক প্রদর্শন করতে রাজি হয়েছে যেখানে খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রতীক আগে থেকেই ছিল। জুন মাসেই নাইকি ইনকর্পোরেটেডকে [জুতার কোম্পানি] বাস্কেটবল খেলার জুতার একটা বিশেষ ব্র্যাণ্ড প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে যার লোগোটা ছিল এমন যে চাইলে আরবিতে সেটাকে আল্লার নাম হিসাবেও পড়া যেতে পারে। আঘাত করে থাকলে তার জন্যে মুসলমানদের কাছে ক্ষমা চায় কোম্পানি। মে মাসে সাইমন অ্যাণ্ড শুস্টার নামের এক মার্কিন প্রকাশক একটা শিশুগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেয় যাতে নবী মুহাম্মদকে হীনভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। হাটফোর্ড শহরে খ্রিস্টান-মুসলমান আন্তঃবিশ্বাস সংলাপ ও গবেষণায় দীর্ঘ দিন থেকে আগ্রহী 'কন', মানে হার্টফোর্ড সেমিনারি, এবং হার্টফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় ইব্রাহিমীয় ধর্মসমূহের ভিজিটিং প্রফেসরের নয়া বহাল-করা একটা চেয়ারে প্রথমবারের মতো কাউকে নিয়োগ দিয়েছে। অতিথি-

মনোনয়নলাভকারী লোকটি হচ্ছেন সুলায়মান নেয়াং, একজন মুসলমান এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র হাওয়ার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক। এরকম চেয়ার বিরল এবং তা তাৎপর্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। [Britannica 2002] (অনুবাদ আমার; মোটা হরফ আমার – স.র.ন.)

রোজার মাসে স্কুলে মুসলমান বাচ্চাদের আলাদা চাহিদার স্বীকৃতি, স্কুলের নানান কাগজপত্র ইত্যাদিতে এতদিন ধরে চলে আসা খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রতীকসমূহের পাশাপাশি মুসলমান প্রতীক ব্যবহার চালু করা, মুসলমান প্রফেসরকে ভিজিটিং প্রফেসর নিয়োগ করা – ইওরোপে এসব হলো বিশাল 'তাৎপর্যপূর্ণ' ঘটনা। কী তাৎপর্য? ইওরোপীয় সমাজে 'অপর' মুসলমানদের 'অনুপ্রবেশের' স্বীকৃতি ঘটছে। লক্ষণীয় যে, অধ্যাপক সুলায়মানের পরিচয় হিসাবে প্রথমে বলা হচ্ছে তিনি "একজন মুসলমান", তার পর বলা হচ্ছে, "এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র হাওয়ার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক।" কী 'সভ্য' দৃষ্টিভঙ্গী! (আমাদের দেশেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো পেশাজীবীকে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে বলা হয়, "হিন্দু ভদ্রলোক"; পদস্থ কেউ যদি হিন্দু হন তবে সেটা আলাদা করে লক্ষ করা হয়, কিন্তু যদি তিনি হন মুসলমান তাহলে সেটা আর লক্ষণীয় ব্যাপার থাকে না।) পাঠক, আপনি চাইলে এও লক্ষ করে থাকতে পারেন, নাইকি কোম্পানির জুতায় এমন লোগো তাহলে সত্যি সত্যি ব্যবহার করা হয়েছিল যেটাকে আরবিতে আল্লার নাম হিসাবে পড়া যায়! এবং বাচ্চাদের বইতে নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে হীন ধারণা প্রদান করাও হয়েছিল সত্যি-সত্যি! একটা দেশে, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য, সেখানে ঐ অল্পসংখ্যক লোকের প্রতি খ্রিস্টীয় মনোভাব এতে পরিষ্কার ধরা পড়ে না কি? পরিষ্কার কি বোঝা যায় না যে, এটা এমন একটা খ্রিস্টান-সমাজ যেখানে ব্যবসায়ীরা জুতায় তাঁদের চোখে 'বিধর্মী' মুসলমানদের আল্লার নাম লেখে, আর বাচ্চাদের বইতে তাদের নবী সম্পর্কে হীন জ্ঞান দেয়া হয়?

ব্রিটানিকার ঐ একই প্রবন্ধ [Britannica 2002] থেকে আরো জ্ঞান লাভ করা যায় পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগাঠনিক ভিত্তি সম্পর্কে। জানা যায়, ঐ সমাজে ইসলামের প্রসারের কারণে সমাজে, তাঁদের ভাষায়, 'নানারকম সমস্যা' দেখা দিচ্ছে। আরও জানা যায়, সেখানকার মুসলমান-সমাজের নেতারা অভিযোগ করেছেন যে, মুসলমান মানেই সহিংস – এরকম ঢালাও, একপেশে, বর্ণবাদী ব্যাখ্যা মিডিয়া দিচ্ছে। *ব্রিটানিকা*-ওয়ালারাই বলছেন যে, মুসলমান-সমাজের নেতারা অবশ্য চেষ্টা করছেন তাদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানেও, ঐ একই কারণে, ইসলাম প্রসারের কারণে। ফলে মিডিয়া থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে *ব্রিটানিকা* কিন্তু স্বীকারই করছে যে, ইওরোপীয়-মার্কিন মিডিয়াতে মুসলমানদের যথাযথ চিত্রায়নের ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু সমস্যা আছে, এবং এই সমস্যার কারণ হলো ঐ সমাজে ইসলামের প্রসার। এই তাহলে পশ্চিমা মিডিয়ার ইসলামের প্রসার প্রতিহত করার কায়দা। পরিস্থিতি এরকমই; অস্বীকার করার উপায় *ব্রিটানিকার*ও নেই! ভালো করে না-জেনে-বুঝে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে দাবিদার লোকেরা এই সমাজকে 'সেক্যুলার' বলে ভাবতে ভালোবাসেন। একেবারে শুরুতে বলেছিলাম, এখন আবার মনে করিয়ে দেই, এর জন্য দায়ী কিন্তু মনোজগতে আধুনিকতা নামক ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের উপনিবেশ।

এবারে বিশ্বনন্দিত পণ্ডিত এডওয়ার্ড উইলিয়াম সাঈদের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলব। তার কথার মানে ঠিকঠাক মতো বোঝার জন্যই তাঁর পরিচয়টা একটু পেশ করে রাখতে চাই। সাঈদ জন্ম নিয়েছেন জেরুজালেমে, ১৯৩৫ সালে। ছোটবেলায় লেখাপড়া করেছেন

জেরুজালেম ও কায়রোর পশ্চিমা স্কুলে। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন- ও হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে চুকিয়েছেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাট। জন্মসূত্রে আরব-খ্রিস্টান ও পৈতৃকসূত্রে মার্কিন এই নাগরিক সাম্প্রতিক লেখায় জানিয়েছেন:

> অজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে পাশ্চাত্য এবং ইসলাম সম্পর্কে মার্কা এঁটে দেওয়ার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ওই এঁটে দেওয়া তকমা মনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে। আর এমন সব বিভ্রান্ত বিষয়কে সত্য হিসেবে আমাদের সামনে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় যে যথার্থ সত্যের উপলব্ধি আমাদের হয় না। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ১৯৯৪ সালের একটি ঘটনার কথা। ওয়েস্ট ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দেবার পর দর্শকসারি থেকে একজন লোক দাঁড়িয়ে 'পাশ্চাত্য' সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে আক্রমণ করতে শুরু করল। যেমনভাবে গোঁড়া ইসলামপন্থীরা পাশ্চাত্যকে আক্রমণ করে তেমনি। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করলাম এক পর্যায়ে সে রাগত স্বরে বলল,'তাহলে আপনি স্যুট টাই পরেছেন কেন, ওগুলো তো পশ্চিমাদের?' কথাটা বলেই সে বসে পড়ল। [সাঈদ, ২০০১]

কী অদ্ভুত কথা! পশ্চিমা মানেই স্যুট-টাই পরা, আর স্যুট-টাই পরা মানেই পশ্চিমা হয়ে যাওয়া! তার মানে, এক দিকে, স্যুট-টাই না-পরলে পশ্চিমা হওয়া যায় না (কারণ তা তাঁদের 'স্বাভাবিক' পোশাক), আর অন্য দিকে, আপনি যদি পশ্চিমের নানান অসঙ্গতির কথা তোলেন, তাহলে আপনি স্যুট-টাই পরার যৌক্তিকতা হারান। আমরা কি বুঝতে পারছি, পশ্চিম-উপনিবেশ-খ্রিস্টায়ন-অপরায়ন কেমন করে একাকার হয়ে থাকে?

পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠন এমনই যে, এমন-কি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এবং অতিশয় ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের মধ্যেও ঐ মনোগঠন এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তৈয়ার করতে থাকে 'সংখ্যালঘু' মুসলমানের সামাজিক পরিচয়। মোটেও মনোহর নয় সেই পরিচয়। কুরায়শি বলছেন, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রচুর আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মখোমুখি হয়েছেন; শুধু ডেনমার্কে নয়, সুইডেন, জার্মানি, এমনকি পর্তুগালের মতো দেশেও; প্রকাশ্য জায়গায় চোখরাঙানি, রাস্তায় থুতু নিক্ষেপ, এবং মিডিয়ার কাছ থেকে অস্বস্তিকর প্রশ্ন – এইসব তাঁকে মোকাবেলা করতে হয়েছে [Quraishy, 2001]।

১১ সেপ্টেম্বরের পরে যে-দুইটা ঘটনায় কুরায়শি সবচে বেশি আঘাত পেয়েছেন তাদের মধ্যে প্রথমটা তাঁর খুব ভালো এক বন্ধুর কাছ থেকে যিনি বিনয়ী, শিক্ষিত এবং জাতিগত 'সংখ্যালঘু'দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন; তাঁদের মধ্যকার অনেক লোকের সাথে তাঁর বন্ধুত্বও আছে। সেই বন্ধু ভদ্রলোক ব্যাশি কুরায়শিকে ই-মেলে লিখেছেন:

> প্রিয় ব্যাশি, আমি তোমাকে অনেক দিন ধরে চিনি। তুমি সবচে পরিশীলিত মানুষদের একজন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আমাদের রাস্তা আলাদা করা ছাড়া পথ নেই। আমরা ডেনমার্কীয়রা এবং তোমরা মুসলমানরা আর এক সাথে বসবাস করতে পারি বলে আমার মনে হয় না। [Quraishy, 2001] (অনুবাদ আমার – স.র.ন.)

এমনই এই পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠন যে, রীতিমতো উদার ভালোমানুষ একজন নাগরিকের সাথে আরেকজন একইরকম নাগরিকের বন্ধুত্ব টেকে না কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাঁদের একজন ধর্মপরিচয়ের দিক থেকে মুসলমান। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের বিদ্বেষায়নের মাত্রা কতটা বিস্তৃত হলে এমনটা সম্ভব তা কি

ভেবে দেখার মতো নয়? পাঠক, আমি কি বোঝাতে পারছি, পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠনের অনিবার্য প্রতিফলনই ঘটায় না শুধু, ঐ মনোগঠনটাকে নিত্যদিন নবায়নও করে?

এবারে মুসলমান নাগরিকদের আনুগত্য ও সুনাগরিকত্ব বিষয়ে একজন 'সভ্য' প্রধানমন্ত্রীর হেদায়েত প্রসঙ্গে জনাব কুরায়শির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে চাই। প্রচারণামাধ্যমের উপরোক্ত মনবিষানো প্রচারণার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে নয়, বরং ১১ সেপ্টেম্বরের পরের পরিস্থিতি কীভাবে সামলানো যায় তা নিয়ে আলাপের জন্য ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী পোল নাইরাপ রাসমুসেনের সাথে প্রাইভেট মিটিং ছিল কুরায়শিদের সংগঠন *বর্ণবাদ-বিরোধী ইউরোপীয় নেটওয়ার্ক* এর সাথে। জাতিগত দিক থেকে 'সংখ্যালঘু' এমন সংগঠনসমূহের এই জোটের প্রতিনিধিদের সাথে কোনো কথাবার্তায় না-গিয়ে তাঁদেরকে তিনি হেদায়েত দিতে শুরু করলেন: "সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করো, লেখাপড়া ঠিকমতো শেখো, গণতন্ত্রের আদর্শগুলাকে সম্মান দেখাও, আর ডেনমার্কের সংবিধানের ওপরে কোরাণকে স্থান দেয়ার মতো অনুচিত কাজ করো না" [Quraishy, 2001]। প্রতিনিধিরা তো হতভম্ভ। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁদের সুনাগরিকত্ব এবং ডেনমার্কের প্রতি আনুগত্য নিয়ে এরকম বর্বরভাবে প্রশ্ন তুললেন কেন তা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। অথচ ঐ প্রতিনিধিদের বেশিরভাগই তাঁদের সারা জীবন কাটিয়েছেন ডেনমার্কে, কিন্তু তাঁদের জন্ম মুসলমান ঘরে হওয়াতে দেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী!! পরের দিন মিডিয়ায় খবরটা পরিবেশন করা হলো এভাবে: "প্রধানমন্ত্রী মধ্যপন্থী মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।" কী পরিহাস!

ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের মিডিয়া-ক্রুসেড

১৯৯৫ সালেই স্যাম হুসেইনির কাছে মনে হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলিট মিডিয়া ও সেই দেশের জ্ঞানরাজ্যের বিশেষজ্ঞবৃন্দ ইসলামের বিরুদ্ধে 'নয়া ক্রুসেড'-এ লিপ্ত আছেন [Husseini, 1995]। পাঠক, লক্ষ করুন, পশ্চিমা মহাপ্রফেসর, ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কার তাত্ত্বিক, স্যামুয়েল হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে তার সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব হাজির করতে গিয়ে [Huntington, 1993] বলেন, "... পশ্চিম ও ইসলাম ১৩০০ বছর ধরে সংঘাতে লিপ্ত, এই সংঘাত থামার আশা নাই।" পশ্চিমা শাসকশ্রেণী ও তাঁদের মতাদর্শিক পণ্ডিত-যোদ্ধাগণ কখনো এই সংঘাতের কথা ভোলেন না। তাঁরা সেই ক্রুসেড থামার কোনো আশাও দেখেন না। তারা বরঞ্চ সেই ক্রুসেডকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর ওপর পশ্চিমের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে চান। সেই ১৯৯৩ সালেই প্রফেসর হান্টিংটন পশ্চিমা নেতাদেরকে সবক দিচ্ছেন কীভাবে ইসলামকে মোকাবেলা করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, ইসলাম এবং কনফুসীয় সভ্যতা পশ্চিমের জন্য "হোস্টাইল" সভ্যতা, এদের সামরিক শক্তিকে বাড়তে দেয়া পশ্চিমের জন্য ঠিক কাজ হবে না; বরং পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে আমেরিকার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে। তার মানে পশ্চিমের দিক থেকে ক্রুসেডের সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত আছে অনেক আগে থেকেই; অথচ ক্রমাগতভাবে তাঁরা দোষ দিয়ে চলেছেন ইসলামকে। দোষ দেয়া চলছে এই মর্মে যে, ইসলামই সহিংস, সন্ত্রাসী – মজ্জাগতভাবে।

পশ্চিমের এই ক্রুসেডার-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বার্নার্ড লুইসের লেখায়। "মুসলমানদের দুর্বার ক্রোধের শেকড়" নামের প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, মুসলমানদের দুর্বার ক্রোধের কারণ হলো, তারা আসলে একেবারে ভেতর থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী, পশ্চিমের নীতিবোধ-মূল্যবোধকে তারা মেনে নিতেই পারে না – তাই তারা সন্ত্রাসী [Lewis,

1990]।

এইভাবে পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম ও তার পণ্ডিতবর্গ ইসলামের একটা নেতিবাচকভাবে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় বা ইমেজ নির্মাণের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে মিডিয়া-ক্রুসেড অব্যাহত রাখে। টেলিভিশনের টক শোগুলাও তাদের অবদান রাখতে পিছপা হয় না। "This Week with David Brinkley" নামের একটা টিভি টক শো'র ২৭ জুন ১৯৯৩ এর অনুষ্ঠানের বক্তারা ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদী জোশে বলছিলেন, পশ্চিমের অস্তিত্বটাই ইসলামী মৌলবাদের উদ্ভবের গোড়ার কারণ; কাজেকাজেই পশ্চিমকে সতর্ক থাকতে হবে এমন একটা মুসলিম মৌলবাদ সম্পর্কে যারা পশ্চিমকে ঘৃণা করে; শুধু তাই নয়, এর বিরুদ্ধে পশ্চিমকে যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো রাস্তাই খোলা নাই – যেখানে এদেরকে দেখা যাবে সেখানেই এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে – এখনো কেন যে পশ্চিম সেটা পর্যাপ্তভাবে করছে না! "সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ এই কথা বলছে, ওরা আমাদের ঘৃণা করে। আমরা মদ্যপান করি। আমরা উচ্ছৃঙ্খল, যা যা ওদের অরুচি আমরা তাই তাই ...।" "আমাদের গণতন্ত্র আর মানবাধিকারও আছে, আরো নানাকিছু আছে – এগুলা ওদের কাছে আশ্চর্য বস্তু।" "এগুলা ওরা ঘৃণা করে।" কী চমৎকার প্রচারণা: মুসলমান মানেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের যম-বিরোধী। তাদের 'পশ্চাদপদতার' সামাজিক-ঐতিহাসিক-ঔপনিবেশিক কোনো প্রকার কারণ নেই। মুসলমানদের রক্তের মধ্যেই তাহলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-বিরোধিতা আছে। পাঠক, এই হয় পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের প্রচারণার নমুনা। আর এবার, ১১ সেপ্টেম্বরের পরের কালে, প্রেসিডেন্ট বুশ তো সরাসরি "ক্রুসেড"-ই ঘোষণা করে দিলেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী বারলুসকোনি তো এতোদূর অব্দি গেলেন যে বলেই বসলেন: ইসলামী সভ্যতা খ্রিস্টান পশ্চিমের চেয়ে হীন। এদিকে, ডেনমার্কের *পিপলস পার্টি*-র নেতা আরো এক ধাপ এগিয়ে ড্যানিশ পার্লামেন্টের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন গত ৫ অক্টোবর। [Quraishy, 2001]

এহেন 'মুক্ত' সমাজে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় নির্মাণের বেলায় যে-দিকগুলো পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম খেলিয়ে তোলে তার কায়দাকানুনগুলার কিছু নমুনা এবারে দেখা যাক।

মুসলমান, তোমার নাম কী? ধর্মে পরিচয়

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে (যে-কথা ওপরে একটু আগে বলা হয়েছে) *বর্ণবাদবিরোধী ইওরোপীয় নেটওয়ার্কের* 'সংখ্যালঘু' প্রতিনিধি-দলটাতে ৮ জন মেয়ে ছিলেন। তাঁরা সবাই 'স্বাভাবিক' ইওরোপীয় পোশাক-পরা ছিলেন, শুধু সোমালীয় এক মেয়ের মাথায় ছিল স্কার্ফ। পরদিনের মিডিয়া কেবল ঐ প্রতিনিধি মেয়েটার ছবি ছাপল। এটা হলো 'সংখ্যালঘু' মুসলমানদের সামাজিক ভাবমূর্তি বানানোর বেলায় পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের অন্যতম কায়দা – মুসলমানদেরকে শুধু তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ে চিহ্নিত করা। ভাবখানা এমন, যেন মুসলমানের আর কোনো সামাজিক বা পেশাগত পরিচয় থাকতে পারে না। একজন খ্রিস্টান-ব্যক্তি ডাক্তার বা রাজনীতিবিদ হতে পারেন, কিন্তু একজন মুসলমানের পরিচয় হচ্ছে যে, সে মুসলমান, ব্যস, আর কিচ্ছু না।

এই ধারারই আরেকটা দৃষ্টান্ত: ১৯৯৩ সালে বিশ্ব-বাণিজ্যকেন্দ্রে হামলা বিষয়ক মামলার সংবাদ পরিবেশন করতে যেয়ে এপি'র এক শিরোনামে [AP, March 5, 1994] লেখা হয়, "মুসলমানরা অভিযুক্ত" [Husseini, 1995]। পাঠক, দেখুন, যে-লোকগুলা মামলায় অভিযুক্ত হলো, তাদের দলীয়-রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক বা নিদেনপক্ষে অপরাধগত অন্য কোনো

পরিচয় নেই; একটাই পরিচয় তাদের; তারা মুসলমান। হুসেইনি তাই ন্যায্য প্রশ্ন তুলেছেন: এপি বা অন্য কোনো প্রচারণামাধ্যম কখনো কি লিখবে "ইহুদিরা অভিযুক্ত"? গর্ভপাত-বিরোধী জঙ্গিদের সম্পর্কে কি কখনো লেখা হবে যে, এরা "খ্রিস্টান মারদাঙ্গায়" লিপ্ত? সবাই জানেন, তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি, এপি কিন্তু যেনতেন কোনো ফুচকা-প্রতিষ্ঠান নয়। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচে পুরোনো এবং সবচে বড় সংবাদ-সংস্থা। এর জন্ম সেই ১৮৪৮ সালে। সংবাদ এবং শিরোনাম লেখার 'নিয়মকানুন' আমরা উনাদের কাছ থেকেই শিখি। আমাদের এবং বিশ্বের আরো অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শেখানোর বিভাগগুলোতে সম্পাদনা শেখানোর যে-স্টাইলশিট অনুসরণ করা হয়, সেটা এই এপি-ইউপিআই-স্টাইলশিট। (ইউপিআই বা ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যশনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটা বিশাল সংবাদ-সংস্থা।)

মুসলমানদের বেলায় তাঁদের ধর্মপরিচয়টাকেই সবচেয়ে বেশি করে সামনে আনার আরেকটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। ২০০০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরে *বিবিসি*-তে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে ভাষ্যকার সাহেব সব দেশের বেলায়ই খেলাধুলায় সে-দেশের অর্জন বা সে দেশের ইতিহাস বা বিশেষ কোনো ভালো দিক বলছিলেন, এবং সেটাই রীতি; কিন্তু যখনই কোনো মুসলমান-প্রধান দেশের পালা আসছিল তখনই তাঁর গলা দিয়ে বেরুচ্ছিল ইসলাম, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ; এবং আলজেরিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব প্রভৃতি হরেক কিসিমের দেশকে ঐ এক 'ইসলামী' পরিচয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছিল [Quraishy, 2001]। পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমকে খেলার মাঠেও এভাবে আঙুল উঁচু করে বলতে হয়, ঐ যে মুসলমান! পাঠক, পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অপরায়নের কায়দা এই প্রকারেরও হয়; হামেশাই।

মুসলমান মানেই মৌলবাদী

পশ্চিমা শাসকশ্রেণী এবং তাঁদের প্রচারণামাধ্যমের সবচে বড় টার্গেট এখন মৌলবাদ। এটা তাঁরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে চলেছেন। প্রচারণা, এক্ষেত্রে এমনভাবে চলছে যেন মৌলবাদ মানেই ইসলামী মৌলবাদ; যেন ইসলাম মানেই মৌলবাদ, আর, মৌলবাদ মানেই ইসলাম। আসলেই কি তাই? ইতিহাস কিন্তু একেবারেই তা বলে না।

'মৌলবাদ' শব্দটাকে ইংরেজিতে বলে fundamentalism। *এনসাইকোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২০০২ ডিলাক্স এডিশান সিডি-রম* এবং *মাইক্রোসফট্ এনকার্টা এনসাইকোপিডিয়া ২০০২ সিডি-রম* বলছে, fundamentalism নামক পদার্থটার জন্ম ১৯-শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টীয় পুনরুজ্জীবনবাদী প্রোটেস্ট্যান্ট ধারার মধ্যে। বাইবেলের সত্যকে অকাট্য মনে করা এই ধারার বৈশিষ্ট্য। এঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা ও বিবর্তনবিদ্যার ঘোর বিরোধী। ২০-শতকে মার্কিন ধর্মীয় ও সেক্যুলার জীবনে 'আধুনিক' প্রবণতাসমূহের বিরোধিতা হিসেবে এই মৌলবাদের প্রসার। ২০-শতকের শেষ ভাগে অসংখ্য চার্চ-সংস্থায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং বিশেষ বিশেষ সংগঠনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিনিধিত্ব ঘটে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অসংখ্য খ্রিস্টান ধর্মগোষ্ঠী মৌলবাদের নানা রূপের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। এঁদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রুপ সশস্ত্রও বটে।

খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে পাওয়া 'মৌলবাদ' কথাটা পরে আস্তে আস্তে সকল ধর্মমতের ক্ষেত্রেই সেই ধর্মমতের গোঁড়া ও আদি রীতি-নীতি-শিক্ষার অন্ধ অনুসারীদেরকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে। পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের তেলেস্মাতিতে এখন সারা বিশ্বের মানুষকে এমন

ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমান মানেই মৌলবাদী এবং মৌলবাদী মানেই মুসলমান, ইসলাম ধর্মটিই মৌলবাদী। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের সাম্প্রতিক উত্থানকে রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা না-করে শুধু সমাজ-সময়-উর্দ্ধ অনড় ধর্মশাস্ত্র দিয়ে বিচার করাটা পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করে না। ওয়াশিংটন ডি.সি.র জর্জটাউন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর অধ্যাপক এবং মুসলমান-খ্রিস্টান ভাববিনিময়-কেন্দ্রের পরিচালক জন এল. এস্‌পোসিটো-ও তাই মনে করেন। *The Islamic Threat: Myth or Reality?* গ্রন্থের এই লেখক পরিষ্কার বলছেন যে,

> 'মৌলবাদ' কথাটা, যার জন্ম খ্রিস্টান-ধর্মমতে, ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলোকে বর্ণনা করার বেলায় বিভ্রান্তিকর হতে পারে। সৌদি আরবের রক্ষণশীল রাজতন্ত্র, লিবিয়ার বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং মোল্লা-চালিত ইরাণ এই সবাইকেই বলা হচ্ছে 'মৌলবাদী', কিন্তু শব্দটা দেশ তিনটার পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। লিবিয়া ও ইরাণ, উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবিরোধী ধ্যানধারণাকে বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করেছে; আবার সৌদি আরব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট মিত্র। রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকা বোঝানোর জন্য 'রাজনৈতিক ইসলাম' বা 'ইসলামতন্ত্র' কথাগুলা আরো কাজের। [Esposito, 2002]

'মৌলবাদী' নামক গালিটির ব্যবহার নিয়েও রাজনীতি চলে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরবকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মৌলবাদী বলে না, মধ্যপন্থী বা মডারেট বলে [Husseini, 1995], কেননা সৌদি আরব গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন-মিত্র। কিন্তু সৌদি আরবের নৈতিক ও আর্থিক মদদপুষ্ট তালিবানরা মৌলবাদী, কারণ তাঁরা মার্কিন তেল-সরবরাহ-পরিকল্পনায় সাড়া দেয় নি।

মুসলমান মানেই সহিংস

মুসলমানদের সম্পর্কে ১৯৯৮ সালের বার্ষিক পর্যালোচনা-প্রতিবেদন লিখতে যেয়ে *ব্রিটানিকা*-র পণ্ডিতরা শুরুই করছেন মারামারি দিয়ে [Britannica, 2002-a]। কেননা, একদিকে পশ্চিমা সমাজের গভীর ও প্রখর খ্রিস্টীয় মনোগাঠনিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যদিকে তাঁদের প্রচারণা-মাধ্যমের মুসলমান-বিরোধী ক্রুসেডের কারণে পশ্চিমা জগতে এখন মুসলমান বলতে এক প্রকার মারাত্মক সহিংস প্রাণীকে বোঝায় যারা শান্তি, শুভ, কল্যাণ ও গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে। তাই দুনিয়া-বিখ্যাত ঐ পণ্ডিতগণ তাঁদের প্রতিবেদনের শুরুতেই বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলমানদের যে-বৈশিষ্ট্যটা খুবই প্রবল ছিল এবং যেটা ১৯৯৭ সালেও বজায় ছিল সেটা হলো সহিংসতা, আক্রমণ, হামলা। পশ্চিমা দুনিয়ায় এই হয় মুসলানের সামাজিক পরিচয়। এই পরিচয় আপনাআপনি পয়দা হয় নি, এটাকে তৈয়ার করা হয়েছে। তৈয়ার করেছে পশ্চিমা শাসকশ্রেণীর প্রচারণা-মাধ্যম, এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক হাতিয়ারসমূহ (যেমন বিশ্ববিদ্যালয় বা ব্রিটানিকা-বিশ্বকোষ)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে মুসলমানরা বৃহৎ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী। সংখ্যায় ৫৫ লক্ষ; জনসংখ্যার ২ শতাংশ। ইহুদিদের সমান প্রায়। *লস এঞ্জেল্‌স্ টাইম্‌স্* (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৪) এর পুরানা এক হিসাবমতে, চলতি শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচে বড়ো অ-খ্রিস্টান ধর্ম হবে ইসলাম [Husseini, 1995]। অথচ, *ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক অ্যাকিউরেসি*-র যোগাযোগ-পরিচালক জনাব স্যাম হুসেইনির কাছ থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতিদিনের জীবনের যে-মিডিয়া-বিবরণী তাতে মুসলমানদের উল্লেখ খুবই বিরল। রমজানের মতো ধর্মীয় ঘটনা

আসে-যায়, মিডিয়া খুব কমই লক্ষ করে। মুসলমানরা প্রচারণামাধ্যমের 'সংবাদ'-এ জায়গা পান শুধুমাত্র যখন তাঁদের সাথে কোনো-না-কোনো ধরনের সহিংসতার সম্পর্ক থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের প্রতি যতোটা মনোযোগ দেয়া হয় তার বেশির ভাগটাই পায় আফ্রিকান-আমেরিকানদের সংগঠন লুই ফারা খানের 'নেশান অফ ইসলাম'। এঁরা বর্ণবাদী, ইহুদি-বিদ্বেষী, গোঁড়া। এঁরা সাদাদের তুলনায় কালোদের নরগোষ্ঠীগত বা বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। এঁরা মনে করেন, আল্লাহপাক এঁদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার। এঁরা এঁদের আদি নেতা, ১৮৭৭ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ও ১৯৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমনকারী, ওয়ালি ফারাদ বা ডব্লু. ডি. ফার্দকে আল্লাহ্‌র 'অবতার' বা নবী মনে করেন [Britannica, 2002-c]। এঁদের অনুসারী প্রায় ১০ হাজার, অর্থাৎ ২০ লক্ষ আফ্রিকান-আমেরিকানের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ। মুসলমানদের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশের এহেন 'ধর্মান্ধ' পরিচয়কে সাধারণভাবে মুসলমানদের পরিচয় হিসেবে সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম নেশান অফ ইসলামকে পছন্দ করে।

পশ্চিমের প্রচারণামাধ্যম এমনভাবে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় বানায় যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়াটা একমাত্র তাদেরই বৈশিষ্ট্য। সহজেই পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমগুলা ভুলে যায় যে, মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সন্ত্রাস পরিচালনা শুরু করার বহু আগে থেকে পৃথিবীতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই ছিল। উদাহরণ হিসাবে প্যালেস্টাইনে সারা দুনিয়ার ইহুদিদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 'স্টার্ণ গ্যাং' ও 'ইরগান', এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী দীর্ঘ লড়াইয়ে 'আফিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বা এএনসি'র যেভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ব্যবহার করেছে এখানে তার সামান্য বিবরণ দেয়া যেতে পারে।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিদ্যার প্রফেসর ড. ভজটেক মাস্তনি জানাচ্ছেন [Mastny, 2002]: পৃথিবীতে রাজনৈতিক অর্থে সন্ত্রাসী তৎপরতার শুরুই ইহুদিদের হাতে – খ্রিস্টীয় ১ম শতকে – যখন জিলটরা (একটা ইহুদি ধর্মীয় গোষ্ঠী) রোমানগণ কর্তৃক বর্তমানে যেটাকে ইসরায়েল বলা হয় সেটার দখলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। সেটা ছিল শুরু। তারপর ব্রিটিশদের কাছ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে প্যালেস্টাইন দখল করে নিয়ে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গড়ে ওঠে উচ্চ মাত্রায় সশস্ত্র 'আত্মপ্রতিরক্ষা' বা 'হাগানাহ্‌', 'ইসরাইলের স্বাধীনতা-যোদ্ধা' বা 'লোহামে হেরাত ইসরাইল' (সংক্ষেপে 'স্টার্ন গ্যাং' বলে অধিকতর পরিচিত) এবং 'জাতীয় সামরিক সংগঠন' বা 'ইরগান জ্ভায় লিউমি'র মতো চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৪ সালে ইসরাইলের ভবিষ্যৎ-প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন প্রতিষ্ঠা করেন 'ইরগান' গেরিলাবাহিনী। ইসরাইলের আরেক ভবিষ্যৎ-প্রধানমন্ত্রী আইজাক শামিরও এই ইরগান-এর সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁকে দু-বার গ্রেপ্তার করেছিল। ১৯৪০ এর দশকে আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই দলগুলোর তৎপরতা ছিল বলার মতো। বহু ব্রিটিশের প্রাণহানি ঘটে সেসব ঘটনায়। একটা দৃষ্টান্ত: ১৯৪৬ সালে কিং ডেভিড হোটেলে ব্রিটিশ সরকারের অফিসে মারাত্মক বোমাহামলায় মারা যায় ১০০ জনেরও বেশি লোক। 'হাগানাহ্‌'র দুই সদস্য খুন করেছিল মিসরের কায়রোয় আবাসিক ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড ময়েন-কে।

অন্য দিকে, ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির ডিন ড. ও'মিয়ারা এবং ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক-পরিবর্তন-অধ্যয়ন-কেন্দ্রের পরিচালক ড. উইনচেস্টার জানাচ্ছেন [O'Meara and Winchester, 2002]: দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলার বিচার শুরু হয় ১৯৬৪ সালে এএনসি'র

সামরিক শাখা 'জাতির বর্শা'র সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সাথে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের প্রধানত স্যাবোটাজ-কর্মকাণ্ডকে তাঁরা নিজেরা বলতেন "যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত সহিংসতা"। এই সংগঠনটি সহিংস তৎপরতা চালাচ্ছিল ১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৬৩-৬৪ পর্যন্ত। এর পরেও বটে। তো, ১৯৬৪ এর এপ্রিল মাসে ম্যাণ্ডেলা যে-জবানবন্দী দেন, তাতে তিনি বলেন, যাঁরা ঐ সামরিক সংগঠনটি গড়ে তোলেন তিনি তাঁদের একজন ছিলেন এবং ১৯৬২ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এর তৎপরতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, এএনসি'র 'সন্ত্রাসী' তৎপরতা এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পর্যায় থেকেই পরিচালিত হতো। মজার ব্যাপার হলো, ম্যাণ্ডেলাদের এই সংগঠনের কর্মকর্তাদের পদবী-নামগুলো তাঁরা নিয়েছিলেন উপরোক্ত ইহুদি 'সন্ত্রাসবাদী' সংগঠন 'ইরগান'-এর সংগঠন-পরিচালনা-পদ্ধতির কাছ থেকে। কে কাকে সন্ত্রাস শেখায়! কে কাকে ইতিহাস শেখায়! আর পাঠক, সেই সাথে মনে রাখুন, মেনাহেম বেগিন এবং নেলসন ম্যাণ্ডেলা উভয়ই পরবর্তী কালে, যথাক্রমে ১৯৭৮ ও ১৯৯৩ সালে, **শান্তির জন্য নোবেল-পুরস্কার** পেয়েছিলেন। (আরাফাতের জন্যেও হয়ত আমরা একটা নোবেল-শান্তি-পুরস্কার ভবিষ্যতে আশা করতে পারি, যদি তিনি তত দিন বেঁচে থাকেন!)

এইসব তথ্য আমরা পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে পাব না। সেখানে পাব শুধু এই কথা যে, পৃথিবীতে সহিংস/সন্ত্রাসী মানেই মুসলমান কেউ, যেন আর কোনো ধর্মাবলম্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠী কোনো দিন কোথাও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় নি। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির বিবরণ মেলে স্যাম হুসেইনির কথায়: 'গোঁড়া মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা' কীভাবে 'ইসলামী মৌলবাদী সহিংসতা'র ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে 'ইসলামী হুমকি' সৃষ্টি করছে সেরকম সব রিপোর্টে পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমগুলা এমনভাবে ঠাসা থাকে যে, গড়পড়তা মার্কিনীদের বিশ্বাস করা স্বাভাবিক, ইসলামের মৌলচেতনার মধ্যেই আছে ধ্বংসের প্রশিক্ষণ; এই রকম বিশ্বাসের জন্যে তাদেরকে হয়ত দোষও দেয়া যায় না। পরিস্থিতি এতই খারাপ যে, আরো ৬/৭ বছর আগে ১৯৯৫ সালের একটি জনমত-যাচাইয়ে [*L.A. Times*, May 6, 1995] ৪৫ শতাংশ মার্কিনী বলেছিলেন যে, "মুসলমানদের মধ্যে ধর্মান্ধ হওয়ার প্রবণতা আছে" [Husseini, 1995]।

২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন-টাওয়ার ও পেণ্টাগনে হামলার পর মুসলমানদের এই সহিংস/সন্ত্রাসী সামাজিক পরিচয়ের আরো অবনতি ঘটেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বরে *সিএনএন* সাক্ষাৎকার নেয় মার্কিন একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ জনাব উইলিয়াম টেইলরের। ১১ তারিখের হামলা সম্পর্কে তিনি বলছিলেন:

> হামলা কারা করেছে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, জঙ্গী মুসলমানরা এতে জড়িত থাকার বিরাট সম্ভাবনা আছে। [Quraishy, 2001] (অনুবাদ আমার – স.র.ন.)

দেখুন, "কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই", তবু "আমার মনে হয়" মার্কা বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান জাহির করা হচ্ছে যে, "মুসলমানরা এতে জড়িত থাকার **বিরাট সম্ভাবনা** আছে"!!! কেমন অবলীলায় এই বিশেষজ্ঞ-ব্যক্তি-জনাব বিষোদগার করছেন মুসলমানদের সম্পর্কে। আসলে ধরেই নেয়া হয় যে, মুসলমানরা তাঁদের ধর্মকে এগিয়ে নেয়ার জন্য 'সন্ত্রাস' এর আশ্রয় নেয়। মিডিয়া কোনো প্রকার পরীক্ষানীরিক্ষা না-করেই এই 'বিশ্বাস' বা 'ধারণা'র ওপর দাঁড়িয়ে প্রচারণা চালায়, বিদ্যমান 'বিশ্বাস' বা 'ধারণা'কেই আরো পোক্ত করে। হাজার-লক্ষ মুসলমান যাঁরা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরিতে নিয়োজিত থেকে সেদেশের অর্থনীতিতে

অবদান রাখছে সে-ব্যাপারটা মিডিয়ার নজরেই আসে না। এরকম শান্তিকামী লাখো মানুষের প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধ মিডিয়ার উপজীব্যই হয় না। টিভি-ফিল্মে কোনো আরব পরিবারের ছবি কখনো দেখানো হয় না কিংবা যাঁরা আর দশ জনের মতো স্বাভাবিক আচরণ করেন তেমন কোনো আরবকে টিভির সিনেমায় কখনো দেখা যায় না – বলেছেন একজন বিশেষজ্ঞ জ্যাক শাহীন [Quraishy, 2001]।

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানরাই কেন প্রধান টার্গেট

কারো কারো মনে এরকম ধারণা আসতে পারে যে, মুসলমানরা মুসলমান বলেই, তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের এই প্রচারণা। এরকম ধারণার পেছনে এক ধরনের সত্যতা ছোঁয়া আছে বৈকি, কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের একটা সামরিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রুসেড বরাবরই অব্যাহত আছে। পশ্চিমের উপনিবেশ ইসলামকে পশ্চিমা ছাঁচের "আধুনিক" বানাতে তেমন একটা সফল হয় নি। এর মানে হলো, তথাকথিত ইসলামী বিশ্ব পশ্চিমের চশমা দিয়ে জগতবিচার করে না। তাদের সমাজ কমই পশ্চিমায়িত হয়েছে যতটা হয়েছে ভারতবর্ষ। কাজেই, ইসলামকে ইসলাম বলেই তার বিরুদ্ধে বিষোদগারের একটা প্রবণতা পশ্চিমা মিডিয়ার আছে বৈকি! কিন্তু সেটাই সব নয়। পশ্চিমা মিডিয়া হলো পশ্চিমা বড়লোক শাসক শ্রেণীর মিডিয়া। এ শুধু ইসলাম বা মুসলমানের মুখকেই বাঁকাভাবে দেখায় না অপরাপর জাতিধর্মভাষাসংস্কৃতির মানুষকেও দেখায় বিকৃত 'অপর' হিসাবে। "'অপর'কে দানবে পরিণত করাটা কোনো প্রকার শোভন রাজনীতির ভিত্তি হতে পারে না" – এডওয়ার্ড সাইদের এই বিচার পশ্চিমের বিবেক-বিবেচনাবোধে কোনো সাড়া তৈরি করে না। তারা এশীয়, কালো, আফ্রিকীয়, ল্যাটিনো প্রভৃতি মানুষদেরকে গৎবাঁধা ছাঁচে পরিবেশন করে। কালো মানুষ মানেই সামাজিক অপরাধের সাথে যুক্ত হবার প্রবণতাসম্পন্ন, কিংবা স্থূল বুদ্ধির লোক, কিংবা হাস্যকর কোনো চরিত্র; অথবা নারী মানেই কোমল, সুন্দর, নির্বিবাদ, ভোগযোগ্য, যৌনদ্রব্য – এই প্রকার আরো নানান ধারণা বা 'সংখ্যালঘু'র সামাজিক ইমেজ যে পশ্চিমের প্রচারণামাধ্যম প্রতিদিন নির্মাণ করে চলেছে সেটা পশ্চিমের গবেষকদের অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

মুসলমানদের বেলায় পশ্চিমের বিশেষ মনোযোগের আরেকটা কারণ হলো তেল। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার তেলগ্যাস সম্পদ এই অঞ্চলকে পশ্চিমের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্ববহ করে তুলেছে। ফলে মিডিয়াতে মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ ইমেজ তুলে ধরা গেলে তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আক্রমণের পক্ষে প্রচ্ছন্ন একটা জনমত সবসময়ের জন্যে চাঙ্গা রাখা যায়।

আরো একটা কারণও শনাক্ত করা যায় পশ্চিমের মুসলমান-বিদ্বেষের পেছনে। নোম চমস্কি ও এডওয়ার্ড এস হারম্যান [Herman and Chomsky, 1994] দেখিয়েছেন, মার্কিন মিডিয়ার জন্য সবসময় একটা জাতীয় শত্রু দরকার পড়ে। এই শত্রুর ছায়ার বিরুদ্ধে সদাসর্বদা যুদ্ধ বজায় রাখা তাদের মতাদর্শিক সিস্টেমের অনিবার্য কৌশল। এইভাবে, কমিউনিজম্-বিরোধিতা একসময় তাদের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল। সেই শত্রুর বিরুদ্ধে 'সভ্যতা ও গণতন্ত্র রক্ষার' লড়াইয়ের দোহাই দিয়ে এতদিন পশ্চিম সারা বিশ্বে তার আধিপত্য ও বাণিজ্য বিস্তারের কাজ চালিয়ে গেছে, আর এখন ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তো যুদ্ধই ঘোষণা করেছে সবচে বড়ো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ। মানে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যএশীয় অঞ্চলে সামরিক-ব্যবসায়িক-তৈলাক্ত আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তাই সন্ত্রাসবাদের নাম ভাঙিয়ে এই

অঞ্চলের মুসলমান-প্রধান দেশগুলাকে (একের পর এক ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, ইরান) 'সাইজ' করার জন্য সহজেই টার্গেট করা যায়। সেই জন্য এখনকার জাতীয় শত্রু হলো সন্ত্রাসবাদ (মানে ইসলামী দুনিয়ার দেশগুলা)। এটাও একটা কারণ যা দিয়ে আপনি পশ্চিমের প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার উদ্দেশ্যকে অনেকখানি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

বাংলাদেশের 'সংখ্যালঘু'র প্রশ্ন

পৃথিবীর সব দেশের বেলায়ই কিন্তু অধিপতি শাসক ও অবনত গোলাম শ্রেণীর মধ্যেকার 'সংখ্যালঘু'র সামাজিক পরিচয় নির্মাণ সংক্রান্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশগুলা কমবেশি একই রকম। বাংলাদেশের হিন্দু 'সংখ্যালঘু'দের সম্পর্কেও আমাদের সমাজে (এবং প্রচ্ছন্নভাবে হলেও মিডিয়াতে), এই ধারণা প্রচলিত আছে যে তারা যথেষ্ট দেশপ্রেমিক নয়; তারা আসলে 'ওপারের' প্রতিই বেশি টান বোধ করে; তারা আসলে ভারতকেই তাদের দেশ মনে করে; এদেশের 'সংখ্যালঘু'দের ওপর আসলে কোনো নিপীড়ণ নাই বললেই চলে; তারা এদেশে যথেষ্ট ভালো আছে; তারা আসলে এতো ভালো থেকেও ভারতে টাকা জমায়, দেশে পাকা বাড়িঘর বানায় না, সবসময় এক পা ওপারের দিকে তুলেই রাখে; কিংবা হিন্দুরা কৃপণ, ওদের দেবদেবীদের ধারণা হাস্যকর, এমন কি ওরা কতলযোগ্য 'কাফের' – এরকম নানান ধ্যানধারণা আমাদের সমাজের মানুষদের মধ্যে নানা মাত্রায় কমবেশি আছে বলে পর্যবেক্ষণ থেকে মনে করা যায়।

বঙ্কিম রস উৎপন্ন হয় মস্তিষ্কে, যখন দেখি, ইহুদিদের বিরুদ্ধে কী কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার একটা তালিকা প্রদান করেছেন প্যাট রবার্টসন তাঁর *The New World Order* বইতে। এই বই আর তার ইহুদিবিরোধী ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব পরিবেশনের দিকটা অধিপতি ধারার বা প্রধান ধারার প্রচারণামাধ্যমে গুরুত্ব পেল ঠিকই কিন্তু তাদের কাছে গুরুত্ব পেল না এই তথ্য যে, ঐ বইতে রবার্টসন সরকারী পদসমূহ থেকে মুসলমান ও **হিন্দুদেরকে** বাদ দেয়ার জন্য সরাসরি আহবান জানিয়েছেন [Robertson, 1995]। ভারতবর্ষের নিরন্তর গলাগলি-মারামারি করা হিন্দু-মুসলমান উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর মধ্যকার ইহুদিদের চোখে আপত্তিকর 'সংখ্যালঘু' বলে চিহ্নিত হতে থাকে। কি পরিহাস!

শুরুর দিকেই বলেছিলাম, আমাদের দেশের 'সংখ্যাগুরু' মুসলমানদের মনের মধ্যে 'সংখ্যালঘু'র মনঃস্তাত্ত্বিক গূঢ়ৈষণার বেদনা-সঞ্চার করা এই প্রবন্ধের অন্যতম দিক। সেই লক্ষ্যেই বলতে গেলে, মূলত বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি মুসলমান-প্রধান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রবন্ধের এখানে-ওখানে এটা-সেটা বলেছি। ফলে, অসতর্ক পাঠকের মনে এই প্রকার সরল হিসাব কাজ করতে পারে যে, যেসব কায়দায় পশ্চিমা খ্রিস্টান সমাজ 'সংখ্যালঘু' মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করে, বাংলাদেশের মুসলমান সমাজও বুঝি ঠিক সেই সেই কায়দায় 'সংখ্যালঘু' হিন্দুদের সামাজিক পরিচয় বানিয়ে তোলে। হিসাবটা এরকম **সরল** করলে চলবে না মোটেও। আসলে যে-দুই পরিস্থিতির পরোক্ষ তুলনা আমরা ঐ বাক্যে করেছিলাম সেই দুই পরিস্থিতির মধ্যে **বিপুল** অমিল রয়েছে; বিশেষত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অমিল। পশ্চিমে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ইতিহাস, আর বাংলাদেশের মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের সম্পর্কের ইতিহাসে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। দুনিয়াতে মানুষ নামক প্রাণীর ধাতই এমন যে, দেশ-কাল-কালচারের ভেদ বিচার না-করে (লিঙ্গগত বা শ্রেণীগত; ভেদ বিচারের প্রশ্নও এর মধ্যে পড়ে) কোনো সমাজের একটা হিসাবকে ফর্মুলা

হিসাবে আর কোথাও সরলভাবে খাটাতে গেলেই বিপত্তি শুরু হয়। আবার এ-কথাও সত্য যে, একটা সমাজকে আমরা কষ্ট করে পাঠ করি অন্য কোনো সমাজকে বোঝার বেলায় পূর্বপাঠজনিত শিক্ষাকে কাজে লাগাব বলেই, তাই না? পূর্বপাঠকে কাজে লাগানোর বেলায় দেশ-কাল-কালচারের ভেদ বিচার করার বিষয়টি সতর্কভাবে বিবেচনায় নিতে হবে – ইহাই কহিতব্য। এক্ষেত্রে যত বেশি সতর্কতা তত বেশি উপকার। পশ্চিমা সমাজ, বিশেষ করে প্রচারণামাধ্যম, যেভাবে 'নিজের' (মানে শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান) বিপরীতে 'অপর'কে (মানে কৃষ্ণাঙ্গ, ল্যাটিনো/হিস্পানি, আদিবাসী মার্কিনী, মুসলমান) নির্মাণ করে তাতে কতকগুলা ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ফ্যাক্টর জারি থাকে ঠিকই কিন্তু তাই বলে আমরা যেন মোদ্দা জায়গাটা থেকে পা হড়কে না-যাই। সেই জায়গাটা হলো, এক কথায়, সমাজের অধিপতি অংশ কর্তৃক নিপীড়িত অংশকে 'অপর' বানানো। বাংলাদেশের সমাজে (প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নির্বিশেষে) 'সংখ্যালঘু' হিন্দুরা যেভাবে-যেভাবে 'অপর'-এ পরিণত হয়েছে তা নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমাদেরকে পশ্চিমা সমাজের 'অপরায়ন'-প্রক্রিয়ার কথাও মাথায় রাখতে হয়।

প্রশ্নটা 'পশ্চিম বনাম অপশ্চিম'-এর নয়

পশ্চিমকে বোঝাতে এই প্রবন্ধে যে মাঝেমধ্যে 'সভ্য', 'আধুনিক', 'অগ্রসর' ইত্যাদি বিশেষণ তীর্যকভাবে ব্যবহার করেছি সেটা পশ্চিমের সমাজকে কটাক্ষ করার জন্যই কেবল, তাচ্ছিল্য করার জন্য নয়। উদ্দেশ্য বা প্রস্তাব – এই সবের বেলায় – এইটা না যে, অপশ্চিম পশ্চিমের চেয়ে বেশি উন্নত, কিংবা পশ্চিম আগাগোড়া প্রত্যাখানযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য। উপনিবেশের জাহাজে চড়ে 'আধুনিকতা'র বিশ্বদখলের অভিযানের কথা আমরা কিন্তু সদাসর্বদা মনে রাখি। সেই জন্যই বুঝতে পারি, পশ্চিমই মানব-মুক্তির কেবলা বলে যে-কথা সারা দুনিয়ায় রটে আছে তাহা ঠিক নহে। পশ্চিমও, অনেক দিক থেকেই, অপশ্চিমের কাছে হাত পাততে পারে (আর অপশ্চিম তো পশ্চিমের কাছে হাত পেতেই আছে)। মোট কথা, পশ্চিম-অপশ্চিমের মধ্যে কে 'উন্নত' এবং কে 'অনুন্নত' সেটা আমাদের ঝামেলা না। প্রশ্নটা মানুষের মুক্তির বা স্বাধীন বিকাশের – সব দেশের মানুষের। বিকাশের এই প্রশ্নটা আসলে লড়াইয়ের প্রশ্ন: মানুষের 'খাঁচা'র সীমাকে প্রসারিত করার পথে যত বাধা আছে তার সকল রূপ বা ধরনের বিরুদ্ধে 'বন্দী' মানুষের লড়াই। অরিজিনাল রেফারেন্স চাই অন্যান্য 'জন্য'র পাশাপাশি 'সংখ্যালঘু' নামে পরিচিত পশ্চিমের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ের প্রশ্নগুলাকে চিনে নেওয়ার জন্যেও এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রশ্নগুলার মধ্যে (সর্বপ্রধান না-হলেও অন্তত) অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হলো, উপনিবেশ-'আধুনিকতা'-সাম্রাজ্যবাদ-'বিশ্বায়ন' এর একদা-লৌহ-অধুনা-ডিজিটাল শেকলের ধারাবাহিকতাটাকে চিনে নেয়ার প্রশ্ন। পশ্চিমের সমস্ত কিছু সোজাসাপ্টা ঢালাওভাবে খারিজ করে দেয়ার মানে সেখানকার মানুষের অর্জনগুলাকেও খারিজ করা। এই ভ্রান্তিবিলাস করতে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদেরকে এই প্রবন্ধের লেখক ভালোবাসেন না; কারণ তাঁরা দেখতে চান না, যাহা পশ্চিমের মানুষের অর্জন তাহা সাধারণভাবে নিখিল মানুষের লড়াইয়ের অর্জনও বটে; কেননা তথাকথিত 'গোলকায়নের' বহু আগে থেকেই, এক্কেবারে আদি থেকেই, দুনিয়া আসলে **একটা** এবং সেইটা গোল এবং বিশ্ব-বৈচিত্র্য-বিকাশের মধ্য দিয়েই তার আজকের অস্তিত্ব।

বিশ্ব-ফাটানো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের মতো পণ্ডিতের এবং একই মনোভাবাপন্ন মিডিয়ার ইসলামবিরোধী সেন্টিমেন্টকে প্যালেস্টাইনী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, *প্রাচ্যবাদ* নামের যুগান্তকারী গ্রন্থের প্রণেতা এডওয়ার্ড সাঈদ উপযুক্তই বলেছেন: "সর্বশেষ বর্ণবাদ, যা জায়েজ" [*Alternative Radio*, 25 April 1995]। হান্টিংটনের 'সভ্যতার

সংঘাত' তত্ত্বকে সাঈদ খানিকটা আদর করে 'অজ্ঞতার সংঘাত' [সাঈদ, ২০০১] নাম দিয়েছেন। তিনি বলছেন:

> পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম ... এই মৌলিক প্যারাডাইমটি কিছুদিন আগেও তেমন জনপ্রকাশ্যে, জোরোশোরে উচ্চারিত হয়নি: ভেতরে ভেতরে ছিল– সন্তর্পণে ও সংগোপনে: কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আলাচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ...
>
> কিন্তু পাশ্চাত্য এবং ইসলাম– এ বিষয় দুটোকে কেন আলাদা করে দেখা হয়? কেন ভাবা হয় না এতে করে সংঘাত ক্রমশ বাড়বে বই কমবে না? কেন ওসামা বিন লাদেন এবং তাঁর অনুসারীদের এমন একটি সম্প্রদায় হিসেবে দেখা হয় না যেমন দেখা হয় গায়ানার রেভারেন্ড জিম জোন্স কিংবা জাপানের ওম শিনরিকিও এবং তাঁদের অনুসারীদের? ...
>
> ... চূড়ান্তভাবে 'পাশ্চাত্য' বা 'ইসলাম'– জাতীয় তকমাগুলো এবং তাদেরকে সাধারণীকরণ করা কিংবা 'আমাদের' সংস্কৃতি 'অন্যদের' থেকে উন্নততর এ ধরনের ধারণা পোষণ করা যে কতটা মূল্যহীন তা সহজেই বোঝা যায়। 'পাশ্চাত্য' বা 'ইসলাম' এ ধরনের বিভাজন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কেবল বিভেদের দেয়ালই সৃষ্টি করা হয় না, বরং জাতিসত্তা এবং জাতীয়তার মধ্যে কেবল সীমাহীন বির্তক এবং অমোচ্য পার্থক্যই সৃষ্টি করা হয়। মরুভূমির বালিতে একটি রেখা এঁকে ক্রুসেড শুরু করা যায়, বলা যায় তাদের মিথ্যাকে আমরা সত্য দিয়ে প্রতিহত করছি কিন্তু তাতে মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না: জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের সূচকগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না।

আমাদের দরকার প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রচলিত, ঔপনিবেশিক অর্থ ভেঙে ফেলা। নতুন অভিধান আমাদেরকে ইশারা দেবে: আমাদের দরকার প্রাচ্যায়ন, পাশ্চাত্যায়ন নয়। প্রাচ্যায়ন মানে ওরিয়েন্টেশান; মানে জানাশোনা, লেনদেন ও পারস্পরিক পরিচয়; পাশ্চাত্যায়ন মানে পশ্চাতে যাওয়া – সূর্যের বা অন্য কারো। এমন-কি সুর্যেরও পশ্চাতে যাওয়া মানে রাত। আর অন্য কারো পশ্চাতে যাওয়া মানে নতুন করে ঔপনিবেশিক আধুনিকতায়নের খপ্পরে পড়া – উহা আমাদেরকে সনাতন-চিরন্তন 'মানুষ' থেকে উচ্ছেদ করে; মানুষকে খণ্ডিত করে ফেলে কখনও ভুগোল, কখনও ধর্ম, কখনও ইতিহাস, কখনও অন্য কোনও মর্মে। দরকার পূর্বে যাওয়া, যেদিকে সূর্য ওঠে, নতুন দিগন্ত দেখা যায়। পশ্চিমে বরফ, রাত, অন্ধকার। পূর্বে মৃত্তিকা, আলো, উষ্ণতা। সেই জন্যেই সুমন বলেন, 'সন্ধ্যা নামার সময় হলে পশ্চিমে নয় পূবের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবব আমি কোন দিকে রাত হচ্ছে ফিকে'। এটা পশ্চিম বনাম অপশ্চিমের প্রশ্ন নয়– সর্বজনীন মনুষ্যত্বের অগ্রগতির সওয়াল। প্রাচ্যায়ন, মানে মানবেতিহাসের বি-উপনিবেশিকরণ, ছাড়া ইতিহাসের গরাদ থেকে পশ্চিম বা প্রাচ্য কারোরই মুক্তি নাই। ইহা হয় এই প্রবন্ধের উপসংহার।

বইপত্রের হদিস

রায়, অরুন্ধতি [২০০১], "'ইনফিনিট জাস্টিস'-এর বীজগণিত", *প্রথম আলো*, ৫ই অক্টোবর ২০০১। [*দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকায় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে প্রকাশিত লেখার অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন জিকরুল ইসলাম]

সাঈদ, এডওয়ার্ড (২০০১], "অজ্ঞতার সংঘাত", *প্রথম আলো*, ২২শে অক্টোবর ২০০১। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *দ্য নেশন* পত্রিকায় ২২ অক্টোবর ২০০১ প্রকাশিত "দ্য ক্ল্যাশ অফ ইগনোরেন্স" নামক প্রবন্ধের

অনুবাদ।]

Bagdikian, Ben [1997]. *The Media Monopoly*. 5th Edition. Boston: Beacon Press.

Britannica [2002-a], 'Islam'/'Year in Review 1998: Religion', *Britannica 2002 Deluxe Edition CD-ROM.*

Britannica [2002-b], “Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-1998”, *Britannica 2002 Deluxe Edition CD-ROM.*

Britannica [2002-c], “Nation of Islam”, *Britannica 2002 Deluxe Edition CD-ROM.*

Esposito, John L. [2002], "The Rise of Islamic Fundamentalism", *Microsoft Encarta Deluxe Encyclopedia 2002*.

FAIR [2001], “Networks Accept Government ‘Guidance’”, *Media Advisory*, 12 October, http://www.fair.org/extra/writers/husseini.html

Herman, Edward S. and Chomsky, Noam [1994]. Manufacturing Consent: The Political Eonomy of the Mass Media. UK: Vintage.

Huntington, Samuel [1993], “The Coming Clash of Civilizations”, *Foreign Affairs*, Summer/93; *New York Times*, 6/6/93.

Husseini, Sam [1995], "Islam: Fundamental misunderstanding about a growing faith", *Extra!*, July-August 1995, http://www.fair.org/extra/ 9507/islam.html.

Lewis, Bernard [1990], “The Roots of Muslim Rage”, *The Atlantic*, 9/90.

Mastny, Vojtech [2002], “Terrorism”, *Microsoft Encarta Deluxe Encyclopedia 2002*.

O’Meara, Patrick and N. Brian Winchester [2002], “Nelson Rolihlahla Mandela”, *Microsoft Encarta Deluxe Encyclopedia 2002*.

Quraishy, Bashey [2001], “The stereotyped image of Islam has a become crutch on which the survival of the western cultural identity depends”, http//www.multicultural.net/news letter/article/issue3-bashey.htm

Robertson, Pat [1995]. *Extra!*, Update 6/95, http://www.fair.org/extra/.

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

রবার্ট ফিস্ক

যখন সাংবাদিকরা ভুলে যান যে হত্যা হত্যাই

তরজমা: উদিসা ইসলাম

> বস্তুনিষ্ঠতার জন্য বিশ্ববিখ্যাত পশ্চিমা 'তথ্যমাধ্যম' হত্যাকাণ্ডের মতো হার্ড ফ্যাক্ট পরিবেশনের সময় পর্যন্ত কীভাবে প্রচারণা-প্রকৌশলের আশ্রয় নেয় রবার্ট ফিস্ক তা দেখিয়েছেন এই লেখায়। প্যালেস্টাইনে ইসরাইলী দখলদারিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিবিসি ও সিএনএন এর রিপোর্টিং-এর প্রবণতাগুলা বিশ্লেষণ করে ফিস্কের সিদ্ধান্ত: 'যুদ্ধ সবসময় বাচনিক ছলনার জন্ম দেয়।' মূল লেখাটা ইন্টারনেট থেকে নেয়া: www.zmag.org।

আমাদের রিপোর্টগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের কী ধরনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে? গত বুধবার হেবরনের পশ্চিম তীর হতে রয়টারের পাঠানো সংবাদটি জর্জ অরওয়েল হয়তো-বা পছন্দ করতেন। বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতনামা সংবাদসংস্থাটি রিপোর্ট করেছে যে, "ছদ্মবেশী ইসরাইলী সৈন্যের গুলিতে গতকাল ইয়াসির আরাফাতের ফাত্তা উপদলের একজন সদস্য নিহত হয়েছে, ফিলিস্তিনীরা এই নিহত হওয়ার ঘটনাকে গুপ্তহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে"। এই বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল "এটাকে ফিলিস্তিনীরা গুপ্তহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে"। যেকোনো সুস্থমস্তিষ্কের পাঠক–ইমাদ আবু নেহে, ইসরাইলী "এজেন্টরা" যার মাথায়, বুকে, পেটে এবং পায়ে দশটি গুলি বিদ্ধ করেছে–সেটাকে শুধু গুপ্তহত্যা বলে ক্ষান্ত হবে না বরং সরাসরি হত্যাকাণ্ড হিসেবেই আখ্যায়িত করে বসবে। কিন্তু না। ফিলিস্তিন-ইসরাইল ট্র্যাজিক সংঘাতের ওপর অন্যান্য সকল বড়ো সংবাদ-সংস্থা এবং টেলিভিশন-কোম্পানিগুলোর মতোই রয়টার্সও হত্যাকাণ্ড শব্দটিকে যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করছে না।

অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের সময় যখন সেখানকার সরকারি ডেথ স্কোয়াড জঙ্গী বিদ্রোহীদের গুলি করে হত্যা করতো তখন স্পষ্ট করে কেউ সেকথা বলতো না। যদিও তারা ঠিকই হত্যা এবং গুপ্তহত্যা সম্পর্কে কথা বলতো। যখন ল্যাটিন আমেরিকান খুনীরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করে তখনো তারা একই কাজ করে। আমি এখনো এমন একটা সংবাদপত্র দেখি না যারা বেলফাস্টের আইআরএ কিংবা ইউডিএ'র গুণ্ডাদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে সরাসরি হত্যাকাণ্ড কিংবা নিদেনপক্ষে "গুপ্তহত্যা" হিসেবে রিপোর্ট করতে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

পিছুপা হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলীদের হাতে যখন প্রতিপক্ষ নিহত হয় তখন রয়টার্স কিংবা সিএনএন কিংবা অতি সম্প্রতি তাদের মতোই ধুসর সাংবাদিকতায় নাম লেখানো বিবিসি'র দৃষ্টিতে সেটাকে হত্যাকাণ্ড কিংবা গুপ্তহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না। ইসরাইলীরা যা ঘটাচ্ছে সেটাকে কেবল ফিলিস্তিনীরাই "গুপ্তহত্যা" হিসেবে "আখ্যায়িত" করছে বলে প্রচার করা হয়। যখনই ইসরাইলীরা জড়িত থাকে তখন আমাদের সত্য রিপোর্ট করার ক্ষমতা, আমাদের নৈতিক ভাবনার পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

সিএনএনও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে, কেবল একপক্ষের বেলায় বছরের পর বছর ধরে "সন্ত্রাসী" প্রত্যয়টির ব্যবহার বর্ণবাদী এবং একইসাথে পক্ষপাতমূলকও বটে। একজন ফিলিস্তিনী যে গত সপ্তাহে জেরুজালেম পিসারিয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে বোমা ফাটালো তখন একজন টেলিভিশন রিপোর্টার তার সম্পর্কে এই প্রত্যয়টি ব্যবহার করলে তারই সহকর্মী দ্বারা সাংবাদিকতার মানদণ্ডের অবনতি ঘটানোর জন্য সরাসরি তিরস্কৃত হন। এমনটিই হওয়া উচিত। কিন্তু দিনে দিনে আমাদের রিপোর্টিং-এর মান খারাপই হচ্ছে, ভালো নয়। যেসব ঘটনা ইসরাইলকে বিপর্যস্ত করতে পারে সেগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের সম্পাদকরা তাদের সাংবাদিকদেরকে সব সময় নমনীয় এবং মধুরভাষী হতে অনুরোধ করছেন। সেকারণেই, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যখন কোনো ইসরাইলী মারা যাচ্ছে তখন ফিলিস্তিনীরা হত্যা করেছে বলে প্রতিনিয়ত রিপোর্ট করা হচ্ছে কিন্তু যখন দশ বছরের ফিলিস্তিনী শিশুও মারা যায় তখন সেটাকে "সংঘাত"-এ মৃত হিসেবে রিপোর্ট করা হয়– যেন এই "সংঘাত" ভূমিকম্প বা বন্যার মতো কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো নেমে আসে, যেন এই ট্রাজেডির জন্য কেউ দায়ী নয়।

হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ইসরাইলের দায়দায়িত্ব শনাক্ত করার একটা সহজ উপায় হলো সেটাকে "ক্রস-ফায়ার" হিসেবে আখ্যায়িত করা। গত বছর গাজায় ইসরাইলী সৈন্যদের হাতে নিহত হওয়া ছোট্ট ফিলিস্তিনী বালক মুহম্মদ-ইল-দুরার ফিলিস্তিনে ইন্তিফাদার (গণঅভ্যুত্থান) মহান প্রতীকে পরিণত হয়েছে। *দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট* পত্রিকার সংবাদদাতা সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা, যারা এই বালকের মৃত্যুর ঘটনাটি তদন্ত করেছেন, তারা বলেছেন, যে-বুলেটটি বালকটিকে আঘাত করেছিল নিঃসন্দেহে সেটি ইসরাইলীদের (যদিও যে সৈন্যের গুলিতে বালকটি নিহত হয়েছিল সে হয়তো না দেখেই গুলি চালিয়েছিল)। নেসেটে একজন ইসরাইলী সংসদ সদস্য কতৃক এই হত্যাকাণ্ডের ভুয়া সামরিক তদন্তটি নাকচ করে দেয়ার পরও পশ্চিমের প্রধান ফটোসংস্থাগুলো তাদের ভবিষ্যত গ্রাহকদের জন্য ফটোটির নিচে একটা ভুল ক্যাপশন লিখে দেয়। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই অনুমান করতে পেরেছেন। ক্যাপশন হিসেবে লেখা হয়, বালকটি "ক্রস ফায়ারে" মারা গেছে।

যুদ্ধ সবসময় বাচনিক ছলনার জন্ম দেয়। যুদ্ধকে আখ্যায়িত করার জন্য "পরোক্ষ ক্ষতি" থেকে শুরু করে "শত্রুর অবনতি" ঘটানোর মতো মলম জাতীয় প্রত্যয় এবং পরিচ্ছন্ন রূপকের সৃষ্টি করা হয়। ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত এরকম বেশ কিছু প্রত্যয় উৎপাদন করেছে। ইসরাইল কর্তৃক কোনো শহর অবরোধের ঘটনা হয়ে ওঠে "বন্ধ করে দেয়া", ইসরাইলের মূল ভূখণ্ড এবং তাদের অধিকৃত ভূখণ্ডের মধ্যকার আইনী সীমারেখা হয়ে ওঠে "মিলন রেখা", ফিলিস্তিনী রাজাকাররা, যারা ইসরাইলীদেরকে সহায়তা করছে তাদেরকে বলা হচ্ছে "সহযোগী", ইসরাইলী অধিকৃত ভূখণ্ড হয়ে ওঠে "বিতর্কিত", আর আরব ভূখণ্ডে অবৈধভাবে গড়ে তোলা ইহুদী বসতিকে বলা হয় "প্রতিবেশী এলাকা"। চমৎকার! এই নিরীহ ইহুদী বসতি আবার ব্যতিক্রমহীনভাবেই "ফিলিস্তিনী" জঙ্গী দ্বারা আক্রান্ত হয়।

যখন আত্মঘাতী হামলাকারীরা বোমা ফাটায় তখন ইসরাইল তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে

আখ্যায়িত করে কিন্তু ফিলিস্তিনীদের দৃষ্টিতে তাদেরকে "শহীদ" বলা হয়। সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হলো ইসরাইল কর্তৃক নির্বিচার হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে তাদের গা ছমছমে ভাষা প্রয়োগ: "তাক করে হত্যা"। এরকম ভয়ানক বাজে প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যদি কিছুটা হলেও জঘন্য রসিকতা থেকে থাকে, তবে আমাকে বলতেই হবে যে, সেটা হলো ফিলিস্তিনীরা বোমা বানাতে গিয়ে যখন নিজেদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তখন সেই ঘটনাকে ইসরাইলীরা পাগলামির চূড়ান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে: ইসরাইলীদের ভাষায় তারা মারা যায় "কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায়"।

ইসরাইলী এবং ফিলিস্তিনীরা এই শব্দগুলো পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করে বলেই যে আমি উদ্বিগ্ন তা নয়, বরং এই শব্দগুলোর প্রতি আমাদের সাংবাদিকদের নতজানু মনোভাবই আমার উদ্বেগের কারণ।

মাত্র এক সপ্তাহ আগেই আমি *'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট'* পত্রিকায় লিখেছিলাম যে ফিলিস্তিনী নাগরিক হত্যাকাণ্ডগুলোকে গুপ্তহত্যা হিসেবে প্রকাশ না করে বরং ইসরাইলের পক্ষে যায় এরকম তাদের নিজস্ব ভাষা "তাক করে হত্যা" হিসেবে আখ্যায়িত করে বিবিসি ইসরাইলী কূটনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। বিবিসি'র এসাইনমেন্ট সম্পাদক ম্যালকম ডাউনিং, যিনি এই নতুন ধরনের শব্দ প্রয়োগের বিধান জারি করেছেন, তিনি আমাকে একারণে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি তিরস্কার করে বলেন, আমি পক্ষপাতদুষ্ট, একতরফা এবং বিভ্রান্তিকর; তার ভাষায়: বিবিসি মনে করে "গুপ্তহত্যা" শব্দটি শুধু "উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের" হত্যাকাণ্ডগুলোর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত।

কিন্তু মি. ডাউনিং-এর প্রত্যুত্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ইসরাইলী হত্যাকাণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে বিবিসি সুনির্দিষ্টভাবে "তাক করে হামলা" ধরনের শব্দ ব্যবহারের যে পরামর্শ দেয় সে-সম্পর্কে আমি আমার নিবন্ধে যা উল্লেখ করেছিলাম সেদিকে ইঙ্গিত করতে তার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। বিবিসি নিজে থেকে প্রত্যয়টি আবিষ্কার করেনি। এটা ইসরাইলীদের সৃষ্টি।

আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না যে, মি. ডাউনিং যা করেছেন সেটা বুঝে-শুনে করেছেন। তার সহকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে তাকে একজন ভালো বন্ধু হিসেবেই বিবেচনা করেন। কিন্তু এটা তাকে অনুধাবন করতে হবে যে, তার রিপোর্টারদেরকে "তাক করে হত্যা" শব্দটি ব্যবহার করতে বলার মাধ্যমে তিনি শুধু ভুল সাংবাদিকতাই নয় প্রকৃত আর্থেই তথ্যের বিভ্রান্তি ঘটাচ্ছেন। এ-কয়দিনে, ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট আততায়ীদের হাতে দুইজন শিশুসহ মোট সতেরজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ সাধারণ ফিলিস্তিনী জনগণ গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছে। সুতরাং, বলা যায়, হত্যাকাণ্ডগুলো ছিল ভয়ঙ্কর– তাক করে হত্যাই বটে। আমি এটা স্মরণ না করে পারছি না যে, যখন বিবিসির জিল ডান্ডোকে তার বাড়ির সিঁড়িতে নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করা হলো সেক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ ছিল না যে একজন ব্যক্তি তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে "তাক করেছিল"। কিন্তু বিবিসি এভাবে বলে নি। তারা এটাকে খুন হিসেবে শনাক্ত করলো। এবং এটা তাই ছিল।

গত এক সপ্তাহে সিএনএন, বিভিন্ন সংবাদ-সংস্থা এবং বিবিসি আরও একবার সত্যের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। যখন বেইট জাল্লাতে ফিলিস্তিনী বন্দুকধারীরা জিলো ইহুদী বসতির ওপর হামলা চালালো তখন সংবাদমাধ্যমগুলোর কাছে এটা হয়ে উঠলো "বিতর্কিত" ভূখণ্ডে "ইহুদী প্রতিবেশী এলাকা"; যদিও এই ভূখণ্ড নিয়ে কোনো "বিতর্ক" থাকা তো দূরের কথা বরং আইনগতভাবেই বেইট জাল্লা ফিলিস্তিনীদের সম্পত্তি (হিব্রু "জাল্লা" শব্দটিকেই "জিলো" হিসেবে ব্যবহার করা হয়)। কিন্তু টেলিভিশনের দর্শক এবং সংবাদপত্র পাঠকদের এই সত্যগুলো বলা হলো না।

যখন পরবর্তী রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট গুপ্তহত্যার শিকার হলো একজন ফিলিস্তিনী হামাস সদস্য তখন একজন টেলিভিশন সাংবাদিক–এক্ষেত্রে বিবিসি–ঘটনাটিকে সংকুচিত করে আমাদেরকে বলেন যে তার নিহত হওয়ার ঘটনাটিকে "ইসরাইলীরা তাক করে হত্যা করা হিসেবে বিবেচনা করছে কিন্তু ফিলিস্তিনীরা এটাকে গুপ্তহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে"। আপনি নিশ্চয় সমস্যাটি বুঝতে পারছেন। ইসরাইলী ভাষ্য দ্বারা গভীর সংকটে নিমজ্জিত বিবিসির সাংবাদিকটিকে "ভারসাম্য' রক্ষা করতে হয়েছে ফিলিস্তিনী ভাষ্য উদ্ধৃত করে। যেনবা তিনি একজন ক্রীড়া সাংবাদিক, নিয়মভঙ্গের জন্য কোনো পক্ষকে দোষারোপ করতে অনাগ্রহী।

পরবর্তী কয়েকদিন ধরে টেলিভিশন-রিপোর্টিং-এ মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত–"তাক করে হত্যা", "প্রতিবেশী এলাকা", "বিতর্কিত", "সন্ত্রাসী", "সংঘাত" এবং "ক্রস-ফায়ার"–এই মূল প্রত্যয়গুলোর প্রতি লক্ষ করুন। এরপর নিজেকেই প্রশ্ন করুন কেন এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি দুপক্ষের সম্পর্কেই সম্পূর্ণ সত্যটা জানতে আগ্রহী। উভয়পক্ষের সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রেই "সন্ত্রাসবাদ" প্রত্যয়টির ব্যবহার দেখতে আগ্রহী। যে-ব্যক্তি বোমা মেরে শিশুদের ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তাকে ফিলিস্তিনীদের "শহীদ" হিসেবে আখ্যায়িত করা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। হত্যা হত্যাই। কিন্তু যেখানে মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত সেটাকে টেলিভিশন এবং সংবাদ-সংস্থার রিপোর্টারদের দ্বারা একটি ফুটবল ম্যাচের মতো করে ধারাভাষ্য দেয়া কি সঙ্গত?

এডোয়ার্ড এস. হারম্যান

‘মূল্য হিসেবে এটা ঠিকই আছে’

তরজমা: আ-আল মামুন

> সাংবাদিকতার শাস্ত্রে আছে মাঠে নাই এরকম একটা ‘সংবাদমূল্য’-এর নাম ‘পরিণাম’। এই পদার্থটা মহান পশ্চিমা সাংবাদিকতায় কতটা অনুশীলিত হয় তা মিডিয়াতত্ত্বের ছাত্ররা পরখ করে দেখতে পারেন এই লেখাটাকে অনুসরণ করে। পশ্চিমা মিডিয়া আর সরকারের পররাষ্ট্রনীতির চমৎকার সাজুজ্য এই লেখা উদঘাটন করেছে।
>
> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জি-নেট থেকে (www.zmag.org) এই লেখাটা ডাউনলোড করা হয়েছে। **মানুষ**-এর জন্যই এটা তরজমা করা হয়েছে।

কল্পনা করতে চেষ্টা করুন তো মার্কিন প্রাধান্যশীল ধারার মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা কীরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো যদি তারা জানতে পারতো বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পেন্টাগনের হামলার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের পূর্ববর্তী এক পরিকল্পনা সভায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, হামলার ফলে “পরোক্ষ ক্ষতি” হিসেবে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাবে কিনা? কিন্তু বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে শীর্ষ সন্ত্রাসী নেতার এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে “আমরা মনে করি পরোক্ষ ক্ষতি হিসেবে এই মূল্য ঠিকই আছে।”

আরো কল্পনা করুন, সন্ত্রাসী নেতারা এরপর তাদের অনুসারীদের কাছে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করলো যে, মহাশয়তানের দেশের জনগণকে এটা দেখিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরি যে তারাও তাদের দেশের মাটিতে এরকম আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ নয়– অর্থাৎ কোনোরকম প্রতিশোধমূলক হামলার সম্মুখীন না হয়ে তারা অন্য দেশগুলোতে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করতে এবং তাদের পছন্দের সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রকে সমর্থন করে যেতে পারে না। সন্ত্রাসীরা যুক্তি দেখালো, যেহেতু মহাশয়তান তৃতীয় বিশ্ব এবং আরব দেশগুলোতে যুগ যুগ ধরে স্বল্পমাত্রার (সচরাচর যা স্বল্পমাত্রায় থাকে না) যুদ্ধ চালিয়ে আসছে, সেহেতু এই পরিকল্পিত আক্রমণ হবে আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী এবং জাতিসংঘ সনদের আত্মরক্ষার অধিকারের নীতি অনুযায়ী বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত। এবং ঐ মহাশয়তান প্রতিনিয়তই তার একপাক্ষিক আক্রমণগুলোর পক্ষে এই যুক্তির উপর নির্ভর করে এসেছে।

সন্ত্রাসী নেতারা আরো যুক্তি দেখালো যে, যেহেতু বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং পেন্টাগনে হামলায় সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু

ঘটাতে পারলে ভঙ্গুরতার প্রতীকী মূল্য অনেক বেড়ে যাবে সেহেতু এটাকে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য পরোক্ষ ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সবশেষে কল্পনা করুন যে, সন্ত্রাসী নেতারা তাদের অনুসারীদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলছে, বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে—যার অর্থ সারা বিশ্বের জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনা—সাম্রাজ্যবাদীদের সহিংসতার মূল্য বাড়িয়ে দেয়া জরুরি; এবং মহাশয়তানের জনগণকে প্রভাবিত করা যেন তারা মহাশয়তানটিকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। সন্ত্রাসী নেতারা যুক্তি দেখালো যে, এর ফলে বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্রে এবং পেন্টাগনে বোমাহামলার ফলে যত প্রাণহানী ঘটবে ভবিষ্যতে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের জীবন রক্ষা পাবে।

সন্ত্রাসীদের এরকম ঠাণ্ডা মস্তিষ্কপ্রসূত হিসেবের অমানবিকতায় প্রাধান্যশীল ধারার গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়বে নাকি? তারা কি সমস্বরে বলে উঠবে না যে, একটি রাজনৈতিক দাবিকে পূরণের জন্য ব্যাপক আকারে সাধারণ জনগণকে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক, শয়তানসুলভ এবং অমার্জনীয়? মহাশয়তানকে অব্যাহত যুদ্ধের প্রতিশোধস্বরূপ এবং মহাশয়তানের সাম্রাজ্যবাদী সহিংসতা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা হিসেবে এই হামলা চালানো বৈধ সন্ত্রাসীদের এমন যুক্তি প্রাধান্যশীল ধারার মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা 'অদ্ভুত' আখ্যায়িত করে বাতিল করে দিবে নাকি? প্রাধান্যশীল ধারার মুখপাত্ররা উন্মুখ হয়ে এমন দাবি উত্থাপন করবেন নাকি যে, কখনো কখনো "দুঃখজনক ভুল" করা ছাড়া এই দেশ আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সব সময় সুব্যবহার করে এসেছে, কেবল ন্যায়সঙ্গত কারণে বিভিন্ন সময়ে অন্যদেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করেছে এবং এই দেশ কখনোই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয় কিংবা সন্ত্রাসবাদের সমর্থকও নয় বরং সন্ত্রাসবাদের শিকার? নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে যে-ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তেমন ঘটনাগুলোর পেছনের "যুক্তিসঙ্গত কারণ" কিংবা সেগুলোর বৈধতা সম্পর্কে আমরা যদি কোনোরকম বক্তব্য হাজির করি তবে কি সেটাকে অর্থনৈতিক ও জঘন্য কাজ হিসেবে জোর দিয়ে বলা হবে না? এরকম সহিংস ঘটনার ক্ষেত্রে একমাত্র যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা হয় তা হলো "কে," "কেন" নয় (শেষ বাক্য দুটি একজন মার্কিন উদারপন্থী ঐতিহাসিকের বিক্ষুব্ধ যুক্তির ভিন্ন প্রকাশ মাত্র)। এবং প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষেত্রেই মার্কিন প্রাধান্যশীল ধারার ব্যক্তিবর্গ যুক্তিহীন শত্রু, যারা গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে, কেবল ভাসা-ভাসাভাবে তাদেরকে অভিযুক্ত করা ইত্যাদি ছাড়া 'কেন' প্রশ্নটি সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা করতে নারাজ।

এবার সেই প্রত্যয়টি—যে লক্ষ্য পূরণে একাজ করা হচ্ছে তার দাম হিসেবে এটি ঠিকই আছে—কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সেদিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৯৯৬ এর ১২ই মে 'সিক্সটি মিনিটস্' অনুষ্ঠানটিতে লেসলি স্টহল-এর এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডিলিন অলব্রাইট এভাবে উত্তর দেন:

> স্টহল: আমরা শুনেছি ৫ লক্ষ শিশু মারা গেছে (ইরাকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে)। আমি বলতে চাচ্ছি যে, হিরোশিমার চেয়েও এ মৃতশিশুর সংখ্যা বেশি। এবং আপনি কি মনে করেন, এই মূল্য ঠিকই আছে?
>
> অলব্রাইট: এ-প্রশ্নের জবাব দেয়া খুবই দুরূহ। যে মূল্য ... আমরা মনে করি লক্ষ্য পূরণের মূল্য হিসেবে এটি ঠিকই আছে।

ইরাকের ক্ষেত্রে যদিও মৃতের সংখ্যা ছিল ভিমরি খাওয়ার মতো— সেকেলে হয়ে যাওয়া ১৯৯৬ সালের ইরাকী শিশুমৃত্যুর সংখ্যাকে হিসেবে নিলেও বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্র/পেন্টাগনের বোমা হামলায় মৃতের সংখ্যার তুলনায় সেই সংখ্যা ৮০ গুণের বেশি ছিল— তবু প্রাধান্যশীল ধারার

গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীরা এরকম গণহত্যাকে মেডিলিন অলব্রাইট কর্তৃক ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিতে, মনোযোগ দিলেন না। প্রাধান্যশীল ধারায় অলব্রাইটের এই শব্দ-বন্ধ কালে-ভদ্রে উপস্থাপন করা হয় এবং কখনোই প্রাধান্যশীল ধারায় বিক্ষোভ জেগে ওঠে না কিংবা এরকম ইঙ্গিত করা হয় না যে, কিছু পলিসি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে গণহারে শিশু হত্যা অনৈতিক এবং অমার্জনীয়।

১১ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্র (পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে সাধারণ নাগরিক হত্যার বিষয়টি সবচে' তীব্র, ... এবং মানবিক আবেদনসম্পন্ন মনোযোগ পেয়েছে, যা এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটিকে সুস্পষ্ট এবং নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করে জনগণের মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে প্ররোচিত করে। কিন্তু উল্টো দিকে ইরাকের হাজার হাজার শিশু মৃত্যুর ঘটনা প্রায় অদৃশ্য থেকে যায়, তাদের দুর্ভোগ এবং মৃত্যু চোখের আড়ালে পড়ে থাকে। নিষেধাজ্ঞা জারির কারণে ইরাকী শিশুমৃত্যুর হার বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্র/পেন্টাগনের মৃতের চেয়ে ৮০ গুণের চেয়ে বেশি থাকলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র/পেন্টাগনের ক্ষুদ্র প্রাণহানির পক্ষে যে পরিমাণ মিডিয়াকাভারেজ দেয়া হচ্ছে তা ইরাকী শিশুদের তুলনায় ৫০০ গুণ বেশি। আক্রান্ত ও ভুক্তভোগীদের আলোকচিত্র এবং তাদের দুর্দশা ও বিক্ষুব্ধতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও একই পরিমাণ বেশি কাভারেজ দেয়া হচ্ছে। "গণ-হত্যাযজ্ঞের নিষেধাজ্ঞা"র এমন কুপ্রভাব দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইরাকে কর্মরত ডেনিস হেলিডের মতো জাতিসংঘের যেসব কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন তাদের, জনগণকে জানানোর জন্য ও নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য, মিডিয়াতে খুব সামান্য জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ইরাকী গণ-হত্যাযজ্ঞের ক্ষেত্রে "কে" প্রশ্নের জবাব খুব স্পষ্ট। সুনিশ্চিতভাবেই সেটা মার্কিন ও বৃটিশ নেতৃত্ব– কিন্তু "কে" প্রশ্নটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কারণ "কেন" এবং কীভাবে এমন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়ে গেছে। এবং এটা করা হয়েছে খুবই সঙ্গোপনে। মেডিলিন অলব্রাইট বললেন যে, মূল্য হিসেবে এই মৃত্যু ঠিকই আছে কারণ মার্কিন পলিসি বিষয়টিকে এভাবেই দেখতে চায়– এবং অলব্রাইট কর্তৃক "কেন" প্রশ্নের এমন উত্তর দেয়ার ফলে মিডিয়ার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য পরোক্ষ ক্ষতি হিসেবে সাধারণ নাগরিক হত্যার অনৈতিকতায় মিডিয়ার যাওবা ক্ষোভ জেগে ওঠে তার এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে কারণ ইরাকী শিশুরা মারা যায় মার্কিন পলিসির কারণে– এবং এইক্ষেত্রে মিডিয়া এই বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনারও সুযোগ দেয় না। পরোক্ষ ক্ষতি হিসেবে অযৌক্তিকভাবে সাধারণ নাগরিক হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি মিডিয়া নীরবে একপাশে সরিয়ে রাখে। (আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৮৩ সালে সোভিয়েত কর্তৃক কেএএল-০০৭ বিমান ভূপাতিত করার ঘটনাটিকে কীভাবে বর্বরোচিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল; কিন্তু ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানী বিমান ৬৫৫ ভূপাতিত করার ঘটনাটিকে "দুঃখজনক ভুল" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, সাদ্দাম হোসেন "গণবিধ্বংসী সমরাস্ত্র" অর্জন থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যপ্রসূত জাতিসংঘ-পর্যবেক্ষক-দলকে অনুমতি দিবে কি না মিডিয়া তার উপর আলোকপাত করে; শিশু গণমৃত্যুর উপর নয়। (এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যে ১৯৮০র দশকে সাদ্দাম হোসেনকে এ-ধরনের সমরাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিবাদ করেনি এসব বিষয়ও উল্লেখ করতে মিডিয়া প্রতিনিয়তই ব্যর্থ হয়।)

যেহেতু ৫ লক্ষ শিশুর দুর্দশা ও মৃত্যুর ঘটনাকে মিডিয়া অদৃশ্য করে দিতে পারে সেহেতু বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্র/পেন্টাগনে বোমা হামলায় মৃতদের উপর প্রবল কাভারেজের মাধ্যমে যে-বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলা হয়' সেটাও বলা যায় শুধুমাত্র হতাহতের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়।

যে-উদারপন্থী ঐতিহাসিক বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্র/পেন্টাগনে বোমা হামলার ক্ষেত্রে এমনকি "কেন" প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতেও প্রবলভাবে অনীহ এবং যুক্তি দেখান যে, কেবল "কে" প্রশ্নটিই প্রাসঙ্গিক, তিনি কিন্তু ইরাকী হত্যাকাণ্ডের অনৈতিকতা সম্পর্কে একটা কথাও বলেন না; এইক্ষেত্রে তিনি "কে" প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে একেবারেই আগ্রহী নন– কারণ অংশত এজন্য যে, তাকে প্রত্যেকদিন ইরাকী শিশুদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে না এবং কিছুটা এজন্য যে তার সরকার গণহত্যার যৌক্তিকতা নির্মাণ করার মাধ্যমে "কেন" প্রশ্নের উত্তরপ্রদান করে তাকে সন্তুষ্ট করেছে। এটা কি নৈতিক শীতলতা, এমনকি কিছুটা আতঙ্কজনকও নয় যে, তিনি এবং তার স্বদেশী বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠী কেবল তাদের নিজেদের ৬০০০ মৃত্যুর ঘটনায় এভাবে বেদনার্ত ও বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাবে কিন্তু তার (তাদের) নিজস্ব সরকার কর্তৃক বিদেশের মাটিতে শত শত গুণ বেশি নিরীহ জনগণের উপর অব্যাহতভাবে চালানো হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ থাকবে কিংবা মনোযোগ দিবে না অথবা অনুমোদন করবে?

এসব অতি চমৎকার একটি প্রপাগান্ডা ব্যবস্থার চিত্রই তুলে ধরে। মার্কিন সরকার যেহেতু মনে করে যে, ইরাকী শিশুদের গণমৃত্যু "ঠিকই আছে" তাই মার্কিন গণমাধ্যম এসকল "অনাকাঙ্ক্ষিত বলি"-দের ভাগ্যকে কৃষ্ণ-গহ্বরে ফেলে দেয়। ফলে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এই মার্কিন পলিসি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সন্ত্রাসবাদের শিকার হলো, তখন কিন্তু এর উল্টো প্রক্রিয়া শুরু করা হলো: এক্ষেত্রে মহামূল্যবান বলিদের দুর্দশা ও মৃত্যুকে মিডিয়া প্রবলভাবে তুলে ধরতে থাকে কিন্তু মূল কারণগুলো অনুসন্ধানে একেবারেই আগ্রহ দেখায় না। কেবল "কে" এটা করেছে তার উপর আলোকপাত করে; বিরতিহীনভাবে তারা যুদ্ধের ঢাক বাজাতে থাকে এবং দেশের সবচেয়ে পশ্চাদমুখী গোষ্ঠীকে সামনে ঠেলে দেয়। ফলে মিডিয়াগুলো সহিংসতা ও দমননীতিকেই এভাবে সম্ভাব্য পথ হিসেবে তুলে ধরে। তবু তারা পত্রিকাও বিক্রি করতে থাকবে, বড়ো অডিয়েন্স ধরবে এবং দক্ষিণপন্থীদের কাছে প্রমাণ করতে থাকবে যে, তারাই প্রকৃত আমেরিকান।

রবার্ট ফিস্ক

আমার মার খাওয়া এই জঘন্য যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা এবং ক্ষুব্ধতার একটি প্রতীক

তরজমা : রিপন মাহমুদ

মধ্যপ্রাচ্য তথা প্যালেস্টাইন এবং আফগানিস্তানের আনাচে-কানাচে প্রত্যক্ষভাবে ঘোরাঘুরি করে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে রবার্ট ফিস্কের কোনো জুড়ি নাই। গত ডিসেম্বরে (২০০১) আফগানিস্তান কাভার করার সময় অত্যন্ত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার শিকার হন। তাঁকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল পশ্চিমা বোমা-হামলার কারণে দেশচ্যূত আফগান উদ্বাস্তরা। এই অভিজ্ঞতার বিবরণ আর ফিস্কের অদ্বিতীয় উপসংহার: ওদের জায়গায় আমি হলে ওরকমই করতাম। মূল লেখাটা নেয়া হয়েছে www.zmag.org থেকে।

করমর্দনের মাধ্যমে তারা শুরু করল। আমরা বললাম, “স্লামালাইকুম”– আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক – তারপরই ছোট পাথরটি আমার মুখের পাশ দিয়ে উড়ে যায়। একটি ছেলে আমার ব্যাগ হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তারপর আরেকজন। তারপর কেউ একজন পিঠে ঘুসি মারে। যুবকেরা আমার চশমা ভাঙে, সজোরে চোখে-মুখে-মাথায় পাথর ফেলতে শুরু করে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কপাল বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ছিল আর দু'চোখ বুজে আসছিল। এমনকী এরপরও আমি বুঝলাম। তারা যা করল তার জন্য তাদেরকে দুষতে পারিনি। আসলে, আমিও যদি আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি কিলা আব্দুল্লাহ'র আফগান শরণার্থী হতাম তাহলে ঠিক এই আচরণই করতাম রবার্ট ফিস্ক-এর সাথে অথবা অন্য কোনো পশ্চিমা খুঁজে পেলে।

কী আর এমন, আফগান সীমান্তের কাছে হামলার শিকার হয়ে, আমার এই কিছু সময়ের আতঙ্ক, আত্মগ্লানি, পশুর মতো গোঙানি আর রক্তাক্ত হওয়া, যখন শয়ে শয়ে– খোলামেলাভাবেই বলি হাজার হাজার– নিরপরাধ; অসামরিক মানুষ মারা যাচ্ছে আফগানিস্তানে মার্কিন বিমান হামলায়, যখন “সভ্যতার যুদ্ধ” কান্দাহারের পশতুনদের পুড়িয়ে ফেলছে, পঙ্গু করে দিচ্ছে আর ধ্বংস করছে তাদের ঘরবাড়ি, কারণ “শুভ” “অশুভ” কে পরাভূত করবেই?

ছোট এই গ্রামটিতে কিছু কিছু আফগান আগে থেকেই

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

ছিলো, গত দু'সপ্তাহে অন্যরা এসেছে, যারা মরিয়া এবং ক্রুদ্ধ আর কোনও না কোনো নিহত আত্মীয়ের জন্য বিলাপরত। গাড়ি বিগড়ে গেলে জায়গাটা ভয়ঙ্কর, আর সময়টাও সুবিধার না, ঠিক ইফতারের আগে আগে। কিন্তু আমাদের উপর যা ঘটে গেল তা ছিলো এই জঘন্য-যুদ্ধের ভণ্ডামি, প্রচণ্ডতা ও ঘৃণার প্রতীকী-প্রকাশ। ধীরে ধীরে সংগঠিত হওয়া একদল অসহায় আফগান যুবক ও বৃদ্ধ নিজেদের বাগে পেয়ে কিছু বিদেশীদের মানেই শত্রুদের মধ্যে অন্তত একজনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল।

পরে আমরা জানতে পারি, এইসব আফগানদের মধ্যে অনেকেই, মাজার-ই-শরীফের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং বন্দীদের পেছনে হাতবাঁধা অবস্থায় খুন হওয়া টেলিভিশনে দেখে ক্ষেপে উঠেছিল। এক গ্রামবাসী পরে আমাদের ড্রাইভারকে বলেছিল যে, তারা ভিডিও টেপে দেখেছে সি.আই.এ অফিসার "মাইক" এবং "ডেভ" মাজারের নতজানু এক কয়েদীকে মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে। তারা ছিলো অশিক্ষিত– হয়তো অনেকেই পড়তে জানে না– কিন্তু বি-৫২ বোমার নিচে দাঁড়িয়ে প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রতিউত্তর করার স্কুল-শিক্ষা তো আপনারও নেই। এক পর্যায়ে উত্তেজিত এক ছেলে আমার ড্রাইভারের দিকে ঘুরে সহজ আন্তরিকতায় জানতে চায় "ওটা কি মি. বুশ?"

বিকাল সাড়ে চারটায় আমরা কিলা আব্দুল্লাহ পৌঁছি। যা পাকিস্তানের কোয়েটা এবং সীমান্ত শহর চমন-এর মাঝামাঝি। আমানুল্লাহ আমাদের ড্রাইভার অনুবাদক ফাইয়াজ আহমেদ, *ইন্ডিপেন্ডেন্টের* জাস্টিন হাগলার, এবং আমি– মাজার-নৃশংসতার প্রতিবেদন সেরে সবাই চনমনে।

কিছু যে একটা সমস্যা হয়েছে তা আমরা প্রথম টের পাই সরু, জনাকীর্ণ রাস্তার মাঝখানে যখন গাড়ি থেমে যায়। জিপের বনেট থেকে সাদা বাষ্পের পাতলা পর্দা উঠে আসছিল। আমাদের বানানো এই যানজটের প্রতিবাদে একটানা বাজতে শুরু করে কার, বাস, ট্রাকের হর্ন আর রিক্সার ঘন্টি। আমরা চারজনই গাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তার একপাশে নিয়ে রাখি। "গাড়ি বিগড়ানোর জন্য জায়গাটা বাজে" আমি ফিসফিস করে জাস্টিনকে বলি। হাজার হাজার দরিদ্র, গাদাগাদি আফগান শরণার্থী, যারা এ যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানে এসেছে, কিলা আব্দুল্লাহ তাদের আশ্রয়স্থল।

আমানুল্লাহ আরেকটি গাড়ি খুঁজতে যায়– ক্ষিপ্ত জনতার দঙ্গলের চেয়ে কেবল একটি খারাপ জিনিস আছে আর তা হলো সন্ধ্যার পরে ক্ষিপ্ত জনতার দঙ্গল– এবং জাস্টিন ও আমি শুরুতে বন্ধুভাবাপন্ন জনতার দিকে তাকিয়ে হাসি যারা এরই মাঝে বৃত্তাকারে জড়ো হয়ে গেছে আমাদের ধোঁয়া ওঠা গাড়ির চারপাশে। আমি অনেকের সাথে হাত মিলালাম– সম্ভবত আমি মি. বুশের কথা ভাবছিলাম– এবং যথেচ্ছ "স্লামালাইকুম" দেই। আমি জানতাম এই হাসি বন্ধ হ'য়ে গেলে কী ঘটতে পারে।

জনতার দঙ্গল বাড়তে থাকলে আমি জাস্টিনকে পরামর্শ দেই যে আমরা জিপের কাছ থেকে সরে গিয়ে খোলা রাস্তায় হাঁটি। একটি শিশু চটাস্ করে তার আঙুল আমার কব্জিতে বসিয়ে দেয় আর আমি নিজেকে বোঝাই এটি একটি দুর্ঘটনা, ঘৃণার ছেলেমি মুহূর্ত। তারপর একটি পাথর হঠাৎ আমার মাথার পাশ দিয়ে সাঁই করে গিয়ে জাস্টিনের হাতে লাগে। জাস্টিন বোঁ করে ঘুরে যায়। তার চোখে উদ্বেগ আর এখন আমার মনে হয় কেমন করে নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম। যা হোক, আমি ভাবলাম এটা কেবলই তামাশা। তারপর আরেকটি ছেলে আমার ব্যাগ হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, যার ভেতরে আমার পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, টাকা, ডায়েরী, কনট্যাক্ট বই, মোবাইল ফোন ছিলো। আমি সবলে তা ফিরিয়ে এনে কাঁধে ঝুলিয়ে নেই। জাস্টিন ও আমি

রাস্তা পার হই। কেউ একজন আমার পিঠে ঘুসি মারে।

আপনি একটি স্বপ্ন থেকে কেমন করে বেরিয়ে আসবেন যখন চরিত্রগুলি আচমকা বৈরী হয়ে ওঠে? আমি একজনকে দেখলাম যে সদা হাস্যোজ্জ্বল ছিলো আমাদের সাথে হাত মেলানোর সময়। সে আর এখন হাসছে না। ছোট ছোট কয়েকজন বালক তখনো শব্দ করে হাসছিল, কিন্তু তাদের দেঁতো হাসি অন্যকিছুতে রূপ নিতে শুরু করেছে। সম্মানিত বিদেশী– যে কয়েক মুহূর্ত আগে সবাইকে "স্লামালাইকুম" জানিয়েছে– বিমর্ষ, ভীত হয়ে ওঠে অবশেষে। পশ্চিমকে টেনে নামানো হলো। জাস্টিনকে চারদিক থেকে ধাক্কা দেয়া হচ্ছিল। আমরা রাস্তার মাঝখানে দেখলাম একজন বাস ড্রাইভার হাত নেড়ে আমাদেরকে তার বাসের দিকে ডাকছে। ফাইয়াজ তখনো গাড়িতেই, বুঝতে পারেনি কেন আমরা হাঁটতে শুরু করেছি, কিছুক্ষণ পর আমাদের আর দেখতেও পায়নি। জাস্টিন গাড়িতে উঠে যায়। গাড়ির পাদানিতে পা রাখতেই তিনজন ব্যাগের স্ট্র্যাপ ধরে হ্যাঁচকা টানে আমাকে রাস্তায় ফেলতে উদ্যত হয়। জাস্টিন হাত বাড়িয়ে দেয়। "ধরো" সে চিৎকার করে। আমি ধরি।

যখন প্রথম ঘুসিটি প্রবলভাবে মাথায় নেমে এলো, আমি প্রায় পড়েই গিয়েছিলাম, আমার কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করছিল। আমি অবশ্য এরকমই আশা করেছিলাম কিন্তু এতটা যন্ত্রণাদায়ক বা কঠিন হবে ভাবিনি, ভাবিনি এতটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে। এর পরিণাম ছিলো ভয়াবহ। কেউ আমাকে এতটাই ঘৃণা করে যে মারতেও বাধে না। তারপর আরো দুই ঘুসি এসে পড়ে, প্রথমটি লাগে কাঁধের পেছনে, আরেকটি আরো জোরে এসে বাসের সাথে আমার মাথা ঠুকে দিয়ে, তখনো আমি জাস্টিনের হাত আঁকড়ে। যাত্রীরা আমাকে আর জাস্টিনকে দেখছিল। কিন্তু তারা নড়াচড়া করেনি, কেউ সাহায্যে এগিয়ে এলো না।

আমি চিৎকার করি "আমাকে সাহায্য করো জাস্টিন", আর জাস্টিন– যে একজন মানুষ যা পারে তার চেয়ে বেশি করেছে– আমার বারবার ফস্কে যাওয়া হাত আঁকড়ে ধরে– জনতার চিৎকার ছাপিয়ে জিজ্ঞেস করে তাকে আমি কী করতে বলছি। আমি বুঝলাম কেবল আমিই শুনতে পাচ্ছি, অবশ্য তারা চেঁচামেচিও করছিল। আমি কি "কাফের"– বিধর্মী শব্দটি শুনতে পেলাম? সম্ভবত ভুল শুনেছিলাম। যখন আমাকে জাস্টিনের কাছ থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কথাটি কানে আসে। ঠিক তখনই জাস্টিনের কাছ থেকে আমি ছিটকে পড়ি।

আমার মাথায় আরো দু'টি ক্ষত ছিলো, একটি মাথার উভয় পাশে এবং কিছু অদ্ভুত কারণে তা আমার স্মৃতির অংশ; কিছু ছোট ছোট ক্ষত আমার মগজেও ছিলো– স্কুলের একটি মুহূর্তের কথা মনে করতে পারি। প্রায় ৫০ বছর আগের কথা। সিডার্স, মেডস্টোনের এক প্রাইমারি স্কুল, যখন একটি লম্বা ছেলে খেলার মাঠে বালির প্রাসাদ বানাতে গিয়ে আমার মাথায় মেরেছিল। সে আঘাতের স্মৃতি আমার ছিলো, গন্ধ পেতাম যেন সেটা আমার নাকে লেগেছিল। পরবর্তী আঘাত আরেকজনের কাছ থেকে আসে। আমি দেখলাম ডানহাতে সে একটি বড় পাথর বহন করছে। ভয়ঙ্কর শক্তিতে সে পাথরটি আমার কপালে মারল। কিছু উষ্ণ তরল বস্তু আমার মুখ, ঠোঁট, চিবুক বেয়ে নেমে এল। লাথি চললো। পাছায়, জঙ্ঘায় এবং ডান উরুতে। আবারো একটি ছেলে আমার ব্যাগ হাতিয়ে নেয় আর আমি স্ট্র্যাপ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ তাকাই এবং বুঝতে পারি অন্তত জনা ষাটেক লোক এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে; গজগজ করছে অদ্ভুতভাবে, আমার যা অনুভব হয় তা ঠিক ভয় না, কিন্তু কেমন যেন একটা বিস্ময়। তো এভাবেই ঘটনা ঘটলো। আমি জানতাম যে অবশ্যই আমাকে পাল্টা জবাব দিতে হবে। অথবা মরতে হবে, প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম।

যে একটা বিষয় আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল তা হলো মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার অনুভূতি,

আমাকে ঢেকে দেয়া রক্ত নিয়ে আমার ক্রমশ বেড়ে যাওয়া উৎকণ্ঠা। আমি ভাবতে পারি না কখনো এত রক্ত একসাথে দেখেছি কীনা। সেকেন্ড খানেকের জন্য একনজর ভয়ঙ্কর কিছুতে আটকে যাই, একটি দুঃস্বপ্নগ্রস্ত মুখ– নিজের– বাসের জানালায় প্রতিফলিত হচ্ছে, রক্তে ডোরাকাটা, আমার দু'হাত লেডি ম্যাকবেথের মতো রক্ত-ভেজা, আমার পুলওভার এবং শার্টের কলার ছাপিয়ে রক্ত পিঠ ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আমার যতই রক্ত ঝরছিল উন্মত্ত জনতা আমাকে ততই কিলঘুসি মারছিল। আমার মাথায় এবং কাঁধে আছড়ে পড়তে লাগলো নুড়ি ও ছোট পাথরের টুকরো। কতক্ষণ ধরে এটা চলতে পারে? আমি ভাবি। একই সাথে হঠাৎ আমার মাথার উভয় দিকে পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়– ছোঁড়াপাথরে নয়, মানুষের হাতে থাকা পাথরে যা তারা ব্যবহার করেছিল আমার খুলি ফাটানোর চেষ্টায়। তারপর একটি ঘুসি এসে মুখে পড়লো, চশমার ভাঙাকাচ নাকে ঢুকে যায়, আরেকটি হাত আমার গলায় ঝুলে থাকা বাড়তি চশমাটি হাতিয়ে নেয় এবং একটানে কর্ড থেকে চামড়ার কন্টেনারটি ছিঁড়ে ফেলে। এ অবস্থায় আমার মনে হয় লেবাননকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ। ২৫ বছর ধরে আমি লেবাননের যুদ্ধ-প্রতিবেদন করছি এবং লেবানিজরা আমাকে শিখিয়েছে বারবার, কেমন করে টিকে থাকতে হয়: সিদ্ধান্ত নিয়ে– যে কোনো সিদ্ধান্ত– কিন্তু কিছু না করে থেকো না।

সুতরাং যে যুবকটি আমার ব্যাগ ধরেছিল তার কাছ থেকে হ্যাঁচকা টানে ব্যাগটি ফিরিয়ে আনি। সে পিছিয়ে যায়। তারপর আমি আমার ডান দিকে থাকা লোকটির দিকে ঘুরে যাই, একহাতে সে সেই রক্ত লাগা পাথর ধরে ছিল। সজোরে এক ঘুসি লাগাই। আমি ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না– আমার দু'চোখ শুধু চশমা না থাকার জন্য ঝাপসা হয়ে আসছিল না, তমসাচ্ছন্নও ছিলো লালরঙা মসৃণ কুয়াশায়– কিন্তু আমি দেখি লোকটির মুখ থেকে এক ধরনের কাশ এবং একটি দাঁত ঝরে পড়ে এবং তারপর সে রাস্তায় পড়ে যায়। এক সেকেন্ডের মতো জনতা থমকায়। আমি আরেকজনের কাছে যাই, ব্যাগটা শক্তভাবে ধরে দুম করে তার নাকে ঘুসি বসিয়ে দেই। সে রাগে ফুঁসতে থাকে এবং হঠাৎ করে সবকিছু লাল হয়ে যায়। আমি ঘুসি মেরে আরেকজনকে নাগালে আনতে ব্যর্থ হই, আরো একবার মুখে আঘাত করে দৌড় দেই।

আমি আবার রাস্তার মাঝখানে ফিরে আসি কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার দু'চোখ রক্তে ভরে উঠেছিল। আঙুল দিয়ে থলথলে আঠালো জিনিস পরিষ্কার করতে চেষ্টা করি। শুষে নেয়া ধরনের শব্দ হয় এতে, আমি ফের দেখতে শুরু করি এবং বুঝতে পারি আমি আর্তনাদ করছিলাম আর কাঁদছিলাম এবং সেই পানি আমার চোখের রক্ত পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমি এ কী করলাম? নিজেকে জিজ্ঞেস করি। আফগান শরণার্থীদের ঘুসি মারলাম, আক্রমণ করলাম সেইসব মানুষকে, যাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমি লিখছি, সেই অধিকারচ্যুত, বিকলাঙ্গ মানুষ যাদেরকে আমার দেশ– অন্যান্য দেশের সাথে– মেরে ফেলছে, সীমান্তের দুইপারে, তালিবানদের সাথে। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছেন, আমি ভাবি। আমার মনে হয় আমি সত্যিই এটা বলেছিলাম। যাদের পরিবারকে আমাদের বোমারুরা মেরে ফেলছে এখন আমারও শত্রু তারা।

তারপর স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটল। একটা লোক আমার দিকে হেঁটে এলেন, খুবই শান্তভাবে, এবং আমাকে তুলে নিলেন দু'হাত বাড়িয়ে। আমি তাকে খুব ভালোভাবে দেখতে পেলাম না কেন না রক্তের প্রবাহ চোখের ভেতর দৌড়াচ্ছিল, কিন্তু তিনি একপ্রকার ডাকাতের পোশাক পরে ছিলেন, মাথায় পাগড়ি আর সাদা-ধূসর দাড়ি। জনতার দঙ্গল থেকে তিনি আমাকে দূরে নিয়ে যান। কাঁধের উপর দিয়ে দেখি অন্তত শ'খানেক লোক আমার পেছনে আর কিছু কিছু পাথরও

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু তারা আমার দিকে তাক করল না– মনে হয় আগন্তুকের গায়ে আঘাত লাগা এড়াতে। তিনি ছিলেন Old Testament-এর কোন চরিত্রের মতো অথবা বাইবেলের Good Samaritan, একজন মুসলমান– সম্ভবত গ্রামের একজন মোল্লাহ– যিনি আমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি আমাকে এক পুলিশ ট্রাকের পেছনে তুলে দেন। কিন্তু পুলিশেরা নড়ে না। তারা আতঙ্কিত। "সাহায্য করো" তাদের ক্যাবের পেছনের ছোট জানলা দিয়ে আমি চিৎকার করতে থাকি। হাত থেকে রক্তের স্রোত কাচ বেয়ে নামতে থাকে। তারা কয়েক মিটার চালানোর পর থেমে যায় যতক্ষণ না লম্বা লোকটি আবার তাদের সাথে কথা বলেন। এরপর আরো ৩০০ মিটার তারা যায়।

সেখানে রাস্তার পাশে রেডক্রস-রেডক্রিসেন্ট কনভয় ছিলো। জনতার পাল তখনো আমাদের পেছনে পেছনে। দু'জন অ্যাটেন্ডেন্ট আমাকে তুলে নেয় তাদের এক বাহনের পেছনে, আমার হাত এবং মুখে পানি ঢালে। মাথায়, মুখে আর মাথার পেছনে ব্যান্ডেজ করে দেয়। তাদের মধ্যে একজন বলে "শুয়ে পড়ুন, আপনাকে একটি কম্বল দিয়ে আমরা ঢেকে দেব যাতে তারা আপনাকে দেখতে না পায়।" তারা দু'জনেই মুসলমান, বাংলাদেশী, তাদের নাম লেখা উচিৎ কারণ তারা ছিলো ভালো মানুষ আর যথার্থ: মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ও সিকদার মোকাদ্দেস আহম্মেদ। আমি কাতরাতে কাতরাতে মেঝেয় শুয়ে পড়ি, বেঁচে উঠতে পারি এ আশায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাস্টিন এসে পৌঁছায়। বেলুচিস্তান লেভিস থেকে এক তাগড়া সৈন্য তাকে এ পর্যন্ত রক্ষা করে এনেছে– ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সত্যিকারের ভূত যে একটি বন্দুক দিয়ে মানুষের দঙ্গলকে গাড়ি থেকে দূরে রেখেছিল, যে গাড়িতে জাস্টিন এখন বসে আছে। আমি ব্যাগ হাতড়াই। তারা কখনোই ব্যাগ নিতে পারেনি, আমি নিজেকে বলতে থাকি যেন আমার পাসপোর্ট ও ক্রেডিট কার্ড যিশুর শেষ নৈশভোজের পবিত্র পাত্র। কিন্তু তারা আমার বাড়তি চশমাটি নিয়ে নিয়েছে– আমি এই তিনটি ছাড়া অন্ধ– মোবাইল ফোনের মতো আমার কনট্যাক্ট বইও হারিয়ে গেছে। যাতে সারা মধ্যপ্রাচ্যের ২৫ বছর ধরে জমে ওঠা ফোন নম্বর ছিল। আমি আর কি করতে পারতাম? সবার কাছে জানতে চাই অন্তত যারা আমাকে চেনেন, তাদেরকে কি ফের আমাকে ফোন নম্বরগুলো পাঠাতে বলব?

গোল্লায় যাক, বলে উঠি আর জোরে নিজের গায়ে ঘুসি মারি যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারি রক্ত আসলে ঝরছিল কব্জির গভীর ক্ষত থেকে– সেই দাঁতের চিহ্ন থেকে যে দাঁতটি আমি লোকটির চোঁয়াল থেকে ফেলে দিয়েছিলাম, যে কেবল গোটাপৃথিবীর শিকারে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কোনো অপরাধ থেকে ছিলো সত্যিই মুক্ত, নিষ্পাপ।

আমি অন্তত আড়াই দশক ব্যয় করেছি মুসলিম বিশ্বের অবমাননা এবং দুর্দশার প্রতিবেদন তৈরিতে, অথচ তাদের ক্ষুব্ধতা এখন আমাকেও পেঁচিয়ে ধরেছে অথবা, ধরেনি? রেড ক্রিসেন্টের মোহাম্মদ এবং সিকদার তো ছিলোই, আর ফাইয়াজ হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসে আলোময় গাড়ির কাছে যেখানে আমাদের শুশ্রূষা চলছিল। আমানুল্লাহ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানায় তার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য। আর সেখানে ছিলেন এক মুসলমান সাধু যে আমাকে হাতে করে তুলে এনেছিলেন। আমি উপলব্ধি করি– যে সকল আফগান পুরুষ ও বালক আমাকে আক্রমণ করেছিল তারা পূর্বে কখনোই এ ধরনের কাজ করেনি, কিন্তু তাদের এই নিষ্ঠুরতা পুরোপুরি অন্যদের তৈরি, আমাদের তৈরি– আমরা যাদের অস্ত্র যুগিয়েছি রুশদের বিরুদ্ধে, তাদের ব্যথাকে উপেক্ষা করেছি, তাদের গৃহযুদ্ধে হেসেছি, তারপর "সভ্যতা রক্ষার যুদ্ধে" তাদেরকে

ফের অস্ত্র দিয়েছি, এই মাত্র কয়েকমাইল দূরে আবার মূল্য দিতে বলেছি, তারপর বোমায় গুড়িয়ে দিয়েছি তাদের বাড়িঘর, ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি তাদের পরিবারকে এবং সেসবকে বলেছি "পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতি"।

তাই আমি ভাবি এই যে যা কিছু ভয়ঙ্কর, বোকাটে, রক্তাক্ত ছোট ঘটনা ঘটে গেল তা নিয়ে আমি লিখব। আমার ভয় লাগে, অন্য কোনো বর্ণনায় হয়তো ভিন্ন কোনো গল্প তৈরি হবে, কেমন করে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক "মার খেলো উচ্ছৃঙ্খল আফগান শরণার্থীর হাতে।"

অবশ্য এটাই মনোযোগ আকর্ষণের বিষয়। যে সকল মানুষ হামলার শিকার হচ্ছে তারা আফগান। বি-৫২-এর মাধ্যমে ক্ষতচিহ্নগুলি আমরাই চাপিয়ে দিচ্ছি, তারা নয়। ফের আমি বলতে চাই, যদি আমি কিলা আব্দুল্লাহ'র একজন আফগান শরণার্থী হতাম তাহলে তারা যা করল তাই করতাম। আমি রবার্ট ফিস্ক-কে মারতাম অথবা যে কোনো পশ্চিমা খুঁজে পেলে।

এক্সট্রা ম্যাগাজিনের আপডেট
ফেব্রুয়ারি ২০০১

সন্ত্রাসবাদের কাহিনী: তিনটি ঘটনা, দুটি মানদণ্ড

তরজমা: গুঞ্জন চৌধুরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ‘ফেয়ারনেস অ্যাণ্ড অ্যাক্যুরেসি ইন রিপোর্টিং’ নামের একটা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (http:\\www.fair.org) থেকে এই লেখাটা ডাউনলোড করা হয়েছে। আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতৃত্বে পশ্চিমা শক্তির সাম্রাজ্যবাদী হামলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে এই লেখাটার কোনো যোগসূত্র নাই। কিন্তু এই লেখাটার বিশেষত্ব এইখানে যে, ছোট্ট এই লেখাটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়, মার্কিন সংবাদমাধ্যম নামে কথিত মিডিয়া প্রকৃতপক্ষেই প্রচারণামাধ্যম, কেননা তা সন্ত্রাস সম্পর্কিত যে-সংবাদমূল্য দ্বারা পরিচালিত হয় তা আসলে শাসকশ্রেণীর নির্ধারিত শত্রুমিত্র ভেদাভেদের দ্বিমুখী মানদণ্ড দ্বারা নির্ণিত। সাম্প্রতিক কালে ইরাক, আফগানিস্তান ও প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত সন্ত্রাস-সংবাদগুলা খেয়াল করলেও এই একই দ্বিমুখী মানদণ্ডকে তৎপর দেখা যাবে। **মানুষ**-এর পাঠকদের জন্যই লেখাটার তরজমা করা হয়েছে।

১৯৯৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর, কেভিন রে প্যাটারসন ও চার্লস ডেনিস কাইল্‌স্‌ নামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী দুজন শ্বেতাঙ্গকে ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়, টিভি-টাওয়ার, বিদ্যুৎ-কেন্দ্র ও প্রপেন (বিস্ফোরক) ভর্তি ট্যাংক উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে। তারা Y2K-সংশ্লিষ্ট মিলিশিয়া বিক্ষোভকে উস্কে দিতে এই পরিকল্পনা করেছিল। পুলিশ জানায়, তারা গ্রেপ্তারকৃতদের বাড়ীতে বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছে। অভিযুক্তদের নাম *নেক্সিস কম্প্যুটার ডেটাবেজ*-এর ৯৬টি সংবাদ নিবন্ধে ছাপা হয়েছে (৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত)।

১৪ই ডিসেম্বর কানাডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় আহমেদ রেশাম নামক একজন আরব-আলজেরীয় নাগরিককে ইউরিয়া সার, তরল বিস্ফোরক ও অন্যান্য বোমা তৈরির জিনিসপত্র বহনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। কর্তৃপক্ষ বলেন, সে অবৈধ পাসপোর্টে ভ্রমণ করছিল এবং একটি আলজেরীয় সহিংস দলের সঙ্গে তার সংশ্রব আছে। রেশামের নাম *নেক্সিসের* ৯০৬টি সংবাদ নিবন্ধে ছাপা হয়।

২৮শে ডিসেম্বর, জেরি ওয়েইনি হ্যানী নামের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী টেক্সাসের অধিবাসী একজন শ্বেতাঙ্গ

ব্যক্তি ৫০ পাউন্ড এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সঙ্গে রাখার জন্য অভিযুক্ত হয়। সে *আমেরিকান এয়ারলাইনসে* মেকানিক হিসেবে কাজ করে। পুলিশ জানায় তারা অভিযুক্তের ঘরে বোমা তৈরির ফর্মুলা এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী সাহিত্য পেয়েছে। এই অভিযুক্তের নাম *নেক্সিসের* ৪৫টি সংবাদ-নিবন্ধে ছাপা হয়।

কেন এরকম হয় যে, বোমার দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে যারা শ্বেতাঙ্গ ও মার্কিনী, তারা একজন আরব-অভিযুক্তের তুলনায় মোটামুটিভাবে দশভাগের একভাগ থেকে বিশভাগের একভাগ কম মিডিয়া-আগ্রহ সৃষ্টি করে? আসলে এই সংখ্যাগুলো সম্ভবত কমজোরী সন্ত্রাসীদের প্রতি প্রদত্ত মনোযোগ অতিরঞ্জিত করে দেখায়; আলজেরীয় অভিযুক্তদের বেশিরভাগ কাহিনী ছাপা হয় প্রথম পাতায়, যখন কিনা ক্যালিফোর্নিয়া এবং টেক্সাসের কাহিনীগুলো ছাপা হয় প্রায়শ সংক্ষিপ্ত সংবাদ হিসেবে। বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সান্ধ্যকালীন নিউজ-শোগুলোতে রেশামের কথা উল্লেখ করেছে ৪৪টি সংবাদকাহিনী, দুটিতে উল্লেখ করা হয় প্যাটারসন ও কাইল্স্রে কথা (দুটোই CBS-G, 15/12/99 I 20/12/99), এবং হ্যানীর কথা উল্লেখ করা হয়নি একটিতেও।

কাভারেজের এই পার্থক্য কি এই জন্যে যে আরব সন্ত্রাসীরা দেশী জাতের সন্ত্রাসীদের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক? বেশিরভাগ সন্ত্রাসীরা যে উৎপত্তির দিক থেকে স্থানীয় বা মার্কিন, সে-কথা মনে করিয়ে দিতে কারও পক্ষে শুধু পেছন ফিরে ওকলাহোমা-বিস্ফোরণের কথা ভাবলেই চলবে। ব্যাপারটা এমনও নয় যে, রেশামের হুমকিটি অন্যদের হুমকির চেয়ে বেশি গুরুতর; লরেন্স লিভারমোর ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীদের আন্দাজ অনুযায়ী একটি প্রপেন ভর্তি ট্যাংকে বোমা বিষ্ফোরন ঘটলে পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যকার মোট মানুষের অর্ধেক মারা যেতে পারে (Sacromento Bee, 7.12.99)। আর, বোমা বানানোর কাজে একজন এয়ারলাইন কর্মীর জড়িত থাকার কী বিপদ, তা সুস্পষ্ট।

এই উপসংহারে না-আসা কঠিন যে, রেশামের জাতিগত পরিচয়ই তার অতি-সংবাদ হয়ে ওঠার কারণ। সন্ত্রাস ঘটাচ্ছে কে, কিংবা অন্তত কার সন্ত্রাসকে ভয় পাওয়া উচিত সেই সংক্রান্ত গৎবাঁধা ছক থেকে মুলধারার মিডিয়াগুলোকে সরিয়ে আনার জন্য এমনকি Y2K-র গিট্টু-মারা সংবাদ পাওয়ার প্রলোভনও যথেষ্ট ছিল না।

নূরুল ইসলাম

মার্কিন তোপের মুখে আল জাজিরা টিভি স্টেশন

তথ্যমাধ্যমের স্বাধীনতার স্লোগানকে যারা ধর্মবিশ্বাসের স্তরে নিয়ে গেছে, খোদ সেই ইঙ্গমার্কিন সভ্যতার খলিফারা আরেক সংস্কৃতির প্রধান একটা তথ্যমাধ্যমকে কীভাবে দমন করার কামনাবাসনা দ্বারা অবলীলায় চালিত হয় এই লেখা থেকে তা জানা যায়। এই লেখাটার সূত্র: দৈনিক *যুগান্তর*, ১২ অক্টোবর ২০০১, 'সীমানা পেরিয়ে' পাতা।

আল জাজিরা। কাতারভিত্তিক আরবিভাষী স্যাটেলাইট টেলিভিশন স্টেশন। হঠাৎ করেই যেমন পাদপ্রদীপে চলে এসেছে। আবার হঠাৎ করেই তেমনি বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তোপের মুখে পড়েছে। কারণ, স্টেশনটি বর্তমানে বিশ্বের রোষানলে পতিত ওসমা বিন লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা তালেবান সরকারের ভাষ্য শোনাচ্ছে, বিভিন্ন সংবাদচিত্র দেখাচ্ছে। আসলেই আল জাজিরা বর্তমানে ওসামা, তার গোষ্ঠী ও আশ্রয়দাতা তালেবান কর্তৃপক্ষের একমাত্র মুখপাত্র হয়ে উঠেছে। আর এ কারণেই বিরাগভাজন হয়েছে মার্কিনীদের।

সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলেছেন, আল জাজিরার ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ সম্প্রচার করা উচিত। ওই টিভি ওসামা, আল কায়দা ও তালেবান কর্তৃপক্ষকে বেশি সময় দিচ্ছে বলেও তিনি পরোক্ষভাবে অভিযোগ করেন। কলিন পাওয়েল তার অসন্তুষ্টির কথা সরাসরি কাতারের আমীর ও ওই স্টেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ হামাদ বিন খলিফা আল হাদির কাছে তুলে ধরেন। এতে ওই স্টেশনের কর্মকর্তারা এমনকি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা আন্দোলন কর্মীরা প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, এই মন্তব্য গণমাধ্যমের ওপর আঘাত হানার শামিল। অবশ্য পরে পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র রিচার্ড বুচার বলেছেন, আল জাজিরার নিজেদের মতো অনুষ্ঠান সম্প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে।

আল জাজিরা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে, গত সেপ্টেম্বরে কলিন পাওয়েলের সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হয়েছে। এমনকি এই সোমবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সাক্ষাৎকারও প্রচার করা হয়। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট জে ডব্লিউ বুশের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য হোয়াইট হাউসে আবেদন করা আছে।

আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় গড়ে তোলা এই স্টেশনের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী মার্কিন বিমান হামলার অধীন আফগানিস্তানের কিছু কিছু ফুটেজ দেখাতে পারছে। এই কেন্দ্র থেকে বিশ্বের অন্য টিভি স্টেশন ফুটেজ করে ধার নিচ্ছে, কখনও বা চড়া মূল্যে কিনে নিচ্ছে। কাতারের আমীর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রথম এই বেসরকারি সম্প্রচার কেন্দ্র আল জাজিরা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে স্টেশনটি সরকারি খরচেই চলত। তবে আসছে নভেম্বরে সরকারি সহায়তা বন্ধ করে দেয়া হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি উঠেপড়ে লেগেছে। স্টেশনে বিবিসি ও ভোয়ার মতো সংবাদ মাধ্যমের প্রশিক্ষিত কর্মীরা কাজ করছেন। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাংবাদিকরা প্রতিটি অনুষ্ঠান কাভার করেন, তুলে ধরেন। তবে সংস্থাটিকে এর আগেও নানা পক্ষের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে। কারণ এই স্টেশন প্রায়ই বিভিন্ন দেশের নিষিদ্ধ ও গেপান সংস্থা ও ব্যক্তির সংবাদ এবং সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ওই সাক্ষাৎকারগুলোই যখন বিবিসি, ভোয়া বা সিএনএন ইংরেজিতে সম্প্রচার করে তখন কোন পক্ষই সামান্য আপত্তিও তোলে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর যখন আফগানিস্তানে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন ওসামা ও তার গোষ্ঠী আল কায়দা এই চ্যানেলে ভিডিও টেপ পাঠিয়ে জেহাদের প্ররোচনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। তালেবান শাসনাধীন আফগানিস্তানের সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারে একমাত্র অনুমোদনপ্রাপ্ত এই টিভি চ্যানেল। তালেবান গোষ্ঠী অন্য কোন প্রচার মাধ্যমকে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরাসরি ঢুকতে দেয় না। আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত লাদেন ও আল কায়দার দুটি ভিডিও বিবৃতি সম্প্রচার করেছে আল জাজিরা। দুটি ভিডিও টেপই ছিল আগে ধারণকৃত। ৭ই অক্টোবর রাতে হামলা শুরু হওয়ার পর ৮ই অক্টোবর সকালে আল জাজিরার সম্প্রচারিত হয় ওসামার একটি বিবৃতি। এতে দেখা যায়, সামরিক পোশাক ও আফগান টুপি পরা ওসামার দু'পাশে বসা আছেন তার মিসরী সহযোগী আইমান আল জাওহারি ও আল কায়দার মুখপাত্র কুয়েতি নাগরিক সুলায়মান আবু গেইস। ওসামার পক্ষে আবু গেইস বিবৃতিটি পড়ে শোনান। এক পর্যায়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে লাদেনও কিছু বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'আজ থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হল। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সবদিক থেকে আমেরিকা আজ ভয়ে আতঙ্কিত। আমরা দীর্ঘ বছর ধরে যে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলাম, আজ থেকে আমেরিকার সে দুর্ভোগ শুরু হল। তাদের এই পরিণতি ছিল প্রত্যাশিত। আমরা যতদিন নিজ দেশ ও ফিলিস্তিনে নিরাপদ হব না, আমেরিকা ততদিন নিজেদের নিরাপদ ভাবার সুযোগ পাবে না।' তিনি বলেন, 'আফগানিস্তান ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে জঘন্য অপরাধ আমেরিকা করেছে ইসলামের কিছু অগ্রসৈনিকদল আমেরিকার বিশাল ক্ষতিসাধন করে তার বদলা নিয়েছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।'

ওসামা আরও বলেন, 'আফগানিস্তানে হামলার ঘটনা বিশ্বকে আস্তিক-নাস্তিক এই দুই শিবিরে বিভক্ত করেছে। এ মুহূর্তে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ধর্মকে রক্ষা করা।' তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে নাস্তিকদের নেতা অভিহিত করে বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেমেছে। তারা ১৯৪৫ সালে জাপানে কয়েক হাজার মানুষ হত্যা করেছে। অবরোধের মাধ্যমে ইরাকের ১০ লাখ শিশুকে খুন করেছে। আজ আরব উপদ্বীপে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।' যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলায় নিজেদের জড়িত থাকার কথা সরাসরি স্বীকার না করে বলা হয়, 'এই হামলা ছিল আমেরিকার বর্তমান

পররাষ্ট্রনীতির পরিণতি। এই পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত থাকলে ইসলামের শার্দুলরা জেহাদ থামাবে না। আল্লাহ আমেরিকার একটি নরম জায়গায় আঘাত হেনেছেন। এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া।' আল জাজিরা টেলিভিশন ১০ই সেপ্টেম্বর লাদেনের আল কায়দা গ্রুপের আরেকটি ভিডিও টেপ সম্প্রচার করে।

গোটা বিশ্বের সরকারগুলোর সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলার মুখে কোণঠাসা ওসামা আল কায়দা ও তালেবান গোষ্ঠী এখন বিশ্ববাসীর কাছে তাদের বক্তব্য পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছে আরব বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় আল জাজিরা টিভি চ্যানেলকে। আর যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী লাদেনকে সংবাদের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে আল জাজিরাও গুনছে ব্যবসায়িক সাফল্য। কারণ আরব বিশ্বের সাধারণ জনগণের মধ্যে ওসামা এখনও বেশ জনপ্রিয়।

এন্ড্রু মার

‘দ্য বিগ আইডিয়া’: নোম চমস্কির সাক্ষাৎকার

তরজমা: আ-আল মামুন

নিচের পাণ্ডুলিপিটা নোম চমস্কির সাক্ষাৎকার। বৃটিশ সাংবাদিক এন্ড্রু মার আধঘণ্টার এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে *বিবিসি* এটা সম্প্রচার করে। ১৯৮৪ সালে *ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট* গ্রন্থে পশ্চিমা মিডিয়ার কর্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে যেয়ে যে-প্রচারণা-মডেল খাড়া করেছিলেন এডোয়ার্ড এস. হারম্যান ও নোম চমস্কি ইঙ্গমার্কিন মিডিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে তা সারা দুনিয়ার সাংবাদিকতা-সংশ্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন ফেলে। এই সাক্ষাৎকারটাকে ঐ প্রচারণা-মডেলের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ‘বিবিসি বনাম চমস্কি বিতর্ক’ হিসাবে পাঠ করাই অধিক সঙ্গত। দেখা গেল, নোম চমস্কি তাঁর মিডিয়া-বিশ্লেষণকে অতিশয় পোক্ত জমিনের ওপর স্থাপিত করতে পেরেছেন। সাক্ষাৎকারটির আদি, অর্থাৎ ইংরেজি, ভাষ্য নেয়া হয়েছে ইন্টারনেট থেকে: http://www.zmag.org/chomsky/interview/9602-big-idea. html।

মার: *প্রফেসর চমস্কি, আপনি যাকে প্রপাগান্ডা মডেল বলেন সেই মডেল সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা শোনার মাধ্যমে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি। কেবল স্বৈরাচারী সরকার নয়, গণতান্ত্রিক সরকারও প্রপাগান্ডা ব্যবহার করে– এমন ধারণা অনেকের কাছেই অদ্ভুত ঠেকবে।*

চমস্কি: ঠিক আছে। ... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে প্রপাগান্ডা প্রত্যয়টির প্রতি বিরাগ দেখা দেয়। কিন্তু ১৯২০’র ও ১৯৩০’র দশকে প্রপাগান্ডা প্রত্যয়টি সকলেই ব্যবহার করতো এবং প্রকৃতপক্ষে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারা, উইলসনপন্থী প্রগতিশীলরা এবং অবশ্যই, জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রীগুলো প্রপাগান্ডা ব্যবহারের পক্ষে ওকালতি করতেন। মিডিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বেশ সহজবোধ্য– আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া নিয়ে কথা বলছি, অন্য দেশগুলোতেও খুব একটা ব্যতিক্রম নেই– মিডিয়াগুলোর রকমভেদ আছে কিন্তু সূচি-নির্ধারক-মিডিয়া, যে মিডিয়া অন্য সকলের জন্য আলোচনা-সমালোচনার কাঠামো নির্ধারণ করে দেয় (যেমন *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *ওয়াশিংটন পোস্ট*, এবং আরো অনেক মিডিয়া), অতিকায় কর্পোরেশন এবং তাদের চেয়েও বড় মাপের

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

কংগ্লোমারেটগুলোর অংশ। অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতোই তাদের নিজস্ব পণ্য ও বাজার রয়েছে: তাদের বাজার হলো বিজ্ঞাপনওয়ালারা, অর্থাৎ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্টান; তাদের পণ্য হলো তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ-সুবিধাভোগী অডিয়েন্স...

অর্থাৎ, তারা অডিয়েন্সকে বিক্রি করে দিচ্ছে...

তারা সুযোগ-সুবিধাভোগী অডিয়েন্সকে বিক্রি করছে– বৃহদাকার কর্পোরেশনগুলো এমন অডিয়েন্সকে বিক্রি করে দিচ্ছে অন্য কর্পোরেশনগুলোর কাছে। এখন প্রশ্ন হলো একজন যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই প্রতিষ্ঠান-কাঠামোর কাছ থেকে পৃথিবীর কেমন ছবি আশা করতে পারে? এই প্রতিষ্ঠান-কাঠামোর কাছ থেকে আপনি কী আশা করতে পারেন সেসম্পর্কে আমরা কিছু উপসংহার টেনেছি এবং তারপর উপসংহারগুলো যাচাই করে দেখেছি। এবং সত্যিই; এই ছবিই প্রতিষ্ঠান-কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসে।

মালিকানা বৃহদাকার ব্যবসার অধীনস্ত হওয়ায় কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রেস তুলনামূলকভাবে দক্ষিণপন্থী এমন যে স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বিদ্যমান এবং যা সকলেরই জানা, প্রেসের ক্ষেত্রে আপনি কি তার চেয়ে বেশি কিছু দেখেন?

আমি প্রেসকে তুলনামূলকভাবে উদারপন্থীই বলব। এক্ষেত্রে আমি দক্ষিণপন্থী সমালোচকদের সাথে একমত। বিশেষ করে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ও *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর কথা ধরুন, কোনোরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার অছিলায় নয় বরং সত্যি সত্যিই, তাদেরকে... *নিউ ইয়র্ক টাইমসকে* "প্রাতিষ্ঠান-ঘেঁষা বাম" (establishment left), অন্যতম বৈদেশিক নীতির জার্নাল বলা হয়– এমন অভিধা প্রয়োগ সঙ্গতও বটে। কিন্তু, তুমি কতো দূর পর্যন্ত যেতে পারবে তার সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়া যে উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী এস্টাবলিসমেন্টের কাজ একথাটি স্বীকার করা হয় না– "এতদূর পর্যন্ত এবং এর বেশি নয়"।

কয়েকটি উদাহরণ দিন...

ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথাই ধরা যাক– প্রকৃতপ্রস্তাবে আধিপত্যশীল ধারার শীর্ষস্থানীয় ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী এবং সম্ভবত শীর্ষ সমালোচকও হলেন *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর এন্থনি লুইস। ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি চূড়ান্তভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমালোচনা করতে থাকেন– অর্থাৎ, মার্কিন কর্পোরেশনগুলো ওয়াশিংটনকে যুদ্ধ থামানোর নির্দেশদানের প্রায় দেড় বছর পর থেকে। সেসময় থেকে তিনি এমন চিত্র ফুটিয়ে তোলেন যে (তাঁর ভাষায়) ভুল হিসেব-নিকেশের ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল কল্যান বয়ে আনা কিন্তু ১৯৬৯ সাল নাগাদ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয় এবং আমাদের ওপর বিশাল ব্যয়-বোঝা চাপিয়ে দেয়– এই হলো সমালোচনা...

আচ্ছা "অ-প্রচারণা মডেলের" প্রেস হলে ভিয়েতনাম সম্পর্কে সেসময় মার্কিন জনগণকে কী বলতো?

আধিপত্যশীল ধারার প্রেস আফগানিস্তান (সোভিয়েত আগ্রাসনের সময়– অনুবাদক) সম্পর্কে

জনগণকে যেসব কথা বলছিল তেমন কথাই বলতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণে (ভিয়েতনাম) অভিযান চালায়। ১৯৫০'র দশকে সর্বপ্রথমে ল্যাটিন আমেরিকা ষ্টাইলের গুনাগুনসম্পন্ন একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র কায়েম করে; যে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যাপক আকারের গণহত্যাযজ্ঞ চালায়, কিন্তু স্থানীয় বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে এই রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল অপারগ (এঘটনা সকলেরই জানা– অন্তত সকল বিশেষজ্ঞই জানতো– কী ঘটছিল)। কেনেডি যখন ক্ষমতায় এলেন, ১৯৬১ সালে, তখন একটা সিদ্ধান্তে আসা জরুরি হয়ে পড়ে কারণ স্থানীয় আক্রমণের মুখে দক্ষিণ (ভিয়েতনাম) সরকার পতনোম্মুখ হয়ে পড়েছিল; সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটি দখল করে নেয়। ১৯৬১ সালে মার্কিন বিমান বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ জনগণের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করে, নাপাম বোমার মাধ্যমে জমির ফসল বিনষ্ট করার ক্ষমতা প্রদান করে... এরপর ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পুনরায় ব্যাপক আকারের অভিযান চালানো হয়; উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে নয়– এটা ছিল একটি পার্শ্বদৃশ্য। প্রেস সৎ হলে এসকল কথাই জনগণকে জানাতো, কিন্তু এসকল ঘটনার সামান্য আভাসও আপনি প্রেসে পাবেন না।

প্রেস যদি নিজে থেকেই সেন্সরকারী হয় তাহলে, আমাকে বলুন, কীভাবে সেই সেন্সর তৎপরতা ক্রিয়াশীল হয়– আপনি নিশ্চয় বলছেন না যে এজন্য মালিকরা পরস্পর পরস্পরকে টেলিফোনে সজাগ করে দেয় কিংবা সাংবাদিকরা, আমরা যেটাকে "চেপে যাওয়া" বলি, সেরকম কিছু করে?

এটা প্রকৃতপক্ষে... আপনি হয়তো স্মরণ করতে পারবেন, অরওয়েলের "ইংল্যান্ডে সাহিত্য-সেন্সরশিপ" শিরোনামের একটি প্রবন্ধ ছিল, যা *এ্যনিমেল ফার্মের* ভূমিকা হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কখনোই প্রকাশিত হয় নি। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "দেখুন, আমি একটি স্বৈরতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে লিখছি কিন্তু মুক্ত গণতান্ত্রিক ইংল্যান্ডও এর ব্যতিক্রম নয়", এবং তিনি তারপর বলেছিলেন যে, অজনপ্রিয় ধারণাকে অনায়াসেই কোনারকম বলপ্রয়োগ ছাড়াই নিরব করে দেয়া যায়। এসম্পর্কে তিনি দু'বাক্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা গভীর নয় কিন্তু ধারণাটিকে বোঝার জন্য যথেষ্ট: তিনি বলেন, এর দুটো কারণ আছে– প্রথমত, প্রেস সম্পদশালীদের মালিকানাধীন, প্রেসে কিছু কিছু বিষয় তুলে না-ধরার ক্ষেত্রে যাদের স্বার্থগত উদ্দেশ্য আছে। দ্বিতীয়ত, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটি আপনার মধ্যে এমন একটি মনোভঙ্গি তৈরি করে যে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে আপনি কখনোই কিছু বলবেন না। সহজ করে যদি বলি, অরওয়েলের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক– আর আমরা প্রথম কারণটিকেই সম্প্রসারিত করেছি...

আমি এটা মানতে পারছি না, কারণ এতে মনে হচ্ছে– আমি বলতে চাচ্ছি, আমিও একজন সাংবাদিক– আমার মতো সাংবাদিকরা "নিজে থেকেই সেন্সর করছে"...

না। নিজে থেকে সেন্সর নয়। একটা ছাঁকনি-ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল আছে যা কিন্ডারগার্টেন থেকে তৎপর হয়ে ওঠে এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত তৎপর থাকে। এই ফিল্টার-ব্যবস্থা শতকড়া একশভাগ কাজ দেয় না, তবে চমৎকার কার্যকরী– এটা আনুগত্য ও অধস্তনতাকে নির্ধারণ করে এবং বিশেষত...

অর্থাৎ, বিক্ষুব্ধ সাংবাদিকরা ক্ষমতা-অবস্থানের বিরুদ্ধে সফল হবে না...

এমন তৎপরতা চালাতে গেলে "আচরণগত সমস্যা" দেখা দেবে কিংবা... আপনি যদি স্নাতক-স্কুলের বিধিমালা পাঠ করেন তবে দেখবেন, লোকজন আপনাকে বলবে, "সে সহযোগীদের সাথে খুব ভালভাবে মানিয়ে চলতে পারেনি"– এমন বিষয় কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় সে আপনি জানেন।

এই বিষয়টিতে আমি বিশেষভাবে আগ্রহী কারণ অন্য অনেকের মতো আমিও, সম্ভবত ওয়াটারগেট ফিল্ম-ও সেরকম অনেক ঘটনা-পরবর্তী সময়ে, বেড়ে উঠেছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে সাংবাদিকতা হলো একটি জেহাদি পেশা এবং সংবাদিকতায় অনেক তর্কপ্রবণ, বিক্ষুব্ধ, ঘার-তেড়া লোক আছে; আমাকে বলতেই হবে যে আমিও এমন অনেককেই চিনি।

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন সবচেয়ে ভাল...সবচেয়ে খ্যাতিমান অনুসন্ধানী রিপোর্টারকে চিনি– আমি তাদের নাম বলতে চাই না– তারা মিডিয়ার ব্যাপারে আমার চেয়েও বেশি নৈরাশ্যবাদী। প্রকৃতপ্রস্তাবে, তারা মিডিয়াকে ভাওতাবাজ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা মিডিয়াকে ভায়োলিনের মতো ব্যবহার করতে জানে এবং কীভাবে তারা সেই চেষ্টায় তৎপর থাকে সে-সম্পর্কে সবসময় কথা বলে: যেসব ঘটনা সাধারণভাবে মিডিয়াতে আসে না সামান্য একটু সুযোগ পেলেই তারা সেসব ঘটনা প্রেসে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। এটা সম্পূর্ণ ঠিক যে সাংবাদিকতা একটি জেহাদি পেশা, প্রতিকূলতাপূর্ণ, "আমরা ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াই" এমন বলাটা খুবই আত্মতুষ্টিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে, আমার মতে, আমি কোনোরকম মূল্যবিচারী হতে অপছন্দ করি তবু, অপেক্ষাকৃত ভাল এবং প্রকৃতপক্ষে সচরাচর যাদেরকে শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় তারা আধিপত্যশীল ধারার প্রেসের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে এবং সেই চিত্র খুবই বাস্তবানুগ।

আপনি কীভাবে জানেন যে আমি নিজে থেকেই সেন্সর করি এবং কীভাবে জানেন যে সাংবাদিকরা...

আমি বলছি না যে আপনি নিজে থেকেই সেন্সর করছেন। আমি নিশ্চিত, যা যা আপনি বলছেন তার সবই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে, আপনি যদি ভিন্ন কিছুতে বিশ্বাস করেন তবে আজ আপনি যেখানে বসে আছেন সেখানে বসে থাকতে পারবেন না।

আমাদের (যুক্তরাজ্যে) এমন একটা প্রেস-ব্যবস্থা আছে যেখানে, আমার কাছে মনে হয়, তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে। যদিও পীড়াদায়কভাবে রক্ষণশীলদের প্রধান্য বিদ্যমান তবু বামপন্থী পত্রপত্রিকাও আছে এবং জানতে আগ্রহীদের জন্য এই প্রেসে কট্টর দক্ষিণপন্থী থেকে কট্টর বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়। আমি দেখতে পাই না কীভাবে একটি প্রচারণা মডেল এখানে...

আপনার একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বৃটিশ প্রেস নিয়ে ভাল ভাল গবেষণা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে জেমস কারানের গবেষণা অন্যতম, আপনি সেগুলো পাঠ করে দেখতে পারেন। এসকল গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৬০'র দশকের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যান্ডে একধরনের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক প্রেস ছিল, যে-প্রেস শ্রমজীবী জনগণ, সাধারণ মানুষ এবং এরকম খেটে খাওয়া জনগণের স্বার্থরক্ষায় তৎপর ছিল। আর এই প্রেস সফলও ছিল। যেমন ধরুন *ডেইলি হেরাল্ড* পত্রিকা কেবল সার্কুলেশনের দিক থেকেই অন্যান্য পত্রিকার চেয়ে বড় ছিল না বরং এর সার্কুলেশন ছিল অঙ্গীকারাবদ্ধ। তদুপরি, সেসময়ের ট্যাবলয়েড পত্রিকা– *মিরর* এবং *সান*– ছিল

শ্রমজীবীনির্ভর। ১৯৬০'র দশক নাগাদ এসকল পত্রিকা হারিয়ে যায়; আর এসকল পত্রিকা হারিয়ে যায় পুঁজির চাপের কারণে। যেগুলো টিকে থাকে পরিপূর্ণভাবেই সেগুলো মধ্যপন্থী বাম প্রেস যেগুলোতে কিছু ভিন্নমতসম্বলিত বক্তব্যও উঠে আসে– এটা সত্য... কিন্তু

আমাদের বেশ কিছু বৃহৎ সার্কুলেশন পত্রিকা রয়েছে যেগুলো মধ্যপন্থী বাম মতাদর্শের এবং সেগুলো নব্য কেইন্সপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে যা, আপনি যাদের অভিজাত বলেন, তার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন।

এটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক যে আপনি ঐ সংবাদপত্রগুলোকে নব্য কেইন্সপন্থী "মধ্যপন্থী বাম" হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। আমি এগুলোকে সরাসরি মধ্যপন্থীই বলি। "মধ্যপন্থী বাম" একটি মূল্যারোপিত প্রত্যয়...

নিশ্চয়।

ইংল্যান্ডে খুবই ভাল সাংবাদিক আছে। তাদের অনেকেই সততার সাথে লেখে এবং তাদের লেখার বিষয়বস্তুও খুবই ভাল। তারা যাকিছু লেখে তার অনেকগুলোই এখানে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) ছাপা হতো না। অন্যদিকে, আপনি যদি সার্বিকভাবে বিবেচনা করেন তাহলে, আমি মনে করি না যে খুব বেশি পার্থক্য খুঁজে পাবেন এবং যে স্বল্পসংখ্যক (বৃটিশ প্রেস নিয়ে খুব বেশি গবেষণা হয় নি) গবেষণা হয়েছে তাতে প্রায় একই রকম ফল পাওয়া গিয়েছে; আমি মনে করি ভাল সাংবাদিকরাও আপনাকে এটা বলতে পারবেন। আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো দৃষ্টান্ত ধরে ধরে বিচার করা। সুতরাং আসুন একটু আগেই আমি যার উল্লেখ করলাম সেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের দৃষ্টান্ত বিচার করি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন প্রেসের মতো ব্যাপক উদ্বেগ বৃটিশ প্রেসের ছিল না, কারণ বৃটিশরা এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না। ভিয়েতনামে মার্কিন যুদ্ধ, ১৯৬১ সাল নাগাদ দক্ষিণ ভিয়েতনামে যা সুস্পষ্ট আগ্রাসনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং '৬৫ সালে ব্যাপক আগ্রাসনে রূপান্তরিত হয়েছিল, সময় করে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন কতোবার প্রেসে এই আগ্রাসনকে 'দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন হামলা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি যদি সংবাদ-কভারেজের ০.০০১% -এ এমন বর্ণনা পান তবে আমি বিস্মিত হব। স্বাধীন প্রেসের ১০০% হারেই এই সত্য সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরার কথা ছিল। এখন কিন্তু এটাই বাস্তবতা– ডান বামে কিছু এসে যায় না।

আমি আরও সাম্প্রতিক যুদ্ধের প্রসঙ্গে আসি, আর সেটা হলো উপসাগরীয় যুদ্ধ। এক্ষেত্রেও বৃটেনের পত্রপত্রিকা পাঠ করে এবং টেলিভিশন দেখে আমি যুদ্ধবিরোধী ভিন্নমত সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হয়েছিলাম।

সত্যিই কি তাই?

"তেলের জন্য রক্তক্ষয় নয়" আন্দোলন এবং আমার সুযোগ হয়েছিল...

ঐ আন্দোলন কোনো ভিন্নমত ছিল না...

"তেলের জন্য রক্তক্ষয় নয়" আন্দোলন কোনো ভিন্নমত ছিল না?

না। সাদ্দাম হোসেন আগস্টের দুই তারিখে কুয়েত আক্রমণ করে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই ওয়াশিংটনে ব্যাপক ভীতি সঞ্চারিত হয় যে সাদ্দাম হোসেন একটি পুতুল সরকার বসিয়ে কুয়েত থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে ফেলবে, পানামার বেলায় যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছিল। সুতরাং, সাদ্দাম হোসেনের প্রত্যাহারের পথ বন্ধ করে দিয়ে ভীতি দূর করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তরিৎগতিতে অগ্রসর হয়। আগস্টের শেষ সপ্তাহ নাগাদ ইরাকের পক্ষ থেকে আপোষরফা-র আবেদন জানানো হচ্ছিল, ইরাক আপোষরফার মাধ্যমে প্রত্যাহার করতে চাচ্ছিল। এখানকার প্রেস এসব সংবাদ প্রচার করেনি, ইংল্যান্ডের প্রেসও এখরবর প্রচার করেনি। কিন্তু এখবর কোনোভাবে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল...

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপোষরফার কোনো ব্যাপার আদৌ ছিল কিনা তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে...

না; দুঃখিত, কোনো বিতর্ক ছিল না। নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখা হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক ছিল, সেটা আলাদা প্রসঙ্গ। প্রকৃত ঘটনা হলো, মধ্য-আগস্ট বা আগস্টের শেষ নাগাদ নিষেধাজ্ঞা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। আমাদের কাছে এর পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে কারণ এসব কাহিনী আসছিল স্টেট ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের– যেমন, প্রাক্তন কর্মকর্তা রিচার্ড হেল্‌ম– কাছ থেকে। আধিপত্যশীল ধারার প্রেসকে তারা এসব ঘটনা কভার করাতে পারে নি। কিন্তু একটি জার্নালকে দিয়ে তারা এসব ঘটনা কভার করাতে পেরেছিল, আর সেটা হলো লং দ্বীপের মফস্বলি জার্নাল *নিউজডে*। *নিউজডে*তে ছাপানোর উদ্দেশ্য ছিল, অনিবার্যভাবেই, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*কে সন্ত্রস্ত করা। কারণ এটাই ছিল সেসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিষেধাজ্ঞার খবর *নিউজডে*তে প্রকাশিত হয় এবং এসংক্রান্ত খবর প্রকাশ অব্যাহত থাকে (আমি বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না) জানুয়ারির ২ তারিখ পর্যন্ত। এই সময় স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে ইরাকের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব আসছিল তা এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা বলতে থাকে "দেখুন, এটা আপোষরফাযোগ্য, অর্থপূর্ণ, হয়তো আমাদের কাছে সবটাই গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু, নিশ্চিতভাবেই, আপোষরফার মাধ্যমে কুয়েত থেকে প্রত্যাহারের প্রস্তাবের এটা শক্ত ভিত্তি আছে"। প্রেস এসব কভার করেনি। *নিউজডে* করেছিল। স্বল্প কিছু লোক এবিষয়ে লিখেছিল। আমার বেশ কয়েকটি উন্মুক্ত আর্টিকেল ছিল এবং আমার জানা মতে– আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন– ইংল্যান্ডে এপ্রসঙ্গে লেখা খুঁজতে গেলে দেখবেন সর্বপ্রথম লেখাটি ছিল আমার, *গার্ডিয়ানে* লিখেছিলাম। আপনি যাচাই করে দেখুন, আমার আগে কারো লেখা খুঁজে পান কিনা।

ঠিক আছে; আসুন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে আসা যাক, যে দৃষ্টান্ত নিয়েও আপনি কাজ করেছেন এবং এই দৃষ্টান্তটি প্রেস সংক্রান্ত আপনার ধারণার বিপরীতে গিয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্তটি হলো ওয়াটারগেট ঘটনা...

ওয়াটারগেট একটি যুৎসই দৃষ্টান্ত। সত্যিই আমাদের গ্রন্থে এবং অন্যত্রও এবিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রেস কীভাবে ক্ষমতার অধিনস্ত হয় তা স্পষ্ট করে তুলতে ওয়াটারগেট একটি যুৎসই দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে...

কিন্তু এই ঘটনা প্রকাশ করে প্রেস একজন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল!

এক মিনিট, আসুন খুঁটিয়ে দেখা যাক। সেখানে যা ঘটেছিল...এটা খুব কৌতুহলোদ্দীপক যে, ইতিহাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না কিন্তু ওয়াটারগেট নিয়ে সেরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করা হয়েছিল। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী উন্মোচনের ঘটনা এমন এক সময় ঘটে যখন আরেক গুচ্ছ ঘটনাও উন্মোচিত হয়– সেটা হলো "কোইনটেলপ্রো" কর্মসূচির কথা।

বুঝলাম না। আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এটা বিস্ময়কর যে আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। ওয়াটারগেটের চেয়ে সেটা ছিল অনেক অনেক বেশি গুরুত্ববহ। আর এতেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "কোইনটেলপ্রো" ছিল একটি নাশকতামূলক কর্মসূচি যা, দু'চারজন দুষ্টলোক এই কর্মসূচি চালায় নি বরং, পরপর চারটি মার্কিন প্রশাসনের শাসনামলে জাতীয় রাজনৈতিক পুলিশ– এফবিআই– চালিয়েছিল। এই নাশকতামূলক কর্মসূচির শুরু হয়েছিল আইজেনহাওয়ার শাসনামলের শেষ নাগাদ এবং অব্যাহত ছিল...

একারণেই কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোস্যালিস্ট ওয়াকার্স পার্টির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল?

সোস্যালিস্ট ওয়াকার্স পার্টি ছিল একটি ক্ষুদ্র অংশ। নাশকতামূলক কর্মসূচি শুরু হয়... যেসময় এটা চালানো হচ্ছিল (আমি সম্পূর্ণ কাহিনীটা বলছি না), এই কর্মসূচির লক্ষ্যবস্তু ছিল পুরো নব্য-বাম-কর্মী, নারীবাদী আন্দোলন, সমগ্র কৃষ্ণ আন্দোলন; এই কর্মসূচি ছিল ব্যাপক বিস্তৃত– রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে চালানো হতো। ওয়াটারগেটের সাথে এই কর্মসূচির পার্থক্য কী? খুবই স্পষ্ট। ওয়াটারগেটের বেলায় রিচার্ড নিক্সন মার্কিন প্রইভেট ক্ষমতার অর্ধেক– অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক পার্টিকে– সাথে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। আর ক্ষমতা নিজেই নিজেকে রক্ষা করে। সুতরাং, কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়ে। নিক্সন কিছুই করেন নি। কিছুই ঘটেনি– সাফাই গাইছি না, আমি নিজেই নিক্সনের শত্রু-তালিকায় ছিলাম। আমি এমনকি কিছুই জানতাম না, কখনোই কিছু ঘটেনি। কিন্তু...

তারপরও আপনি নিশ্চয় বলবেন না যে একজন প্রেসিডেন্টকে গদি থেকে নামানো কোনো অগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা...

না, এই কেসের বেলায় অনিবার্যভাবেই বিপথে চলে যাওয়া একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক ক্ষতাবলয় নিজেকে রক্ষা করতে লিপ্ত হয়েছিল। প্রেস এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিল যা থেকে প্রতীয়মান হয়, তারা ভেবেছিল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। এখন, নৈতিকতার প্রশ্ন যদি এখানে জড়িত থাকে বলে আমরা মনে করি তবে এই কেসের সূত্র ধরে সহজেই তা যাচাই করে নেয়া যায়। ওয়াটারগেটের সমুদয় ঘটনাপ্রবাহ'র তুলনায় "কোইনটেলপ্রো" কর্মসূচির একটি ক্ষুদ্র অংশও ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সমগ্র কর্মসূচির দিকে দৃষ্টিপাত করেন তবে দেখবেন এপ্রসঙ্গে একটুও আলোচনা নেই কোথাও। আপনাকে আমায় জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে "কোইনটেলপ্রো" কী। কিন্তু ওয়াটারগেট কী তাতো আপনার ভালভাবেই জানা। শিক্ষিত মতামতের ক্ষমতার অধিনস্ত হওয়ার

এমন নাটকীয় দৃষ্টান্ত এই ইংল্যান্ডের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আর একটাও পাওয়া যাবে না।

পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আপনি বেশ কাজ করেছেন বলে আমি জানি এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো...

দেশীয় সমস্যা নিয়ে আমি ব্যাপক আলোচনা করেছি।

ঠিক আছে, আমি এই বিষয়টাতেই আসতে চাই। কারণ এস্টাবলিসমেন্টের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গুরুতর ভিন্নমত রয়েছে...

সেটা ঠিকই।

...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিনগ্রিস ও তার নব্য-রক্ষণশীল এজেন্ডা বর্বর ব্যঙ্গবিদ্রুপের শিকার হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থিতার আপতদৃশ্যমান নিশ্চয়তা শেষ পর্যন্ত আর থাকে নি। ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব ক্লিন্টন হোয়াইটওয়েদারকে নিয়ে ব্যাপক ঝামেলা পোহাচ্ছেন। যেকোনোদিকে তাকালেই বিরুদ্ধতা, ফাঁক দেখা যাচ্ছে।

এত সংকীর্ণ পরিসরে এই বিভেদ খুঁজে পেতে আপনার কষ্ট হবে। আমি একটা..

এখানে আপনাকে একটু থামতে হবে যেহেতু আপনি বলছেন পরিসর খুবই সংকীর্ণ, কিন্তু একদিকে...

আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন...

...আমরা পেয়েছি স্বার্বজনীন ট্যাক্স...

আমাকে কি ব্যাখ্যা করতে দিবেন?

স্বার্বজনীন ট্যাক্সপন্থী রিপাবলিকান থেকে শুরু করে তুলনামূলকভাবে বিশালাকার রাষ্ট্রপন্থী ডেমোক্রাটদের।

একজনকে... একজন রাষ্ট্রপন্থী ডেমোক্রাটকে খুঁজে বের করুন। এখনকার অবস্থান ক্লিন্টন যেমনটি ১৯৯২ সালের প্রচারণা বার্তায় বলেছিলেন ঠিক সেরকম: "বিশালাকার সরকারের দিন শেষ হয়ে গেছে, বিশালাকার সরকার ব্যর্থ হয়েছে, দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই ব্যর্থ হয়েছে, আমাদেরকে অধিকার প্রয়োগের কারবার থেকে মুক্ত হতে হবে"। এটাই হলো ডেমোক্রাটদের অবস্থান। এখন যা থাকলো তা হলো মধ্যপন্থী ও কট্টরপন্থী রিপাবলিকানদের মধ্যকার পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে, এটা সর্বজনস্বীকৃত যে মার্কিন ব্যবসায়িক মহলে দীর্ঘদিন ধরে একটা ফাটল রয়েছে: এ-ফাটল একেবারে দ্বিবিভাজনমূলক নয় বরং এটি সাধারণ দৃষ্টিতে গ্রাহ্যমান একটি বিভেদ। এটা হলো প্রযুক্তিনির্ভর, পুঁজিঘন, আন্তর্জাতিকতামুখী ব্যবসা, যারা তথাকথিত "উদারবাদী" হওয়ার প্রবণতা দেখায়; বনাম নিব প্রযুক্তিনির্ভর, অধিকতর জাতীয়তামুখী শ্রমঘন ব্যবসা, যাদেরকে "রক্ষণশীল" বলা হয়, তাদের মধ্যকার বিভেদ। এখন, এই সেক্টরগুলোর মধ্যে

পার্থক্য আছে এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক চিত্রের দিকে একবার তাকান তাহলে দেখবেন এই সেক্টরগুলোর সীমার মধ্যেই তা দোলায়মান (ঘটনাক্রমে এপ্রসঙ্গে ভাল কাজও হয়েছে– সবচেয়ে বিস্তারিত কাজ যিনি করেছেন তিনি হলেন থমাস ফার্গুসন, তিনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী)।

মিডিয়াতে ভিন্নমতের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, বৃটেন ও ইউরোপেও যার অনুরণন দেখা যায়, নর্থ এ্যামেরিকান ফ্রি ট্রেড এ্যাসোসিয়েসন কেন্দ্রীক মহাবিতর্ক– নাফটা বিতর্ক, যেখানে...

এটা একটা আগ্রহোদ্দীপক বিষয়।

...বৈশ্বিক বিরোধী আন্দোলন বলে যদি কেউ এটাকে শনাক্ত করতে চায়, যেমন পরিবেশ আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিটিনির্ভর আন্দোলন তবে তার সবই নাফটা-বিরোধী...

আমি কি আপনাকে বলবো কী ঘটেছিল?

বেশ...

আমি কি আপনাকে বলবো কী ঘটেছিল?

আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো...

কখনোই রিপোর্ট করা হয় নি...

...ঐ বাহাসগুলো ছিল চমৎকার...আমরা বাহাসগুলো সম্পর্কে ভালই অবগত ছিলাম।

না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাহাসগুলোকে প্রেসে আসার সুযোগ দেয়া হয় নি; আমি সেগুলোর রেকর্ড রেখেছি। আপনি যদি চান তবে আমি তার বিস্তারিত তথ্য দিতে পারি।

আমার যা বলার তা হলো বৃটেনে বসেই আমরা বাহাসগুলো সম্পর্কে পাঠ করতে পেরেছি।

না, আপনি পাঠ করেন নি, যেমন ধরুন...

দুঃখিত, আমরা...

বেশ, তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি অফিস অব টেকনোলজি এ্যাসোসিয়েসন অব কংগ্রেস এর দেয়া রিপোর্ট পড়েছেন? আপনি কি লেবার এ্যাডভাইজরি কমিটির দেয়া রিপোর্ট পড়েছেন?

না, এই রিপোর্টগুলো আমি পাইনি কিন্তু আমি পড়েছি...
দুঃখিত, এটা হলো...

...আমি নাফটা-বিরোধী বাহাস সম্পর্কে অনেক আর্টিকেল পড়েছি সেগুলো ছিল খুবই...

আমি দুঃখিত, আপনি সেগুলো সম্পর্কে জানেন না। আপনি যদি তথ্যগুলো জানতে আগ্রহী হন তবে আমি জানাতে পারি এমনকি সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে তাও বলতে পারি। মধ্য আগস্টে প্রেসিডেন্ট নির্বচনের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে অনেকখানি গোপনীয়তা রক্ষা করেই নাফটা বিতর্ক সাক্ষর করেছিলেন তিনজন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইন আছে, ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইন, যে আইন মোতাবেক বাণিজ্য সংক্রান্ত যেকোনো ইস্যুকে ইউনিয়ন-ভিত্তিক লেবার এ্যাডভাইজরি কমিটির কাছে পেশ করতে হবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য। নাফটা বিষয়টি যথাসময়ে লেবার এ্যাডভাইজরি কমিটির কাছে পেশ করা হয় নি। মধ্য সেপ্টেম্বরে লেবার এ্যাডভাইজরি কমিটির যেদিন চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা তার ঠিক আগের দিন অবশেষে বিষয়টি তাদের কাছে পেশ করা হয়। ইউনিয়নগুলো সুস্পষ্টতই দক্ষিণপন্থী, কিন্তু তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলা হয়েছিল। আগে কখনো তারা এমন ক্রুদ্ধতা দেখায় নি। এমনকি তাদের যখন রিপোর্ট লিখতে হচ্ছিল...রিপোর্ট লেখার জন্য তাদেরকে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় দেয়া হয়, বিষয়টি ভাল করে পড়ে দেখার সময় তাদের ছিল না। তদুপরি তারা একটি সাহসি বিশ্লেষণ লিখেছিল এবং বিভিন্ন বিকল্প উপস্থাপন করে বলেছিল "দেখুন, আমরা নাফটা বিরোধী নই, আমরা কেবল নাফটার এই মডেলটির বিরোধী"। তারা একটি চমৎকার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিল যা কংগ্রেস রিসার্স সার্ভিস ও অফিস অব টেকনলজি এ্যাসেসমেন্ট এর প্রদত্ত বিশ্লেষণের সাথে মিলে যায়। এসব বিশ্লেষণের একটিও প্রেসে উপস্থাপিত হয় নি। প্রেস কেবল সে-ধরনের সমালোচনাগুলোকেই উপস্থাপিত হতে দিয়েছিল যেগুলো তারা ব্যবহার করতে চায়ঃ যেমন, মেক্সিকোর ওপর সমালোচনামূলক লেখা, দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী সমালোচনা ইত্যাদি। এরকম সমালোচনা প্রেসে জায়গা পেয়েছে, কোনো গভীর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ নয়। এখন...

কিন্তু কোনো না কোনোভাবে চুঁইয়ে পড়ে বা অন্য উপায়ে আমি নাফটা-বিরোধী বাহাস সম্পর্কে শ্রমিক-সুরক্ষা, পরিবেশ অবক্ষয় ইত্যাদি ভিত্তিক বেশ অনেকই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম...

আমি কি আমার বক্তব্য অব্যাহত রাখব? প্রেসে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয় প্রায় শেষ পর্যন্ত ... নাফটা-বিরোধী বিশাল জনবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই বিশাল আন্দোলনের সবটাই– শমিক আন্দোলন থেকে, জনবাদী আন্দোলন থেকে যাকিছু বেড়িয়ে আসছিল– চেপে যাওয়া ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু প্রেস চেপে গিয়েছিল। তবে একবারে শেষ পর্যায়ে নাফটা-বিরোধী আন্দোলন এমন তুমুল আকার ধারণ করে যে এই আন্দোলনকে আর গুড়িয়ে দেয়া যাবে না বলে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের কয়েক সপ্তাহর "উদারবাদী" ও জাতীয় মিডিয়া হিসেবে খ্যাত *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ও *ওয়াশিংটন পোস্টের* দিকে তাকান– আমি এসম্পর্কে লিখেছি এবং আপনাকে বলে দিতে পারি সেখানে কী খুঁজে পাবেন। আপনি যা খুঁজে পাবেন তা হলো নাফটার প্রতি একশতভাগ সমর্থন, জনবাদী যেকোনা বাহাস ছাপাতে অস্বীকৃতি, ভয়ানক শ্রমিক সমালোচনা...

রক্ষণশীল প্রেসের বিরুদ্ধে উদারবাদী প্রেসের অবস্থান সম্পর্কে আমি ঠিক ঠিক বুঝেছি কিনা সেটা স্পষ্ট

করতে চাই, কারণ গত দু'বছর ধরে বৃটেনে আমি যেসকল রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎ পেয়েছি তারা প্রেস কর্তৃক তাদের ওপর দিনের পর দিন আক্রমণ চালানো নিয়ে ক্রুদ্ধ, এমনকি কেউ কেউ ব্যাপকভাবে ক্ষিপ্ত এবং প্রেসের এই আক্রমণ চালানোকে 'স্লেজ' বলে আখ্যায়িত করা শুরু হয়েছে। রাজনীতিবিদরা বোধ করছেন যে প্রেস তাদেরকে হয়রানি করছে, ভুল বুঝছে, এবং প্রেস উচ্চমন্যতায় ভোগে, "আত্মম্ভরিতাপূর্ণ" ও ধ্বংসাত্মক : এই দৃষ্টিভঙ্গিই তারা আমাদের কাছে তুলে ধরছে। তারপরও কি আপনি বলবেন যে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অর্থহীন, কারণ এটা একই প্রক্রিয়ার অংশ...

প্রেসের এমন অবস্থান প্রান্তীয়, কিছু সত্য আছে এখানে– প্রেস যখন রাজনীতিবিদদের যৌনজীবনের ওপর আলোকপাত করে তখন তাদের নজর থাকে পাঠকের পকেটের ওপর। যেহেতু এসকল ইস্যু জনগণের স্বার্থকেন্দ্রীক নয় সেহেতু এখন খুঁজে দেখুন কে আপনার টাকার থলি ফাঁকা করছে। আমার মতে, এসব ইস্যু খুব প্রান্তীয় স্বার্থকেন্দ্রীক। জনগণের স্বার্থকেন্দ্রীক ইস্যু অন্য কোথাও এবং যখনই প্রেস, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বা অন্য কেউ "মূল্যবোধ" নিয়ে আলোচনা করে তখন আপনার নিজের টাকার থলেতে হাত দিতে হয়– কিন্তু আপনি জানেন, এসবের গভীরে অন্য কিছু ঘটছে।

কিন্তু এটা তার চেয়েও বেশি কিছু...আমাদের কাছে, "খাট ঝাঁকানোর" চেয়েও অনেক গুরুতর। অর্থগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কেও, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্পোরেশনের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ...

দুর্নীতি, নিশ্চয়...দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারক–চমৎকার বিষয়...

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দল?

হ্যাঁ– দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলগুলো। আপনি নিশ্চয় জানেন বড় মাপের ব্যবসাগুলো দুর্নীতির পক্ষে নয় এবং প্রেস যদি দুর্নীতির ওপর আলোকপাত করে তবে *ফরচুন ম্যাগাজিন* বেশ খুশিই হবে, এগুলোর প্রতি তাদের নজর নেই– তারা চায় না যে সমাজটি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ুক, তারা চায় সমাজটি তাদের স্বার্থের অনুকূলে চলবে– এপ্রসঙ্গ অবশ্য আলাদা। কিন্তু দুর্নীতি সমাজকে তাদের অনুকূলে চলাকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, কদিন আগেই আমাকে ভারত থেকে ফিরতে হয়েছে, সেখানকার অর্থনীতিবিদরা আমাকে জানালো যে ব্যাংক অব ইন্ডিয়া একটা বিবৃতি প্রকাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে, ভারতীয় অর্থনীতির চারভাগের তিনভাগই "কালো" নির্ভর; অর্থাৎ, অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়ীই কর প্রদান করছে না। এমন খবর অবশ্য প্রেসে আসছে কারণ প্রকৃতপক্ষে বহুজাতিক কর্পোরেশন এগুলো পছন্দ করে না। তারা চায় যে পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি দুর্নীতি-ডাকাতি-ঘুষ ইত্যাদি ছাড়াই চলবে– শুধু নিজেদের পকেটে অর্থ ভরতেই ব্যাস্ত। সুতরাং, নিশ্চয় দুর্নীতি প্রেসের কাছে আকর্ষনীয় বিষয়বস্তু। অন্যদিকে, আমি যে বিষয়বস্তুটির কথা বললাম সেটা চমৎকার বিষয়বস্তু নয় কারণ সেটি গণমানুষের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বহ।

আপনার মতে প্রচারণা মডেলের বাইরে প্রেসের চেহারা কেমন হবে? এখন যেসব বিষয় পড়তে পারছি না তেমন কী বিষয় তখন আমরা পত্রিকাতে পাব?

আমি এখানে প্রায় ডজনখানেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। আপনার উপস্থাপিত বিষয়গুলোতেই

আমি প্রতিটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি, প্রতিটি বিষয় আপনিই উত্থাপন করেছেন, আমি নই। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি যে নিজের যুক্তির পক্ষের বিষয় আমি তুলে ধরতে পারতাম কিন্তু আমি খুশি মনেই আপনার পক্ষের বিষয়গুলো উপস্থাপনের সুযোগ দিয়েছি। এর প্রতিটি দৃষ্টান্তেই, আমি মনে করি, আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে প্রেস প্রকৃত ঘটনার ভয়ানক তথ্যবিকৃতি ঘটিয়েছে– বাম বা ডানপন্থী দিয়ে এক্ষেত্রে কিছু এসে যায় না। এই তথ্যবিকৃতি জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেয়, প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়। একটি মুক্ত প্রেস আপনাকে কেবল সত্যটাই বলবে। বাম বা ডানপন্থা ব্যাপার নয়...

'বিগ বিজনেসের', প্রেসের এই বিপুল ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ কী করতে পারে?

হাইতির বস্তিতে এবং পাহাড়ে মানুষ যা করছে–নিজেদেরকে সংগঠিত করছে– জনগণও ঠিক তাই করতে পারে। ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ হাইতি, তবু তারা বস্তিগুলোতে, পাহাড়গুলোতে এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও উদ্যমশীল ও প্রাণবন্ত নাগরিক-সমাজ গড়ে তুলেছে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। আমরা এখানে অনেক সহজেই একই কাজ করতে পারি।

আপনাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো অনেক মহল্লা কর্মী (কমিউনিটি এ্যাকটিভিস্ট) রয়েছে ...

হ্যাঁ আছে।

... আমি তথাকথিত "মহল্লাপন্থী" (কমিউনিটেরিয়ান) আন্দোলনকারীদের কথা বলছি না বরং স্থানীয় মহল্লা কর্মী এবং লেখকদের কথা বলছি যারা সকল অঞ্চলে...

সকল অঞ্চল... সকল অঞ্চল... যেমন ধরুন বস্টনের মতো একটা শহর, সেখানে সকল রকম মানুষের বাস কিন্তু তারা একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নয়। এরকম লোকের সংখ্যা বিশাল। বিভিন্ন কাজের মধ্যে আমি অব্যাহতভাবে যে কাজটি করবো তা হলো সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বক্তব্য দেব; আমার, এবং আমাকে যারা বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় তাদের, উদ্দেশ্য হলো একই অঞ্চলের যে মানুষগুলো একই লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নয় তাদেরকে একত্রিত করা। কারণ সম্পদ এতো বিক্ষিপ্ত এবং যোগাযোগের উপায়গুলো এতা প্রান্তীয় যে তারা এগুলোর মাধ্যমে খুব একটা কিছু করতে পারে না। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই অসংখ্য কিছু ঘটে চলেছে। যেমন ধরুন, মহল্লা-রেডিওর কথা, এটা এখনও সিস্টেমের বাইরেই থেকে গেছে...

আমি এই প্রসঙ্গটাতেই আসতে চাচ্ছিলাম, এবং ইন্টানেট এর প্রসঙ্গে, যাতে অভিগম্যতা এখনও উন্মুক্ত।

বেশ, অন্যান্য যেকোনো প্রযুক্তির মতোই ইন্টারনেটও দ্বিমুখী করাত। প্রিন্ট-মাধ্যমসহ অন্য যেকোনো প্রযুক্তির মতো ইন্টারনেটও মুক্তির সম্ভাবনা ধারণ করে কিন্তু একই সাথে এটা দমনমূলক সম্ভাবনাও ধারণ করে এবং এখন কোন পথে ইন্টারনেট যাবে তা নিয়ে একটা লড়াই চলছে। রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন লড়াই চলেছিল।

এর বিষয়বস্তু কী হচ্ছে এবং কে এই মাধ্যমে অভিগম্যতা পেতে যাচ্ছে। স্মরণ রাখা দরকার যে ঘটনাক্রমেই ইন্টারনেট একটি এলিট-তৎপরতা। আপনি জানেন যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কখনো একটা টেলিফোনও করে নি, সুতরাং তাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করাটা একবারেই অবান্তর। তারপরও ইন্টারনেট গণতন্ত্রায়নের সম্ভাবনা ধারণ করে এবং এই সম্ভাবনাকে বাস্ত বায়ন করা যাবে কিনা কিংবা এটা কেবল গৃহে বসে কেনাকাটা সারার মতো কোনো মাধ্যমে ও জনগণকে আরও প্রান্তিকতায় ঠেলে দেয়ার মিডিয়াতে পর্যবসিত হবে কিনা তা নিয়ে এখন লড়াই চলছে। এরকম আলোচনা ১৯২০'র দশকেও উঠেছিল (রেডিওকে কেন্দ্র করে), এটা বেশ দৃষ্টিগ্রাহী যে টেলিভিশনকে নিয়েও এমন বিতর্ক উঠেছিল এবং এখন ইন্টারনেট নিয়ে এমন বিতর্ক চলছে। এটা জনবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জনের বিষয়। দেখুন, দু'শ বছর আগে আমরা যেমন করে বাঁচতাম তা এখনকার মতো নয় এমনকি ৩০ বছর আগের মতোও নয় – বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। এটা আকাশ থেকে পড়া কোনো দান নয়। এটা হলো জনগণের একত্রিত হওয়া এবং স্বৈরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানানোর ফল। অধিকার আদায়ের লড়াই শেষ হয়ে গেছে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

নিঃসঙ্গ ভিন্নমতের ব্যক্তি হিসেবে আপনাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেন, কখনো কখনো আপনি নিজেও নিজেকে এভাবে চিত্রায়িত করেছেন– আপনি নিশ্চয় একেবারেই নিঃসঙ্গ বোধ করেন না।

আমি নিজে থেকে কখনোই এরকম কিছু বলি না। অবশ্যই আমি নিজেকে এভাবে চিত্রায়িত করি না। সারা দেশ থেকে আমার যে-পরিমাণ আমন্ত্রণ আসে তার একটি ক্ষুদ্র অংশও এখনও আমি গ্রহণ করতে পারি না: আমার দুই বছরের সিডিউল আগে থেকেই হয়ে থাকে। এবং এই সিডিউলের একটি ক্ষুদ্র অংশকেই আমি গ্রহণ করি...

এবং, আপনি সবসময় বিশাল সব অডিয়েন্সের সামনে কথা বলছেন।

বিশাল অডিয়েন্স। আর এই অডিয়েন্সের কেউই এলিট বুদ্ধিজীবী নয়। তারা প্রধানত সাধারণ মানুষ। সারা দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের থেকে আসা চিঠির জবাব দিতে সপ্তায় ২০ থেকে ৩০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করি। আমি যদি আরেকটু নিঃসঙ্গ হতে পারতাম তবে ভাল হতো। কিন্তু আমি তা পারি না। এটা নিশ্চিত যে, আমি জনসংযোগে লিপ্ত নই, আমাকে আধিপত্যশীল মিডিয়াতেও দেখা যাবে না; আর আমি সেটা আশাও করি না। যে ব্যক্তি তাদের ক্ষমতাকে খর্ব করতে চায় তাকে কেন মিডিয়া জায়গা দেবে, কেনইবা তাদের কৃতকর্ম ফাঁস করে দেয়ার সুযোগ দেবে? কিন্তু এর মানে নিঃসঙ্গতা নয়।

প্রফেসর চমস্কি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্র
চা
র
ণা,
পুঁ
জি
বা
দ,
যু
দ্ধ

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

জে টি. হ্যারিস

সংবাদ ও মুনাফা

তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন

জে টি. হ্যারিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সান হোসে মার্কারি নিউজ' এর প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকাটির মূল মালিক-কোম্পানি 'নাইট রাইডার' মুনাফা বাড়ানোর জন্যে সাংবাদিক-কর্মচারি ছাঁটাই করার চেষ্টা চালায়। আস্তে আস্তে শক্তিহীন হতে থাকা মার্কিন অর্থনীতির চলতি পটভূমিতে এ ছাঁটাইয়ে রাজি না-হওয়ার কারণে গত ১৯শে মার্চ ২০০১ তারিখে তিনি পদত্যাগ করেন। তার ক'দিন পরই 'আমেরিকান সোসাইটি অফ নিউজপেপার এডিটর্স্'-এ দেয়া বক্তৃতায় তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা হাজির করেন। বক্তৃতাটি প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩৬ বছরের পুরোনো সাপ্তাহিক 'দ্য নেশন' এর ২৮শে মে ২০০১ তারিখের ইন্টারনেট-সংস্করণে, 'নিউজ অ্যাণ্ড প্রফিট' শিরোনামে। জানিয়ে রাখা যেতে পারে, তৎকালে *প্রথম আলো* এই অনুবাদটা ছাপে নাই। এখানে সেই প্রবন্ধটির বাংলা তরজমা পেশ করা হলো।

সংবাদপত্র জনগণের আস্থার একটা জায়গা– এটা ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই আমাকে 'নাইট রাইডার'-এ টেনে এনেছিল। ১৯৮৫ সালে। তখন আমার এ উপলব্ধি ছিল যে, একটা ভালো পত্রিকা আর একটা ভালো ব্যবসা হাতে হাত রেখে চলে। এখন অবশ্য এটা আমি আরো ভালো করে বুঝি। ভালো ব্যবসা ছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে ভালো সাংবাদিকতা করা সত্যি অসম্ভব। কিন্তু একটা সময়ে এসে প্রশ্ন তুলতে হয়। ভালো ব্যবসা বলতে কী বোঝায়? মুনাফাযোগ্যতার দিক থেকে, তার মানে বছর-বছর বাড়ার মতো মুনাফার দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে কতটা পর্যন্ত গেলে সেটাকে যথেষ্ট ভালো ব্যবসা বলা যায়? আর শক্তিশালী একটা ব্যবসা এবং জনগণের আস্থার সেবক হিসেবে আপনার ওপর অর্পিত দায়দায়িত্ব– এ দুয়ের মধ্যে কীভাবে আপনি ভারসাম্য রাখবেন?

বেশিরভাগ ব্যবসাই চাহিদা এবং আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের খরচ কমবেশি বাড়াতে বা কমাতে পারে। তাদের একেবারে ভেতরের ক্ষমতা, বাজারে তাদের অবস্থান এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মেরামত-অযোগ্যভাবে নষ্ট না-করে খরচ ওরকম বাড়ানো-কমানো যায়। পাঠকের স্বার্থ কিন্তু কমতে-থাকা বিজ্ঞাপনের সাথে চুক্তি রক্ষা করে চলে না। কিম্বা, আয় কমতে থাকলে বা নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়তে থাকলে তার সাথে সাথে জনগণের কাছে আমাদের দায়দায়িত্ব কমে আসতে থাকে–

ব্যাপারটি সেরকমও নয়।

ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের জন্যে হাসপাতাল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ভালো সংবাদপত্রও তেমনি আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের জাতি এবং আমাদের গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আজকে আমার মোদ্দা যুক্তি হলো এই যে, একটা স্বাধীনতা, একটা সম্পদ যা এতোটাই মৌলিক যে আমাদের সংবিধানে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেটাকে প্রধানত বাজারের চাহিদানুযায়ী বা কতিপয় বড়ো শেয়ারহোল্ডারের নির্দেশানুযায়ী চালানো উচিত নয়।

গুণগত মান রাষ্ট্রীয় বনাম ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপার নয়। উভয় ক্ষেত্রেই ইস্যুগুলি একই। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে পরিচালিত এমন সংবাদপত্র আছে যেখানে ভালো সময়ে বা খারাপ সময়ে গুণগত মান আলাদা হয় না। আবার অন্যেরা আছে, এবং আমি এর মধ্যে নাইট রাইডারের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চাইব, যারা খুব ভালো সংবাদপত্র প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু এক দিকে গুণগত মান ও দায়িত্বশীলতা এবং অন্য দিকে আর্থিক প্রত্যাশার মধ্যে টানাপোড়েন লেগেই থাকে, এবং ভারসাম্যটি রক্ষিত হয় ক্ষীণভাবে।

জিম লেরার এর "দ্য নিউজ আওয়ার" এর সাম্প্রতিক একটি পর্বে এই টানাপোড়েন এবং এর উৎসগুলো ভালোভাবে এবং চুম্বকভাবে ধরা পড়েছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। এতে সংবাদদাতা টেরেন্স স্মিথ প্রশ্ন করেছিলেন লরেন রিচ ফাইনকে। ফাইন একজন মেরিল-লিন্চ্-মিডিয়া-বিশ্লেষক। প্রশ্নটা হলো: "একটা সংবাদপত্রের কাছ থেকে, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে পরিচালিত একটা সংবাদপত্র-কোম্পানির কাছ থেকে ওয়াল-স্ট্রিট কতটা মুনাফা প্রত্যাশা করে? মুনাফার মার্জিন যদি হয় শতকরা কুড়ি, সেটা কি যথেষ্ট? মুনাফা আসলে কতখানি হওয়া দরকার?" ফাইন জবাব দিয়েছিলেন: "আচ্ছা, এটা কখনোই যথেষ্ট না, অবশ্যই যথেষ্ট না। এটা ওয়াল-স্ট্রিট, আমরা যেখানে কথা বলছি।"

আমরা কেউ কেউ যেটাকে চলতি পরিস্থিতির নির্দয় দৌরাত্ম্য হিসেবে দেখি এটা তারই একটা সৎ এবং অলজ্জিত বিবরণ। বিশ্লেষক ও শেয়ারহোল্ডারদের চাহিদা, সেসব চাহিদার প্রতি কর্পোরেট-কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া অথবা অযৌক্তিক উচ্চ মুনাফার জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্র-মালিকদের নিছক আকাঙ্ক্ষা এই দৌরাত্ম্যের উৎস কিনা তাতে কিছু আসে-যায় না।

সংবাদপত্রের ঐতিহাসিক জনসেবা-মিশনকে যা হুমকির মুখে এনেছে তা পরিষ্কার - আদৌ তা যদি আমরা দেখতে চেয়ে থাকি। এবং এটাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় এবং পুরোপুরি পাল্টে দেয়া যায় - আদৌ আমরা যদি বলতে ইচ্ছুক থাকি। পরিস্থিতির সত্যকে দেখতে বা বলতে অবশ্য-অবশ্যই অনেকেই অক্ষম, বা অনিচ্ছুক। একটা কারণ হলো, নিউজরুমে এবং ব্যবসা-কার্যালয়ে এবং সেই সাথে কর্পোরেট-হেডকোয়ার্টারে আমাদের নেতাদের অনেকেই যে উচ্চ বেতন পান সেটা তাঁদের সোনালী হাতকড়ায় পরিণত হয়েছে। এবং ঐ হাতকড়াগুলো রূপান্তরিত হয়েছে অন্ধঠুলি ও বাকরোধক মুখপট্টিতে।

সৌভাগ্যের এই ডিব্বা কিন্তু চরম নীরবতা উৎপন্ন করতে পারে নি। ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে এবং বাইরে আজ আমরা সাহসী আত্মার ক্রমবর্ধমান কোরাস শুনতে পাচ্ছি, দৃঢ়তার সাথে তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি পদমর্যাদাসম্পন্ন সাংবাদিকগণের, এবং একই সাথে পাঠকেরও, অসন্তোষের বিড়বিড়-করা গুঞ্জন।

এখান থেকে আমরা তাহলে কোথায় যাব? মার্কিন সংবাদপত্রগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী ও শুভবাদী – ব্যবসা হিসেবেও বটে, আবার আমাদের গণতন্ত্রের প্রাণশক্তিতে মূল অবদান রাখার ক্ষেত্রেও বটে। এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না এবং আমি মেনেও নেব না যে,

চলতি প্রবণতা বদলানো যাবে না, যথাযথ ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা যাবে না, অবিচক্ষণতা এড়ানো অসম্ভব অথবা আমাদের নীতিনিয়ম ও মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ একটা পথ অনুসরণ করতেই হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি আমরা সত্য বলতে ইচ্ছুক থাকি, যথাযথ ভারসাম্য কী এবং কীভাবে তা ফিরিয়ে আনা যায় সে-ব্যাপারে একসঙ্গে কথা বলতে ও কাজ করতে যদি আমরা রাজি থাকি তাহলে সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। কীভাবে তা করা যেতে পারে সে-সম্পর্কে কিছু চিন্তা এখানে হাজির করা হলো:

১। কেবল প্রকাশক, সম্পাদক, বৃহৎ শেয়ারহোল্ডার এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ নন, সংবাদপত্রের স্বার্থ-কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। ব্যবসা-পক্ষের দিক থেকে সাংবাদিক ও কর্মচারীদেরকেও আলোচনার টেবিলে রাখা দরকার। একইভাবে রাখা দরকার পাঠক ও বিদ্বজ্জন এবং সংবাদপত্র-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নানান দলের মানুষকে।

২। জন-আস্থার উত্তম ও বিশ্বস্ত সেবক হয়ে-ওঠাটা সংবাদপত্র-ব্যবস্থাপক ও -মালিকদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে তার একটা কার্যকর সংজ্ঞা প্রস্তুত করা এই প্রয়াসের একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৩। বিবেচ্য প্রসঙ্গটির নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসাগত মাত্রাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত ও সেগুলোকে সমান অগ্রগণ্যতা প্রদান করা উচিত।

৪। আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটিকে পরিণত করা দরকার সংবাদ, সার্কুলেশান, গবেষণা ও প্রচার-প্রসারের সুষম ও নির্ভরযোগ্য একটি বিনিয়োগে - পরিণামদর্শী ও সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবসা যতটা অনুমোদন করে।

৫। একটা ব্যাপার হওয়া দরকার। সেটা হলো, সম্পাদকদের অবশ্য-অবশ্যই প্রকাশকদের চেয়ারের সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। সংবাদপত্র-পাঠক ও সংবাদপত্র-সম্প্রদায়ের কাছে দায়িত্বশীলতার প্রতি গভীর অঙ্গীকার যাদের নেই সাংবাদিকগণ তাদের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারেন না।

৬। এবং শেষ কথা হলো এই যে, এমন একটা উপায় অতি-অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যাতে করে জনগণ তাদের সম্প্রদায়ের সংবাদপত্রের ওপর এক ধরনের "মালিকানা" অনুভব করতে পারে। জনগণের উচিত হবে সংবাদপত্রকে, তার মানে এর মালিক ও ব্যবস্থাপকদেরকে, যৌক্তিকতাপূর্ণ উচ্চ মানে ধরে রাখা এবং তার চেয়ে নিচে নেমে যাওয়াকে মেনে না-নেয়া।

আন্তর্জাতিক আইন
মানবাধিকার
যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা

মাইকেল ম্যান্ডেল

আপনারা যা খুশি বলুন, কিন্তু এ-যুদ্ধ বেআইনি

তরজমা: বদরে মুনীর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জি-নেট থেকে (http://www.zmag.org) এই লেখাটা ডাউনলোড করা হয়েছে। আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন হামলার কিছু দিনের মধ্যেই এটা লিখিত হয়। **মানুষ**-এর জন্যই এটা তরজমা করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা বিষয়ে একটি সর্বগ্রাহ্য সত্য এই যে, এ-হামলা অবৈধ। এই আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিমালার পরিষ্কার লঙ্ঘন।

জাতিসংঘ সনদের ৫১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বারবার বলা হ'লেও, সনদের কিছুই এ-ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে কোনও চলমান অথবা আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার অধিকার পায় যতদিন না জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ইতোমধ্যে ১১ই সেপ্টেম্বর আক্রমণকে ধিক্কার জানিয়ে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্যে রাশি রাশি ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ দু'টি প্রস্তাব পাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, সন্ত্রাস ও তার পেছনে অর্থলগ্নীকারীদের ওপর বৈধ দমন-প্রক্রিয়া, এবং সন্ত্রাস সম্পর্কিত যাবতীয় তৎপরতার তদন্ত কল্পে দেশসমূহের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে সহযোগিতা প্রদান। প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ একটি কমিটি তৈরি করেছে এবং ৯০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রসমূহকে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। প্রস্তাবদ্বয়ের কোনটিতেই সামরিক শক্তি ব্যবহারের অধিকার প্রসঙ্গে অস্পষ্টভাবেও কিছু বলা হয়নি। এটা ঠিক যে, উভয় প্রস্তাবের শুরুতেই সংক্ষিপ্ত অথচ সুনিশ্চিত দৃঢ়তার সাথে আত্মরক্ষার সহজাত অধিকার ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু তারা এমন বলেছে জাতিসংঘের "সনদ অনুযায়ী"। প্রস্তাবে বলা হয়নি যে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ আত্মরক্ষার আওতার মধ্যে পড়ে, তারা তা বলতে পারেও না। আর সে কারণেই, থেমে যাওয়া আক্রমণের পাল্টা জবাব আত্মরক্ষার আওতার মধ্যে পড়ে। আন্তর্জাতিক আইনে আত্মরক্ষার অধিকার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আত্মরক্ষার অধিকারের মতোই:

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

আইন অকর্মণ্য হ'লে নিজেকে রক্ষার অধিকার আপনার আছে, কিন্তু তাই ব'লে আপনি আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না।

নিরাপত্তা পরিষদের সুনির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়াই যেহেতু আমেরিকা ও ইংল্যান্ড এই আক্রমণ শুরু করেছে, যারা এর ফলে জীবন হারাবেন তারা মানবতার বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধের শিকার হবেন, যেমন শিকার হয়েছেন ১১ই সেপ্টেম্বরে অনেক আমেরিকান। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদই একমাত্র সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার রাখে যেখানে, "আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য শক্তি প্রয়োগ জরুরি।" এখন এটা সবার কাছেই পরিষ্কার যে, আফগানিস্তানে সামরিক হামলার সঙ্গে সন্ত্রাস প্রতিরোধের কোনোই সম্পর্ক নাই। বরং এই আক্রমণ সন্ত্রাসবাদকে আরও উশ্‌কে দেবে। এমনকি বুশ-প্রশাসন স্বীকার ক'রে নিয়েছে যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ হবে দীর্ঘমেয়াদী; এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, গোয়েন্দা বিভাগ আর মার্কিন-মিত্রদের বিষয়ে পুনর্বিবেচনার সমন্বয়ে হবে এই যুদ্ধ। বুশ-সিদ্ধান্তের সমালোচকরাও এই মত পোষণ করেন যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী লড়াই-এর ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের প্রতি ওয়াশিংটনের আচরণের পুনর্মূল্যায়নকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন তারা সাময়িক লাভের স্বার্থে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সহিংসতাকে মদদ জুগিয়েছে: এক দশক আগে তারা তালিবানদের সমর্থন দিয়েছে আফগানিস্তানে, ইরাক-ইরান যুদ্ধে তারা সমর্থন দিয়েছে সাদ্দাম হোসেনকে, এবং তার পূর্বে তারা শাহকে সমর্থন দিয়েছে ইরানে।

আফগানিস্তানে আক্রমণ কেবলি প্রতিহিংসা, এবং দেখিয়ে দেয়া যে আমেরিকানরা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। এই আক্রমণ চলছে সেই জনগোষ্ঠীর ওপর, নিজেদের সরকার বিষয়ে যাদের কোনোই ভূমিকা নাই, এমনকি ১১ই সেপ্টেম্বরের হতভাগ্যদের চেয়েও যারা ভাগ্যাহত। এর ফলে অনেক অসামরিক মানুষের মৃত্যু এড়ানো যাবে না, তারা মরবে বোমায় এবং খাদ্যের অভাবে; যে দেশে ইতোমধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে। গত রোববারে বিমান থেকে ফেলা ৩৭,০০০ সাহায্য সামগ্রী ছিলো নিখাদ জনসমর্থন আদায়ের ধান্দা, আর সেই সুবাদে এই আক্রমণকে "শল্য-চিকিৎসাসুলভ" ব'লে দাবি করা হচ্ছে আর বাতিল করা হচ্ছে অসামরিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারটি। আমরা তাদের আগেও দেখেছি, প্রসঙ্গত কসোভোর কথা বলা যায়, যেখানে "দুর্ঘটনার" খোঁড়া যুক্তিতে খুন হয়েছে অনেক নিষ্পাপ প্রাণ।

১১ই সেপ্টেম্বরের পর বিশ্ব পরিস্থিতির অনেককিছুই পাল্টে গেছে, কেবল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আমেরিকার অবজ্ঞা বদলায়নি। দশকব্যাপী ইরাকে বোমাবর্ষণ এবং ১৯৯৯ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় বোমাবর্ষণ– উভয়ই ছিল অবৈধ। এমনকি আন্তর্জাতিক আদালতের আইনগত অধিকারকেও কাঁচকলা দেখিয়েছে আমেরিকা। ১৯৮৬ সালে আন্তর্জাতিক আদালত নিকারাগুয়ায় আক্রমণ, এর নৌঘাঁটিতে মাইন পুঁতে রাখা এবং বিদ্রোহীদের অর্থ সরবরাহের অভিযোগে ওয়াশিংটনকে দোষী সাব্যস্ত করলে ওয়াশিংটন আদালত থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে। সেক্ষেত্রে নিকারাগুয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থে সনদের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল ব'লে আমেরিকার দাবি আদালত প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে, ন্যাটো চুক্তির "সলিডারিটি" ধারার ওপর ভর ক'রে কানাডাও পারে না এই আইনহীনতার সাথে নিজের সম্পৃক্ততা এড়াতে, কেননা এই ধারা তৈরিই হয়েছিল জাতিসংঘ সনদের অধীনস্ত ও সাহায্যকারী হিসাবে।

আপনারা বলতে পারেন এরকম পরিস্থিতিতে বৈধতার প্রশ্ন কতটা প্রাসঙ্গিক? বাজি ধরা যায় যে, এটা প্রাসঙ্গিক। আইন ছাড়া আন্তর্জাতিক সহিংসতার আর কোনও সীমারেখা থাকে না, থাকে কেবল অপরাধীদের ক্ষমতা, নিষ্ঠুরতা আর চক্রান্ত। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বৈধতা

ব্যতীত, আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের ভূমিকা খেলো হ'য়ে যায়। এরপর যা ঘটবে সেই বিপদের মুখে আমরা সবাই। আমরা অবশ্যই চাইব যে, ওয়াশিংটন হামলার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও সমানুপাতিকতা প্রকৃত আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে হাজির করুক। আফগানিস্তানে বোমা হামলা আইনগত ও নীতিগত বিবেচনায় তারই সমমূল্যের যা ঘটেছিল আমেরিকানদের ওপর ১১ই সেপ্টেম্বরে। আমরা সেই দিনটিকে স্মরণ করতে পারি এর মানবিক বিপর্যয়ের জন্য না; বরং এক সহিংস, ছন্নছাড়া পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সূচনা হিসাবে ১১ই সেপ্টেম্বর স্মরণীয়।

আবু নাসের মোহাম্মদ ওয়াহিদ

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা এবং মানবাধিকার-পরিপ্রেক্ষিত

এই লেখাটা ওয়াহিদ লিখেছেন আইনের শিক্ষক হিসাবে নিজের বিষয়ের সাথে আর বিবেকের সাথে বোঝাপড়ার তাগিদে। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সুদান আর আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র-হামলা চালিয়েছিল ১৯৯৮ সালে, তখন-তখনই তিনি একই ধরনের আরেকটা লেখা লিখে *ভোরের কাগজ*-এ পাঠিয়েছিলেন এবং বেদনার সাথে লক্ষ করা গিয়েছিল যে সেটা সেখানে ছাপা হয় নি। **মানুষ**-এ লেখা দুইটা দিয়ে ওয়াহিদ তাঁর কর্তব্য তো করেছেনই, আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বেঁধেছেন। দুইটা লেখাই আমরা ছাপছি।

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করলেন এক বিস্ময়কর ধ্বংসলীলা। নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার পুরোটা এবং পেন্টাগন-ভবনের আংশিক ধ্বংস শুধু নিউ ইয়র্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল স্থাপনার ধ্বংসই নয় বরং তা মানবাধিকারের উপরও চরম আক্রমণ। এই সমস্ত ভবনে কর্মরত হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মানব-সভ্যতাকে যেভাবে ভ্রুকুটি করা হল তা মানবজাতির ইতিহাসের বিশাল কলঙ্কজনক অধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিমান দুটিতে নিরপরাধ যে-সমস্ত যাত্রী ছিলেন তাদের শেষ সময়ের আকুতি ও যন্ত্রণা এবং পরিশেষে মৃত্যু মানবাধিকারের ধারণাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তা কারোরই উপলব্ধির বাইরে নয়। কোনো সভ্য বিবেকবান মানুষ মানবতার এই চরম বিপর্যয়ে নিন্দা ও ঘৃণা না-জানিয়ে পারেন না। সেই সঙ্গে 'মানবতার বিরুদ্ধে' এই অপরাধীদের শাস্তি প্রত্যেকেরই কাম্য। কিন্তু এই শাস্তি-প্রদান-কর্মকাণ্ডও হওয়া উচিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই। ক্রোধ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে কেউ যদি 'মানবতার বিরুদ্ধে' সম্ভাব্য অপরাধীদের মানবাধিকারই লঙ্ঘন করে এবং হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করার মাধ্যমে মানবতার বিরুদ্ধে আরেকটি অপরাধ সংঘটিত করে তাহলে তা কি কোন সভ্য ও বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে?

মানবাধিকারের ধারণা

বর্তমান সময়ে যে-অর্থে 'মানবাধিকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমৃদ্ধ হলেও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে –

যেমন পবিত্র বাইবেল ও কোরআনে – সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রত্যক্ষ ফলাফল পেয়েছে মানুষ। পরোক্ষভাবে এর মাধ্যমে মানুষের সহজাত কিছু অধিকারকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে 'প্রাকৃতিক আইন মতবাদ' চিহ্নিত করেছে মানুষের কিছু প্রাকৃতিক অধিকারকে। ১২১৫ সালে প্রণীত ম্যাগনাকার্টার মাধ্যমে ইংলিশদের অনেক অধিকারকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত ফরাসী ঘোষণা মানুষের সহজাত অধিকার সংরক্ষণ আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'-র ধারণা এবং পরবর্তী সময়ে সংশোধনীর মাধ্যমে 'বিল অফ রাইটস'-এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মুখ্য কিছু মানবাধিকারকে মানুষের মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান অনন্য এক বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তৎকালীন 'জাতিপুঞ্জ' মানবজাতির প্রতি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ মানবাধিকার সংরক্ষণে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ-সনদের প্রস্তাবনা এবং অনুচ্ছেদ ২, অনুচ্ছেদ ৫৫ ও অনুচ্ছেদ ৫৬-তে বিশ্বজনীন ধারণা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবাধিকারের ধারণাকে উন্নীত করা ও উৎসাহ দেওয়া এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য-রাষ্ট্রদের অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সনদে সাধারণ পরিষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলকে এই সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান এবং মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে জাতিসংঘের দায়িত্বকে বিস্তৃত করা হয়েছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রণয়ন এবং অসংখ্য কভেন্যান্ট এবং কনভেনশনের মাধ্যমে মানুষের মানমর্যাদা ও স্বত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে অপরিহার্য অধিকারগুলিকে শনাক্ত করেছে। এটি নিঃসন্দেহে মানবাধিকারের ধারণাকে একটি বাহ্যিক রূপ দিয়েছে। সমস্ত জাতি ও মানুষের জন্য সাধারণ অর্জনযোগ্য মানদণ্ড হিসেবে ঘোষণা করেছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩০টি অনুচ্ছেদে একজন মানুষের মানমর্যাদাসহ পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য মানবাধিকারগুলি বর্ণিত হয়েছে এবং জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র এগুলিকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং তাদের সংবিধান বা অন্যান্য আইনের মাধ্যমে দেশীয় আইনের অংশ করে নিয়েছে।

মার্কিন হামলা ও মানবাধিকার

১১ই সেপ্টেম্বরের বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'আমেরিকা ও তার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করেছে। এবং তাদের দৃষ্টিতে এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত 'প্রধান সন্দেহভাজন' ওসামা বিন লাদেন এবং তার সংগঠন আল কায়েদাকে 'নির্মূল করতে' অভিযান পরিচালনা করছে। তাদের সহযোগিতা প্রদানকারী সমস্ত সংগঠনকে প্রতিপক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের অভিযানের বিরোধিতাকারীদেরও শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিন লাদেনকে হস্তান্তরে অসম্মত আফগানিস্তানের শাসক 'তালেবানদের' প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; পাশাপাশি তারা সমস্ত বিশ্ব থেকে 'সন্ত্রাসবাদ' নির্মূলেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আফগানিস্তানে মার্কিন ও পশ্চিমা বিশ্বের এই হামলাকে জাতিসংঘ-প্রণীত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার আলোকে বিশ্লেষণ করা জরুরি।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২নং অনুচ্ছেদে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেককে এই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকারগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং কোনো রাজনৈতিক এখতিয়ারগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো

দেশ বা ভূখণ্ডের কোনো মানুষের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না বলে বলা হয়েছে।

৩নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১০-এ প্রত্যেক মানুষের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নির্ধারণে এবং কারো বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে জনসমক্ষে পরিপূর্ণ সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার পাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত প্রত্যেকের সরকারি বিচারে দোষী সাব্যস্ত না-হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসেবে অনুমিত হবার অধিকার এবং তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ১১ অনুচ্ছেদে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী তাদের ভাষায় 'প্রধান সন্দেহভাজন' ওসামা বিন লাদেন ও তার দল এবং তাদের সহায়তা প্রদানকারী তালেবান বাহিনীকে নির্মূল করতে যে যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে তা কি উপরোক্ত মানবাধিকারগুলির লঙ্ঘন নয়? নিরপেক্ষ এবং যথোপযুক্ত ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই পরিচালিত এই অভিযানের ফলে সাধারণ আফগান জনগণের জীবনের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং তাদের মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা কি 'মানবাধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার' আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদেশগুলির উচিত হচ্ছে?

আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনী এই ধারণা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট যে, লাদেনকে গ্রেফতার না-করলে তার বিচার করা যাবে না । কিন্তু লাদেনকে বা তার সহযোগীদেরকে গ্রেফতার না-করেও বিচার অনুষ্ঠান করা সম্ভব যার নজির জাতিসংঘের ইতিহাসেই আছে। এক্ষেত্রে তারা আরও যুক্তি দেখাতে পারেন যে, সমস্ত বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতে অনেক সময় লাগতে পারে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জামার্নির নাজী বাহিনীর অনেক যুদ্ধাপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তাদের মৃত্যুর পরেও। এটাই ন্যায় বিচারের মহিমা। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যদি কোনো শাস্তি আরোপ করা হয় তাহলে মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা নিদারুণ বিপদগ্রস্ত হবে বলেই এমন বিধান ফৌজদারি বিচার পদ্ধতিতে রাখা হয়েছে।

হামলার এখতিয়ার ও জাতিসংঘ

আফগানিস্তানে এই আক্রমণ আরেকটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আমেরিকা এবং তার মিত্রবাহিনীর এই আক্রমণ পরিচালনার এখতিয়ার কি আছে? শুধু সামরিক শক্তি থাকলেই এক বা একাধিক রাষ্ট্র কোনো রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে পারে না। কুয়েত দখল করার অপরাধে ইরাককে এখনও অব্দি জাতিসংঘের অবরোধের শিকার হয়ে থাকতে হচ্ছে। এমনকি তারা জাতিসংঘের অনুমোদিত বাহিনীর সামরিক হামলারও সম্মুখীন হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার কোনো সদস্য-রাষ্ট্রের নেই। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আছে একমাত্র নিরাপত্তা পরিষদের। সুতরাং এক্ষেত্রে কি আমেরিকা ও অন্যান্য মিত্র-রাষ্ট্র ইরাকের মতো একই অপরাধে অপরাধী নয়?

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' কি কোনোভাবেই নির্মূল করা সম্ভব নয়? সম্ভব, এবং তা জাতিসংঘ-সনদের আওতাতেই। জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মোকাবেলায় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছে এবং এর মোকাবেলা করার জন্য সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রের আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতায় বহুজাতিক বাহিনী গঠনের বিধানও রাখা হয়েছে। বহুজাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব কীভাবে পরিচালিত হবে তার ব্যবস্থাও জাতিসংঘ-সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্র রাষ্ট্রগুলি 'জাতিসংঘ' নামক বিশ্বসংস্থাটিকে অকার্যকর রেখে এবং একে পাশ কাটিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এর

ভয়াবহতা শুধুমাত্র আফগানিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত বিশ্বে।

স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী এই বিশ্বে অন্যতম অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে বলিয়ান আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনীর উচিত আরও দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। মনে রাখা উচিত, সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানই জাতিসংঘ-সনদের অন্যতম মূলকথা। কারণ যুদ্ধ মানেই ধ্বংস – তা যেমন সম্পদের তেমনি মানবাধিকারের। জাতিসংঘ-সনদে 'রাষ্ট্রীয় সমতার' যে-নীতি বর্ণিত হয়েছে তা প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের জন্য সমান কার্যকর। যদি 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে বলীয়ান হয়ে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তবে তা বিশ্বশান্তি ও সভ্যতাকেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। বিলীন হয়ে যাবে মানবাধিকারের তাৎপর্য। সুতরাং 'মানবতার ও মানবাধিকারের' বিরুদ্ধে একটি 'অপরাধ'-এর শাস্তি আরোপ করতে যেয়ে যদি জাতিসংঘের আওতার বাইরে চলে যাওয়া হয় তবে তা মানবতার বিরুদ্ধে আরেকটি অপরাধের জন্ম দিতে পারে। যার সূচনা ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানে হয়েছে। আর এটা নিশ্চয়ই কোনো সভ্য বিবেকবান মানুষের কাম্য হতে পারে না।

আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধবিরোধিতা

আবু নাসের মোহাম্মদ ওয়াহিদ

সুদান ও আফগানিস্তানে মার্কিনী হামলা: আন্তর্জাতিক আইনগত পর্যালোচনা

এই লেখাটা ওয়াহিদ লিখেছেন আইনের শিক্ষক হিসাবে নিজের বিষয়ের সাথে আর বিবেকের সাথে বোঝাপড়া তাগিদে। ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সুদান আর আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র-হামলা চালিয়েছিল তখন-তখনই তিনি এই লেখাটা লিখে *ভোরের কাগজ*-এ পাঠিয়েছিলেন এবং বেদনার সাথে লক্ষ করা গিয়েছিল যে সেটা সেখানে ছাপা হয় নি। এবারে আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন সন্ত্রাসী হামলার সাথে সাথে তার মানবাধিকার-আইনগত পর্যালোচনা দাঁড় করান। **মানুষ**-এ লেখা দুইটা দিয়ে ওয়াহিদ তাঁর কর্তব্য তো করেছেনই, আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বেঁধেছেন। দুইটা লেখাই আমরা ছাপছি।

সন্ত্রাস সব সময় একটি নিন্দনীয় ব্যাপার এবং কোন বিবেকবান, সভ্য ব্যক্তি-সমাজ-জাতি সন্ত্রাসকে সমর্থন জানাতে পারে না। কিন্তু তাই বলে 'সন্ত্রাস' দমনের জন্য যদি কেউ সন্ত্রাসীয় কায়দা প্রয়োগ করে তবে শেষোক্ত পদক্ষেপও সন্ত্রাস হিসেবেই আখ্যায়িত হবে। কেনিয়া ও তানজানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও সুদানে যে টোমহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত উপলব্ধিই হয়।

কেনিয়া ও তানজানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় ৬ জন মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার ঠিক বারো দিন পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রত্যেক্ষ নির্দেশে আফগানিস্তানের কথিত সন্ত্রাসী অবস্থান ও সুদানের একটি ঔষধ তৈরির কারখানার মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ২৬ জন নিহত হয়েছে। তাই আজ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক আইনগত দিক থেকে ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করা।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

এক.

মার্কিন প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হলো, অব্যাহতভাবে মার্কিন সংস্থাগুলোর উপর সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার

আছে এই ধরনের হামলা পরিচালনা করার। তাই তারা মনে করে জাতিসংঘ সনদের ৫১ অনুচ্ছেদে যে আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার আওতায় তারা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘ সনদের ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যদি জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্র সশস্ত্র হামলার সম্মুখীন হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিসংঘ সনদের কোন কিছুই কোন সদস্য রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত একক বা যৌথ আত্মরক্ষার অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করবে না। কোন সদস্য রাষ্ট্র এই ধরনের আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ কালে গ্রহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট করবে এবং কোনোক্রমেই তা নিরাপত্তা পরিষদের আন্ত-র্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই সনদের মাধ্যমে প্রদত্ত কর্তৃত্ব ও দায়দায়িত্বকে খর্ব করবে না। এই অনুচ্ছেদের "সশস্ত্র হামলা", নিরাপত্তা পরিষদের "আন্ত-র্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না করা" ও আত্মরক্ষা অধিকার প্রয়োগের সময় অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট করার বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনার দাবী রাখে।

প্রথমত 'সশস্ত্র' হামলার যে ব্যাখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন দিচ্ছেন তা শাব্দিক দিক থেকে ঠিক থাকলেও এই অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত ভাবের সংগে তা সংগতিপূর্ণ নয়। কেননা মার্কিন দূতাবাসগুলিতে যে সশস্ত্র হামলা পরিচালিত হয়েছে তা নিতান্তই একটি পৃথক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং কোনোভাবেই তাতে আফগানিস্তান বা সুদানের সরকার জড়িত ছিল না। এমনকি এই হামলা যে সুদান বা আফগানিস্তানের কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী করেছে তারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। তাই এই সমস্ত হামলা কোনো সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি পরিচালিত হয়নি। এ কারণেই আত্মরক্ষার অজুহাতে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর যে আক্রমণ চালানো হয়েছে তা কোনোভাবেই সঙ্গত হয়নি। বরং এই ধরনের অসঙ্গত আক্রমণের কারণে সুদানে ও আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ছিল, যদি আদৌ কোনো গোষ্ঠী জড়িত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দুই সরকারকে আহবান জানানো কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তাব দিতে পারতো। নিদেনপক্ষে এই ধরনের আক্রমণের আগে রাষ্ট্র দুইটির অনুমতি নিতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উপরোক্ত কোনটিই সত্যি হয়নি।

দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্তই আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যাবে। আর নিরাপত্তা পরিষদ তখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যখন এই ধরনের সশস্ত্র হামলা সম্পর্কে পরিষদকে জানানো হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ করার আগে এই ধরনের কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। বরং সুদানই সনদের ৫১ অনুচ্ছেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন হামলার বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের গোচরীভূত করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই নিরাপত্তা পরিষদ ২৪শে আগস্ট, ১৯৯৮ ইং তারিখে আলোচনায় বসেছে।

তৃতীয়ত, আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের পর গৃহীত ব্যবস্থা অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট করার কথা ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের কোনো রিপোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেনি।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় যে, জাতিসংঘ সনদের যে ৫১ অনুচ্ছেদের দোহাই দিয়ে সুদান ও আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা পরিচালিত হয়েছে তা উক্ত অনুচ্ছেদেরই সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

দুই.

জাতিসংঘ সনদের শুরুতেই অনুচ্ছেদ (১) এ জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্যগুলি বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন করা, যার ভিত্তি হবে সমতার অধিকার।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই হবে জাতিসংঘের কাছে সমান। এই উদ্দেশ্য পুরণের জন্য ২ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে জাতিসংঘ প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

২ অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে প্রত্যেক সদস্য তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড ঐক্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শন বা শক্তিপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে। এই নীতির মাধ্যমেই সার্বভৌম সমতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর বিনা উসকানিতে আক্রমণ চালিয়ে উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করেছে।

তাছাড়া ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত জাতিসংঘের অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম ও ভাষার বিভেদের উর্দ্ধে উঠে সকলের জন্য মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উন্নয়ন্ ও উৎসাহ প্রদান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যকে ধুলিস্মাৎ করেছে। আফগানিস্তান ও সুদানে যে ২৬ জন নিহত হয়েছে তারা নিশ্চয় সকলেই সন্ত্রাসী ছিল না। সেই নিরীহ ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় মানবাধিকার জীবনের অধিকারকে নস্যাৎ করা হয়েছে। তারা সকলেই যদি সন্ত্রাসীও হতো তারপরেও ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত মানবাধিকার হিসেবে প্রকাশ্যে স্বাধীন বিচার পাবার অধিকার তাদের ছিল।

তিন.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ৫১ অনুচ্ছেদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Norman Bentwich এবং Andrew Martin *A commentary on the charter of the United Nations* গ্রন্থে চমৎকার একটি উক্তি করেছেন যা উদ্ধৃত না করে পারছি না। তারা বলছেন Modern History is crowded with instances where aggression was commited under the cloak of self defence. নিঃসন্দেহে আমেরিকার আত্মরক্ষার মোড়কে পরিচালিত এই হামলা সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটি আগ্রাসন হিসেবেই বিবেচিত হবে।

১৯৭৪ সালে আগ্রাসন শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটির যে সংজ্ঞা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয় তার ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণনামূলকভাবে বলা হচ্ছে-

আগ্রাসন হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত ঐক্য বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অথবা এই সংজ্ঞায় বর্ণিত জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনো উপায়ে সশস্ত্র শক্তির ব্যবহার। এই সংজ্ঞার ২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন করে কোন রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তির প্রথম ব্যবহার আগ্রাসনের *prima facie* সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই সংজ্ঞার ৩নং অনুচ্ছেদে কোন কোন নির্দিষ্ট ধরনের কাজ আগ্রাসন হবে তা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীর অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে পরিচালিত আক্রমণ, এর পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক দখল, সংযুক্তকরণ অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে বোমা নিক্ষেপ বা অন্য কোনো অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়কে আগ্রাসন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৫ এ বলা হয়েছে যে আগ্রাসন সবসময়ই আন্তর্জাতিক শান্তির বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং এক্ষেত্রে আগ্রাসনের সাফাই গেয়ে এর প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক বা অন্য কোনো কারণকে বিবেচনা করা হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৫১ এর পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করে আফগানিস্তান ও সুদানের উপর যে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা পরিচালনা করেছে তা আগ্রাসনের সংজ্ঞার ১,২ এবং ৩ নং অনুচ্ছেদে অনুসারে আগ্রাসন এবং অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে তা আন্ত-র্জাতিক শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ।

চার.

কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু তা হতে হবে আইন অনুসারে, আইন সম্মত উপায়ে। আমার কোনো নিকট আত্মীয়কে কেউ হত্যা করলে আমার অবশ্যই অধিকার জন্মে সেই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার লাভ করার, কিন্তু ঐ হত্যাকাণ্ডের অজুহাতে প্রয়োজনমতো যে-কাউকে হত্যা বা হামলা করার অধিকার আমার কিছুতেই জন্মায় না। এই কথা যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা না-যায় তাহলে বিশ্বনৈরাজ্যে তথা শক্তিধরদের দাপটে আমরা সবাই ভেসে যাব, আর শক্তিমানরাও মাঝেমধ্যে শিকার হতে থাকবে সন্ত্রাসী হামলার। এই বিষচক্র-পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য সকলেরই ভাবা দরকার, কিছু করা দরকার।

আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধবিরোধিতা

জিওভ প্যারিশ

পূর্ণ প্রলয়প্রান্তে

তরজমা: ফাহমিদুল হক ও রিফাত ফাতিমা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জি-নেট থেকে এই লেখাটা ডাউনলোড করা হয়েছে (www.zmag.org/parrishapoc.htm)। আফগানিস্তানে মানুষ নামক প্রাণীরা পৃথিবীর সবচেয়ে 'সভ্য' বলে 'খ্যাত' পরাশক্তির হামলায় কী অবস্থার শিকার হয়েছে তার কিছুটা আন্দাজ এই লেখা থেকে পাওয়া যায়। 'বর্বর' 'মৌলবাদী' তালেবানদের কবল থেকে আফগানিস্তানের নারী ও নিপীড়িত মানুষদের 'উদ্ধার' করার নমুনা এই একুশ শতকের দোড়গোড়ায় অবলীলাক্রমে চলল আর আমরা নির্বিকার থাকলাম আন্তর্জাতিক প্রচারণা-মাধ্যমের সুবাদে। **মানুষ**-এর জন্যই এটা তরজমা করা হয়েছে।

এদেশের কেউ কি এটা জানে?

কেউ কি বুঝতে পারছে আমেরিকার কর্মকাণ্ড কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে?

অভিজ্ঞ খাদ্যসহায়তা সংস্থা সতর্ক করেছিল যে, ৭ই অক্টোবরে আফগানিস্তানে বোমা হামলা না হলেও প্রায় ৭,৫০০,০০০ আফগান এই শীতে চারদিক থেকে ধেয়ে আসা দারিদ্র্য, খরা, যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি এবং অনাহারক্লিষ্ট হয়ে মারা যেতো। যখন বোমা হামলা শুরু হলো, বাইরে থেকে আসা সব ধরনের খাদ্যসাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। এখন সেতু, রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়েছে, লাখ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে এবং উত্তরের সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে তুষারপাত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

মানবিক সংস্থাসহ অন্যান্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ আমেরিকার কাছে আবেদন জানাচ্ছে তারা যেন বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখে যাতে আফগানিস্তানের ভেতরে সাহায্যসংস্থাগুলো খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে, যাতে করে বড়ো ধরনের মৃত্যু ঠেকানো যায়। যে-মৃত্যু সুদীর্ঘকাল পৃথিবীর মানুষ দেখেনি। আমাদের সংবাদ-সম্প্রচারে একে নিছক মানবিক বিপর্যয় বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই দ্ব্যর্থবোধকতা পুরো ব্যাপারটাকে "পরোক্ষ ক্ষতি" হিসেবে বর্ণনা করছে।

মাত্র এক মাসের মধ্যে সাড়ে সাত মিলিয়ন লোকের মৃত্যুর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। পলপট যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন, এই সংখ্যা তার তিনগুণ বেশি। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে মৃতের সংখ্যার চেয়ে এটা ৩৫ গুণ বেশি। যদি ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলায় বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্রে ৫,০০০ জন মারা যায় (এ-

সংখ্যাটি যে বাড়িয়ে বলা হয়েছিল তা সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে) তবে আমরা যে সংখ্যার কথা বলছি, ১৫০ দিন ধরে ১০ বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্র ধ্বংস হলে, তার সমপরিমাণ মানুষ মারা যাবে। এই মৃত্যু ধীর এবং যন্ত্রণাময়। সম্পূর্ণভাবে এই মৃত্যুকে এড়ানো যায়। মৃত্যুর মূল কারণ আমেরিকা নয়, এখনও এর বেশিরভাগ প্রতিহত করা যায়– যদি আমেরিকা প্রতিহত করতে দেয়।

এটা আমার বলতে বাধে, কিন্তু অনেক আমেরিকানেরই এটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা বরং অপেক্ষায় আছে ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকা পেয়ে যাবে (যদিও এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ওসামাকে ধরার বিষয়ে দু-মাস আগের চাইতে আমরা এখন অনেক এগিয়ে আছি। দিন দিন জনপ্রিয় ও সুরক্ষিত হয়ে ওঠায় ওসামাকে ধরার কাজটি কঠিনতর হয়ে উঠেছে)। আফগানিস্তানের বিশালসংখ্যক নিরীহ ও সাধারণ মানুষ যে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং এজন্য যে বিশ্ববাসী আমেরিকাকেই দায়ী করবে, দেশের অনেক মানুষেরই এ নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। সত্যিই তাই।

আমাদের ভাবতে হবে। যদি এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় সন্ত্রাসকে নির্মূল করা– বর্তমান সন্ত্রাসীদের বিচার করা, এবং তাদের রাজনৈতিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক করা যাতে অন্যরা এতে নিরুৎসাহী হয়– তবে সামরিক ইতিহাসে এটা হবে আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা। আমেরিকা এখনও জানে না আল-কায়েদার নেতারা কোথায় থাকে। আফগানিস্তানে একটি একক সরকার গঠনের লক্ষ্য অর্জনের দ্বারপ্রান্তে আমেরিকা এসে দাঁড়িয়েছে– দুঃখজনক ব্যাপার হলো আফগানরা তালেবানদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এতোদিন ধরে যুদ্ধবাজদের নিজেদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, তা ভুলে তারা আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় এক লাখেরও বেশি তরুণ যুবা সীমান্ত অতিক্রম করে আফগানিস্তানে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। যে বেঁচে যাবে সারা জীবনের জন্য সে এই ঘৃণা নিয়ে বাঁচবেঃ বেঁচে থাকা, নিঃশ্বাস নেয়া এটা প্রমাণ করে যে, আমেরিকা একটি দেশে বোমা ফেলেছিল এবং লজ্জাজনকভাবে হেরে গিয়েছিল।

আজ সেরকমই দিন। যদি এই শীতে লাখ লাখ আফগান মারা যায় তবে কী ঘটবে? বুশ প্রশাসনের পদক্ষেপের কারণে ভবিষ্যতে আরো কত সন্ত্রাস হবে? যদি কয়েক মিলিয়ন মুসলিম ভাই ও বোন না খেয়ে মারা যায়, নিরীহ বেসামরিক লোকজন শীত ও আমেরিকান রোষের ফাঁদে পড়ে, তবে একশ বিশ কোটি মুসলিম ও বাকি পাঁচশ কোটি বিশ্ববাসীর মধ্যে কতজন বুশের "সন্ত্রাসী" ও "শয়তান" নির্মূলের অভিযানকে মন থেকে সমর্থন করতে পারবে?

দু'মাসেরও কম সময়ে, মার্কিন সরকার নৈতিকতার উচ্চ আসন থেকে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের একটি ঘটিয়ে বসেছে– এক কি দু'সপ্তাহের মধ্যে এমন অপরাধ সে করেছে যে ১১ই সেপ্টেম্বরের স্মৃতি বিশ্ববাসীর মন থেকে মুছে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের কেউই এই ব্যাপারটা ভাবছে না, বুঝছে না, লক্ষ করছে না। এমনকি প্রগতিশীলরা– আমেরিকার নিজেকে রক্ষা করার আইনগত অধিকার রয়েছে– এই দ্ব্যর্থবোধক ব্যাখ্যায় নিজেদের সন্তুষ্ট রেখেছেন, যে-ব্যাখ্যায় নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। আর একারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যেমন বিশ্ববাসী জার্মানদের অভিযুক্ত করে থাকে, তেমনি আমাদেরও ভবিষ্যতে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। আপনি কোথায়? আপনি কী বলেছিলেন? আপনি কীভাবে এই সবকিছুকে মেনে নিলেন? অথবা মুসলিম অঞ্চলে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেঃ তোমরাও আমাদের মতো লাখ লাখ সংখ্যায় মর না কেন? আমেরিকাকে একজন ব্যক্তিকে একঘরে করতে হবে, কিন্তু তার পরিবর্তে লাখ লাখ লোক হত্যা করেছে এবং নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এবং বিশ্বের

বিরাট অংশই বিশ্রাম নেবে না যতক্ষণ না আমরা পর্যুদস্ত হচ্ছি।

সাড়ে সাত মিলিয়ন লোক। পাহাড়ী এলাকা থেকে তুষারপাত ধেয়ে আসছে। খাদ্যসামগ্রী একেবারে নেই বললেই চলে। অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। লোকসংখ্যা গণনার কোনো "স্বাধীন যাচাই" উৎস থাকবে না। রুয়ান্ডা ও কম্বোডিয়ার গণহত্যার সময় ছিল না। বিশ্বের বিচারে সেসব ছিল না। ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ ঘুরেই যাচ্ছে। হে বিবেকবান, আপনি কোথায়?

আন্তর্জাতিক বিবৃতি

আফগানিস্তানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আবেদন

তরজমা: রিফাত ফাতিমা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জি-নেট থেকে এই লেখাটা ডাউনলোড করা হয়েছে (www.zmag.org)। আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন হামলার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিবেকের ধ্বনি হিসাবে নিচের বিবৃতিটা পড়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রচারণা-মাধ্যমের দক্ষতায় এই বিবৃতিটা আমাদের নজরে তেমন আসে নি, যদিও জর্জ বুশের বচন আমাদেরকে প্রতিদিনই পড়তে হয়েছে। **মানুষ**-এর পাঠকদের জন্যই এটা তরজমা করা হয়েছে।

১৫ই নভেম্বর ২০০১। ফ্রাংকফুর্ট/মেইন (জার্মানি)

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্রুত বন্ধ করার জন্য নোবেল বিজয়ী কবি, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের আবেদন

একজন সন্ত্রাসীকে ধরতে গৃহীত সামরিক পদক্ষেপ পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশ ও তার জনগণের ওপর বড়ো হামলার রূপ নিলো; দেশটি ক্ষুধা, দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে, মৃত্যু ও উন্মূল হবার বিভীষিকায় ভীত হয়ে পড়েছে।

বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান, ১১ই সেপ্টেম্বরের বর্বর হামলার কারণ হিসেবে যতো ছোটই হোক না কেন, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পরে এই ব্যবধান প্রকট হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে পশ্চিম ও পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ঘৃণার কারণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমা দেশগুলোর গণতন্ত্র, সমৃদ্ধি, গণতন্ত্রের চারণভূমি হিসেবে যে খ্যাতি ছিল, তার বদলে সুবিবেচনাবোধের অভাব, হঠকারী কার্যক্রম এবং সন্ত্রাস ইত্যাদি নেতিবাচক রূপে তাদের পরিচিতি ঘটবে।

প্রতিটি বোমার আঘাত এবং আফগানিস্তানে পশ্চিমা সৈন্য কর্তৃক প্রতিটি হত্যা দক্ষিণের জনগণের দুর্ভোগের প্রতি পশ্চিমের চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনকি বর্তমানের দৃশ্যমান সাফল্যও

এর কোনো পরিবর্তন আনছে না। সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য যে যৌথ আইনী পদক্ষেপ নেয়া যেতো তার পরোয়া করেনি পশ্চিম। এবং এর ফলে তারা তাদের নিজস্ব নীতিকেও বিসর্জন দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই অঘোষিত যুদ্ধ সন্ত্রাসকে প্রতিহত করতে সহায়ক তো হবেই না, বরং সামরিক আগ্রাসনের দিকটিকেই জোরালো করে তুলবে। শেষ কথা হলো, সেখানে যতোই যুদ্ধের দিন কাটছে এবং পশ্চিমে যতো নিরাপত্তা আইন পাশ হচ্ছে, স্বাধীনতার প্রতি হুমকি ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণের শরণার্থী কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

১১ই সেপ্টেম্বরে শুধু যে হাজার হাজার লোক নৃশংসভাবে মারা গেছে তাই নয়, পশ্চিমা সভ্যতাও বড়ো ধরনের হোঁচট খেয়েছে। তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মৃতদের ফিরিয়ে আনা যাবে না। যুদ্ধের প্রতিটি দিনেই বড়ো ধরনের নৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট তীব্রতর হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ব্যর্থতার খতিয়ান থেকে শিক্ষা নেয়া সম্ভব। এখনও আলোচনায় ফিরে গিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে এবং পৃথিবীব্যাপী সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে।

প্রাথমিক স্বাক্ষরকারীবৃন্দ

হোসে সারামাগো (পর্তুগাল, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী, ১৯৯৮)
গুন্টার গ্রাস (জার্মানি, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী, ১৯৯৯)
এডলফ পেরেজ স্কুইবেল (আর্জেন্টিনা, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী, ১৯৮০)
রিগোবার্তো ম্যাচো তু (গুয়াতেমালা, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী, ১৯৯২)
হোসে রামোস হোর্তা (পূর্ব তিমুর, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী, ১৯৯৬)
এডোনিস (আলি আহম্মদ সাইদ এসবির) (ফ্রান্স/লেবানন)
অরহ্যান পামুক (তুরস্ক)
মাহমুদ দারবিশ (প্যালেস্টাইন)
ওগাগা ইফোবোদো (নাইজেরিয়া)
হ্যারল্ড পিন্টার (যুক্তরাজ্য)
ফারাজ সারকোহি (ইরান)
জুয়ান ভিলোরো (মেক্সিকো)
আব্দুরহমান এ. ওয়াবেরি (জিবুতি/ফ্রান্স)
সাঁ ম্যাকগাফিন (আয়ারল্যান্ড)
ক্রিস্তা উলফ (জার্মানি)
উরি আভনেরি (ইসরায়েল)
মঁসিয়ে স্যামুয়েল রুইজ গারসিয়া (মেক্সিকো)
ড্যানিয়েল মিতেরাঁ (ফ্রাঁ-লিবেখ, ফ্রান্স)
ড. পাজ রোজাস বেইজা (কোদেপু, চিলি)
আকিন বিরদাল (মানবাধিকার-কর্মী, তুরস্ক)
ড. জাঁ জিগলার (জাতিসংঘে সুইস প্রতিনিধি)
গুন্টার গ্রাস (জার্মানি)
প্রফেসর গিওর্গি আগামবেন (ইতালি)

প্রফেসর নেভিল আলেকজান্ডার (দক্ষিণ আফ্রিকা)
প্রফেসর ফ্রান্সিস এ. বয়েল (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রফেসর জুডিথ বাটলার (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রফেসর হাজো ফুঙ্ক (জার্মানি)
প্রফেসর এক্সেল হনেথ (জার্মানি)
প্রফেসর ওয়াল্টার জেনস (জার্মানি)
প্রফেসর স্টিভ লুকস (যুক্তরাজ্য/ইতালি)
প্রফেসর জাঁ-লুক ন্যান্সি (ফ্রান্স)
প্রফেসর বারট্রান্ড ওগিল্‌ভি (ফ্রান্স)

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

যুদ্ধাপরাধী? যুদ্ধাপরাধী না! মানুষ না!

এই লেখাটা বেরিয়েছিল *প্রথম আলো*-র শুক্রবারের সাময়িকীতে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে। ইঙ্গমার্কিন পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলার মানবাধিকার-দরদ ও আফগানিস্তানের অন্যায় অসম যুদ্ধে বন্দি-হওয়া 'মানুষ'দের প্রতি তাদের আচরণ মিলিয়ে দেখার সুযোগ এই লেখা আমাদেরকে দিয়েছে। প্রতিপক্ষের প্রতি আচরণে পশ্চিমারা যে তালেবানদের কথিত বর্বরতার সুযোগ্য প্রতিযোগী তা এই লেখা থেকে সহজেই বোঝা যায়। 'অন্যায়-অশুভ'-এর বিরুদ্ধে কথিত হলেও এই যুদ্ধ নিজেই যে অন্যায় ও অমানবিক লেখক তা দেখাতে পেরেছেন।

সেকান্দার বাদশাহ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের ঝিলাম বা বিতস্তা নদী অতিক্রম করে তিনি পৌরব বংশীয় রাজা পুরুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। হঠাৎ বৃষ্টির জন্য পুরুর সৈন্যরা মাটিতে রেখে তাদের বিশেষ ধরনের তীর ছুঁড়তে না পারায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। হাতিবাহিনী ভয়ে পালিয়ে যায়। পুরু বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। তার শরীরের নয় জায়গায় ছিল অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। যখন তাকে সেকান্দার বাদশাহের সামনে হাজির করা হলো, তখন বিজয়ী বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছ থেকে পুরু কী রকম আচরণ প্রত্যাশা করেন। পুরু উত্তরে বলেন, তিনি রাজার মতোই ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। সেই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে সেকান্দার বাদশাহ তাঁকে শুধু তাঁর রাজ্যই ফিরিয়ে দিলেন না, পার্শ্ববর্তী আরো কিছু রাজ্য জয় করে তাঁকে তা দান করলেন এবং তার ওপর সেই অঞ্চলের ঔপনিবেশিক গ্রিকদের দেখভাল ও স্বার্থরক্ষার ভার দেন। পরাজিতের প্রতি বিজিতের এমন বড় দৃষ্টান্ত তেমন দেখা যায় না।

প্রাচীনকালে যুদ্ধবন্দিদের প্রতি তেমন অনুকম্পা প্রদর্শন করা হতো না। তাদের কোনো স্টেটাস বা মর্যাদা ছিল না। হয় তাদের হত্যা করা হতো বা তাদের দাস বানানো হতো। গ্রিকদের মধ্যে পরাজিত দেশের সব সাবালক পুরুষ মানুষকে হত্যা করা একটা সাধরণ রেওয়াজ ছিল। প্রাচীন ব্রিটনরাও যুদ্ধবন্দিদের বড় বর্বরভাবে হত্যা করত। ১৬৬৭-১৬৬৮ সালের যুদ্ধে তুর্কিরা ৩০ হাজার খ্রিস্টান যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করে । পরাজিতদের হত্যা করে তাদের ছিন্নমস্তক সাজিয়ে জয়স্তম্ভ বা মিনার তৈরির রেওয়াজ ছিল এশিয়ার নানান দেশে। ক্রুসেডের সময় গাজি সালাহুদ্দিন ও

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

সিংহহৃদয় রিচার্ড পরস্পরের প্রতি যে বীরাচরণ করেছিলেন তা কিংবদন্তীর বিষয়। পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে শিভালরি বা যোদ্ধৃত্বের রেওয়াজ বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধবন্দিদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা শুরু হয়। মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দিদের প্রাণ রক্ষা হতো।

যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণের জন্য ১৯০৬ এবং ১৯২৬ সালে জেনেভা কনভেনশন রচিত হয়। তখন সাব্যস্ত হলো যুদ্ধবন্দিকে আর অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং তাকে অসামরিক বেতনযোগ্য কাজে নিয়োগ করাও যাবে। বন্দিদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক ও আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। চিঠি ও পার্সেল পাওয়ার তাদের অধিকার থাকবে। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য তার নাম, র‍্যাঙ্ক, ক্রমিক নম্বর, জন্ম তারিখ আটককারী কর্তৃপক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবে, কিন্তু এর বেশি কোনো তথ্য প্রদান করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এইসব মানবিক আইনকানুন ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়, বিশেষ করে জার্মান ও জাপানি সেনাবাহিনীর হাতে। সেই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৪৯ সালে নতুন কনেভেনশন তৈরি হয়। ১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধে এই নতুন রেওয়াজ অনুসরণ করার চেষ্টা হয়।

যুদ্ধের একটি সভ্য নীতি হচ্ছে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে একটা পার্থক্য মেনে চলা। সেই পার্থক্য না থাকলে যুদ্ধ একবারে বর্বরতায় অবনমিত হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ এই পার্থক্য প্রায় মুছে দেয়। দুই মহাযুদ্ধের মাঝে ইতালিয়ান সমরনায়করা শত্রুপক্ষের প্রতিরোধের মনোবল চুরমার করার জন্য বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের কথা বলেন। সার্বিক যুদ্ধে যুধ্যমান ও অযুধ্যমানদের মধ্যে কোনো পাার্থক্য নেই বলে যারা মনে করেন তাদের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধের ফলাফল তো যেকোনো যুদ্ধের স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন ওঠে, যদি বেসামরিক লক্ষ্যবস্তু যুদ্ধের ন্যায্য টার্গেট বা আক্রমণ লক্ষ্য হয় তবে যুদ্ধবন্দি ও আহত ব্যক্তিদের জন্য যেসব মানবিক রেওয়াজ গড়ে উঠেছে তা তো মূল্যহীন হয়ে যাবে। সৌভাগ্যবশত, এখনো যুধ্যমান ও অযুধ্যমানদের মধ্যকার পার্থক্যকে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সামরিক ব্যক্তিরা সাধারণত চারটি প্রধান বাধ্যতামূলক বৈশিষ্টের দ্বারা অসামরিক ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হয়। তারা একজন কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাদের পোশাক সামরিক, তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন করে এবং যুদ্ধের আইন ও রেওয়াজ মেনে চলে। অবৈধ আক্রমণ বা তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সংঘর্ষে ধৃত সেনাবাহিনী সদস্যদের যুদ্ধবন্দি বলা হয়। মিলিশ্যা ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্যরাও যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি তারা অধস্তন হিসেবে দায়িত্বশীল ব্যক্তির হুকুম মানতে বাধ্য থাকে এবং তাদের পোশাকে দূর থেকে দেখা যায় এমন আঁটা বিশেষ চিহ্ন থাকে, তারা প্রকাশ্য অস্ত্র ধারণ করে এবং তাদের তৎপরতা যুদ্ধের আইন ও রেওয়াজ অনুযায়ী চালিত হয়।

মার্কিন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে আল-কায়েদার সদস্য ও তালেবানরা উপরে বর্ণিত কোনো শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে না। আল-কায়েদার সদস্যরা কোনো সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ছিল না, তারা কোনো উর্দি পরিধান করত না বা পোশাকে আঁটা কোনো বিশেষ চিহ্ন বহন করত না। তাদেরকে আটক ব্যক্তি বা অবৈধ যোদ্ধা বলে অভিহিত করা হচ্ছে। যুদ্ধের আইনের ওপর এক মার্কিন সামরিক পুস্তিকায় অবৈধ যোদ্ধার নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: অবৈধ যোদ্ধা এমন এক ব্যক্তি যাকে কোনো যুদ্ধবিগ্রহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে ক্ষমতা না দেওয়া সত্ত্বেও সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। অবৈধ যোদ্ধাদের যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করলে তাদেরকে আক্রমণ করা যাবে। যদি তারা ধরা পড়ে তবে তাদেরকে বিচার করা যাবে ও শাস্তি দেওয়া যাবে। যারা ক্ষমতার্পিত না

হয়ে যুদ্ধ করে এমন ব্যক্তিরা হচ্ছে ডাক্তার, ধর্মউপদেষ্টা এবং উর্দি ছাড়া যারা যুদ্ধ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটজন উর্দি ছাড়া অন্তর্ঘাতককে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের মধ্যে ছয়জনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। হামলা মোকাবিলা করার জন্য অসামরিক ব্যক্তিরা আত্মরক্ষায় প্রতিরোধে লিপ্ত হলেও যুদ্ধের কাজ যোদ্ধাদেরই। অসামরিক ব্যক্তিদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণ না করা হলেও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ঝুঁকি তাদেরকে পোহাতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বা আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে গেরিলা বা অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করে থাকে। গেরিলাদের গতিবিধি সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যকার পার্থক্য প্রায় মুছে ফেলে দেয়। তবু সৈনিক ও অসৈনিক উভয়ের স্বার্থ রক্ষার্থে সেই পার্থক্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা ঐক্যমত্য রয়েছে। ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন বিধান দেয় যে, যোদ্ধার মর্যাদা পেতে হলে গেরিলা, মুক্তিযোদ্ধা বা প্রতিরোধকারীদের উপরোক্ত চারটি পার্থক্য মেনে চলতে হবে। তা না হলে তাদেরকে অবৈধ যোদ্ধা হিসেবে বিচার ও শাস্তিপ্রদান করা যাবে। আক্রান্ত দেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধে নিয়োজিত হলে তাদেরকে যোদ্ধা হিসেবে বিচার ও শাস্তিপ্রদান করা যাবে। আক্রান্ত দেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধে নিয়োজিত হলে তাদেরকে যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যদি তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র ধারণ করে এবং যুদ্ধের আইন ও রেওয়াজ মেনে চলে। জাতিসংঘের শান্তি সৈন্যদেরও জেনেভা কনভেনশনের কানুন মেনে চলারই কথা। জেনেভা কনভেনশনে অবশ্য যে ব্যক্তি আটক করে তার আটক ব্যক্তির স্টেটাস বা অবস্থন নির্ণয় করার অধিকার নেই। এ ব্যাপারে একজন স্বাধীন বিচারকের অভিমত কার্যকরী হবে। যুদ্ধবন্দিদের স্টেটাস সম্পর্কে কানাডিয়ান রেগুলেশনে বিধান রয়েছে আটক ব্যক্তিদের সামরিক ট্রাইবুন্যালের সম্মুখে হাজির করতে হবে এবং সেই ট্রাইবুনাল নির্ধারণ করবে তারা যুদ্ধবন্দি কি না।

প্রধান প্রধান বিধান হচ্ছে:

২৫ অনুচ্ছেদ : যে বাহিনী বন্দিদের আটক করে তাদের এলাকার সেনা ছাউনির আবাসের মতো অনুকূল আবাসে বন্দিদের বাসের ব্যবস্থা করতে হবে ।
২৬ অনুচ্ছেদ: তামাক খাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩০: স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে বাধা দেওয়া যাবে না।
অনুচ্ছেদ ৪০ : র‌্যাঙ্ক ও জাতীয়তা ব্যাজ এবং ডেকরেশন পরার অনুমতি দিতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৪৪ : সমমর্যাদার অফিসার ও বন্দিদের সঙ্গে তাদের র‌্যাঙ্ক ও বয়স অনুযায়ী আচরণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৬২ : যুদ্ধবন্দিদেরকে ন্যায্য হারে সরাসরি বেতন দেবে আটককারী কর্তৃপক্ষ। বেতনের হার সেই কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে, তবে কোনো সময়ই তা পুরো এক দিনের জন্য এক সুইস ফ্রাঙ্কের এক-চতুর্থাংশের কম হবে না।

যারা অবৈধ যোদ্ধা তাদেরও আন্তর্জাতিক আইনে কিছু অধিকার থাকে। তাদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন করা চলবে না। তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করতে হবে এবং যদি কোন অপরাধে কেউ অভিযুক্ত হয় তবে তার ন্যায্য বিচার হতে হবে।

কিউবায় মার্কিন নৌঘাঁটি গুয়ানটানামো বে-র ক্যাম্প এক্সরে-তে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান, ইয়েমেন, ব্রিটেন, সুইডিশ নাগরিক রয়েছে। এদেরকে আফগানিস্তানে গ্রেপ্তার করা হয়। এরা আল-কায়িদা ও তালেবান গোষ্ঠীর সদস্য বা সমর্থক। মার্কিন দৃষ্টিতে এরা সন্ত্রাসী, আত্মঘাতী এবং ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যক্তি। এরা কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষের অধীনে যুদ্ধ করেনি এবং বৈধ যোদ্ধা হিসেবে এদেরকে কোনোমতেই বিবেচনা করা যায় না। ক্যাম্প এক্সরে-

তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপ দায়িত্বশীল, মানবিক, আইনি, ন্যায্য এবং জেনেভা কনভেনশানের বিধানের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'সূর্যকরোজ্জ্বল সুন্দর' গুয়ানটানামো বে-তে আটক ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, বলেছেন, মার্কিন প্রতিরক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড। তার কথা, 'আমরা চাই না আমরা আবার আক্রান্ত হই। পিছু হটে সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর আবার হামলা করুক এটা আমাদের প্রথম ইচ্ছা নয়। সন্ত্রাসীরা যাতে তা না করতে পারে সে জন্য তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যে ব্যবাহর করা হচ্ছে তা মানবিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক চুক্তি দায়দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ'। পাঁচ হাজার মাইল দূরে থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা আটক ব্যক্তিদের ব্যাপারে মার্কিনি ব্যবহার সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

জেনেভা কনভেনশনে যোদ্ধা ও অবৈধ যোদ্ধা সম্পর্কে যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে তা মুছে ফেললে মার্কিন সামরিক অবস্থান বড় বিপন্ন হবে বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ মত প্রকাশ করেছে। অপরদিকে সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েল না কি বলেছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবন্দির মর্যাদা না দিয়েও জেনেভা কনভেনশানের নিয়মাদি আটক ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট আইনি পরামর্শ ও আলাপ আলোচনার পর ব্যাপারটি সিদ্ধান্তের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে পেশ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্র ব্রিটেন এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক না কেন তা সমর্থন করবে বলে মনে হয়।

সিনেটর ড্যানিয়েল ইনুই বলেছেন যে, তাদের নিজেদের দেশের লোকের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয় আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে তার চেয়ে ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা বর্তমান অবস্থার চেয়ে এমন কিছু ভালো ছিল না। আটক ব্যক্তিদের হালাল খাবার দেওয়া হচ্ছে। তাদের জন্যে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে লাউড স্পিকার থেকে সকলের জন্য আজানও দেওয়া হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদা ও তালেবানদের এক আইনি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ফেলে রাখতে চায় বলে অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল অভিমত প্রকাশ করেছে। আটক ব্যক্তিদের শুধু যে যুদ্ধবন্দির মর্যাদাই দেওয়া হচেছ না তা নয়, স্বাধীনতা-রহিত ব্যক্তির মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের যে অভিযোগই থাক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে তাদের হেফাজতে আটক ব্যক্তিদের সব মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা, তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা এবং তাদের যেন ন্যায্য বিচার হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। ধৃত ব্যক্তিরা যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিবেচিত হবে কি না তা ১৯৪৯ সালে জেনেভা কনভেনশনের পাঁচ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত হবে। এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল তিন সদস্য দ্বারা গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিরক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী বা প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার নেই। একটি স্বাধীন মার্কিন আদালত আইন অনুযায়ী নিয়মমাফিক এ ব্যাপারে ফয়সালা করবে। এই বিষয়ে অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস অভিন্ন মত পোষণ করে।

কেবল শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার অভিযোগে কোনো যুদ্ধবন্দির বিচার করা যায় না। রেডক্রসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাকে দেখা করতে দিতে হবে। যদি তাকে কোনো যুদ্ধাপরাধ বা অন্য কোনো অপরাধের অভিযোগে বিচার করার প্রয়োজন না থাকে তবে অ্যাকটিভ হস্টিলিটিজ বা সক্রিয় বৈরিতা অবসানে তাকে তার দেশে প্রত্যর্পণ করতে হবে। যুদ্ধবন্দিদেরকে ন্যায্য বিচারের সুবিধা না দেওয়া একটি যুদ্ধাপরাধ। যেকোনো আটক ব্যক্তি আন্তর্জাতিক

কাভানানট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯২ সালে সেই চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হয়) এবং ইউএন বডি অব প্রিন্সিপলস ফর দ্য প্রটেকশন অব পার্সনস আন্ডার এনি ফর্ম অব ডিটেনশন অর ইম্প্রিজনমেন্ট অনুযায়ী তার স্বাধীন ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আটকের আইনানুগতা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন না এবং তার আইন পরামর্শদাতার সান্নিধ্য পাওয়ার অধিকার থাকবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আটক ব্যক্তিদের পেছন দিকে হাত বেঁধে, শেকল পরিয়ে মাথা ঢেকে চোখে কালো চশমা এবং হলদে জাম্পসুট পরিয়ে স্থানান্তরের সময় শমক ওষুধ খাইয়ে, বাধ্যতামূলকভাবে তাদের দাড়ি কাটিয়ে খাঁচায় রাখা হয়েছে। তাঁদের খাঁচার উপরে দিনের সূর্যের আলো এবং রাত্রে সারাক্ষণ হ্যালোজেন আলো পড়ছে। সেখানে প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কুকুরের খাঁচার মতো যে-খাঁচায় আটক ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে তা নাকি জাপানিরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহার করতো।

প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামজে ক্লার্কসহ লস এঞ্জেলসের পাদ্রি, সাংবাদিক ও নাগরিক অধিকারের প্রবক্তারা যৌথভাবে মার্কিন ফেডারেল আদালতের জজের কাছে একটা দরখাস্ত করেন যে, মার্কিন প্রশাসন আটক ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে তার ব্যাখ্যা দেবে। এ বিষয়ে আদালতের এক্তিয়ার আছে কিনা তা প্রথমে স্থির করতে হবে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও রেডক্রসের সঙ্গে নেদারল্যান্ডস দাবি করেছে, আটক ব্যাক্তিদেরকে যুদ্ধবন্দির মর্যাদা দিতে হবে। সুইডেন আটককৃত সুইডিশ নাগরিকের জন্য ন্যায্য আচরণ দাবি করছে। ব্রিটেনের পক্ষে বলা হয়েছে, তিনজন আটককৃত ব্রিটিশ নাগরিক কোনো অন্যায় আচরণের অভিযোগ করেনি। নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্টসেন বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের মতাদর্শ ও মূল্যবোধকে উঁচুতে ধারণ করতে হবে এবং আটককৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির প্রধান জাভিয়ের সোলানা 'অবৈধ যোদ্ধা' সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পরোক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রেওয়াজ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে জেনেভা কনভেনশান প্রয়োগ করতে হবে।

ইউরোপ ইউনিয়নের বৈদেশিক বিষয়ক কমিশনার ক্রিস প্যাটেন বলেছেন, 'আমাদের এটা পরিষ্কার করতে হবে যে, যে-সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ তা হচ্ছে ন্যায়বিচার, প্রতিহিংসা নয় এবং তার অর্থ এই যে আমাদেরকে এক নিশ্চিত মানবিক অনুকম্পা ও শালীনতা প্রদর্শন করতে হবে পরাজিতদের প্রতি, তারা বেশ বিপজ্জনক হলেও'। আটক ব্যক্তিদের সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে দুই মেরুর দৃষ্টিভঙ্গি। একদিকে বলা হচ্ছে তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সন্ত্রাসীদের কোনো অধিকার নেই। তাদের অপকর্মের জন্য যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সন্ত্রাসীদের শায়েস্তা করতে হবে। আটক ব্যক্তিদের হিংস্রতা এতই প্রবল যে কেউ কেউ রক্ষীদের কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং খুন করার হুমকি দেয়। তালেবানরা তাদের বন্দিদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিল অনুরূপ ব্যবহার তাদের সঙ্গে করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। সুতরাং তাদেরকে কেন যুদ্ধবন্দির মর্যাদা দেওয়া হবে? নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে বোমাবর্ষণের জন্য যারা উল্লাস করেছে তাদের জন্য আবার মানবাধিকারের কান্না! আটক ব্যক্তিদের কিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সেটা গৌণ ব্যাপার বদমাশদের পেট থেকে সব কথা টেনে বের করাই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

অপরদিকে বলা হচ্ছে, যুদ্ধ ঘোষণা না করার জন্য যদি আটক ব্যক্তিদের যুদ্ধবন্দির মর্যাদা না দেওয়া হয় তবে আফগানিস্তানে যারা ঝাঁক ঝাঁক বোম ফেলে ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যালীলা চালালো তাদের বিচার করবে কে? প্রতিপক্ষ কলসির কানা মারলে, প্রেম না দিতে চাও , তুমি তার বিরুদ্ধে কলসির কানা ছুড়ে মারবে? এমন দৃষ্টিভঙ্গি সভ্যজগতে এখন কেউ সমর্থন করে না। মন্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসায় যাতে কেউ মন্দ ব্যবহার না করে সেই জন্যই আইন-কানুন-কনভেনশান। মানব সমাজের কৃষ্ণপক্ষ থেকে বিজিতের যে বিচার বিজেতার খুশিমাফিক চলে আসছে তা-ই তাহলে চলবে নির্দ্বিধায় ও নির্বাধায়? জেনেভা কনভেনশান কি মানবসভ্যতার শুক্লপক্ষের সূচনা করেনি?

একটি দেশের সভ্যতার বড় মাপকাঠি সেই দেশ অপরাধ ও অপরাধীদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে। সাধারণ কয়েদির প্রতি যে মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তার চেয়ে উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গির আশা করা হয় যুদ্ধবন্দিদের প্রসঙ্গে। কেবল যুদ্ধ করার জন্য কোনো যুদ্ধবন্দির অপরাধ হয় না। যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধাপরাধ করা এক জিনিস নয়। যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার হয়। যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করা বা পণ্যের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার রেওয়াজ উঠে গেছে। যদি যুদ্ধবন্দির বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ বা যুদ্ধপরাধের অভিযোগ না থাকে, তবে যুদ্ধবিরতি ও বৈরিতার অবসানের পর তার দেশে তাকে প্রত্যর্পণ করা আজ বিধেয় বলে বিবেচিত।

মঈনুস সুলতান

যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেট্স্-এ পড়তে যাওয়া বাংলাদেশী ছাত্র মইনুস সুলতানকে আমরা লক্ষ করেছি পশ্চিমা মুলুকের মুক্তি ও প্রগতির সংগ্রামে রত শক্তিসমূহের সাথে যোগাযোগ করতে এবং সেখানে শামিল হতে। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ শান্তির জন্য যে প্রয়াস চালাচ্ছেন মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার ছাঁকনি পেরিয়ে তা সচরাচর আমাদের গোচরে আসে না। সেই প্রয়াসের টুকরা-কিন্তু-দুর্দান্ত ছবি পাওয়া যায় এই লেখায়। দৈনিক *প্রথম আলো*-র 'শুক্রবারের সাময়িকী'র ৭ই ডিসেম্বর ২০০২ তারিখের সংখ্যা থেকে এই লেখাটা পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে শীত তেমন পড়ে নি, আকাশে রোদ আছে বিস্তর, তাই অ্যাম্‌হার্স্ট শহরের দিকে চলে এলাম। এদিকে আসার কারণ একটি নয় তিন তিনটি। স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ ছেপেছে অ্যাম্‌হার্স্ট কলেজের মিউজিয়ামে আফ্রিকার কোথা থেকে নাকি আস্ত এক পেল্লায় ম্যামথের জীবাশ্ম নিয়ে আসা হয়েছে। তাই প্রথমত কলেজ চত্বরের দিকে শ্রীচরণযোগে চললাম- জানোয়ারটি কখন পাবলিককে দেখানো হবে তার তত্ত্বতালাশে। যেতে যেতে ভাবলাম পরে না হয় শহরের মাঝামাঝি ফার্মার্স মার্কেট থেকে তাজা আনাজপাতি কেনা যাবে। অতঃপর হাতে সময় থাকলে শহরের সবুজ মলে যুদ্ধবিরোধী জমায়েত মিছিল কিছু হচ্ছে কিনা তাও জেনে নেওয়া যাবে।

অ্যামহার্স্ট কলেজের ক্যাম্পাসে উঁচুনিচু টিলা টক্করের প্রাধান্য বেশি। মহাবিদ্যালয়টির ভবনগুলোর বয়স শতাব্দী দেড়েকের কম হবে না। ম্যামথ আকারের স্থাপত্যগুলোর নকশায় গ্রিক ও রোমান যুগের ঐতিহ্য প্রকট। এখানে প্রকাণ্ড সব গাছের সংখ্যাও বেশুমার। বৃক্ষগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিক প্যাটার্নের শ্বেতকায় কলামরাজি।

আমি স্তম্ভসমুদয় ও প্রাচীন বৃক্ষমালার গোলকধাঁধায় এক চিলতে ম্যাপের সাহায্যে মিউজিয়ামটির সন্ধান করি। সহসা দেখি আমার যাত্রাপথে ভুঁইফোড়ের মতো দাঁড়িয়ে মার্কিন পতাকা হাতে রীতিমতো জটলা জনসমাবেশ। ঝাণ্ডাধারীদের সংখ্যা জনা তিরিশেকের বেশি হবে না। তাদের বেশির ভাগের বয়সই অল্প তবে বেশ কয়েকজন প্লাকার্ড হাতে প্রৌঢ়ও আছেন। তবে কি এ্যাম্‌হার্স্ট কলেজেও যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা শুরু হলো? এই ভেবে ঘটনাটি সরজমিনে অবলোকন করার জন্য আমি

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

মিউজিয়াম গমন ইস্তফা দিয়ে একটি ঘেসো বৃক্ষতলে রাখা কাঠের বেঞ্চের পাশে এসে দাঁড়াই। এবার মনোযোগ দিয়ে প্লাকার্ডগুলো পড়ি। পড়তে পেরে আর বিষয়টিকে মোটেই যুদ্ধবিরোধী মনে হয় না। পোস্টার-ব্যানারে তো দেখা যাচ্ছে রীতিমতো যুদ্ধংদেহী সংলাপ। আফগানিস্তানে লড়াইরত আমেরিকান ট্রুপসকে নৈতিক সমর্থন দানের আহবান। কিছু কিছু প্লাকার্ডে সন্ত্রাসবাদ ও লাদেনি তৎপরতার মুণ্ডুপাতের ব্যবস্থাপত্র। দেখতে দেখতে লড়াই সমর্থক জমায়েতটি নাটকীয় হয়ে ওঠে। বেশ কটি বেটাছেলে মশারির মতো দেখতে মেকি বোরকায় শরীর ঢেকে পর্দানশীন আফগান নারীর ভূমিকায় মাতে।

তাদের পেছন পেছন কংকালের মুখোশ পরা এক লোক বয়ে আনে প্রকাণ্ড এক প্লাকার্ড। তাতে অ্যানলার্জ করা আলোকচিত্রে সালোয়ার-কুর্তা ও পাগড়িসমেত এক তালেবান বোরকা পরা নারীকে ডাণ্ডাপেটা করছে।

গণতামাশাটির এখানেই ইতি হয় না। রঙ্গটি আরো জমজমাট হয় কালো পোশাক পরা জনাকয়েক যুবা খানিক তফাতে এসে দাঁড়ালে। কৃষ্ণ ড্রেসধারীদেরও হাতে আছে মার্কিন নিশান। তারা খানিক স্থির দাঁড়িয়ে থেকে শান্ত মুখে দুটি পতাকায় ম্যাচ জ্বেলে আগুন দেয়। এতদিন টেলিভিশনে লাহোর কিংবা জাকার্তায় ইউএসএ'র ফ্লাগকে পুড়তে দেখেছি। এবার তাহলে খোদ আমেরিকাতে নিশান জ্বালানো শুরু হলো। পতাকা দহনে যুদ্ধংদেহী জমায়েতের মাঝে স্পষ্টত টেনশন সংক্রমিত হয়। তারা সবেগে তাদের হাতে ধরা নিশান দোলায়।

শান্তিবাদীদের আশু কবর কামনা করে ওঠে বেশ কিছু স্লোগান। এতে পতাকা পোড়ানেওয়ালারা স্থির থেকে একটি ব্যানার মেলে ধরে। ব্যানারে লেখা "আমারা প্রতিবাদ করি উগ্র জাতীয়তাবাদের। আমরা মনে করি না, আমেরিকান নাগরিকদের জীবন বিদেশী নাগরিকদের চেয়ে অধিক মূল্যবান। আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধতৎপরতার নিন্দা করি"। এতে জমায়েতের মুডে যেন ঘৃতাহুতি হয়। কোনো কোনো লড়াই সমর্থক চিৎকার করে আনবিক বোমা ব্যবহারের আহ্বান জানায়। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের লক্ষ্য কে তা কিন্তু এলোমেলো শ্লোগান ও চিৎকার থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ঘোড়া হাঁকিয়ে দুটি পুলিশ এসে দুদলের মাঝামাঝি অবস্থান নেয়। সাইরেনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারি– অধিক পুলিশ আগমন অত্যাসন্ন। আমার আশৈশব পুলিশ-ভীতি আছে বলে আর ঘাপলা অবলোকন করা নিরাপদ বোধ করি না। তাই সহসা ঝোপ-ঝাড়, ভাস্কর্য ও কেয়ারি করা ফুল বাগানের ভেতর দিয়ে সাততাড়াতাড়ি সটকে পড়ি।

কেটে পড়ে চলে আসি। অ্যাম্হার্স্ট শহরের মাঝামাঝি। উইক এন্ড বলে এদিকে ভিড়-ভাট্টা কিছু নেই, কোথাও নেই দারোগা পুলিশের কোনো লক্ষণ। সবুজ মলে যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা শুরু হবে বেলা এগারোটা নাগাদ। হাতে ঢের সময় আছে তাই খানিক অলস হাঁটি। ক্যাথলিক চার্চটির পরিচ্ছন্ন আঙিনায় দাঁড়িয়ে বুড়ো এক লোক খিক্ খিক্ হেসে তার লোমশ কুকুরটিকে আইসক্রিম খাওয়াচ্ছে। মোটাতাজা টেকো মানুষটির অন্যহাতে ধরা সস্তা কনডমের বৃহৎ বাক্স। পাশেই গোটা কয়েক কিশোরী গৃহহীনদের জন্য কারযাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলছে। একটি মেয়ের হাতে ধরা একগুচ্ছ নীলাভ নাম না জানা ফুল। নিউইয়র্কের আতংকবাদী হামলায় এ দেশের ইকোনমির তেরোটা বেজে গেছে। স্ট্রিটে ও ট্রেন স্টেশনে প্রতিদিন বাড়ছে গৃহহীনদের সংখ্যা। ফুল শুঁকতে শুঁকতে একটি মেয়ে আমার কাছে চাঁদা চায়। তাকে অবজ্ঞা করে খানিক কড়ি বাঁচাতে আমার হৃদয় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ওয়ালেট থেকে বের করে কেবল একটি ডলার ছাড়তেই বালিকাটি আমার নাকের পাশে ফুল দুলিয়ে ফিক্ করে হাসে। অল্প দূরে সড়কের এক পাশে ফিউনারেল হোম বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভবন। গৃহটির সামনে লাশ

বহনকারী কালো লিমোজিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবি– রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে কার ঘরে আজ আঁধার নামল।

অবশেষে ইহুদিদের একটি বেকারির সামনে চলে আসি। এখানে বেগোল ও ক্রিমচিজ খাদকদের বিস্তর জটলা। ওখান থেকে আমি এক পেয়ালা কাপাচিনো কিনে তাতে দারুচিনি চূর্ণ ছড়াতে গেলে সহসা মিসরের মেয়ে ইয়ামনার সঙ্গে দেখা হয়। কফিতে চিনির কিউব মিশ্রণরত ইয়ামনা আমাকে রীতিমতো চমকে দেয়। মিসরের এ তরুণীটির সঙ্গে আমি অপরিচিত না। বলা যায় এর সঙ্গে আমার বছর দুয়েকের ভাব-সাব আছে। মাঝে মধ্যে আমরা একত্রে বাস চেপে লাইব্রেরিতে যাই। পার্টি-পরবেও দেখা হয় ঢের। গেল বছর আমরা একসঙ্গে কানাডা পর্যন্ত গিয়েছিলাম বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সমাবেশ করতে কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো তাকে খোলা চুলে দেখিনি। মেয়েটি সর্ব সময় দীর্ঘ এক হেজাবে চুল ও মুখের কিয়দংশ ঢেকে ঘুরে বেড়াত। আজ কেবল হেজাবই অনুপস্থিত না, পরিবর্তন হয়েছে চুলের বর্ণের। আমি তার সদ্য রঙ করা কোঁকড়ানো সোনালি চুলের গুচ্ছের দিকে অবাক হয়ে তাকালে ইয়ামনা ম্লান হাসে। একটি চেয়ার টেনে বসতে বসতে মৃদু স্বরে কৈফিয়তের মতো করে বলে– 'সেপ্টেম্বর এগারোর আতংকবাদী হামলার পর আর এদেশে মুসলমান মেয়েদের হেজাব পরা নিরাপদ না। নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছ এদিকেও বেশ কিছু চাদর ও হেজাবধারী মেয়েদের হেনস্তা করা হয়েছে।' তার বক্তব্য শুনে আমি ব্যাথিত হই কিন্তু জবাবে কিছু বলি না। নীরবে কাপাচিনো পান করতে করতে ভাবি, ইয়ামনার গাত্রবর্ণ শ্বেত ও হলুদে মেশানো তাই ব্লণ্ড চুলে তার এথনিক্ পরিচয় কিঞ্চিৎ ঢাকা পড়বে সত্য। কিন্তু আমার গতরের যা আধো আবলুস রঙ এতে শিরিষ কাগজ ঘষেও ফায়দা কিছু হবে না। ইয়ামনা এদেশে সন্ত্রাসবাদবিরোধী মায় যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী সদ্যসৃষ্ট কিছু আইনকানুনের কথা বলে। বলতে বলতে সে খানিকটা ইমোশনাল হয়ে জানায়, 'বুশ টেরোরিস্ট সাসপেক্টদের মিলিটারি ট্রাইবুনালে বিচার করার কথা বলছে। এতে কয়েদিদের আপিল করার, উকিল দ্বারা ক্রস একজামিনেশন ইত্যাদির অধিকার লোপ পাবে।' এসব বলতে বলতে ইয়ামনা তপ্ত কেটলির ঢাকনাটির মতো উচ্ছ্বাসে কাঁপে। তাঁর পরিবর্তিত বেশভূষার লোকাট জামায় বুক জোড়া ওঠানামা করে। আমি ড্রেস কোড পরিবর্তনে নারীদেহের রেখাবঙ্কিমে যে ভিন্ন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয় তার কথা না ভেবে পারি না। ইয়ামনা ঠোঁট কামড়ে বলে, 'কায়রোতে মানবাধিকার আন্দোলন করতাম, ওখানে থাকা হলো না, এ দেশে আসলাম, এখানেও মানুষের সিভিল লিবার্টি, মৌলিক অধিকার কিছু থাকবে বলে মনে হয় না!' এ পর্যন্ত বলে সে পার্সে মিনা করা আরবি কোনো শব্দের ওপর আঙুল বোলায়। আমি বলার মতো কিছু খুঁজে পাই না। নতমুখে খানিকক্ষণ কাপাচিনোর পাত্রটির দিকে তাকাই। বাতাসে মিসরি মাস্কের মৃদুমন্দ সুঘ্রাণ ভাসে।

সময় হয়ে এলে আমরা একত্রে সবুজ মলের দিকে হাঁটি। ফার্মার্স মার্কেটটি বেশ জমে উঠেছে। চাষীরা রাশি রাশি লেটুস্, টমেটো, পেঁয়াজপাতা ও ফুলকপি সাজিয়ে বসে। কেউ কেউ পোষা ঘোড়া বা গাভী নিয়ে এসেছে ক্রেতাদের দেখাতে। বাজারটির প্রান্তে খানিক নিরিবিলি স্থানে বদখৎ রকমের স্যুট পরে এক গোলমুখো সাহেব সবাইকে টেলিস্কোপে মাগনা সূর্য দেখাচ্ছে। এখান থেকে মাইক্রোফোনে যুদ্ধবিরোধী তৎপরতার আওয়াজ পাওয়া যায়। ইয়ামনা আর সামনে বাড়তে রাজি হয় না। সে সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে বলে– 'আজকাল এফবিআই'র গোয়েন্দারা চোরা ক্যামেরায় সকলের ছবি তুলে নিচ্ছে। বলা তো যায় না কখন কাকে ঘাড় ধরে দেশ থেকে বের করে দেয়।' ইয়ামনার আশঙ্কায় আমি কিঞ্চিৎ ভাবিত হই। খানিক ইতস্তত করে অবশেষে শনিবারের স্নিগ্ধ সহচরটির মায়া কাটিয়ে জোর কদমে যুদ্ধবিরোধী জলসাটির দিকে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেই। মনে মনে ভাবি– আমি তো শ্রীহট্টের বেহদ্দ বাঙ্গাল বটি, কৈশরে হাঁটি হাঁটি

পা পা করে নকশাল আন্দোলন পাড়ি দিয়েছি, এবার কাবুল কান্দাহারে বেরাদরদের সঙ্গে সংহতিতে পিছপা হই কীভাবে? ইতিপূর্বে লাওস ভিয়েতনামে বসবাস করে এসেছি– এখান থেকে বের করে দিলে দেশে ফিরে গিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দেব, না হয় গ্রামে ফিরে মৌমাছি পালন করা যাবে। মাইকের আওয়াজ শোনা মাত্র আমার দেহমনে শ্লোগানি জোশ ফিরে আসে।

এ জলসাটি সংখ্যায় তেমন বড় না হলেও মনে হয় সমাজের সর্বস্তরের, সর্ববর্ণের বৃদ্ধা, বিকলাঙ্গ ও শিশুসমেত শ্বেতকায়, কৃষ্ণাঙ্গ ও এশিয়ান সকলেই কমবেশি এসেছেন। অনেকের হাতেই শোভা পাচ্ছে লড়াই বন্ধের আহ্বান– বিশেষ করে সিভিলিয়ানদের বাঁচানোর বাণী সংবলিত প্লাকার্ড। সভা এখনো সরগরম হয়ে ওঠেনি, তাই মাইক্রোফোনে ড্রাম ইত্যাদি বাজিয়ে গাওয়া হচ্ছে যুদ্ধবিরোধী সঙ্গীত। গানটি তেমন সুরেলা না তবে বক্তব্যে তাকদ ও জোশ দুইই উপস্থিত। গান শেষ হতেই তরুণী গোছের এক কবিকে নিয়ে আসা হলো। মেয়েটির কান, নাক, ভুরু ও ঠোঁট বিঁধিয়ে ঝুলছে একাধিক রুপার আংটা। তার থোপা থোপা চুলে বেগুনি, হরিৎ ও লালবর্ণের ছোট ছোট নকশা। যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব রেখে তরুণী গোটাকতক কবিতা পড়ল। পড়তে পড়তে সে মাঝে মধ্যে শরীর দোলাচ্ছে, এতে আংটাগুলোতে প্রতিফলিত সুর্যালোক ঝিলিক পাড়ে। সর্বশেষ কবিতায় অন্ত্যমিলরূপে চার অক্ষরের একটি ইংরেজি শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করল, যার বঙ্গানুবাদ অনেকটা অনভিপ্রেত যৌন সঙ্গমের কাছাকাছি। শ্রোতারা রই রই করে উঠলো মনে হলো লবজটি যুদ্ধবাজদের বর্ণনায় লাগসই হয়েছে। পদ্য পাঠ শেষ হতেই মাঠে হালকা বাদ্যে দ্রিম দ্রিম রব ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণের মতো ধ্বনির লহরি। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি দুই জাপানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী– এদের একজনের মাথা বিলকুল মোড়ানো– পাখার মতো দেখতে ঢোলক বাজিয়ে সভাস্থল পরিক্রমা করছেন। সভা থেকে দুএকজন উঠে তাদের সঙ্গে পরিক্রমায় যোগ দেন। একজন বিকলাঙ্গ মানুষ হুইল চেয়ারে করে তাদের পিছন পিছন যাচ্ছেন। কবিটি পড়িমরি করে ছুটে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। জাপানি সন্ন্যাসিনীরা ছোটখাটো মিছিল নিয়ে বার কয়েক পরিক্রমা করে ল্যাম্প পোস্টের নিচের বাধানো চত্বরে চোখ মুদে শান্তি মন্ত্র জপ করেন। তাদের আশপাশে জড়ো হয় ছোট্ট কিছু ছেলেমেয়ে। কবিটি এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমায়। সে তার পাণ্ডুলিপির পাতা ছিড়ে শিশুদের তৈরি করে দেয় অরিগামি বা কাগজের সারস পাখি। একটি শিশুকে উৎসাহিত করতে গিয়ে সে ঈষৎ লম্ফ দিয়ে বেশকটি শান্তি সারস বাতাসে উড়ায়। লাফানোতে তার উন্মুক্ত নাভীমূলে একটি রুপালি আংটা ঝিক করে ওঠে। আমি তার রৌপ্য বলয়ের চারপাশে উল্কি করে আঁকা বিবিধ ভাষার বেশ কিছু বর্ণ দেখতে পাই।

অবশেষে মাইক্রোফোনে শান্ত কণ্ঠে এক বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। খর্বাকৃতির এ মহিলা অধ্যাপকটি বেশ দূরের এক কলেজ থেকে এসেছেন। পরিচয়কারী জানান, মাস কয়েক আগে এ অধ্যাপক ইরাকে ওষুধপত্র নিয়ে রিলিফের কাজ করে এসেছেন। জেলও খেটেছেন বার কয়েক যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রনীতির প্রতিবাদ করে। বক্তাটি মাইক হাতে নিয়েই শ্রোতাদের চিলির কথা স্মরণ করতে বলেন। তিনি শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বলেন– আজ থেকে অনেক বছর আগে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভেদর আলেন্দেকে সিআইএর মদদে হত্যা করা হয়। তারপর গোপন স্কোয়াডের জুলুমে চিলিতে যে কত দেশপ্রেমিকের প্রাণহানি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সকল স্বৈরাচারী মিলিটারি ডিক্টেটর যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল অফ আমেরিকায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এ পর্যন্ত বলে বক্তাটি দম নেন তারপর শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে যোগ করেন, আল কায়েদার ট্রেনিং ক্যাম্প ধ্বংস করার জন্য আজ আফগানিস্তানের পল্লীতে পর্বতে আক্রমণ চলছে– তার আগে স্কুল অফ আমেরিকার মিলিটারি

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয় কি? বক্তব্যের সমর্থনে শ্রোতাদের মাঝ থেকে শোরগোল ও হাততালি ওঠে। বক্তা আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা ফাও-এর সূত্র থেকে একটি উপাত্ত দিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানেন। তিনি বলেন– 'এগারোই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ মরেছে তা সত্য, তবে ওই একই দিনে অনাহারে, অপুষ্টি ও নানারকম রোগব্যাধিতে তৃতীয় বিশ্বে প্রায় ছত্রিশ হাজারের মতো লোক মরেছে। এদের মধ্যে অনেকেই ইরাকের অপুষ্টিজনিত শিশু।' ভাষণ শেষ হতেই আমি উপাত্তটির সংখ্যাগত বিরাটত্ব নিয়ে ভাবি। মনে হয় এদের মৃত্যু নিয়ে তো কোথাও জ্বলে নি একটি মোমবাতি, নেওয়া হয় নি একটি শোকপ্রস্তাব কিংবা ওড়ে নি জঙ্গীবিমান কোনো দূর দেশের আকাশসীমায়!

সভা প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন ধীরলয়ে থেকে থেকে উঠছে যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান। বেশকটি তরুণ-তরুণী শরীরে সাদা কাপড়ের তৈরি শ্বেতকপোতের প্রতীক জড়িয়ে ড্রাম বাজিয়ে সভাস্থল প্রদক্ষিণ করছে। তাদের পেছনে দৌড়ায় উষ্কখুষ্ক দাড়িচুলের দীর্ঘকায় এক লোক। মানুষটির জিন্সের প্যান্ট ও জ্যাকেটে বেশ কিছু ছিদ্র ও স্টিকার সাঁটা। সে এক হাতে নড়বড়ে দুটি প্লাকার্ড ধরে আছে, অন্য হাতে তার পেপসির খালি ক্যান। প্লাকার্ড দুটির একটিতে যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান ও অন্যটিতে লেখা– 'আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধে ছিলাম– বর্তমানে গৃহহীন ও ক্ষুধার্ত।' সে দৌড়ে যেতে যেতে মাঝে মধ্যে বিকট ফ্যাসফেসে গলায় চিৎকার দিয়ে বলছে– 'ওয়ার ইজ নট্ দ্য আনসার।' তারপর ভিক্ষার জন্য মেলে ধরছে পেপসির খালি ক্যান্। সভাস্থলের কেউ কেউ তার ক্যানে টুংটাং করে ফেলে দিচ্ছেন কোয়াটার, ডাইম বা মার্কিনি সিকি কিংবা দশ পয়সা।

ফেরার পথে দেখি ফার্মার্স মার্কেটের শাকসব্জির আবডালে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন মুখে মিসরের মেয়ে ইয়ামনা। অপরাহ্নের তীব্র সূর্যালোক তার সদ্য রাঙানো চুলের স্বর্ণাভায় ঝিলিক পাড়ে। তাকে আর এ বেলায় বিরক্ত করতে ইচ্ছে হয় না।

আসিফ নজরুল

আন্তর্জাতিক আইন: আমেরিকার বিরোধিতা

এই লেখাটা বেরিয়েছিল *প্রথম আলো*-য় ১লা জুন ২০০২ তারিখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির সবচে বড়ো প্রতিপক্ষ, এটা এমন এক সাম্রাজ্য যা শক্তির দাপট ও দখলদারিত্ব ছাড়া অন্য কোনো আইন মানতে আগ্রহী না– সেটা এই লেখা পড়লে টের পাওয়া যায়।

অতি সম্প্রতি আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট গঠনের জন্য প্রণীত রোম সংবিধি বা রোম চুক্তি থেকে স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নিয়েছে। 'জাতিসংঘের ইতিহাসে এই কাজ আগে কখনোই কোনো দেশ করেনি'– হতবুদ্ধি জাতিসংঘের আইনবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারির এই মন্তব্য করা ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না।

আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনের প্রতি আমেরিকার অনীহা নতুন কিছু নয়। জাতিসংঘের বহু চুক্তিতে আমেরিকা পক্ষ হতে রাজি হয়নি। রোম চুক্তিতেও আমেরিকা পক্ষ হয়নি। বহুপাক্ষিক কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করলেই কোনো দেশ তা পালনে বাধ্য হয়ে যায় না। চুক্তি পালনের বাধ্যবাধকতা মেনে নেওয়ার জন্য একটি দেশকে রাষ্ট্রপতি বা সংসদের মাধ্যমে চুক্তিটিকে র‍্যাটিফাই বা অনুস্বাক্ষর করতে হয়। আমেরিকা রোম সংবিধি অনুসমর্থন করেনি। কেবল স্বাক্ষর করেছিল। আন্তর্জাতিক আইনে এই স্বাক্ষরের মানে চুক্তির নৈতিক ভিত্তিকে মেনে নেওয়া শুধু। রোম চুক্তি থেকে স্বাক্ষর প্রত্যাহার (আন-সাইন) করে আমেরিকা প্রকারান্তরে এই ভিত্তির প্রতিই প্রশ্ন তুলেছে।

রোম চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা। এই আদালতের মাধ্যমে যেসব যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীকে তাদের দেশ বিচার করতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক তাদের বিচার করা। এ ধরনের আদালত রুয়ান্ডা এবং যুগোশ্লোভিয়াতে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। তবে তা হয়েছে অস্থায়ীভাবে এবং নির্দিষ্ট দেশে নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য। অন্যদিকে রোম চুক্তির অধীন আদালতটি হচ্ছে স্থায়ী ও সামগ্রিক এবং এতে অপরাধীর দায়মুক্তির কোনো সুযোগ থাকবে না।

রোম সংবিধি তাই নিজ দেশে কুর্দিদের বিরুদ্ধে দমননীতি চালানোর জন্য ইরাকের মতো দেশের শাসকদের বা ফিলিস্তি

নিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের জন্য ইসরাইলের মতো দেশের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে। এটি অস্বস্তিকর লিবিয়া বা উত্তর কোরিয়ার মতো চরম একনায়কতান্ত্রিক দেশের জন্যও। তাই হয়তো এসব দেশ রোম সংবিধি স্বাক্ষরই করেনি।

আমেরিকা রোম চুক্তি আন-সাইন করে তার চেয়েও নিন্দনীয় কাজটি করেছে। প্রশ্ন আসতে পারে গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর ন্যায়পরায়ণতার স্বঘোষিত রক্ষক এই দেশটি এমন একটি কাজ কেন করতে গেল? মার্কিন প্রশাসন কি ভাবছে এই আদালত তাদের জন্যও হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে কোনো সময়? নিকারাগুয়া বা পানামার মতো প্রতিবেশী অনেক দেশে আমেরিকানদের ইতিহাস, কিংবা অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন করে আফগানিস্তানে ক্লাস্টার বোমার মতো বেসামরিক জনগোষ্ঠীর প্রতি হুমকিমূলক মারণাস্ত্রের ব্যবহার সেই সম্ভাবনাকেই মনে করে দেয়।

বুশ প্রশাসনের এই কাজটিকে আমেরিকার সচেতন জনগোষ্ঠীও ভালো চোখে দেখেনি। লস এঞ্জেলস-এর পত্রিকা *দ্যা অ্যাডভোকেটস*-এর ২২ মে সংখ্যায় সিনডি রোজ লিখেছেন,

> বুশ প্রশাসন আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল কোর্টকে নাকচ করে আমাদের জাতিকে এমন এক সময়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, যখন বুশ নিজেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা আহ্বান করছেন। বাকি বিশ্ব ক্রমেই আমেরিকাকে আরো বেশি করে উদ্ধত এবং অসহযোগী বলে বিবেচনা করছে।

নর্থ ক্যারোলিনার *হেরাল্ড সান* পত্রিকার ২০ মে সংখ্যায় স্টিফেন হথর্ন আন-সাইন করার ঘটনাটির জন্য সর্বজনীন ন্যায়বিচারের প্রতি প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষিত আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

শিকাগো ডেইলি হেরাল্ডের ২১ মে সংখ্যায় ডারউইন কুপার আরো আক্রমণাত্মক সমালোচনা করেছেন বিষয়টি নিয়ে। তার চিঠির একটি অংশ এমন:

> আমেরিকানদের কেন ঘৃণা করে অন্যরা? ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার পর এটি আমরা অনেকেই ভাবতে শুরু করেছি। ঔদ্ধত্যই হচ্ছে এর কারণ– আমাদের আলোচনায় বেশির ভাগ সময়ে এটিই ভাবা হয়। আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট গঠনের প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে আমরা বিশ্বকে এই সংকেতই দিচ্ছি যে, আমরা আমাদের কাউকে অন্য কারো সমালোচনা বা নিন্দার মুখে পড়তে দেব না।

আন্তর্জাতিক আইন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমেরিকা সমালোচিত হয় পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলোতেও। গত বছর জার্মানির বনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো বহু চেষ্টা করেও আমেরিকাকে ক্যুইটো প্রটোকল মেনে নিতে রাজি করাতে পারে নি। ক্যুইটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ২০০৮ থেকে ২১১২ সালের মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ১৯90 সালের পরিমাণের চেয়ে ৫-৮ শতাংশ কমানোর বিধান রয়েছে। আমেরিকা এই প্রটোকল অনুসমর্থন করতে কোনোক্রমেই রাজি হয়নি। আমেরিকা বরং দাবি তুলছে, পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোকে এই দায়দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। আমেরিকার এই দাবির অযৌক্তিক দিকটি বোঝানোর জন্য কিছু পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইউএনডিপির ২০০০ সালের ওয়ার্ল্ড এনার্জি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৫ সালে আমেরিকা একাই সারা বিশ্বের শিল্পজাত কার্বন ডাই অক্সাইডের ২২ শতাংশ উৎপন্ন করেছে। একই সময়ে পুরো আফ্রিকা মিলে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য দায়ী এই গ্যাসটির মাত্র ৩ শতাংশ উৎপন্ন করেছে, চীন ও মধ্যপ্রাচ্য বাদে বাদবাকি এশিয়া উৎপন্ন করেছে মাত্র ৬ শতাংশ। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির ১৯৯৯ সালের এনার্জি ব্যালেন্সেস নামক রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালে আমেরিকা/কানাডাতে মাথাপিছু কার্বন এমিশন যেখানে ৪.৭০ টন, সেখানে এশিয়ায় এর

পরিমাণ ০.৩৪, ল্যাটিন আমেরিকায় ০.৬৩, আফ্রিয় ০.২৮ টন। বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী আমেরিকায় জ্বালানী সম্পদের মাথাপিছু ব্যবহার দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে দশগুণের বেশি, আফ্রিকার তুলনায় আরো বেশি। এশিয়া, আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার গরিব দেশগুলো পরিবেশ বিপর্যয়, বিশেষ করে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য বহুলাংশে কম দায়ী, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এসব দেশের পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি ও অর্থের সংস্থান করার সামর্থ্যও খুবই সীমাবদ্ধ। এ কারণে ১৯৯২ সালের রিও ডিক্লারেশনের ৭নং নীতিতে পরিবেশ রক্ষায় এসব দেশের দায়দায়িত্ব ভিন্ন হবে বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। পরিবেশের জন্য মারাত্মক গ্যাস নির্গতকারী পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ দেশ আমেরিকা পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কনভেনশনে এই নীতির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সেন্টিমেন্টকে নাকচ করার আরেকটি সাম্প্রতিক ঘটনা আমেরিকা ঘটায় গত বছর বর্ণবাদ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলনে। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে জাইআনিজম বা কট্টর ইহুদিবাদকে বর্ণবাদ হিসেবে অভিযুক্ত করে নিন্দা প্রস্তাব নেওয়ার একটি উদ্যোগ শুরু হলে আমেরিকা সম্মেলন বর্জনের হুমকি দেয়। অথচ ইহুদিবাদের ইতিহাস বর্ণবাদের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়।

জাইআনিজমের প্রবক্তারা বাদবাকি জনগোষ্ঠীকে অভিহিত করত জেনটাইল নামে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে এই মতবাদের প্রবক্তারা যে প্রটোকল প্রণয়ন করে তার একটিতে (চতুর্দশ প্রটোকল) বলা হয়,

> ... In this divergence between the Gentiles and ourself in ability to think and reason, is seen clearly the seal of our election as the Chosen People, as higher human beings, in contrast to the Gentiles, who have merely instinctive and animal minds.

জাইআনিজমে মনে করে যে, তারা পৃথিবীকে শাসন করবে ও দিকনির্দেশনা দেবে– এটা তাদের ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। ইসরাইল যে তার প্রতিষ্ঠার পর জাতিসংঘের কোনো প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তই মেনে নেয়নি, বহু ক্ষেত্রে তার পেছনে রয়েছে আমেরিকার প্রশ্রয় বা সরাসরি সমর্থন।

আন্তর্জাতিক আইন বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমেরিকার অনীহার আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। ১৮৬৪ সালের যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রথম জেনেভা কনভেনশন আর্মি মেডিক্যাল ইউনিটকে সহযোগিতার বিধান করা হয়। এই কনভেনশনটি সে সময়ের স্বাধীন প্রতিটি দেশ সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়। আমেরিকা এটি মেনে নিতে রাজি হতে সময় নেয় আরো প্রায় ২০ বছর। ১৯৮২ সালে যখন সমুদ্র আইনের ওপর জাতিসংঘের বহুল প্রশংসিত কনভেনশনটি গৃহীত হয়, তখন এর বিপক্ষে মাত্র চারটি দেশ ভোটদান করে। আমেরিকা এর একটি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের সময়ে এর বিরোধিতা করে আমেরিকা। পারমাণবিক অস্ত্রের সব ধরনের ব্যবহার বন্ধের জন্য যে চুক্তি হয় তা এখনো মেনে নেয়নি দেশটি। জাতিসংঘের তহবিল সবচেয়ে বেশি অনাদায়ী থাকে যে দেশটির কাছে সেটিও আমেরিকা।

আমেরিকার সমালোচনাও তাই সীমা ছাড়িয়ে যায় কিছু ক্ষেত্রে। বছর তিনেক আগে জিম্বাবুয়েতে শ্বেতাঙ্গ ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমির মালিকানা উদ্ধারের জন্য ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়নসহ কিছু সহিংস পদক্ষেপ নেয়া শুরু হলে আমেরিকা 'জিম্বাবুয়ে ডেমোক্রেসি অ্যান্ড রিকভারি অ্যাক্ট' নামক একটি আইন প্রণয়ন করে। এর জবাবে গত বছর জিম্বাবুয়ের মিনিস্টার ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জোনাথন মোয়ো স্থানীয় সানডে মেইল পত্রিকায় বলেন,

> আমেরিকা মূলত একটি বর্ণবাদী দেশ। এর ইতিহাস হচ্ছে বর্ণবাদের, দাসপ্রথার এবং ঔপনিবেশিকতার। আমাদের প্রাক্তন দাসমালিকরা কখনই আমাদের মুক্তিদাতা হতে পারে না। লোকে বুঝতে পারে না কীভাবে একটি দেশ যা আফ্রিকার মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, যে দেশটি আফ্রিকার ঔপনিবেশিকতার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে চায় না, সে দেশটি জিম্বাবুয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে পারে।

মোয়োর বক্তব্যের একপেশে প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু কিছুটা হলেও এ ধরনের বক্তব্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা আন্তর্জাতিক আইনের উর্ধ্বে থাকার প্রবণতা থেকে। বিশ্বে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষার অভিভাবকত্বের ভূমিকায় গ্রহণযোগ্য হতে হলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাধারণ আবেগানুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতগুলো আরো বেশি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, মার্কিন নীতিনির্ধারকরা এটি যত গভীরভাবে উপলব্ধি করবে, ততই তা মঙ্গলজনক হবে গোটা বিশ্বের জন্য।

"অস্ত্রোপচারাঘাত"

আইজাক নোভাক

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

ইরাক-প্যালেস্টাইন-বালী-কেনিয়া-আফগানিস্তান

নোম চমস্কি

‘যদি গান্ধীর মতো নেতার দ্বারাও শাসিত হয় তবু ইরাক অস্ত্রব্যবস্থা গড়ে তুলবে’

সাক্ষাৎকারগ্রহণ: মাইকেল অ্যালবার্ট

তরজমা: আ-আল মামুন

> যুদ্ধ নিয়ে শঙ্কিত মানুষের মনে নানান প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। মাইকেল অ্যালবার্ট ২৯শে আগস্ট ২০০২ তারিখে ই-মেইলের মাধ্যমে নোম চমস্কির কাছে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এখানে সেই প্রশ্নাবলী (ছোট হরফে) ও নোম চমস্কির দেয়া উত্তর (সাধারণ হরফে) তুলে ধরা হলো। মূল সাক্ষাৎকারটা নেয়া হয়েছে www.zmag.org থেকে।

১। সাদ্দাম হোসেন কি ততোটাই ভয়ঙ্কর, আধিপত্যশীল মিডিয়া সচরাচর যতোটা বলে থাকে? স্বদেশে? আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে?

মিডিয়া যেমনটি বলে তিনি সেরকমই ক্ষতিকারক, আধুনিক যুগের সুহার্তোসহ ও অন্যান্য দানবদের সারিতেই তার স্থান। কেউই তার তুল্য হতে চাইবে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত, তার ক্ষমতা বেশি দূর বিস্তৃত নয়।

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে, সাদ্দাম ইরান আক্রমণ করেন (পশ্চিমা মদদপুষ্ট হয়ে) এবং যুদ্ধ চলাকালে তা ভয়ানকভাবে রাসায়নিক অস্ত্রপ্রয়োগের দিকে মোড় নেয় (সেও পশ্চিমা সমর্থনে)। তিনি কুয়েত দখল করে নেন কিন্তু অতিদ্রুত বিতাড়িত হন। কুয়েত দখলের ঠিক পরেই ওয়াশিংটনে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে যে, সাদ্দাম হয়তো তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবেন “একটি পুতুল সরকার বসিয়ে (এবং) আরব বিশ্বের সকলে খুশিই হবে” (কলিন পাওয়েল, তৎকালীন চিফ অব স্টাফ)। প্রেসিডেন্ট বুশ উদ্বিগ্ন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকী সৈন্য প্রত্যাহার বাধাগ্রস্ত না করলে সৌদি আরব হয়তো “শেষ মুহূর্তে হতাশ হয়ে পড়বে এবং কুয়েতে প্রতিষ্ঠিত পুতুল সরকারটি মেনে নেবে”। সংক্ষেপে, উদ্বেগটা ছিল এরকম যে, পানামাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুদিন মাত্র আগে যেটা করেছিল সাদ্দাম সেটারই হুবহু নকল করবে (কেবল একটাই ব্যতিক্রম ঘটবে, ল্যাটিন আমেরিকানরা একবারেই খুশি হননি)। একবারে শুরু থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই “দুঃস্বপ্ন-দৃশ্যটা” এড়াতে চেষ্টা করে। ঘটনাগুলো সতর্ক মনোযোগের সাথে বিচার করা দরকার।

সাদ্দামের সবচেয়ে খারাপ দুষ্কর্ম, এযাবৎকালে, তার স্বদেশের মাটিতে; যার মধ্যে রয়েছে কুর্দীদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ, ৮০'র দশকের শেষের দিকে বিপুল সংখ্যক কুর্দীর ওপর চালানো গণহত্যা, বর্বর নিপীড়ন এবং কল্পনাযোগ্য সকলরকম কুৎসিত অপরাধ। তার ভয়াবহ অপরাধ-তালিকায় এগুলোই শীর্ষে রয়েছে, যার জন্য এখন তাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে; ঠিকই আছে। কিন্তু এটা বিচার করা জরুরি যে, সাদ্দামকে তীব্রভাবে খারিজ করে দেয়া এবং সুদক্ষ ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করার সময় "আমাদের সহায়তায়" শব্দযুগল একই সাথে উচ্চারণ করা হয় কিনা।

সাদ্দামের অপরাধসমূহ সেইসময়ই সকলে জেনে গিয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমে তা নিয়ে বিশেষ কোনো উদ্বেগ দেখা যায়নি। সাদ্দামকে কখনো সখনো মৃদু তিরস্কার করা হয়েছে; কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক কঠোর নিন্দা করাটাকে খ্যাতিমান ভাষ্যকাররা বিবেচনা করেছে যে একটু বেশিই হয়ে যাবে। রিগ্যানবাদীরা এবং বুশ-১ এই দানবকে তার নিকৃষ্টতম নৃশংসতা চালানোর দিনগুলো এবং তার অনেক পর পর্যন্তও একজন মিত্র ও মূল্যবান ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে। বুশ সাদ্দামকে ঋণ পাওয়ার এবং গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণে ব্যবহারযোগ্য উন্নত প্রযুক্তি বিক্রয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, কখনো কখনো সাদ্দামের নৃশংসতা রুদ্ধ করার জন্য কংগ্রেসের নেয়া তৎপরতাকে পদদলিত করে, কুয়েত দখলের ঠিক আগের দিন পর্যন্ত। কুয়েত দখলের কয়েকদিন পরও বৃটেন সামরিক যন্ত্রপাতি ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ রপ্তানি করার অনুমোদন দিচ্ছিল। *এবিসি*'র সাংবাদিক, যিনি এখন *জেড নেট*-এরও ভাষ্যকার, চার্লস গ্লাস জীবাণু অস্ত্র প্রদানের বিষয়টি যখন আবিষ্কার করলেন (বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট ব্যবহার করে এবং পক্ষত্যাগীদের স্বীকারোক্তির সাহায্যে), পেন্টাগণ তৎক্ষণাৎ তাঁর এই উন্মোচনের বিষয়টি অস্বীকার করে এবং সংবাদ-কাহিনীটি মিডিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মার্কিন নির্দেশ অমান্য করে (কিংবা হয়তো ভুল ব্যাখ্যা করে) সাদ্দাম যখন তার প্রথম প্রকৃত অপরাধটি করলেন কুয়েত দখলের মাধ্যমে তখন এই কাহিনী পুনরুজ্জীবিত করা হলো এবং তৎক্ষণাৎ সাদ্দাম মিত্র থেকে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত হুন রাজা আটিল্লা হয়ে উঠলেন। এরপর প্রদত্ত সেই সুযোগ-সুবিধাগুলোকেই ব্যবহার করা হতে থাকলো সাদ্দামের শয়তানী প্রকৃতি তুলে ধরার জন্য। বুশ-১ যখন তার বন্ধুকে নতুন করে উপহার দেয়ার ঘোষণা দিলেন ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে (মার্কিন কৃষি ব্যবসা ও শিল্পের দিক থেকেও দেয়া উপহার) তখন সেটাকে মিডিয়াতে রিপোর্ট করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাও করা হয়নি, যদিও এসংক্রান্ত খবর পড়তে চাইলে কেউ তখনই জেড-ম্যাগাজিনে এবং এখন অন্য জায়গাতেও পেতে পারেন। এর কয়েক মাস পরে, কুয়েত দখলের কিছুদিন আগে, একটি উচ্চ পর্যায়ের সিনেট প্রতিনিধিদল (পরবর্তীকালে) রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বব ডোলের নেতৃত্বে সাদ্দামের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছাবাণী পৌঁছে দেন এবং সেখানে প্রচলিত মতের রিপোর্টারদের কাছ থেকে তাকে যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তাতে কান না দেবার আশ্বাস দেন। সাদ্দাম, এমনকি, মার্কিন রণতরী ইউএসএস স্টার্ক আক্রমণ করে কয়েক ডজন নাবিক হত্যা করার পরও পার পেয়ে গিয়েছিলেন। এটা তাকে উচ্চ গুরুত্ব দেয়ারই স্মারক। অন্য আর যে একটিমাত্র দেশকে এমন অনুগ্রহ দেখানো হয়েছিল সে হলো, ১৯৬৭ সালে, ইসরাইলকে। সাদ্দামের প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইরাকের গণতান্ত্রিক বিরোধীদলের সাথে যে-কোনো রকম যোগাযোগ নিষিদ্ধ করে এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের পর পর্যন্তও এই নীতি অনুসরণ করে; অন্যদিকে, শিয়া বিদ্রোহ দমনে সাদ্দামকে ওয়াশিংটন কার্যকর কর্তৃত্ব দান করে, যে-বিদ্রোহ হয়তোবা তাকে উৎখাত করতে পারতো– "স্থিতিশীলতা" রক্ষার স্বার্থে এটা করা হয় বলে প্রেস প্রাজ্ঞোচিত ব্যাখ্যা খাড়া করে।

সাদ্দাম যে একজন বড়মাপের অপরাধী সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে এবং এমনকি তার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তার হত্যাযজ্ঞকে 'রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার' অজুহাতে গুরুত্বহীন বিবেচনা করেছিল বলেই ইতিহাস বদলে যায় না সেগুলো ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

২। ভবিষ্যতের দিকে তাকালে, আধিপত্যশীল মিডিয়া যেমনটি বলে, সাদ্দাম হোসেন কি ততোটাই বিপজ্জনক?

সে যদি সেখানে না থাকে তবে তা পৃথিবীর জন্য ভাল হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্তত ইরাকীরা ভাল থাকবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যখন তাকে মদদ দিচ্ছিল, এমনকি তাকে পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণের জন্য (যে কাজটি তিনি করেছেন বলেই মনে হয়) দ্বি-ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি সরবরাহ করছিল, তখন সে যতোটা বিপজ্জনক ছিল, এখন সে তার তুলনায় খুব সামান্যই বিপজ্জনক। দশ বছর আগে সিনেট ব্যাংকিং কমিটির শুনানীতে উন্মোচিত হয় যে, বুশ-প্রশাসন দ্বি-ব্যবহারোপযোগী প্রযুক্তির লাইসেন্স ও দ্রব্যাদি পাওয়ার অনুমোদন দেয়, যা "পরবর্তীতে ইরাকী প্রশাসন পারমাণবিক মিসাইল ও রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করে"।

পরবর্তী শুনানীতে আরও তথ্য উন্মোচিত হয় এবং এসম্পর্কে প্রেসে রিপোর্টও প্রকাশিত হয় ও মূলধারার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজও আছে (সেই সাথে ভিন্নমতীদের লেখালেখি)।

১৯৯১ সালের যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ রকমের ধ্বংসাত্মক এবং তারপর থেকে এক দশকের নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; যা সম্ভবত সাদ্দামের হাতকে আরও শক্ত করেছে (চূর্ণবিচূর্ণ সমাজের সকল সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা হ্রাস করার মাধ্যমে), কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তার যুদ্ধ করার সামর্থ্য বা সন্ত্রাসবাদকে মদদ যোগানোর সামর্থ্য বিপুল পরিমাণে হ্রাস করেছে। তদুপরি, ১৯৯১ সালের পর থেকে তার প্রশাসনকে "নো ফ্লাই জোন", নিয়মিত দেশটির ওপর দিয়ে বিমান-চালনা ও বোমাবর্ষণ এবং কড়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংকটের মধ্যে রাখা হয়। সেপ্টেম্বর ১১-র ঘটনাবলী তাকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে বলে মনে হয়। সাদ্দাম এবং আল-কায়েদার মধ্যে যদি কোনো সম্পর্ক থেকেও থাকে, তবে সে-সম্পর্ক এখন রক্ষা করা আরও দুষ্কর হয়ে উঠবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপুলভাবে জোরদার করার কারণে। আর তাছাড়া সাদ্দাম ও আল-কায়েদার মধ্যে কোনোরকম সম্পর্ক না-থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার সাথে সাদ্দামকে জড়িত করার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুই পাওয়া যায়নি। আর এতে বিস্মিত হওয়ারও কিছু নেই। সাদ্দাম এবং লাদেন ছিলেন পরস্পরের তীব্র শত্রু; সে-পরিস্থিতির বদল ঘটার বিশেষ কোনো কারণ ঘটেনি।

যুক্তিসঙ্গত উপসংহার হলো যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের আগের তুলনায় সাদ্দাম এখন কম-বিপজ্জনক এবং অধিকতর কম বিপজ্জনক সেই সময়ের তুলনায় যখন তিনি পর্যাপ্ত মার্কিন-বৃটিশ এবং অন্যান্যদের মদদ পাচ্ছিলেন। সাদ্দাম যদি আজ সভ্যতার টিকে থাকার বিরুদ্ধে এমন এক হুমকি হয়ে ওঠে যে বৈশ্বিক ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, তবে একবছর আগে সে-পদক্ষেপ নেয়া হলো না কেন? এবং আরও বিস্ময়কর যে, ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে নেয়া হলো না কেন?

৩। আজকের দুনিয়ার গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রের উপস্থিতি ও ব্যবহারের বিষয়টি কীভাবে বিচার করা উচিত?

সেগুলো বর্জন করা উচিত। অস্ত্র-বিস্তার রোধ চুক্তিতে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে পারমাণবিক অস্ত্রসম্পন্ন দেশসমূহ সেগুলো বর্জন করার পদক্ষেপ নেবে। জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রের

চুক্তিগুলোরও একই লক্ষ্য। ইরাক-সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান রেজুল্যুশনটি (৬৮৭, ১৯৯১) আহ্বান জানায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও বিতরণ ব্যবস্থা বর্জন করতে এবং রাসায়নিক অস্ত্রের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য। উত্তম পরামর্শ।

ইরাকের প্রসঙ্গটিই এক্ষেত্রে সবার আগে এসে পড়ে। আমরা ক্লিন্টনের আমলের স্ট্রাটেজিক কমান্ড-এর প্রধান জেনারেল লি বাটলারের, '৯০ এর দশকের শুরুতে, উচ্চারিত সতর্কবাণী স্মরণ করতে পারি: "এটা ভয়াবহ রকমের বিপজ্জনক যে মধ্যপ্রাচ্যে, যাকে আমরা বিদ্বেষের কড়াই আখ্যায়িত করে থাকি, একটা দেশ স্পষ্টতই নিজেকে অস্ত্র-সজ্জিত করছে বিপুল পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে যার সংখ্যা সম্ভবত শতকেও ছড়িয়ে যাবে এবং যা অন্য দেশগুলোকেও এই কাজ করতে উৎসাহিত করছে"। নিশ্চয়ই তিনি ইসরাইল সম্পর্কে একথা বলেছিলেন। ইসরাইলের সামরিক কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে তারা ন্যাটোভুক্ত যেকোনো ইউরোপীয় দেশের তুলনায় আকাশ এবং স্থলসেনার দিক থেকে বৃহত্তর ও অধিক অগ্রসর (আইজাক বেন ইসরাইল, *হা'রেজ*, ৪-১৬-০২, হিব্রু)। তারা আরও ঘোষণা করে, তাদের ১২ শতাংশ বোমারু ও যুদ্ধবিমান স্থায়ীভাবে পূর্ব-তুরস্কে স্থাপন করা হয়েছে; সেই সাথে তুরস্ক-ঘাঁটিতে রয়েছে সম পরিমাণেই সাবমেরিন ও নৌ-সেনা এবং গোলন্দাজ বাহিনী – যাতে করে কুর্দী জনগণকে দমন করার দরকার হলে ক্লিন্টন আমলের মতো বিধ্বংসী সহিংসতার আশ্রয় নেয়া যায়। জানা গেছে যে তুরস্কে অবস্থিত ইসরাইলী বিমান ঘাঁটি থেকে মার্কিন-ইসরাইল-তুরস্ক যৌথ নীতির আওতায় ইরানকে হামলার হুমকির মধ্যে রাখা এবং সম্ভবত খণ্ডবিখণ্ড হতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ইরানী সীমান্ত দিয়ে ইসরাইলী গোয়েন্দা বিমান চালানো হয়। ইসরাইলী বিশ্লেষকরাও জানিয়েছেন যে মার্কিন-ইসরাইল-তুরস্ক যৌথ বিমান মহড়ার লক্ষ্য হলো ইরানকে হুমকি দেয়া ও সতর্ক করে দেয়া। এবং অবশ্যই ইরাককেও (রবার্ট ওলসান, *মিডিলইস্ট পলিসি*, জুন ২০০২)। ইসরাইল সন্দোহতীতভাবেই পূর্ব-তুরস্কে অবস্থিত বিশাল মার্কিন বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করছে, সেখানকার মার্কিন বোমারুগুলো সম্ভবত পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত। আর এখন ইসরাইল প্রকৃত প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রবর্তী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

ঐ এলাকার বাকি দেশগুলোও পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত। ইরাক যদি ভবিষ্যতে গান্ধীর মতো কোনো নেতার দ্বারাও শাসিত হয় তবু সম্ভবপর হলেই ইরাক অস্ত্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং সম্ভবত আজকের ইরাকের যে সামর্থ্য আছে তার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণেই। আর এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে, এমনকি হয়তো বেগবানও হবে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ভারত এবং পাকিস্তান মার্কিন মিত্র দেশ, কিন্তু গণবিধ্বংসী অস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং গুরুতরভাবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিল বলে জানা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য মিত্র ও মক্কেল রাষ্ট্রগুলোর বেলায়ও একথা সত্য।

অস্ত্রসজ্জিতকরণ অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়, যদি কিনা পুরো এলাকাজুড়ে সার্বজনীনভাবে অস্ত্র হ্রাস করা না হয়।

সাদ্দাম কি তাতে রাজী হবেন? প্রকৃতপক্ষে, আমরা তা জানি না। ১৯৯১ সালের জানুয়ারির শুরুতে ইরাক, সুস্পষ্টতই, আঞ্চলিক পর্যায়ে অস্ত্র হ্রাসকরণের সমঝোতার শর্তে কুয়েত থেকে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দিয়েছিল, যে প্রস্তাবটিকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচনাযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু আমরা এসম্পর্কে আর কিছুই জানি না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোরূপ সাড়া না দিয়েই এটা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং প্রেস এসম্পর্কে কার্যত কোনো রিপোর্টই করেনি। এটা অবশ্য বেশ আগ্রহোদ্দীপক যে সেই-সময় – বোমাবর্ষণের

ঠিক আগে – একটি জরিপে মার্কিন জনগণ ২-১ অনুপাতে সাদ্দাম স্পষ্টতই যে প্রস্তাব করেছিল তার পক্ষে রায় দেয়; বোমাবর্ষণের তুলনায়। জনগণকে যদি সকল কিছু জানার সুযোগ দেয়া হতো তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনেক বেশি হতো। রাষ্ট্রীয় সহিংসতার লক্ষ্য পূরণে তথ্যগোপন করাটা বিপুল সাহায্য করেছিল। ঐধরনের আলাপ-আলোচনা কোন লক্ষ্যে নিয়ে যায়? কেবল উন্মত্ত ভাববাদীই আস্থাবান হতে পারেন। এধরনের চিন্তাভাবনা কি পুনরায় শুরু করা যায়? একই উত্তর। সমাধান পাওয়ার একটা উপায় হলো চেষ্টা করে যাওয়া।

> ৪। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সম্ভাবনাকে ভিন্নভাবে বিচার করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে; কেননা নিরাপত্তা পরিষদের ৬৮৭ নং প্রস্তাবের আওতায়, যাতে সাদ্দাম হোসেন সম্মত হয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে কুয়েত দখল করার গর্হিত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ইরাককে নিরস্ত্র করার কথা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রতিরুদ্ধ করা কি সঙ্গত? এই যুক্তি যদি গ্রহণ করা হয়, যেভাবে বলা হলো সেভাবেই, তবে আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের কী হবে। এই প্রস্তাবের কি উন্নততর যুক্তি ও পদ্ধতি সম্বলিত কোনো ভিন্ন ভাষ্য আছে এবং তার কী গুরুত্ব রয়েছে?

৬৮৭ নং অনুচ্ছেদের অন্যান্য ধারাও আছে; সেগুলোই বরং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

কুয়েত দখল করাটা ছিল সাদ্দাম হোসেনের অপরাধগুলোর মধ্যে কম গুরুতর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব আধিপত্যাধীন এলাকায় করা অপরাধের তুলনায় এটা বিশেষ আলাদা কিছু ছিল না। কয়েক মাস আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পানামায় অভিযানের পক্ষে ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্য কোনো অজুহাতও ছিল না। কিন্তু প্রধান যে-পার্থক্য সেটা হলো, অভিযানের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ নিন্দা প্রস্তাব নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে ভেটো দিতে পারে; ল্যাটিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে করা নিন্দাবাদকে (যে-সম্পর্কে প্রায় কোনো রিপোর্টই করা হয়নি) তোয়াক্কা না করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে, সে যা চায় সেটা-ই করতে পারে। এই একই কারণে নির্যাসিত ইতিহাস থেকে এসব ঘটনা সরিয়ে ফেলা হয়। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কিত ছিল যে সাদ্দাম হয়তোবা পানামা-অভিযান অনুকরণ করতে চাইবে এবং সেজন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করে সেটা রোধ করতে। ঐ অঞ্চলেই অপরাধ হিসেবে কুয়েত দখল মার্কিন মদদপুষ্ট ইসরাইল কর্তৃক লেবানন অভিযানের তুল্য নয়– যাতে ২০,০০০ লোক মারা যায়। এর চেয়ে আরও অসংখ্য গুরুতর খারাপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরাও সম্ভব। আর সেগুলো সম্পর্কে আমরা সবাই জানি।

আর তাছাড়া এসব যুক্তি এক অর্থে অবান্তর। যারা বিশ্বাস করে যে নিরাপত্তা পরিষদের এক দশক আগে নেয়া প্রস্তাবে (যাতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি) পরোক্ষভাবে অভিযান পরিচালনার অধিকার দেয়া হয়েছে, সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব যে তারা এই দাবির ব্যাপারে খুব আন্তরিক: তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানাতে পারে নিরাপত্তা পরিষদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত সমরশক্তি প্রয়োগের অনুমোদন নিতে। যা বিষয়টির সমাধান করবে। অনুমোদন সম্ভবত অর্জন করাও সম্ভব; কিন্তু ভেটো প্রদানটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এধরনের অনুমোদনের তোয়াক্কা করে না, অন্তত এই মুহূর্তে। আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় যেমনটি তারা অনুমোদনের তোয়াক্কা করেনি, যদিও সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, অনুমোদন দেয়া হতো। এসব কারণেই এধরনের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। বাস্তবে "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়" বলতে বুঝায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য যারা তার সাথে থাকতে চায় তাদেরকে।

আরও সার্বিকভাবে অস্ত্র-বিস্তার-রোধ-চুক্তি, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি এবং ৬৮৭

অনুচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করা অনেক বেশি অর্থ বহন করে। এবং সেই অনুযায়ী সারা বিশ্বকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তরিক তৎপরতা নেয়া দরকার। কিন্তু এধরনের যেকোনো পদক্ষেপ নিতে গেলেই দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি; যা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, যদি-না এক্ষেত্রে ব্যাপক বদল ঘটে।

৫। ইতোপূর্বের অস্ত্র পরিদর্শন থেকে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে পরিদর্শকদেরকে বোকা বানানো যায়, তাদের কাজকে বিলম্বিত করা যায় এবং অন্যভাবে তাদের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা যায়? এমন কি কোনো কার্যকরী পরিদর্শন-পদ্ধতি বা প্রাসঙ্গিক নীতিমালা আছে যা সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব?

নিশ্চয় তাদের বোকা বানানো সম্ভব। তবু ইরাকের সামরিক সামর্থ্য ধ্বংস করতে বোমাবর্ষণের তুলনায় অস্ত্র-পরিদর্শন অনেক বেশি কার্যকরী ছিল এবং এযাবৎ সফল হয়েছিল। একধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করা যায়, শেষ কবে ইসরাইলের পারমাণবিক এবং (সম্ভাব্য) রাসায়নিক অস্ত্র সুবিধাদির বেলায় আন্তর্জাতিক কোনো পরিদর্শন করা হয়েছিল? কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের? পরিদর্শন-প্রশাসন গড়ে তোলা দরকার এবং তা বিশ্বজনীন করে তোলা দরকার। কিন্তু আবারও বলতে হয়, এক্ষেত্রেও দরকার মার্কিন সম্মতির।

৬। ইরাকের ওপর সম্প্রতি কংগ্রেসীয় শুনানীকালে একজন সাক্ষী বলেন যে, অস্ত্র-পরিদর্শন সত্যিকার অর্থেই সফল হতে হলে দরকার হবে একটি ঝটিকা সামরিক-দল, যাতে করে অগ্রহণযোগ্য তৎপরতা চলছে এমন স্থাপনাগুলোতে পরিদর্শকদের আকস্মিক অভিযানকে সাদ্দাম হোসেন ব্যাহত করতে না পারেন। সাক্ষীদাতা বলেন, ইরাক কোনোভাবেই এতে রাজী হবে না, কিন্তু এরকম একটা সেনাদল দাবি করার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উচ্চ নৈতিক ভিত্তি অর্জন করবে। কার্যকর পরিদর্শন-প্রশাসনের জন্য এরকম সেনাদল কি খুবই প্রয়োজনীয় অংশ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি উচ্চ নৈতিক ভিত্তি অর্জন করবে? যুক্তিসঙ্গত উপায়ে অন্য কী দাবি অন্যরা করতে পারে আমাদের কাছে?

উদ্দেশ্যটা কি প্রচারণা চালানো (উচ্চ নৈতিক ভিত্তি অর্জন করা)? নাকি, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের হুমকি কমিয়ে আনা? দ্বিতীয়টি যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এমন প্রস্তাব আমরা বাতিল করে দিতে পারি। নানান অসঙ্গতি সত্ত্বেও অস্ত্র-পরিদর্শন খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্কট রিটারের সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বের দাবিদার এবং এখন পর্যন্ত কাউকে তা অস্বীকার করতে দেখিনি আমি। যারা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের হুমকি কমিয়ে আনতে চায় তারা সেহেতু অর্থপূর্ণ পরিদর্শনের পরিবেশ তৈরি করবে, যেমনটি বলা হয়েছে ৬৮৭ নং ও পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলোতে এবং যেগুলো প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়-সমর্থিত। কয়েক বছর ধরে এ ধরনের তৎপরতা বাধাগ্রস্ত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। অস্ত্র-পরিদর্শনকে ইরাকের ওপর গোয়েন্দাগিরি চালানোর ছদ্মাবরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল ইরাকী শাসকগোষ্ঠী অপসারণ করা এবং সম্ভবত সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করা। এধরনের তৎপরতা একেবারে প্রাথমিক নীতি লংঘন করার সাথে সাথে অস্ত্র-পরিদর্শন প্রশাসনকে দুর্বল করে দেয় এবং ইরাকের অস্ত্র-পরিদর্শন প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার সম্ভাবনাকে বিপুলভাবে হ্রাস করে দেয়। ইসরাইল কি রাজী হবে হামাসের গোয়েন্দা দ্বারা তার সামরিক স্থাপনা পরিদর্শনে? ১৯৮৮ সালে ক্লিন্টন পরিদর্শকদের প্রত্যাহার করে নেন বোমাবর্ষণের প্রস্তুতি হিসেবে– প্রচারণা তৎপরতায় এ-ঘটনাকে এমনভাবে বিনির্মাণ করা হয় যে ইরাক পরিদর্শককে বহিষ্কার করেছে।

মার্কিন-ইংল্যান্ডের বোমাবর্ষণের সময়কাল এমন সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে করে তা নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত্র-পরিদর্শনের ওপর আয়োজিত জরুরি মিটিংয়ের সময়ের সাথে মিলে যায়, যাতে জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পায়। তারপর থেকে, ওয়াশিংটন জোরাজোরি করছে যে, ইরাক যদি খুব অনাকাঙ্ক্ষিত মার্কিন গোয়েন্দা-

পরিদর্শনদলকে গ্রহণ করতেও স্বীকার করে, যারা অভিযান চালানোর পথ পরিষ্কার করতে তৎপর থাকে, তাহলেও কিছু এসে যায় না। ডিক চেনির সাম্প্রতিক ভাষ্য অনুযায়ী, "পরিদর্শকদের পরিদর্শনকাজে ফিরে যাওয়াটাই জাতিসংঘের রেজুল্যুশনের প্রতি তার (সাদ্দাম) আনুগত্যকে নিশ্চিত করে না"। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যাতে ইরাক পরিদর্শকদের গ্রহণ করতে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। রিপোর্ট করা হয়েছে, কোনোরকম রাখঢাক না-রেখেই, জাতিসংঘের রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংগঠনের অত্যন্ত সম্মানিত ডাইরেক্টর জোসে বাসতানিকে ওয়াশিংটন কর্তৃক অপসারণ করতে বাধ্য করার একটি কারণ ছিল এই যে, তিনি ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র পরিদর্শনের আয়োজন করতে চেষ্টা করেছিলেন, অর্থাৎ ওয়াশিংটনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র পরিদর্শন বাধাগ্রস্ত করার পরিকল্পনায় নাক গলিয়েছিলেন। এই ভণ্ডামী বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, আধিপত্যশীল ধারার ভাষ্যকাররা উল্লেখ করেছেন, শেষ মুহূর্তে বাস্তবায়ন প্রটোকলে স্বাক্ষর না করে বুশ প্রশাসন জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশনকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে। এর কারণ, অংশত অস্ত্র চুক্তির প্রতি মার্কিন বিরোধিতা, অংশত মার্কিন কর্পোরেশনগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং সম্ভবত, মার্কিন সরকারের নিজস্ব চুক্তি লংঘনের ঘটনা যেন বেশি পরিমাণে প্রকাশ না পায় সেজন্য (তবু, কিছু তথ্য ইতোমধ্যে ফাঁস হয়েছে)।

সুতরাং প্রথম প্রশ্নে আমরা ফিরে যাই: অস্ত্র পরিদর্শন ত্বরান্বিত করা নাকি বাধাগ্রস্ত করাটা উদ্দেশ্য? ইতোপূর্বে উল্লেখিত সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, বাধাগ্রস্ত করতেই চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং, এবিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেয়ার দরকার নেই। বিপরীতদিকে, পরিদর্শন-কার্যক্রমকে গতিশীল করা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইরাকের সাথে সাথে মার্কিন সরকারের তৎপরতাকেও বিচারে নেয়া দরকার।

সংক্ষেপে বলা যায়, গণবিধ্বংসী অস্ত্র কর্মসূচি পৃথিবীকে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা করে তুলেছে, বিশেষত সাদ্দামের কর্মসূচি। এবং এই সমস্যাটার এমনভাবে মোকাবিলা করা দরকার যাতে পৃথিবীটা নিরাপদ হয়ে ওঠে। সবচেয়ে ভাল পদক্ষেপ হলো সার্বজনীন তৎপরতা নেয়া: এমন চুক্তি হবে যার নীতিমালাগুলো অর্থপূর্ণ এবং সার্বজনীন পরিদর্শন কর্মসূচি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। এর বিকল্প পদ্ধতি হতে পারে আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ। কিন্তু এ দু-ধরনের প্রচেষ্টার জন্যই দরকার মার্কিন সম্মতির, যার সম্ভাবনা, অন্তত এই মুহূর্তে, সুদূরপরাহত। বিবেকবান মানুষদের এই পরিস্থিতি বদলাতে চেষ্টা করা উচিত। এরও পরবর্তী ভাল উপায় হলো অন্তত ইরাকে পরিদর্শক দল পাঠানো। প্রতিটি প্রচেষ্টা নিতে হবে অস্ত্রের হুমকি নিরসনের জন্য – অন্তত যারা এই হুমকি কমিয়ে আনতে চায় তাদের, যুদ্ধ বাধানোর অজুহাত খোঁজার জন্য নয়। সবচেয়ে কদাকার উপায় হবে পরিদর্শকদের ইরাক যাওয়াটা রুদ্ধ করা, যেমনটি করা হয়েছে বলে এইমাত্র উল্লেখ করলাম। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন পলিসি নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে যাতে অভিযান চালানোর পরিস্থিতি তৈরি করা যায়। মার্কিন পরিকল্পিত আক্রমণ বহু বছর ধরে বহু পরিশ্রমে গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিগুলোর মৌল কাঠামোকে আরেকবার আঘাত হানবে, যেগুলোকে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বে সহিংসতার ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য, যে-সহিংসতা আতঙ্কজনক প্রভাব বয়ে আনে। অন্যান্য প্রভাবের বাইরেও আক্রমণ চালালে, তা উত্তরসূরী ইরাকী সরকারসহ অন্যান্য দেশকেও গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরিতে উৎসাহিত করবে এবং রাশিয়া, ভারত এবং চীনসহ অন্যান্য দেশকে প্রচলিত বিধান লঙ্ঘন করে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য হাসিল করতে উৎসাহিত করবে।

৭। কখনো বলা হয় যে, অনিবার্য পরিণতি জানার পরও সাদ্দাম হোসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা (আরও

বাস্তবসম্মতভাবে) ইসরাইলে পারমাণবিক হামলা চালানোর মতো উন্মাদ হয়ে উঠবে না। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রশালী ইরাক কি দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ওপর, স্বভাবসুলভভাবে হামলা চালাতে পারে যা কিনা, যখন সে জানে যে তার হামলার শিকার দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (কিংবা এমনকি জাতিসংঘের কাছেও) সাহায্য চেয়ে সফল হবে না, কারণ ওয়াশিংটন তেল আবিবে পারমাণবিক হামলার ভয়ে শঙ্কিত হবে?

সকল প্রকার উদ্ভট সম্ভাবনার কথাই কল্পনা করা যায়। গণবিধ্বংসী অস্ত্র উদ্ভাবনের পর থেকেই এসকল ভাবনা অনেক মানুষকে নিয়োজিত করার সুযোগ করে দিয়েছে র‍্যান্ড ও অন্যান্য চিন্তা-শালায় (think tank)। এরকম ঘটনা যে ঘটবে তা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর একটি কারণ হলো যে, প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে না। পরিস্থিতি থেকে ধরে নেয়া যায়, সাদ্দাম হোসেন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তুলে ধরেছে যে তার কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এবং সেগুলো ব্যবহারের সামর্থ্যও তার আছে। অন্যথায়, এধরনের অস্ত্র আদৌ কোনো হুমকি বা ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু যদি কখনো এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে তাহলে অন্য কোনো দেশে হামলা করার আগেই তাকে উৎখাত করা হবে। ধরা যাক, খেলাচ্ছলে আমরা অযৌক্তিকভাবেই আন্দাজ করলাম যে, অন্য কোনো দেশে অভিযান চালানোর অগ্রবর্তী ধাপ হিসেবে সাদ্দাম সম্ভাব্য হুমকি দেয়ার জন্য নিজেকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রে সজ্জিত করলো কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল নীরব ভূমিকা পালন করলো। কিন্তু তারপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল ইরাকী অভিযানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেবে, সাদ্দামকে উৎখাত করবে (এবং সম্ভবত ইরাককে ধ্বংস করবে)। তার গণবিধ্বংসী অস্ত্র আসলে আদৌ কোনো হুমকি হয়ে উঠবে না। এর যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো অভিযানে সফল হলে তাকে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনতে হবে। তদুপরি এটা ধরে নেয়া যায় যে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের যতোটুকু সামর্থ্যই তার থাক না কেন তিনি সেগুলো ব্যবহার করবেন না কারণ তা হবে তাৎক্ষণিক আত্মহত্যার সামিল। আর তিনি যদি আত্মহননের পথই বেছে নেন তবে অন্য কোনো দেশ দখল করার আগেই ইসরাইলের (বা অন্য কোনো দেশের) ওপর গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োগ করতেন। এরকম পরিস্থিতির গ্রহণযোগ্যতা এতই ক্ষীণ যে বাস্তব সমস্যার তুলনায় এগুলোকে বিবেচনায় আনা একেবারেই অর্থহীন। প্রিয় কল্পনাগুলোর সাথে বাস্তব সমস্যা গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

কেউ যদি কল্পিত খেলা খেলতেই চায় তবে আরও বাস্তবসম্মত পরিস্থিতির কথাই ধরুক না কেন। এখানে সেরকম একটার কথা বলি। ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নীতি বদলালো এবং আন্তর্জাতিকভাবে সর্বসম্মত দু'রাষ্ট্র ভিত্তিক ইসরাইল-প্যালেস্টাইন মীমাংসার প্রস্তাবের সাথে যোগ দিল। ধরুন, আরব লীগ কর্তৃক গৃহীত সৌদি আরব প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন দিল। ধরুন, ইসরাইল প্রতিক্রিয়া জানালো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিয়ে, বোমা বর্ষণের হুমকি নয়, বরং অন্য কোনো উপায়ে। যেমন, ধরা যাক ইসরাইল সৌদি তেল-ক্ষেত্রগুলোতে বোমারু বিমান পাঠালো (হতে পারে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত, কিন্তু তারও দরকার নেই) শুধু এই সতর্কবাণী দিতে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারও যদি তার সাথে না-থাকতে চায় তবে বিশ্বের কী ধ্বংস সে ডেকে আনতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বিলম্ব ঘটে যাবে, কারণ ইসরাইল তৎক্ষণাৎই তার সতর্কবাণী বাস্তবায়ন করে বসতে পারে। এরকম দৃশ্যকল্প অনেক বেশি বাস্তবসম্মত কারণ ২০ বছর আগে সুস্পষ্ট এরকম ঘটনাই ঘটেছিল; যখন সৌদি আরব অনুরূপ একটা পরিকল্পনা উপস্থাপন করলে ইসরাইল তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করে। ইসরাইলী প্রেসের খবর অনুযায়ী, ইসরাইল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল তেল-ক্ষেত্রে বোমারু বিমান পাঠিয়ে; কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ রিগ্যান

প্রশাসন ইসরাইলের সাথে যোগ দিয়ে সেই রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল– সচরার যেমনটি করে থাকে। সত্যি যে, ইসরাইল হয়তো নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে। কিন্তু যে-কেউই যুক্তি দিতে পারে যে ইসরাইলের কৌশল সেই সম্ভাবনার পথকেই সুগম করে দেয়। অনেক দিন আগে, সেই ১৯৫০-র দশকে, সেসময়ের শাসকদল লেবার পার্টির নেতৃবৃন্দ পরামর্শ দিয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের দাবি-দাওয়ার সাথে সহমত পোষণ না করে তবে ইসরাইলের কর্তব্য হবে "ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা" এবং তারপর থেকেই "স্যামসন গূঢ়ৈষা" পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান হয়ে রয়েছে– কতোটা গুরুতরভাবে তা অবশ্য আমরা জানি না। সুতরাং কোনোরকম শয়তানী চক্রান্ত বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়ার আগেই আমাদের উচিত এখনই ইসরাইলকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া।

আমি কি এর কোনোটাতে বিশ্বাস করি? অবশ্যই না। অবশ্য ইরাকের দৃশ্যপটের সাথে এর তুলনা খুব একটা বিসদৃশ নয়।

এটা যোগ করা দরকার যে, সাদ্দামের সামর্থ্য আছে এমন অনুমানের ওপর ভর করে বলা যায় পরিস্থিতি সাপেক্ষে সাদ্দাম গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন। যদি সুস্পষ্টভাবে দখলের উদ্দেশ্যে কিংবা সাদ্দামকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইরাকে অভিযান চালানো হয় তবে নিজেকে সর্বস্বান্ত করার সকলরকম প্রেরণাই তিনি পেয়ে যাবেন, কারণ তার তো হারানোর কিছু নেই। এর বাইরে অন্য যে-কোনোরকম পরিস্থিতি কল্পনা করাই কঠিন।

৮। ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতি ইরাকী জনগণ কীরকম প্রতিক্রিয়া জানাবে? মার্কিন যুদ্ধের কারণে মানবিক ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পড়বে?

কারোরই কোনো ধারণা নেই। ডোনাল্ড রামসফিল্ডের নয়, আমার নয়, কারোরই নয়। কেউ এমন পুলকানন্দময় দৃশ্যকল্প কল্পনা করতে পারে যে: কয়েকটি বোমা পড়লো, তাতে রিপাবলিকান গার্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং সাদ্দামকে উৎখাত করলো, মার্কিন সৈন্যরা মার্চ করে এগোতে থাকলো আর জনতা উল্লসিত হয়ে উঠলো, ব্যান্ডে বাজতে থাকলো "আল্লাহ আমেরিকার মঙ্গল করুন", ঐ অঞ্চলের জনগণ এমন মুক্তিদাতাকে প্রশংসা করলো যে তারা এগিয়ে এসেছে ইরাকে মার্কিন আদলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং দেশটি ঐ অঞ্চলের আধুনিকায়ন কেন্দ্ররূপে রূপান্তরিত করতে– এবং এই রাষ্ট্রটিই পর্যাপ্ত তেল সরবরাহ করবে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত স্তরে মূল্যসীমা রাখা যায়, ওপেক-এর দূর্গ ধ্বংস করে। আর সান্তা ক্লজ তার স্লেজ গাড়ীতে বসে প্রসন্ন হাসি হাসবেন। কেউ অতি সহজেই বরং অতি নির্মম পরিণতির কথাও কল্পনা করতে পারেন। সেটাই ব্যাপক সহিংস পদক্ষেপ নেয়ার স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক ফলাফল এবং সেকারণেই এরকম পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষে যারা সাফাই গাইছেন তাদেরকে এর যৌক্তিকতা প্রমাণের দায় বহন করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, না রামসফেল্ড না চেনি কিংবা অন্য কোনো বুদ্ধিজীবী, যারা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন, কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণের দায় স্বীকার করেছেন।

৯। সম্ভাব্য এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী বলে আপনার মনে হয়?

প্রেক্ষাপটমূলক অনেক কারণ আছে, যেগুলো সকলেরই জানা। ইরাকের রয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল-ভাণ্ডার। সকল সময়ই এমন সম্ভাবনা ছিল যে আজ হোক কাল হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিপুল সম্পদকে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণে নিতে চেষ্টা করবে। আর এখন এর অর্থ হলো অন্য সুবিধাভোগীদেরকে বঞ্চিত করে সম্পূর্ণভাবে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে নেয়া। ১১ই সেপ্টেম্বর "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে" যুদ্ধের অজুহাতে এই লক্ষ্য হাসিলের নতুন সুযোগ করে দিয়েছে – অজুহাত

হিসেবে এটা খুবই ঠুনকো, কিন্তু সম্ভবত প্রচারণা চালানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট। পরিকল্পিত এই যুদ্ধ তাৎক্ষণিক দেশীয় চাহিদাও পূরণ করবে। এটা আর কোনো গোপনীয় বিষয় নয় যে, বুশ প্রশাসন সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে – যাদেরকে বুশ প্রশাসন এমনভাবে সেবা করে থাকে যে সাধারণ মানদণ্ডের স্তরও অতিক্রম করে যায় – সাধারণ জনগণ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আঘাত হানছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, ঘাটতি, পরিবেশ ধ্বংসকরণ, নতুন অস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা আক্ষরিক অর্থেই জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে এবং এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দীর্ঘ তালিকা থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়াটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। এর জন্য পুরনো ও নির্ভরযোগ্য কৌশল হলো জনগণকে আতঙ্কিত করে তোলা। খ্যাতিমান মার্কিন ব্যঙ্গরচয়িতা এইচ এল ম্যানিকিন একবার বলেছিলেন, "প্র্যাকটিক্যাল পলিটিক্সের সর্বাত্মক লক্ষ্যই হলো জনগণকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা (এবং তার ফলে শোরগোলকারীদের নিরাপদে রাখা) সীমাহীন কুৎসিত শয়তানের ভীতি দেখিয়ে যার সবটুকুই কল্পনাসৃজিত।" প্রকৃতপক্ষে, জাগিয়ে তোলা এই আতঙ্ক কদাচিৎই কল্পনাপ্রসূত, যদিও সেগুলো সচরাচর যুক্তিশীলতার সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। "প্র্যাকটিক্যাল পলিটিক্সের" ইতিহাসের বৃহদাংশ এরকমই, আর শুধু এদেশেই নয়। খুব বেশি দক্ষতার দরকার হয় না সাদ্দাম হোসেনকে এমন প্রবল শয়তানী শক্তির ইমেজ দাঁড় করাতে, যিনি পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন, এমনকি মহাবিশ্বকে। আর জনগণ যখন ভয়ে-আতঙ্কে বিশৃঙ্খল জড়োসড়ো হয়ে যায় তখন আমাদের অকুতোভয় সৈন্যবাহিনী অলৌকিকভাবে এই শত্রু-ভয়ঙ্করকে পরাজিত করবে, পরাজিত করতে গিয়ে তাদের প্রতি কী করা হবে সেদিকে জনগণ হয়তো মনোযোগই দেবে না এবং এমনকি খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগ দিয়ে আমাদের নেতাদের প্রশংসা করতে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা এতই প্রবল যে পরিস্থিতি যদি খারাপের দিকেও যায় তবু বিপুল পরিমাণেই এমন ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকবে। আর রাস্তায় রাস্তায় যদি জনতার বিক্ষোভ দেখা যায় তবে সেটাকেও অতল স্মৃতি-গহ্বরে সমাধিস্থ করে দেয়া সম্ভব কিংবা অন্য কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া সম্ভব কিংবা আমাদের অন্ধ বিশ্বাস গড়ে তোলা সম্ভব যে অন্যরাও আমাদের মতোই অমায়িক। এটা খুবই সহজ: অভিজ্ঞতার বিশাল ভাণ্ডার আছে যা থেকে দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব।

১০। যুদ্ধের কিছু কিছু প্রবক্তা এমন পরামর্শ দিয়েছেন যে বামপন্থীরা যেমনটি বলেন তেমনই যদি ভয়াবহ হয় ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধের প্রভাব তবে যুদ্ধ, যদি সে যুদ্ধে ১০০,০০০ সাধারণ নাগরিকও মারা যায়, হবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ, আন্দাজ করা যায়, মার্কিন বিজয়ের পর আর কোনো অবরোধ থাকবে না। এই যুক্তির প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন?

অতীতে আমি অনেক নির্বোধ যুক্তি শুনেছি, কিন্তু এটা নিশ্চয় সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। আমার আন্দাজ এই যুক্তি দেখানো হয়েছে কথার কথা হিসেবে। "বামপন্থী" ধারণাটি কী বোঝাচ্ছে প্রথমে লক্ষ করা যাক: জাতিসংঘের মানবাধিকার সমন্বয়কারী (ডেনিস হেলিডে, হেনস জন স্পোনেক) অন্য যে কারো চেয়ে, এমনকি ইউনিসেফ ইত্যাদির চেয়েও, দেশটি সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল। এটা অনেকটা এরকম বলা যে, বামরা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন – এবং আমাদেরকে বলে তারা কোথায় যারা "দাবিটি" সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে নিজেদেরকে রাজনৈতিক আঙ্গিনায় নিয়ে আসে।

তবে এর বাইরে, এধরনের যুক্তির অন্য আবেদনও আছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইরানকে সাহায্য করার প্রস্তাব করতে পারি ইসরাইল জয় করতে এবং উপযুক্ত "শাসকগোষ্ঠী" প্রতিষ্ঠা করতে, তাহলে আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীরা বিরত হবে। যেহেতু যুদ্ধের প্রস্তাবকরা

সন্দেহাতীতভাবেই আত্মঘাতী বোমাকে নৃশংস বিবেচনা করে, তাদের উচিত এমন আহ্বান জানানো। কিংবা, আমরা রাশিয়াকে সাহায্য করতে পারি চেচনিয়াকে ধূলোর সাথে গুড়িয়ে দিতে, তাহলে চেচেনদের আর রাশিয়ানদের সন্ত্রাস ও নৃশংসতার শিকার হতে হবে না। এরূপ সম্ভাবনা সীমাহীন।

১১। মধ্যপ্রাচ্যে এবং পৃথিবীর অন্য অংশেও যুদ্ধের কী প্রভাব পড়বে? মার্কিন এলিটরা কি কিছু কেয়ার করে?

এলিটরা অবশ্যই কেয়ার করে, যদিও সম্প্রতি যে-ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ক্ষমতার লাগাম দখল করে আছে তারা খুব একটা কেয়ার করছে না। তারা স্পষ্টতই বিশ্বাস করে, তাদের অধীনে এত বিপুল ক্ষমতা আছে যে অন্যরা কী ভাবছে না ভাবছে তা আসলেই কোনো অর্থ বহন করে না: তারা যদি সাথে এগিয়ে না আসে তবে তারা বিচ্যুত হবে কিংবা বিরোধিতা করতে থাকে তবে গুড়ো হয়ে যাবে। শীর্ষস্থানীয়দের চিন্তার ধরন খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করা হয় যখন সৌদি আরবের প্রিন্স আব্দুল্লাহ গত এপ্রিলে মার্কিন প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানায় ইসরাইলী সন্ত্রাস ও নির্যাতনের প্রতি দৃঢ় মার্কিন সমর্থন নিয়ে আরব বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তার প্রতি মনোযোগ দিতে। প্রত্যুত্তরে তাকে বলা হলো, সে কিংবা অন্যান্য আরবরা কী ভাবছে তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটুও কেয়ার করে না। একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করে বললেন, "সে যদি বোঝে যে আমরা ডেজার্ট স্টর্মে শক্তিশালী ছিলাম, তবে তার এটাও বোঝা দরকার যে, সে-তুলনায় এখন আমরা দশ গুণ বেশি শক্তিশালী। আফগানিস্তানে আমাদের সামর্থ্যের যে প্রমাণ সে-সম্পর্কে তাকে কিছু ধারণা দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।" একজন সিনিয়র-প্রতিরক্ষা-বিশ্লেষক খুব সরল ব্যাখ্যা দিলেন: তারা "আমাদেরকে সমঝে চলবে আমাদের দৃঢ়তার কারণে এবং আমাদের সাথে লাগতে আসবে না"। এরকম অবস্থান নেয়ার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে, উল্লেখ করা অবান্তর। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর উত্তর বিশ্বে এমন অবস্থান আরও শক্তিমত্তা অর্জন করছে। তারা কি ঠিক মুল্যায়ন করছে? হতে পারে। কিংবা হতে পারে যে তাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব ফুঁসে উঠবে, কূটনৈতিক ভাষায় যেমনটি বলা হয় হয়তো তেমন একটা "শালীন বিরতির" পর। আবারও বলতে হয়, বড় মাপের সহিংসতার আশ্রয় নেয়া খুবই অনিশ্চিত প্রভাব বয়ে আনতে পারে, ইতিহাসে তাই দেখা যায় এবং আমাদের কাণ্ডজ্ঞানও তাই বলে। আর একারণে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষজন এটা এড়িয়ে চলেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের বেলায় কিংবা আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতেও, যদি না "সামরিক শক্তি প্রয়োগের রুগ্ন আকাঙ্ক্ষাকে বাধাগ্রস্ত" করার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি দেখানো যায় (রিগ্যানপন্থী বুদ্ধিজীবী নরম্যান পোধরেজ এর বাক্যাংশ ধার করা যা গোয়েবলস এর কথারই শব্দান্তর মাত্র)।

১২। ক্রিস্টোফার হিচেন্স্ উল্লেখ করেছেন যে, সৌদি আরব, স্কোক্রাফট এবং কিসিঞ্জার ইরাকের সাথে যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করছে ঐ অঞ্চলের ওপর অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে বলে, কিন্তু বামদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রগুলোর স্থিতিশীলতা নিয়ে কেয়ার করা উচিত নয়। এটা কি সচরাচর শোনা যুদ্ধ বিরোধী অবস্থানকে খারিজ করে দেয়?

কী বুঝাতে চাচ্ছেন তা কল্পনা করা দুরূহ। বামপন্থীরা সবসময় তেজোদ্দীপ্তভাবে "মধ্যপ্রাচ্যের দুর্নীতিপরায়ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি" মার্কিন মদদের বিরুদ্ধতা করেছে এবং অবশ্যই ভাল কিছু একটার জন্য "অস্থিতিশীলতাকে" স্বাগত জানাবে। অন্যদিকে, "অস্থিতিশীলতা" যদি আরও খারাপ চক্রকে ক্ষমতায় আনে – ধরুন, হিচেন্স্ যাকে বলছেন "ইসলামী মৌলবাদ" – তবে বামপন্থীরা তার বিরোধিতা করবে, এবং আমি আশা করি তিনিও।

তাই যদি হয় তাহলে তিনি কী বলতে চাচ্ছেন?

আমি জানি না কীভাবে সচরাচর, শোনা যাক বা না যাক, এধরনের বিবেচনা “যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান” হিসেবে বিবেচিত হয় অন্তত বামপন্থীদের দিক থেকে। স্ক্রোক্রাফট এবং কিসিঞ্জারের মনে যা আছে তা সম্ভবত ভিন্ন কিছু।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি : ইরাক

নরম্যান সলোমন

বাগদাদ, হেমন্ত ২০০২: দণ্ডিত নগরী

তরজমা: আ–আল মামুন

ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক এ্যকুউরেসির স্পনসরশীপে একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল মধ্য-সেপ্টেম্বরে বাগদাদে যায়। নরম্যান সলোমন এ প্রতিনিধি-দলে ছিলেন। এ-লেখাটি সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০২-এ লেখা। **মানুষ**-এর কাজের শেষ পর্যায়ে আমরা ইরাক, প্যালেস্টাইন, বালী ও কেনিয়া প্রসঙ্গে কিছু লেখা দেয়ার চেষ্টা করি। সেই সুবাদে তাড়াহুড়া করে চালানো সংগ্রহ-অনুবাদ-অভিযানের অংশ হিসাবে এটা আমরা সংগ্রহ করেছি www.alternet.org থেকে।

বাগদাদ: ইরাকের উপ-প্রধানমন্ত্রী তারিক আজিজ যখন ইরাকের দিকে ওয়াশিংটনের সযত্নে বাগিয়ে ধরা ঘুষির বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন তিনি সেটাকে বর্ণনা করলেন এভাবে: "দণ্ডিত হবে যদি রাজী হও, দণ্ডিত হবে যদি রাজী না হও তবুও"।

এ-প্রসঙ্গে আজিজের নিকট যুক্তিতর্ক হাজির করা দুষ্কর এবং আমি সে-চেষ্টা করলামও না। তার বদলে, এই বাগদাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এক মিটিংয়ে একটি ক্ষুদ্র মার্কিন প্রতিনিধিদলের অন্যান্যদের সাথে যোগ দিলাম– যারা যুক্তি দেখালো যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোর আতঙ্কজনক ঘটনাপ্রবাহকে হয়তো বদলানো যেতো যদি – প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে – ইরাক নিঃশর্তভাবে পরিদর্শনের অনুমোদন দিতো।

যদিও এর মাত্র দুদিন পরই ইরাক ঠিক এই কাজটি করারই অবিস্মরণীয় সিদ্ধান্ত নেয়, আমি আজ রাতেই খুবই বিষাদমাখা মনে বাগদাদ ছেড়ে চলে যাব। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরাকের রাজধানী থেকে আসা খবরগুলো যদিও ইতিবাচক, তবু, ক্যাপিটাল হিলের শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্রাটদের মাঝে যুদ্ধোন্মাদনার মাত্রা গভীর ও প্রবল হয়েছে।

ঘুষি খেয়ে ইরাকের সরকার অস্ত্র-পরিদর্শনের শর্ত মেনে নিয়েছে, মন্দের ভাল পছন্দ হিসেবে। যুদ্ধ এড়ানোর ঝামেলাগুলো পরিমাপ করে ইরাক বিশাল ঝুঁকিবহুল পদক্ষেপ নিলো– এ-সিদ্ধান্ত যদিও একেবারে কোনো বিকল্প না-থাকার চেয়ে ভাল, তবু ইরাক নিজেই নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে গেল। বেশ কয়েকবছর আগে ওয়াশিংটন UNCSOM পরিদর্শকদলকে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করেছিল, যা ছিল সম্পূর্ণভাবে জাতিসংঘ পরিদর্শক দলের মিশনের বৈধতা বহির্ভূত। এই হেমন্তে দেশটির চারপাশে ঘুরঘুর করছে নতুন পরিদর্শকদলগুলো যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে মূল্যবান তথ্যাদি তুলে দিতে পারবে, যার ফলে পরবর্তী সামরিক হামলাগুলোর সাফল্য আরও বেড়ে যাবে।

বিশ্লেষণী ক্ষমতাশালী আজিজকে হামলা এড়ানোর উপায় হিসেবে অস্ত্র-পরিদর্শনকে মেনে নিতে একেবারেই উৎসাহী মনে হলো না। এবং আমাদের প্রতিনিধিদলকে বললেন– যার মধ্যে ছিলেন রিপাবলিকান সদস্য নিক রাহাল এবং প্রাক্তন সিনেটর জেমস আবরেজ– দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য একটি সর্বাত্মক "ফর্মুলা" দরকার।

আন্দাজ করা যায় এই ফর্মুলার মধ্যে থাকতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন না চালানোর অঙ্গীকার এবং অবরোধ প্রত্যাহার। এরকম কোনো ফর্মুলা অবশ্য এখনও দৃষ্টিগোচর নয়। এর পরিবর্তে বরং হোয়াইট হাউস একটি বীভৎস যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রয়েছে। এদিকে সিনেটে ডেমোক্র্যাটিক দলের "শীর্ষনেতারা", কাপুরোষিত রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ মেলাতে তৎপর, সংঘবদ্ধ হচ্ছে নিজেদের হাত বিপুল পরিমাণ রক্তে রঞ্জিত করতে।

আমি চাই টম ব্যাসেল একবার সাত বছর বয়সী লিউকোমিয়া আক্রান্ত সেই মেয়েটিকে দেখে আসুন, কয়েকদিন আগেই যাকে আমি বাগদাদের একটি হাসপাতালে দেখেছিলাম। তিনি হয়তো কয়েকটি সিনেটরীয় মুহূর্ত ব্যয় করবেন মেয়েটির কব্জির সাথে লাগানো আই.ভি (শিরার মধ্যে প্রবিষ্টকারী এক-ধরনের ইনজেকশন), তার ঠোঁট থেকে গড়িয়ে-পড়া অনিয়ন্ত্রিত রক্তধারা এবং খালি ম্যাট্রেসের ওপর বেদনার্ত কালোচোখে বসে থাকা তার মায়ের দিকে তাকিয়ে। বছরের পর বছর ধরে আরোপিত অবরোধ যার সমর্থক ওয়াশিংটনস্থ নৈতিকতার ধ্বজাধারীরা, ইরাককে পর্যাপ্ত কেমোথেরাপী ওষুধপত্রশূন্য করেছে।

এখন আমরা একটা রেজুল্যুশনের কথা শুনতে পাচ্ছি– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এর বিরুদ্ধে অবস্থান না নিলে– যা সংসদ ও সিনেট অনুমোদন দেবে ইরাকের ওপর ব্যাপকভিত্তিক সামরিক হামলা চালাতে।

আমি যেন সিনেটর ওয়েনি মোর্সের বেদনাদায়ক ও ক্রান্তদর্শী উচ্চারণ শুনতে পাচ্ছি, যিনি গাল্ফ অব টনকিং রেজুল্যুশনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন ৩৮ বছর আগে, গর্জন করে বলেছিলেন, "আমি জানি না কেন আমরা ভাবি যে, যেহেতু আমরা ক্ষমতাধর, সেহেতু আমাদের অধিকার আছে ন্যায়ের বিকল্প হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ-চেষ্টার।"

তারেক আজিজের অফিস ত্যাগ করার পর আমাদের প্রতিনিধিদল ইরাকের ন্যাশনাল এ্যাসেম্বেলির স্পিকার সাদউন হামাদির সাথে সাক্ষাৎ করে। তিনি বললেন, "আমাদের দেশটি এখন যুদ্ধের হুমকির মুখে"। "আমাদেরকে সেজন্য প্রস্তুত হতে হবে।"

হামাদি একজন বয়স্ক মানুষ। যদিও তার শারীরিক অবস্থা এখন খুবই ভঙ্গুর, তার মনটা দৃঢ় এবং উচ্চারণ ঋজু। মার্কিন আক্রমণকারীরা যদি আসে, হামাদি বললেন, "ইরাকী জনগণ লড়বে"। এই শব্দগুলো বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকলো, লিকলিকে বৃদ্ধ মানুষটি একটু বিরতি দিলেন, তারপর যোগ করলেন, "আমিও লড়ব"। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমি যেন তার চোখের জ্যোতি নিভে আসতে দেখলাম যেনবা নিভু নিভু অগ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ।

মৃত্যুর তুমুল নৃত্যের এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকল গুরুতর পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এবং বাগদাদের আকাশে আবার নতুন বিভীষিকার পূর্বাভাস: তলহীন আর অ-নিবারণযোগ্য।

ইরাকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ছায়া যখন নিকট দিগন্তে আভাষিত তখন মার্কিন

জনগণকে কী করতে হবে, যদি তারা এই গণহত্যা রোধ করতে চায় যখন কিনা তাদেরই নামে এবং তাদেরই ট্যাক্সের পয়সায় এটা করা হচ্ছে? একটা কথা হলো, তারা ... মানে আমরা ... সোচ্চার হতে পারি। এখনই। ভীষণ যে বাধাবিপত্তিগুলো তা আমাদেরকে আরও সৃজনশীল তৎপরতায় সক্রিয় করে তোলা উচিত, আরও অনুভূতিহীন অক্রিয়তার দিকে ঠেলে দেয়া নয়। আলবেয়ার কামু লিখেছেন, "এবং এরপর থেকে একমাত্র সম্মানজনক পথ হবে ভীষণ জুয়ায় সবকিছু নাড়িয়ে দেয়া: কেননা গোলাবারুদের চেয়ে শব্দ অধিক শক্তিশালী"।

অনুবাদকের টীকা

গাল্ফ অব টনকিং বা টনকিং একটা উপসাগর। এর তীরে ভিয়েতনাম অবস্থিত। ভিয়েতনামী টর্পেডো দুটো মার্কিন ডেস্ট্রয়ারে আঘাত করলে পরে ১৯৬৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসে গাল্ফ অব টনকিং প্রস্তাব নেয়া হয়, যাতে ভিয়েতনামে মার্কিন উপস্থিতি বাড়ানোর কথা বলা হয়।

মাইকেল প্যারেন্টি

ইরাককে আক্রমণের কারণ

তরজমা: ফাহমিদুল হক

এখানে অনূদিত ইরাকে সম্ভাব্য মার্কিন হামলা বিষয়ে প্যারেন্টির এই নিবন্ধটা (“To Kill Iraq: The Reasons Why”) ইন্টারনেটের প্যারেন্টি-আর্কাইভে জানুয়ারি ২০০৩-এ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটির উৎস হলো: http://www.michaelparenti.org/ IRAQGeorge2.htm

অক্টোবর ২০০২-এ হাউসে ও সিনেটে বেশ কয়েকদিনের বিতর্কের পরে মার্কিন কংগ্রেস প্রায়-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বুশের কাতারে সামিল হয়; তাকে ইতোমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ ইরাকের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালানোর ম্যান্ডেট দেয়া হয়। কংগ্রেসে বক্তৃতাগুলোও হয় তার স্বভাবগত কাপুরুষতার মধ্য দিয়ে। অনেক সিনেটর ও প্রতিনিধিবর্গ যারা প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করেছেন তারাও প্রায় একই আচরণই করেন। তারা কষ্ট করে জানান: তারাও কী পরিমাণে সাদ্দাম হোসেনকে ঘৃণা করেন, প্রেসিডেন্টের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে তারাও কতখানি একমত; তারা এও জানান ইরাককে নিয়ে কীভাবে কিছু একটা করা যায়– কিন্তু এখনই নয়, ঠিক এভাবে নয়। তো এই হলো কংগ্রেস: এতো বেশি রাজনৈতিক কথাবার্তা এখানে হয়, কিন্তু আলোচনার জায়গা কত কম! কিছু সদস্য অবশ্য এরকম প্রশ্ন তোলার সাহস করেছিলেন যে, এসব করে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত কী দাঁড়াবে তা পরীক্ষা করা হয় নি; আর কোন রাষ্ট্রের টিকে থাকা উচিত ও কোন রাষ্ট্রের বিনাশ হওয়া দরকার– এই সিদ্ধান্ত নেবার সাম্রাজ্যবাদী অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের আছে কিনা, সেব্যাপারেও তারা প্রশ্ন তুলেছিলেন। খুব সামান্য কয়েকজন, অবশ্য যদি আদৌ কেউ থেকে থাকেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে, উদ্ধত মার্কিন প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু যুদ্ধাপরাধ করেছে যা মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন।

যুদ্ধের পূর্বকথন

বুশ এবং তার সরকারের সদস্যরা ইরাকের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’-কে (এটা ঠিক যুদ্ধ নয়, একপাক্ষিক গণহত্যার আয়োজন) জায়েজ করার জন্য নানা কিসিমের বিশ্বাস-অযোগ্য কারণ দেখিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের ও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এই যুদ্ধ দরকারী; কারণ ইরাক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞে সক্ষম

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

নিউক্লিয়ার মিসাইলসহ নানা ধরনের মারণাস্ত্র তৈরি করছে। কিন্তু জাতিসংঘের পরিদর্শক দল এব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছে যে ইরাকের সেধরনের নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা নেই।

এটা সত্যি যে ইরাকের একসময় রাসায়নিক ও ব্যাকটেরীয় অস্ত্র তৈরীর কারখানা ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধী কে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সাদ্দাম হোসেনকে এধরনের বস্তু সরবরাহ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র-ইরাকের এই পূর্ব-সখ্যের এটা অন্যতম একটি তথ্য যা করপোরেট মিডিয়া সবসময়ই গোপন করে এসেছে। সে যাই হোক, জাতিসংঘের পরিদর্শক-প্রতিবেদন ইরাকের পামাণবিক অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছে। এরপরও বুশীয়রা ইরাকের বিপজ্জনক 'ক্ষমতা' সম্পর্কে বকে যাচ্ছেন। এসোসিয়েট প্রেস এর একটি রিপোর্টে (২ নভেম্বর, ২০০২) পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি জন বোল্টন বলেছিলেন যে "ইরাক যদি যথার্থ প্রযুক্তি পায় তবে এক বছরের মধ্যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে সমর্থ হবে"। যদি যথার্থ প্রযুক্তি পায়? এর অর্থ কী? এই উক্তির সত্যতা সবার নজর এড়িয়ে গেল। যদি "যথার্থ প্রযুক্তি পায়", তবে জিবুতি, কাতার এবং নিউ জার্সি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে সমর্থ হবে।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর জুড়ে হোয়াইট হাউস এটা স্পষ্টভাবে বলেছে যে যদি ইরাকের মারণাস্ত্র থাকে তবে তাকে আক্রমণ করা হবে। এরপর নভেম্বর ২০০২-এ বুশ ঘোষণা করেন, সাদ্দাম যদি তার মারণাস্ত্র থাকার কথা অস্বীকার করে তবে তাকে আক্রমণ করা হবে। তাহলে কী দাঁড়ালো? যদি ইরাক স্বীকার করে যে তার ঐ ধরনের অস্ত্র আছে, তাহলে দেশটিতে বোমা হামলা হবে; আর যদি তা থাকার কথা অস্বীকার করে তাহলেও, অস্ত্র থাকুক বা না থাকুক, বোমা হামলা হবেই।

বুশীয়রা ইরাককে এই বলেও অভিযুক্ত করেছে যে আল-কায়েদা-সন্ত্রাসীদের দেশটি প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোই জানিয়েছিল যে ইসলামী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ইরাকের সংশ্লিষ্টতা নেই। হাউস কমিটির একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বারবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে মার্কিন জনগণের জন্য সাদ্দাম হোসেন বড়ো কোনো হুমকি কিনা, তারা সম্মিলিতভাবে জানিয়েছিলেন যে তাদের কাছে সেরকম কোনো প্রমাণ নেই (সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২)। সত্যি বলতে গেলে বলতে হয়, লাদেন-পরিবারের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের চাইতে বুশ-পরিবার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। মার্কিন নেতারা কীভাবে তাদের ভূখণ্ডে সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা অনুমোদন করেন সেব্যাপারে কেউ প্রশ্ন তোলেন না। কিউবান যাত্রীবাহী বিমানকে ধ্বংস করার অভিযোগে অভিযুক্ত অরলান্ডো বোশ মিয়ামিতে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়।

বুশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করার চেষ্টা করেন: সাদ্দাম যুদ্ধা-পরাধী এবং আগ্রাসী। তিনি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন ও বহু কুর্দিকে হত্যা করেছেন। কিন্তু পেন্টাগনের নিজস্ব গবেষণায় দেখা গেছে যে মালাহ্জায় কুর্দিদের হত্যার সঙ্গে ইরান জড়িত ছিল, ইরাক নয়। (টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২) আরেকটি সত্য খুব কমই উচ্চারিত হয়: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন নেতারাই ইরাককে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং সামরিক সহায়তা প্রদান করেছেন। আর যুদ্ধাপরাধ ও আগ্রাসনই যদি ইস্যু হয়ে থাকে তবে গ্রানাডা ও পানামায় মার্কিন আগ্রাসনকেও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, নিকারাগুয়া, এল সালভেদর, গুয়াতেমালা, যুগোস্লাভিয়া এবং অন্য অনেক দেশে লাখ লাখ বেসামরিক লোককে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড যে প্রত্যক্ষ মার্কিন প্ররোচনা ও প্রশ্রয়ে হয়েছিল, সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। বিগত দু-দশকে কোনো সমাজতন্ত্রী বা কোনো 'সন্ত্রাসী' রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্য কোনো দেশের ওপরে এরকম ভয়ংকর আগ্রাসনের কোনো

রেকর্ড পাওয়া যাবে না।

যুদ্ধের পূর্বকথন হিসেবে এইসব ফাঁপা বুলির পরে বুশপন্থীরা চূড়ান্ত যে-কারণটি দেখাচ্ছেন তা হলো, সাদ্দাম একজন স্বৈরাচারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে থাকে, তাই ইরাকে শাসনক্ষমতা পরিবর্তন আনতে মার্কিন নেতাদের বলপ্রয়োগ ও সহিংসতা সৃষ্টি ছাড়া আর কোনো উপায় থাকছে না। এই যুক্তির বিরুদ্ধেও আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি। সাদ্দাম যে স্বৈরাচারী এবিষয়ে দ্বিমত করার অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি এবং তার সহযোগীরা ক্ষমতায় কীভাবে এলেন? বাথ পার্টির ভেতরে সাদ্দামের রক্ষণশীল অংশটিকে সিআইএ দীর্ঘ সময় জুড়ে সমর্থন দিয়ে এসেছে। তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ইরাকের গণঅভ্যুত্থানকে ধ্বংস করার, প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী প্রগতিশীল ব্যক্তিকে নির্মূল করার এবং তারা এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনও করেছিল। তারা বাথ পার্টির প্রগতিশীল অংশটিকেও ধ্বংস করেছিল। মার্কিন মিডিয়া এই সত্যটিকেও স্মৃতির অতল গহ্বরে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠান্ডা লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাদ্দাম ছিলেন ওয়াশিংটনের পোস্টার-সাঁটানো-বালক।

তাই দ্বিতীয় জর্জ কেন তার বাপের মতো ইরাককে টার্গেট করেছেন? যখন লোকে একটি বিশেষ কাজের পেছনের কারণ হিসেবে নতুন নতুন ও বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দিতে থাকে, তখন তারা মিথ্যা কথাই বলে। রাজনৈতিক নেতা ও নীতিনির্ধারকরা তাই করছেন। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে যুদ্ধকে জায়েজ করার জন্য যে-কারণগুলো দেখানো হচ্ছে, তা দেখে কেউ কেউ মনে করছেন প্রশাসন অপ্রকৃতিস্থ অথবা ‘পাগল’। কিন্তু যেহেতু তারা জনগণকে বিপথে চালিত করছেন ও তাদের মধ্যে দ্বিধার জন্ম দিচ্ছেন, তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তারা নিজেরা কিন্তু বিপথগামী বা দ্বিধাগ্রস্ত নয়। বরং এটা এমন হতে পারে যে, প্রকৃত কারণগুলোকে তারা জনগণের সামনে আনতে ও বিতর্কের জন্য ছেড়ে দিতে চান না। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন নীতি ধনী ও ক্ষমতাবানদের স্বার্থকে সিদ্ধ করে। এই স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে আমেরিকান জনগণের ও এই ধরিত্রীর প্রত্যেকটি মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের প্রকৃত কারণ আমি যা মনে করি তা এখানে উপস্থাপন করছি।

বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে মাতব্বরী

বুশ প্রশাসনের নীতিনির্ধারণের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ড. স্ট্রেঞ্জলাভস-এর মতে এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী মার্কিন উচ্চাসন বহাল রাখা। এ কেবল নিজের ক্ষমতাকে জাহির করার ব্যাপার নয়। এ হলো বিশ্বে ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত করা, উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের সব স্থানের জনগণের বারোটা বাজিয়ে অবাধ ‘মুক্তবাজার’-কর্পোরেট-পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই লড়াই হলো দুই পক্ষের মধ্যে; যেখানে এক পক্ষ মনে করে বিশ্বের ভূমি, শ্রম, পুঁজি, প্রযুক্তি ও বাজার কিছু লোকের পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে ব্যবহৃত হবে; আরেক পক্ষ মনে করে এই বিষয়গুলো বহুর সম্প্রদায়গত লাভালাভ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে।

লক্ষ্যটি কেবল এরকম বৈশ্বিক পুঁজিবাদের উচ্চাসন বজায় রাখা নয়, বরং মার্কিনীদের বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে বহাল-তবিয়তে রাখার লক্ষ্য। এবং এজন্য সম্ভাব্য কোনো পরাশক্তির উত্থানকে এবং একই কারণে কোনো আঞ্চলিক শক্তির উত্থানকে রদ করাই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে ইরাক একটি কেস। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে তেল আছে কিন্তু জল নেই। আবার কারও কারও জল আছে কিন্তু তেল নেই। ইরাক হলো একমাত্র দেশ যার উভয় সম্পদই বিপুল পরিমাণে আছে, এবং সঙ্গে আছে কৃষির একটি ভালো ভিত্তি– যদিও ১৯৯১ সালের

উপসাগরীয় যুদ্ধে বোমাবর্ষণের কারণে উর্বর কৃষিযোগ্যভূমি ইউরেনিয়াম দ্বারা দূষিত হয়ে পড়েছে।

একসময় ইরাকের তেলক্ষেত্রসমূহ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন, ব্রিটিশ ও অন্যান্য দেশের কোম্পানির মালিকানায় ছিল। ১৯৫৮ সালে ইরাকে একটি জনঅভ্যুত্থান হয়। দশ বছর পরে বাথ পার্টির ডানপন্থী অংশ সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে, এখানে সাদ্দাম সিআইএ-এর পছন্দের লোক হিসেবে কর্মকুশলতা দেখান। তার কাজ ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঠেকানো, যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে নিকারাগুয়ার সোমোজা, চিলির পিনোচেট, পেরুর ফুজিমোরার এবং অন্য অনেকের মতো পশ্চিমা বিনিয়োগকারীদের মুৎসুদ্দি-দালালরূপে কাজ করেন নি। তিনি ১৯৭২ সালে ইরাকী তেলশিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করেন, পশ্চিমা মুনাফাখোরদের তেলশিল্প থেকে সরিয়ে দেন এবং জনগণের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালের মধ্যে ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ জীবনযাত্রার দেশ হিসেবে পরিণত হয় (যদিও তা বলার মতো এমন বেশি কিছু নয়)। এটা প্রমাণিত হয় যে ১৯৫৮ সালের বিপ্লবের ফলাফলকে সুদূরে ঠেলে দেবার পরও যুক্তরাষ্ট্র তা থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারে নি। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও কয়েক দশকের অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবী একটা ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্র পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন আর সহ্য করা যাবে না। যুগোস্লাভিয়া ইউরোপে একটি 'খারাপ' উদাহরণ সৃষ্টি করে এবং মধ্যপ্রাচ্যে অন্যান্য দেশের কাছেও ইরাক খারাপ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ওয়াশিংটনের ধনিকরা যে-জিনিসটা একেবারেই চান না, সেটা হলো মধ্যপ্রাচ্যে এমন কোনো আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্রের উদ্ভব হোক যে নিজের ভূমি, শ্রম, ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে নিজেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়।

মার্কিন অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রতিযোগিতামূলক যেকোনো পরিবেশকে বারংবার দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিউবা, ইরাক ও যুগোস্লাভিয়ার মতো আত্মসচেতন দেশগুলোকে এজন্য টার্গেট করা হয়েছে। যুগোস্লাভিয়ার কথাই ধরুন। সে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে ও ন্যাটোতে যোগ দিতে আগ্রহী ছিল না। এর একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতি ছিল। যুগোস্লাভিয়ার শতকরা ৮০ ভাগ জিনিস ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের নামে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে দেশটিকে খণ্ডিত করার ও ক্ষয়িত করার যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটির অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস করা হয় এবং দরিদ্র ক্ষমতাহীন ডানপন্থী কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। এই দেশগুলোর অর্থনীতিকে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে, সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়েছে এবং বিনিয়োগের আদর্শ পরিবেশের বরাত দিয়ে পশ্চিমা কর্পোরেটদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। খুব সম্প্রতি সার্বিয়াতে এরকম ঘটনাই ঘটেছে। সবকিছু জলের দরে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মানবিক সেবা, চাকুরী ও পেনশন ভাতা অন্ত র্হিত হচ্ছে। বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্র্য হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে; তেমনি বেড়ে যাচ্ছে অপরাধ, গৃহহীনের সংখ্যা, পতিতালয়ের সংখ্যা ও আত্মহত্যার পরিমাণ। সার্বিয়ার মুক্ত বাজার স্বর্গরাজ্যে স্বাগতম!

সার্বিয়া, বসনিয়া, মেসেডোনিয়া, পানামা, গ্রানাডা ও অন্যদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, আমরা অনুমান করতে পারি মার্কিন আগ্রাসনের পরে ইরাকের ভাগ্যেও একই বিপদ রয়েছে: ক্ষমতায় ইরাকের একটি পুতুল সরকার বসানো হবে, এমন একজনকে সরকারপ্রধান করা হবে যে টনি

ব্লেয়ারের মতো হোয়াইট হাউসের প্রতিটি নির্দেশে আনুগত্য প্রদর্শন করবে। ইরাকের রাষ্ট্রীয় মিডিয়াকে ধনী ও রক্ষণশীল বেসরকারী কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেয়া হবে এবং তা তখন 'অবাধ ও স্বাধীন' মিডিয়ায় পরিণত হবে। মার্কিন বৈদেশিক নীতির ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির মৃদুতম সমালোচককে কায়দামতো বঞ্চিত করা হবে। রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলগুলো মার্কিন উৎস দ্বারা বহুল অর্থপ্রাপ্তির মাধ্যমে, যদি কোনো বামপন্থী গোষ্ঠী থেকে থাকে, তাকে দমন করবে। এই অসম খেলার মাঠে, মার্কিন উপদেষ্টারা মার্কিন-ধাঁচের 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' অনুষ্ঠিত করবেন, সম্ভবত যেখানে ফ্লোরিডা ও অন্যান্য অংশের মতো গ্রহণযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। ইরাকী অর্থনীতির বেসরকারীকরণ করা হবে, জলের দরে সব ছেড়ে দেয়া হবে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা অনতিক্রম্য উচ্চতায় পৌঁছবে। বৈদেশিক অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে ইরাক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়বে। অন্যের শিকার হবার খেসারত এভাবেই তাকে দিতে হবে। সরকারী সেবাখাত সংকুচিত হয়ে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াবে। ইরাকের আজকে বিপদগ্রস্ত, আগামী দিনেও দুর্ভোগের পরিমাণ এভাবে বেড়ে যাবে। আমাদের এটা বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে যে ইরাকী জনগণ মুক্ত বাজারের স্বর্গে পৌঁছার জন্য আরেকবার ব্যাপক বোমা হামলার শিকার হতে রাজি আছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন

ইরাককে টার্গেট করার আরেকটি কারণকে এক শব্দে বর্ণনা করা যায়: তেল। সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে যুক্তরাষ্ট্র নিকট অতীতের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠননীতিই গ্রহণ করেছে। হোয়াইট হাউসের বর্তমান প্রশাসন তেলমানবদের দ্বারা অলংকৃত। তারা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম ইরাকের তেলসম্পদের মজুদ নিয়ে চিন্তিত। ব্যারেল প্রতি ২৫ ডলার হারে ১১৩ বিলিয়ন ডলারের ইরাকী সরবরাহের মূল্য দাঁড়ায় ২.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু তার একটি ফোঁটাও মার্কিন তেলজোটের জন্য নয়; ইরাকী তেলক্ষেত্রের সবই রাষ্ট্রীয় মালিকানার। বাগদাদ তেল-অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল, ইটালি ও মালয়শিয়াকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরাক দখল করতে পারে এবং একটি পুতুল সরকার বসাতে পারে, তবে এইসব চুক্তি বাতিল করা সম্ভব হবে। আমরা হয়তো খুব শিগগীরই তৃতীয় বিশ্বে উপনিবেশের ইতিহাসে সবচাইতে বৃহত্তম তেল লুণ্ঠনের দৃশ্য দেখতে পাবো। এই লুণ্ঠন করবে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো এবং এতে মদদ যোগাবে ও সহায়তা দেবে মার্কিন সরকার।

ইরাকী তেল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি কাজ করতে আগ্রহী– সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অপরিশোধিত তেলের অধিক সরবরাহ ও মূল্যহ্রাসের কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য এই তেলকে বাজারের বাইরে রাখা। লন্ডন ফিনান্সিয়াল টাইমসের একটি রিপোর্ট অনুসারে (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮), তেলের মূল্য ব্যাপকভাবে কমে গেছে কারণ হলো জাতিসংঘ ও ইরাকের মধ্যে চুক্তি, যার মাধ্যমে বাগদাদ বিশ্ববাজারে তেল বিক্রি করতে পারবে। *দি সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল*-এর একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮) "ইরাকের তেল পশ্চিমের জন্য হুমকিস্বরূপ"। সত্যি অর্থে ইরাকী অপরিশোধিত তেল 'পশ্চিম'-এর জন্য কোনো হুমকি নয়, হুমকি হলো পশ্চিমা তেলবিনিয়োগকারীদের জন্য। দি ক্রনিকল লেখে: "ইরাক যদি বিশ্ববাজারে আবার অনুপ্রবেশ করতে পারে তবে তা ব্রিটেনের উত্তর-সাগর-তেলের অবমূল্যায়ন ঘটাবে, আমেরিকান তেল উৎপাদনকে পেছনে ফেলে দেবে; সবচাইতে বড়ো কথা, আজারবাইজানসহ ককেশীয় অঞ্চলে ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (পড়ুন: মার্কিন তেলকোম্পানিগুলো) যে মুনাফা পেতে পারে সেই সম্ভাবনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমরা এপ্রসঙ্গের উপসংহার টানতে পারি

এভাবে যে, ইরাকী তেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাগ্রহণ হলো তাকে বিশ্ববাজার থেকে সরিয়ে রাখার সবচাইতে নিশ্চিত পন্থা এবং যখন তেলের দাম ভালো পাওয়া যাবে তখন এই তেল বিক্রি করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হবে।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফায়দা লোটা

যুদ্ধ ও সহিংসতা জর্জ ডব্লিউ বুশের খুব প্রিয়। ২০০১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার গ্রহণযোগ্যতা দারুণভাবে কমে যাচ্ছিল। এরপর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপরে হামলা হলো, দ্রুত সন্ত্রাসের-বিরুদ্ধে-যুদ্ধ শুরু হলো এবং ব্যাপক বোমাবর্ষণের মাধ্যমে আফগানিস্তানে আক্রমণ করা হলো। বুশের গ্রহণযোগ্যতা হু হু করে বাড়তে থাকে। কিন্তু এর পরপরই ২০০২ সালে এনরন, ওয়ার্ল্ডকম, হার্কেন, হেলিবার্টন প্রভৃতি কোম্পানির কর্পোরেট কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট উভয়েরই কর্পোরেট কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। ভুয়া হিসাব দেখানো, মুনাফার মিথ্যে খবরের মাধ্যমে স্টকমূল্য বাড়িয়ে তোলা, আর শেয়ারের দর একেবারে পতিত হবার ঠিক আগ মুহূর্তে মালিকপক্ষের লোকজনের শেয়ার বিক্রি করে দেয়া– এসবই একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে এবং প্রশাসনের অনেকের বিরুদ্ধেই এসব প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইরাকের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের ইস্যুর কারণে কর্পোরেট কেলেঙ্কারীর ইস্যু সংবাদপত্রের প্রথম পাতা থেকে এবং টেলিভিশনের সন্ধ্যাকালীন সংবাদ থেকে হারিয়ে যায়। পিতা বুশ ১৯৯০ সালে একই কাণ্ড করেছিলেন; সঞ্চয় ও ঋণ কেলেঙ্কারীকে মিডিয়া থেকে উধাও করে দেবার জন্য এই একই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধিয়েছিলেন।

যে-রিপাবলিকান পার্টি কেলেঙ্কারীতে জর্জরিত ছিল এবং কর্পোরেটপ্রীতি ও দুর্নীতির জন্য নিন্দিত ছিল, অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে সেই রিপাবলিকান পার্টির দেশপ্রেম, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও দৃঢ় সামরিক নেতৃত্বের দল হিসেবে পুনরুত্থান হয় এবং কংগ্রেসের উভয় কক্ষে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে ও নির্বাচনে জিততে সক্ষম হয়। বহু আমেরিকান পতাকাকে ঘিরে র‍্যালি করে, যেন তারা প্রেসিডেন্টকে ঘিরেই তা করছে। দেশবাসীর মধ্যে অনেকে আছেন যারা দিনমান রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে নিন্দুক ও সন্দেহপ্রবণ থাকেন। কিন্তু একই রাজনীতিবদরা যখন প্রকৃত বা কল্পিত বহিঃশত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার কথা তুললেন, তারা তাদের ওপরে সীমাহীন ও শিশুসুলভ আস্থা প্রদর্শন করলেন।

যুদ্ধের তৎপরতা জনগণকে তার অর্থনৈতিক সমস্যাবিষয়ক চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। অথচ ভালো বাসস্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চাকরি পাবার সম্ভাবনা ঠিকই কমে যাবে এবং মহামন্দার কারণে এথেকে উত্তরণ হবার কোনো লক্ষণও দেখা যাবে না। দ্বিতীয় জর্জ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে স্টক মার্কেটে শতকরা ৩৪ ভাগ দরপতন হয়েছে, বেকারত্ব ৩৫ ভাগ বেড়ে গেছে, রাষ্ট্রীয় উদ্বৃত্ত ২৮১ বিলিয়ন ডলার থেকে এখন ১৫৭ বিলিয়ন ডলার ঘাটতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বাড়তি ১.৫ মিলিয়ন লোক স্বাস্থ্যবীমাবঞ্চিত হয়ে পড়েছে; ফলে স্বাস্থ্যবীমাবঞ্চিতের মোট পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ মিলিয়ন। সাধারণত রক্ষণশীল এজেন্ডায় যুদ্ধকে ইতিবাচক বিবেচনায় আনা হয়। রেকর্ড পরিমাণ সামরিক ব্যয় হয়, প্রতিরক্ষা শিল্পে আর্থিক মুনাফার কথা ভাবা হয়, ঘাটতি রাজস্ব থেকেও খরচের হিড়িক পড়ে যায় যা বিত্তশালী শ্রেণীকে আরও বিত্তবান করে তোলে এবং এসবকিছু হয় সাধারণ করদাতাদের কাছ থেকে বাড়তি কর আদায়ের বিনিময়ে। অভ্যন্তরীণ মানবিক সেবাগুলোকে কমিয়ে দেবার পক্ষে তখন শক্ত শক্ত যুক্তি তৈরী হয়।

উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সবচাইতে বেশি খুশি হন, যখন তারা মৃদু হাসিমাখা মুখে, জর্জ বুশের স্টুপিডিটির বয়ান করতে সক্ষম হন। আমি যা বলার চেষ্টা করেছি, তা হলো বুশ কখনোই বিকারগ্রস্ত বা দিশাহারা নন। শ্রেণীপ্রেক্ষাপটে ও শ্রেণীস্বার্থের বিচারে তার ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোর জোর কারণ রয়েছে। শুধু ইরাক নয়, অন্য দেশের বিরুদ্ধেও তিনি সামনের সময়ে আক্রমণ করবেন। এখন সময় এসেছে তার সারগর্ভ কথামালার ওপর বেশি মনোযোগ না দিয়ে, বরং তার কার্যকর প্রতারণা ও নির্দয় হিংস্ররূপের দিকে আলোকপাত করা। অনেক সুশীল ক্রুসেডার হার স্বীকার করে নিয়ে বসে আছেন, কারণ তাদের শত্রুদের বেহাল বঞ্চনার পরিমাণ কতখানি তা বুঝতে তারা অসমর্থ। আমরা যার বিরুদ্ধে কথা বলছি তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে যত বেশি জানবো, তত তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হবো।

ফরহাদ মজহার

ইরাক-পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশে “মৌলবাদ” আতংকের স্বরূপ

ফরহাদ মজহারের এই লেখাটা একটু পুরানা। **মানুষ**-এর কাজের শেষ পর্যায়ে আমরা আফগানিস্তান, ইরাক, প্যালেস্টাইন, বালী ও কেনিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কিছু লেখা দেয়ার চেষ্টা করি। সেই সুবাদে তাড়াহুড়া করে চালানো সংগ্রহ-অনুবাদ-অভিযানের অংশ হিসাবে ২৯শে মাঘ ১৪০৫ সালের তারিখচিহ্নিত এই লেখাটা ফরহাদের কাছ থেকে জোগাড় করে পাঠিয়েছেন আমাদের বন্ধু রফিকুল ইসলাম। লেখাটা পুরানা হলেও এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে বাংলাদেশ বিষয়ক বিশ্লেষণ যথেষ্ট চিন্তা-উদ্দীপক। **মানুষ**-এ পুনর্মুদ্রিত ফরহাদ মজহারের ‘ক্রুসেড জেহাদ শ্রেণীসংগ্রাম’ লেখাটার সাথে এই লেখাটা মিলিয়ে পড়ার সুযোগ আছে। লেখাটা আদিতে কোথায় ছাপা হয়েছিল সেই তথ্যটা তাড়াহুড়ায় জোগাড় করা যায় নাই।

এডওয়ার্ড সাঈদ বাংলাদেশেও এখন খানিকটা পরিচিত। বিশেষত যাঁরা শিল্প-সাহিত্যের খোঁজ খবর রাখেন, তাঁদের কাছে। তিনি সাহিত্যের মানুষ, কিন্তু সাহিত্যের জন্য তাঁর খ্যাতি নয়। তাঁর খ্যাতি বিশেষভাবে *Oreintalism* বইটির কারণে। বইটিতে তিনি ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর পদ্ধতি যেভাবে অনুসরণ করেছেন সেই বিষয়ে তাঁর বন্ধু মহলেও খানিক সমালোচনা আছে। তবুও বইয়ে প্রাচ্যের প্রতি, বিশেষত আরব জনগণ ও আরব সভ্যতার প্রতি পাশ্চাত্যের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উৎস ও মনোজাগতিক কাঠামোর একটা বিচার তিনি করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন,

> আরব ও মুসলমানদের সম্পর্কে বর্ণবাদী চিন্তার জাল, ছককাটা সাংস্কৃতিক চিন্তা, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং নির্মানবিক ইডিওলজি বাস্তবিকই খুব শক্তিশালী ....।

তাঁর আরেকটি প্রখ্যাত কাজ হচ্ছে ‘Zionism from the Standpoint of Its Victims’। রচনাটি পরে তাঁর *The Question of Palestine* বইতে সংকলিত হয়েছে। ফিলিস্তিন সমস্যা, ইসলাম এবং ইসলাম-প্রধান দেশগুলির প্রতি পাশ্চাত্যের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রাজনৈতিক বিষয়ে এডওয়ার্ড বিস্তর লেখালিখি করেছেন। তাঁর রচনা যদি নিছকই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করতো তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিক বা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

পণ্ডিতী মূলধারায় হয়তো তেমন প্রভাব ফেলতো না। কিন্তু তাঁর পর্যালোচনার পদ্ধতিটা নতুন। একটি সভ্যতা বা একটি জনগোষ্ঠি অন্য সভ্যতা বা "অপর" জনগোষ্ঠিকে কী চোখে দেখে, কীভাবে ভাবে এবং ঐ দেখার মধ্য দিয়ে আপন-পর ভেদ কী করে নির্ণয় করে সেই সকল গোড়ার প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। যে প্রক্রিয়ায় আমরা কাউকে "অপর" জ্ঞান করি, সেই একই প্রক্রিয়া আমাদের আপন পরিচয়টাকেও নির্ণয় করে। সেই প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ায় তৈরি সেই ধারণাগুলোই আবার সামাজিক কর্মকাণ্ড, রাজনীতি, পররাষ্ট্র নীতি ও সাংস্কৃতিক কায়কারবার নিয়ন্ত্রণ করে। প্রশ্নগুলো খুবই মূল্যবান। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বুঝতে হলে গোড়ার এই সকল প্রক্রিয়ার প্রতি নজর দিতে হবে। এডওয়ার্ড সাঈদ সকলের নজর সেদিকে ফেরাতে পেরেছেন। এতে তাঁর একটা খ্যাতিও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ফলে বর্ণবাদ, ঔপনিবেশিকতা এবং সাংস্কৃতিক বা যেকোন আত্মপরিচয়ের লড়াই সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তার পথ আগের চেয়েও অনেক অনেক খোলাসা হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ঘটনা যে কোন সুস্থ মানুষকে উদ্বিগ্ন করে ফেলার জন্য যথেষ্ট। যেমন, বাংলাদেশের নূরুল আবছারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিশাবে গ্রেফতার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এনজিওদের উস্কানির মধ্য দিয়ে একটি জেলাকে তালেবানদের ঘাঁটি হিশাবে প্রমাণ করার চেষ্টা, শামসুর রাহমানের ওপর হামলা এবং হামলাকারীদের হরকাতুল জিহাদ নামক একটি সন্ত্রাসী সংগঠন ও ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে যুক্ত বলে মরীয়া প্রচার এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে ওসামা বিন লাদেনের সৈন্য সংগ্রহের ও প্রশিক্ষণের কাহিনী পরিবেশন ও মাদ্রাসার ওপর নির্বিচারে অত্যাচার ও নির্যাতন, ইত্যাদি। এরই ফাঁকে ঘটেছে কাজী আরেফসহ কুষ্টিয়ার হত্যাকাণ্ড এবং উদীচীর মঞ্চ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া। হত্যাকাণ্ডের মোটিফ কিম্বা হত্যাকারী সম্পর্কে কোন প্রমাণ বা আলামত সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু প্রধান প্রচারণা হচ্ছে এই সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 'মৌলবাদী'-রা জড়িত। যারপরনাই ভীতিকর হোল গণমাধ্যমের ভূমিকা। নূরুল আবছারের ঘটনাই গণমাধ্যমগুলোর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। আবছার গ্রেফতার হওয়ার পরে প্রতিটি সংবাদপত্র তাকে বিশাল শক্তিধর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে বলে খবর ছাপায়। তাঁকে "বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ", "অস্ত্র চোরাচালানকারী" প্রভৃতি বৃহৎ ও মহৎ গুণে ও সম্মানে বিভূষিত করে পত্রপত্রিকা বেধড়ক খবর ছাপতে থাকে। তখন থেকে তালেবান আর ওসামা বিন লাদেনের কেচ্ছাও ফেরি করা শুরু হয়। কিন্তু যখন দ্রুতই ফাঁস হয়ে গেল যে পুরো ব্যাপারটাই বানোয়াট তখন গণমাধ্যমগুলো একবারও তাদের বদমায়েশির জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চায় নি। বরং একই কেচ্ছা শামসুর রাহমানের ওপর হামলার সময় ভিন্ন ভাবে আরো প্রকট ভাবে প্রচার শুরু করে দেয়। বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো তালেবান আর ওসামা বিন লাদেনের রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্র আর সামারিক প্রশিক্ষণের আখড়া বলে রগরগে খবর ছাপার তামাশা শুরু হয়ে যায়। এখন পুরো তৎপরতা মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেবার পাঁয়তারায় এসে ঠেকেছে। তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমাগত সন্ত্রাস চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু তার পরেও সেগুলো বন্ধ করে দেবার কথা ওঠেনি। মনে হোল এই সেই আইয়ামে জাহেলিয়ার কাল যে কালে এডওয়ার্ড সাঈদ আরেকবার পড়লে উপকার হতে পারে। কারণ ইসলাম বা যা-কিছুই ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত – তার প্রতি ঘৃণা, অবিশ্বাস আর সন্দেহ। এই সন্দেহের এই উৎস খুঁজতে হবে ঔপনিবেশিকতা এবং পাশ্চাত্যের বর্ণবাদী সভ্যতার শেকড়ে, গড়নে আর চিন্তার বুনুনির মধ্যে। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আর তথাকথিত "আধুনিক" কিম্বা "প্রগতিবাদী"-র রক্তে বইছে সেই একই বিষ। কারণ এই শ্রেণীর জন্ম

ঔপনিবেশিকতারই ঔরসে। জন্মের দাগ সহজে মুছে ফেলার নয়। সেই একই ঘোরতর ইসলাম-বিদ্বেষ আর প্রাচ্যের সংস্কৃতির প্রতি আমূল ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে চতুর্দিকে।

এডওয়ার্ড সাঈদ সম্প্রতি ইরাকের ইঙ্গ-মার্কিন হামলার ওপর একটি লেখা লিখেছেন। মূল লেখাটি ছাপা হয়েছিল "আল হায়াত" নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায়। একই লেখা কায়রো থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক "আল আহরাম" পত্রিকায় ছাপা হয়। ন্যূইয়র্ক থেকে নাঈম মোহাইমেনের সৌজন্যে "Apocalypse Now" নামক লেখাটি আমার হাতে এসেছে। তাঁকে ধন্যবাদ।

লেখাটি সাঈদ শুরু করেছেন একটা গলদ ধরিয়ে দিয়ে। বলছেন,

> আমি মনে করি এটা ভুল হবে যদি ইরাক আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ঘটনাঘটন একদিকে আরব জনগণের ইচ্ছা আর তাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন আর অন্য দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপার – শুধুমাত্র এই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আমরা ভাবি। তবে নিঃসন্দেহে এই দিকটাই কেন্দ্রীয় ভূমিকা।

পুরো ঘটনার কেন্দ্রে আরব জনগণের সঙ্গে মার্কিন জনগণের লড়াইকে এডওয়ার্ড কেন্দ্রীয় বিষয় বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু এই সরল জায়গায় তাঁর বিশ্লেষণ থেমে থাকে নি। সাদ্দাম হোসেন চালাক, সন্দেহ নেই। অনেকে ধরে নিয়েছে চালাকিটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য পরাশক্তির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করা। আপাত দৃষ্টিতে সেই রকম মনে হলেও সাঈদ এখানে কোন সাফল্য আদতে সাদ্দামের ঘরে জমা হয়েছে মনে করেন না। বরং সাদ্দামের সফলতা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির হ-য-ব-র-ল অবস্থা আর ব্যর্থতাকে কাজে লাগাতে পারা। অন্যদিকে সাদ্দাম হোসেন মার্কিন আগ্রাসনের শিকার – নিজের এই নিরপরাধ ভাবমূর্তিটা সাদ্দাম নিজেও যে বিশ্বাস করেন না সেটাও সাঈদ জোর দিয়েই বলেছেন। ইরাকের জনগণ যে অমানবিক দুর্দশার শিকার তার শর্ত সাদ্দাম নিজেই তৈরি করেছে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্যাণ্ডি বার্গার গর্ব করে বলেছেন, তীব্রতার বিচারে এই অবরোধ এতোই অভূতপূর্ব যে বিশ্ব-ইতিহাসে এমনটি আর কখনো হয় নি। জানা দরকার, অবরোধের ফলে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে এই পর্যন্ত ইরাকের ৫৬৭,০০০ অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাধারণ নাগরিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এতোই এই অবরোধের তীব্রতা।

এই অমানবিক অবরোধে ইরাকী জনগণ – বিশেষত শিশুরা কীভাবে ক্ষুধায়, অসুখে, অপুষ্টিতে, মরছে তার বিস্তর প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যান আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আমি (নভেম্বর ১৯৯৮) লণ্ডন থেকে কিছুদিন আগে প্রকাশিত *New Internationalist* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের কথা বলব। লিখেছেন ফেলিসিটি আরবুথনট (Felicity Arbuthnot)। নিউ ইন্টারনেশানালিস্ট পত্রিকা কোন ইসলামী গ্রুপের পত্রিকা নয়। লণ্ডনের আর্ত সাহায্য সংস্থা OXFAM এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। ফেলিসিটির প্রতিবেদনটির শিরোনাম হচ্ছে Little Poet (ক্ষুদে কবি)। কবির নাম জসিম। কিশোর ইরাকি কবি জসিমের বয়স ১৩ বছর। জসিমের সঙ্গে ফেলিসিটির দেখা বাগদাদের একটি হাসপাতালে। জসিম তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ফেলিসিটি লিখছে,

> জসিম পড়ে আছে, যেন এক তালিকাহীন নাম। হাসপাতাল ওয়ার্ডের সংকীর্ণ পরিসরটা সে দেখছে আয়ত কালো চোখ মেলে। তার অপরিসীম সুন্দর, অথচ ফ্যাকাসে আর কাঁচের মতো স্বচ্ছ ত্বকের বিপরীতে চোখটি যেন আরো বৃহৎ হয়ে গিয়েছে। তার ভারী, কোঁকড়ানো চুলের গোছা চক চক করছে যেন ওগুলো পালিশ করেছে কেউ, এলিয়ে পড়ে আছে তার মুমূর্ষু স্বাস্থ্যের পাশে।

কিশোর কবি জসিম কেন মরছে তার পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফেলিসিটি বলছেন:

ইরাকের প্রাচীন দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বসরা। উপসাগরীয় যুদ্ধে ১৯৯১ সালে ডেসার্ট স্টর্ম অপারেশনের চোখে পড়ে গিয়েছিল এই শহর আর নির্দয় ভাবে এর ওপর বোমা বর্ষিত হয়েছে। এই শহরে শিশু-কিশোরদের ক্যান্সারের হার ছয়গুণ বেড়ে যাবার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষয়ে যাওয়া ইউরোনিয়াম বর্জ্য (Depleted Uranium বা সংক্ষেপে DU)। মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র আর বুলেটগুলো এই বর্জ্য দিয়ে কোটিং করা হয়েছিল। এই মারণাস্ত্রের ফল হোল এই যে বিস্ফোরিত হবার পর এগুলো পুরো দেশে পারমাণবিক ধূলো ছড়িয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরিবেশ নীতি নির্ধারক ইনস্টিটিউটের (US Army Environmental Policy Institute) মতে এই পারমাণবিক ধূলা যদি শরীরে প্রবেশ করে তাহলে মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটায় (significant medical consequences)। হাওয়ার সঙ্গে এই পারমাণবিক ধূলোর অবশেষও ছড়াতে থাকে আরও ৪৫০ কোটি বছর ধরে ধূলোর তেজস্ক্রিয়তা কার্যকর থাকে। পুরো ইরাকে ক্যান্সার মহামারী আকারে ছড়িয়েছে, বসরায় এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বিস্ফোরণের মতো।

জসিম এই ক্যান্সারে আরো অনেক শিশু-কিশোরের মতো হাসপাতালে মরছে। ফেলিসিটিকে যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একজন লেখক হিশাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন জসিম তখন খুশি হয়ে উঠল। তার চোখে মুখে উত্তেজনা। বালিশের তলা থেকে সে তার খসড়া খাতাটি বের করে আনল। খাতার ওপর মিকি মাউসের ছবি। ভেতরে অপূর্ব সুন্দর জসিমের আরবি হস্তাক্ষর। সে যখন বড়ো হবে তখন তার ইচ্ছা সে হবে এক মস্তো বড়ো কবি। ফেলিসিটি বলছেন, "প্রতিভা আর কাব্য শৈলীর দিক থেকে পদ্যগুলো অসাধারণ, তার বয়সের তুলনায় অনেক গভীর অন্ত র্দৃষ্টিতে ভরপুর।" সেই খসড়া খাতা থেকে ফেলিসিটি কিশোর কবি জসিমের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। আমি সেই ইংরেজী থেকেই বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য অনুবাদ করছি। কবিতাটির নাম, "আইডেনটিটি কার্ড" বা পরিচয় পত্র।

নিজের নাম: ভালবাসা
শ্রেণী: প্রাণহীন কক্ষ
ইস্কুল: কষ্ট বিদ্যালয়
প্রশাসনিক অঞ্চল: দুঃখপুর
শহর: দীর্ঘশ্বাস সিটি
রাস্তা: দুর্দশা রোড
টেলিফোন নাম্বার: এক শূণ্য শূণ্য শূণ্য ট্রিপল জিরো হাহাকার।

ভারী সুন্দর কবিতা। নিজের পরিচয় দিচ্ছে কিশোর কবি। ভাল লাগে এমন অনেক উদ্ধৃতিও সে জোগাড় করেছে। যেমন, "জীবন মানুষের আবেগ হিশাবের মধ্যে নেয় না'। কিম্বা, "আমি মওতকে শুধাই তোমার চেয়ে অধিক কি? মওতের চেয়েও অধিক বিরহ হচ্ছে মহব্বতের মানুষগুলোর দুদিকে ছিটকে পড়া'। ফেলিসিটি জসিমের এই পরিণত কাব্যবোধ এবং অসাধারণ প্রতিভা ধেকে বিস্মিত হয়েছিলেন। বাংলা অনুবাদে যতটুকু ধরা পড়ল তাতে পাঠক এই কিশোর কবির মেধা সম্পর্কে খানিক আঁচ করতে সক্ষম হবেন বলে আমার ধারণা। এই হোল তেরো বছর বয়েসি বসরার কিশোর কবি জসিম।

ইরাক থেকে ফিরে গিয়ে ফেলিসিটি জসিম এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে অনেক লিখেছেন। কিন্তু এই জসিমের বেঁচে থাকা না থাকা নির্ভর করছিলো একটি ইউরোপীয় সাহায্য সংস্থা তার জন্য জরুরি ওষুধ দশ দিনের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করার সফলতার ওপর। ফেলিসিটি জসিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর ওপর যা কিছু লিখবেন তা ওকে পাঠাবেন। তার অনেক কবিতা ছাপা হয়েছিল। ইরাকে যাবার সময় কবিতার অনুবাদ ও তার ওপর লেখালিখির ক্লিপিং এক বন্ধুর হাতে দিয়ে যেভাবেই হোক জসিমকে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানান

ফেলিসিটি। বন্ধুটি ফিরে এলে ফেলিসিটি শুধান কেমন আছে কবি জসিম?

না, জসিম লড়েছে ঠিকই, কিন্তু শেষ অবধি হেরে গিয়েছে। জসিমের কাছে লেখাগুলো পৌঁছাবার আগেই জসিম বিদায় নিয়েছে। নিজের কবিতা ছাপার অক্ষরে দেখার সাধ আর তার মিটলো না। ফেলিসিটি মন্তব্য করেছেন,

> জসিম ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধের আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতির একটি পরিসংখ্যানে পর্যবসিত হয়েছে।

এই মৃত্যু একটি সংখ্যা মাত্র বাড়ালো।

ফেলিসিটি আরবুথনটের বলা জসিমের এই কাহিনী বাংলাদেশের পাঠকদের জানানোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেলিসিটির মতো অনেক কর্মী নানান ভাবে পাশ্চাত্যের জনগণের বিবেক জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি এবং ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের নিষ্ঠুর ও অমানবিক দিকগুলো নানান ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হয়েছেন বলা যাবে না। কোন ফল হয়নি। এরপরও অবরোধ তুলে নেওয়া দূরের কথা, ইরাকী জনগণের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন হামলা হয়েছে এবং এখনও হামলা চলছে। নিষ্পাপ ইরাকী শিশুরা মরছে। একটা নীরব হত্যাযজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ইরাকের জনগণের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের যাদের আমরা "শিক্ষিত" মনে করি, যারা পাশ্চাত্যমুখী এবং কথায় কথায় নিজেদের "প্রগতিশীল" প্রমাণ করতে ব্যস্ত, এদের কাউকেই আমি আজ পর্যন্ত এই অমানবিক নীরব হত্যা প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করতে দেখি নি। মনে রাখা দরকার এরাই ঘোর ইসলাম-বিদ্বেষী এবং যেখানে সেখানে তারা ইসলামী মৌলবাদের ছায়া দেখে বেড়ায়। সেই ছায়ার বিরুদ্ধে ডন কিয়োটির মতো ঢাল তলোয়ার নিয়ে তারা সদাই লাফিয়ে পড়ে। আমি সাদ্দাম হোসেনের ব্যাপারে এডওয়ার্ড সাঈদের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত। মানুষটি ভাল নয়, কিন্তু সাদ্দামের অপরাধে নিরীহ ইরাকীদের হত্যা করার কী যুক্তি থাকতে পারে? সাম্প্রতিক ইঙ্গ-মার্কিন হামলাতেও পাশ্চাত্য খুশি নয়। এডওয়ার্ড সাঈদ খবর দিয়েছেন যে, অস্ট্রেলিয়া থেকে গত বছর নভেম্বরের ১৬ তারিখে (রোববার) পত্রপত্রিকায় ফাঁস হয়ে যাওয়া খবরে এটা বোঝা যায় যে ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকি জনগণকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য নিউট্রন বোমা মারার কথাও খুবই গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তাভাবনা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা কী পরিমাণ দানব হতে পারে এটা তারই একটা নজির মাত্র।

প্রশ্ন হোল, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথ কি? তিনি বলেছেন, আরব জাতি ঐক্যবদ্ধ নয়। এই কথাও ঠিক। এখনো ইসলামের ইতিহাস বিভেদ আর রক্তপাতেরই ইতিহাস। তার সঙ্গে আরেকটি সত্য যুক্ত করা যেতে পারে। ইসলামী ধর্মান্দোলন এবং ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয়ের রাজনীতি ইসলামের দার্শনিক বা ভাবগত শক্তির উন্মেষ না ঘটিয়ে তাকে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক খাদে ফেলে দিচ্ছে বারবার। ইসলামের অন্তর্নিহিত দার্শনিক বা রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ধর্মতত্ত্বের খোসা ছড়িয়ে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ভাব, নীতি ও কর্মপরায়নতার উৎস হিশাবে হাজির করার বিবিধ প্রচেষ্টা ইতিহাসের নানান সময়ে নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে সবসময়ই দমন করা হয়েছে। উদাহরণ হিশাবে বলা যায়, শরিয়ত মারেফাতের বিরোধ নিছকই ব্যাখ্যা বর্ণনার তর্ক হয়ে থাকে নি। মনসুর হাল্লাজের মতো সুফিদের আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। এই কালেও দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্ররা যেভাবে মানুষ হত্যা করছে, যাদের অধিকাংশই জসিমের মত কিশোর আর শিশু, তার কি কোন বিহিত হবে না?

যেটা তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হোল আমাদের দেশের পাশ্চাত্যমুখী শ্রেণী, যারা হঠাৎ করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে, এই বিষয়ে তাদের কোন অবস্থান নেই। হয়তো ইরাক অনেক দুরের দেশ ফলে ইরাকী জনগণের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের এই হত্যাযজ্ঞের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। কিন্তু, এই দূরত্ব নিছকই ভৌগোলিক নয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকও বটে। এটাই হচ্ছে আসল কথা। সেই কথাটি বোঝাবার জন্য এই নিবন্ধটি লিখছি এবং এডওয়ার্ড সাঈদকে সাক্ষী মানছি।

বাংলাদেশে ইসলামের ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক প্রকাশ ও ব্যবহার আছে, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। যেমন আছে তার উল্টো পিঠ, শহুরে মধ্যবিত্ত আর ভুয়া প্রগতিবাদীদের পশ্চিমা সভ্যতার গোলামি আর পা-চাটা খাসিলত। কিন্তু যে দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করেছে এবং ধর্মতাত্ত্বিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যে দেশের জনগণের লড়াইয়ের ইতিহাস কয়েক শতাব্দির, যে দেশ ফকির লালন শাহ, দুদ্দু, পাঞ্জু, জালাল উদ্দীন খাঁর দেশ, যে দেশ একই সঙ্গে ন্যায়, ভক্তি, ভাব ও যুক্তির সাধনা করেছে এবং জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণকে পথ দেখিয়েছে সেই দেশের মানুষকে বারবার “মৌলবাদ” নামক জুজুর ভয় দেখানো প্রকট তামাশা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। গোঁড়া ও কুশিক্ষিত মোল্লা যখন ওয়াজ করে, বক্তৃতা হাঁকিয়ে ইসলামের সংকীর্ণ আর সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করে, এই দেশেই তার ঠিক খানিক দূরে মঞ্চ বেঁধে ঢোল, করতাল, হার্মেনিয়াম বাজিয়ে মোল্লাদের মাইক্রোফোনের সমান শক্তিতে বয়াতিরা গান করে, “মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এ মন্ত্রণা কে দিয়াছে/মানুষ ভজ কোরাণ খুঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে”। ধর্মতত্ত্বের খোসা ফেলে দিয়ে ইসলামের ভাব ও দার্শনিকতার অসাম্প্রদায়িক শক্তি এই দেশের মাঠে ঘাটের কবি-শিল্পী বয়াতিরা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। সমাজে যেহেতু শ্রেণী আছে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম আছে তেমনি বিবাদমান শ্রেণীর মতাদর্শিক লড়াইও এই দেশে আছে। কিন্তু “মৌলবাদ” নামক যে জুজু শিক্ষিত শহুরে শ্রেণী তাদের কথাবার্তায় পত্রপত্রিকায় গণমাধ্যমে হাজির করছে – যা এখন উন্মাদের চিৎকারে পরিণত হয়েছে – সেই জুজু কেন এত ভয়ানক হয়ে উঠল তার কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র। “মৌলবাদ” নামক জুজুর ভয় দেখিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চরিত্র এবং আমাদের অর্থনীতি, কৃষিব্যবস্থা, পরিবেশ, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কর্তব্য ও আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক রূপান্তরের প্রশ্নকে আড়াল করা হয়। এই স্রোত এতদিন খুবই শক্তিশালী ছিল। “মৌলবাদ” নামক ছুতা দিয়ে সমাজের উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের বৈষয়িক রূপান্তরের প্রশ্নগুলোকে ক্রমাগত একটা ধোঁয়াশায় রেখে দেওয়ার কেরামতি এতোকাল বেশ ভালই কাজ করেছে। এখন আর করছে না। যে সকল শ্রেণী এই প্রচার থেকে ফায়দা তুলছিল তাদের ভাওতা এখন আর খাটছে না। গরিব কৃষক, মুটে ও খেটে খাওয়া মানুষকে বুঝ দেওয়ার ভণ্ডামি আগে কাজ করেছে, এখন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর বিরোধ আরো বেড়েছে। দ্বন্দ্বের চরিত্র এখন আরো প্রকট ও ফর্শা হয়ে উঠছে। আগে যতো সহজে “মুক্তি যুদ্ধের চেতনা”, “গণতন্ত্র”, “আইনের শাসন” প্রভৃতি আকথা-কুকথা কয়ে সাধারণ মানুষকে বুঝ দেওয়া গিয়েছিল এখন আর সেটা কাজ করছে না। ফলে শাসক ও শোষক শ্রেণীর মধ্যে একটা কৌতুককর ভীতি কাজ করছে। সেই কারণে “মৌলবাদ” নিয়ে উন্মাদ আতংক। পত্রপত্রিকায় নূরুল আবছার, তালেবান, ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যে সকল রগরগে কেচ্ছা কাহিনী ছাপা হয়েছে সেগুলোকে একটা নপুংসক, মেরুদণ্ডহীন, নীতিশূণ্য ও অতিশয় ক্ষয়িষ্ণু একটি শ্রেণীর শেষ আহাজারি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। একদিকে আন্তর্জাতিকভাবে “মৌলবাদ” বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন মাত্র, অন্যদিকে

আভ্যন্তরীন দিক থেকে গরিব ও নিঃস্ব শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের সম্প্রসারণ। খেয়াল করতে হবে যে মাদ্রাসার ওপর হামলা এবং মাদ্রাসাগুলোকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র আখ্যা দেওয়ার একটা বাস্তব শ্রেণীগত দিক আছে। কারণ মাদ্রাসা গরিব ছেলে মেয়েদের শেষ ভরসা। মাদ্রাসা এখনো গরিব, এমনকি এতিম ও দুঃখী সন্তানদের একমাত্র ভরসাস্থল। শাসক ও শোষক শ্রেণী গরিবের শেষ আশ্রয়স্থলগুলোকে ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

মানি, মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের পিছু টেনে ধরে রেখেছে। মাদ্রাসার বিরুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের সকল সমালোচনা যদি মেনেও নেই তবুও প্রশ্ন ওঠে তাহলে আমাদের উচিত সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা। মাদ্রাসা যদি আমাদের পিছু টেনে ধরে রাখে তাহলে ঔপনিবেশিক আধুনিক শিক্ষা আমাদের গোলামে পরিণত করে রেখেছে। আমরা পশ্চাতে পড়ে থাকব, নাকি গোলাম হব, এই বুঝি বিতর্ক? আধুনিক শিক্ষা সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শিক ভিত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে মজবুত করে। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ঔপনিবেশিক শাসন ও গোলামির সম্পর্ককেই স্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী করে। শিক্ষার প্রশ্নটি এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপার হতে পারে না। নিশ্চয়ই স্বাধীন ও ভিন্ন পথ আছে। সেটা ভিন্ন একটি বিতর্ক। শিক্ষা সংক্রান্ত সেই বিতর্ক আমাদের সমাজে হতেই পারে এবং হওয়া খুবই জরুরী। কিন্তু বিতর্কটা সেখানে হচ্ছে না। বলা হচ্ছে "আধুনিক" শিক্ষাই হচ্ছে প্রগতি ও অগ্রসরতার একমাত্র সিঁড়ি। উন্নতি মানে সাহেবদের দুনিয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতার মডেলকে বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করা। মাদ্রাসা শিক্ষার বিপরীতে এই বিপরীত "মৌলবাদ" মেনে নেওয়া যায় না। এই যাবত মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে যাদের লেখা পড়েছি তাঁদের প্রত্যেকের লেখাতেই সেই হাতে-পায়ে-গলায় শেকল বাঁধা অতি চেনা প্রাচীন ও পুরনো দাসত্বের কণ্ঠস্বরই শুনেছি। শিক্ষা সম্পর্কে স্বাধীন ও পর্যালোচনামূলক কোন মন্তব্য শুনি নি।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সবচেয়ে সংবেদনশীল ও আন্তরিক লেখাটি বোধহয় আজকের কাগজে (৯/২/৯৯) আহমদ ছফা লিখেছেন। এই সময়ে, যখন মাদ্রাসাগুলোর ওপর নানান কিসিমের হামলা চলছে, তখন লেখাটি সাহসীও বটে। ছফা বলতে চাইছেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে "যুগোপযোগী" করা দরকার। লিখেছেন, "সব কথার সার কথা হোলো যুগের প্রয়োজন স্বীকার করা।" তবে প্রশ্ন থেকে যায় "যুগের প্রয়োজন" কথাটার মানে কি? কী যুগে, কিম্বা কোন যুগে আমরা বাস করছি? এটাকি সাম্রাজ্যবাদীদের যুগ নয়? যে যুগে জসিমের মতো শিশু-কিশোররা মরছে। যে যুগে পৃথিবীর সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে দুনিয়ার অল্প কিছু মানুষের হাতে। যে যুগে দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা ক্রমশ চলে যাচ্ছে অল্প কিছু বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে এবং তাদের রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে। এই যুগের ভিত্তি কি ঔপনিবেশিকতা, পরদেশ লুণ্ঠন আর জাতিকে পদানত করা নয়? যে যুগ পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পসভ্যতাকে সভ্যতার একমাত্র আদর্শ বলে মানে সেই সভ্যতাই কি আজ পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ ও প্রাণের সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়? তাহলে "যুগের প্রয়োজন" কথাটার কী মানে হতে পারে? যুগের প্রয়োজন হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি অর্জন করা এবং সেই বৈষয়িক, দার্শনিক, ভাবগত এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অর্জন করা যাতে বর্তমান সভ্যতার রূপান্তর সাধন করে আমরা ভিন্ন এক সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারি। বলাবাহুল্য "আধুনিকতা", "আধুনিক শিক্ষা" বা তথাকথিত "আধুনিক সভ্যতা" আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি দেয় না।

আহমদ ছফা মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ চান। তাঁর লেখা পড়ে বুঝলাম, তিনি বলতে চাইছেন মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করতে হবে। তাকে যুগোপযোগী বা আধুনিক করতে হবে।

কিন্তু সেটা করতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের বলে কয়ে, বুঝিয়ে শুনিয়ে, এমন ভাবে যেন তাঁরা রাগ না করেন। আধুনিক আর প্রগতিবাদীদের সঙ্গে ছফার পার্থক্য নেই। শুধু তিনি চান কাজটা যেন হুজুরদের পিঠে হাত বুলিয়ে করা হয়। সেই দিক থেকে সংবেদনশীল ও আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও ছফা শিক্ষা সম্পর্কে নতুন কিছু বলেন নি। মাদ্রাসা শিক্ষার বিপরীতে "আধুনিক" শিক্ষাকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা ঠিক কিনা আমি তাঁকে সেটা ভাবতে অনুরোধ করবো। আধুনিক শিক্ষার ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ভিত্তি ও মতাদর্শিক ভূমিকা সম্পর্কে ছফা সচেতন নিশ্চয়ই। তাহলে কেন "যুগের প্রয়োজন" স্বীকার করে মাদ্রাসা শিক্ষাকেও ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানকাঠামোর অধীনস্থ করার প্রস্তাব তিনি দিচ্ছেন আমার কাছে সেটা পরিষ্কার নয়। আমাদের সন্ধান করতে হবে নতুন পথ। এই বিষয়ে আশা করি তাঁর সঙ্গে আগামি এক সময় আরো তর্ক করা যাবে।

"মৌলবাদ" নামক জুজুর বিরুদ্ধে একটা শ্রেণীর যে উন্মাদ প্রতিক্রিয়া দেখছি তাদের ব্যাপারে রাজনৈতিক ভাবে সাবধান হওয়া এখন বড়ো বেশি দরকার। ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলোকে কেন্দ্র কেরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে মেরুকরণ ঘটছে সেই মেরুকরণে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল মাত্র। ইরাকীদের হত্যা করা, মক্কায় দখলদার মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি এই বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে কোন প্রকার নীতিগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। না করার কারণ তাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলামি ও তাবেদারির খাসিলতের সঙ্গেই জড়িত। এই নীরবতার মানে বুঝতে পারলে এদের ঘোর সাম্প্রদায়িকতার চেহারাটা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বুঝব মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাদের আতংকের সঙ্গে প্রগতিশীল চিন্তার কোনই সম্পর্ক নেই। এই শ্রেণীর মধ্যে যদি কোন প্রতিক্রিয়া না হয় তাহলে এটা ধরে নেবার কোনই কারণ নেই বাংলাদেশের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। বিশেষত গরিব কৃষক, খেটে খাওয়া মুটে মজুর, শ্রমিক। যারা ছিঁটেফোঁটা তথ্য যতোটুকু পায় তার মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনগণের শত্রুমিত্র নির্ণয় করতে জনগণ ভুল করে না। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো মানবিক বোধে জীবন্ত। অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত "আধুনিক" বা "প্রগতিবাদী"-র এখনেই একটা বড়ো পার্থক্য। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ইরাকি জনগণ বা বসনিয়ার হত্যাযজ্ঞ সম্বন্ধে যতোটা খোঁজ রাখে একজন "আধুনিক" মানুষের মধ্যে তার কণামাত্র আবিষ্কার করা মুশকিল। এটা পরিষ্কার দুটো বিষয় বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই সংবেদনশীল ঘটনা এবং একই সঙ্গে তীব্র অপমান ও ক্রোধের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। প্রথমত, যে ভূমিতে মক্কা শরিফ অবস্থিত সেই সৌদী আরবে হানাদার মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত ইরাকী জনগণের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ এবং বসনিয়ার প্রতি পাশ্চাত্য নীতি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মেরুকরণে বাংলাদেশ পড়তে বাধ্য।

বলাবাহুল্য এই সংবেদনশীলতা ও ক্রোধের পেছনে ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করে এবং সেটা মোটেও অস্বাভিক নয়। এই অনুভূতিকে এমন শক্তি ব্যবহার করতেই পারে যারা সত্যি সত্যি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী। যারা জনগণের দুষমন এবং এদের বিরুদ্ধে লড়া আমাদের কর্তব্য। এই লড়াইকে তারা তৃতীয় বিশ্বের জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ও অমানবিক যুদ্ধ হিশাবে হাজির না করে একে মুসলমান বনাম ইহুদি-নাসারার যুদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই সম্ভাবনা আছে বলেই সত্যিকারের প্রগতিশীল কর্মীর আরো অনেক বেশি সতর্ক ও সাবধান থাকা দরকার। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় নিশ্চিত করার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে এটা বারবার প্রমাণ করা যে এই যুদ্ধ মুসলমান বনাম ইহুদি-নাসারার যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার নিপীড়িত ও শোষিত, জাতি, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর যুদ্ধ।

একই সঙ্গে এই যুগের প্রতিটি লড়াই তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিকে প্রশ্নবোধক করে তোলার লড়াইও বটে। যুদ্ধ জয়ের শর্ত হচ্ছে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীগুলোকে একত্রিত করার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানো এবং আগামি সভ্যতার আবির্ভাবের পথ সাফ করবার জন্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্মের নতুন দিগন্তগুলো আরো গভীর ও আরো বৈপ্লবিক আন্তরিকতার সঙ্গে সন্ধান করার সাহস অর্জন করা। জ্ঞান ও ইতিহাসের চলন সরলরেখার মতো নয় যে তাকে দাগ কেটে "পশ্চাতপদতা" ও "প্রগতি" কিম্বা "মৌলবাদ" ও "আধুনিকতা" – এই প্রকার দুই খণ্ডে বিভক্ত করা চলে। আমাদের চিন্তা ও তৎপরতা কোন শ্রেণীর পক্ষে কাজ করছে, কোন শক্তিকে মদদ দিচ্ছে এবং যুদ্ধে কাদের পক্ষাবলম্বন করছে তার দ্বারাই স্থির হবে।

এর অর্থ কি? এর মানে কি এই যে আমরা ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ও মোল্লাতন্ত্রী শক্তির পক্ষে দাঁড়াবে? অবশ্যই নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করার মানে এই নয় যে সেই শক্তিকেই আমাদের সমর্থন করতে হবে যারা বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেরুকরণকে মুসলমান বনাম ইহুদি-নাসারা-কাফেরদের দ্বন্দ্ব হিশাবে হাজির করতে চাইছে। বিশ্ব "মৌলবাদ" সংক্রান্ত আতংক সৃষ্টি করে যে-শ্রেণী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তদের সামরিক মিত্রদের পক্ষে সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে কাজ করছে তাদের তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যেমন আমাদের কাজ, তেমনি ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়াও আমাদের কর্তব্য। ইরাকি জনগণের প্রতি নিজেদের সংহতি প্রকাশ এবং সৌদি আরব থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণের প্রশ্নে নিজেদের নীতি পরিষ্কার ভাবে জনগণের সামনে হাজির করলেই আমাদের দায় ফুরিয়ে যায় না। নিছক ধর্মানুভূতিকে আশ্রয় করে যে সংবেদনশীলতা সাধারণ মানুষের কাজ করছে তাকে তার সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করে সকল মানুষের সংহতির দিকে কী করে আমরা নিয়ে যাব সেই পথটাও দেখাতে হবে।

ফিলিস্তিন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে বহু তরুণ লড়তে গিয়েছে। এর পেছনে গরিব দেশের অর্থনীতি কাজ করেছে, সেটা অবশ্যই সত্যি। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে সেটা সত্যি নয়। এর আল ফাতাহর মতো রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণপন্থীদের হয়ে যেমন লড়েছে, তেমনি জর্জ হাবাশের নেতৃত্বাধীন মার্কসবাদী লেনিনবাদী পিএফএলপির অধীনেও লড়েছে। অনেকে শহিদ হয়েছেন। লেবানন যুদ্ধে ইসরাইলীদের হাতে ধরাও পড়েছেন অনেকে। ফিলিস্তিনী জনগণের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে আমাদের তরুণরা আমাদের গৌরব বাড়িয়েছে। এই সমাজ এদের কোন সম্মান বা স্বীকৃতি দেয় নি। যাঁরা সত্যি সত্যিই প্রগতিবাদী তাঁদের উচিত এঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া। তেমনি তালেবানদের পক্ষে আফগানিস্তানে লড়তে গিয়েছে এমন তরুণের সংখ্যাও কম নয়। সন্দেহ নেই তালেবান একটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক দিক থেকে জনগণের স্বার্থ বিরোধী শক্তি। বাংলাদেশে তালেবান আছে কি নেই সেই বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তরুণদের একটা বড়ো অংশ সামরিক প্রশিক্ষণ নতুন পায় নি। তালেবানে হঠাৎ দেশ ছেয়ে গেছে কিম্বা ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী হঠাৎ আবিস্কৃত হয়েছে – এগুলোও ডাহা মিথ্যা ও অসৎ প্রচার ছাড়া কিছুই নয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের তালেবানদের পক্ষে কিম্বা ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী থাকা মোটেও বিচিত্র কিছু নয়। সেই ওহাবি আর ফরায়জি আমলের সময় থেকেই এই দেশের মানুষ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে। অন্য দেশে গিয়ে অস্ত্র ধরেছে। তাহলে এখন সেটা নতুন কাহিনী হয়ে যাচ্ছে কেন? এই কালের তরুণরা সেই ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছে। কারা এদের ভয় পাচ্ছে? সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ফিরে আসা তরুণরা যদি এখন কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তালেবানদের রাজনীতি গ্রহণ করে – সেটা প্রগতিশীল আন্দোলন ও সংগঠনেরই ব্যর্থতা। কিন্তু তেমন কোন

বিপজ্জনক লক্ষণ বাংলাদেশে দেখা যায়নি। তাছাড়া পৃথিবী আর আগের মতো নেই, বাংলাদেশ বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে আবর্তিত হতে বাধ্য। এই আবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তিকে সংগঠিত হয়ে উঠতে হবে। আতংক সৃষ্টি করে নয়।

সাদ্দাম হোসেন বা ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পেছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরব বিদ্বেষ। এডওয়ার্ড সাঈদ বলছেন মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির গোড়াতেই রয়েছে আরবদের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং অপ্রকৃতিস্থ আতংক। তিনি লিখছেন,

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আরবদের প্রতি এই অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ আতংক এবং ঘৃণা মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির সার্বক্ষণিক থিম হয়ে রয়েছে। এমনকি একদিক থেকে, আরবদের সম্পর্কে কোন ইতিবাচক ধারণা মাত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসরাইলের স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে ইসরাইলের ঘোর পক্ষাবলম্বনকারী ইহুদি, পুরনো প্রাচ্যবাদী (ওলিয়েন্টালিস্ট) এবং যুদ্ধবাজ সামরিক কর্তাব্যক্তিরা ভয়ানক সর্বনাশী ভূমিকা রেখেছে।

যারা বাংলাদেশে ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী খুঁজছেন এবং আতংক ও ঘৃণায় পাতার পর পাতা পত্রিকা ভরে ফেলছেন এদের সম্পর্কে আর কীইবা বলা যায়? মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির তল্পিবাহক ছাড়া? তালেবান ও ওসামা বিন লাদেন ও তার অনুসারীদের রাজনীতি স্পষ্ট? আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এরা যাকে শত্রু জ্ঞান করছে, প্রগতিশীল রাজনীতির দিক থেকেও শত্রু একই, কিন্তু বাইরের মিলে বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। মিল থাকলেও এই রাজনীতির সঙ্গে প্রগতিশীল রাজনীতির বিরোধ খুবই স্পষ্ট। কিন্তু আরো স্পষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণীগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এই সংঘর্ষ ও সংঘাতের জায়গা স্পষ্ট হলেই বাংলাদেশের প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও রাজনীতি নিজেকে জনগণের কাছে আরো স্পষ্ট করে তুলতে পারবে। এটাই এখনকার প্রধান কাজ।

বাস্তব অর্থে কিম্বা প্রতীকী ভাবেই হোক – এই কালের বিল ক্লিনটন আর ওসামা বিন লাদেনের লড়াইয়ে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিরাজ করছে। একে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দুনিয়ার মুক্তিকামী জনগণের লড়াইয়ে আমরা পরিণত করতে পারব কিনা তার ওপর নির্ভর করছে শুধু আমাদের নয়, সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের জনগণের সেই হিম্মত কতোটুকু আছে সেটা অচিরেই আমরা দেখব।

কাপুরুষদের দিন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আসছে সততা, সাহস এবং দেশকালপাত্র বিচার করে সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণের সময়।

মঈনুস সুলতান

এক ইরাকি কিশোরের আঁকা তৈলচিত্র

এই লেখাটা দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকার ১৫ই নভেম্বর ২০০২ তারিখের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ইরাকের ওপর পশ্চিমা যুদ্ধ ও অবরোধ কীভাবে লাখ লাখ ইরাকির জীবন মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার একটা টুকরা-ছবি এই লেখায় ধরা পড়েছে। **মানুষ**-এর কাজের শেষ পর্যায়ে আমরা ইরাক, প্যালেস্টাইন, বালী ও কেনিয়া প্রসঙ্গে কিছু লেখা দেয়ার চেষ্টা করি। সেই সুবাদে তাড়াহুড়া করে চালানো সংগ্রহ-অনুবাদ-অভিযানের অংশ হিসাবে এই লেখার পুনর্মুদ্রণ।

অ্যামহার্স্ট শহরের প্রান্তে, পুলিশ ফাঁড়ির দালানটির লাগোয়া ঘেসো চত্বরে যেখানে হামেশা এক অন্ধ ভিখারিকে ব্যাঞ্জু বাজিয়ে গান করতে দেখা যায়, ঠিক সেখানে অধ্যাপক মেহজুবানের তালাশ পাওয়া গেল। মরক্কোর এ পক্ককেশ প্রফেসরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় গেল বছর ওয়াশিংটন ডিসিতে আফগান লড়াই-বিরোধী মিছিলের সময়। সে থেকেই আরবিভাষী মানুষটি এক ধরনের খাতির-সদ্ভাব বজায় রেখে আসছেন। গত বছর রমজান মাসে আমাকে তিনি ইফতারে দাওয়াত দিয়েছেন। শহরে নাগরিক অধিকার বা প্যালেস্টাইন বিষয়ক কোন মিছিল-মিটিং হলে আগবাড়িয়ে তার খোঁজ দিয়েছেন। আজ তার কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে – ইরাকে নতুন করে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিষয়ক সভাতে যোগ দিতে এসেছি। প্রফেসর মেহজুবান আমাকে দেখতে পেয়ে ভুরু নাচিয়ে ইশারায় সম্ভাষণ জানান এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে মোবাইল ফোনে খাস আরবিতে কাকে যেন নসিয়তও করেন। তার অন্য হাতে দীর্ঘ সিগারেটটি পুড়ে পুড়ে ছাই জমতে থাকে। আমাদের পাশে লাল সিগনালের প্রতিবন্ধকতায় দাঁড়িয়ে পড়ে এক সারি কার। কোনো কোনো গাড়ির ঈষৎ খোলা উইন্ডোপথে রক্‌ কিংবা ব্লুজ মিউজিকের ঝংকার সহসা বিকালের ম্রিয়মাণ আবহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অধ্যাপক এবার মোবাইল ফোনটি গুটিয়ে আমাকে ‘আহলান সাহলান, আল সৈয়দ’ এবং আরও কি কি যেন বলে শুভেচ্ছা জানান। আমরা ট্রাফিক জ্যামে থেমে যাওয়া গাড়িগুলোর ভেতর দিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে পথ করে সড়ক পাড়ি দেই। রাস্তার অন্য পাশে ফার্স্ট ক্রাইশ্চার্চ নামক শহরের প্রাচীন সুরমা রঙের গির্জা বাড়িটি – যেখানে আজ বাগদাদে মার্কিন যুদ্ধাভিযানের পাঁয়তারা

নিয়ে জমায়েত হওয়ার কথা আছে।

যেতে যেতে অধ্যাপক আমাকে চার্চটির যে সমাজ পরিবর্তন বিষয়ক ভূমিকা আছে তা জানান। তিনি বলেন – 'এখানে এক সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী সভা-সমিতি হয়েছে। এই কিছুদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য আগত ইমিগ্রান্টদের অধিকার খর্ব করা নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে।' তার বক্তব্য শেষ না হতেই আমরা চার্চের ভেতরে চলে আসি। ইরাকে যুদ্ধ বিষয়ক সভাটি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমরা বসতে না বসতেই মাইক্রোফোনে সভার উদ্যোক্তা মহিলার বক্তব্য শুনতে পাই। মহিলা অত্যন্ত বৃদ্ধ। তিনি শ্লেষ্মা জড়িত কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন –

> জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার আফগানিস্তানে লড়াই শেষ না হতেই চাচ্ছে পারস্য উপসাগরে আরেকটি যুদ্ধ শুরু করতে। বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চালু রেখে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ইরাকে প্রায় দশ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, যেখানে জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র ও পরিশোধিত পানীয় জলের অভাবে প্রতি মাসে পাঁচ থেকে ছয় হাজার শিশু মারা যাচ্ছে, সেখানে আরেকটি উপসাগরীয় যুদ্ধ নৈতিকভাবে সঙ্গত কিনা? কিছুদিন আগের এক তথ্য জরিপে ৬৮ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরাকে নতুন করে হামলার পক্ষে রায় দিয়েছে। এখন সময় এসেছে ইরাক সম্পর্কে মার্কিন নাগরিকদের সত্যিকারের তথ্য জানানোর, সাদ্দাম হোসেন কি আসলেই এক অশুভ দৈত্য, যাকে আবার লড়াই করে গদিচ্যুত করতে হবে? তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কীইবা অধিকার আছে?

পর্যন্ত বলে বৃদ্ধা দম নেন। তিনি পরবর্তী বক্তা জর্জ আপাসিকে আর্লিংটন ম্যাসাচুসেটস থেকে আগত লেখক বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বসে পড়েন।

জর্জ আপাসি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ থেকে চশমা খুলে কাঠের পডিয়মের ওপর রেখে নীরবে এক দৃষ্টিতে শ্রোতামণ্ডলীর দিকে তাকান। তিনি যেন নেপথ্যে সংলাপ আউড়ে যাচ্ছেন এরকম নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলেন–

> উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে গত এগারো বছরে আমি মোট আটবার ইরাক যাই, কেবল ইরাকের অভ্যন্তরে কি ঘটছে তার সত্য সংবাদটুকু জানার জন্য। আমি আজ শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ করব, যা থেকে আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন দুই কোটি ইরাকির জীবন যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে কিরকম দুর্বিষহ হয়ে আছে। আমার প্রথমবার বাগদাদ সফরের সময় আমাল আলওয়ান নামক এক মহিলা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়। আমাল একটি ইরাকি হাই স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতেন। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ডেজার্ট স্টর্মের বিমান হামলায় স্কুলটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। এরপর থেকে আমালের চাকরি কিংবা বেতন-ভাতা কিছুই নেই। বছর তিনেক তাদের চলে পরিবারের গাড়ি, আসবাবপত্র ও বাসনকোসন বিক্রি করে। একপর্যায়ে আমাল অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার চিকিৎসা বাবদ একটি প্রাইভেট হসপিটালে যেতে বেশকিছু টাকার প্রয়োজন হয়। আমি সহানুভূতিশীল হয়ে দরদী আমেরিকানদের কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে আমালের চিকিৎসার জন্য তিনশ' ডলার পাঠাই। একটি অপারেশনে আমালের সম্পূর্ণ সুস্থতা ফিরে আসে না। তার প্রয়োজন হয় আরেকটি জরুরি সার্জারির। তখন শুরু হয়েছে দ্বিতীয়বারের উপসাগরীয় যুদ্ধ। ডেজার্ট ফক্স নামক চার দিনের হামলায় বাগদাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ডাক্তাররা ইলেকট্রিসিটি ছাড়া দ্বিতীয় অপারেশনটি করতে ব্যর্থ হয়। অপর্যাপ্ত অক্সিজেন ও অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধের অভাবে আমাল অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

এ পর্যন্ত বলে জর্জ থেমে গ্লাস থেকে পানি পান করে শ্রোতাদের দিকে ক্ষণিক নীরবে চেয়ে থাকেন। একটু কেশে তিনি আবার বলেন,

> আমালের পরিবার কিছুতেই আমার কাছে ঋণী থাকবে না। তার কিশোরী মেয়ে নাদা আলওয়া – যে মায়ের কাছ থেকে ছবি আঁকা শিখেছে, আমার ঋণ শোধ করার জন্য আমি ও আমার স্ত্রীর একটি তৈলচিত্র করে দিয়েছে।

জর্জ তৈলচিত্রটি তুলে ধরে শ্রোতাদের তা দেখান। তারপর বলেন –

> মেয়েটির প্রতিভা আছে, তাই আমি এক জাপানি আমেরিকান শিল্পীর দান করা রঙ, তুলি ও আরও কিছু সরঞ্জাম তার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। মেয়েটি এগুলো দিয়ে বেশ ক'টি ছবি এঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। এ মিটিং-এর পর আমি ছবিগুলো চার্চের দেয়ালে টাঙিয়ে দেব।

পরবর্তী বক্তা শক্ত পোক্ত চেহারার কালো জ্যাকেট পরা জোয়ান মতো এক লোক। উদ্যোক্তা মহিলা তাকে জাতিসংঘের ইরাকে নিযুক্ত সাবেক ওয়েপনস ইন্সপেক্টর স্কটরিটার বলে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি স্কটের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে গিয়ে বলেন যে, মার্কিন মেরিন কোরের ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে তিনি গাল্ফ যুদ্ধে অংশ নেন। স্কট কোন রকম ভূমিকা ছাড়া বলেন,

> যুদ্ধের পর সাত বছর আমি ইরাকে জাতিসংঘের ওয়েপনস ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করেছি। ইরাকিদের রাসায়নিক, জীবাণু, আণবিক ও দূরপাল্লার মিসাইল প্রোগ্রাম সবই আমরা প্লান মাফিক ধ্বংস করেছি। কথা ছিল বাগদাদের ওয়েপনস অব মাস ডেস্ট্রাকশন বিলুপ্ত করে দেয়ার পর দেশটির ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠানো হবে। কিন্তু তা আজতক কার্যকর হয়নি। একপর্যায়ে আমি হতাশ হয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছি। ইরাকের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার পরও দেশটিকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত করা অথবা আরেকটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। আমি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করি– যখন শুনি জন কেরির মতো নামজাদা সিনেটর, যিনি একসময় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভিয়েতনাম পলিসির কড়া সমালোচক ছিলেন, আজ ইরাকে নতুন করে যুদ্ধ শুরুর ওকালতি করেন। জন কেরিকে আমি ইরাকে পাঁচ লাখ শিশুর মৃত্যুর কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি পাল্টা নালিশ করলেন যে, সাদ্দাম হোসেন সীমিত তেল রফতানির পয়সা শিশুদের জীবন রক্ষাকারী খাতে ব্যয় না করে খরচ করছেন নিজস্ব বিলাসবহুল জীবনযাত্রায়। জন কেরির উচিত জাতিসংঘের হিউমেনিটিরিয়ান কোঅর্ডিনেটর ডেনিশ হেলিডের রিপোর্টটি পড়ে দেখা। ডেনিশ, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আগ্রাসী পলিসির প্রতিবাদে পদত্যাগ করে মিডিয়াকে বলেছেন যে, ইরাকের তেল বিক্রির পয়সা সোজাসুজি চলে যায় জাতিসংঘের একাউন্টে। এ একাউন্টের ওপর সাদ্দাম হোসেনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। খাদ্য ও মেডিকেল সাপ্লাই-এর সীমিত টাকা যে সাদ্দাম তার প্রাসাদ পুনঃনির্মাণ বা সামরিক শক্তি বৃদ্ধির খাতে ব্যয় করছেন তার কোন তথ্যগত প্রমাণ নেই।

স্কট রিটার আরও বলেন,

> যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের বেসামরিক জনতাকে খাদ্য ও ওষুধের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করে যে পরোক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে – তা জেনেভা কনভেনশনের ১৯৭৭ সালের এক নম্বর প্রটোকলের পরিপন্থী। আমি শান্তি বাদী নই, আমি সাদ্দাম হোসেনের সমর্থকও নই; কিন্তু বিনা কারণে যুদ্ধের আমি কোন নৈতিক জাস্টিফিকেশন দেখি না। আমি নীতিনির্ধারকদের এ বিষয়ে টেলিভিশন বিতর্কের আমন্ত্রণ জানাই। আমি চাই প্রশাসন আরেকটি গাল্ফ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা যেন তথ্য-প্রমাণসহ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সামনে হাজির করেন।

স্কট রিটার সিনেটে ইরাকে আরেকটি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শুনানির দাবি জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। প্রফেসর মেহজুবান ফিস ফিস করে আমাকে বললেন– 'দেখেছো প্রেস থেকে কেউ কিন্তু এ সভা কভার করতে আসেনি।' উদ্যোক্তা মহিলা তার কাঁপা কাঁপা হাতে শ্রোতাদের সকলকে একটি চিঠির মুসাবিদা করা কপি দিচ্ছেন। তিনি শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আরেকটি গালফ ওয়ার এড়াতে হলে এখনই সবার তার নিজ নিজ সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানকে যুদ্ধ-বিরোধী মতামত জানিয়ে চিঠি দেয়া উচিত। চার্চ থেকে বেরুনোর পথে দেখি লেখক জর্জ আপাসি ইরাকি কিশোরী নাদা আলওয়ানের আঁকা বেশ ক'টি তেলের কাজ দেয়ালে টাঙিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ও প্রফেসর মেহজুবান ছবি দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ি। আমাদের চোখের সামনে বাগদাদের লড়াইয়ে বিধ্বস্ত মিনাররাজি তেলের রেখাচিত্রে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ফরহাদ মজহার

ইন্তিফাদা জিন্দাবাদ: ফিলিস্তিনী শিশুকিশোরদের ঢিল আর গুলতি লড়াই

> ফরহাদ মজহারের এই লেখাটা একটু পুরানা। **মানুষ**-এর কাজের শেষ পর্যায়ে আমরা আফগানিস্তান, ইরাক, প্যালেস্টাইন, বালী ও কেনিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কিছু লেখা দেয়ার চেষ্টা করি। সেই সুবাদে তাড়াহুড়া করে চালানো সংগ্রহ-অনুবাদ-অভিযানের অংশ হিসাবে ২৯শে মাঘ ১৪০৫ সালের তারিখচিহ্নিত এই লেখাটা ফরহাদের কাছ থেকেজোগাড় করে পাঠিয়েছেন আমাদের বন্ধু রফিকুল ইসলাম। লেখাটা পুরানা হলেও এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। **মানুষ**-এ পুনর্মুদ্রিত ফরহাদ মজহারের 'ক্রুসেড জেহাদ শ্রেণীসংগ্রাম' লেখাটার সাথে এই লেখাটা মিলিয়ে পড়ার সুযোগ আছে। লেখাটা আদিতে ছাপা হয়েছিল কোথায় সেই তথ্যটা তাড়াহুড়ায় জোগাড় করা যায় নাই।

ফিলিস্তিনের শিশু-কিশোররা লড়ছে ঢিল আর গুলতি দিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আধুনিক মারণাস্ত্র, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, মারকেভা ট্যাংক, মিসাইল, হেলিকপ্টার গানশিপ আর আনুষঙ্গিক ভারী যুদ্ধবাহন। একেকটি ঢিল আর গুলতির গুলির বিপরীতে সকল স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র গর্জে উঠছে ইসরাইলী সৈন্যদের হাতে। শিশু আর কিশোরদের বুক আর মাথার খুলি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হচ্ছে গুলি। মরছে তারা। এমনেস্টি ইন্টারন্যালশাল তাদের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে অতিশয় অধিক হারে মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, "খুন করবার ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার"। এই খুনে-শক্তির ব্যবহার হয়েছে সেইসকল ক্ষেত্রে যখন

> নিরাপত্তা রক্ষীদের ওপর কোন বিপদের আশংকা ছিল না, ফলে হত্যাকাণ্ডগুলোর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন জড়িত নয়। এগুলো অবৈধ হত্যাকাণ্ড।

এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এই প্রতিবেদনের উল্লেখ করে মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিদ এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে সরব নোয়াম চমস্কি বলছেন, এই ধরনের বিশদ ও বিস্তৃত প্রতিবেদনের কোন উল্লেখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয় না বললেই চলে। চমস্কি যখন তাঁর "আল-আকসা ইন্তিফাদা" নিবন্ধটি লিখছেন ততদিনে কমপক্ষে ১০০ জন ফিলিস্তিনী শহিদ হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩০ জন

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

শিশুকিশোর, বয়েশ দশ থেকে চৌদ্দ পনের বছরের মধ্যে। এই লেখা যখন লিখছি তখন ফিলিস্তিনীদের পক্ষে শহিদের সংখ্যা তিনশয়ের বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছে। অধিকাংশই শিশু আর কিশোর। ইসরাইলী পক্ষেও হতাহত হয়েছে, কিন্তু সেটা শিশু আর কিশোরদের ঢিল আর গুলতির আঘাতে নয়। আল-আকসা ইন্তিফাদার শুরুর দিকে প্রকাশিত এমনেস্টির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রতি একজন ইসরায়েলীর বিপরীতে ১৫ জন ফিলিস্তিনীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই অনুপাত এখন বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

অক্টোবর মাসের ৩ তারিখের একটি খবরে জানা যায় যে, মাত্র এক সপ্তাহের সংঘর্ষের মধ্যেই ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে হামলাবাজিতে দক্ষ যুদ্ধের হেলিকপ্টার (Balackhawk military helicopters) কিনেছে। এই হেলিকপ্টারের দাম হচ্ছে ৫২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অক্টোবরের ২৫ তারিখে ইসরাইলের একটি বিখ্যাত পত্রিকা *হারেৎজ*-এ সাংবাদিক আলুফ বেন খবর দিচ্ছেন যে, এই সামরিক সাহায্যেরও অতিরিক্ত আরও ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ইমার্জেন্সি সামরিক সাহায্য ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চেয়েছে। সবমিলিয়ে আগামি বছরের মধ্যে ইসরাইলে মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণ হবে প্রায় দুই বিলিয়ন (১.৯৮) মার্কিন ডলার।

যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলী আগ্রাসনে সরাসরি অস্ত্র দিচ্ছে। সংঘর্ষের প্রথম থেকেই গুলতি আর ঢিলের ব্যাপারটিকে যুদ্ধের রূপ দিয়েছে ইসরাইল, আর ক্রমাগতভাবে তারা এই শিশুদের ঢিল আর গুলতিকে ফিলিস্তিনীদের সন্ত্রাসী হামলা বলে প্রচার চালাচ্ছে। গণমাধ্যমগুলো সেটা প্রচারও করছে। যতোবারই এই রক্তপাত বন্ধের প্রস্তাব এসেছে, ততোবারই ইসরাইল বলছে, আগে ওরা আক্রমণ বন্ধ করুক তারপর আমরা করবো। অর্থাৎ আগে ওরা ঢিল আর গুলতি ছোঁড়া বন্ধ করুক তারপর আমরা গোলাগুলি আর মিসাইল হামলা থামাবো।

বিবিসি তার একটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখিয়েছে যে ইসরাইলী সৈন্যরা যখন গুলি করে তখন তাদের লক্ষ্য থাকে ফিলিস্তিনীদের হত্যা করা। শুধুমাত্র ছত্রভঙ্গ করার জন্যে নয়। যদিও ইসরাইল এই প্রচারই আন্তর্জাতিকভাবে চালাচ্ছে। যেমন, প্রতিটি গুলির লক্ষ্য ছিল শরীরের উপরের অংশ যেন গুলি শিশুকিশোরদের মাথায় মগজ সরাসরি ভেদ করে যায়, অথবা সরাসরি বুকের মধ্যে গিয়ে লাগে। যেন তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয় তাদের। গুলি ছোঁড়ার এই প্যাটার্ন অতি সহজেই শহিদদের শরীর পরীক্ষা করে বোঝা যায়। এখনও কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি হাসপাতালে আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের অনেকের মগজের মধ্যে ইসরাইলী সৈন্যদের ছোঁড়া গুলি গিয়ে বিঁধে গেছে। ওদের মগজ বিকল হয়ে গেছে। বাঁচলেও তারা আর স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে না। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রী এক হিশাবে দেখিয়েছেন নিহত এবং আহতদের প্রত্যেকের শরীরের উপরের অংশে আঘাতের চিহ্ন, পায়ে বা শরীরের নীচের অংশে নেই। অর্থাৎ ইসরাইলীদের পক্ষ থেকে হত্যার ইচ্ছাটাই প্রবল ধরা পড়ছে। ইসরাইলের পক্ষ থেকে বারংবার বলা হয়েছে, এই ছোঁড়াগুলো কেন ঢিল ছুড়ছে? তাদের গুলি করে মারতে হবে। ওরা ভয়ানক। এমন নগ্ন ও নির্লজ্জ সহিংসতা অবিশ্বাস্য।

যাঁরা স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের বিপরীতে ঢিল আর গুলতির এই লড়াই দুই এক পলক টেলিভিশনে দেখেছেন তাঁদের চোখ ফেটে পানি আসবে। কী অপরাধ এই শিশু আর কিশোরদের? আজ যুদ্ধক্ষেত্রে নামছে এই শিশু কিশোর – এটা তো সকলেরই লজ্জার কথা। বিশেষত ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি হবার পর কেন এই মৃত্যুর জবজবা জমে উঠলো? কেন এই শিশুকিশোরদের বলি হতে হচ্ছে ইসরায়েলী কামান, বন্দুক, ট্যাংক আর মারণাস্ত্রের সামনে? এটা তো ঘটবার কথা নয়। যাঁরা এতোদিন দাবি করে আসছিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি-প্রক্রিয়া

শুরু হয়েছে এবং ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন পরস্পরের প্রতিবেশী হয়ে শান্তিতে বসবাস করবেন, তাঁরা এখন কোথায়।

টেলিভিশনে শিশুকিশোররা সাক্ষাৎকারে বলছে তারা শহিদ হবার জন্য তৈরি। তারা মরতে চায়। তারা ইসরাইলী বুলেট আর মিসাইল বুকে নিয়ে আযরাইলের কাজ সহজ করবার জন্য তৈরি। তাদের ধারণা প্রতিটি মৃত্যু প্যালেস্টাইনী জনগণের মুক্তির জন্য জরুরী। ইসরাইলের আছে মারণাস্ত্র আর প্যালেস্টাইনীদের আছে প্রাণ দেবার ক্ষমতা। দেখা যাক কে জেতে।

পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো প্যালেস্টাইনী জনগণের সংগ্রামকে বিকৃত করে হাজির করে। কিন্তু তবুও ইসরাইলী সমরাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনী শিশুকিশোরদের এই অসম যুদ্ধ তারা না দেখিয়ে পারে না। কিন্তু তাদের চোখে এই শিশুকিশোররা হোল সন্ত্রাসী, ইসরায়েলী সেনাবাহিনী নয়। গুলতি আর ঢিল হাতে "সন্ত্রাসী" শিশুকিশোরদের দেখানো হয়। আর ইসরাইলী সৈন্যদের দেখানো হয় মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির দূত হিশাবে। শিশুকিশোরদের দিকে তাক করে ছোঁড়া গুলি যেন জলপাই গাছের ডাল থেকে পাতা ছিটানো মাত্র। হত্যা নয়। একদিকে বিশ্বে ক্ষমতার অসাম্য, জনগণের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্রের এই নিষ্ঠুর মৃত্যুযজ্ঞ আর অন্যদিকে যারা ভূক্তভোগী তাদেরকেই দোষী বানাবার ক্রমাগত প্রচেষ্টা – সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটাই একটা আজগুবি কল্পকাহিনীর মতো মনে হয়।

কিন্তু এটাই সত্য। এটাই বাস্তব। এই বাস্তবতার মধ্যেই নিপীড়িত জনগোষ্ঠিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। লড়তে হবে। জায়োনিজম বা ইহুদিবাদ যার অতিশয় নগ্ন অভিপ্রকাশ। এই লড়াই শুধুমাত্র বাইরের দুষমণদের বিরুদ্ধে নয়। নিজেদের মধ্যেও। এডওয়ার্ড সাঈদ *আল আহরাম* পত্রিকার একটি নিবন্ধে সেই কারণে বলেছেন, আল-আকসা মসজিদকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় দফার এই ইন্তিফাদা আসলে সরাসরি অসলো চুক্তি এবং যারা এই চুক্তির কারবারি তাদেরও বিরুদ্ধে (দেখুন "ME: The Tragedy Deepens", *The Daily Star*, 12.12.2000)। তিনি বলছেন,

> কারবারিদের চক্রে শুধু ইয়াহুদ বারাক আর ডেনিস রস-ই নেই, আছে ফিলিস্তিনের গুটিকয়েক কর্মকর্তা।

ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী গণমাধ্যমের ক্রমাগত অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ফিলিস্তিনী কর্মকর্তাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে সতর্ক, এটা তাঁর ভাষা দেখলেই বোঝা যাবে। বলছেন, এরা irresponsible বা দায়িত্বজ্ঞানহীন। সাঈদ বলছেন,

> এইসব ফিলিস্তিনী কর্মকর্তাদের এখন অন্তত জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে ভুল স্বীকার করার মতো ভদ্রতাটুকু থাকা উচিত এবং যদি তাদের আদৌ কোন (মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধানের) পরিকল্পনা থাকে তবে তারা তার পক্ষে সমর্থন চাইবার সৎসাহস প্রদর্শন করুক।

এডওয়ার্ড সাঈদের নিবন্ধের মূল সমালোচনা হচ্ছে আরব নেতাদের কপটতার বিরুদ্ধে। তাদের অতিশয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রীতিকে তিনি সমালোচনা করছেন। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। তবে বিস্ময়ের দিকটা হোল গত দশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইসরাইলকে সামরিক অস্ত্র দিচ্ছিল তখন কোন আরব দেশই প্রতিবাদ জানায় নি। যে হেলিকপ্টার গানশিপ আমরা এখন টেলিভিশনে ফিলিস্তিনের জনগণকে হত্যা এবং তাদের বাড়িঘর ও সয়সম্পত্তির সর্বনাশ ঘটানোর জন্য নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখছি তারও উৎস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই হেলিকপ্টারগুলো যখন ইসরাইল জোগাড় করছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অতিশয় প্রীতির কারণে আরব নেতারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি।

বছর দেড়েক আগে ইয়াহুদ বারাক যখন নির্বাচনে জিতে এসেছিলেন তখন সব আরব নেতাই তাকে অভিনন্দন জানালেন। সাঈদ বলছেন, যে-ইয়াহুদ বারাকের পুরো জীবনই কাটল আরবদের হত্যা করে তাদের রক্তে নিজের হাত রাঙাতে, সেই বারাককে অভিনন্দন জানাবার মোজেজাটা কি? সেটা নিশ্চয়ই আবারও মার্কিন প্রীতি। সেটা না হয় হোল, কিন্তু ইয়াহুদ বারাক শান্তি-প্রক্রিয়ার প্রতি আন্তরিক – এই বিশ্বাস আরব নেতাদের রাজনৈতিক কপটতার লক্ষণ, নিছকই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা নয়। সাঈদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরব নেতাদের আঁতাতের দিকটার প্রতি জোর দিয়ে তাদের রাজনৈতিক কপটতার কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ফিলিস্তিন সংগ্রামের মর্মার্থ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, কিন্তু আরব নেতাদের রাজনীতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। ফিলিস্তিনী জনগণের রক্তক্ষয় এবং শিশুকিশোরদের এতো মূল্য দেবার একটি প্রধান কারণ এখানে।

ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে এই সহিংস ঘটনার সৃষ্টি করেছেন ইয়াহুদ বারাক। গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখে বারাক সরকারের অনুমতি ও প্রণোদনায় এরিয়েল শ্যারন হাজার খানেক পুলিশ নিয়ে আল-আকসা যান। আল-আকসার সঙ্গে ফিলিস্তিনী আবেগ ও ইতিহাসও শুধু জড়িত নয়, ওর সঙ্গে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় স্থানের আবেগ ও ইতিহাসও জড়িত রয়েছে। ফিলিস্তিনিদের কাছে শ্যারন ইসরাইলের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যক্তি এবং হামলাবাজ হিশাবে পরিচিত। ১৯৫৩ সাল থেকে আজ অবধি ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলী অত্যাচারের প্রতীক এই শ্যারন। কিন্তু শুধু শ্যারনের আগমনই এতো সহিংসতার সৃষ্টি করে নি। ইয়াহুদ বারাক আল-আকসায় শ্যারনের এই আগমনের উসিলায় জামায়াতে নামাজের দিনে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে পুলিশ ও মিলিটারীর উপস্থিতি দিয়ে উসকানির সৃষ্টি করে, ফলে সংঘর্ষ হয়। এই দিনেই ৭ জন ফিলিস্তিনী শহীদ হয় এবং ২০০ জন আহত হয়। সহিংসতা এভাবেই শুরু হয়। পরবর্তীতে বারাক ও ইসরাইলের আচরণে এটা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি হয়েছে যে ইয়াহুদ বারাক এটাই চেয়েছিলেন। তথাকথিত শান্তি-প্রক্রিয়া থেকে তাঁর আর কিছুই পাবার নেই। অসলো চুক্তি থেকে তিনি যা পাবার পেয়েছেন, বিশেষত ইয়াসির আরাফাতের কাছ থেকে ইসরাইলী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। অতএব সেই প্রক্রিয়া থেকে এখন কোন একটা ছুতোয় বেরিয়ে আসার জন্যই এই সহিংসতার সৃষ্টি। সেই দিক থেকে ইয়াহুদ বারাককে সফলই বলতে হবে।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ সাল অবধি ফিলিস্তিন জনগণের লড়াই, বা প্রথম ইন্তিফাদার আত্মত্যাগ, রক্তপাত ও লড়াইয়ের সাফল্য বিকিয়ে দিয়ে ইয়াসির আরাফাত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যে শান্তিচুক্তি করেছেন তার ফল হোল এক টুকরা জমির ওপর পিএলওর মিউনিসিপ্যাল কর্তৃত্ব। ওয়েস্ট ব্যাংকের ৫৯ ভাগ জমি ইসরাইলের দখলে রয়ে গেছে। ফিলিস্তিন প্রশ্নের মীমাংসা আরও ছয় বছর পরে হবে এই সিদ্ধান্তও তিনি মেনে নিয়েছেন। এই ছয় বছরে ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের ভূখণ্ডে আরও ইহুদি বসতি গড়ে তুলছে, ওয়েস্ট ব্যাংককে খণ্ডবিখণ্ড করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে এক খণ্ডের সঙ্গে অন্য খণ্ডের কোন যোগাযোগ না থাকে, গড়ে তুলেছে ইসরাইলী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হাইওয়ে ও অন্যান্য ব্যবস্থা। তার মানে হোল – চমস্কি, সাঈদ, এজাজসহ প্রত্যেকেই বলছেন – যদি কোন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ইসরাইল এখন মেনেও নেয় সেটা হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টুস্তানের মতো। সেটা হবে স্বাধীনতা নয়, ইসরাইলী রাষ্ট্রের মধ্যে ফিলিস্তিনীদের জন্য দেয়ালহীন কারাগার। ইসরাইলী ধর্মান্ধতা ও বর্ণবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত নব্য এপারথেড। যে-কারণে নেলসন ম্যাণ্ডেলা একবার মন্তব্য করেছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা আর বর্ণবাদের কী দেখেছে? ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলী বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার যে শিকার হয়েছে তার কোন তুলনা নেই।

১৫ই নভেম্বর, ফিলিস্তিন তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে। পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি কাতারে অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দোহা ঘোষণায় ফিলিস্তিনীদের প্রতি সমর্থন এবং ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে দুইজন বিখ্যাত মানুষের বরাত আগে দিয়েছি। একজন নোয়াম চমস্কি এবং অন্যজন এডওয়ার্ড সাঈদ। এঁরা কেউই জন্মসূত্রে মুসলমান নন। প্রথমজন ইহুদি এবং দ্বিতীয় জন খ্রিস্টান। উভয়েই মার্কিন-ইসরাইলী হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে লেখালিখি করছেন। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের ধর্মপরিচয়ের দিকটি উল্লেখ করা দরকার কারণ ফিলিস্তিনীদের লড়াই মুসলমান বনাম ইহুদিদের লড়াই নয়। মার্কিন-ইসরাইলী সাম্রাজ্যবাদী আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াকু মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রাম। এই দিকটা পরিষ্কার বুঝতে পারলে আমরা বুঝব কেন বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার বাইরের প্রতিটি অংশই ফিলিস্তিন প্রশ্নে নীরব। এমনকি মুসলিম উম্মার স্বার্থ নিয়ে যে-সকল দল এই দেশে রাজনীতি করে তারাও প্রায় নীরবে এই হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি? কারণ ইসলামী দলগুলো এখনও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটাও কমবেশি স্পষ্ট যে জামায়াতে ইসলামের রাজনীতির সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্কটাই প্রধান, ইসলামের নয়। জালিম বা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরবার যে লড়াকু ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে এই দলটির আন্তরিক কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম তার বাইরের ছদ্মবেশ মাত্র। যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের ইসলামী কোন একটি দলেরও ন্যূনতম অঙ্গীকার থাকত তাহলে অন্তত সেই নৈতিক অঙ্গীকারের তাগিদে আমরা তাদের বাংলাদেশের রাজপথে দেখতাম। ফিলিস্তিনী শিশুকিশোরদের পক্ষে এবং ফিলিস্তিনী জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের পক্ষে বাংলাদেশে জনমত সৃষ্টির তারা চেষ্টা করতো। অন্তত তার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যেতো।

এবার আমরা ভারতের আরকজন নামজাদা বুদ্ধিজীবীর বরাতে কিছু কথা বলব। তিনি এজাজ আহমেদ। ভারতের *ফ্রন্টলাইন* পত্রিকায় (১২–১৪ নভেম্বর সংখ্যা) "Israel's Killng Fields" নামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন এজাজ। এখানে শুরুতেই ভারতে ইসরাইল সম্পর্কে লেখালিখির মুশকিলের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা গুণগত বদল ঘটেছে। যখন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাধান্য ছিল তখন সেটা শুধু জনগণের সচেতন অংশের মধ্যেই সক্রিয় ছিল এমন নয়, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে তার প্রতিফলন ছিল। এজাজ বলছেন যে, সে কারণে ভারতের শাসক শ্রেণী ইসরাইলকে দেখত অপরের ভূখণ্ডে জবরদখলকারী একটা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিশাবে। ইসরাইল থেকে দূরে থাকাই ছিল ভারতের নীতি। অন্যদিকে ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি সমর্থন ছিল ভারতের। কারণ তারা ছিল দখলদার ঔপনিবেশিক শক্তির 'ভিকটিম' বা ভুক্তভোগী। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এই বাস্তবতাকে ধরে নিয়েই কাজ করত। একইভাবে আরব দেশগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করত ভারত। সেই একাত্মতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও তার দ্বিধা ছিল না। যেমন, আলজিরিয়ার জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, নাসেরের জোটনিরপেক্ষ নীতি, ইত্যাদি। আরবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের প্রতি ভারতের একাত্মতার ইতিবাচক প্রবণতাটুকু দৃশ্যমান ছিল।

ভারতের এই পররাষ্ট্রনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোচনারও বিষয় ছিল এবং প্রশংসিত হোত। বাইরের জগতে ভারত সম্পর্কে যে-ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে, আজ অবধি তার জের রয়েছে। এজাজ এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছেন। যেমন ষাট এবং

সত্তর দশকে তিনি যে-সকল আরব বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিবিদ ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা ফিলিস্তিন প্রশ্নে পাকিস্তানের সমর্থনকে একটা হাল্কা ইসলামী ব্যাপার বলে পাত্তা দিত না। কিন্তু ভারতের সমর্থনকে দেখত ধর্মনিরপেক্ষ ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির স্বাভাবিক সংহতির অভিব্যক্তি হিশাবে। ফলে পাকিস্তান আরব জনগণের মনে মুসলমান সেজে যে-ভাবমূর্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে নি, ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষ ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কারণে তার চেয়ে অনেক বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে।

এজাজ পুরনো পরিপ্রেক্ষিতটা তুলেছেন বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করবার জন্য। সেই ভারত আর নেই। সেটা অবশ্য বাইরে থেকে স্পষ্ট। সম্প্রতি যশোবন্ত সিং ইসরাইল ঘুরে আসার একটা পর্যায়ে বলেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি মুসলমানদের ভোটের কাছে এতোকাল জিম্মি ছিল। এখন ভারত সেটা শোধরাবে। তার মানে, এতোকাল ভারত প্যালেস্টাইনকে সমর্থন দিয়েছে ভারতের মুসলমানদের খুশি করবার জন্য, কোন জোটনিরপেক্ষ বা ধর্মনিরপেক্ষ নীতির চর্চা হিশাবে নয়। এখন সে মুসলমানদের আর খুশি করবে না। খুশি করবে ইহুদিদের। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি শোধরাবার এটাই তো মানে। যশোবন্ত সিং এই মন্তব্য করে ভারতের অতীত মুছে ফেলতে চাইছেন এবং বিজেপির মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক নীতিটাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করলেন। উল্লেখ থাকা দরকার যে অটল বিহারী বাজপেয়ী বাবরী মসজিদের ভগ্নস্তূপের ওপর সম্প্রতি আগামি নির্বাচনের আগেই মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। এই উপমহাদেশের আরেকটি দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হচ্ছে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা *মোসাদ*-এর সঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা *রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইংয়ের* ঘনিষ্ঠ কাজের সম্পর্ক গড়ে ওঠা। এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক। কারণ ভারত যদি ইহুদি রাষ্ট্রের মতো নিজেকেও হিন্দু রাষ্ট্র হিশাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তাকে তার দেশের অভ্যন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, কাশ্মিরের জনগণকে শায়েস্তা করতে হবে। একই সঙ্গে তাকে পশ্চিমে পাকিস্তান এবং পূবে বাংলাদেশের জনগণকে মোকাবিলা করতে হবে। *রিসার্চ এন্ড এনালিসিস উইংয়ের* সঙ্গে ইহুদি গোয়েন্দা সংস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে হরকাতুল জেহাদ, ওসামা বিন লাদেনের অনুসারীদের হন্যে হয়ে খোঁজা এবং বাংলাদেশকে একটি "মৌলবাদী" দেশে পরিণত করার প্রচার প্রপাগান্ডার সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক। একই কারণে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইসলামপন্থী দলগুলোর নীরবতাও অতিশয় সন্দেহজনক।

পাকিস্তান যখন নিজেকে "ইসলামী প্রজাতন্ত্র" বলে ঘোষণা দেয়, তখন তাকে মধ্যযুগীয়, প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি থেকে চ্যুত রাষ্ট্র বলে যথার্থই নিন্দা করা হয়। যখন ভারতের রাষ্ট্রীয় সেবক স্বয়ং সেবক সংঘ ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' বানাবার দাবি তোলে এবং দাঙ্গাবাজদের দিয়ে চার্চ আর মসজিদ ভাঙার উৎসবে মেতে ওঠে, তখন তাকে যথার্থই "ফ্যাসিস্ট" বলে নিন্দা করা হয়। কিন্তু একটি "ইহুদি রাষ্ট্র" হিশাবে সৃষ্ট এবং ঘোষিত ইসরাইল এক অদ্ভুত সৃষ্টি। তার ভিত্তি ইহুদিবাদ এবং ইহুদি ধর্ম। ইসলামী মৌলবাদ বা হিন্দু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা যায় কিন্তু ধর্মান্ধ, জাতি বিদ্বেষী ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল সম্পর্কে সেই কথা বললেও যেন গুনাহ হয়। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছু বলতে নারাজ তো বটেই এমনকি সবসময় তারা এই ধারণাই দিয়ে থাকে যে ইসরাইল একটি আধুনিক, গণতন্ত্রী আর প্রগতিশীল রাষ্ট্র। ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানে যেন হিটলারের ইহুদিবিরোধী মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। এই পরিস্থিতির বদল কেবল তখনই সম্ভব যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদ আর ইহুদিবাদ একই মুদ্রার দুই পিঠ হিশাবে শনাক্ত করতে শিখি। তৃতীয়

বিশ্বের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজ ইহুদিবাদী রাষ্ট্রটিকে সাম্রাজ্যবাদ যেকোন মূল্যে টিকিয়ে রাখবে যতদিন না ফিলিস্তিনী জনগণের লড়াইকে আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জনগণের লড়াই বলে গন্য না করি।

ততোদিনে আর কতো ফিলিস্তিন শিশুকিশোরকে আত্মাহুতি দিতে হবে, কে জানে।

জন পিলজার

বালী ও সাম্রাজ্যবাদ

তরজমা: আ-আল মামুন

> পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এই যুগে মিডিয়া এমন একটা দুনিয়ার সামনে আমাদের হাজির করছে যেখানে যেকোনো কোথাও একটা বোমা ফাটলেই তার পেছনে বিন-লাদেনের ছায়া দেখা যাচ্ছে। কোনো ঘটনাকে তার পটভূমি-পরিস্থিতিসহ বোঝার চেষ্টা এখন তাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। জন পিলজারের এই পটভূমি-বিশ্লেষণ আমাদেরকে বালীর সমুদ্রসৈকতে বিস্ফোরিত বোমার 'ইতিহাস' অথবা বিদ্যমান আতঙ্কের উল্টা পিঠের 'দীর্ঘ স্মৃতির বহর' উন্মোচন করে দেখিয়েছে। লেখাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেড-নেট (www.znet.org) থেকে নেয়া।

"What passing bells for those who die as cattles" – লিখেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খ্যাতিমান কবি উইলফ্রেড ওয়েন। তার এই বিখ্যাত লাইনটি যেন লেখা হয়েছে আজ যারা গুপ্তযুদ্ধ ও সন্ত্রাসী নিষ্ঠুরতায় নিহত হচ্ছেন তাদেরই উদ্দেশ্যে।

তার প্রজন্মের লোকজন কখনোই "সন্ত্রাসবাদ" শব্দটির ব্যবহার করেনি; কিন্তু যে-গণহত্যার তারা শিকার হয়েছে তা ছিল ভয়ানক শ্বাসরোধী স্তরের সন্ত্রাসবাদ এবং তার প্রয়োগকারীরা কোনো ছায়াশরীরী মৌলবাদী ছিল না, ছিল সরকার: তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করার সময় জোরের সাথে দেশ ও প্রভাবশালীদের দোহাই দেয়।

গত সপ্তায় বালীতে সংঘটিত বর্বরতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার মতোই, বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত কোনো ঘটনা নয়। সকল কিছুর মতো, এগুলোও অতীতের কর্মফল। জর্জ ডব্লিউ বুশ, টনি ব্লেয়ার এবং বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডের মতানুযায়ী, তারা কী পরিস্থিতিতে আছে তা উপলব্ধি করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আমরা কেবল চাই অবশ্য-অবশ্যই অপরাধীদের ধরতে, জীবিত অথবা মৃত।

বুশের সৈন্যসামন্ত ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে এখন পর্যন্ত যে প্রমাণযোগ্য কোনো সন্ত্রাসীকে ধরতে পারেনি এমন তথ্যের বিপরীতে ইরাকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য, যার ধ্বংসযজ্ঞ হবে বালী-ঘটনার চেয়ে বহুগুণ বেশি, বুশের আধা মূর্খ হুমকি ও ব্লেয়ারের মিশনারী ধোঁকাবাজী এখন নির্মম প্যারোডির মতো শোনায়। "সন্ত্রাসী হামলা" কথাটা কেবল বাগাড়ম্বর নয়; এ্যাটর্নী জেনারেল লর্ড গোল্ডস্মিথ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার যদি এই কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হয় তবে একসময় নিজেকে আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করবে।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস একটা অ-কহতব্য শব্দবন্ধ। রাজনীতিকরা কখনোই এটা উচ্চারণ করেন না। সংবাদপত্রগুলো কদাচিৎ এর বর্ণনা দেন। একাডেমিক "বিশেষজ্ঞরা" এবিষয়টি চেপে যান; তা সত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্রেই বালী এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের মতো অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মূল কারণ বুঝে নিতে এটা আমাদেরকে সাহায্য করে। এপর্যন্ত দেখা সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়ানক ধরনের। কারণ, এরূপ সন্ত্রাসের সামর্থ্য ২০০ লোককে মারার মধ্যে সীমিত নয়, এর সামর্থ্য হাজার হাজার মানুষকে মারা। ইরাকের ওপর প্রতিটা ক্লাস্টার বোমা ফেলা হবে অসংখ্য শেরি ক্লাবের তূল্য। হিরোসিমা নগরীর ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ ছিল টুইন টাওয়ারের ধ্বংসযজ্ঞের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার মদদপুষ্ট রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস গত চল্লিশ বছর ধরে ইন্দোনেশিয়াকে সন্ত্রস্ত রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, নির্মম সহিংসতার প্রধান উৎস হলো ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনী, যে-সেনাবাহিনী পশ্চিমা সমর্থিত ও অস্ত্রসজ্জিত। আজও সেনা-বাহিনী আছে্ এবং পশ্চিম পাপুয়া প্রদেশের জনগণকে সন্ত্রস্ত করে চলেছে; সেখানে তারা মার্কিন এক্সন তেল কোম্পানির সম্পদ এবং ফ্রিপোর্ট খনি "রক্ষা" করছে।

পশ্চিম পাপুয়াতে সেনাবাহিনী প্রকাশ্যেই ইসলামী গোষ্ঠী লস্কর জিহাদকে সমর্থন করে, যা আল কায়েদার সাথে সম্পর্কিত। এই সেনাবাহিনীকেই অষ্ট্রেলীয় সরকার দশকের পর দশক ধরে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা স্থুল আকার ধারণ করার সময়ও প্রকাশ্য-সমর্থন দিয়েছে।

১৯৯৯ সালে, অষ্ট্রেলীয়ার উত্তর সীমান্তের নিকটতম প্রতিবেশী পূর্ব তিমুরের, যা জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বাধীন ইন্দোনেশীয়া দখল করে নিয়ে রাজ্যভুক্ত করেছিল, জনগণের সামনে অবশেষে ভোটদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের সুযোগ যখন এলো জন হাওয়ার্ডের সরকারই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অষ্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যদিও আগে থাকতেই সতর্ক করে দিয়েছিল যে ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী মিলিশিয়াদের মোতায়েন করছিল জনগণকে সন্ত্রস্ত করার অভিপ্রায়ে, তবু হাওয়ার্ড ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাওনার কিছু জানতেন না বলে দাবী করেন; এবং গণহত্যা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এঘটনার পর থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিপত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, তারা জানতেন।

ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রীয় সহিংসতার সাথে অষ্ট্রেলিয়ার দীর্ঘ যোগসাজশের এটা কেবল সাম্প্রতিক একটা দৃষ্টান্ত, যা গত সপ্তায় দেয়া আত্ম-প্রবঞ্চণামূলক ঘোষণাকে – বালীতে অষ্ট্রেলিয়া তার "নিষ্পাপতা খোয়ালো" – কৌতুক করে। গুটিকয়েক অষ্ট্রেলীয় নাগরিক নিশ্চয় অবগত আছেন যে তাদের অবকাশ যাপনের হোটেলের নিকটেই রয়েছে ১৯৬৫-৬৬ সালে বালীতে নিহত ৮০,০০০ মানুষের হাড়গোর ঢাকা গণকবরগুলো, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল অষ্ট্রেলীয় সরকারের মদদে।

সম্প্রতি প্রকাশিত নথিপত্র থেকে উন্মোচিত হয়েছে যে ১৯৬০ এর দশকে ইন্দোনেশীয় স্বৈরাচার জেনারেল সুহার্তো যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন, তিনি সেটা করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়া সরকারের গোপন সমর্থনে; যারা কিনা এই বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে দিতে কিংবা পাঁচ লক্ষাধিক "কমিউনিস্ট" হত্যা করতে সক্রিয় সহযোগিতা দেয়। এঘটনাকে পরবর্তীতে সিআইএ বর্ণনা করে, "বিশ শতকের নিকৃষ্টতম গণহত্যা" হিসেবে।

অষ্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড হল্ট চাতুর্যের সাথে বলেন, "৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ কমিউনিস্ট ভক্তকে ভূপতিত করার ফলে, আমি মনে করি, এখন পুনরায় কাজ শুরু করার পথ নিরাপদ হয়েছে।" হল্টের মন্তব্য যথাযথভাবেই অষ্ট্রেলিয়ার বিদেশনীতি ও রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা দানের চিত্র বিম্বিত করে। জাকার্তায় অবস্থিত অষ্ট্রেলীয় দূতাবাস গণহত্যাকে বর্ণনা করে "শোধন প্রক্রিয়া" হিসেবে। ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রী-দপ্তরের কর্মকর্তারা "আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রত ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীকে যেকোনোরূপ সহযোগিতামূলক পদক্ষেপকে" সমর্থন জানায়।

সুহার্তোর রক্তাক্ত উত্থান হয়তো সফল হতো না যদি কিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করতো। একটি আধুনিকতম মাঠ পর্যায়-যোগাযোগ-সিস্টেম মার্কিন বিমান বাহিনীর প্লেনে করে রাতের অন্ধকারে নিয়ে এসে ইন্দোনেশিয়ায় বসানো হয়, যা ছিল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং যা সরাসরি সিআইএ ও প্রেসিডেন্ট জনসনের পরামর্শদাতা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সাথে সংযুক্ত। সুহার্তোর জেনারেলদেরকে এটা কেবল হত্যাকাণ্ড চালানোর কাজে সমন্বয় করতেই সাহায্য করেনি; এতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে সবকিছু শোনা হচ্ছিল এবং সুহার্তো দেশটির বৃহত্তর অংশ অবরুদ্ধ করে রাখতে পারতো। মার্কিন দূতাবাসে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সুহার্তোর জন্য হত্যার তালিকা প্রণয়ন করেন, অতঃপর একটা করে হত্যাকাণ্ডের পর তালিকায় একটা করে টিক চিহ্ন দিয়ে দেন। বিশ্বব্যাংকের বর্ণনা মাফিক "বিশ্ব অর্থনীতির মডেল-জনতা" হিসেবে আজকের ইন্দোনেশিয়া গড়ে উঠেছে পূর্বের ঐ রক্তস্নানের মূল্যে। পশ্চিমা কর্পোরেশনগুলোর কাছে এটা ছিল ইন্দোনেশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের সবুজ সংকেত। ফ্রিপোর্ট কোম্পানী পশ্চিম পাপুয়া প্রদেশে তামা ও স্বর্ণের একটি পাহাড় লাভ করে। নিকেল খনিগুলো পায় মার্কিন ও ইউরোপীয় কনসোর্টিয়াম। ইন্দোনেশিয়ার বক্সাইট খনিগুলোর বৃহদাংশ পায় বৃহদায়তনিক আলকোয়া কোম্পানী। অন্য কোম্পানীগুলো নেয় সুমাত্রা ও কালিমানতান প্রদেশের ক্রান্তিয় বনভূমি; আর সুহার্তো ও তার সহযোগীরা পায় এই ভাগবাটোয়ারার অংশবিশেষ, যাতে তারা লক্ষপতি, কোটিপতি হয়ে ওঠে।

১৯৭৫ সালে, যেমন সহিংসতার মাধ্যমে সুহার্তো ক্ষমতায় এসেছিল তেমন সহিংসতা পর্তুগীজ কলোনি পূর্ব-তিমুরেও ছড়িয়ে পড়ে। সুহার্তোর সৈন্যদল দখলাভিযান চালায়, এবং পরবর্তী ২৩ বছরে দুই লক্ষাধিক লোক, যা পূর্ব-তিমুরের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, নিহত হয়। পূর্ব-তিমুরে রক্তাক্ত দখলদারিত্বের বেশিরভাগ সময়জুড়ে সুহার্তোর অস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতির বৃহত্তম সরবরাহকারী ছিল বৃটেন। এক বছরেই সুহার্তোকে রপ্তানী আয় থেকে পরিশোধযোগ্য এক বিলিয়ন পাউন্ড লোন দেয়া হয় যাতে করে তিনি বৃটিশ এ্যারোস্পেস হক (Hawk) জেট কিনতে পারেন। আজ সুহার্তো নেই কিন্তু কয়েক যুগের বিদেশী লুণ্ঠন, সেইসাথে কুখ্যাততম গণহত্যাকারীর শাসন ইন্দোনেশীয় সমাজকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির "মডেল-জনতা" অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি ঋণগ্রস্ত, এবং হাজার হাজার ইন্দোনেশীয় নাগরিক প্রবল দারিদ্রে পতিত হয়েছে। বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়াতে এবং কট্টর ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সমর্থক বৃদ্ধি পাওয়াতে তাই বিশেষ বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

বালীতে বোমাবর্ষণের জন্য দায়ী কে ছিল? আমরা জানি না, কিন্তু প্রেসিডেন্ট মেঘবতির নির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল করার পর্যাপ্ত আলামত রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জেনারেলদের মধ্যে। তাদের অনেকেই যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন এবং দোষীদের বিচার সম্পন্ন করার জন্য সামান্য মাত্রায় হলেও পশ্চিমা চাপ রয়েছে, বলকানে যা নেই। গণতন্ত্র আসায় সেনাবাহিনীর অনেক বিশেষ সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সংসদে সেনাবাহিনীর জন্য নির্ধারিত একগুচ্ছ স্থায়ী আসন। গতমাসে, সেনারা পশ্চিম পাপুয়াতে একটা "এ্যামবুশ" করে এবং দাবী করে যে সেটা ছিল কোন এক স্থানীয় গেরিলা গোষ্ঠীর কাজ – যা

থেকে মনে হয়, সেনাবাহিনী এই বার্তা দিচ্ছে যে তারা এখন বিদেশীদের টার্গেট করবে এবং এই ঘটনায় দু'জন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়।

জাকার্তার সেক্যুলার সরকারের ওপর, ইসলাম প্রধান একটি দেশের, ইসলামী গোষ্ঠীগুলো "দমন" করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও বৃটেনের চাপের কারণে যেটা ঘটতে পারে তা হলো সমাজে প্রবল মেরুকরণ ঘটবে। কারো কারো কাছে এটাকে মনে হতে পারে ক্ষমতাবানদের সেই সুপরিচিত খেলা হিসেবেই। ১৯৬০ এর দশকে ইসলামী গোষ্ঠীগুলোকে পশ্চিমা-সভ্যতা মদদ জুগিয়েছিল কারণ তারা ভেবেছিল ইন্দোনেশিয়া "কমিউনিস্ট" হয়ে যাবে। তারা তখন ছিল খরচযোগ্য। বুশ, ব্লেয়ার এবং হাওয়ার্ড যখন আজ মায়া কান্না কাঁদছেন এবং ভাষাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জীর্ণ "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" শব্দ প্রয়োগ করছেন, তখন ইন্দোনে-শীয়ার নাগরিকরা, যাদের রয়েছে দীর্ঘ স্মৃতির বহর, যদি ভাবে যে কিছুই বদলায়নি; তবু তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া যায়।

অক্টোবর ২৫, ২০০২

অ্যান ট্যালবট

কেনিয়ায় সন্ত্রাসী হামলা: উত্তরহীন প্রশ্নাবলী

তরজমা: বদরে মুনীর

এই লেখাটা সংগ্রহ করা হয়েছে ইণ্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট ওর্গানাইজেশন কর্তৃক পরিচালিত ওয়ার্ল্ড সোশ্যালিস্ট ওয়েবসাইট (wsws) থেকে। কেনিয়ায় সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী করে যে-অভিযোগগুলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে করা হয়েছে আল-কায়েদা, আল-ইত্তিহাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সেইগুলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই লেখায়। দেখা গেল, পশ্চিমের অভিযোগগুলা খুব একটা ধোপে টেকে না। আরও বোঝা গেল, খোদ ইসলাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে না।

কেনিয়ার মোম্বাসায় ইজরায়েলি মালিকানাধীন প্যারাডাইজ হোটেল-এ ২৮শে নভেম্বরের বোমা হামলা, এবং অবকাশ-কাটানো ইজরায়েলি যাত্রীভর্তি বিমানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য মার্কিনী, এবং ইজরায়েলি সূত্রগুলো আঙুল তুলে অভিযুক্ত করেছে আল-কায়েদা-কে।

এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে ১৬ জন। নিহতদের মধ্যে দু'জন শিশুসহ ইজরায়েলি তিনজন। কেনিয়ান হোটেল-কর্মচারী দশজন, যাদের ভেতর রয়েছে একটা নাচের দল, নতুন অতিথিদের জন্য অভ্যর্থনাকক্ষে যারা নৃত্য পরিবেশন করছিল।

নিহতদের তিনজন আত্মঘাতী বোমহামলাকারী একটা সবুজ পাজেরো জীপ নিয়ে হোটেলের ফটক ভেঙে লবিতে ঢুকে পড়ে এবং বিস্ফোরণ ঘটায়।

এর মিনিট বিশেক আগে আরিকা এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৫৭-৩০০ জানায়, তেল আবিব-এর উদ্দেশ্যে মোম্বাসা ছাড়ার পরপরই তাদের বিমান লক্ষ্য ক'রে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রটি বিমানে আঘাত করেনি এবং কেউই হতাহত হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, চার এঞ্জিনের একটা শাদা গাড়ি দেখা গেছে রানওয়ের শেষ প্রান্তের কাছে। পুলিশ পরে ঘটনাস্থল থেকে দুটি অব্যবহৃত স্যাম-৭ ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ধার করে।

'আর্মি অব প্যালেস্টাইন' নামধারী এক অপরিচিত সংগঠন এ-হামলার দায়িত্ব দাবি করেছে, কিন্তু ইজরায়েলি এবং যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তকারীরা সোমালিয়া ভিত্তিক সংগঠন আল ইত্তিহাদ আল ইসলামিয়া (এআইএআই) কে দায়ী করেছে। তাদের মতে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

এই সংগঠনের সাথে আল-কায়েদা'র যোগাযোগ রয়েছে।

সহজেই এই বর্বর হামলা আরো অনেক মানুষ মারতে পারত। হামলার লক্ষ্য বিমানটিতে ছিল ১৪০ জন যাত্রী এবং ১০ জন ক্রু। হোটেলের বোমাটি যদি আর একটু আগে বিস্ফোরিত হত, বিস্ফোরণের কবলে পড়ত নতুন আগত বাসভর্তি পর্যটকেরা। অতিথিদের অধিকাংশই সকালের নাস্তা সারতে গিয়েছিলেন অথবা ছিলেন নিজেদের কক্ষে। নিহত বালক দুটো ফিরে এসেছিল নাচ দেখতে।

নিহতদের অনেকে এসেছিল একই গ্রাম থেকে, যেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশ পর্যটকদের কাছে ভিক্ষা ক'রে কিছু পয়সা জোগাড়ের আগে পর্যন্ত নিহতদের আত্মীয়দের এমনকী শবাগারের পাওনা মিটিয়ে প্রিয়জনের লাশ দাফনের সামর্থ্যটুকুও ছিল না।

এরকম বোমা বিস্ফোরণ এর আগেও ঘটেছে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির আমেরিকান দূতাবাসে, ১৯৮৮ সালে। সে-বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিল ২৫০ জন, এবং পরবর্তীতে পঙ্গু হয়েছে আরও ১,০০০ জন, যাদের অধিকাংশই কেনিয়ান।

যুক্তরাষ্ট্র, অথবা ইজরায়েল-এর কোনও পদক্ষেপই এই সমস্ত অপরাধ-কর্মকাণ্ড বিবেচনায় আনেনি, যার ফলশ্রুতিতে খুন হচ্ছে নিরাপরাধ জনগণ, যারা নিয়োজিত ছিল সাধারণ দৈনন্দিন কাজকর্মে, অথবা কেবল খুঁজতে এসেছিল অবকাশের আনন্দ। কোনও প্রকারেই তারা দুনিয়ার নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মার্কিন-আগ্রাসন-বিরোধী ভূমিকাকে সহায়তা করে না। বরং উল্টো, মোম্বাসা আক্রমণে মার্কিন নেতৃত্বাধীন "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"র আপাতন্যায্যভাবে আরও সুযোগ ঘটলো প্রসারিত হওয়ার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-ব্যাপার সেটা হচ্ছে, ইজরায়েলি সরকার এই হামলার ফলে ইজরায়েলে ফিলিস্তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলার সাথে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যগুলোর একটা সংযোগ আবিষ্কারের মওকা পেল।

মোম্বাসা বোমা হামলার সাথে কাকতালীয় সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে একই দিনে ইজরায়েলের বিয়েত শে'আনে লিকুদ পার্টি-দপ্তরে বন্দুকধারীদের আক্রমণের। নতুন দলনেতা নির্বাচনের প্রাথমিক ভোটগ্রহণকালে এই হামলায় নিহত হয় ছয়জন, আহত ৪৩ জন। আল আকসা মার্টায়ার্স ব্রিগেড এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে।

ইজরায়েলি কর্মকর্তারা মোম্বাসা হামলায় আল-কায়েদাকে জড়িত করার কারণ, বিমানবন্দর এবং হোটেল-এ যুগপৎ হামলার জন্য দরকার জোরদার পরিকল্পনা; এবং আরও একটা কারণ, হামলার লক্ষ্য ছিল পর্যটকরা; বালী বোমা হামলারও লক্ষ্য ছিল পর্যটকরা, এবং এ-হামলার জন্যও দায়ী করা হয়েছে আল-কায়েদাকে। এই ঘোষণার পর ইজরায়েলও এখন আল-কায়েদা'র আক্রমণের লক্ষ্য, হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য তারা মার্কিন সহযোগিতা চেয়েছে।

বুশ প্রশাসন তার "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" থেকে ফিলিস্তিনি প্রসঙ্গকে পৃথক রাখার উদ্যোগ নিয়েছে, কেননা ইজরায়েল সরাসরি পর্দায় চলে এলে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণে সমর্থন জোগাতে আরব বিশ্ব উৎসাহী হবে না। কিন্তু ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন মার্কিন প্রশাসনের চরম বেপরোয়া ডানপন্থী শক্তিগুলোর কাছে জোর তদবির চালিয়ে যাচ্ছে, তারাও ফিলিস্তিনি-নির্মূলযজ্ঞে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলি নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে শ্যারনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

মোম্বাসা হামলা এবং লিকুদ পার্টি-দপ্তরে হামলার সংবাদের মধ্য থেকে শ্যারন দলনেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দিতে সমর্থ হলেন। ২৮শে

নভেম্বর বিকালের ঠিক আগ মুহূর্তেও শ্যারন চিন্তিত ছিলেন যে, ফলাফল কিছুটা মোড় নিয়ে তার অবস্থান টলিয়ে দিতে পারে, এবং নেতানিয়াহু জিতে যেতে পারে। ইজরায়েলি সংবাদপত্র *হারেত্জ্* অনুসারে, শ্যারনের দপ্তর দেখাচ্ছিল বিধ্বস্ত এলাকার মতো, এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে যতক্ষণ না কেউ একজন নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবস্থান কক্ষে নেতানিয়াহু ও এক অঘোষিতপূর্ব সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, সে-সময় তার হাতে-ধরা ফ্যাক্সবার্তায় ছিল মোম্বাসায় নিহত শিশু দু'টির নাম।

হামলার পর ইসলামপন্থী এক ইন্টারনেট *সাইন*-এ আল-কায়েদা কর্তৃক দাবিকৃত এক বার্তায় মোম্বাসা হামলার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। যদিও এ-দাবির সত্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ, কেননা আল-কায়েদা অতীতে এমন কোনও স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেনি, কিন্তু ইজরায়েলি নিরাপত্তা দপ্তর এই বিবৃতি লুফে নিয়েছে। ইজরায়েলি জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান, ইফরাইম হালবি, সংবাদ-মাধ্যমে বলেছেন, মোম্বাসা হামলাকে "মহাসন্ত্রাসী হামলা" হিসাবে দেখা উচিত, এবং তিনি সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে, ইজরায়েল এর পাল্টা জবাব দেবে "অভিনব এবং আকস্মিক উপায়ে"।

এটা হয়তো সম্পূর্ণ কাকতালীয় যে, মোম্বাসা হামলা শ্যারনকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে আল-কায়েদার সাথে ইজরায়েলিদের প্রতি ফিলিস্তিনি হামলাকে যুক্ত করার, এবং লিকুদ পার্টির নির্বাচনের মোড় তার পক্ষে ঘুরিয়ে নেয়ার, কিন্তু কেনিয়ার হামলার সাথে ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা, মোসাদ-এর জড়িত থাকার বিষয়টা কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না।

অবশ্য এটা সম্ভব যে স্যাম-৭ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যথেষ্ট নির্ভুল ছিল না, অথবা সেগুলোর ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা অপর্যাপ্ত ছিল; কিন্তু এটা দুর্বোধ্য যে, দু'দুটো তাজা ক্ষেপণাস্ত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০ ফুট উচ্চতার বিমানকে ছুঁতেও পারল না! তারপরও ইজরায়েলি যাত্রীবাহী বিমানটির সম্ভবত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সামলে নেয়ার শক্ত প্রস্তুতি ছিল, যা সাধারণত থাকে না।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিমানটি নকল ঝালর পরিবেষ্টিত ছিল, মিলিটারি বিমানগুলোর সচরাচর যেমন থাকে। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যুত্থানতত্ত্ব (ইনসার্জেন্সি) বিভাগের প্রভাষক এবং প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্মী ঈগাল এইয়েল বলেছেন, এই ঘটনা "বিমান চলাচলে ক্ষেপণাস্ত্ররোধক প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের এক দৃষ্টান্ত হতে পারে।" তার বক্তব্যানুসারে বেসামরিক বিমানকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে রক্ষার জন্য ইজরায়েল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে ১৯৭০-এর দশক থেকে।

যাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এই ধারণাকেই আরও নিশ্চিত করে যে, ক্ষেপণাস্ত্ররোধক কিছু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিমানে প্রযুক্ত ছিল। বিমানের এক পাখায় ছোট্ট বিস্ফোরণ দেখার কথা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা, যা নকল ঝালরে আগুন জ্বলার প্রতি ইঙ্গিত করে। ব্যয়বহুল বলে বাণিজ্যিক বিমানগুলোতে সাধারণত এ-ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় না। আরিকা কোম্পানির বোয়িং ৭৫৭-৩০০ বিমান আছে দুইটি, যার একটি ব্যবহৃত হয়েছিল এ-বছরের গোড়ার দিকে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন যখন ওয়াশিংটন যান। যদি একই বিমান মোম্বাসার ঘটনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো ব্যাপারটা যে ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের পূর্বজ্ঞাত, এমনই ধারণা তৈরি হয়।

এ-ধরনের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডে মোসাদ-এর পূর্বখ্যাতি রয়েছে। লিবিয়ায় মার্কিন বিমান হামলার অজুহাত যুগিয়েছিলো ১৯৮৬ সালে বার্লিনের ডিস্কোতে যে বোমা হামলা, তার অভিযুক্তদের একজন পরবর্তীতে মোসাদ-এর পক্ষে কাজ করার কথা স্বীকার করেছে।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল পূর্ব আফ্রিকায় সমূহ সন্ত্রাসী হুমকির ব্যাপারে সতর্কতাকে

আমলেই আনা হয় নি। লন্ডন ভিত্তিক ইসলামী সংগঠন আল মুজাহিরন প্রধান শেখ ওমর মোহাম্মেদ বলেছেন, সতর্ক সংকেত ইন্টারনেট-এ প্রকাশিত। তিনি বলেন,

> আল-কায়েদা'র সাথে সহমর্মিতা বোধ করে এমন চরমপন্থী দলগুলো কেনিয়ায় হামলা হতে পারে বলে এক সপ্তাহ আগে সতর্ক ক'রে দিয়েছে, এবং তারা ইজরায়েলিদের কথা উল্লেখ করেছে।

অস্ট্রেলিয়া সরকার বোমাবিস্ফোরণের দুই সপ্তাহ আগে এক সতর্ক সংকেত ঘোষণা করে, "কেনিয়ার সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাবনা, বিশেষত নাইরোবি অথবা মোম্বাসায়"। ঘোষণায় অস্ট্রেলিয় পর্যটকদের মোম্বাসায় সমস্ত অনতিজরুরি ভ্রমণ স্থগিত রাখতে পরামর্শ দেয়া হয় এবং যারা এর মধ্যেই মোম্বাসায় অবস্থান করছিল তাদেরকেও মোম্বাসা ত্যাগ করা উচিত বলে জানানো হয়। সিডনি মর্নিং হেরাল্ড অনুসারে ব্রিটিশ গোয়েন্দাসূত্র মারফত এ-তথ্য পাওয়া গেছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মেই, ইজরায়েলসহ অন্যান্য সরকারকে এ-সতর্কতা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। জার্মানীও এই সতর্ক সংকেত পেয়েছে এবং যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে তার নাগরিকদের সাবধান করে দিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ইজরায়েলি সরকারের মুখপাত্র এরকম কোনও সতর্ক সংকেত পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। কিন্তু বিস্ফোরণের চারদিন পর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়োসি কুপারওয়াসার মেনে নিয়েছেন যে কেনিয়ার হামলার হুমকি সংক্রান্ত ইজরায়েলি সামরিক গোয়েন্দাদের জানা ছিল। এ-তথ্যের গুরুত্ব চাপা দিতে তিনি জোর গলায় দাবি করেছেন যে, তথ্যটির যথেষ্ট সুনির্দিষ্টতা ছিল না। প্রাক্তন মোসাদ-প্রধান ড্যানি ইয়াটম একই ধারায় দাবি করেছেন যে, ইজরায়েল ভুরি ভুরি সন্ত্রাসবাদী সংকেত পেয়ে থাকে যার সবগুলোকে সঠিক গুরুত্বের সাথে নেয়া যায় না।

ইজরায়েলি সরকারের উদাসীনতার পেছনে সতর্কতাজনিত ক্লান্তির যুক্তি অগ্রহণযোগ্য। অন্যান্য সরকার যে বিষয়কে সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট মারাত্মক এবং যথাযথ সুনির্দিষ্ট মনে করল, সেখানে ইজরায়েলি সরকার চুপচাপ তার নাগরিকদের বিপদের মুখে ঠেলে দিল। এ দায়িত্ব অন্তত ইজরায়েলি সরকার এড়াতে পারবে না।

কেনিয়ায় হামলা এই অঞ্চলে উচ্চ পর্যায়ের পশ্চিমা সামরিক কর্মকাণ্ডের গোড়াপত্তনের বিরুদ্ধে এর জায়গা ক'রে নিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন সেনারা কেনিয়ান সেনাদের সাথে নিয়ে ইদগেদ মালেত নামে অভিযান শুরু করেছে উত্তর মোম্বাসায়। কেনিয়া এবং তানজানিয়া বহুপূর্ব থেকে মার্কিন গোয়েন্দা তৎপরতার ঘাঁটি এবং বলা হয়ে থাকে, এতদঞ্চলে সি.আই.এ.-এর তাৎপর্যপূর্ণ কর্মতৎপরতা রয়েছে। এমনকী, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে মোম্বাসা বিমানবন্দরে, যেখানে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে কেনিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীকে "মালপত্র সরবরাহ ও বিলিবণ্টনে সহায়তা" করার উদ্দেশ্যে।

ইতোমধ্যে জার্মান বিমান বাহিনী মোম্বাসার আকাশে টহল দিতে শুরু করেছে এবং তারা কেনিয়া, সোমালিয়া ও পাকিস্তানের জাহাজ চলাচলের ওপর নজর রাখছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'আফ্রিকার শৃঙ্গ' বলে খ্যাত জিবুতিতে সামরিক শক্তির উপস্থিতি, এবং আফ্রিকার সমস্ত পূর্ব উপকূলকে দেখা যাচ্ছে এক চূড়ান্ত নজরদারির ছায়ার নিচে। প্রকাশ্য এবং লুকায়িত এমন ব্যাপক বিস্তৃত সামরিক গোয়েন্দা উপস্থিতির পরও সন্দেহভাজন সোমালি অথবা আল-কায়েদা সন্ত্রাসীরা দেশটাতে ঢুকতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদের সাম্প্রতিক বোমা হামলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেছে।

মোম্বাসা বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহে একমাত্র যে নামটি উল্লেখ করা হচ্ছে সেটি একজন ইয়েমেনির, আব্দুল্লাহ আহমেদ আব্দুল্লাহ; ১৯৯৮-এর দূতাবাস বোমা হামলার জন্যও তিনি দায়ী

ব'লে আমেরিকার অভিযোগ ছিল। আল ইত্তিহাদ আল ইসলামিয়া'র সাথে তার কেমন যোগাযোগ থাকতে পারে সেটা অবশ্য পরিষ্কার না। তার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, গত পাঁচ বছর ধরে তিনি আফ্রিকায় ঘুরছেন এবং সাম্প্রতিককালে তিনি আল-কায়েদা'র জন্য সিয়েরা লিয়েনে হীরা চোরাচালান সংক্রান্ত ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে কেনিয়ায় ছিলেন, অথবা সাম্প্রতিক হামলায় তার কোনও যোগাযোগ রয়েছে, এমন বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে আল ইত্তিহাদ আল ইসলামিয়া'র ওপর, ১৯৯১ সালে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বসে গেলে এবং মার্কিন-সমর্থিত সিয়াদ বারা সরকারের পতনের পর সোমালিয়ার এই সংগঠনের উত্থান ঘটে। এদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ক'রে গোত্রদ্বন্দ্বে বিভাজিত সোমালিয়ার একত্রীকরণ। এ-ক্ষেত্রে গোত্রে গোত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইথিওপিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপ অধিক শক্তিশালী প্রমাণিত হয়, এবং সশস্ত্র শক্তি হিসাবে ১৯৯৬ সালেই সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে। "আশা পুনরুদ্ধার অভিযানে" মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এরা সামান্যই ভূমিকা রাখতে পেরেছিল, এবং মার্কিনিদের জন্য একটি মাত্র বিপর্যয় ঘটিয়েই এরা ফুরিয়ে যায়, যার ফলে ১৯৯৩ সালে মোগাদিসুতে নিহত হয় ১৮জন মার্কিন সেনা।

গত বছর ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম আল ইত্তিহাদ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। এই পত্রিকার মতে যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনটিকে আল-কায়েদা'র সাথে সম্পর্কিত বিবেচনা করে। পত্রিকা আরও অভিযোগ করে যে, ১৮ জন মার্কিন সেনা হত্যায় গোত্র প্রধান মোহাম্মদ আইদদি-কে সাহায্য করার জন্য ওসামা বিন লাদেন তার কিছু লেফটেন্যান্টকে সোমালিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

আফগানিস্তানে যুদ্ধের পর আল-কায়েদা সদস্যদের সোমালিয়ায় পালাতে বলা হয়, যেখানে তারা আল ইত্তিহাদের সাথে যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ ঘাঁটি গ'ড়ে তোলে। এ-বছর সেপ্টেম্বরে মার্কিন প্রশাসন সোমালি মুদ্রা বিনিময়কারী প্রতিষ্ঠান আল বারাকাত-এর বিরুদ্ধে আল কায়েদা'কে অর্থনৈতিক সাহায্য সরবরাহের অভিযোগ প্রত্যাহার করে।

সেই অসফল অভিযোগ এখন আবার নবায়িত হয়েছে। আল বারাকাত-এর সভাপতি, যিনি ১৯৯০ দশকের গোড়ার দিকে আল ইত্তিহাদ এর নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন, অভিযুক্ত হয়েছেন বাহামাস-এ বিন লাদেনের নামের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এ মুনাফা পাচারের দায়ে। একই কারণে সিনিয়র জর্জ বুশ অভিযুক্ত হ'তে পারেন বিন লাদেনের অর্থ যোগানদাতা হিসাবে, কেননা তার কার্লাইল গ্রুপ ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম বিন লাদেনের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে।

আফ্রিকা বিষয়ক প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ড্রোডেন জানিয়েছেন, গোত্ররাজনীতির ব্যাপকতার ফলে সোমালিয়ায় কাজ করার উদ্যোগ বিদেশি মানবাধিকার কর্মীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হ'তে পারে। "বহিরাগতরা" অবজারভার-এ তিনি লিখেছিলেন,

> বিশেষ করে ধনীরা রাজস্বের প্রধানতম উৎস। নির্বিচারে তাদের অপহরণ করা হয় এবং মুক্তিপণ আদায় ক'রে ছাড়া হয়। ওসামা বিন লাদেন হতে পারেন সবিশেষ মূল্যবান পুরস্কার।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ এ-বিষয়ে একমত। কংগ্রেসবিষয়ক গবেষণা সংস্থার টেড ডেঞ্জ আল বারাকাত বন্ধ করে দেয়ার মার্কিনী সিদ্ধান্তকে "এক মারাত্মক ভুল" বলে অভিহিত করেছেন যা ভর করে আছে "বাতিল গোয়েন্দাগিরির" ওপর। জাতিসঙ্ঘের সোমালিয়া বিষয়ক প্রাক্তন উপদেষ্টা কেন মেংখাউস, পরে যিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন, গত বছর বুশ-প্রশাসনকে জানিয়েছেন যে, সশস্ত্র সংগঠন হিসাবে আল ইত্তিহাদ-এর আর কোনও অস্তিত্ব নাই।

আকাশে-সমুদ্রে এত বিস্তৃত পাহারদারি সত্ত্বেও বুশ প্রশাসন সোমালিয়ায় আল-কায়েদা অথবা আল ইত্তিহাদ প্রশিক্ষণ শিবিরের অবস্থান আছে বলে তাদের যে অভিযোগ তার সমর্থনে

প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর ওপর এরকম অব্যাহত হুমকি-ধামকি চালিয়ে যাওয়া, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সমরকৌশলগত আগ্রহকেই বিম্বিত করে।

সোমালিয়ার নিয়ন্ত্রণে আছে "আফ্রিকার শৃঙ্গ", উপসাগর থেকে আসা সমস্ত তেল-ট্যাংকারকে যা অতিক্রম করতে হয়। ইরাককে পরাভূত করার, এবং এর তেলক্ষেত্রগুলো করায়ত্ত করার সবটা সুফল যদি যুক্তরাষ্ট্র ঘরে তুলতে চায় তো এই অঞ্চলের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি। আল ইত্তিহাদ নয়, হুমকির কারণ বরং অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উপস্থিতির সম্ভাবনা যা সোমালিয়াকে কব্জা ক'রে বিশ্বের তেল সরবরাহের ওপর মার্কিন-নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করতে পারে, এবং সে-কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ দখলে রাখার পাঁয়তারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভূতপূর্ব ফরাসি উপনিবেশ জিবুতি থেকে সোমালিয়ার উত্তর পর্যন্ত এলাকাটুকু জার্মান বাহিনীর সমরসজ্জার বৃহত্তম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বারবারা'য় ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, এক গভীর জলবন্দর– যা ভারত মহাসাগরের শ্রেষ্ঠ বন্দরগুলোর একটা। ব্রিটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নৌবাহিনীর বড় বড় নৌকাগুলো সদাসর্বদা এই জলসীমানা দাবড়ে বেড়াচ্ছে আল-কায়েদা সন্ত্রাসীদের খোঁজে।

মোম্বাসায় বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা যে-ই করুক না কেন, ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের সংঘাত আরও বেড়ে যাবে এবং এর জনগণকে তা ঠেলে দেবে এক তীব্রতর সামরিক অভিযানের মুখে, যারা এরই মধ্যে দারিদ্র আর রুগ্নতার কবলে পর্যুদস্ত।

জাতিসংঘ এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে আফগান নারী বিপ্লবী সংঘ ‘রাওয়া’র আবেদন

তরজমা: উদিসা ইসলাম

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিযুক্ত করে পশ্চিমা মিডিয়া আফগানিস্তানের এমন একটা ছবি আমাদের সামনে বিজ্ঞাপনের মত অবিরতভাবে তুলে ধরেছে যাতে তালেবান আর উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে কালো আর ভালোর মত সরল মনে হয়েছে। রাওয়া’র এই ‘আবেদন’ পরিস্থিতির জটিলতা উন্মোচন করে। রাওয়া আফগানিস্তানের নারীসমাজের প্রতিনিধিত্বে এবং তালেবানদের নিপীড়ণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একেবারে সামনের সারির সংস্থা। এই বিবৃতি একদিকে যেমন উত্তরাঞ্চলীয় জোটের একই ‘তালেবানী’ চেহারা তুলে ধরে, তেমনি অন্যদিকে ইঙ্গমার্কিন শক্তির ‘আরোপিত’ সরকারের দুর্বলতার দিকেও ইঙ্গিত করে। বিবৃতিটা রাওয়ার ওয়েবসাইট (www.rawa.org) থেকে নেয়া।

আফগানিস্তানের জনগণ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের আধিপত্য মানে না!

এটা এখন নিশ্চিত যে, তালিবান কাবুল ত্যাগ করেছে এবং উত্তরাঞ্চলীয় জোট নগরে প্রবেশ করেছে।

এ-বিশ্বকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে উত্তরাঞ্চলীয় জোট কতিপয় দলের সমন্বয়ে গঠিত যারা কিনা ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আফগানিস্তান শাসনকালে তাদের অপরাধমূলক এবং অমানবিক আচরণের প্রকৃত চেহারা দেখিয়েছে।

কাবুল থেকে সন্ত্রাসী তালিবানদের পিছনে সরাটা ইতিবাচক অগ্রগতি কিন্তু নগরে ধর্ষক এবং লুটেরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রবেশের সংবাদ কাবুলের ২ লক্ষ অধিবাসীদের, ১৯৯২-৯৬ সালের ক্ষত যাদের এখনো মিলিয়ে যায় নি, জন্য দুঃখের এবং আতংকের।

গত দুই মাসে কাবুল ছেড়ে যে-হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে এসেছে তারা বলেছে, মার্কিন বোমা হামলায় তারা যতটা আতংকিত ছিল কাবুলে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের ক্ষমতা গ্রহণে তারা তার চেয়ে বেশি আতঙ্কিত।

তালিবান এবং আল-কায়েদা উৎখাত হয়ে যাবে কিন্তু আফগানিস্তানের জনগণের বৃহত্তর অংশ বর্বর তালিবানের ঘৃণ্য শেকল থেকে মুক্ত আফগানিস্তানের যে সুখ-স্বপ্ন দেখছিলো

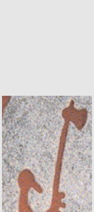

সামরিক শক্তি হিসেবে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের উপস্থিতি তা গুঁড়িয়ে দিবে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট জাতিগত ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ভয়ানকভাবে তীব্রতর করবে এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে আরেকটি বর্বর ও সীমাহীন গৃহযুদ্ধের আগুন উস্কে দেয়া থেকে কখনোই বিরত থাকবে না। গত কয়েক দিনে মাজার-ই-শরিফে তাদের লুণ্ঠন এবং গ্রেফতারকৃত তালিবান কিংবা তাদের বিদেশী সহযোগীদের ওপর পরিচালিত অমানবিক নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ সংবাদ সে সাক্ষ্যই দেয়।

যদিও উত্তরাঞ্চলীয় জোট শিখে নিয়েছে কীভাবে মাঝে মাঝে পশ্চিমের কাছে নিজেকে 'গণতান্ত্রিক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এমনকি নারী অধিকারের সমর্থক সাজতে হবে; প্রকৃতপক্ষে তারা একেবারেই বদলায়নি, যেমনটা চিতাবাঘ তার ডোরাকাটা দাগ কখনো বদলাতে পারে না।

রাওয়া ইতোমধ্যেই উত্তরাঞ্চলীয় জোটের ঘৃণ্য অপরাধের তথ্যাদি সংগ্রহ ও নথিভূক্ত করেছে। সময় চলে যাচ্ছে। রাওয়া নিজে থেকেই এককভাবে জাতিসংঘ এবং সার্বিকভাবে বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে, দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই, আমাদের দুঃস্থ আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রতি জরুরীভিত্তিতে পর্যাপ্ত মনোযোগ প্রদানের আবেদন জানাচ্ছে।

উল্লিখিত বছরগুলোতে উত্তরাঞ্চলীয় জোট কর্তৃক সংঘটিত অবিস্মরণীয় অপরাধের পুনরাবৃত্তি করে ফেলার আগেই জাতিসংঘ এদেশে কার্যকর শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠাবে, আমরা সবিনয়ে সেই আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতিসংঘকে রাব্বানীর নেতৃত্বাধীন তথাকথিত ইসলামী সরকারের প্রতি প্রদত্ত সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ-ভিত্তিক সার্বজনীন সরকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে হবে।

রাওয়ার এই আবেদন আফগানিস্তানের জনগণের বৃহত্তর অংশের আকাঙ্খারই প্রতিফলন।

নভেম্বর ১৩, ২০০১

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি : আফগানিস্তান

হাফিজুর রশীদ

আফগানিস্তানের হাল-হকিকত

আফগানিস্তানকে 'উদ্ধার' করার 'সফল' ইঙ্গমার্কিন অপারেশান চালানোর পরও সেখানকার মানুষের দুর্দশার অপরিবর্তিত পরিস্থিতির যে-বয়ান আমাদের সামনে হাজির তা পশ্চিমা শক্তির আফগানিস্তান-অভিযানের পক্ষে দেখানো যুক্তিগুলার অসারতাই প্রদর্শন করে। লেখাটা *প্রথম আলো পত্রিকার* ২৩শে ডিসেম্বর ২০০২ তারিখের সংখ্যা থেকে নেয়া।

প্রতিশ্রুতি এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে দূরত্বটা যে কেমন তা আফগানিস্তানের জণগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এক বছর আগে তালেবানকে উৎখাত করে হামিদ কারজাইর অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর সময় তাদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল শান্তি, উন্নতি আর গণতন্ত্রের নতুন এক অধ্যায়ের।

কিন্তু ১২ মাস পর সব প্রতিশ্রুতি কথার ফুলঝুরি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিশ্রুত বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের বেশির ভাগই পূরণ হয়নি। লাখ লাখ আফগানকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে চরম দুর্দশার মধ্যে। নেই অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, মাথা গোঁজার ঠাঁই, স্কুল, বিদ্যুৎ ও পানির ন্যূনতম সুবিধা। কেন্দ্রীয় প্রশাসন থাকলেও দেশের অধিকাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন যুদ্ধবাজ নেতা, মিলিশিয়া কমান্ডার ও উপজাতিপ্রধানদের হাতে। এরা সদা তৎপর নিজেদের সম্পদ ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগানদের স্বার্থ নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা নেই তাদের।

জাতিগত ও উপদলীয় কোন্দলে জর্জরিত কারজাইর কাবুল প্রশাসনও বলতে গেলে এক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথ। সাধের গণতন্ত্র কেবল উপজাতিপ্রধানদের পরিষদ লয়া জিরগার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গত জুনে গঠিত এই পরিষদ ওয়াশিংটনের পছন্দের ব্যক্তি কারজাইকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। তার নিজস্ব সামাজিক ভিত্তিহীন কারজাই অর্থ, সামরিক বল, রাজনৈতিক সমর্থন সবকিছুর জন্য প্রধান শক্তিধর দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। তার অবস্থান খুব নাজুক বলেই ওয়াশিংটনে গত জুলাই মাসে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর একটি দলকে তার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দিতে হয়েছে।

বড় কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে কারজাইর নিধিরাম সর্দার অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত মাসে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব দেখাতে গিয়ে তিনি ২০জন মার্কিন কর্মকর্তাকে ব্যাপক দুর্নীতি ও

ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বহিষ্কার করেন। তবে এর প্রতিক্রিয়া ঠেকানোর জন্য সরকারি পরিদর্শক দলকে সাত সপ্তাহ দেশ চষে বেড়াতে হয়।

তার মন্ত্রিসভার দুই শক্তিধর আঞ্চলিক প্রতিনিধি জেনারেল আবদুল রশিদ দোস্তাম ও ইসমাঈল খান যথাক্রমে মাজার-ই-শরিফ ও হেরাতে নিজ নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা নিজস্ব মিলিশিয়া বহাল রেখে এলাকায় কর, শুল্ক আদায় এবং বিচার ব্যবস্থা চালাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাবুলকে তোয়াক্কা না করে ইসমাইল খান দৃশ্যত পশ্চিমাঞ্চলের হেরাতে মিনি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন। তালেবানদের মতো হুবহু শাসন বহাল রেখেছেন। ইসমাইল খানের ওই সমাজে মানুষের বাকস্বাধীনতা নেই। গণতন্ত্র আর আইনের শাসন তো দূরের কথা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন অতি সাধারণ ঘটনা। অথচ দোস্তাম ও ইসমাইল এসব করছেন খোদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে। এ দুজনকেই অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। তালেবান ও আল-কায়েদার ফেলে যাওয়া বিপুল অস্ত্রও যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে না দিয়ে যুদ্ধবাজদের দিয়েছে। বিনিময়ে ইসমাইল হেরাতের কাছে বিশেষ বাহিনী ও অন্য সেনাদের জন্য ঘাঁটি রাখতে দিচ্ছেন।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও অভিন্ন। উত্তরাঞ্চলে সম্প্রতি উজবেক দোস্তামের বাহি-নীর সঙ্গে তাজিক যুদ্ধবাজ নেতা জেনারেল আত্তা মোহাম্মদের বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। নিজেরা প্রতিপক্ষ হলেও এই দুজনই যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। অথচ এদের মধ্যে লড়াইয়ের কারণে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে, যাদের অধিকাংশই পশতুন।

অথচ কেন্দ্রের কর্তৃত্ব না মানা দোস্তাম ও ইসমাইল স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়াবেন, এমন কোনো লক্ষণ নেই। এদের সরানোর মতো ঝুঁকি নেওয়ার শক্তিও কার্যত কারজাইর নেই। কারণ এ দুজনসহ বিভিন্ন যুদ্ধবাজ নেতা ও উপজাতিপ্রধানদের প্রায় ২লাখ মিলিশিয়া থাকলেও কারজাইর নিজস্ব কোনো বাহিনী নেই। মাত্র ১ হাজার ৪০০ সদস্যের যে জাতীয় সেনাবাহিনী রয়েছে, এর অধিকাংশ সেনা সরবরাহ করেছে ওই যুদ্ধবাজরা। এই সেনারাও নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। বেতন পাচ্ছে না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পুলিশ বাহিনীও। কারণ প্রতিশ্রুত বৈদেশিক অর্থ সাহায্য না পাওয়া। বেতন না পেয়ে এরা জড়িয়ে পড়ছে ঘুষ গ্রহণ, চুরি, ডাকাতি, লুটপাটে।

সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই কারজাই বিদেশী সাহায্যের মুখাপেক্ষী। অক্টোবরের মাঝামাঝি তিনি যে বাজেট দিয়েছেন তাতেও রয়েছে বিদেশনির্ভরতা। কিন্তু এই সাহায্যের নিয়ন্ত্রণ তার প্রশাসনের হাতে নেই এবং সাহায্য দেওয়া হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রধান শক্তিগুলোর কৌশল ও স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে। এ নিয়ে কারজাই নিজেও অসন্তুষ্ট। গত মাসে তিনি অভিযোগ করেছেন, ৮৯ কোটি ডলার সাহায্যের মধ্যে ৮০ কোটিই ব্যয় হয়েছে জাতিসংঘ এবং কাবুলে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা সহযোগী সংস্থাগুলোর আমলাদের পেছনে। এ ছাড়া সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেস আগামী চার বছরের জন্য আফগানিস্তানের জন্য ৩০০ কোটি ডলার অনুদানের আইন পাশ করেছে; তার মধ্যে ১০০ কোটি ডলার ব্যয় হবে শান্তিরক্ষা বাহিনীদের জন্য। ৩০ কোটি ডলার ব্যয় হবে বেসরকারি ব্যবসায় ঋণদানে। বাকি অর্থের মধ্যে বছরে সাড়ে ৪২ কোটি ডলার যাবে পুনর্গঠন প্রকল্পে, যার মাথাপিছু পরিমাণ মাত্র ১৭ ডলার। অথচ গত বছর সামরিক অভিযানেই যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে।

এদিকে প্রধান প্রধান নগরী ও চারপাশের দেশগুলোকে সংযোগকারী যে জাতীয় মহাসড়ক যুক্তরাষ্ট্র পুনঃনির্মাণ করেছে তার পেছনেও রয়েছে নিখাদ স্বার্থ। এই মহাসড়ক আফগানদের অর্থনৈতিক কিছু সুবিধা এনে দিলেও এটি মধ্য এশিয়ার বিপুল তেল ও গ্যাস ভাণ্ডারে মার্কিন

আধিপত্য নিশ্চিত করার উচ্চাশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই মহাসড়কের মাধ্যমে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মতো ভূবেষ্টিত দেশগুলা নির্ভরযোগ্য সড়ক সুবিধা পাবে। বর্তমানে মার্কিন প্রতিপক্ষ রাশিয়া, চীন ও ইরান ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে দেশগুলোকে তাদের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে। আফগান মহাসড়ক এসব দেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাপক সহায়তা করবে।

তবে ওয়াশিংটনের জন্য ভাবনার বিষয় হলো, দেশটিতে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব ক্রমাগত বাড়ছে। মার্কিন সেনাদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলাও হচ্ছে। এ বিষয়টি মার্কিন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল রিচার্ড মায়ার্সও স্বীকার করেছেন। তাই আফগানদের মন জয় করতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প নির্মাণের জন্য ২০০ বেসামরিক সম্পর্কবিষয়ক বিশেষজ্ঞকে সেখানে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে মার্কিন বাহিনী।

কিন্তু হাতেগোনা কয়েকজন বাদে জীবনধারণের ন্যূনতম সুবিধাবঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ কারজাই কীভাবে কমাবেন? কাবুলে প্রায় কয়েক লাখ মানুষ বাস করছে বোমায় বিধ্বংস ঘরে পানি-বিদ্যুৎহীন অবস্থায়। নেই অন্ন সংস্থানের কোনো আয়োজন। নগরীর ২৭ লাখ মানুষের যাতায়াতের জন্য রয়েছে মাত্র ১৫০টি সরকারি বাস। গত এক বছরে পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা অধিকাংশ নগরবাসীকে প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবার হালও করুণ। প্রতি সাড়ে ৩ হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসক রয়েছে মাত্র একজন। প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার ব্যাপক।

এ অবস্থায় বেঁচে থাকা নিয়ে কাবুলের বাসিন্দা কান্দি গুল সোজাসাপ্টা বললে, আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। রাজধানীর বাইরের অবস্থা আরো খারাপ।

দুঃসহ এই পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। এর মাত্রা ও পরিণতির আভাস মিলেছে সাহায্য সমন্বয়কারী রাফায়েল রবিলার্ডের কথায়। তিনি বলেছেন, অনেক আফগান বাইরের বিশ্বের সাহায্যের আশায় বসে আছে। তা না এলে সরকার গভীর সংকটে পড়তে পারে। আরো দুবছর এই অবস্থা থাকলে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।

রবার্ট ফিস্ক

বিন লাদেন বেঁচে আছেন

প্রথম আলো গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে রবার্ট ফিস্কের এই লেখাটার অনুবাদ ছাপে। যে-ওসামাকে ধরার জন্য ইঙ্গমার্কিন পরাশক্তি আফগানিস্তানকে বোমা মেরে প্রস্তরযুগে পাঠিয়ে দিল সেই ওসামা বেঁচে আছেন, এটা মেনে নেয়া তাঁদের জন্য অসম্মানের। তাঁরা তাই রটনা করেন যে, ওসামা-বিন-লাদেন 'সম্ভবত' মারা গেছেন। কিন্তু, প্যালেস্টাইন, পূর্ব তিমুর এবং আফগানিস্তান নিয়ে দুর্দান্ত সব সরেজমিন-রিপোর্টের জনক রবার্ট ফিস্কের এই রিপোর্ট অন্য তথ্য দিচ্ছে। ওসামা বেঁচে থাকলে আমরা আনন্দিত হবো, না দুঃখ পাব, সেটা আমাদের যার যার ব্যাপার, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তি আফগানিস্তানে যে 'অপারেশান এনডিওরিং ফ্রিডম' চালালো তার প্রধানতম উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। *প্রথম আলো* এই রিপোর্টের শুরুতে যে-নোট দিয়েছিল সেটাসহ আমরা ফিস্কের লেখাটা এইখানে ছাপছি। উল্লেখ্য, অনুবাদকের নাম লেখাটার সাথে দেয়া ছিল না।

প্রথম আলো'র নোট: ওসামা বিন লাদেন কি বেঁচে আছেন? যদি তিনি বেঁচে থাকেন তাহলে এখন কোথায় আছেন? করাচিতে, কাশ্মীরে নাকি সৌদি আরবে? সম্প্রতি কাতারের আল-জাজিরা স্যাটেলাইট টেলিভিশনে বিন লাদেনের অডিও টেপ প্রচারিত হওয়ার পর এ রকম অনেক প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও টেপটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক গত ১৪ই নভেম্বর লন্ডনের *দি ইনডিপেন্ডেন্ট* পত্রিকায় 'বিন লাদেন বেঁচে আছেন' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগে তিনি বিন লাদেনের একাধিক সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। লাদেনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তিনি ভালোভাবেই পরিচিত। অডিও টেপের কণ্ঠস্বরটি বিন লাদেনের হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এবং ওই টেপে মার্কিন মিত্রদের প্রতি যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে তা কী ইঙ্গিত বহন করছে, রবার্ট ফিস্ক এ লেখায় তার বিশ্লেষণ করেছেন। লেখাটার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

টেপটি বিন লাদেনের। তিনি জীবিত। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত ও আকস্মিক ফোন কল থেকে এটা নিশ্চিত করেছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো। লাদেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর সংক্ষিপ্ত কথায় পাশ্চাত্যকে সতর্ক করে দিয়েছে। আর তা প্রথম সম্প্রচার করেছে আরব টেলিভিশন চ্যানেল আল-জাজিরা।

কাজেই সৌদি কোটিপতি, গুহাবাসী ব্যক্তি, 'শয়তান', শ্মশ্রুমণ্ডিত, তপস্বী– বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী যার অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হয়েছে– তিনি এখনো আমদের মাঝে

রয়েছেন। এটাই বাস্তব।

'মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো' সচরাচর আমেরিকার প্রচার মাধ্যমে সমালোচিত হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার এই বীরেরা আরবদের বিমান উড্ডয়নের প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা শুনেছিল, কিন্তু সময়মতো তা আমাদের জানাতে পারেনি। এখন তারা আমেরিকার মিডিয়ার কাছে আবর্জনা নিয়ে আসছে: 'এটা তিনি হতে পারেন', 'সম্ভবত তিনি', 'গম্ভীর কণ্ঠস্বরের অর্থ হতে পারে তিনি আহত', 'তিনি দ্রুত কথা বলছেন, কারণ তিনি মার্কিনিদের দ্বারা আহত হয়ে থাকতে পারে।' 'অসত্য'।

অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তাদের কেউ কেউ যাকে মৃত বলে দাবি করেছে, খুব সম্ভবত তিনি এখনো জীবিত এবং এমনভাবে তিনি হুমকি দিচ্ছেন যা পশ্চিমা নেতাদের জন্য ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের কারণ হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমাদের যেভাবে হত্যা করছ, ঠিক সেভাবে আমরা তোমাদের হত্যা করব।'

যখন বিন লাদেনের কথাগুলো রেকর্ড করা হয়, তখন তিনি টেপ রেকর্ডারে কথা বলছিলেন না। কথা বলছিলেন টেলিফোনে। ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তিটি রেকর্ডার ধরে ছিলেন– খুব সম্ভব পাকিস্তানে বসে। বিন লাদেন এবং ওই রেকর্ডধারী ব্যক্তি সম্ভবত একই শহরে ছিলেন না। হয়তো বা একই দেশেও নয়।

ওসামা বিন লাদেন সব সময় ধীরে কথা বলেন। কিন্তু টেপে তার কণ্ঠ ছিল দ্রুত। এর কারণ খুব সহজেই অনুমান করা যায়, রেকর্ডারের ব্যাটারি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আল-জাজিরা যখন সেটি সঠিক মাত্রায় চালিয়েছে তখন কণ্ঠস্বর দ্রুত হয়ে গিয়েছিল।

আমি বিন লাদেনকে জানি। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যদিও তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি তবু বলব পূর্ববর্তী বছরগুলোতে আমি তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তার সম্পর্কে লেখা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন সাংবাদিকতার কাজগুলোর একটি। আপনাকে তো তা-ই বলতে হবে যা আপনি জানেন, যা আপনি সত্য বলে মনে করেন। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন তিনি এই টেপটি তৈরি করেছেন। এ কাহিনী জানার জন্য প্রশ্নের আরো গভীরে যেতে হবে। কেন? কী জন্য? এখন কেন? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সত্যকে তুলে ধরতে একটি নতুন, রূঢ় পদ্ধতির লেখা, যেমন: ব্র্যাকেট আর কোলনের ব্যবহার।

জানা ও সন্দেহ এবং সম্ভাবনা ও অনুমান বহু তর্ক-বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিন লাদেন তোরাবোরার বোমা হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সত্য। বিন লাদেন পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেছেন। সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিন লাদেন এখন সৌদি আরবে। এ বিশ্বাস ক্রমে বাড়ছে।

কাজেই এ ব্যাপারে সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও শর্তসাপেক্ষ বিষয় নিয়েই আমি এ টেপ সম্পর্কে আমার যা সন্দেহ ও অনুমান তা এখানে তুলে ধরছি।

বিষয়টি পাশ্চাত্যের জন্য যথেষ্ট মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় যা লেখা সহজ নয়। এই টেপের নিহিতার্থ উপলব্ধি করে আমি আতঙ্কিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর অন্যান্য পশ্চিমা দেশের মধ্যে সবার আগে ব্রিটেনের প্রতি এ টেপের একটি বার্তা হলো: সাবধান! আরো হামলার ব্যাপারে টনি ব্লেয়ারের সতর্কতা সঠিক (একবারের জন্য), যদিও বিন লাদেনের ফোন কল (আমার সন্দেহ) শনাক্ত করা হয়নি। তবে এটা বিন লাদেন।

আমাদের শুরু করা উচিত ২০০1 সালের হেমন্তে তোরাবোরায় হামলার ঘটনা থেকে। মার্কিন বিমান বাহিনীর ভারী বোমাবর্ষণের মুখে বিন লাদেনের আল-কায়েদার যোদ্ধারা বুঝতে

পারে জালালাবাদে পাহাড়ের গুহাগুলোতে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে পারবে না। বিন লাদেন তাদের সঙ্গে ছিলেন। আল-কায়েদার সদস্যরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় যুদ্ধরত আফগান যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে বিন লাদেন তাদের ছেড়ে যেতে চাননি। তিনি তাদের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা এবং সিনিয়র উপদেষ্টারা তাকে চলে যাওয়ার জন্য জোর অনুরোধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মনোক্ষুণ্ন হয়ে তোরাবোরা ত্যাগ করেন। আর দেহরক্ষীরা তাকে পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় তিনি অনেকটা সেই একই আতঙ্কের মাঝে ছিলেন, ১১ সেপ্টেম্বর আল-কায়েদার বিমান ছিনতাইকারীরা ওয়াশিংটনে হামলা চালালে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির নিরাপত্তারক্ষীরা হোয়াইট হাউসের ভূগর্ভস্থ অংশ দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি যেমন আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। এসব খবরই এসেছে 'নিখুঁত সূত্রে'র মাধ্যমে।

উত্তরাঞ্চলীয় জোটের একজন দুর্নীতিপরায়ণ বন্দুকধারী যেভাবে জালালাবাদ থেকে পালিয়ে এসেছিল, বিন লাদেনও যদি সেভাবে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যেতেন তাহলে তা হতো পাগলের মতো আচরণ। তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন। কিন্তু গুলিবর্ষণের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলে তা কেবল বিপদই ডেকে আনত। তা-ও আবার একটি সাদা ঘোড়ায়। এমন ঘোড়া তো রাতেও নজরে পড়তে পারত।

বিন লাদেন কাশ্মীর (সম্ভাব্য, যদিও সে সম্ভাবনা নেই) অথবা করাচি (খুব সম্ভবত) গিয়েছিলেন। আমি এটা বলছি কারণ বিন লাদেন একবার এই বৃহৎ, উষ্ণ ও বিপজ্জনক পাকিস্তানি নগরীর সুন্নী ধর্মগুরুদের মধ্যে তার বহু ভক্ত থাকার কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি সব সময় তাদেরকে তার 'ভাই' বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি একবার আমাকে উর্দুতে লেখা কিছু পোস্টার দিয়েছিলেন যা ওই ধর্মগুরুরা তৈরি করেছিলেন এবং করাচির দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়েছিলেন। তিনি আমার কাছে তাদের ধর্মোপদেশের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছিলেন। কাজেই আমি এ ব্যাপারে করাচিকে অগ্রাধিকার দেব। তবে আমার ভুলও হতে পারে।

পরবর্তী মাসগুলোতে তার জীবিত থাকার ব্যাপারে সামান্যই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে– একজন ধূমপায়ী একটি কক্ষ ত্যাগ করার পর সে ঘরে বিরাজমান তামাকের গন্ধের মতো। বিন লাদেনের এক ভক্ত আমাকে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি জীবিত (সত্য, তবে সূত্র সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত নয়)। তিনি কোনো পশ্চিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের একই উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। পুরোপুরি সত্য। তার সর্বসাম্প্রতিক ভিডিও টেপটি নতুন, যাকে ওই সব বিখ্যাত 'মার্কিন গোয়েন্দা সূত্র' পুরনো বলে বাতিল করে দিয়েছে। যেহেতু এতে ২০০১ সালের নভেম্বরের পর কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই (সম্ভাবনা জোরালো, একটি ভালো সূত্র-সমর্থিত, তবে 'নিখুঁত' নয়)।

প্রশ্ন হলো এখন কেন এই বার্তা? ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যুদ্ধ এবং ইরাকে একটি সম্ভাব্য ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্ররোচনার মুখোমুখি মধ্যপ্রাচ্য একটি নতুন এবং ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে দুঃখজনক পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আরব বিশ্বের কাছে আরো একবার তার বার্তা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা বিন লাদেনকে উপলব্ধি করতে হতো। এবং তার অডিও টেপটি ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের প্রতি সরাসরি হুমকি হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিকভাবে তা তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রোতা আরব মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত। বিন লাদেনের দৃষ্টিতে এ মুহূর্তে তার নীরব থাকা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হতো।

বিন লাদেনের টেপটি পুরনো হতে পারে, এই দাবির পাল্টা যুক্তিও রয়েছে। তার সম্ভাব্য 'মৃত্যু'র পর পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর বেশ কিছু আঘাত এসেছে। করাচিতে ফরাসি সাবমেরিন প্রকৌশলীদের ওপর বোমা হামলা, তিউনিসিয়ার সিনেগগে, বালিতে বোমা হামলা, মস্কোয় চেচেনদের দ্বারা থিয়েটার দখল, এমনকি জর্ডানে মার্কিন কূটনীতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, তিনি বলছেন যে তিনি এসব বিষয়ে জানেন। তিনি বলছেন, এসব তিনি অনুমোদন করেন। তিনি আমাদের বলছেন যে, তিনি এখনো এখানে আছেন। আরবরা এসব সহিংস ঘটনার নিন্দা করতে পারেন, তবে কেউ কেউ আছে যাদের কোনো অনুভূতি নেই। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের নৃশংসতা এবং ইরাকের প্রতি মার্কিন হুমকির মাঝে অন্তত একজন আরব পাল্টা আঘাতের জন্য প্রস্তুত। আরবদের উদ্দেশ্যে এটাই তার বারতা।

বিন লাদেন সব সময়ই সাদ্দাম হোসেনের ব্যাপারে অনাগ্রহী। তিনি ইরাকি নেতার অনৈসলামিক আচরণ, তার ধর্মনিরপেক্ষনীতি, একজন খ্রিস্টান দ্বারা যৌথভাবে গঠিত বাথ পার্টির প্রতি আনুগত্যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ধর্মকে ব্যবহার– এসব ঘৃণা করেন। ইরাক সরকারের সঙ্গে আল-কায়েদাকে সম্পর্কযুক্ত করার মার্কিন দাবি ওয়াশিংটনে সবচেয়ে উদ্ভট দাবিগুলোর একটি। বিন লাদেন আমাকে বলতেন সাদ্দামকে তিনি কী পরিমাণ ঘৃণা করেন। কাজেই 'ইরাকের সন্তানদের' উদ্দেশ্যে তার দুটি মন্তব্য নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে তা হলো তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। তিনি তার মন্তব্যে ইরাক সরকার বা সাদ্দামের কোনো উল্লেখই করেননি। তবে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাকে এখনো হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু হচ্ছে এবং ইরাক সম্ভাব্য মার্কিন হামলার লক্ষ্যবস্তু। বিন লাদেন সম্ভবত এটা উপেক্ষা করতে পারেন না। কাজেই তিনি 'ইরাকের শিশুদের' এবং 'ইরাকে আমাদের সন্তানদের' সম্পর্কে কিছু বলে থাকলে তা আরব মুসলিমদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। যারা ইরাকি হতে পারে, তবে সাদ্দাম নন। কীভাবে মার্কিন প্রশাসন বাগদাদ ও আল-কায়েদার মধ্যে আরেকটি ভুয়া সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য বিন লাদেনের এ দুটি মন্তব্যকে ব্যবহার করতে পারে তা বোঝা কষ্টসাধ্য নয়। তবে বিন লাদেন যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং এটা আগে থেকেই অনুমানে সক্ষম। তাই তিনি সুস্পষ্টভাবেই এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইরাকের আরবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র তার মন্তব্যকে অপব্যবহার করতে পারে।

১৯৯৬ সালে বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন, সৌদি আরবে ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্যরা মার্কিন বাহিনীর মতো তার অনুসারীদের দ্বারা হামলার ঝুঁকি বহন করছে। ১৯৯৭ সালে তিনি তার লক্ষ্যবস্তুর তালিকা পরিবর্তন করেন। ব্রিটিশ ও ফরাসিদের তখন তিনি যেকোনো প্রস্তাবিত হামলার লক্ষ্যবস্তু থেকে বাইরে রাখেন। কিন্তু নতুন অডিও টেপে ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তারা এখন আবার হিট লিস্টে ফিরে এসেছে। এবং এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে ব্রিটেন।

আমাদের অর্থাৎ পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে তার বার্তাটি সহজ এবং তিনবার এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। যদি আমরা 'এ যুগের ফেরাউন' জর্জ বুশকে সমর্থন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে মূল্য দিতে হবে। দু'দশক আগে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করার পর তার হত্যাকারীরা তাকে 'ফেরাউন' বলে অভিহিত করেছিল। 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের অপরাধী চক্রের সঙ্গে তোমাদের সরকারগুলোর জোটবদ্ধ হওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য কী...?' আমার সঙ্গে কথোপকথনের সময় বিন লাদেনকে দুবার 'ইফারবাতু আল-ইজরান' এই আরবি অভিধাটি ব্যবহার করতে শুনেছি। অর্থ 'অপরাধী চক্র', পশ্চিমা বিশ্ব আল-কায়েদাকে যা বলে থাকে।

কাজেই এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে? কয়েক সপ্তাহ আগে একটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে শ্রোতৃমণ্ডলীর একজন আমাকে এ প্রশ্ন করেন। আমার ভাবনা ছিল পরবর্তী আঘাত আসছে। আমার ভাবনায় যে দুটি শব্দ ছিল তা হলো 'তেলের ট্যাঙ্কার'। এটা ছিল 'সম্পূর্ণ অনুমান'। কিন্তু আমি কাউকে কোনো ধারণা দিতে চাইনি। তাই আমি কিছু বলিনি। পরের সপ্তাহে আল-কায়েদা ইয়েমেনের উপকূলে সুপার ট্যাংকার 'লিমবার্গে' হামলা চালায়। এখন আমি আমার মনে খারাপ ভাবনা খুঁজে ফিরছি। এবং আমার গল্পের এখানেই ইতি টানাকে শ্রেয় মনে করছি।

ইরাক ও
প্যালেস্টাইনের কবিতা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

ই. ইয়াঘি

ফিলিস্তিনি আমি

তরজমা: বদরে মুনীর

আমার পরিচয় ছিনিয়ে নিতে কেউ
কখনো পারবে না, কেননা তা আমার।
ফিলিস্তিনি আমি।
আমি তো সেই নদী
যে-প্রবাহিত ধারা আমার দেশ দিয়ে বহতা নিরবধি।
আমি সে-পর্বত
সমূহ ধ্বংসের, সংঘাতের সীমা
ছাড়িয়ে দাঁড়িয়েছি সম্মানিত আর গৌরবান্বিত।
ভোরের সূর্যকে জানাই কুর্ণিশ
যে-তার কিরণের বিচ্ছুরিত কণা
ঝিলিক দিয়ে ঢালে আমার উর্বর উপত্যকাব্যাপী,
এবং ঝলসায় ঊষর মরুভূমি।
আমি সে-লাল পপি, হলুদ ড্যাফোডিল
তুলেছে যারা মুখ আমার স্বদেশের
রক্ত-ঝলসিত পাহাড়ে-পর্বতে।
আমি তো যুদ্ধের দামামা চিৎকার,
স্বাধীনতার গান, প্রতিধ্বনি তুলি
আমারই ঘরদোরে, করুণ করিডোরে,
এবং হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে।
ফিলিস্তিনি আমি।
আমি সে গর্বিত অংশীদার
কমলা বাগানের লেবুর ফুলে ফুলে
বাঁধনহারা যার জন্য মৌমাছি।
ফিলিস্তিনি আমি।
সন্ত দাউদের নাছোড় সন্তান
ইজরায়েলি সেই দানোর বিপরীতে
অভয়ে লড়ে যাই, খণ্ড পাথরের টুকরো সম্বল।
আমার ভয় নাই,
কেননা জেনে গেছি সত্য সাথে আছে
এবং ঈশ্বর সঙ্গে রয়েছেন।
যদি-বা মরে যাই
আমাকে ঘিরে তবে বিপুল বৈভবে
জানাবে সম্মান নিযুত দেবদূত
এবং তারপর আমার বাবা ও মা

আঁকড়ে ধরবেন পাথরে প্রসারিত আমার দুইহাত
তারাও মিলবেন আমার সাথে সাথে স্বর্গতরুতলে।
নিহত পুত্রের স্মরণে কেঁদে কেঁদে
ফোঁপানো মায়েদের অশ্রুরেখা আমি।
আমাকে আজ যারা দমনে, নিপীড়নে করেছে বিক্ষত,
তাদের ধ্বংসের
পূর্বাভাষ যারা দিয়েছিলেন সেই
প্রাচীন নবীদের পদধ্বনি আমি।
আমার সাগরের সুদূর তীর ধরে
অবাধে উড়ে যাওয়া গুঞ্জরিত পাখি, ঘুঘু বা গাঙচিল–
আমার ভাই ওরা, বন্ধু পরিজন।
ফিলিস্তিনি আমি, আমি তো তাই আমি।
আমার পরিচয় আমার কাছে থেকে
ছিনিয়ে নিতে কেউ পারে না, পারবে না।
বুলেট বন্দুক অথবা বোমা, ট্যাংক অশুচি করবে না,
আমাকে হত্যায় হবে না কামিয়াব।
আমার দেশ বাঁচে আমার অন্তরে।
স্বাধীনতার পথে আমিই শতমুখ আর্তচিৎকার।
যা খুশি নিক তারা, কীই-বা যায় আসে,
ছিনিয়ে নিতে তবু পারে না পারবে না
আমার পরিচয় এবং মর্যাদা,
ফিলিস্তিনি আমি।

দুনিয়া আল-আবেদ আকাবি

শিশুর প্রশ্ন

তরজমা: রিপন মাহমুদ

মা,
আমরা পালাচ্ছি কেন?
আমরা কোথায় যাব?
কেন এসেছিল ঐ লোকেরা,
আর কেনইবা নিয়ে গেল আমাদের ঘরদোর?

সোনামনি,
এখন কেঁদনা তুমি,
কেবল তোমার মাথা ঊর্দ্ধে তুলে ধরো।
এমন অনেক কিছুই ঘটতে পারে
(যখন) মায়েরা তার কারণ জানে না।

বাবা,
কোনো ভুল আমি কি করেছিলাম?
আমার কি কোনো ভুল হয়েছিল?
সবাইকেই বদ্ধ পাগল মনে হয়।
আশা করি এটা আমার দোষ না।
আমি কি মন্দ কিছু করেছিলাম?

বাছা,
তোমার কোনোই ভুল নাই।
দোষও নাই কিছু।
কখনও সখনও এমন প্রশ্নেরা আসে
বাবাদের কাছে যার উত্তর থাকে না।

আল্লাহ
পরম করুণাময়,
তোমার নিকটে আজ প্রার্থনা আমার,
আমার স্মৃতিরা যেন আমাকে পথের দিশা দেয়
যদ্দিন না আমি খুঁজে পাই ঘর।
আমাকে কখনও ভুলতে দিও না।
আমি কে আর কি,
আমি ভিক্ষা করছি আল্লাহ
যেন আমি বিনত প্রকৃত ইসলামে।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

হে আমার বান্দা
মনে রেখ আমি তোমাকে শুনতে পাই
যখন পথিক তুমি আমার পথের।
এ-কর্তব্য সাধন আমার নয়
কিন্তু এ-ভার বহনে আমি সাহায্য করব।

সর্বদা আমার কাছে সত্য তুমি।
তোমার হৃদয় আর আত্মাতো আমারই।
আর জেনে রাখো আমি তাদের সবার সাথেই আছি।
যাদের সাকিন ফিলিস্তিন।

হানান আশরাবি

হাদিলের গান

তরজমা: বদরে মুনীর

কিছু শব্দের কঠিন উচ্চারণ–
হে-লি-কপ-টার সবচেয়ে ভয়াবহ
(অ্যা-পা-চে অথবা কোবরা তো দুঃসহ)
কিন্তু কী করে সে এখনও থাকে আকাশে দাঁড়িয়ে
বুঝতে পারি না আমি–
কী একে উর্দ্ধে তুলে ধরে রাখে আর
কীই বা এটার ওজন বহন করে
(মেঘেরা পারে না, জানি)
চোখ-ঝলকানো আলোক ছড়ায়-কত মসৃণ–
কানে তালা-লাগা-শব্দের তোড়ে
ঘড়বাড়ি কেঁপে ওঠে
(বিছানার পাশে আমার দেয়ালে অনেক ছিদ্র)
আলোর ঝিলিক, গুরুগম্ভীর শব্দের গর্জন–
এ-সময়ে আমি ঘুমাতে পারি না
(বিছানা ভিজিয়ে লজ্জায় পড়ে যাই
কিন্তু বকে না কেউ।)
বিমান– একটা এমন শব্দ যার
সহজ উচ্চারণ–
এটা ওড়ে যেন পাখি
আমার আম্মা আমাকে বলেছিলেন
সব শব্দেরই অর্থ থাকতে হয়
সকল নামেরই অর্থ থাকতে হয়
যেমন আমার,
(হাদিল, ঘুঘুর ডাক)
ট্যাংক যদিও ভিন্ন শব্দ তোলে
কেঁপে কেঁপে ওঠে সে যখন গুলি ছোঁড়ে
অজগর, এই শব্দটা খুব ভারী,
যত ভারী এর মানে।

হাদিল, অর্থ ঘুঘুর কূজন
পাখি – সে আকাশে ওড়ে
অজগর চলে বুকে পেটে হেঁটে হেঁটে
আমার আম্মা – সে কেবল কাঁদে
আর কাঁদে আর কাঁদে

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

শহীদ আমার ভাই – রামি – শুয়ে আছে
মৃত
শেষশয্যায় শায়িত সে আজ
নিমীলিত দুই চোখ
মাথায় গুলির জখমে নিহত
(গুলি হ'ল সেই মহিলা খনিজ সিসা – সে করে হত্যা
এদিকে আমার পেন্সিলে আছে পুরুষ খনিজ সিস –
সে লেখে কবিতা)

একটা গুলি ও একটা শেলের ভেতরে তফাৎ কত?
(পাঁচশত মিলিমিটার অথবা
আটশত মিলিমিটার শেল-ই বা কারা?)
শব্দের চেয়ে সংখ্যা সকল আরও বেশি ভয়াবহ
এক থেকে দশ গুনতে শিখেছি
তারপর গুনি দশ আর এক, দশ আর দুই
কিন্তু যখন দশ আর দশ তখন কী হবে
কী করে জানব আমি?
শত শত যারা নিহত হয়েছে
রামি তো তাদেরই একজন আজ
রামি, যে আমার ভাই –
অনেকে বলছে হাজার হাজার আঘাতগ্রস্ত
কোনটা যে বেশি
একশত নাকি এক সহস্র
বলতে পারি না আমি –
এত বড় – এত বিশাল বিপুল
কত অগণিত, একশ অপরিমেয়।

প্যালেস্টাইন – আমার আসে না –
আমি শুধু পারি বলতে ফিলিস্তিন,
এটা নয় তত কঠিন উচ্চারণ,
এর মানে আছি এখানে আমরা – থাকার জন্য –
যদিও এ ঠাঁই রুক্ষ ভীষণ
ছোট সোনামনি আর মায়েদেরও জন্য
কেন না এখানে গুলি ছোঁড়ে সৈন্যরা
হেলিকপ্টার বোমা ফেল আর
ট্যাংকগুলো গজরায়
এবং তোমাকে কাঁদায় অঝোরে কাঁদানো গ্যাসের ঝাঁঝ
(অবশ্য আমি এমন ভাবি না,
আম্মার এত কান্নার মূলে কারণ কাঁদানো গ্যাস)

এর চেয়ে ভালো তার কাছে যাই
জাপটে, জড়িয়ে ধরি
এক মুহূর্ত তার কোলে বসি
তার মুখ ছুঁয়ে সিক্ত আঙ্গুল দেখি
তারপর তার দু'চোখে তাকাই
যতক্ষণ না আমাকে আবার দেখা যায় ভালমত
একটা বালিকা স্তম্ভিত অসহায়
মায়ের কোলের দৃষ্টি-দ্রাঘিমা জুড়ে।
শব্দের যদি সত্যিই থাকে মানে
কী হবে ইজরায়েল?
একটা শব্দ মিশে যায় যদি অন্যগুলোর সাথে
কী থাকে অর্থ তার?
যদি এইসব সৈন্যের পাল,
ট্যাংক, কামান, বোমারু বিমান
সবই যদি আজ ইজরায়েলের
তাদের এখন কী কাজ এখানে –
যে-দেশ আমার চেনা,
একটা শব্দে যাকে আমি জানি –
একটা জীবনে তাকে আমি আর জানতে কি পারবো না?

আবদেল রহিম মাহমুদ

শহীদ

তরজমা: রিপন মাহমুদ

আমার আত্মাকে আমি হাতে করে বয়ে নিয়ে যাবো
এবং মৃত্যু-উপত্যকার মাঝে ফেলে দেবো ছুঁড়ে
এ এক এমনই জীবন, যা বন্ধুকে করবে সুখী
অথবা এমনই এক প্রয়াণ যা শত্রুকে করবে ক্রোধোন্মাদ।
মহা মানুষের আত্মার দুইটি উদ্দেশ্য রয়েছে –
মরে যাওয়া, কিম্বা স্বপ্নকে অর্জন করা;
জীবন কী, যদি না আতঙ্কে থাকি আমি,
এবং আমার যা আছে তা নিষিদ্ধ অন্যের কাছে?
সমস্ত দুনিয়া শোনে যে-সময় আমি কথা বলি,
এবং আমার স্বর প্রতিধ্বনি তোলে সারা মানুষের মাঝে;
আমার মৃত্যুকে দেখি, কিন্তু তার দিকে ছুটে যাই
এটাই পুরুষদের মৃত্যু।
আর যদি কেউ সম্মানজনক মৃত্যু প্রত্যাশা করেন
তবে এই-ই তা।
সমূহ আক্রোশে আমি কীরকম ধৈর্যশীল থাকি?
সমূহ বেদনা নিয়ে আর কত ধ্বস্ত হবো আমি?
তবে কী আতঙ্কে ঘটছে এমন?
যখন আমার কাছে জীবনের কোনও দাম নেই।
অথবা জীবন মানে অবমাননার ভার? যখন ঘৃণিত আমি?
হৃদয়কে আমি আমার শত্রুর মুখে ছুঁড়ে দেবো
আমার হৃদয় আজ নির্মম এবং গনগনে;
তরবারির তীক্ষ্ণতা দিয়ে আমি আমার ভূমিকে রক্ষা করবো
ফলত লোকেরা জানবে মানুষ আমি।

ইব্রাহিম তুকান

আমার জন্মভূমি

তরজমা: রিপন মাহমুদ

জন্মভূমি মাগো
জন্মভূমি মা –

তুমুল গৌরব লাবণ্যের ছটা,
ভয়াল বিশালতা আলোর ঝলকানি
তোমার পর্বত জুড়ে;
প্রাণের ছড়াছড়ি সুখের উদ্ধার
শান্তি আছে, আর বিপুল প্রত্যাশা
তোমার জলবায়ু ছেয়ে।
তোমায় দেখতে কি পাবো?

ভাবনাহীন আর
সম্মানিত বাঁচা –
তোমায় দেখতে কি পাবো?

তারকা ছুঁয়ে গেছে
তোমার গুণপনা –
জন্মভূমি মাগো
জন্মভূমি মা –

ক্লান্তি মানবে না তরুণী তরুণেরা
তোমার স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য,
অথবা মৃত্যুর তীর।
আমরা করে যাবো মৃত্যু থেকে পান,
তবুও কিছুতেই হবো না শত্রুর দাস।

আমরা চাইনাতো
অশেষ যন্ত্রণা
দুর্বিষহ প্রাণ,
অথচ চাই ফিরে
মহিমা আমাদের
জন্মভূমি মাগো
জন্মভূমি মা –

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

কলম, তরবারি
প্রতীক আমাদের।
আর তো কথা নয়, ঝগড়া নয় কোনও
প্রতিশ্রুতি আর বিজয়-গৌরব –
পূর্ণ করে যাওয়া কেবল করণীয়।
কাঁপিয়ে দাও তুমি তুমুল ধাক্কায়
সবার সম্ভ্রম
সম্মানিত তাই
নিশান উড্ডীন।

তোমার রূপ-ছটা
তোমার খ্যাতি জুড়ে
বিজয়ী বীর তুমি মাড়িয়ে শত্রুকে
জন্মভূমি মাগো
জন্মভূমি মা –

ইরাক-প্যালেস্টাইনের কবিতা

কনি আল রামাহি

গাজা

তরজমা: আ-আল মামুন

ছোট শরীরের প্রাণহীন এক দেহ
জড়ানো পুরোটা শুভ্র সাদা কাপড়ে
জানাজা নামাজ সমাপ্ত হলে পরে
দিবস মিলায় রাত্রির কালো গায়ে

অবয়বহীন মৃত্যু-আঘাত এ-যে
অবিচার আর ঘৃণাই যাহার মূল
কেমনে এমন নিষ্পাপ শিশু ভোগে
নির্দয় এই নিয়তির লেখা শুল?

মৃদু হাসি তার দেখাতো পথের দিশা
অট্টহাসিতে সে ছিল পাখির গান
পিতার বেদনা মায়ের কান্না সে-যে
সারারাত ঝরে, ঝরিয়া কাঁপায় প্রাণ

ভাঙা খেলনারা ছড়ানো ছিটানো পড়ে
উঠোন জুড়িয়া পাথর টুকরা শুধু
কোন শিশু আর হাসে না এমন দিনে
তীব্র কান্না কেবল, আকাশ ধু ধু

শিশু বয়সের কোমল সরল মন
ছিনিয়ে নিয়েছে আদিম বর্বরতা
নির্বাক মুখ শুধু বেদনায় ঢাকা
যেনবা বৃদ্ধ, খেলতে তাদের মানা

পুরোটা জীবন দুঃখ যাতনা আর
দুর্বার ক্রোধে তীক্ষ্ণ জ্বালায় ভরা
আল্লাহ তুমি আমাদের করো জয়ী
যাবে না বিফলে– এমন মিনতি করা।

জুলাই ২৪, ২০০২

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

কামাল নাসির

গল্প

তরজমা: ফাহমিদুল হক

একটা গল্প শোনাই তবে ...
মানুষের স্বপ্নে যে-গল্পের বসবাস ...
সারি সারি তাঁবুর দেশের গল্প
ক্ষুধা গেঁথে গেঁথে হয় গল্পের নির্মিতি,
অঙ্গসজ্জায় রাত্রির কালো ....
এ আমার দেশের গল্প
অগণিত শরণার্থীর দেশ আমার ...
বিশ জনের এক সের ময়দা
আর আছে ত্রাণের প্রতিশ্রুতি ...
প্যাকেটজাত খাবারের
এ হলো আমাদের গল্প ...
অনাহারী দশ বছরের
অশ্রুর আর সন্তাপের গল্প
কষ্টের আর আকুতির ...

এ হলো সেইসব মানুষের গল্প
যারা ছিল হতবুদ্ধি ...
কালের গোলকধাঁধায় যারা নিক্ষিপ্ত
কিন্তু তাদের প্রতিরোধ দেখ
ঐক্য দেখ
তাঁবু থেকে তারা আলোয় বেরোয় ঐ
অন্ধকার থেকে ফেরার বিপ্লব দেখ ...

বুলান্দ আল-হায়দারি

ডাকপিয়ন

তরজমা: বদরে মুনীর

ও ডাকপিয়ন,
কেন তুমি মিছে এসেছ আমার কাছে?
আমি তো অনেক দূরে বিতাড়িত তাবৎ দুনিয়া থেকে,
নিশ্চিত কিছু ভুল হয়ে গেছে
দুনিয়ার আর নতুন কিছু নাই
নির্বান্ধব হতচ্ছাড়ার জন্য।

একদা যা ছিল,
এখনও রয়েছে, অতীতে যেমন ছিল।
দুনিয়া স্বপ্ন দেখে,
দুনিয়া কবর খোঁড়ে,
আবার দুনিয়া বাঁচার জন্য লড়ে।

এখনও জনতা উৎসবে মেতে ওঠে,
এবং বিলাপে জোড়া দেয় কোনও উৎসব তার পরবর্তীর সাথে।
নবতর কোনও গরিলার খোঁজে,
নতুন নতুন ক্ষুধার্তদের শান্ত করতে
তাদের দু'চোখ খুঁড়ে খুঁড়ে খায়
নিজেদেরই যত মনের সমাধিভূমি।

এখনও চীনের প্রাচীর বিদ্যমান,
একদা যা-ছিল কিংবদন্তী, লুপ্ত হয়েছে,
সময় আবার ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই।
দুনিয়া আজও সিসিকাস বিরাজিত।
এবং একটি পাথর, যে তার কামনা জানে না নিজে।

ও ডাকপিয়ন
নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়ে গেছে,
কেননা, নতুন কিছুই কোথাও নাই ...
যে-পথে এসেছ সে-পতেই ফিরে যাও;
যে-পথ তোমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসে।
কেন তুমি মিছে এসেছ আমার কাছে?

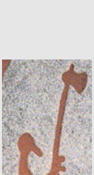

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

কারেম আল-ইরাকি

ফেরেস্তারা ডাকে

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের গণহত্যায় নিহত ইরাকি শিশুদের স্মরণে

তরজমা: বদরে মুনীর

আপনি যখন প্রার্থনা করছেন,
একবার শুধু স্মরণ করুন,
লক্ষ লক্ষ ইরাকি তখন
পাথর করেছে প্রাত্যহিকের রুটি।

যারা হেঁটেছিল জখমের সেতু ধরে
সেই জখমেই এখনও হাঁটছে তারা।
নিজের চামড়া নিজেদেরই পরিধান,
এবং তাদের মৃত্যু সম্মানিত।

আপনি যখন বালিশে রাখেন মাথা
মনে করে দেখবেন,
কেউ কি ঘুমাতে পারে,
যে-সময় তার মাতৃভূমিকে অন্যে জবাই করে?
তার মৃত্যুতো পুনর্জন্ম, যদি বা সে মরে ন্যায্য মর্যাদায়।

ছোট ছোট সব ফেরেস্তাদের
জখমে জখমে বিরাজিত আজ আমার হৃদয় শিখা।
আমি দেখি তারা ইশ্‌কুল থেকে ফিরে আসে দলে দলে।
চার্চের বেল- আজানের ধ্বনি
সিক্ত করেছে তাদের কপাল কত শত চুম্বনে।

তারাই লিখেছে এই চিঠি, আর ডেকেছে আপনাদের:
আমাদের দেশ জখমজীর্ণ অন্যায্য সব নিষেধাজ্ঞার নিচে,
প্রতিদিন এই নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছি আমাদের শত
শত।
কতদিন আর? কতদিন আর চলবে এমন ধ্বংসের তাণ্ডব??
শুকিয়ে গিয়েছে বিবেক আপনাদের,
আর এই ডাকে – যে-ডাক কাঁপায় স্বর্গের সব
ফেরেস্তাদের আগুনের অন্তর –

অবিচল আপনারা।
হৃদয়ে আপনাদের
বিবেচনা গেছে শুকিয়ে, কিন্তু সেই নিষ্পাপ
দেবশিশুদের কান্নার ধারা শুকায় নি আজতক।

কনি আল-রামাহি

বাবা

তরজমা: সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী

বাবা, হে আমার বাবা,
হাসিমুখ তব এতখানি উজ্জ্বল,
বাবা গো, আমার বাবা,
আমার স্মৃতিতে বেঁচে আছো প্রাঞ্জল।
চাও নি কখনো দুখ পাই ক্ষণকাল।

তুমি বেঁচে ছিলে আল্লার রাস্তায়।
পারবে না তারা মোদের আকসা
করে নিতে ছিনতাই –
সতত তোমার এই ছিল প্রার্থনা।

বাবা, হে আমার বাবা,
সারাটা জীবন সয়ে গেছ যন্ত্রণা,
বাবা গো, আমার বাবা,
ব্যাথাতুর সংঘাত আর অন্যায়।

রকেট – বাজের নিণাদ – এবং চোখ-ঝলসানো আলো,
শহীদ হয়েছে কতজন সেই নিয়তিতাড়িত রাতে?

তুমি তো লড়েছ শুধুই ন্যায়ের পাশে,
সকলেই গাজী আল্লার ভরসায়;
সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গে তোমার হাসি–
মোনাজাত করি ফের যেন দেখা পাই।

বাবা, ও আমার বাবা,
হাতখানি মোর ধরে ছিলে দৃঢ়তায় –
বাবা গো, আমার বাবা,
রক্ত তোমার শুষছিল সিক্তায়।

মরুবালুকায় মেশানো শহীদ-খুন –
বাবার-ভায়ের – এই তো আমার ভূম।

বাবা, হে আমার বাবা,
জানি, তুমি জান, আমি কত গর্বিত।
শিরায় আমার বইছে তোমারই ধারা,

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

হাল ছাড়ব না– আমি যে প্রতিশ্রুত।

বাবা, হে আমার বাবা,
আল্লা তোমায় অপার শান্তি দিন,
বাবা, ও আমার বাবা,
মোদের যুদ্ধ থামবে না কোনো দিন।

বাবা, হে আমার বাবা,
আকিদা আমার হত্যা করতে
পারবে না কেউ তারা;
আমি ভালবাসি, বন্ধু, আমার বাবা,
হৃদয় আমার তোমার বাঁচায় ভরা।

ন্যান্সি হর্ন

আমি জেনিন

তরজমা: বখতিয়ার আহমেদ

একজন মার্কিন নারী, ন্যান্সি হর্ন, নিচের চিঠি আর কবিতাটা ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন ফর প্যালেস্টাইন (ইএপি) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমরা দুইটারই তরজমা এখানে ছাপছি:

প্রিয় ইএপি,

আমি মাঝবয়েসী একজন আমেরিকান-খ্রিস্টান নারী; সমর্থন করি তোমাদের আন্দোলন। আমি আর আমার স্বামী, দুজনের কেউই আরবি বা হিব্রু জানিনা। কিন্তু এখানকার ইংরেজি কাগজগুলোতে যা পড়ি, তা-ই অসুস্থ বোধ করবার জন্য যথেষ্ট। প্রতি সপ্তাহেই আমরা দুজনে চিঠি লিখে আমাদের দেশের নেতাদের কার্যকলাপজাত হতাশার কথা জানাই। তারপরও, যেহেতু দেশটা আমাদের, তোমাদের রক্ত আমাদেরও হাতে এসে লাগে– আমরা দুঃখ পাই, লজ্জিত হই। একই ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলে তোমাদের দুঃখটা আমাদেরও; আমরাও অসহায় আজ।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, যেভাবে মার্টিন লুথার কিং, মোহন দাস গান্ধী শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন, সেভাবেই আজকের এই নির্লজ্জদের লজ্জা দিয়ে – ঈশ্বরের কৃপায় – তোমরা তোমাদের মাতৃভূমি ফিরে পাবে।

আমার হৃদয়-উৎসরিত এই কবিতাটি গ্রহণ কর। আশা করি কবিতাটি লিখে, তোমাদের পাঠিয়ে, নিজের অজান্তে তোমাদের কষ্টের কারণ হব না। এ-কথার কারণ, হৃদয়ে তোমাদের জন্য তোমাদের সাথেই রক্তক্ষরণ হলেও ঠিক তোমাদের একজন নই বলে এ-কষ্টের প্রকৃত গভীরতায় আমার অনুভব সম্ভবত যেতে পারবে না।

বিনীত
ন্যান্সি হর্ন
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

আমি জেনিন।
এক আতঙ্কের স্বাদ, পরাভূত ঘৃণার গন্ধ,
নুড়িময় রাস্তায় পড়ে থাকা খেলনার গায়ে
ছলকানো রক্ত, নিজ বাসভূমের ধুলা আর রক্তের লেই
খামচে ধরেছে হৃদয় আমার।

আমি নাবলুস।
আজো ধরে আছি হাতে
পিতার লুণ্ঠিত ঘরের চাবি।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

আমি প্রাণের মুষল বৃষ্টিতে ভেজা জনাকীর্ণ গাজা
তবু আমার সন্তানদের পেটে ক্ষুধার আগুন
বিশাল চোখ জুড়ে ক্রোধ, আতঙ্ক।

আমি জাফা আর আক্রা,
যার সুপ্রাচীন বেদনার প্রস্তরগুলোও আজ পদতলপিষ্ট।
আমি সূর্যস্নাত পাহাড়ের পাদদেশ,
মেষহীন মায়াময় তৃণের উপত্যকা।
আমার বনভূমি, জলপাই-বাগান আজ মিশে গেছে মাটিতে,
আমার দেবতারা লাঞ্ছিত, নারীরা ধর্ষিত,
পুরুষেরা নিষ্পেষিত, মৃত।
আমার সন্তানেরা, হায় আমারে সন্তানেরা ...

আমি জেরুজালেম, আলোর বর্ণালী বধূ,
আজ ধর্ষিত, একদা-সুবর্ণ পাহাড়ের নীচে,
বসে আছি প্রতীক্ষায়
রিক্ত, নিঃসঙ্গ– তবু বলতে চাই
হায়! পৃথিবীর কোন প্রান্তেই ধ্বনিত হয় না
আমার চিৎকার– আমার কান্না।
অনুকম্পা নয়– প্রাপ্য ইনসাফের জন্য
আমার এ আর্তি– মানুষের বোধের কাছে।

সুদুরে অসহায়, বিষন্ন এই আমি
বসেছি সজল প্রার্থনায়–
আমার প্রিয় দেশের প্রভুকূল
যেন আর ভুল না করে,
যা আজ করছে সব ভুলে।

জেনিন, তোমার রক্তে আমার হাত নেই,
আমিও লড়ছি তোমার খুনিদের বিরুদ্ধে।
আমার হৃদয় তোমার জন্য কাঁদে, জেনিন;
আমার হৃদয় আজ তোমার জন্য ভাঙে, গাজা।

চোখ মেলি নিজ পাহাড়-প্রান্তে,
প্রাণময় শ্যামলিমায়;
আবার দেখি, তোমার পৃথিবী জোড়া
রক্তাক্ত ক্ষত চিহ্ন।

আমাদের ঈশ্বর একজনই
যাঁকে আমরা ভজনা করি নানা পথে,

সে তোমাকে ভোলেনি, প্যালেস্টাইন,
সে যে ছেড়ে যায় না আপনজন।

আমি জেনিন।
আমার পাখিরা গাইবেই আরেকবার,
পোড়া ছাই থেকেই জন্মাবে আবার
সবুজ বনভূমি–
হাজারো মানুষের ভীড়ে মুখরিত হবে
সব নগরী আমার।

আমাদের ঈশ্বর,
শোষক আর শোষিতের ঈশ্বর,
একদিন আমাদের ইনসাফ দেবেন,
দেবেন শাশ্বত শান্তি আর
সেদিন আমিও ফিরব ঘরে
তার পরশ নিয়ে গায়।

আবদেলকরিম আল-কারমি (আবু সালমা)

ফিরে আসবো

তরজমা: আ-আল মামুন

প্রিয়তম ফিলিস্তিন, কীভাবে কাটাবো এই রাত,
নিপীড়নের প্রেতাত্মা ঘোরে যখন দুচোখ জুড়ে,
জগৎ পবিত্র করি তোমার নামের শুদ্ধ জলে।
তোমার মমতা যদি এরকম শ্রান্ত না-করতো,
সঙ্গোপনে রাখতাম ঢেকে আমার বেদনা যত।
দিনের কাফেলা চলে যায়, আর বলে যায়
ষড়যন্ত্র যত ছিল বন্ধু কিংবা শত্রুর অন্তরে।

প্রিয়তম ফিলিস্তিন!
কী করে বাঁচবো আমি বলো,
এ-পরবাসে তোমার টিলা আর সমতল ছেড়ে
রাঙানো রক্তের দাগে
তোমার পর্বত-পাদদেশ
আমায় ডাকতে থাকে।

দিগন্তবলয় জুড়ে রক্তিম আভার ফুটে-ওঠা দেখি;
কান্নারত বেলাভূমি আমায় ডাকতে থাকে;
আমার রোদন-অনুরণনের ঢেউ শুধু কালের শ্রবণে।
বন্যাহীন স্রোতধারা ডাকছে আমায় শুধু;
শত্রুর ভূমিতে তারা হয়ে গেছে ভিন-যাযাবর।
শহর-নগর ডাকে, আমায় এতিম হয়ে ডাকে
প্রাসাদ-গম্বুজ আর গ্রামগুলো ডাকে সেইসাথে।

বন্ধুরা আমায় প্রশ্ন করে, "আবার কি দেখা হবে?"
"ফিরব আবার কবে?"
নিশ্চয়ই! শিশিরের ভেজা ঘাস চুমিব আবার!
রক্তিম কামনা জ্বলে নির্যাতিত আমাদের ঠোঁটে,
আমরা আসব ফিরে আগামী সকালে,
অনাগত মানুষেরা শুনবে সে পদধ্বনি জেনো।

আমরা আসব ফিরে সাথে নিয়ে ঝঞ্ঝাবায়ু, আর
বজ্রপাত ও উল্কাপ্রপাত;
আমরা আসব ফিরে গান আর স্বপ্ন সাথে নিয়ে
উড্ডীন ঈগলের বিস্তৃত পাখায়,

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

আমরা আসব ফিরে প্রান্তর-হাসানো ভোর নিয়ে –
সাগরে নাচের বেলা নিয়ে।
রক্তঝরানো পতাকা হাতে
ঝিলিক-দেয়া বল্লম আর তলোয়ারে শান দিয়ে
আমরা আসব ফিরে।

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

নাদিয়া আল-রামাহি

সৈনিকের পরাজয়

তরজমা: বখতিয়ার আহমেদ

গেটের ছায়া মুছে দিয়েছে দৃষ্টি আমার
শুধু লেশটুকু আছে মুখে,
ঠিক আমার প্রজন্মের মতই।

ওপারের মুক্তি তৃষ্ণা জাগায় আকণ্ঠ।
আমাকে কবর দাও তোমার পায়ের নীচে,
আকাশের গায়ে একটি গর্ত খুঁড়ো আমার জন্য ...

তোমাকে কী করে যোদ্ধা বলি, বলো,
যে-তুমি কোনও লড়াই দ্যাখোনি?
বাতাসের সামনেই তুমি নতজানু,
শক্তিতে ক্ষুদে জন্তরও অধম।

আমার পিতামহ ছিল কারাগারে,
তোমার লোভের হাতে বন্দী,
তোমার হাতে কয়েদ ছিল সে
তোমার অসারতা জেনে ফেলার অপরাধে।

তিনি চলে গেছেন,
হেঁটে গেছেন অনন্তের পথে
তাঁর রক্ত বোঝাবে তোমায় এ-চলে-যাওয়ার মানে।

তবু এখনও তুমি বেঁধে রাখো আমার তৃষ্ণার জল?
তাঁর কবরে ঢালো তা বখিলের মত ফোঁটায় ফোঁটায়?

তুমি আজো বুভুক্ষু–
আমার জানার চেয়েও বেশি।
জানি, তোমার লোভ এই জলে নয়;
তুমি চাও আমার রক্ত-মাংশ।

প্রকৃতির মুখে আঁচড় কেটে
আমার রক্ত পান কর ...
দ্যাখো, রক্ত নয়,
আমার শিরায় শিরায় ঘৃণা বয় অনর্গল।

তোমার চোখের মণি পোড়াবে এ শিখা
নরক-খাদে পড়বার আগে
প্রান্ত
ধরে
ঝুলছ
তুমি।

আমার রক্ত কি তোমার তৃষ্ণা মেটায়?
খাও! যোদ্ধা, প্রাণ ভরে নাও এর স্বাদ ...
দ্যাখো, কীভাবে গলগল করে নেমে এসে
পাথর হয়ে যায় রক্ত,
ফালি ফালি চিরে দ্যায় তোমার জিভ।
আমাতে তলোয়ার গেঁথে দ্যাখো সৈনিক...
দ্যাখো জমজম বয় কুলকুল ...

সেপ্টেম্বর ১৭, ২০০২

The Islamic Emirate of Afghanistan

Facts and Realities under Taleban Administration

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পটভূমি বানানোর ব্যাপারে একপাক্ষিক সর্বব্যাপী পশ্চিমা প্রচারণার বিপরীতে আমরা তালেবান সরকারের ভাষ্যটাও জানতে চেয়েছিলাম। আফগানিস্তানের তৎকালীন তালেবান সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের হদিস আমরা বের করি ইন্টারনেটে। সেইখানে ১৯৯৪ সাল নাগাদ আপডেট করা এই ভাষ্যটা পাওয়া গিয়েছিল।

The realities in Afghanistan are different than some of the media report. Such reporting does not reveal the real situation in Afghanistan. It is a campaign launched by countries that have geopolitical interests in Afghanistan to malign the Taleban Islamic Movement of Afghanistan (TIMA). Their aim is to isolate the young Islamic Emirate internationally. As a result of this, the rulers of these countries believe their puppets will gain political power in Kabul to serve their political and economic interests- obviously against the interests of others.

The Islamic Emirate of Afghanistan led by TIMA which has already brought security and peace to the country and put an end to the atrocities of irresponsible commanders, earnestly wants to serve the Afghan people and re-build the country. Similarly, the Islamic Emirate is willing to have good relations with all neighboring countries and the international community based on mutual understanding and non-interference.

The following explains policy on issues frequently raised in regard to I.S.A.

1. Women's Life Conditions Presently and Under Rabbani Regime

The Islamic Emirate of Afghanistan is fully committed to the social, cultural and economic development of women. The government has been able

to protect the honor, life and property of Afghan women. Contrary to the situation under the Rabbani regime, women can now be outside their houses safely without the fear of being kidnaped, raped or looted. They no longer fear conditions that were common during the Rabbani regime. According to amnesty international reports of 1992-95, women in Afghanistan bore the brunt of the atrocities by the Rabbani regime and other armed factions. Irresponsible commanders and gunmen not only violated the honor of women by raping them but mutilated women's bodies and in many cases, cut their breasts etc. Similarly, common was murder, torture and execution of our people by the armed factions. Due to the intolerable atrocities, the Taleban Islamic Movement emerged to deliver the defenseless Afghan people from the cruel hands of the warlords.

The former regime that did not serve the country had employed women in a number of sectors without any real need. Some of them were used just for the sexual entertainment of the bureaucracy. Due to the ineffective and immoral institutions, they have temporarily been relieved of their duties. The government pays them their salaries regularly. But women whose work is really needed, are still working in the health, education and security sectors. As conditions in the country improve, so will, doubtlessly, job opportunities for women.

2. Women's Education

The Islamic Emirate of Afghanistan considers education to be obligatory equally for men and women according to the tenets of Islam. This is a clear verdict of our religion. However, currently the country is in shambles, its economic structure destroyed and education facilities turned to rubble like much else in the country. Afghanistan requires appropriate foreign assistance to rebuild every aspect of educational institutions. The present war situation imposed and fueled by foreign powers diverts from Afghanistan's already meager national resources that would be better allocated to opening more schools. Larger and more centrally-run schools in urban areas present the greatest challenge. Secondly, the Afghans do not trust the communist-style curriculum. We have to restore the trust of the common people in government-run education.

We also need to compile a new curriculum that will answer to the needs of our society. Thirdly, the war has created a huge brain drain in all sectors including education. In order to successfully tackle restoration of educational, economic, political and social institutions, the government wants to attract Afghan professionals and intellectuals living abroad. We want them to take part in the reconstruction of their country. Without their full participation in the rehabilitation and development efforts, the Islamic Emirate will not be able to tackle these issues

successfully.

3. Currently Operating Schools

Despite the limited economic resources of the Islamic Emirate of Afghanistan to fund educational institutes, universities in Qandahar, Kabul and Nangrahar provinces are operating as usual. Several NGOs have been allowed to fund schools in Afghanistan, besides the schools funded by the government.

Contrary to reports about girls education in the press, the figures obtained from the education sector in Afghanistan, reveal that girls education in rural Afghanistan is increasing. According to a survey conducted by the Swedish Committee for Afghanistan (SCA), almost 80 per cent of the girls schools located in rural areas under the administration of the Islamic Emirate of Afghanistan are operating in full swing. Ms. Pia Karlsson, education advisor at the Education Technical Support Unit (ETSU) of SCA, said in a recent interview published by the Frontier Post, a Peshawar based English daily that only in Ghazni province, where the Islamic Emirate under the leadership of TIMA has control for the last two years, approximately 85 per cent of the girls are still in schools. Ms. Karlsson says, "The picture outside the cities is totally different."

The SCA which has been supporting elementary education in Afghanistan since 1984, currently supports 422 boys schools, 125 girls schools and 897 mixed schools (co-education) in the forms of primary schools and home schools. During the survey, she concentrated on 100 SCA supported girls schools in the nine provinces: Kabul, Kunar, Laghman, Ningarhar, Ghzani, Logar, Paktika, Paktya and Wardak. All these provinces are under the administration of the Islamic Emirate of Afghanistan. According to the survey, female attendance was at 94 per cent and of the 7834 girls enrolled, 7341 were found present. More significantly, at least 170 female teachers were found teaching in these schools. Similarly, in Kunduz province, 122 schools are operating with 390 female teachers teaching at the schools. The Islamic Emirate is ready to open girls and boys schools with appropriate foreign assistance.

4. Female Health Sector

Health facilities for women have increased 200% during Taleban administration. Prior to the Taleban Islamic Movement's taking control of Kabul, there were 350 beds in all hospitals in Kabul. Currently, there are more than 950 beds for women in exclusive women's hospitals. Some hospitals which have specifically been allocated to women include Rabia Balkhi Hospital, Malali Hospital, Khair Khana Hospital, Indira Gandhi Child Health Hospital, Atta Turk Hospital, Kuwait Red Crescent Hospital,

Contagious Disease Hospital and T.B. Hospital. Moreover, there are 32 mother and child health clinics. In addition to this, women receive treatment at ICRC and the Sandy Gal Orthopaedic Centers. In all these hospitals and clinics, women work as doctors and nurses to provide health services to female patients.

5. Drug Control

The Islamic Emirate of Afghanistan is ready to help the international community wipe out drug trafficking because the tenets of Islam enjoin on us to prevent cultivation, selling and use of intoxications whatsoever. On our part, we have taken drastic measures to put an end to drug trafficking, use of drugs and its production. Those found guilty are heavily punished according to the Emirate law. By dividing the problem into three categories, the Islamic Emirate has concentrated on the following facets of the problem:

1. Use of Drug: The Islamic Emirate has imposed a strict ban on the use of drug in the country and great success has been achieved in this field.
2. Drug Trafficking: The government of I.S.A. has legally prohibited production and trafficking of drugs and severe punishment has been introduced for perpetrators.
3. The cultivation of marijuana has been easily brought under control because this product was not cultivated on a large scale. Similarly, the government has set up a commission with the UNO Narcotic Control Department to work out ways and means to completely put an end to cultivation of poppies. It can be achieved through providing crop substitute to farmers and introducing small projects in the area so that people will have a substantial income to lead their life .

6.Terrorism

Willingness to Establish Friendly Relations with all Countries Based on Mutual Respect and Non-Interference The ISA is against all forms of terrorism and is ready for cooperation with the international community to curb it. The government has taken practical steps in this regard. The para-military training camps which existed during the Rabbani regime have been closed down.

The case is often made that Osama Bin Laden is living in Kandahar under the administration of the Islamic Emirate of Afghanistan. However, the fact is that prior to the emergence of TIMA he was functioning and moving around freely while Rabbani and Massood ruled in Kabul. The Islamic Emirate of Afghanistan has moved him to Kandahar to keep him under strict limitations. He is no longer allowed to use Afghan

soil to cause harm to any country.

7. Treatment of POWs

The ISA treats POWs in accordance with all accepted national and international norms and laws. Over 3000 POWs and several army generals of the opposition captured by the Islamic Emirate, have been set free unilaterally on different occasions during the past three years. The Islamic Emirate of Afghanistan provides all basic facilities of health, nutrition and clothing to the prisoners. When a prisoner voluntarily offers to perform a physical task, he is paid half of the wage being paid to normal market wage-earners. The Red Cross has free access to all prisoners and indeed backs the I.S.A's claims on the treatment of prisoners. On the other hand, the rebel opposition is well-known for their ill-treatment and brutality against the POWs of the Islamic Emirate of Afghanistan. They massacre our POWs collectively and no international organization has been allowed to visit the POWs of the Islamic Emirate of Afghanistan. It is ironic that the gross violations of humans rights that opposition militias have engaged in constantly go unnoticed by the world.

8. Seeking a Negotiated Solution

ISA believes in a negotiated and peaceful solution. To us, military solution is the last alternative. We want to avoid bloodshed as much as possible and reach a lasting solution through negotiation and peaceful means if it is possible. The ISA is prepared to hold talks with Jamiate-Islamic (Rabbani) Supervisory Council (Masood) and Hezbe-Wahat (Khalili,) without any pre-condition.

9. Willingness to Establish Friendly Relations with all Countries Based on Mutual Respect and Non-Interference

The Islamic Emirate of Afghanistan wants friendly relations with all those countries of the world who are not pursuing enmity against it and who respect the territorial integrity, Islamic and national sovereignty of Afghanistan. The Islamic Emirate of Afghanistan does not want to interfere in other countries internal affairs and does not want others to interfere in its internal affairs. Similarly, I.S.A. wants good relations with all neighboring countries on the basis of Islamic and international laws and on the basis of non-interference in each other domestic affairs. The Islamic Emirate has practically shown this through goodwill gestures to its neighbors by strictly abstaining from any hostile or provocative military and political action against neighboring countries. Unfortunately, some of our neighbors have unilaterally been meddling in our internal affairs, providing military and logistical aids to the opposition forces of

the Islamic Emirate which is certainly contrary to the Islamic law and the international covenants.

(a) A Reminding Glimpse of the Islamic Jihad - 1978 to 1992
(b) Hostilities and Ineffectiveness of the Leaders
(c) Foreign Invervention Intensifies Factional Hostilities
(d) Efforts to ProEmirate a Nation
(e) The Taleban Rise to Rescue the People and the Country
(f) Taleban Islamic Movement as a Grass Roots Movement

(A) A Reminding Glimpse of the Islamic Jihad: 1978 to 1992

Afghanistan's Jihad against communism and foreign occupation began under the banner of Islam. It was on the basis of the teachings of Islam that a small, ill-equipped nation succeeded in defeating a Super Power who seemed well-positioned to dominate the world. As students of Islamic teachings, the Taleban played a paramount role in mobilizing, planning, and directing the holy Jihad. This role was not new to the Afghan history. In the past, whenever a foreign power invaded Afghanistan and threatened freedom and independence of the Afghans, the Islamic Students (called Talaba) left their schools or Madrases to fight at the head of the Afghan armies. Based on this historical tradition, and their complete devotion to the holy teachings of Islam, the Taleban were naturally opposed to the communists and their decadent materialistic philosophy and atheistic view of the world. Before the communists were helped to power by the direct support of the Soviet Union in 1978, the Taleban used preaching and religious guidance as the major means of fighting against the atheist ideology and corruption. After the communist coup d'etat, it was clear that preaching and religious education had to be complemented by practical Jihad if the people of Afghanistan were to be saved from vices that were being promoted by the communists and their supporters. Thus, the Taleban changed their strategy and called on the nation to take up arms and render resistance against the atheist regime and its collaborators. Within a short period, the struggle that began with the help of a handful of devout Islamic teachers and students took national proportions and began to shake and frighten the communist regime. In December 1979 the communist regime was at the brink of collapse when the Soviet Union decided to send 150,000 troops to pacify the Islamic uprising that had engulfed the whole country. But soon it became apparent to the Soviets and the rest of the world that crushing the resistance was not a task that could be accomplished easily or quickly.

The struggle continued relentlessly and was organizationally cen-

tered around a number of different political parties called Tanzeemha. The Islamic Ulema (religious scholars) and the Taleban (Islamic Students) were particularly attached to two of these political parties. These two were Harakat-e Inqelab-e Islami-e Afghanistan (Afghanistan's Movement of Islamic Revolution), under the leadership of Mawlavi Mohammad Nabi Mohammadi and Hizb-e Islami (The Islamic Party), under the leadership of Mawlavi Mohammad Yunes Khales. Many of the Afghan Taleban and Ulema served as leading commanders in the battlefield, maintaining strong fronts all over the country and waging both spiritual and armed war against the atheist forces of the Evil Empire. The struggle for the faith, freedom, and dignity of the Afghan people lasted over 14 years. During these trying and painful years, over two million Afghans were massacred and slaughtered by the evil forces of the Red Army, tens of thousands of innocent men, women, and children became permanently maimed and disabled, thousands of the faithful and intellectuals were made victims of mass-executions, several thousands were sent to prisons, tortured, buried or burned alive. Whole villages were destroyed to the ground or burned to ashes. The economy of the country was ruined. As a result of the atheist policies of the communist regime, Afghanistan became a graveyard of the faithful; honesty and morality were forced out of people's lives; and Afghan culture, education, and mass media were put in the service of promoting communist ideology and philosophy.

In spite of the tremendous hardships, the Taleban and other devout Moslems of Afghanistan continued their holy war of spiritual salvation and national freedom until the Soviet Union withdrew its forces in defeat on February 15, 1989. Eventually, on December 28, 1992, the puppet regime that was installed by the Soviets collapsed, and the prospects of the establishment of an Islamic, peace-seeking government in Kabul appeared on the horizon. With the Soviets gone in disgrace, and their puppets defeated, the Taleban perceived their task accomplished, and soon returned back in large numbers to their Madrases, to take up their search for knowledge and spiritual advancement. The period described above that lasted from 1978 to 1992, can be called the First Phase of the Taleban mission in serving their faith, their people, and their country.

(B) Hostilities and Ineffectiveness of the Leaders

Soon after taking power in Kabul, the weaknesses and ineffectiveness of some of the leaders of the political parties began to show up. Those who formed the new government, after the communist regime collapsed, proved incapable of bringing peace, security, and stability to the country. They failed to establish a united and effective administration, free

from discrimination and corruption, to run the national and international affairs of the country. Members of the new administration, each in turn, tried to grab and monopolize power for their particular faction or clan. A fierce and devastating factional fighting started to flare up in the capital. Designated Prime Minister, Gulbaddin Hekmatyar, took up arms against President Sibghatulla Mujaddidi, using the presence of the communist militia leader, Rashid Dostem in Kabul, and his support of Mojaddidi's presidency, as a pretext. Mr. Mujaddidi's presidency lasted only two months, during which fighting and bickering went on between factions attached to different political parties.

Following the Peshawar Accord, Mr. Burhanuddin Rabani ascended to the post of presidency and Mr. Hekmatyar was granted (once again) the post of prime minister. Nevertheless, the new power-sharing arrangement failed to satisfy the lust and ambitions of those who were striving for the monopolization of political power. The factional war continued, albeit with greater intensity and proportions, with the forces of Hekmatyar on the one side, and the forces of Rabani and Rashid Dostem on the other. During this period, over 80 percent of the Kabul city was ruined and thousands of innocent people lost their lives. Yet, soon differences appeared between Mr. Rabani and his communist ally Rashid Dostem. Using this opportunity, Mr. Hekmatyar, despite all his previous claims and allegations, joined ranks with Rashid Dostem and Mr. Mujaddidi and formed a coalition with them to take power from Rabani and his military strongman, Ahmad Shah Masood.

Rabani who had lost an important ally to the enemy, reacted by declaring Rashid Dosten an infidel, and announced holy war against him and his forces. Mr. Rabani, further, extended his allegation of infidelity to Mr.

Hekmatyar, and claimed that war against Dostem and Hekmatyar was a Jihad (a religious obligation of the faithful), because these two had launched a rebellion against the Islamic Emirate of Afghanistan. The fractional war escalated and the sufferings of the residents of Kabul took horrific proportions.

Despite the severity of the war in Kabul that had no other cause except the inability of the factional leaders to reach a workable political compromise, none of the rival groups made any clear-cut advancement in annexing more territory of the capital. Kabul, like before, remained divided, with different parts of the city in the hands of different factions and groups. The administrative centrality of the Emirate collapsed and complete chaos and anarchy prevailed over the country.

(c) Foreign Intervention Intensifies Factional Hostilities

Taleban Islamic Movement as a Grass Roots Movement War, destruction,

disunity, and lack of concern among leaders for the life and dignity of the ordinary citizens, provided foreign self-seeking powers with the long-awaited opportunity to promote and expand their interests and agendas in Afghanistan.

Iran pushed the Shiite Hezb-e Wahdat to the battlefield, whereas Russia and Uzbekistan provided support to the communist militia leader Rashid Dostem. India, on the other hand, provided technical and financial assistance to Rabani and his military strongman Masood. The mass-media of these countries used every opportunity to add fuel to hostilities, widen the differences between the parties and give ethnic twists to the political and personal rivalries that existed among the feuding warlords and their political bosses. Open foreign intervention and support lent to particular groups, led to the further intensification of hostility and bloodshed among selfish warlords, who were still ferociously vying to grab power the capital.

The blazes of the brutal and unforgiving war did not, indeed could not, remain confined to the city of Kabul. Soon it spread throughout the country in one shape or another. Because warlords and other irresponsible people were in possession of heavy and light weaponry, looting posts and checkpoints were erected within cities and along national highways by brigands, robbers, and bandits. These posts were used to rob innocent people who had to use the roads, and to extort illegal and arbitrary taxes from the travelers. These checkpoints were also used to detain young boys and beautiful women for sexual misuse and rape. During the course of this brutality, lawlessness, and war that lasted for four years, over 50,000 Afghans were killed and thousands of others were crippled, kidnaped, raped, and tortured.

After the communists were defeated, the people of Afghanistan, tired of 14 years war and suffering, expected their political leaders to resolve their differences in a civil and Islamic way, and use their authority and energy for the reconstruction of the devaEmirated land. The people of Afghanistan rightfully expected that those leaders fulfil the promise they had made to them, and to the world, regarding restoring peace, security, and liberty that were destroyed by the evil forces of communism. The people of Afghanistan hoped that those who claimed their leadership succeed in establishing a true Islamic Emirate capable of restoring justice and equality in the country.

Unfortunately, all these expectations, aspirations, and hopes were shattered, because those who took the reigns of power, after communism was defeated, failed to set aside their differences and act in a humane, compassionate way. Realizing the grand failure of their leaders, Afghans began to question the legitimacy and efficiency of the new Emirate.

(D) EFFORTS TO PROEMIRATE A NATION

Feeling betrayed, and disappointed, by the irresponsible behavior and the dismal performance of their leaders, Afghans hoped that friendly countries who had supported them during the anti-Soviet war, would step in and try to mediate between the warring parties. Regrettably, steps taken by these countries towards mediation and reconciliation failed to produce concrete results and put an end to the feud between leaders and their warlords. Next, Afghans turned their hopes to mediation by the OIC. Unfortunately, because of the egoism of the leaders and their lack of interest in searching for a genuine solution, the efforts of this important organization also proved futile. Still Afghans did not give up hope; they thought that the United Nations may be interested and able to put an end to the fratricide that was pushing Afghanistan deeper and deeper into chaos, violence, and anarchy. Though the U.N. Secretary General dispatched his Special Envoys to Afghanistan and the region from time to time to search for a resolution of the conflict, the efforts of these Envoys proved inadequate and unsuccessful.

As a result several trips to Afghanistan, Ambassador Mahmoud Mistiri, the former Special Envoy of the Secretary General, determined that the main obstacle to the restoration of peace and security in the country was the existence of weapons in the hands of rival groups and other irresponsible people, who were using these weapons to commit crimes and pursue illegal economic activities, such as hostage-taking, smuggling, and drug-trafficking.

Thus, Mr. Mistiri proposed purchasing these weapons from the public and drew a plan of action to restore peace in Afghanistan. As part of his plan, Mr. Mistiri gathered a number of former Afghan administrators and intellectuals from all over the world in Quetta, Baluchestan, and organized them in three, i.e., political, financial, and military, committees. These committees were supposed to make arrangements for the purchase and collection of weapons, create a neutral security force, 20,000 to 30,000 men strong, to be deployed in the areas where arms were being collected, and last but not least, to provide administrative staff and resources for the interim political set-up that was supposed to replace the Rabani regime.

Conceptually, Mistiri's plan sounded reasonable and promising. Yet, neglecting the role of the real representatives of the people of Afghanistan in the peace process, lack of genuine international support, as well as political maneuvers by Rabani and his collaborators to extend his term of office, caused this plan to go nowhere. Soon the plan was abandoned and the civil war continued unabated.

(E) The Taleban Rise to Rescue the People and the Country

The suffering took diabolic proportions. It seemed that all doors of hope were closed and the end of the spiral of violence and war was not in sight. Ordinary people began to raise their voices. Those who were victims of atrocities committed by the warlords turned their attention to those who first issued the Fetwa (religious order) of Jihad, i.e., the religious scholars, and those who led them in the prosecution of this order, i.e., the Taleban. The people asked: " Why our religious scholars and students, who preach justice and peace, do not do something to save us from injustice and war?" This was an expectation and a question that could not be left unanswered by those who believe in God and whose purpose in life is to serve His will.

In response to this important calling directed to them by the innocent and suffering people of Afghanistan, the Taleban once again stood to their feet, closed their books, and came out of their Madrases classrooms to begin the second phase of their holy Jihad against the wickedness and the corruption. The rise of the Taleban was accompanied by a Fetwa issued by the Islamic scholars, confirming the legitimacy of their uprising against corruption and vice. In this way the new movement was called "The Taleban Islamic Movement of Afghanistan." The paramount purpose of this movement is to stop the war of national annihilation and to liberate the people of Afghanistan from the yoke of oppression and despotism imposed upon them by the forces of evil and arrogance.

(F) Taleban Islamic Movement as a Grass Roots Movement

The Taleban Islamic Movement of Afghanistan is a genuine grass roots movement that draws its power and support from the masses of the Afghan people. All those who support the Taleban agree with the paramount goal of the Taleban, which is collecting weapons from the hands of irresponsible persons, groups, and warlords.

Within the first two years of its existence, the Taleban Movement succeeded in eliminating the large number of looting posts or checkpoints that had made life for citizens of the country painful and intolerable. During the same period, the Taleban were able to disarm irresponsible individuals and groups and, thus, restore peace and security in more than 80 percent of the Afghan territory. After the Taleban succeeded in driving the corrupt forces of Rabani and his military commander from Kabul in September 1996, they were able to establish a central administration in the capital, run by people of good faith and intention. This is the first administration in almost 20 years that is truly interested in the well-being of the citizens and trying hard to make life for them easier.

Those who run this administration are chosen on the basis of their loyalty and concern for the people, irrespective of their race, language, ethnicity, or region. This policy is in full agreement with the desire of the UN, reflected in the decision of the Secretary General to send envoys to Afghanistan from time to time.

The Taleban Islamic Movement has been received and welcomed with happiness and open arms by the people in more than two-thirds of the country. There is no doubt that the Taleban Movement will be received and greeted with cheerful tears in the rest of the country that is, unfortunately, still under the yoke of the forces of oppression and despotism. There is no opposition in these areas to the Taleban administration, except by those self-seekers and criminals who have lost their unearned privileges, positions, and perks. These self-seekers and criminals accuse the Taleban of harshness and strictness in the implementation of the traditional Islamic Law in Afghanistan. Whereas the actual situation in Afghanistan clearly substantiate the fact that the Taleban have restored law, order, peace, and morality with the support of the absolute majority of the people in that country. It is unfortunate that the Western media has such a short span of memory, otherwise they should remember what was done to the people of Afghanistan when the warlords and groups of armed bandits ruled the country. It was the Taleban Movement that through great efforts and sacrifices put an end to the horrifying chaos and tyranny that were ruining the country and its people. The Taleban achieved this with the help of God, and does not expect any thing in return except a fair and just judgment.

ACCOMPLISMEMT OF THE TALEBAN ISLAMIC MOVEMENT AND ITS AIMS

Thus, when the Taleban Islamic Movement took the reign of political power in Kabul on September 27, 1996, and formed the Islamic Emirate of Afghanistan, the city was in shambles, the treasury was empty, the administration was crippled, the infrastructure was ruined, and city services, such as health care, sanitation, water, electricity, telephone, and transportation were almost non-existent, opportunities for productive and gainful employment did not exist, food and grain were in short supply, hyperinflation was out of control, and economic dependency among families was widespread. In simple words, for the overwhelming number of people who were not in one way or another attached to the regime of Mr. Rabbi, or to his self-styled commanders, life was brutish, difficult, and extremely painful. The Taleban, from the very first day of their rise, were determined to put an end to this dismal situation. Thus, after taking Kabul, they began the difficult task of rehabilitating Kabul and the rest of the country. In the pursuance of this noble objective with the help of God, The Almighty, they have succeeded in bringing

about a number of drastic changes, some of which are listed and discussed below.

(i) Restoration of Full Security of the Citizens
(ii) Pursuance of Honest and Sincere Negotiations
(iii) Support for the UN and OIC Peace Efforts
(iv) Respect for UN Rules and Principles
(v) Search for Mutual Respect and Friendly Relations Towards All Countries
(vi) Establishment of a Credible and Accountable Islamic Regime
(vii) Protection of Human Rights and Liberties
(viii) Restoration of Women's Safety, Dignity and Freedom
(ix) Observance of Islamic Hejab or the Veil
(x) Women's Education in the Islamic Emirate of Afghanistan
(xi) Establishment of a Representative Government on the Basis of Islamic Shariah
(xii) The Islamic Emirate Lends Full Support to the UN Agencies and the NGOs
(xiii) Efforts to Combat Production and Consumption of Illicit Drugs
(xiv) The Islamic Emirate is Against All Forms of Terrorism
(xv) The Islamic Emirate of Afghanistan Intends to Rebuild the War-Torn Country

(I) Restoration of Full Security of the Citizens

The Islamic Emirate of Afghanistan, disarmed hundreds of large and small groups of bandits and self-proclaimed commanders who were killing, raping, and robbing the citizens in the city and its surroundings. A working judicial system has been put into place in the areas under the Taleban administration. Life, property, children, personal rights, and dignity of people in these areas that one could aptly call "the liberated areas," are protected in the framework of the holy Islamic Legal Code, i.e., the Islamic Shariah, regardless of race, language, tribe, or regional origin of the persons involved. Property rights of individuals and legal entities enjoy full protection in the Islamic courts. Properties taken away by force or deception from people by Emirate or by individuals are returned to their original owners. Checkpoints and looting posts erected by self-styled administrators and commanders have been eliminated from roads and highways. Roads have been opened for free movement of persons and goods.

(II) Pursuance of Honest and Sincere Negotiations

As a second important step towards restoring peace and tranquillity in the country, the Islamic Emirate of Afghanistan is committed to give priority to sincere, honest, and constructive negotiations with those who still resist the restoration of a united Afghanistan. The Islamic Emirate

of Afghanistan strongly believes that the continuation of war and armed conflict in Afghanistan is not only detrimental to the interests and well-being of the Muslim people of Afghanistan, but it also seriously endangers peace and security in the neighboring countries and the region. In line with this stance, the Islamic Emirate of Afghanistan has repeatedly asked the neighboring countries to stop their financial and arms assistance to the opponents of the Islamic Emirate, and to use their influence on these groups to bring them to the negotiating table. Unfortunately, so far, the opponents of the Islamic Emirate, gathered around the former communist militia leader Rashid Dostem, and their foreign supporters, have failed to reciprocate these good, peace-seeking intentions of the Islamic Emirate of Afghanistan under the leadership of the Taleban Islamic Movement. In contrast, every time they have received a new shipment of arms or money from their foreign supporters, Dustem and Masood have tried to gain territory by force and have let canons scream instead of allowing peace to raise its voice.

(III) Support for the UN and OIC Peace Efforts

From the very first day of their rise against vice and corruption, the Taleban Islamic Movement of Afghanistan has lent serious and genuine support to the peace-making efforts of the United Nations and the Organization of Islamic Countries. We have always welcomed the UN Special Envoy for Afghanistan and his staff, as well as representatives of the OIC, with utmost respect and interest in Kabul and Kandahar. We have provided them with conveniences they needed to travel inside Afghanistan. The leadership of the Islamic Emirate of Afghanistan has never failed to search for possible venues of peace and negotiations by persuading the opponents to lay down their weapons and return to the negotiating table. We have sent high level delegations to all of the preliminary meetings organized so far by Dr. Norbert Holl.

(IV) Respect for UN Rules and Principles

The Islamic Emirate of Afghanistan considers itself to be a faithful member of the United Nations. As one of the oldest members of the world body, the Islamic Emirate of Afghanistan respects and adheres to all rules and principles ratified by the UN, provided they do not contradict the teachings of the Islamic Shariah. The Islamic Emirate of Afghanistan considers all international treaties to which Afghanistan has been a legitimate party as valid, and promises to fulfill its obligations in this respect, in so far as the principles laid down in Islamic Shariah support and confirm such obligations.

Regrettably, as a result of the current domestic conflict, as well as

a certain degree of negligence and indifference on the part of the UN, today the Afghan UN Representation has been given to a group of self-seeking and war-mongering individuals who not only do not represent the Afghan people, but use this position to conspire, in cooperation with the enemies of Afghanistan, against the self-determination right of its innocent and oppressed people.

The Islamic Emirate of Afghanistan is hopeful that this injustice done to the people of Afghanistan is soon corrected and the Afghan Representation at the UN is returned to the its Designate Representative and his staff, who are present in the city of New York.

(V) Search for Mutual Respect and Friendly Relations Towards All Countries

Based on the condition of respect for the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan, the Islamic Emirate of Afghanistan wishes to develop and maintain friendly relations with all countries in the region and in the world. The Islamic Emirate of Afghanistan is anxious to participate in efforts aimed at maintaining peace and resolving conflicts in the region and the world. Based on tradition and the recent experience, the Islamic Emirate of Afghanistan has great respect for the sovereignty and territorial integrity of the nations, whether adjacent to or far from Afghanistan.

In pursuing this basic principle, the Islamic Emirate of Afghanistan, rightfully, expects that other nations too refrain from interfering in the internal affairs of Afghanistan. In cases where the goodwill and good wishes of the Islamic Emirate of Afghanistan is reciprocated by hostility and bad intentions regarding the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan, the Muslim people of Afghanistan reserves the right to defend themselves and their country in any way they see appropriate.

(VI) Establishment of a Credible and Accountable Islamic Regime

Since the arrival of Islam to the two sides of the Hindukush mountains over 1300 years ago, Afghanistan has always been, and will always remain, an Islamic country. Except for the relatively short but bloody period of the communist reign, the political regime of the country has been based on the teachings of Islamic Shariah. Islam always provided the fundamental legal code or the set of laws upon which the political, economic and the judicial systems of the country were founded. During this century, these laws twice underwent some modifications: Once during the time of King Amanullah in 1921 and for a second time during the reign of the former King Mohammad Zaher Shah in 1964.

After liberating Kabul in September 1996, the Taleban Islamic Movement declared all non-Islamic laws and regulations, passed and

practiced during the communist regime, invalid and reintroduced the set of laws that were in place during the time of the former King Mohammad Zaher Shah. At present, the Islamic Emirate of Afghanistan runs its affairs on the basis of these laws, and the constitution passed in 1964. To adapt the constitution to the present situation, the chapter dealing with the status of the King has been removed. Furthermore, to eliminate government waste and inefficiency, the Islamic Emirate of Afghanistan has reduced the number and the size of Government Ministries to what existed during Daud`s regime.

(VII) PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND LIBERTIES

By restoring security, and applying the uniform rules of the Islamic Shariah, for the first time since April 1978, the Islamic Emirate of Afghanistan is providing equal protection and justice for all. As a result of the introduction of Shariah, arbitrariness in resolution of disputes, nepotism, discrimination on the basis of tribal, linguistic, religious orientation, or regional affiliation have been eliminated. Individual property rights have been restored, confiscation of private property by Emirate, or by those attached to it, have been stopped. Freedom of engaging in legal economic activities and freedom of movement have been guaranteed.

(VIII) RESTORATION OF WOMEN'S SAFETY, DIGNITY AND FREEDOM

Being highly concerned about the well-being of its female citizens, the Islamic Emirate of Afghanistan, soon introduced measures to put a stop to the miserable living conditions under which the women lived in Kabul. After the communists took over in Kabul, they began to exploit women for the purpose of advancing their political and social agendas. In spite of war condition in the country and with no work in the offices, the communist regime forced a large number of women to attend government offices only for their amusement.

The Islamic Emirate decided to pay the salaries of these women at their homes, so that they could stay home and take care of their families and children. The purpose of this policy is to help revive the Afghan family and household, as the foundation of the Afghan society, a foundation that was intentionally destroyed by the communist regime.

The Islamic Emirate of Afghanistan is determined to provide educational and employment opportunities for the women of Afghanistan, as soon as the security and financial circumstances under which the Islamic Emirate operates allow such a step to be taken. In the meantime, the Islamic Emirate of Afghanistan will try to acquire the resources and build the facilities that would make the separate education of women

possible.

(ix) Observance of Islamic Hejab or the Veil

The enforcement of the code of Islamic Hejab by the Islamic Emirate of Afghanistan is fully consistent with the Islamic beliefs of Afghans and the traditions of the Afghan society. Wearing a veil is common among women all over Afghanistan. Islam and Afghan tradition attach the greatest importance to the honor and safety of women in the society.

To comply with the Islamic code of Hejab, as well as to reduce the degree of threat to the personal safety of women, the Islamic Emirate of Afghanistan is asking the women to observe the Islamic Hejab, and cover their faces in public. This is a measure that is undertaken for the simple reason of protecting the honor, dignity, and personal safety of the women in Afghanistan.

(x) Women's Education in the Islamic Emirate of Afghanistan

Based on the holy teachings of Islam, the Islamic Emirate of Afghanistan considers education as the pillar of a healthy and prosperous individual and social life. The Islamic Emirate is determined to provide educational opportunities for all Afghans irrespective of gender, race, tribe, language, or regional affiliations.

Unfortunately, today conditions for the implementation of a sound, effective, and Islamic educational program for the women of Afghanistan are nonexistent. Over ninety percent of school buildings have been ruined by the war. Qualified teachers have left the country. School books are full of communist propaganda and indoctrination material. Because of past abuses of the educational system for the purpose of propagating atheist ideology and ideas, the great majority of Afghan fathers and mothers have lost faith in schools and secular education. Last but not least, in spite of its deep desire to activate the schooling system in the country, the Islamic Emirate of Afghanistan has been facing great difficulties in securing the financial and physical resources needed to provide security for the schools, reconstruct school buildings, print new books, acquire the necessary materials and pay for qualified and dependable teachers.

The limited amount of resources at the disposal of the Islamic Emirate are being used to finance a war that has been imposed on Afghanistan by the brazen and open intervention of countries such as Iran, Russia, Uzbekistan and India. Intervention by these countries, and the resulting terrorist activities launched against the innocent men and women of Afghanistan by groups affiliated to these countries, have made

the task of providing security for schools and public buildings, particularly girl's schools, extremely difficult.

(XI) Establishment of a Representative Government on the Basis of Islamic Shariah

The Islamic Emirate of Afghanistan adheres to the principle of a representative government based on the teachings of the Islamic Shariah. Government in Islam is open to all groups living in the Islamic society, irrespective of their race, language, region, ethnicity, tribal affiliation, and religious orientation within the Islamic faith. Discrimination by government and in government on any pretext is strictly prohibited in Islam. Government posts in an Islamic society are to be given to those who are the most virtuous members of the society. Leaders of an Islamic Emirate serve as role models and set examples. Thus, these leaders are chosen on the basis of their merits and virtues, not on the basis of their party or other kinds of affiliations.

Members of the current care-taker administration in the Islamic Emirate of Afghanistan have been chosen by the Ulema of the country. These members represent all ethnic, religious and Jihadi groups who have struggled to free Afghanistan from the tyranny of atheism and fascism. When circumstances change and an appropriate environment more conducive to political dialogue is created, the Islamic Emirate will take further steps towards solidifying the representational foundations of the Islamic Emirate.

(XII) The Islamic Emirate Lends Full Support to the UN Agencies and the NGOs

The Islamic Emirate of Afghanistan has paid special attention to cooperation with UN agencies and the NGOs operating in Afghanistan. The Islamic Emirate has provided full support and protection to the legal activities of the NGOs in the territories under its control. The security forces of the Islamic Emirate have safeguarded the life and property of all foreign citizens working in Afghanistan, including UN offices and personnel, foreign reporters, teams and delegations of other international organizations and Emirates, visiting the Taleban-controlled areas. The security of highways and air traffic made possible through security efforts of the Islamic Emirate of Afghanistan have facilitated the movement of humanitarian international assistance across the liberated territories.

(XIII) Efforts to Combat Production and Consumption of Illicit Drugs

The Islamic Emirate of Afghanistan has declared the production and shipment of illicit drugs throughout its territories as illegal and prohibited. Consumption of narcotics and alcohol has been prohibited and is

punishable on the basis of Shariah. The Islamic Emirate has made serious efforts to curtail and eliminate poppy and Hashish cultivation and production in areas under its control.

Nevertheless, the Islamic Emirate of Afghanistan is concerned that as long as there exists a lucrative market abroad and as long as the economic situation of the Afghan farmers is such that it provides drug dealers with the opportunity to exploit their poverty, the problem of illicit drug production and trafficking will continue to be a difficult and costly fight for everybody concerned.

Thus, the Islamic Emirate of Afghanistan asks the United Nations and the world community to design, among other measures, a program of reasonable incentives for the Afghan farmers, and farmers of other drug producing countries, to stop them from engaging in this activity.

(XIV) THE ISLAMIC EMIRATE IS AGAINST ALL FORMS OF TERRORISM

The Islamic Emirate of Afghanistan has not and will not support acts of violence and terrorism under any name or in any form in any part of the world. The Islamic Emirate of Afghanistan firmly believes in peaceful ways of resolving conflicts at national and international levels. The Islamic Emirate of Afghanistan is fully aware of the delicate geopolitical location of the country in the region, and is, thus, interested in friendly relations with all countries on the basis of the principles of mutual respect and non-interference. Based on this stance, the Taleban Islamic Movement has put an end to the paramilitary-training activities of foreign groups, run under the sponsorship of the Rabani regime and its affiliated political parties in different parts of Afghanistan, now under the Taleban control. The Islamic Emirate of Afghanistan is seriously determined not to allow the Afghan territory in the future to be used by terrorists or any other organized groups for the purpose of launching terrorist activities against other countries. The Islamic Emirate of Afghanistan announces its readiness to fully cooperate in joint international efforts aimed at combating terrorism in all its shapes and forms.

The Islamic Emirate of Afghanistan Intends to Rebuild the War-Torn Country

The Islamic Emirate of Afghanistan is earnestly determined to begin the process of national reconstruction. To accomplish this goal, the Islamic Emirate of Afghanistan appeals to all international agencies, such as the World Bank, the IMF, the United Nations, as well as to the private entities, to consider taking part in the grand task of rebuilding Afghanistan. To facilitate this process, the Islamic Emirate of Afghanistan is ready to provide the needed guarantees regarding the legal aspects of the projects being considered.

To speed up and to provide a conductive environment for the reconstruction of Afghanistan, the economic policy of the Islamic Emirate of Afghanistan has been designed to promote a market economy based on the principle of free enterprise, and to encourage private investments and undertakings. The Islamic Emirate of Afghanistan attaches a great significance to the role of private foreign capital and expertises into Afghanistan.

(XV) Shariah as the Foundation of the Afghan Judicial System

Every country of the world has its own legal system. Legal systems develop in their respective societies over long periods of time and in accordance to the special needs and conditions prevailing in those societies. One cannot import legal systems into a country the way one imports cars or radio sets. Except for the fourteen years of the communist rule, the legal system that existed in Afghanistan rested on the Islamic legal code, called the Islamic Shariah. This legal system has been in existence in Afghanistan since the time when Islam reached that country over one thousand years ago. This system has become part of the people's lives. Its rules and principles are known to all devout Muslims and are derived from the teachings of Holy Qur'an and practices of Prophet Mohammad (Peace be upon Him).

After the Taleban Islamic Movement liberated Kabul in September 1996, they founded the Islamic Emirate of Afghanistan and re-introduced Shariah as the legal system of the country. This choice of the legal system was based on the expressed will of the people of Afghanistan, who fought and suffered for fourteen years for the purpose of restoring the rule of Shariah in their country. In this way, the Islamic Laws applied by the Taleban Movement in Afghanistan are in no way something new or strange to the people of Afghanistan. This system has existed, and been practiced, in the country for 1300 years and has been fully integrated in the Afghan code of personal and social behavior.

By enforcing the Islamic Law, the Taleban have won the full support of the people and succeeded to restore peace and security in all areas under their control. Through the implementation of Shariah rules, the Taleban have been able to restore and protect human rights and dignity, including the rights and dignity of women. These rights were systematically violated by the communist regime and by the warlords who replaced it. By restoring the Islamic legal system, the Taleban have been able not only to provide their countrymen and countrywomen with the needed security and peace, rather they have also succeeded to create a safe and secure atmosphere for N.G.Os and UN agencies to work in Afghanistan without fear and concern for the safety of their personnel.

After years of war, destruction and bloodshed caused by foreign intervention and domestic strife, the Taleban Islamic Movement, as a genuine grass roots Islamic movement, has been able to establish peace and security in over 80% of the territory of Afghanistan. As a result of this important achievement, large parts of Afghanistan are currently on their way to recovery from the devastating effects of war. Large numbers of refugees living in the neighboring countries have returned to their lands in these parts of Afghanistan and have began to engage in productive activities. Life in these areas has slowly began to return to normalcy. In achieving the important goal of restoring peace and security, after all the years of chaos and lawlessness, the Taleban have been extremely cautious to limit the amount of force that was needed to reach this goal. As a result of this prudent policy, most of the territories now under the control of the Islamic Emirate of Afghanistan have been won through constructive negotiations with groups that used to control them under the chaotic circumstances of the Rabani-regime.

The world and the United Nations, have always considered disarmament in Afghanistan as an important step towards solving the political differences that exist between the warring factions. Unfortunately, this desire on the part of the world and the United Nations always remained in words and was merely expressed in sketchy written pronouncements and resolutions issued by the world body from time to time. Finally, the Taleban Islamic Movement rose as an authentic Afghan reaction to the unbearable domestic chaos and world's inability to achieve something more than issuing these repetitive Emiratements.

Disarmament in Afghanistan had to be brought forth, no matter by whom, if the country was to return to normalcy. The Taleban are proud that they were able to achieve this noble goal. But this achievement in no way and manner means that the Taleban are there to monopolize power and claim legitimacy for themselves. Nevertheless, the Taleban Islamic Movement does believe that a return to the previous status quo of a bunch of armed factions seeking supremacy through force or negotiations, will not be conducive to promoting the cause of durable peace and maintaining the territorial integrity of Afghanistan. Experience has shown that dishonest negotiations between forces that are armed to the teeth can never bear fruit and lead to peace. Therefore, it is the firm belief of the Islamic Emirate of Afghanistan that durable peace can be achieved when the opposing forces stop the fighting, lay down their arms, and begin honest negotiations concerning participation of all forces in the political and economic reconstruction of the country. The Islamic Emirate of Afghanistan is willing and ready to sponsor such a genuine

effort towards the resolution of the differences.

Based on the points and issues raised in this presentation, and consistent with the peace-seeking desires of the Islamic Emirate of Afghanistan, expressed publicly by the eminent leaders of the movement, the Islamic Emirate asks the United Nations and the world community to extend diplomatic recognition to the Islamic Emirate, and help the Afghan nation put an end to the horrific experience of the last 18 years. The more the world postpones this recognition, the more Afghan blood will be shed, and the more the world ignores the problem, the greater the possibility of a spillover of the crisis to the neighboring regions becomes.

The Islamic Emirate of Afghanistan is not asking the world community for special favors; what the Islamic Sate of Afghanistan is asking for is justice and fairness. We want the world to look at Afghanistan from the tearing eyes of the suffering men, women and children of Afghanistan who have become the victims of great injustice and mindless oppression and not from the vintage point of greedy, hegemonic regional powers in search of special interests and privileges in Afghanistan or in the region.

We believe God, the Almighty, is always with those who are steadfast and persevere, submit to His will and perform good deeds as His true servants.

[http://www.taleban.com/taleb.htm]

Human Rights Watch

Poor Human Rights Record of Northern Alliance Commanders

সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পরে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা উত্তরাঞ্চলীয় জোট তখনই, তালেবানের উত্থানের কোনো নিশানাও যখন কোথাও ছিল না, কাবুলসহ তাদের শাসন-এলাকাগুলাতে সাক্ষাৎ নরক কায়েম করেছিল। সে খবর পশ্চিম জানতো না তা নয়। কিন্তু তখন পশ্চিমা মিডিয়া এ বিষয়ে নীরব থাকতে পছন্দ করেছে। তালেবানদের সরিয়ে এই জোটকেই পশ্চিমারা গণতান্ত্রিক আধুনিক বলে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এই লেখা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের চেহারা উন্মোচন করেছে। এর সাথে মিলিয়ে রাওয়া'র 'আবেদন'টা পড়া যেতে পারে এই পত্রিকাতেই।

(New York, October 6, 2001) - A number of commanders associated with the emerging coalition of opposition forces in Afghanistan have a record of serious human rights abuse, Human Rights Watch said in a backgrounder released today:

> The U.S. and its allies should not cooperate with commanders whose record of brutality raises questions about their legitimacy inside Afghanistan," said Sidney Jones, executive director of the Asia division of Human Rights Watch. "Any country that gives assistance to the Afghan opposition must take responsibility for how this assistance is used.

Human Rights Watch urged in particular that no cooperation be extended to Abdul Rashid Dostum, the head of the Junbish militia; Haji Muhammad Muhaqqiq, a senior commander of Hizb-i Wahdat; Abdul Rasul Sayyaf, leader of the erstwhile Ittihad-i Islami; and Abdul Malik Pahlawan, a former senior Junbish commander.

Abuses that were reported from an area controlled by a United Front faction in late 1999 and early 2000 include summary executions, burning of houses, and looting, principally target-

ing ethnic Pashtuns and others suspected of supporting the Taliban. Children, including those under the age of fifteen, have been recruited by both the United Front and Taliban.

The various parties that comprise the United Front also amassed a deplorable record of attacks on civilians between the fall of the Najibullah regime in 1992 and the Taliban's capture of Kabul in 1996.

> Not a single Afghan commander has been held accountable for human rights abuses," said Jones. "The time to break this cycle of impunity is now, and the United States and its allies will have the leverage to do it.

Military Assistance to the Afghan Opposition Human Rights Watch Backgrounder October 2001 To respond to the attacks on the World Trade Center and Pentagon on September 11, 2001, the United States government has begun to put together what it calls a coalition against terrorism. As part of this approach, the United States has signalled support for the creation of a broad-based coalition to oppose the Taliban, the current rulers of most of Afghanistan. This opposition would include forces that presently constitute the United Front--also known under its former name the Northern Alliance--as well as Taliban defectors. Some commanders with experience in the guerrilla war against Soviet occupation in 1979-1989, but not now in the United Front, may also be drawn into the new coalition. A number of present and former commanders who may be eager to assume positions of leadership in the coalition have a long record of serious human rights abuse in Afghanistan.

Human Rights Watch is concerned that unqualified support--military, political, diplomatic, financial--for this new coalition, which may come to constitute the basis for a future government of Afghanistan, will encourage further abuses. In responding to the crimes against humanity of September 11, the United States should not resort to means that themselves violate basic human rights and humanitarian law standards, or provide assistance to forces that do.

SUPPORT FOR THE AFGHAN OPPOSITION

While the United States says it has so far provided no arms to the Afghan opposition, recent media reports suggest that it is gearing up to provide financial and possibly military support to the United Front and other armed Afghan groups. U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld said on September 30, 2001: "There are any number of people in Afghanistan, tribes in the south, the northern alliance in the north, that oppose Taliban [sic]. And clearly we need to recognize the value they bring to this anti-terrorist, anti-Taliban effort - and where appropriate, find ways to assist them." The administration declined to comment on reports that the United States was offering covert financial support to the United Front.

The United Front could use new funds to replenish its stocks with arms purchases from Russia. Russia, along with Iran, has been one of the United Front's main arms suppliers during recent years; both have significant strategic interests in Afghanistan, and both have reaffirmed their support for the United Front in recent days. The Russian minister of defense, Sergei Ivanov, said on September 26 that Russia had been "rendering assistance continuously to the Northern Alliance since 1996." A day earlier, President Vladimir Putin said that Russia would "expand cooperation with the internationally recognized Afghan government of Rabbani and give its armed forces additional assistance in the form of weapons supplies." The Russian president was referring to the United Front's political arm, the Islamic State of Afghanistan, headed by Burhanuddin Rabbani, which has occupied Afghanistan's seat in the United Nations since its ouster from Kabul in 1996. In Iran, the defense minister, Ali Shamkhani, told reporters on October 1, 2001: "We continue to support the Northern Alliance as in the past," and replied "yes" when asked if that meant supplying them with arms. (The level and nature of past military support provided by Russia and Iran to the United Front has been detailed in a Human Rights Watch report, "Crisis of Impunity: The Role of Pakistan, Russia, and Iran in Fueling the Civil War in Afghanistan," available at http://www.hrw.org/reports/2001/afghan2.)

WHAT IS THE UNITED FRONT/NORTHERN ALLIANCE?

In 1996, when the Taliban captured the Afghan capital, Kabul, the groups opposed to the Taliban formed an alliance called the National Islamic United Front for the Salvation of Afghanistan, commonly known as the United Front. The United Front supports the government ousted by the Taliban, the Islamic State of Afghanistan (ISA). The president of the ousted government, Burhanuddin Rabbani, remains the president of the ISA and is the titular head of the United Front. For the past year his headquarters have been in the northern Afghan town of Faizabad. The real power was, until his assassination in September 2001, the United Front's military leader, Commander Ahmad Shah Massoud, who was also the ISA's minister of defense. The precise membership of the United Front has varied from time to time, but includes:

Jamiat-i Islami-yi Afghanistan (hereinafter known as Jamiat-i Islami). Jamiat-i Islami was one of the original Islamist parties in Afghanistan, established in the 1970s by students at Kabul University where its leader, Burhanuddin Rabbani, was a lecturer at the Islamic Law Faculty. Although Rabbani remains the official head of Jamiat-i Islami, the most powerful figure within the party was Ahmad Shah Massoud. Both Rabbani and Massoud are ethnic Tajiks (Persian-speaking Sunni

Muslims) but from different areas. Massoud's ethnic power base has historically been in Parwan and Takhar provinces in the northeast, where he established a regional administrative structure in the late 1980s, the Supervisory Council of the North (SCN, Shura-yi Nazar-i Shamali). Massoud's forces have received significant military and other support from Iran and Russia, in particular.

Hizb-i Wahdat-i Islami-yi Afghanistan (Islamic Unity Party of Afghanistan, hereinafter known as Hizb-i Wahdat). The principal Shi'a party in Afghanistan with support mainly among the Hazara ethnic community, Hizb-i Wahdat was originally formed by Abdul Ali Mazari in order to unite eight Shi'a parties in the run-up to the anticipated collapse of the communist government. Its current leader is Muhammad Karim Khalili. The leader of its Executive Council of the North, Haji Muhammad Muhaqqiq, commanded the party's forces in Mazar-i Sharif in 1997. Hizb-i Wahdat has received significant military and other support from Iran, although relations between Iranian authorities and party leaders have been strained over issues of control. The party has also received significant support from local Hazara traders.

Junbish-i Milli-yi Islami-yi Afghanistan (National Islamic Movement of Afghanistan, hereinafter known as Junbish). Junbish brought together northern, mostly ethnic Uzbek, former militias of the communist regime who mutinied against President Najibullah in early 1992. It also included mainly Persian-speaking former leaders and administrators of the old regime from various other ethnic groups, and some ethnic Uzbek guerrilla commanders. In 1998 it lost all of the territory under its control, and many of its commanders have since defected to the Taliban. Its founder and principal leader was Abdul Rashid Dostum, who rose from security guard to leader of Najibullah's most powerful militia. One of Dostum's principal deputies was Abdel Malik Pahlawan. This group took control of the important northern city of Mazar-i Sharif in alliance with other groups in early 1992 and controlled much of Samangan, Balkh, Jowzjan, Faryab, and Baghlan provinces. A coalition of militias, the Junbish was the strongest force in the north from 1992 to 1997, but was riven by internal disputes. Since the fall of Mazar in 1998 the Junbish has largely been inactive, although Dostum returned to northern Afghanistan in April 2001.

Harakat-i Islami-yi Afghanistan (Islamic Movement of Afghanistan). This is a Shi'a party that never joined Hizb-i Wahdat, led by Ayatollah Muhammad Asif Muhsini, and which was allied with Jamiat-i Islami in 1993-1995. Its leadership is mostly non-Hazara Shi'a. Its most prominent commander is General Anwari. The group has received support from Iran.

Ittihad-i Islami Bara-yi Azadi Afghanistan (Islamic Union for the Liberation of Afghanistan). This party is headed by Abdul Rasul Sayyaf.

During the war against the Soviet occupation, Sayyaf obtained considerable assistance from Saudi Arabia. Arab volunteers supported by Saudi entrepreneurs fought with Sayyaf's forces. The United Front's Human Rights Record

Throughout the civil war in Afghanistan, the major factions on all sides have repeatedly committed serious human rights abuses and violations of international humanitarian law, including killings, indiscriminate aerial bombardment and shelling, direct attacks on civilians, summary executions, rape, persecution on the basis of religion or ethnicity, the recruitment and use of children as soldiers, and the use of antipersonnel landmines. Many of these violations can be shown to have been "widespread or systematic," a criterion of crimes against humanity. Although committed in an internal armed conflict, violations involving indiscriminate attacks or direct attacks on civilians are increasingly being recognized internationally as amounting to war crimes.

Abuses committed by factions belonging to the United Front have been well documented. Many of the violations of international humanitarian law committed by the United Front forces described below date from 1996-1998 when they controlled most of the north and were within artillery range of Kabul. Since then, what remains of the United Front forces have been pushed back into defensive positions in home territories in northeastern and central Afghanistan following a series of military setbacks. There have nevertheless been reports of abuses in areas held temporarily by United Front factions, including summary executions, burning of houses, and looting, principally targeting ethnic Pashtuns and others suspected of supporting the Taliban. Children, including those under the age of fifteen, have been recruited as soldiers and used to fight against Taliban forces. The various parties that comprise the United Front also amassed a deplorable record of attacks on civilians between the fall of the Najibullah regime in 1992 and the Taliban's capture of Kabul in 1996.

Violations of international humanitarian law committed by United Front factions include:

> Late 1999 - early 2000: Internally displaced persons who fled from villages in and around Sangcharak district recounted summary executions, burning of houses, and widespread looting during the four months that the area was held by the United Front. Several of the executions were reportedly carried out in front of members of the victims' families. Those targeted in the attacks were largely ethnic Pashtuns and, in some cases, Tajiks.
>
> September 20-21, 1998: Several volleys of rockets were fired at the northern part of Kabul, with one hitting a crowded night market. Estimates of the number of people killed ranged from seventy-six to 180. The attacks were generally believed to have been carried out by

> Massoud's forces, who were then stationed about twenty-five miles north of Kabul. A spokesperson for United Front commander Ahmad Shah Massoud denied targeting civilians. In a September 23, 1998, press statement, the International Committee of the Red Cross described the attacks as indiscriminate and the deadliest that the city had seen in three years.
>
> Late May 1997: Some 3,000 captured Taliban soldiers were summarily executed in and around Mazar-i Sharif by Junbish forces under the command of Gen. Abdul Malik Pahlawan. The killings followed Malik's withdrawal from a brief alliance with the Taliban and the capture of the Taliban forces who were trapped in the city. Some of the Taliban troops were taken to the desert and shot, while others were thrown down wells and then blown up with grenades.
>
> January 5, 1997: Junbish planes dropped cluster munitions on residential areas of Kabul. Several civilians were killed and others wounded in the indiscriminate air raid, which also involved the use of conventional bombs.
>
> March 1995: Forces of the faction operating under Commander Massoud, the Jamiat-i Islami, were responsible for rape and looting after they captured Kabul's predominantly Hazara neighborhood of Karte Seh from other factions. According to the U.S. State Department's 1996 report on human rights practices in 1995, "Massood's troops went on a rampage, systematically looting whole streets and raping women."

On the night of February 11, 1993 Jamiat-i Islami forces and those of another faction, Abdul Rasul Sayyaf's Ittihad-i Islami, conducted a raid in West Kabul, killing and "disappearing" ethnic Hazara civilians, and committing widespread rape. Estimates of those killed range from about seventy to more than one hundred.

In addition, the parties that constitute the United Front have committed other serious violations of internationally recognized human rights. In the years before the Taliban took control of most of Afghanistan, these parties had divided much of the country among themselves while battling for control of Kabul. In 1994 alone, an estimated 25,000 were killed in Kabul, most of them civilians killed in rocket and artillery attacks. One-third of the city was reduced to rubble, and much of the remainder sustained serious damage. There was virtually no rule of law in any of the areas under the factions' control. In Kabul, Jamiat-i Islami, Ittihad, and Hizb-i Wahdat forces all engaged in rape, summary executions, arbitrary arrest, torture, and "disappearances." In Bamiyan, Hizb-i Wahdat commanders routinely tortured detainees for extortion purposes. Accountability and the Cycle of Impunity

To date, not a single Afghan commander has been held accountable

for violations of international humanitarian law. Nor has the United Front, in particular, indicated any willingness to bring to justice any of its commanders with a record of human rights abuse. To the contrary, the representative of the Islamic State of Afghanistan (and the United Front) in the United States, Mohammed Eshaq, remarked in response to a question at a public event in Washington, D.C., on October 2, 2001 that United Front atrocities have been "exaggerated," and that while "criminals should answer to a court_it should not be a demand that all the heads of the United Front should be taken to court," as this would not be "practical."

The United Front's failure to hold its commanders to account for atrocities committed in the past raises the prospect that they will revert to the same practices should they be given the opportunity to do so. Having suffered a series of military setbacks, the United Front has been increasingly pushed back into its "home" territory in recent years. But should its political fortunes turn with United States or other external support, their past record of abuse and impunity gives no reason to believe that abusive commanders will feel discouraged from committing further abuses. Human Rights Watch is particularly concerned that United Front factions may seek retaliation against the Taliban, and ethnic Pashtuns generally, if, for example, the United Front succeeds in recapturing Mazar-i Sharif.

The provision of unqualified material and political assistance under such circumstances, rather than sending a signal that human rights abuse is not condoned, would serve to embolden these very same commanders. Such support may feed rather than break the lethal cycle of impunity that has brought so much suffering to the people of Afghanistan. It is for this reason that the United States, Russia, Iran and any other states providing assistance to the Afghan opposition must take responsibility for how this assistance is used. Their failure to do so would entail a degree of complicity in any abuses that may be committed, and they should therefore be held accountable for these abuses.

Leahy Law

In the United States, assistance to units of foreign security forces that have committed gross violations of human rights is expressly prohibited by law. Known as the Leahy Law, this consists of two provisions in the appropriations acts for Fiscal Year 2001. The Leahy Law applies to the Islamic State of Afghanistan and its military arm, the United Front, because the ISA remains the internationally recognized government of Afghanistan. Section 563 of the Foreign Operations Appropriations Act for Fiscal Year 2001 prohibits the provision of funds available under the act "to any unit of the security forces of a foreign country if the

Secretary of State has credible evidence that such unit has committed gross violations of human rights, unless the Secretary determines and reports to the Committees on Appropriations that the government of such country is taking effective measures to bring the responsible members of the security forces unit to justice." Likewise, Section 8092(a) of the Defense Appropriations Act for Fiscal Year 2001 prohibits the provision of funds made available under the act "to support any training program involving a unit of the security forces of a foreign country if the Secretary of Defense has received credible information from the Department of State that the unit has committed a gross violation of human rights, unless all necessary corrective steps have been taken." This latter provision may be waived in "extraordinary circumstances."

Human Rights Watch's Recommendations

To break the lethal cycle of impunity, Human Rights Watch calls on the United States, Russia, Iran, and any other states providing, or intending to provide, direct or indirect military, political, diplomatic, or financial assistance of any kind through bilateral or multilateral channels to the factions of the United Front or any other armed Afghan opposition groups to:

Actively discourage and refuse to support in any way any group or coalition that includes commanders with a record of serious violations of international humanitarian law standards, including, but not exclusive of, Abdul Rashid Dostum, the head of the Uzbek militia known as the Junbish; Haji Muhammad Muhaqqiq, a senior commander of the Hizb-i Wahdat; Abdul Rasul Sayyaf, leader of the erstwhile Ittihad-i Islami; and Abdul Malik Pahlawan, a former senior Junbish commander.

Condition any military or financial support for the United Front, its individual factions, or any other armed Afghan opposition group on firm commitments that they respect international human rights and humanitarian law, and allow U.N. and independent monitors to assess their compliance with these standards. Make it clear that serious violations could result in having aid terminated.

Condition any military or financial support for the United Front, its individual factions, or any other armed Afghan opposition group on a firm commitment not to use antipersonnel landmines.

In accordance with international standards, insist that the United Front end all recruitment and use of children under the age of eighteen as soldiers and take immediate steps to demobilize children currently in its ranks.

Press the United Front to bring to justice any of its personnel, including former commanders, who have been implicated in serious violations of human rights and international humanitarian law.

Make any aid to armed Afghan opposition groups conditional on their granting full access by the International Committee of the Red Cross to areas under the control of these groups and detainees under their control.

Avoid cooperative activities that will be read by human rights abusers--and the general population--as implying support for abusive practices. Additionally, to the Government of the United States:

> Implement the Leahy Law strictly, without waivers.
>
> Monitor any assistance given to the United Front or any other Afghan opposition groups, and report how this assistance is used and whether these groups comply with international human rights and humanitarian law.

[Downloaded from http://www.zmag.org/ZNET.htm]

Noam Chomsky

"Just Got Your Message. Quick Reaction"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরের দিনই নোম চমস্কি এই দ্রুত প্রতিক্রিয়াটা জানান জেড নেটের মাইকেল অ্যালবার্টের ইমেইল-প্রশ্নের উত্তরে। আমাদের কাছে জেড নেটের করা ইমেইল থেকে এটা আমরা পেয়েছি।

Today's attacks were major atrocities. In terms of number of victims they do not reach the level of many others, for example, Clinton's bombing of the Sudan with no credible pretext, destroying half its pharmaceutical supplies and probably killing tens of thousands of people (no one knows, because the US blocked an inquiry at the UN and no one cares to pursue it). Not to speak of much worse cases, which easily come to mind. But that this was a horrendous crime is not in doubt. The primary victims, as usual, were working people: janitors, secretaries, firemen, etc. It is likely to prove to be a crushing blow to Palestinians and other poor and oppressed people. It is also likely to lead to harsh security controls, with many possible ramifications for undermining civil liberties and internal freedom.

The events reveal, dramatically, the foolishness of ideas about "missile defense." As has been obvious all along, and pointed out repeatedly by strategic analysts, if anyone wants to cause immense damage in the US, including weapons of mass destruction, they are highly unlikely to launch a missile attack, thus guaranteeing their immediate destruction. There are innumerable easier ways that are basically unstoppable. But today's events will, nonetheless, be used to increase the pressure to develop these systems and put them into place. "Defense" is a thin cover for plans for militarization of space, and with good PR, even the flimsiest arguments will carry some weight among a frightened public.

In short, the crime is a gift to the hard jin-

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

goist right, those who hope to use force to control their domains. That is even putting aside the likely US actions, and what they will trigger -- possibly more attacks like this one, or worse. The prospects ahead are even more ominous than they appeared to be before the latest atrocities.

David McReynolds

Statement on September 11 Attack

War Resisters' League
12 September 2001

এটা যুদ্ধপ্রতিরোধী লীগের কর্মনির্বাহী কমিটির লেখা হলেও লীগের অফিশিয়াল বিবৃতি না। ১১ই সেপ্টেম্বরের ট্রাজিক ঘটনার দিনই এটা লেখা হয়েছিল। এই লেখা থেকে ১১ই সেপ্টেম্বরের অগ্নিঝড়ের হলকা এসে গায়ে লাগে।

As we write, Manhattan feels under siege, with all bridges, tunnels, and subways closed, and tens of thousands of people walking slowly north from Lower Manhattan. As we sit in our offices here at War Resisters League, our most immediate thoughts are of the hundreds if not thousands of New Yorkers who have lost their lives in the collapse of the World Trade Center. The day is clear, the sky is blue, but vast clouds billow over the ruins where so many have died, including a great many rescue workers who were there when the final collapse occurred.

Of course we know that our friends and co-workers in Washington, D.C. have similar thoughts about the ordinary people who have been trapped in the parts of the Pentagon which were also struck by a jet. And we think of the innocent passengers on the hi-jacked jets who were carried to their doom on this day.

We do not know at this time from what source the attack came. We do know that Yasser Arafat has condemned the bombing. We hesitate to make an extended analysis until more information is available but some things are clear. For the Bush Administration to talk of spending hundreds of billions on Star Wars is clearly the sham it was from the beginning, when terrorism can so easily strike through more routine means.

We urge Congress and George Bush that whatever response or policy the U.S. develops it

will be clear that this nation will no longer target civilians, or accept any policy by any nation which targets civilians. This would mean an end to the sanctions against Iraq, which have caused the deaths of hundreds of thousands of civilians. It would mean not only a condemnation of terrorism by Palestinians but also the policy of assassination against the Palestinian leadership by Israel, and the ruthless repression of the Palestinian population and the continuing occupation by Israel of the West Bank and Gaza.

The policies of militarism pursued by the United States have resulted in millions of deaths, from the historic tragedy of the Indochina war, through the funding of death squads in Central America and Colombia, to the sanctions and air strikes against Iraq. This nation is the largest supplier of "conventional weapons" in the worldand those weapons fuel the starkest kind of terrorism from Indonesia to Africa. The early policy support for armed resistance in Afghanistan resulted in the victory of the Talibanand the creation of Osama Bin Laden.

Other nations have also engaged in these policies. We have, in years past, condemned the actions of the Russian government in areas such as Chechnya, the violence on both sides in the Middle East, and in the Balkans. But our nation must take responsibility for its own actions. Up until now we have felt safe within our borders. To wake on a clear day to find our largest city under siege reminds us that in a violent world, none are safe.

Let us seek an end of the militarism that has characterized this nation for decades. Let us seek a world in which security is gained through disarmament, international cooperation, and social justice not through escalation and retaliation. We condemn without reservation attacks such as those which occurred today, which strike at thousands of civiliansmay these profound tragedies remind us of the impact U.S. policies have had on other civilians in other lands. We also condemn reflexive hostility against people of Arab descent living in this country and urge that Americans recall the part of our heritage that opposes bigotry in all forms.

We are one world. We shall live in a state of fear and terror or we shall move toward a future in which we seek peaceful alternatives to violence, and a more just distribution of the world's resources. As we mourn the many lives lost, our hearts call out for reconciliation, not revenge.

[Downloaded from www.zmag.org/znet.htm]

Michael Albert and Stephen R. Shalom

ZNet's September 11 Talking Points

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অহংকারের দুইটা স্নায়ুকেন্দ্রে নাম-না-জানা সন্ত্রাসীদের মর্মান্তিক অমানবিক হামলার আগেপরে যে-প্রশ্নগুলা মানুষের কথায়-চিন্তায় অহরহ ঘুরেফিরে এসেছে সেইসব প্রশ্ন আর উত্তরের এই সংকলন আমাদের মনের অনেক প্রশ্নের ফয়সালা সারতে সাহায্য করবে।

Introduction

We are writing this on September 17, less than a week after a horrific terrorist attack against the United States. We are still dealing with our grief and trauma and we are still profoundly moved by the many acts of heroism, generosity, and solidarity that have taken place. Some may find it inappropriate to offer political analysis this early, but however discordant some may find it, the time for political analysis is before actions are taken that may make the situation far worse. Critics of war across the U.S. and around the world are working hard to communicate with people who for the moment mainly seek retribution. Below we address some of the many questions that are being asked. We hope the answers we offer, developed in consultation with many other activists, will assist people in their daily work.

Who did it?

The identity of the 19 individuals who hijacked the four planes is known, but what is not known as we write is who provided the coordination, the planning, and the funding, and who provided the logistical support, both in the United States and elsewhere. Many indications point to the involve-

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

ment of Osama bin Laden, but if his role is confirmed, this is the beginning, not the end, of the inquiry: Were any other organizations involved, and if so, which ones? Were any national governments involved, and if so, which ones? The danger here is that the U.S. government may answer these questions on the basis of political criteria rather than evidence.

Who is Osama bin Laden?

Osama bin Laden is an exiled Saudi, who inherited a fortune estimated at $300 million, though it's not clear how much remains of it. Fanatically devoted to his intolerant version of Islam -- a version rejected by the vast majority of Muslims -- bin Laden volunteered his services to the Afghan Mujahideen, the religious warriors battling the invading Soviet Union from 1979 to 1989. The Afghan rebels were bankrolled by Saudi Arabia and the United States and trained by Pakistani intelligence, with help from the CIA. The United States provided huge amounts of arms, including Stingers -- one-person anti-aircraft missiles -- despite warnings that these could end up in the hands of terrorists. Washington thus allied itself with bin Laden and more than 25,000 other Islamic militants from around the world who came to Afghanistan to join the holy war against the Russians. As long as they were willing to fight the Soviet Union, the U.S. welcomed them, even though many were virulently anti-American, some even connected to the 1981 assassination of Anwar Sadat of Egypt. When Moscow finally withdrew its troops from Afghanistan, some of these Islamic militants turned their sights on their other enemies, including Egypt (where they hoped to establish an Islamic state), Saudi Arabia, and the United States. Bin Laden established an organization of these holy war veterans -- al Qaida. In February 1998, bin Laden issued a statement, endorsed by several extreme Islamic groups, declaring it the duty of all Muslims to kill U.S. citizens -- civilian or military -- and their allies everywhere.

Where is Osama bin Laden?

After some attacks on U.S. interests in Saudi Arabia, Saudi authorities revoked bin Laden's citizenship. Bin Laden went to the Sudan and then on to Afghanistan. His precise location is unknown, since he frequently moves or goes into hiding. Afghanistan is led by the Taliban, a group of extreme Islamic fundamentalists, who emerged out of the Mujahideen. The Taliban does not have full control over the country -- there is a civil

war against dissidents who control some 10-20% of the country. Afghanistan is an incredibly poor nation -- life expectancy is 46, one out of seven children die in infancy, and per capita income is about $800 per year. Huge numbers of people remain refugees. Taliban rule is dictatorial, and its social policy is unusually repressive and sexist: for example, Buddhist statues have been destroyed, Hindus have been required to wear special identification, and girls over 8 are barred from school. Human rights groups, the United Nations, and most governments have condemned the policies of the Taliban. Only Pakistan, and the two leading U.S. allies in the Gulf, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, recognize the Taliban government.

Why did the World Trade Center terrorists do it?

We don't entirely know who did it, so we can't say for sure why they did it. There are, however some possibilities worth thinking about.

One explanation points to a long list of grievances felt by people in the Middle East -- U.S. backing for Israeli repression and dispossession of the Palestinians, U.S. imposition of sanctions on Iraq, leading to the deaths of huge numbers of innocents, and U.S. support for autocratic, undemocratic, and highly inegalitarian regimes. These are real grievances and U.S. policy really does cause tremendous suffering. But how do these terror attacks mitigate the suffering? Some may believe that by inflicting pain on civilians, a government may be overthrown or its policies will change in a favorable direction. This belief is by no means unique to Middle Easterners -- and has in fact been the standard belief of U.S. and other government officials for years. It was the belief behind the terror bombings of World War II by the Nazis and by the U.S. and Britain, behind the pulverizing of North Vietnam, and behind the strikes on civilian infrastructure during the Kosovo war. It is the same rationale as that offered for the ongoing economic sanctions against Iraq: starve the people to pressure the leader. In addition to the deep immorality of targeting civilians as a means of changing policy, its efficacy is often dubious. In this case, one would have a totally inaccurate view of the United States if one thought that the events of September 11 would cause U.S. officials to suddenly see the injustice of their policies toward the Palestinians, etc. On the contrary, the likely result of the attacks will be to allow U.S. leaders to mobilize the population behind a more uncompromising pursuit of their previous policies. The actions will horribly set back the causes of the weak and the poor, while empowering the most aggressive and reactionary elements around the globe.

There is a second possible explanation for why those who planned

the September 11 attacks did so. Why commit a grotesquely provocative act against a power so large, so armed, and so dangerous as the United States? Perhaps provoking the United States was precisely the intent. By provoking a massive military assault on one or more Islamic nations, the perpetrators may hope to set off a cycle of terror and counter-terror, precipitating a holy war between the Islamic world and the West, a war that they can lead and that they may hope will result in the overthrow of all insufficiently Islamic regimes and the unraveling of the United States, just as the Afghan war contributed to the demise of the Soviet Union. Needless to say, this scenario is insane on every count one can assess.

But if provocation rather than grievances is what motivated the planners of the terror strikes against the U.S., this wouldn't mean grievances are irrelevant. Whatever the planners' motives, they still needed to attract capable, organized, and skilled people, not only to participate, but even to give their lives to this suicidal agenda. Deeply-felt grievances provide a social environment from which fanatics can recruit and garner support.

How should guilt be determined? How should punishment be assessed and meted out?

The answers to these questions are all important. In our world, the only alternative to vigilantism is that guilt should be determined by an amassing of evidence that is then assessed in accordance with international law by the United Nations Security Council or other appropriate international agencies.

Punishment should be determined by the UN as well, and likewise the means of implementation. The UN may arrive at determinations that one or another party likes or not, as with any court, and may also be subject to political pressures that call into question its results or not, as with any court. But that the UN is the place for determinations about international conflict is obvious, at least according to solemn treaties signed by the nations of the world. Most governments, however, don't take seriously their obligations under international law, and certainly the United States does not. To U.S. policy makers international law is for everyone else to follow, and for Washington to manipulate when possible, or to ignore otherwise. Thus when the World Court told the United States to cease its contra war against Nicaragua and pay reparations, U.S. officials simply declared they did not consider themselves bound by the ruling.

Why us? Why the U.S.?

The terrorists wreaked their havoc on New York and Washington, not on Mexico City or Stockholm. Why?

George W. Bush has claimed that the United States was targeted because of its commitment to freedom and democracy. Bush says people are jealous of our wealth. The truth is that anti-Americanism rests on feelings that the U.S. obstructs freedom and democracy as well as material plenty for others. In the Middle East, for example, the United States supports Israeli oppression of Palestinians, providing the military, economic, and diplomatic backing that makes that oppression possible. It condemns conquest when it is done by Iraq, but not when done by Israel. It has bolstered authoritarian regimes (such as Saudi Arabia) that have provided U.S. companies with mammoth oil profits and has helped overthrow regimes (such as Iran in the early 1950s) that challenged those profits. When terrorist acts were committed by U.S. friends such as the Israeli-supervised massacres in the Sabra and Shatilla refugee camps in Lebanon, no U.S. sanctions were imposed. But about the U.S. imposed sanctions on Iraq, leading to the deaths of hundreds of thousands of innocent children, Secretary of State Madeleine Albright could only say that she thought it was worth it. When the U.S. went to war against Iraq, it targeted civilian infrastructure. When Iran and Iraq fought a bloody war, the United States surreptitiously aided both sides.

On top of specific Middle Eastern concerns, anti-Americanism is also spawned by more general grievances. The United States is the leading status-quo power in the world. It promotes a global economic system of vast inequality and incredible poverty. It displays its arrogance of power when it rejects and blocks international consensus on issues ranging from the environment, to the rights of children, to landmines, to an international criminal court, to national missile defense.

Again, these grievances may have nothing to do with the motives of those who masterminded the terror strikes of September 11. But they certainly help create an environment conducive to recruiting people to commit such acts.

But isn't it callous to talk about U.S. crimes at a time when the U.S. is mourning its dead?

It would be callous if the people talking about U.S. crimes weren't also horrified at the terror in New York, grieving the grievous, and, as well, if the U.S. weren't talking about mounting a war against whole countries,

removing governments from power, engaging in massive assaults, and evidencing no concern to discriminate terrorists from civilian bystanders.

But since critics do feel the pain, and since the U.S. is formulating its notions of justice in precisely those unconstructive and dangerous terms, for critics to carefully point out the hypocrisy and the likely consequences even as we also mourn the dead, feel outrage at the carnage, and help relief efforts is essential. It is how we help avoid piling catastrophe on top of catastrophe.

Suppose bin Laden is the mastermind of the recent horror. Imagine he had gone before the Afghan population a week or two earlier and told them of the U.S. government's responsibility for so much tragedy and mayhem around the world, particularly to Arab populations as in Iraq and Palestine. Imagine that he further told them that Americans have different values and that they cheered when bombs were rained on people in Libya and Iraq. So bin Laden proposes the bombing of U.S. civilians to force their government to change its ways. In that hypothetical event, what would we want the Afghan people to have replied?

We would want them to have told bin Laden that he was demented and possessed. We would want them to have pointed out that the fact that the U.S. government has levied massive violence against Iraq's civilians and others, does not warrant attacks on U.S. civilians, and the fact of different values doesn't warrant attacks of any sort at all.

So isn't this what we ought to also want the U.S. public to say to George Bush? The fact of bin Laden's violence, assuming it proves to be the case, or that of the Taliban or whatever other government may be implicated, does not warrant reciprocal terror attacks on innocent civilians.

BY TALKING ABOUT U.S. CRIMES ABROAD, YOU SOUND LIKE YOU ARE EXCUSING THESE TERRORIST ACTS. DO YOU HAVE NO FEELINGS FOR THOSE SUFFERING?

To express remorse and pain, and to also seek to avoid comparable and worse pain being inflicted on further innocents (including Americans) is not to evidence a lack of feeling for the impact of crimes against humanity, but instead indicates feelings that extend further than what the media or the government tells us are the limits of permissible sympathy. We not only feel for those innocents who have already died, and their families, and the whole populace reeling in pain, but also for those who might be killed shortly, for those we may be able to help save.

U.S. crimes in no way justify or excuse the attacks of September 11. Terror is an absolutely unacceptable response to U.S. crimes. But at the same time, we need to stress as well that terror -- targeting civilians --

is an absolutely unacceptable response by the United States to the genuine crimes of others.

The reason it is relevant to bring up U.S. crimes is not to justify terrorism, but to understand the terrain that breeds terrorism and terrorists. Terrorism is a morally despicable and strategically suicidal reaction to injustice. But reducing injustice, which is correct on its own account, can certainly help eliminate the seeds of pain and suffering that nurture terrorist impulses and support for them.

BUSH HAS SAID THAT THE "WAR ON TERRORISM" NEEDS TO CONFRONT ALL COUNTRIES THAT AID OR ABET TERRORISM. WHICH COUNTRIES QUALIFY?

The current thinking on this topic, promulgated by Bush and spreading rapidly beyond, is that anyone who plans, carries out, or abets terrorism, including knowingly harboring terrorists, is culpable for terrorist actions and their results -- where terrorism is understood as the attacking of innocent civilians in order to coerce policy makers. Some people might argue with some aspect of this formulation, but from where we sit, the formulation is reasonable enough. It is the application that falls short.

The U.S. State Department has a list of states that support terrorism, but it is -- as one would expect -- an extremely political document. The latest listing consisted of Iran, Iraq, Syria, Libya, Cuba, North Korea, and Sudan -- significantly omitting Afghanistan. Cuba is included, one suspects, less because of any actual connection to terrorism, than because of longstanding U.S. hostility to the Cuban government and the long record of U.S. terrorism against Cuba. If we are talking about terrorism of the sort exemplified by car and other hand-delivered bombs, kidnappings, plane hijackings, or now plane suicide assaults, we can reasonably guess that most of the countries on the State Department list, along with Afghanistan, Pakistan, and some other poor nations would qualify with varying degrees of culpability.

On the other hand, if we are talking about terrorism of the sort exemplified by military bombing and invasion, by food or medical embargoes affecting civilians rather than solely or even primarily official and military targets, by hitting "soft targets" such as health clinics or agricultural cooperatives in Nicaragua, or by funding and training death squads, then we would have a rather different list of culpable nations, including such professed opponents of terrorism as the United States, Britain, France, Russia, and Israel.

At times the parties engaged in either list point to the actions perpetrated by those on the other list as justification for their behavior. But of course original terror does not justify subsequent terror, nor

does reciprocal terror diminish terror from the other side.

Do Palestinians support the attacks, and, if so, what is the implication?

There have been reports of Palestinians in the West Bank and Gaza cheering the attacks, and similar reports regarding Palestinians in the United States. Fox News has played over and over the same clip of some Palestinians in the occupied territories celebrating. But the media fails to explain that they are showing only a small minority of Palestinians and that official Palestinian sentiment has expressed its condemnation of the attacks and sympathy for the victims. The media have been especially remiss in not reporting such things as the statement issued by the Palestinian village of Beit Sahour movingly denouncing the terror, or the candlelight vigil in Arab East Jerusalem in memory of the victims.

There is no reason to doubt, however, that some Palestinians -- both in the U.S. and in the Middle East -- cheered the attacks. This is wrong, but it is also understandable. The United States has been the most important international backer of Israeli oppression of Palestinians. Some Palestinians, like the Americans who cheered the atomic bombing of Hiroshima or many lesser bombings, such as that of Libya in 1986, mindlessly ignore the human meaning of destroying an "enemy" target.

But that some Palestinians have reacted in this way, while disappointing and painful to watch, should have no bearing on our understanding of their oppression and the need to remedy it. In fact, given that Israel seems to be using the September 11 attacks as an excuse and a cover for increasing assaults on Palestinians, we need to press all the more vigorously for a just solution to the Israeli-Palestine conflict.

What is the likely impact of the attacks within the U.S. policymaking establishment?

The catastrophic character of these events provides a perfect excuse for reactionary elements to pursue every agenda item that they can connect to "the war against terrorism" and that they can fuel by fanning fears in the population. This obviously includes expanding military expenditures that have nothing whatever to do with legitimate security concerns and everything to do with profit-seeking and militarism. For example, even though the events of September 11 should have shown that "national missile defense" is no defense at all against the most likely threats we face, already the Democrats are beginning to drop their opposition to that destabilizing boondoggle. Amazingly, certain elements will even extrapolate to social issues. For example, our own home grown

fundamentalists -- like Jerry Falwell -- have actually declared (though retracted after wide criticism) that abortion, homosexuality, feminism, and the ACLU are at fault. Others hope to use the attacks as a rationale for eliminating the capital gains tax, a long-time right-wing objective. But the main focus will be military policy. In coming weeks, in short, we will see a celebration in America, a celebration of military power, a celebration of a massive arms build-up, and perhaps assassinations, all touted as if the terror victims will be honored rather than defiled by our preparing to entomb still more innocent people around the world.

So what is the likely U.S. response?

U.S. policymaking regarding international relations (and domestic relations as well) is a juggling act. On one side, the goal is enhancing the privilege, power, and wealth of U.S. elites. On the other side, the constraint is keeping at bay less powerful and wealthy constituencies who might have different agendas, both at home and abroad.

Since the end of the Cold War, the U.S. has had a problem--how to scare the public into ratifying policies that don't benefit the public, but that serve corporate and elite political interests. The fear of a Soviet menace, duly exaggerated, served that purpose admirably for decades. The ideal response to the current situation, from the elite standpoint, will be to replace the Cold War with the Anti-Terror War. With this accomplished, they will again have a vehicle to instill fear, arguably more credible than the former Soviet menace. Again they will have an enemy, terrorists, whom they can blame for anything and everything, trying as well to smear all dissidents as traveling a path leading inexorably toward the horrors of terrorism.

So their response to these recent events is to intone that we must have a long war, a difficult struggle, against an implacable, immense, and even ubiquitous enemy. They will declare that we must channel our energies to this cause, we must sacrifice butter for guns, we must renounce liberty for security, we must succumb, in short, to the rule of the right, and forget about pursuing the defense and enlargement of rights. Their preferred response will therefore be to use the military, particularly against countries that are defenseless, perhaps even to occupy one and to broadly act in ways that will not so much reduce the threat of terror and to diminish its causes, as to induce conflict that is serviceable to power regardless of the enlargement of terror that ensues.

Already Congress has been asked to give the President a blank check for military action, which means further removing U.S. military action from democratic control. Only Rep. Barbara Lee had the courage to vote

"no" on Congress's joint resolution, authorizing the President "to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States by such nations, organizations or persons."

WHAT RESPONSE SHOULD THE U.S. TAKE INSTEAD, INTERNATIONALLY?

The best way to deal with terrorism is to address its root causes. Perhaps some terrorism would exist even if the grievances of the people of the Third World were dealt with -- grievances that lead to anger, despair, frustration, feelings of powerlessness, and hatred -- but certainly the ability of those who would commit terror without grievances to recruit others would be tremendously reduced. As a second step, we might help establish a real international consensus against terrorism by putting on trial U.S. officials responsible for some of the atrocities noted earlier.

Of course, these are long-term solutions and we face the horror of terrorism today. So we must consider what we want the United States government to do internationally right now.

The U.S. government's guiding principle ought to be to assure the security, safety, and well-being of U.S. citizens without detracting from the security, safety, and well-being of others. A number of points follow from this principle.

First, we must insist that any response refrain from targeting civilians. It must refrain as well from attacking so-called dual-use targets, those that have some military purpose but substantially impact civilians. The United States did not adhere to this principle in World War II (where the direct intention was often to kill civilians) and it still does not adhere to it, as when it hit the civilian infrastructure in Iraq or Serbia, knowing that the result would be civilian deaths (from lack of electricity in hospitals, lack of drinking water, sewage treatment plants, and so on), while the military benefits would be slight. We would obviously reject as grotesque the claim that the World Trade Center was a legitimate target because its destruction makes it harder for the U.S. government to function (and hence to carry out its military policies). We need to be as sensitive to the human costs of striking dual-use facilities in other countries as we are of those in our own country.

We must insist as well that any response to the terror be carried out according to the UN Charter. The Charter provides a clear remedy

for events like those of September 11: present the case to the Security Council and let the Council determine the appropriate response. The Charter permits the Council to choose responses up to and including the use of military force. No military action should be carried out without Security Council authorization. To bypass the Security Council is to weaken the foundations of international law that provide security to all nations, especially the weaker ones.

Security Council approval is not always determinative. During the Gulf War, the U.S. obtained such approval by exercising its wealth and power to gain votes. So we should insist on a freely offered Security Council authorization. Moreover, we should insist that the UN retain control of any response; that is, we should oppose the usual practice whereby the United States demands that the Council give it a blank check to conduct a war any way it wants. In the case of the Gulf War, although the Council authorized the war, Council members learned about the opening salvos from CNN; the war was run out of Washington, not the UN. To give the United States a free hand to run a military operation as it chooses removes a crucial check.

And we should insist that no action and no Security Council vote be taken without a full presentation of the evidence assigning culpability. We don't want Washington announcing that we should just take its word for it -- as occurred in 1998, when the U.S. bombed a pharmaceutical plant in Sudan, asserting that it was a chemical warfare facility, only to acknowledge some time later that it had been mistaken.

If -- and it's a big if -- all these conditions are met, then we should no more object to seizing the perpetrators than we object to having the domestic police seize a rapist or a murderer to bring the culprit to justice. And what if a state determines to use military means to protect bin Laden from seizure? The dangers of harm to civilians are much greater in the case of action against a state. Military action would be justified only insofar as it did not cause substantial harm to civilians. In addition, if the goal of a proposed military action is to enhance U.S. security rather than to wreak vengeance, such envisioned benefits would have to be weighed against the prospects of driving thousands of others in the Islamic world into the hands of terrorism. In other words, military action needs to be the smallest part of the international response. More important are diplomatic pressures, cutting off funding sources for terrorist organizations, reducing the grievances that feed frustration, and so on.

It is critically important to also note, however, that even non-military actions can cause immense civilian suffering and that such options too must be rejected. Calling for Pakistan to cut off food aid to Afghanistan, for example, as the United States has already done, would likely lead to starvation on a huge scale. Its implications could be even worse, perhaps far worse, than those of bombing or other seemingly

more aggressive choices.

WHAT SHOULD WE DO IN THE UNITED STATES TO PROTECT OURSELVES FROM THESE SORTS OF ATTACKS?

Beyond pursuing the implementation of international law through appropriate international channels and with regard for proportionate and proper response and beyond trying to rectify unjust conditions that breed hopelessness and despair that can become the nurturing ground of terror -- it is also necessary to reduce vulnerability and risk.

Some things are far easier than the media would have us believe. If we don't want to ever see a commercial airliner turned into a missile and used to destroy people and property, we can simply disconnect the pilots' cabin and the body of the plane, making entry to the former from the latter impossible. Likewise, it is significant that the U.S. airline industry has, up until now, handled airport security through private enterprise, which means low-paid, unskilled security personnel with high turn-over. In Europe, on the other hand, airport security is a government function and the workers are relatively well-paid, and hence much more highly motivated and competent.

Other tasks will be harder. What we should not do, however, is curtail basic freedoms and militarize daily life. That response doesn't ward off terror, but makes terror the victor.

It seems like a lot of Americans are responding to the crisis with a lot of patriotic flag-waving. Is this bad?

For people to feel mutual sympathy, to express solidarity, to mourn, to help, is never wrong or bad. The image of firefighters running up stairs to help those above, stairs that would soon collapse, is heroic, and deserves profound respect and engenders almost unbearable sorrow. The vision of hundreds and thousands of people helping at the scene, working to save lives, donating, supporting, is similarly worthy and positive. Even the flag waving, which can at times be jingoism, should not be assumed to be such. To harshly judge the way some show their feelings for the U.S. and for the victims can indeed be callous and also unconstructive. The important thing is to increase awareness of the relevant facts and values at stake, and of the policies that may follow and their implications, and what people of good will can do to influence all these.

HOW CAN WE RESPOND TO PEOPLE WHO SAY AMERICA SHOULD MAKE A SHOW OF STRENGTH RIGHT NOW, AND RETALIATE?

We understand the sentiment. We share feelings of anger and outrage. But we also feel the rule of law is vastly preferable to vigilantism. We do

not advocate that every victim hunt and kill every perpetrator without the critical step of adjudication and of lawful determination of appropriate actions, nor should we in this case.

To retaliate merely to demonstrate strength or resolve, but not to attain real justice or security, is to follow the logic of terror. It seeks not a worthy end but symbolic or vengeful violence. It punishes not perpetrators, but innocents. We should not conduct terrorism as our response to terrorism, but should transcend terrorism in our response to it.

What should the progressives do more broadly?

These are difficult times. It is not going to help to isolate ourselves from the reality that others feel, and that we should feel as well. But change depends on organized resistance that raises awareness and commitment. It depends on pressuring decision makers to respect the will of a public with different views. It doesn't suffice for a left to have a good position, to be courageous, to be committed. It must also be huge.

Our immediate task is to communicate accurate information, to counter misconceptions and illogic, to empathize and be on the wavelength of the public, to be able to talk and listen, and be prepared to offer information, analysis, and humane aims.

Noam Chomsky

On 9/11 attacks and the Aftermath

> ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীদের হামলার পর দুনিয়ার নানা জায়গার সংবাদমাধ্যম, ওয়েবসাইট ও যুদ্ধবিরোধী তৎপরতায় শরিক সংস্থাগুলার প্রতিনিধিরা নোম চমস্কির প্রচুর সাক্ষাৎকার নেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েবসাইট *জেড নেট* নোম চমস্কির ৫টা সাক্ষাৎকারের একটা গুচ্ছসংগ্রহ প্রকাশ করে। পরে রেডিও বি-৯২ বেলগ্রেড-প্রচারিত আরেকটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় এবং *জেড নেট* এর পরিচালক মাইকেল অ্যালবার্ট আলাদাভাবে চমস্কির সাক্ষাৎকার নেন। এখানে এই ৭টা সাক্ষাৎকার পেশ করা গেল। এইসব সাক্ষাৎকারের সবগুলাই মোটামুটি ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের।

INTERVIEW 01

Questions from various phone and periodical interviews...and answers.

> 1) The fall of the Berlin Wall didn't claim any victims, but it did profoundly change the geo-political scene. Do you think that last week's attacks could have a similar effect?

The fall of the Berlin Wall was an event of great importance, and did change the geopolitical scene, but not in the ways usually assumed, in my opinion. I've tried to explain my reasons elsewhere, and won't go into it now.

The events of September 11 are something quite new in world affairs, not in their scale and character, but in the target. For the US, this is the first time since the War of 1812 that the national territory has been under attack, even threat. Many commentators have brought up a Pearl Harbor analogy, but that is quite misleading. On Dec. 7 1941, military bases in two COLONIES were attacked. Not the national territory, which was never threatened. During these

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

years the US annihilated the indigenous population (millions of people), conquered half of Mexico, intervened violently in the surrounding region, conquered Hawaii and the Philippines (killing hundreds of thousands of Filipinos), and in the past half century particularly, extended its resort to force throughout much of the world. The number of victims is colossal. For the first time, the guns have been directed the other way. That is a dramatic change.

The same is true, even more dramatically, of Europe. Europe has suffered murderous destruction, but from internal wars. Meanwhile European powers conquered much of the world with extreme brutality. With the rarest of exceptions, they were not under attack by their victims outside. England was not attacked by India, or Belgium by the Congo, or Italy by Ethiopia . It is not surprising, therefore, that Europe should be utterly shocked by the terrorist crimes of Sept. 11. Again, not because of the scale, regrettably.

Exactly what this portends, no one can guess. But that it is something strikingly new is quite clear.

2) My impression is that these attacks won't offer us new political scenery, but that they rather confirm the existence of a problem inside the "Empire". The problem concerns political authority and power. What do you think?

The likely perpetrators are a category of their own, but uncontroversially, they draw support from a reservoir of bitterness and anger over US policies in the region, extending those of earlier European masters. There certainly is an issue of "political authority and power." In the wake of the attacks, the _Wall Street Journal_ surveyed opinions of "moneyed Muslims" in the region: bankers, professionals, businessmen with ties to the US. They expressed dismay and anger about US support for harsh authoritarian states and the barriers that Washington places against independent development and political democracy by its policies of "propping up oppressive regimes." Their primary concern, however, was different: Washington's policies towards Iraq and towards Israel's military occupation. Among the great mass of poor and suffering people, similar sentiments are much more bitter, and they are also hardly pleased to see the wealth of the region flow to the West and to small Western-oriented elites and corrupt and brutal rulers backed by Western power. So there definitely are problems of authority and power. The immediate US reaction is to deal with these problems by intensifying them. That is, of course, not inevitable. A good deal depends on the outcome of such considerations.

3) Is America having trouble governing the process of globalization - and I don't mean just in terms of national security or intelligence systems?

The US doesn't govern the corporate globalization project, though it of

course has a primary role. These programs have been arousing enormous opposition, primarily in the South, where mass protests could be suppressed or ignored. In the past few years, the protests reached the rich countries as well, and hence became the focus of great concern to the powerful, who now feel themselves on the defensive, not without reason. There are very substantial reasons for the worldwide opposition to the particular form of investor-rights "globalization" that is being imposed, but this is not the place to go into that.

> 4) "Intelligent Bombs" in Iraq, "humanitarian intervention" in Kosovo. The USA never used the word "war" to describe that. Now they talking about war against a nameless enemy. Why?

At first the US used the word "crusade," but it was quickly pointed out that if they hope to enlist their allies in the Islamic world, that is a serious mistake, for obvious reasons. The rhetoric therefore shifted to "war." The Gulf war of 1991 was called a war. The bombing of Serbia was called a "humanitarian intervention," by no means a novel usage. That was a standard description of European imperialist ventures in the 19th century. To cite some more recent examples, the major recent scholarly work on "humanitarian intervention" cites three examples of "humanitarian intervention" in the immediate pre-World War II period: Japan's invasion of Manchuria, Mussolini's invasion of Ethiopia, and Hitler's takeover of the Sudetenland. The author of course is not suggesting that the term is apt; rather, that the crimes were masked as "humanitarian." But the pretext of "humanitarian intervention" cannot be used in the normal way in the present case. So we are left with "war."

To call it a "war against terrorism," however, is simply more propaganda, unless the "war" really does target terrorism. But that is plainly not contemplated. Perhaps I may quote political scientist Michael Stohl: "We must recognize that by convention -- and it must be emphasized _only_ by convention -- great power use and the threat of the use of force is normally described as coercive diplomacy and not as a form of terrorism," though it commonly involves "the threat and often the use of violence for what would be described as terroristic purposes were it not great powers who were pursuing the very same tactic," in accord with the literal meaning of the term. Under the (admittedly, unimaginable) circumstances that Western intellectual culture were willing to adopt the literal meaning, the war against terrorism would take quite a different form, along lines spelled out in extensive detail in literature that does not enter the respectable canon.

> 5) Nato is keeping quiet until they find out whether the attack was internal or external. How do you interpret this?

I do not think that that is the reason for Nato's hesitation. There is no

serious doubt that the attack was "external." I think the reasons are those that European leaders are giving. They recognize, as does everyone with close knowledge of the region, that a massive assault on a Muslim population would be the answer to the prayers of Bin Laden and his associates, and would lead the US and its allies into a "diabolical trap," as the French foreign minister put it.

6) Could you say something about connivance and the role of American secret service?

I don't quite understand the question. This attack was surely an enormous shock and surprise to the intelligence services of the West, including those of the US. The CIA did have a role, a major one in fact, but that was in the 1980s, when it joined Pakistani intelligence and others (Saudi Arabia, Britain, etc.) in recruiting, training, and arming the most extreme Islamic fundamentalists it could find to fight a "holy war" against the Russian invaders of Afghanistan. After that war was over, the "Afghanis" (many not Afghans, like Bin Laden) turned their attention elsewhere: to Chechnya and Bosnia for example, where they may have received at least tacit US support. And to their prime enemy, Saudi Arabia, and the United States, which Bin Laden regards as having invaded Saudi Arabia much as Russia invaded Afghanistan. A long story.

7) What consequences do you foresee for the Seattle movement? Do you think it will be brought up short, or is it possible that it will gain momentum?

It is certainly a setback for the worldwide protests against corporate globalization, which -- again -- did not begin in Seattle. Such terrorist atrocities are a gift to the harshest and most repressive elements on all sides, and are sure to be exploited -- already have been in fact -- to accelerate the agenda of militarization, regimentation, reversal of social democratic programs, transfer of wealth to narrow sectors, and undermining democracy in any meaningful form. But that will not happen without resistance, and I doubt that it will succeed, except in the short term.

8) What are the consequences for the Middle East? in particular for the Israeli-palestinian conflict?

The atrocities of September 11 were a devastating blow for the Palestinians, as they instantly recognized. Israel is openly exulting in the "window of opportunity" it now has to crush Palestinians with impunity. In the first few days after the Tuesday attack, Israeli tanks entered Palestinian cities (Jenin, Jericho for the first time), several dozen Palestinians were killed, and Israel's iron grip on the population tightened, exactly as would be expected. Again, these are the common dynamics of a cycle of escalating violence, familiar throughout the world: Northern Ireland, Israel-Palestine, the Balkans, and elsewhere.

> 9) How do you judge the reaction of Americans? From over here they seemed pretty cool-headed, but Saskia Sassen said in an interviw "We already feel as though we are at war".

The immediate reaction was shock, horror, anger, fear, a desire for revenge. But public opinion is mixed, and countercurrents did not take long to develop. They are now even being recognized in mainstream commentary. Today's newspapers, for example.

> 10) In an interview you gave to "La Jornada", you said that we are faced with a new type of war. What exactly did you mean?

It is a new type of war for the reasons mentioned in response to question (1): the guns are directed in a different direction, something quite new in the history of Europe and its offshoots.

> 11) Are Arabs, now defined as necessarily fundamentalist, the west's new enemy?

Certainly not. First of all, no one with even a shred of rationality defines Arabs as "fundamentalist." Secondly, the US and the West generally have no objection to religious fundamentalism as such. The US, in fact, is one of the most extreme religious fundamentalist cultures in the world; not the state, but the popular culture. In the Islamic world, the most extreme fundamentalist state, apart from the Taliban, is Saudi Arabia, a US client state since its origins. As we know, Islamic fundamentalist extremists were US favorites in the 1980s, because they were the best killers who could be found. In those years, a prime enemy of the US was the Catholic Church, which had sinned grievously in Latin America by adopting "the preferential option for the poor," and suffered bitterly for that crime. The West is quite ecumenical in its choice of enemies. The criteria are subordination and service to power, not religion.

> 12) Is the nation's so-called war on terrorism winnable? If yes, how? If no, then what should the Bush administration do to prevent attacks like the ones that struck New York and Washington?

I will not elaborate here, but if we want to consider this question seriously, we should recognize that in much of the world the US is regarded as a leading terrorist state, and with good reason. We might bear in mind, for example, that the US was condemned by the World Court for "unlawful use of force" (international terrorism) and then vetoed a Security Council resolution calling on all states (meaning the US) to adhere to international law. Only one of countless examples.

But to keep to the narrow question -- the terrorism of others directed against us -- we know quite well how the problem should be addressed, if we want to reduce the threat rather than escalate it. When IRA bombs were set off in London, there was no call to bomb the US, the source of most of the financial support for the IRA. Rather,

efforts were made to deal with what lay behind the resort to terror. When a federal building was blown up in Oklahoma City, there were calls for bombing the Middle East, and it probably would have happened if the source turned out to be there. When it was found to be a militia-based bombing, there was no call to obliterate Montana and Idaho. Rather, there was a search for the perpetrator, who was found, brought to court and sentenced, and there were efforts to understand the grievances that lie behind such crimes and to address the problems. Just about every crime -- whether a robbery in the streets or colossal atrocities -- has reasons, and commonly we find that some of them are serious and should be addressed.

That is the course one follows if the intention is to reduce the probability of further atrocities. There is another course: react with extreme violence, and expect to escalate the cycle of violence, leading to still further atrocities such as the one that is inciting the call for revenge. The dynamic is very familiar.

13. What aspect or aspects of the story have been under-reported by the mainstream press, and why is it important that they be paid more attention?

There are several fundamental questions:

First, what courses of action are open to us, and what are their likely consequences. There has been virtually no discussion of the option of adhering to the rule of law, as others do, for example Nicaragua, when it responded to the US terrorist assault by going to the World Court and the UN Security Council (failing, of course, but no one will bar such moves by the US); or as England did in the case of the IRA, or as the US did when it was found that the Oklahoma City bombing was domestic in origin. And innumerable other cases. Rather, there has been a fairly solid drumbeat of calls for violent reaction, with only scarce mention of the fact that this will not only visit a terrible cost on wholly innocent victims, many of them Afghan victims of the Taliban, but also that it will answer the most fervent prayers of bin Laden and his network, as the US falls into the "diabolical trap" they are laying, as the French Foreign Minister warned a few days ago, and as every knowledgeable observer has been trying to make clear.

The second question is: "why?" The veteran British correspondent Robert Fisk, one of the most respected experts on the region, has had innumerable interviews, and he observes that almost no one is asking him that question. To refuse to face this question is choose to increase significantly the probability of further crimes of this kind. There have been some exceptions. The Wall Street Journal, to its credit, has reviewed the opinions of "moneyed Muslims": bankers, professionals, businessmen, people who are pro-American but severely critical of US policies in the

region, for reasons that are familiar to anyone who has paid any attention. The feelings in the streets are similar, though far more bitter and angry.

The bin Laden network itself falls into a different category, and in fact its actions for 20 years have caused great harm to the poor and oppressed people of the region, who are not the concern of the terrorist networks. But they do draw from a reservoir of anger, fear, and desperation, which is why they are praying for a violent US reaction, which will mobilize others to their horrendous cause.

Such topics as these should occupy the front pages -- at least, if we hope to reduce the cycle of violence rather than to escalate it.

INTERVIEW 02

1. How do you see the media coverage of this event? Is there a parallel to the Gulf War in "manufacturing consent?"

Media coverage is not quite as uniform as Europeans seem to believe, perhaps because they are keeping to the NYT, NPR, TV, and so on. Even the NYT conceded, this morning, that attitudes in New York are quite unlike those they have been conveying. It's a good story, also hinting at the fact that the mainstream media have not been reporting this, which is not entirely true, though it has been true, pretty much, of the NYT. But it is entirely typical for the major media, and the intellectual classes generally, to line up in support of power at a time of crisis and to try to mobilize the population for the same cause. That was true, with almost hysterical intensity, at the time of the bombing of Serbia. The Gulf war was not at all unusual. To take an example that is remote enough so that we should be able to look at it dispassionately, how did the intellectuals of Europe and North America react to World War I -- across the political spectrum? Exceptions are so few that we can virtually list them, and most of the most prominent ended up in jail: Rosa Luxemburg, Bertrand Russell, Eugene Debs,...

2. Assuming that the terrorists chose the World Trade Center as a symbolic target, how does globalization and cultural hegemony help create hatred towards America.

This is an extremely convenient belief for Western intellectuals. It absolves them of responsibility for the actions that actually do lie behind the choice of the WTC. Was it bombed in 1993 because of concern over globalization and cultural hegemony? A few days ago the Wall Street Journal reported attitudes of rich and privileged Egyptians at a

McDonald's restaurant wearing stylish American clothes, etc., and bitterly critical of the US for objective reasons of policy, which are well-known to those who wish to know: they had a report a few days earlier on attitudes of bankers, professionals, businessmen in the region, all pro-American, and harshly critical of US policies. Is that concern over "globalization", McDonald's, and jeans? Attitudes in the street are similar, but far more intense, and have nothing at all to do with these fashionable excuses.

As for the bin Laden network, they have as little concern for globalization and cultural hegemony as they do for the poor and oppressed people of the Middle East who they have been severely harming for years. They tell us what their concerns are loud and clear: they are fighting a Holy War against the corrupt, repressive, and "un-Islamist" regimes of the region, and their supporters, just as they fought a Holy War against the Russians in the 1980s (and are now doing in Chechnya, Western China, Egypt (in this case since 1981, when they assassinated Sadat), and elsewhere. Bin Laden himself probably never even heard of "globalization." Those who have interviewed him in depth, like Robert Fisk, report that he knows virtually nothing of the world, and doesn't care to. We can choose to ignore all the facts and indulge in self-indulgent fantasies if we like, but at considerable risk to ourselves, among others. Among other things, we can also ignore, if we choose, the roots of the "Afghanis" such as bin Laden and his associates, also not a secret.

3. Are the American people educated to see this? Is there an awareness of cause and effect?

Unfortunately not, just as the European people are not. What is crucially important for privileged elements in the Middle East region (and even more so, on the streets) is scarcely understood here, particularly the most striking example: the contrasting US policies towards Iraq and Israel's military occupation. About the latter, the most important facts are scarcely even reported, and are almost universally unknown, to elite intellectuals in particular. Very easy to give examples. Can easily refer you to material in print for many years, if you like, including right now.

4. How do you see the reaction of the American Government? Who's will are they representing?

The US government, like others, primarily responds to centers of concentrated domestic power. That should be a truism. Of course, there are other influences, including popular currents -- that is true of all societies, even brutal totalitarian systems, surely more democratic ones. Insofar as we have information, the US government is now trying to exploit the opportunity to ram through its own agenda: militarization, including "missile defense," a code word for militarization of space;

undermining social democratic programs and concerns over the harsh effects of corporate "globalization," or environmental issues, or health insurance, and so on; instituting measures that will intensify the transfer of wealth to very narrow sectors (e.g., eliminating the capital gains tax); regimenting the society so as to eliminate discussion and protest. All normal, and entirely natural. As for a response, they are, I presume, listening to the foreign leaders, specialists on the Middle East, and I suppose their own intelligence agencies, who are warning them that a massive military response will answer bin Laden's prayers. But there are hawkish elements who want to use the occasion to strike out at their enemies, with extreme violence, no matter how many innocent people suffer, including people here and in Europe who will be victims of the escalating cycle of violence. All again in a very familiar dynamic. There are plenty of bin Ladens on both sides, as usual.

> 5. Economic globalization has spread the western model all over, and the USA in primis have supported it, sometimes with questionable means, often humiliating local cultures. Are we facing the consequences of the last decades of american strategic policy? Is America an innocent victim?

This thesis is commonly in advanced. I don't agree. One reason is that the western model -- notably, the US model -- is based on vast state intervention into the economy. The "neoliberal rules" are like those of earlier eras. They are double-edged: market discipline is good for you, but not for me, except for temporary advantage, when I am in a good position to win the competition.

Secondly, what happened on Sept. 11 has virtually nothing to do with economic globalization, in my opinion. The reasons lie elsewhere. Nothing can justify crimes such as those of Sept. 11, but we can think of the US as an "innocent victim" only if we adopt the convenient path of ignoring the actions of the US and its allies, which are, after all, hardly a secret.

> 6. Everybody agrees that nothing will be the same after 11th september, form daily life with a restriction of rights up to global strategy with new alliances and enemies. What is your opinion about this?

The horrendous terrorist attacks on Tuesday are something quite new in world affairs, not in their scale and character, but in the target. For the US, this is the first time since the War of 1812 that its national territory has been under attack, even threat. Its colonies have been attacked, but not the national territory itself. During these years the US virtually exterminated the indigenous population, conquered half of Mexico, intervened violently in the surrounding region, conquered Hawaii and the Philippines (killing hundreds of thousands of Filipinos), and in the past half century particularly, extended its resort to force throughout much of the world. The number of victims is colossal. For the first time,

the guns have been directed the other way. The same is true, even more dramatically, of Europe. Europe has suffered murderous destruction, but from internal wars, meanwhile conquering much of the world with extreme brutality. But India did not attack England, or the Congo Belgium, or the East Indies the Netherlands. One can think of marginal exceptions, but this is truly novel in several centuries of history -- not in scale, regrettably, but in the choice of target.

I do not think it will lead to a long-term restriction of rights internally in any serious sense. The cultural and institutional barriers to that are too firmly rooted, I believe. If the US chooses to respond by escalating the cycle of violence, answering the prayers of bin Laden and his associates, then the consequences could be awesome. There are, of course, other ways, lawful and constructive ones. And there are ample precedents for them. An aroused public within the more free and democratic societies can direct policies towards a much more humane and honorable course.

> 7. World-wide intelligence services and the international systems of control (Echelon, for example) could not forsee what was going to happen, even if the international islamic terrorism network was not unknown. How is it possible that the Big Brother s eyes were shut? Do we have to fear, now a Bigger Big Brother?

I frankly have never been overly impressed with concerns widely voiced in Europe over Echelon as a system of control. As for world-wide intelligence systems, their failures over the years have been colossal, a matter I and others have written about, and that I cannot pursue here. That is true even when the targets of concern are far easier to deal with than the bin Laden network, presumed to be responsible for the Sept. 11 crimes. Surely one would expect the network to be reasonably well understood by the CIA, French intelligence, and others who participated in establishing it and nurtured it as long as it was useful to them for a Holy War against the Russian enemy, but even then they did not understand it well enough to prevent such events as the assassination of President Sadat in 1981, the suicide bombing that effectively drove the US military out of Lebanon in 1983, and many other examples of what is called "blowback" in the literature on these topics.

By now the network is no doubt so decentralized, so lacking in hierarchical structure, and so dispersed throughout much of the world as to have become largely impenetrable. The intelligence services will no doubt be given resources to try harder. But a serious effort to reduce the threat of this kind of terrorism, as in innumerable other cases, requires an effort to understand and to address the causes.

When a Federal Building was blown up in Oklahoma City, there were immediate cries to bomb the Middle East. These terminated when it was

discovered that the perpetrator was from the US ultra-right militia movement. The reaction was not to destroy Montana and Idaho, where the movements are based, but to seek and capture the perpetrator, bring him to trial, and -- crucially -- explore the grievances that lie behind such crimes and to address the problems. Just about every crime -- whether a robbery in the streets or colossal atrocities -- has reasons, and commonly we find that some of them are serious and should be addressed. Matters are no different in this case -- at least, for those who are concerned to reduce the threat of terrorist violence rather than to escalate it.

8. Bin Laden, the devil: is this an enemy or rather a brand, a sort of logo which identifies and personalizes the evil?

Bin Laden may or may not be directly implicated in these acts, but it is likely that the network in which he was a prime figure is -- that is, the network established by the US and its allies for their own purposes and supported as long as it served those purposes. It is much easier to personalize the enemy, identified as the symbol of ultimate evil, than to seek to understand what lies behind major atrocities. And there are, naturally, very strong temptations to ignore one's own role -- which in this case, is not difficult to unearth, and indeed is familiar to everyone who has any familiarity with the region and its recent history.

9. Doesn't this war risk to become a new Vietnam? That trauma is still alive.

That is an analogy that is often raised. It reveals, in my opinion, the profound impact of several hundred years of imperial violence on the intellectual and moral culture of the West. The war in Vietnam began as a US attack against South Vietnam, which was always the main target of the US wars, which ended by devastating much of Indochina. Unless we are willing to face that elementary fact, we cannot talk seriously about the Vietnam wars. It is true that the war proved costly to the US, though the impact on Indochina was incomparably more awful. The invasion of Afghanistan also proved costly to the USSR, but that is not the problem that comes to the fore when we consider that crime.

Interview 03

1. Let's assume, for the sake of discussion, that bin Laden was behind the events. If so, what reason might he have had? It certainly can't help poor and disempowered people anywhere, much less Palestinians, so what is his aim, if he planned the action?

One has to be cautious about this. According to Robert Fisk, who has interviewed him repeatedly and at length, bin Laden shares the anger felt throughout the region at US support for atrocities against Palestinians, side by side with US devastation of Iraqi civilian society. That ranges from rich to poor, across the political and other spectrums, and it would be surprising if he didn't share the feelings.

Many who know the conditions well are also dubious about bin Laden's capacity to plan that incredibly sophisticated operation from a cave somewhere in Afghanistan. But that his network was involved is highly plausible, and that he is an inspiration for them, also. These are decentralized, non-hierarchic structures, probably with quite limited communication links among them. It's entirely possible that bin Laden's telling the truth when he says he didn't know about the operation, though he is outspoken in approving of it.

All that aside, bin Laden has been quite clear about what he wants, not only to any Westerners who want to interview him, like Fisk, but more importantly to an Arab audience: on cassettes in Arabic that are circulating everywhere, and that are much like what he tells Westerners, according to those who have heard them. Adopting his framework for the sake of discussion, the prime target is Saudi Arabia and other corrupt and repressive regimes of the region, none of them truly "Islamic." And he and his network are intent on supporting Muslims defending themselves against "infidels" wherever it may be: Chechnya, Bosnia, Kashmir, Western China, Southeast Asia, North Africa, maybe elsewhere. They fought and won a holy war to drive the Russians (Europeans, in their view) out of Muslim Afghanistan, and they are even more intent on driving the Americans out of Saudi Arabia, a far more important country to them, as the site of the holiest places. His call for the overthrow of corrupt and brutal regimes of gangsters and torturers resonates quite widely, as does his indignation against the atrocities that he and others attribute to the US, hardly without reason. It's entirely true that his crimes are extremely harmful to the poorest and most oppressed people of the region. The latest attacks, for example, were a crushing blow against Palestinians. But what looks like sharp inconsistency from outside may be perceived rather differently from within. By courageously fighting oppressors, who are quite real, he may appear to be a hero, however harmful his actions are to the poor majority. And if the US succeeds in killing him, he may become even more powerful as a martyr whose voice will continue to be heard on the cassettes that are circulating and through other means. He is, after all, as much of a symbol as an objective force, both for the US and probably much of the population.

There's every reason, I think, to take him at his word. And his

crimes can hardly come as a surprise to the CIA. "Blowback" from the radical Islamic forces organized, armed, and trained by the US-Egypt-France-Pakistan and others began almost at once, with the 1981 assassination of President Sadat of Egypt, one of the most enthusiastic of the creators of the forces assembled to fight a Holy War against the Russians. And has been continuing since without let-up.

> 2. Again, if bin Laden planned these actions, and especially if popular fears of more such actions come are credible, what is the proper approach to reducing or eliminating the danger? What steps should be taken by the U.S. or others, domestically or internationally? What would be the results of those steps?

Every case is different, but let's take a few analogies. What was the right way for Britain to deal with IRA bombs in London? One choice would have been to send the RAF to bomb the source of their finances, places like Boston. Putting aside feasibility, that would have been criminal idiocy. Another possibility was to consider realistically the background concerns and grievances, and to try to remedy them, while at the same time following the rule of law to punish criminals. Makes a lot more sense, one would think. Or take the bombing of the Federal building in Oklahoma City. There were immediate calls for bombing the Middle East, and it probably would have happened if even a remote hint of a link had been found. When it was found to be a militia-based bombing, there was no call to obliterate Montana and Idaho. Rather, there was a search for the perpetrator, who was found, brought to court and sentenced, and to the extent that the reaction was sensible, there were efforts to understand the grievances that lie behind such crimes and to address the problems. Just about every crime -- whether a robbery in the streets or colossal atrocities -- has reasons, and commonly we find that some of them are serious and should be addressed. At least, that is the course we follow if we have any concern for right and justice, and hope to reduce the likelihood of further atrocities rather than increase it. The same principles hold quite generally, with due attention to variation of circumstances. Specifically, they hold in this case.

There are hysterical cries that we dare not look at the reasons that lie behind criminal acts carried out by our enemies (it's fine in other cases) because that amounts to condoning them. Aside from the transparent absurdity, that stance is profoundly immoral, on the most elementary grounds: it increases the likelihood of serious harm. And like other immoral acts, we should ask what lies behind this disgraceful stance. The answers often are not pretty.

> 3. What steps, in contrast, is the U.S. government seeking to undertake? What will be the results, if they succeed in their plans?

What has been announced is a virtual declaration of war against all who

do not join Washington in its resort to violence, however it chooses. The nations of the world face a "stark choice": join us in our crusade or "face the certain prospect of death and destruction" (RW Apple, NYTimes, Sept. 14). Bush's rhetoric of Sept. 20 forcefully reiterates that stance. Taken literally, it's virtually a declaration of war against much of the world. But I am sure we should not take it literally. Government planners do not want to undermine their own interests so grievously. What their actual plans are, we do not know. But I suppose they will take to heart the warnings they are receiving from foreign leaders, specialists in the region, and presumably their own intelligence agencies that a massive military assault, which will kill many innocent civilians -- not Taliban, but their victims -- will be the answer to bin Laden's prayers. Even if he himself is killed -- maybe even more so if he is killed -- a slaughter of innocents will only intensify the feelings of anger, desperation and frustration that are rampant in the region, and mobilize others to his horrendous cause. The US will fall into a "diabolical trap" that bin Laden is setting, as the French Foreign minister put it. He may well have used the words advisedly. He -- or at least his intelligence agencies -- surely know that they were instrumental in drawing the Russians into an "Afghan trap," as Carter's National Security Adviser Zbigniew Brzezinski proudly informed the French press, congratulating himself on having sprung the trap months before the Russians actually invaded by arranging for US support for Mujahideen fighting the government. Brzezinski may have been bragging about his own brilliance in creating the monster that has been spreading death and destruction through much of the Middle East, Africa, and beyond, including New York City, but there's probably at least some truth to it.

What the Administration will do we don't know; it will depend in part at least on the mood at home, which we can hope to influence. What the consequences of their actions will be we also cannot say with much confidence, any more than they can. But there are plausible estimates, and unless the course of reason, law, and treaty obligations is pursued, the prospects could be quite grim.

4. Many people say that the citizens of Arab nations should have taken responsibility to remove terrorists from the planet, or governments that support terrorists. How do you react?

It makes sense to call upon citizens to eliminate terrorists instead of electing them to high office, lauding and rewarding them. But I would not suggest that we should have "removed our elected officials, their advisers, their intellectual claque, and their clients from the planet," or destroyed our own and other Western governments because of their terrorist crimes and their support for terrorists worldwide, including many who know fall into the category of "terrorists" because they dis-

obeyed orders: Saddam Hussein, and many others before him. However, it is rather unfair to blame citizens of harsh and brutal regimes that we support for not undertaking this responsibility, when we do not do so under vastly more propitious circumstances.

5. Many people say that all through history when a nation is attacked, it attacks in kind. How do you react?

When countries are attacked they try to defend themselves, if they can. According to the doctrine proposed, Nicaragua, South Vietnam, and numerous others should have been sending suicide bombers to destroy the US from within, Palestinians should be applauded for suicide bombings in Tel Aviv, and on, and on. It is because this doctrine had brought Europe to virtual self-annihilation after hundreds of years of savagery that the nations of the world forged a different compact after World War II, establishing -- at least formally -- the principle that the resort to force is barred except in the case of self-defense against armed attack until the Security Council acts to protect international peace and security. Specifically, retaliation is barred. Since the US is not under armed attack, these considerations are irrelevant -- at least, if we agree that the fundamental principles of international law should apply to ourselves, not only to those we dislike.

International law aside, we have centuries of experience that tell us exactly what this doctrine entails. And in a world with weapons of mass destruction, what it entails is an imminent termination of the human experiment -- which is, after all, why Europeans decided half a century ago that the game of mutual slaughter in which they had been indulging for centuries had better come to an end, or else.

6. Many people evince horrified anger at the expressions of anger at the U.S. emanating from many parts of the world, including but not confined to the mideast. The images of people celebrating the collapse of the World Trade Center leave people wanting revenge. How do you react to that?

The US-backed army took control in Indonesia in 1965, organizing the slaughter of hundreds of thousands of people, mostly landless peasants, in a massacre that the CIA compared to the crimes of Hitler, Stalin, and Mao. That led to uncontrolled euphoria in the West, a display of exuberance that could not be contained, in the national media and elsewhere. Indonesian peasants had not harmed us in any way. When Nicaragua finally succumbed to the US assault, the mainstream press lauded the success of the methods adopted to "wreck the economy and prosecute a long and deadly proxy war until the exhausted natives overthrow the unwanted government themselves," with a cost to us that is "minimal," leaving the victim "with wrecked bridges, sabotaged power stations, and ruined farms," and thus providing the U.S. candidate with "a winning

issue": ending the "impoverishment of the people of Nicaragua." We are "united in joy" at this outcome, as the New York Times proclaimed. It's easy to continue.

Very few people around the world celebrated the crimes in New York; overwhelmingly, they were deplored, even in places where people had been ground underfoot by Washington's boots for a long, long time. But there were undoubtedly feelings of anger at the US. However, I am aware of nothing as grotesque as the two examples I just mentioned, or many more like them in the West. Those who believe that reactions last week call for revenge should be dedicating themselves to a campaign of mass destruction against their own institutions, and themselves, if the reactions are based on any moral principle.

7. Getting beyond these public reactions, in your view what are the actual motivations operating in U.S. policy at this moment? What is the purpose of the "war on terror," as proposed by Bush?

The "new war on terror" is neither "new" nor a "war on terror." We should recall that the Reagan administration came to office 20 years ago proclaiming that "international terrorism" would be a prime focus of our foreign policy, and we must undertake a war to eliminate this "cancer," this "plague" that was destroying civilization. It acted on that commitment by organizing campaigns of international terrorism that were extraordinary in scale and destruction, even leading to a World Court condemnation of the US, while lending their support to innumerable others, for example, in southern Africa, where Western-backed South African depredations killed a million and a half people and caused $60 billion of damage during the Reagan years. Hysteria over international terrorism peaked in the mid-80s, while the US and its allies were well in the lead in spreading the cancer they were demanding must be extirpated. If we choose, we can live in a world of comforting illusion. Or we can look at recent history, at the institutional structures that remain essentially unchanged, at the plans that are being announced -- and answer the questions accordingly. I know of no reason to suppose that there has been a sudden change in long-standing motivations or policy goals, apart from tactical adjustments to changing circumstances.

We should also remember than one exalted task of intellectuals is to proclaim every few years that we have "changed course," the past is behind us and can be forgotten as we march on towards a glorious future. That is a highly convenient stance, though hardly an admirable or sensible one.

8. Do you believe that most Americans will, as conditions permit more detailed evaluation of options, accept that the solution to terror attacks on civilians is more terror attacks on civilians, and that that solution to fanaticism is surveillance and curtailed civil liberties.

I hope not, but we should not underestimate the capacity of well-run propaganda systems to drive people to irrational, murderous, and suicidal behavior. Take an example that is remote enough so that we should be able to look at it with some dispassion: World War I. It can't have been that both sides were engaged in a noble war for the highest objectives. But on both sides, the soldiers marched off to mutual slaughter with enormous exuberance, fortified by the cheers of the intellectual classes and those who they helped mobilize, across the political spectrum, from left to right, including the most powerful left political force in the world, in Germany. Exceptions are so few that we can practically list them, and some of the most prominent among them ended up in jail for questioning the nobility of the enterprise: among them Rosa Luxemburg, Bertrand Russell, and Eugene Debs. With the help of Wilson's propaganda agencies and the enthusiastic support of liberal intellectuals, a pacifist country was turned in a few months into raving anti-German hysterics, ready to take revenge on those who had perpetrated savage crimes, many of them invented by the British Ministry of Information. But that's by no means inevitable, and we should not underestimate the civilizing effects of the popular struggles of recent years. We need not stride resolutely towards catastrophe, merely because those are the marching orders.

INTERVIEW 04

From Greek, Spanish and French Press

> 1. After the attack in the USA, Colin Powel said that the government will revise the laws for terrorism, including the law of 1976 that does not enable the american personel to kill or plan the murder of terrorists. European Union is about to apply a new law on terrorism. Up to which point will this attack constrict our freedom? For instance, does terrorist's action give the right to any government to put us under surveillance, in order to trace suspects and prevent future attacks?

A response that is too abstract may be misleading, so let us consider a current and quite typical illustration of what such plans mean in practice. This morning (Sept. 21), the New York Times ran an opinion piece by a respected intellectual who is considered a moral leader (MIchael Walzer). He called for an "ideological campaign to engage all the arguments and excuses for terrorism and reject them"; since as he knows, there are no such arguments and excuses for terrorism of the kind he has in mind, at least on the part of anyone amenable to reason, this translates as a call to reject efforts to explore the reasons that lie

behind terrorist acts that are directed against states he supports. He then proceeds, in conventional fashion, to enlist himself among those who provide "arguments and excuses for terrorism," tacitly endorsing political assassination, namely, Israeli assassinations of Palestinians who it claims support terrorism; no evidence is offered or considered necessary, and in many cases even the suspicions appear groundless. US-supplied attack helicopters have been used for such assassinations for 10 months. Walzer puts the word "assassination" in quotes, indicating that in his view, the term is part of the "fervid and highly distorted accounts of the blockade of Iraq and the Israeli-Palestinian conflict." He is referring to criticism of US-backed Israeli atrocities in the territories that have been under harsh and brutal military occupation for almost 35 years, and of US policies that have devastated the civilian society of Iraq (while strengthening Saddam Hussein). Such criticisms are marginal in the US, but too much for him, apparently. By "distorted accounts," perhaps Walzer has in mind occasional references to the statement of Secretary of State Madeleine Albright over national TV when she was asked about the estimates of 1/2 million deaths of Iraqi children as a result of the sanctions regime. She recognized that such consequences were a "hard choice" for her administration, but "we think the price is worth it."

I mention this single example, easily multiplied, to illustrate the substantive meaning of the relaxation of constraints on state action. We may recall that violent and murderous states quite commonly justify their actions as "counter-terrorism": for example, the Nazis fighting partisan resistance. And such actions are commonly justified by respected intellectuals.

To be sure, there are many factors to be considered in thinking about your question. But the historical record is of overwhelming importance. At a very general level, the question cannot be answered. It depends on specific circumstances and specific proposals.

2. Bundestag in Germany already decided that German soldiers will join american forces, although 80% of the german people do not agree with this, according to a survey of the Forsa Institute. How do you comment this?

For the moment, European powers are hesitant about joining Washington's crusade, fearing that by a massive assault against innocent civilians the US will be falling into a "diabolical trap" set by bin Laden (in the words of the French foreign minister), helping him to mobilize desperate and angry people to his cause, with consequences that could be even more horrifying.

3. What do you think about the nations acting as a global community on war time? It is not the first time that every country should be allied

with USA, otherwise it is considered an enemy, but now Afganistan is declaring the same thing.

The Bush administration at once gave the nations of the world "a stark choice": join us "or face the certain prospect of death and destruction" (NY Times, Sept.14). It might be interesting to seek historical precedents.

The "global community" strongly opposes terror, including the massive terror of the powerful states, and also the terrible crimes of Sept. 11. But the "global community" does not act. When Western powers use the term "international community," they are referring to themselves. For example, NATO bombing of Serbia was undertaken by the "international community" according to consistent Western rhetoric, although those who did not have their heads buried in the sand knew that it was strongly opposed by most of the world, often quite vocally. Those who do not support the actions of wealth and power are not part of "the global community," just as "terrorism" conventionally means "terrorism directed against us and our friends."

It is hardly surprising that Afghanistan is attempting to mimic the US, calling on Muslims to support it. The scale, of course, is vastly smaller. Even as remote as they are from the world outside, Taliban leaders presumably know full well that the Islamic states are not their friends. These states are prime targets of the radical Islamic forces organized and trained by the CIA, Egypt, Pakistan and others to fight a Holy War against Russia. These states have, in fact, been subjected to terrorist attack by the radical Islamicist forces they helped to create ever since the assassination of President Sadat of Egypt -- one of the most enthusiastic of the creators -- 20 years ago.

4. According to you, an attack against Afganistan, is "a war against terrorism"?

An attack against Afghanistan will probably kill a great many innocent civilians, not Taliban but their victims, possibly enormous numbers in a country where millions are already on the verge of death from starvation. It will also answer bin Laden's most fervent prayers, as Washington is hearing from foreign leaders, specialists on the region, and presumably its own intelligence agencies. Such an attack will be a massive crime in itself, and will very likely escalate the cycle of violence, including new acts of terror directed against the West, possibly with consequences even more horrifying than those of September 11. The dynamics are, after all, very familiar.

5. Could you imagine how the situation would be if the terrorist's attack in the USA had happened during the night, when very few people would be in the WTC? In other words, if there were very few victims, would the American government react in the same way? Up to what point is it

influenced by the symbolism of this disaster, the fact that the Pentagon and the Twin Towers were hit?

I doubt that it would have made any difference. It would have been a terrible crime even if the toll had been much smaller. The Pentagon is more than a "symbol," for reasons that need no comment. As for the World Trade Center, we scarcely know what the terrorists had in mind when they bombed it in 1993 and destroyed it last week, but we can be quite confident that it had little to do with such matters as "globalization," or "economic imperialism," or "cultural values," matters that are utterly unfamiliar to bin Laden and his associates and of no concern to them, just as they are, evidently, not concerned by the fact that their atrocities over the years have caused great harm to poor and oppressed people in the Muslim world and elsewhere, again on September 11. Among the immediate victims are Palestinians under military occupation, as they surely must have known. Their concerns are different, and bin Laden, at least, has been eloquent enough in expressing them in many interviews: to overthrow the corrupt and repressive regimes of the Arab world and replace them with properly "Islamic" regimes, to support Muslims in their struggles against "infidels" in Saudi Arabia (which he regards as under US occupation), Chechnya, Bosnia, western China, North Africa, and Southeast Asia; maybe elsewhere.

It is convenient for Western intellectuals to speak of "deeper causes" such as hatred of Western values and progress. That is a useful way to avoid questions about the origin of the bin Laden network itself, and about the practices that lead to anger, fear and desperation throughout the region, and provide a reservoir from which radical Islamicist terrorist cells can sometimes draw. Since the answers to these questions are rather clear, and are inconsistent with preferred doctrine, it is better to dismiss the questions as "superficial" and "insignificant," and to turn to "deeper causes" that are in fact more superficial even insofar as they are relevant.

6. Are we assisting to a war? Should we call it a war?

There is no precise definition of "war." People speak of the "war on poverty," the "drug war," etc. What is taking shape is not a conflict among states, though it could become one: the US has warned, loud and clear, that the nations of the world face a "stark choice": join us in our crusade or "face the certain prospect of death and destruction" (RW Apple, NYTimes, Sept. 14). If the US literally follows through on that threat, or anything like it, there will be war on an extraordinary scale. I think that is highly unlikely, but not excluded.

7. Is it a conventional war? A new one, a crusade, as Mr. Bush said, or simply an act of terror?

It is neither "new," nor a "war against terrorism." We should not forget that the Reagan administration came into office 20 years ago announcing that a primary focus of foreign policy would be the threat of "international terrorism," and it reacted to this threat with programs of international terrorism on a remarkable scale, even leading to a World Court condemnation of the US for "unlawful use of force" (i.e., international terrorism).

What happened on Sept 11 was, unquestionably, a horrifying crime. There are proper ways to respond to crimes, great or small, in accord with US domestic and international law, and there are precedents; for example the one I just mentioned. Nicaragua presumably could have reacted to Washington's terrorist war by setting off bombs in Washington. Instead, it approached the World Court, which issued the judgment that I just cited. The US of course dismissed the Court with contempt. Its response was to escalate the terrorist attack, and to veto a Security Council resolution calling on all states to observe international law, then voting against a similar General Assembly resolution (alone with Israel and El Salvador; the following year Israel alone). The US could choose to adhere to its obligations under international law as well, and of course would face no barriers. That is by no means the only example. When the US attacked Sudan in 1998, destroying the facilities that produce half its pharmaceutical supplies (which it could not replenish), causing the death of unknown numbers of people, Sudan approached the Security Council, but the US refused to permit even an inquiry. When IRA bombs were set off in London, there was no call to bomb the US, the source of most of the financial support for the IRA. Rather, efforts were made to deal with what lay behind the resort to terror. When a federal building was blown up in Oklahoma City, there were calls for bombing the Middle East, and it probably would have happened if the source turned out to be there. When it was found to be a militia-based bombing, there was no call to obliterate Montana and Idaho, where most of the ultra-right militias are based. Rather, there was a search for the perpetrator, who was found, brought to court and sentenced, and there were efforts to understand the grievances that lie behind such crimes and to address the problems. Just about every crime -- whether a robbery in the streets or colossal atrocities -- has reasons, and commonly we find that some of them are serious and should be addressed.

These are the proper ways to respond to criminal acts, whether by individuals or by states.

8. Can we talk of the clash between two civilizations?

This is fashionable talk, but it makes little sense. Suppose we briefly review some familiar history.

The most populous Islamic state is Indonesia, a favorite of the US

ever since Suharto took power in 1965, as army-led massacres slaughtered hundreds of thousands of people, mostly landless peasants, with the assistance of the US and with an outburst of euphoria from the West that was unconstrained, and is so embarrassing in retrospect that it has been effectively wiped out of memory. Suharto remained "our kind of guy," as the Clinton administration called him, as he compiled one of the most horrendous records of slaughter, torture, and other abuses of the late 20th century. The most extreme Islamic fundamentalist state, apart from the Taliban, is Saudi Arabia, a US client since its founding. In the 1980s, the US along with Pakistani intelligence (helped by Saudi Arabia, Britain, and others), recruited, armed, and trained the most extreme Islamic fundamentalists they could find to cause maximal harm to the Russians in Afghanistan. As Simon Jenkins observes in the _London Times_, those efforts "destroyed a moderate regime and created a fanatical one, from groups recklessly financed by the Americans." One of the beneficiaries was Osama Bin Laden. Also in the 1980s, the US and UK gave strong support to their friend and ally Saddam Hussein -- more secular, to be sure, but on the Islamic side of the "clash" -- right through the period of his worst atrocities, including the gassing of the Kurds, and beyond.

Also in the 1980s the US fought a major war in Central America, leaving some 200,000 tortured and mutilated corpses, millions of orphans and refugees, and four countries devastated. A prime target of the US attack was the Catholic Church, which had offended the self-described "civilized world" by adopting "the preferential option for the poor."

In the early 90s, primarily for cynical great power reasons, the US selected Bosnian Muslims as their Balkan clients, to their enormous harm.

Without continuing, exactly where do we find the divide between "civilizations." Are we to conclude that there is a "clash of civilizations" with the Catholic Church on one side, and the US and the most murderous and fanatic religious fundamentalists of the Islamic world on the other side? I do not of course suggest any such absurdity. But exactly what are we to conclude, on rational grounds?

9. Do you think we are using the word civilization properly? Would a really civilized world lead us to a global war like this?

It is said that Gandhi was once asked what he thought of Western civilization, and answered that he felt it might be a good idea. No civilized society would tolerate anything I have just mentioned, which is of course only a tiny sample even of US history, and European history is even worse. And surely no "civilized world" would plunge the world into a major war instead of following the means prescribed by international law, following ample precedents.

10. How do you see the imminent future? What do you expect to happen now?

The US might follow the course it has proclaimed, attacking Afghanistan and probably killing a great many innocent civilians, not Taliban but their victims, possibly enormous numbers in a country where millions are already on the verge of death from starvation. By doing so, it will also answer bin Laden's most fervent prayers, as Washington is hearing from foreign leaders, specialists on the region, and presumably its own intelligence agencies. Such an attack will be a massive crime in itself, and will very likely escalate the cycle of violence, including new acts of terror directed against the West, possibly with consequences even more horrifying than those of September 11. The dynamics are, after all, very familiar.

Or, the US might heed the warnings that it is receiving, for example, from the French foreign minister, who warned that the US would be falling into a "diabolical trap" set by bin Laden if it massacred innocents in Afghanistan.

I would not venture a prediction. But there clearly are choices within the spectrum just indicated.

11. Which political consequences do you believe this conflict will have in a long term? What kind of world will our sons and daughters heritage from us?

That depends on which course is chosen. The consequences of one or another choice are not certain, but we can make some rather plausible estimates.

12. What do you think the terrorists tried to do or say with the attacks?

I presume no one knows the answer better than the CIA, who helped establish and train the terrorist networks, and has been well acquainted with them since the first time that they turned against their creators, in 1981, when they assassinated President Sadat of Egypt. Or two years later, when one suicide bomber, perhaps with links to the same networks, drove the US military out of Lebanon. And on many occasions since. They have also been quite clear in articulating their goals, particularly bin Laden himself, in many interviews over the past 10 years: to overthrow the corrupt and repressive regimes of the Arab world and replace them with properly "Islamic" regimes, to support Muslims in their struggles against "infidels" in Saudi Arabia (which he regards as under US occupation), Chechnya, Bosnia, western China, North Africa, and Southeast Asia; maybe elsewhere. Their terrorist activities have been very harmful to the poor and oppressed majority, but that is not their concern, and they know that they can draw from the reservoir of desperation, fear, and anger that in significant measure results from US policies, as people

of the region, including the most pro-American of them, are well aware.

13. The attacks have been called an act of hate. Where do you think this hate comes from?

For the radical Islamists mobilized by the CIA and its associates, the hate is just what they express. The US was happy to support their hatred and violence when it was directed against US enemies; it is not happy when the hatred it helped nurture is directed against the US and its allies, as it has been, repeatedly, for 20 years. For the population of the region, quite a distinct category, the reasons for their feelings are not obscure. The sources of those sentiments are also quite well known. The Wall Street Journal recently reviewed the attitudes of "moneyed Muslims": bankers, professionals, businessmen, pro-American but severely critical of US policies in the region. They deplored Washington's support for harsh and repressive regime, its opposition to democratic tendencies, and the barriers it places to independent economic development by "propping up oppressive regimes." But their primary concern was Washington's decisive support for Israel's harsh and brutal military occupation, a policy that is even more shocking by contrast to the devastating US assault against the civilian society of Iraq, a huge crime against innocent people that also happens to strengthen Saddam Hussein. Similar sentiments prevail, though in much harsher terms, among the great majority outside the narrow circles of privilege. They do not, of course, share the comforting illusions prevalent in the US about the "generous" and "magnanimous" offers at Camp David, let alone other favored myths.

14. Do you think innocent people and civilians are going to pay for the attacks?

Yes, exactly as in the past. Who have been the victims of the crimes I have already mentioned, a minuscule sample?

15. What do you think about the European attitude in the conflict?

Like virtually everyone, Europeans reacted with justified horror, shock, and dismay to the terrorist atrocities. But for Europe and its Northamerican offshoot, these came as a particular shock. The crimes have been described as something new in modern history, and that is correct -- not in scale, regrettably, but in the target.. For the US, this is the first time since the War of 1812 that its national territory has been under attack, even threat. Its colonies have been attacked, but not the national territory itself. During these years the US virtually exterminated the indigenous population, conquered a large part of Mexico, intervened violently in the surrounding region, conquered Hawaii and the Philippines (killing hundreds of thousands of Filipinos), and in the past half century particularly, extended its resort to force throughout much

of the world. The number of victims is colossal. For the first time, the guns have been directed the other way. The same is true, even more dramatically, of Europe. Europe has suffered murderous destruction, but from internal wars, meanwhile conquering much of the world with extreme brutality. It has not been under attack by its victims outside, with rare exceptions. It is therefore natural that NATO should quickly rally to the support of the US; hundreds of years of imperial violence have an enormous impact on the intellectual and moral culture.

Nevertheless, European leaders, and to some extent public commentary, have been warning the US not to react with extreme violence. They have not, I believe, gone as far as President Mubarrak of Egypt, who urged the US to provide credible evidence before launching an attack, and to operate within the framework of international law -- and recall that Egypt, one of the initial creators of the terrorist networks, has suffered bitterly from its atrocities for 20 years. However, Europe has been, so far, a restraining force, with variations of course.

16. What do you suggest the citizens of the Western World could do to make peace come back?

That depends what these citizens want. If they want an escalating cycle of violence, in the familiar pattern, they should certainly call on the US to fall into bin Laden's "diabolical trap" and massacre innocent civilians. If they want to reduce the level of violence they should use their influence to direct the great powers in a very different course, the one I outlined earlier, which, again, has ample precedents. That includes a willingness to examine what lies behind the atrocities. One often hears that we must not consider these matters, because that would be justification for terrorism, a position so foolish and destructive as scarcely to merit comment; but unfortunately common (this morning's New York Times, Sept. 21, for example, on the part of a respected intellectual). But if we do not wish to contribute to escalating the cycle of violence, with targets among the rich and powerful as well, that is exactly what we must do, as in all other cases, including those familiar enough in Spain.

17. Who do you think is going to be benefited from this conflict?

Such atrocities commonly benefit the harshest and most repressive elements on both sides, just as a massive retaliation against civilians is widely expected to benefit the terrorist networks. In this case, the Sept. 11 atrocities were a crushing blow against Palestinians living under military occupation, and Israel made no effort to conceal its satisfaction in exploiting a "window of opportunity" (as it was openly described) to tighten its grip on Palestinians. The Bush administration at once moved to exploit the opportunity to ram through its own agenda: militarization, including "missile defense," a code phrase for militarization of space;

undermining social democratic programs and concerns over environmental issues, the harsh effects of corporate "globalization," and so on; instituting measures that will intensify the transfer of wealth to very narrow sectors (e.g., eliminating the capital gains tax); regimenting the society so as to eliminate discussion and protest. That is all natural, and to be expected. Escalation of violence is likely to have similar effects, on all sides. Again, the dynamics are familiar.

> 18. What did you think of these terrorist attacks? Where they predictible?

The attacks were an atrocious crime against humanity. No one seriously doubts that. That something of this scale and sophistication could take place, no one could have predicted. That includes the world's intelligence agencies, which monitor very closely the activities of the terrorist networks that are presumably responsible. Bear in mind as well that the leading intelligence agencies know a great deal about the terror networks, if only because they helped establish them and observed their criminal activities closely while continuing to provide them with massive aid and training . But although an assault of this nature was surely not anticipated, that some kind of terrorist attack might take place is a surprise to no one who has been paying attention to US policies in the Middle East region.

> 19. Did the US 'ask for' these attacks? Are they a consequences of American politics?

The attacks are not "consequences" of US policies in any direct sense. But indirectly, of course they are consequences; that is not even controversial. There seems little doubt that the perpetrators come from the terrorist network that has its roots in the mercenary armies that were organized, trained, and armed by the CIA, Pakistani intelligence, Egypt, Saudi Arabia, and others (with initiatives from French intelligence too) in order to fight a Holy War against the Russian invaders in Afghanistan. The backgrounds of all of this remain somewhat murky. President Carter's National Security Adviser, Zbigniew Brzezinski, has boasted that he was responsible for drawing the Russians into an "Afghan trap" (his words) by initiating support for Mujahideen fighting the government in mid-1979, six months before the Russian invasion. China and Iran were also apparently active in 1978-79 in similar activities, joining later with the US-centered operation. It is possible that Brzezinski is simply bragging about his brilliance in helping unleash the monster that has been causing havoc around much of the world since, but there may be something to his story. There is no doubt that these operations were underway at an enormous scale from early 1980. And it is not surprising that the CIA and its associates preferred the most extreme

radical elements that they could round up from North Africa, Saudi Arabia, and elsewhere, to form the core of their "Afghanis," who were forged into a mercenary army of hundreds of thousands, armed with advanced weapons. These radical Islamists (called "fundamentalists," in much Western commentary) were the most fanatic and dedicated killers. And the "blowback," to borrow the CIA's term, began at once. In 1981, radical Islamists with "Afghani" roots assassinated President Sadat of Egypt, one of the most enthusiastic creators of the "Afghanis". In 1983, a single suicide bomber, possibly with indirect links to the same growing networks, effectively drove the US military out of Lebanon. Since then, particularly in the 1990s, they have spread terror around much of the world. Their great triumph was driving the Russians out of Afghanistan, at enormous cost. The end result was to "destroy a moderate regime and create a fanatical one, from groups recklessly financed by the Americans" (_London Times_ correspondent Simon Jenkins, a specialist on the region; most of the funding was apparently Saudi). "Afghanis" then joined Muslim forces fighting in Chechnya, Bosnia, Kashmir, Western China (themselves veterans of the Chinese-inspired campaigns), the Philippines, and elsewhere. They have carried out murderous terror attacks in the countries where the regimes are their main enemies, Saudi Arabia and Egypt. And in the 1990s, against the United States, which, according to bin Laden and his associates, have been occupying Saudi Arabia much as the Russians occupied Afghanistan, since the US established permanent military bases there. And the US of course is the prime backer of the corrupt and brutal Saudi regime, and others like it in the region -- none of them "Islamist" by the standards of the terrorist monster that was created by the West for its own purposes.

Furthermore, as is common knowledge among anyone who pays attention to the region, the terrorists draw from a reservoir of desperation, anger, and frustration that extends from rich to poor, from secular to radical Islamist. That it is rooted in no small measure in US policies is evident, and constantly articulated to those willing to listen.

20. Why are the US so much hated in the Middle East? Support for Israeli occupation, support of repressive Arab regimes, sanctions against civilian populations in Irak, arrogance, US as a symbol (of what?), religious reasons?

The _Wall Street Journal_ (Sept. 14) published a survey of opinions of wealthy and privileged Muslims in the Gulf region (bankers, professionals, businessmen with close links to the US). They strongly support the general policies that the US is advancing throughout the world: corporate globalization, and all the rest. But they bitterly resent US policies in the Middle East. Their primary grievance is the massive US military, diplomatic, and economic support for Israel's brutal military occupation,

now in its 35th year, a stand that contrasts sharply in their minds with Washington's attack against Iraqi civilian society, devastating it while strengthening Saddam Hussein -- who, as they know, the US strongly supporter through his worst atrocities, including the gassing of the Kurds. They also object strenuously to US support for harsh, repressive and corrupt regimes throughout the region, its opposition to democratic tendencies, and its imposition of barriers against economic development by "propping up oppressive regimes." Among the great majority of people suffering deep poverty and oppression, similar sentiments are far more bitter. Though the bin Laden network and others like them cause immense harm to the people of the region, nonetheless their denunciation of the brutal and corrupt regimes, and their condemnation of US policies, surely has ample resonance.

21. You said that the main practitioners of terrorism are countries like the US which use violence for political motives. When and where?

I find the question baffling. The US is, after all, the only country condemned by the World Court for international terrorism -- for "the unlawful use of force" for political ends, as the Court put it, ordering the US to terminate these crimes and pay substantial reparations. The US of course dismissed the Court's judgment with contempt, reacting by escalating the terrorist war against Nicaragua and vetoing a Security Council resolution calling on all states to observe international law (and voting alone, with Israel, against similar General Assembly resolutions). The terrorist war expanded in accordance with the official policy of attacking "soft targets" -- undefended civilian targets -- instead of engaging the Nicaraguan army. That was only a small component of Washington's terrorist wars in Central America in that terrible decade, leaving 200,000 corpses and four countries in ruins. In the same years the US was carrying out large-scale terrorism elsewhere, including the Middle East: to cite one example, the car-bombing in Beirut in 1985 outside a Mosque, timed to kill the maximum number of civilians, with 80 dead and 200 casualties, aimed at a Muslim Sheikh, who escaped. And it supported much worse terror: for example, Israel's invasion of Lebanon that killed some 18,000 Lebanese and Palestinian civilians, not in self-defense, as was conceded at once; and the vicious "iron fist" atrocities of the years that followed, directed against "terrorist villagers," as Israel put it. And the subsequent invasions of 1993 and 1996, both strongly supported by the US (until the international reaction to the Qana massacre in 1996, which caused Clinton to draw back). The post-1982 toll in Lebanon alone is probably another 20,000 civlians. In the 1990s, the US provided 80% of the arms for Turkey's vicious counterinsurgency campaign against Kurds in its southeast region, killing tens of thousands, driving 2-3 million out of their homes, leaving 3500 villages

destroyed (10 times Kosovo under NATO bombs), and with every imaginable atrocity. The arms flow had increased sharply in 1984 as Turkey launched its terrorist attack and began to decline to previous levels only in 1999, when the atrocities had achieved their goal. In 1999, Turkey fell from its position as the leading recipient of US arms (Israel-Egypt aside), replaced by Colombia, the worst human rights violator in the hemisphere in the 1990s and by far the leading recipient of US arms and training, following a consistent pattern. In East Timor, the US (and Britain) continued their support of the Indonesian aggressors, which had already wiped out about 1/3 of the population with their crucial help (France as well). That continued right through the atrocities of 1999, with thousands murdered even before the September assault that drove 85% of the population from their homes and destroyed 70% of the country -- while the Clinton administration kept to its position that it is the responsibility of the Indonesians, and we don't want to take that away from them. It was only after enormous pressure that the Administration informed the Indonesians that the game was over, at which point they immediately withdrew, revealing the latent power that was always there had the US not been committed to support for Indonesian mass murderers. In 1998, in one of the minor episodes of US terrorism, Clinton destroyed half the pharmaceutical supplies in Sudan and the facilities for replenishing them, with a casualty toll that must be enormous, though no one knows, because the US blocked a UN inquiry and Western intellectuals evidently are not concerned about such trivialities: similar attacks in France, or Israel, or the US would presumably lead to a different reaction, though the comparison is unfair, because these are rich countries with ample supplies that can easily be replenished. I have already mentioned the devastation of Iraqi civilian society, with about 1 million killed, over half of them young children -- "a very hard choice, but the price - we think the price is worth it," as Secretary of State Madeleine Albright explained on prime time TV a few years ago. This is only a small sample.

I am, frankly, surprised that the question can even be raised -- particularly in France, which has made its own contributions to massive state terror and violence, surely not unfamiliar.

22. You said if the Clinton doctrine on retaliation is to be taken litterally, some countries would have the right to set off bombs in Washington . Could you explain this.

I don't recall ever referring to a "Clinton doctrine on retaliation," but if you have in mind official US policy, in all administrations, the explanation seems transparent. Merely to take a single example -- uncontroversial because of the World Court ruling -- according to US doctrine, after Washington had rejected the orders of the World Court and the

Security Council, and escalated its terrorist war, Nicaragua should have set off bombs in Washington. And after Washington's decisive support for Israeli atrocities in Lebanon and the occupied territories, the victims should be doing the same. And so on. This is just simple logic. If the doctrine is accepted -- not just for ourself, but for others -- the conclusions follow at once.

23. There are rather unanime reactions in the US? Do you share them, partly or completely?

If you mean the reaction of outrage over the horrifying criminal assault, and sympathy for the victims, then the reactions are virtually unanimous everywhere, including the Muslim countries. Of course every sane person shares them completely, not "partly." If you are referring to the calls for a murderous assault that will surely kill many innocent people -- and, incidentally, answer bin Laden's most fervent prayers -- than there is no such "unanimous reaction," despite superficial impressions that one might derive from watching TV. As for me, I join a great many others in opposing such actions. A great many. The New York Times surveyed opinion in the streets of New York, and at a memorial for the victims, discovering that the sentiments expressed in words and in signs were overwhelmingly opposed to a resort to violence. What majority sentiment is, no one can really say: it is too diffuse and complex. But "unanimous"? Surely not, except with regard to the nature of the crime.

24. What will be the consequences of these attacks? In the United States? Concerning the civil liberties, Defense budget, others?

Such atrocities commonly benefit the harshest and most repressive elements on both sides, just as a massive retaliation against civilians is widely expected to benefit the terrorist networks. Predictably, the Bush administration at once moved to exploit the opportunity to ram through its own agenda: militarization, including "missile defense," a code phrase for militarization of space; undermining social democratic programs and concerns over environmental issues, the harsh effects of corporate "globalization," and so on; instituting measures that will intensify the transfer of wealth to very narrow sectors (e.g., eliminating the capital gains tax); regimenting the society so as to eliminate discussion and protest. That is all natural, and to be expected. What the longer term consequences will be depends, as always, on how the population responds after the initial shock is absorbed and the efforts to inspire obedience become less effective. I suspect that the society will prove rather resilient.

25. In other countries?

It depends which countries you mean. Surely many countries will rejoice at the opportunity to enlist Washington's support for their own atroci-

ties. Commentators express much satisfaction that other countries are expressing some willingness to join Washington's "crusade against evil," but they are not explaining why. They surely know the reasons. US assistance is welcomed by Russia for crushing Chechens, by China for its wars against Muslims in Western China, by Indonesia for its continuing atrocities in Aceh and elsewhere, by India for destroying resistance to its rule in largely-Muslim Kashmir, and on, and on. If you have in mind the Middle East, the regimes that are the targets of bin Laden's wrath and despised many of their own citizens will be inclined to join Washington's assault against their enemies, but they are also wary of the consequences. They doubtless agree with Foreign Minister Vedrine about the "diabolical trap" laid by bin Laden, who reiterated what has been stressed by specialists on the region and presumably US intelligence agencies. They understand the likely consequences of a ground war in Afghanistan, and understand as well that the massacre of Afghanis -- not Taliban, but their victims -- will only help bin Laden and others like him to enlist others in the horrendous cause, the familiar dynamic of an escalating cycle of violence.

We cannot be confident about consequences, just as Washington planners cannot be. But there are plausible assessments of the likely consequences of the various choices that Washington and its allies might make.

> 26. What shoud the US government do now? What can they do? And the European countries?

It should follow the rule of law and its treaty obligations, a course for which there are ample precedents. For example the case of Nicaragua, just mentioned -- and recall that the US attack against Nicaragua was a serious affair, leaving tens of thousands killed and the country ruined. True, Nicaragua's efforts to follow the rule of law were blocked by a violent superpower, but no one will block the US. That is far from the only example. If half the pharmaceutical facilities and supplies in the US were destroyed by the bin Laden network, the crime would be considered horrendous, and there might be a violent response. Sudan however, went to the UN, where it was of course blocked by its attacker. When IRA bombs went off in London, the government did not send the RAF to bomb the source of their finances; where I live in Boston, for example. Even if that had been feasible, it would have been criminal idiocy. A more constructive response was to consider realistically the background concerns and grievances, and to try to deal with them seriously, while at the same time following the rule of law to punish criminals. Or take the bombing of the Federal building in Oklahoma City. There were immediate calls for bombing the Middle East, and it probably would have taken place if there had been even a remote hint of a connection. When the perpetrator was

found to be a militia sympathizer, there was no call to obliterate Montana and Idaho and Texas, and other places where the ultra-right militias are based. Rather, there was a search for the perpetrator, who was found, brought to court and sentenced, and to the extent that the reaction was sensible, there were efforts to understand the grievances that lie behind such crimes and to address the problems.

Just about every crime -- whether a robbery in the streets or colossal atrocities -- has reasons, and commonly we find that some of them are serious and should be addressed. At least, that is the course we follow if we have any concern for right and justice, and hope to reduce the likelihood of further atrocities rather than increase it. The same principles hold quite generally, with due attention to variation of circumstances. Specifically, they hold in this case.

There are lawful and proper ways to proceed in the case of crimes, including horrifying crimes of international terrorism -- of which this, regrettably, is not the first example.

As for the European countries, they do not need my advice.

INTERVIEW 05

> 1. Do you condemn terrorism? How can we decide which act is terrorism and which one is an act of resistance of a desperate nation against a tyrant or an occupying force? In which of the previous categories do you "classify" the recent strike against usa?

I understand the term "terrorism" exactly in the sense defined in official us documents: "the calculated use of violence or threat of violence to attain goals that are political, religious, or ideological in nature. This is done through intimidation, coercion, or instilling fear."

In accord with this -- entirely appropriate -- definition, the recent attack on the us is certainly an act of terrorism, in fact, a horrifying terrorist crime. There is scarcely any disagreement about this throughout the world, nor should there be.

But alongside the literal meaning of the term, as just quoted from us official documents, there is also a propagandistic usage, which unfortunately is the standard one: the term "terrorism" is used to refer to terrorist acts committed by enemies against us or our allies. Political scientist Michael Stohl is quite correct when he writes that "we must recognize that by convention -- and it must be emphasized only by convention -- great power use and the threat of the use of force is normally described as coercive diplomacy and not as a form of terrorism," though

it commonly involves "the threat and often the use of violence for what would be described as terroristic purposes were it not great powers who were pursuing the very same tactic."

This propagandistic use is virtually universal. Everyone "condemns terrorism," in this sense of the term. The Nazis harshly condemned terrorism, and carried out counter-terrorism against the terrorist partisans -- in Greece, for example. The US basically agreed. It organized and conducted similar "counter-terrorism" in Greece and elsewhere in the postwar years. Furthermore, us counterinsurgency programs drew quite explicitly from the Nazi model, which was treated with respect: Wehrmacht officers were consulted and their manuals were used in designing postwar counterinsurgency programs worldwide, typically called "counter-terrorism."

Given these conventions, even the very same people and actions can quickly shift from "terrorists" to "freedom fighters" and back again. That's been happening right next door to Greece in recent years. The kla-uck were officially condemned by the us as "terrorists" in 1998, because of their attacks on Serb police and civilians in an effort to elicit a disproportionate and brutal Serbian response, as they openly declared. As late as January 1999, the British -- the most hawkish element in nato on this matter -- believed that the kla-uck was responsible for more deaths than Serbia, which is hard to believe, but at least tells us something about perceptions at high levels in nato. If one can trust the voluminous documentation provided by the state department, nato, the osce, and other western sources, nothing materially changed on the ground until the withdrawal of the kvm monitors and the bombing in late march 1999. But policies did change: the us and UK decided to launch an attack on Serbia, and the "terrorists" instantly became "freedom fighters." after the war, they became "terrorists," "thugs," and "murderers" as they carried out similar actions in Macedonia, a us ally.

Everyone condemns terrorism, but we have to ask what they mean. You can find the answer to your question about my views in many books and articles that i have written about terrorism in the past several decades, though i use the term in the literal sense, and hence condemn all terrorist actions, not only those that are called "terrorist" for propagandistic reasons.

It should be unnecessary to point out that massive terrorism is a standard device of powerful states, just as Stohl observes. Some cases are not even controversial. Take the us war against Nicaragua, leaving tens of thousands dead and the country in ruins. Nicaragua appealed to the world court, which condemned the us for international terrorism ("the unlawful use of force"), ordering it to desist and pay substantial reparations. The us responded to the court ruling by sharply escalating the war, and vetoing a security council resolution calling on all states to

observe international law. The escalation included official orders to attack "soft targets" -- undefended civilian targets, like agricultural collectives and health clinics -- and to avoid the Nicaraguan army. The terrorists were able to carry out these instructions, thanks to the completely control of Nicaraguan air space by the us and the advanced communications equipment provided to them by their supervisors.

It should also be recognized that these terrorist actions were widely approved. One prominent commentator, Michael Kinsley, at the liberal extreme of the mainstream, argued that we should not simply dismiss state department justifications for terrorist attacks on "soft targets": a "sensible policy" must "meet the test of cost-benefit analysis," an analysis of "the amount of blood and misery that will be poured in, and the likelihood that democracy will emerge at the other end" -- "democracy" as the US understands the term, an interpretation illustrated quite clearly in the region. It is taken for granted that US elites have the right to conduct the analysis and pursue the project if it passes their tests. When the terrorist project succeeded, and Nicaragua succumbed, Americans were "united in joy," the New York Times proclaimed, knowing full well how the goal was achieved. As Time magazine put it joyfully, the methods were to "wreck the economy and prosecute a long and deadly proxy war until the exhausted natives overthrow the unwanted government themselves," with a cost to us that is "minimal," leaving the victim "with wrecked bridges, sabotaged power stations, and ruined farms," and thus providing the us candidate with "a winning issue": ending the "impoverishment of the people of Nicaragua." euphoria over the achievement was unconstrained among elites.

But the US terrorist war was not "terrorism," it was "counter-terrorism" by doctrinal standards. And us standards prevail in much of the world, as a result of us power and the cost of defying it.

This is by no means the most extreme example; i mention it because it is uncontroversial, given the world court decision, and because the failed efforts of nicaragua to pursue lawful means, instead of setting off bombs in washington, provide a model for today, not the only one.

2. There are (in the light of the recent terrorist attack) a lot of debate and controversy here in Greece (and i suppose in other countries) that in the wholeness of human history, there had not been a single superpower with ethics. Many analysts, historians, politicians and intellectuals claim that superpowers, nations, states and all the other human institutes are interested only in becoming bigger, stronger. In other words, power and authority have nothing to do with values, ethics and ideas. They have only to do with more power, more money, much greater force, and much greater authority. Do you believe that? Do we have an historic example of an empire, a state, a superpower that dealt with the rest of the world and the citizens having in mind human values?

I am frankly surprised that there is even a debate. States are not moral agents. They are systems of power, which respond to the internal distribution of power. Human beings, however, are moral agents, and can impose significant constraints on the violence of their own states, particularly in societies that are more free. They may fail to do so; the international behavior of classical Athens was hardly delightful, to mention one case, and we need not speak of the examples of modern history. But they can do so, and often do. Of course, virtually every system of power describes itself as deeply humane and pursuing the highest values, and a primary task of elite intellectuals is to lead the chorus of self-acclaim, as they commonly do. That is another story, which should be just as familiar, right up to the present moment. I have two recent books reviewing how "the herd of independent minds" (Harold Rosenberg's apt description of intellectual elites) fulfilled their function in the past few years, perhaps establishing new records in disgracing the intellectual vocation.

> 3. It is obvious that American politicians and intelligence officers know many things that we don't about this tragedy. In many cases we will hear half-true facts and straightforward lies. I've read in many articles and book of yours that when a politician tells a lie, in a short time he comes to believe it! (forgive me for not quoting you exactly). A) how can we explain this attitude? B) which do you think that are the biggest lies and half true facts we heard until now for this tragedy?

I have to disagree. I doubt that us intelligence knows much that others cannot discover. That is quite commonly the case, as we learn from a rich record of declassified documents, and the record of history as well. But public officials, and the obedient chorus, are not expected to tell the truth about what they know. Rather, they are supposed to proclaim that we were targeted because of our magnificence: "they hate us because we champion a `new world order' of capitalism, individualism, secularism and democracy that should be the norm everywhere" (respected liberal intellectual ronald steel, ny times, sept. 14).

Anyone who pays minimal attention to the facts knows that the reasons are quite different, not only among the terrorist networks that the CIA helped to organize, arm, train and nurture for a holy war against the Russians, but even among wealthy, privileged, and pro-American sectors of the population. The same day, the wall street journal published a review of opinions of "moneyed Muslims" in the region: bankers, professionals, businessmen. They expressed dismay and anger about us support for harsh authoritarian states and the barriers that Washington places against independent development and political democracy by its policies of "propping up oppressive regimes." their primary concern, however, was Washington's twin policies of support for Israel's harsh and brutal military occupation and devastation of the civilian society of iraq, with hun-

dreds of thousands of deaths, while strengthening Saddam Hussein -- who they know very well received strong support from Washington and London through the period of his worst atrocities, including the gassing of the Kurds and beyond. Among the great mass of poor and suffering people, similar sentiments are much more bitter, and they are also hardly pleased to see the wealth of the region flow to the west and to small western-oriented elites and corrupt and brutal rulers backed by western power.

Bin Laden has issued the same charges -- just a few days ago once again, in a long interview on the only independent Arab radio channel, rebroadcast by bbc. He and his associates, however, have other goals: in their words, driving "foreign invaders" out of Muslim lands, replacing the corrupt and repressive regimes by true "Islamic" ones, and defending Muslims fighting for their rights in Chechnya, Bosnia, Kashmir, western china, the Philippines, and elsewhere. All of this they see as a continuation of the holy war against the Russians that they fought with the support of the CIA, Saudi Arabia, and others who they regard as enemies of Islam.

4. We see that, nowadays, the value of human life is getting... Depreciated rapidly. Do you think that this phenomenon will continue to scale? The US government (and the western word in general) does consider human life as a valuable "asset"?

Again, i do not agree. What was the value of human life throughout the whole history of European imperialism? For example, when the US was expanding to its national borders, overcoming "that hapless race of Native Americans, which we are exterminating with such merciless and perfidious cruelty," to quote president John Quincy Adams, long after his own substantial contributions to the enterprise he came to regret, but before further inglorious exploits. What was the value of human life when king Leopold of Belgium killed 10 million Congolese? Or when 1/3 of the population of Germany was killed in one 17th century war, not to speak of more recent examples? In fact we can go back as far as we like. Everyone is, or should be, familiar with the exaltation of genocide in the holiest books of western civilization.

5. Now, as far as this strike against Manhattan and the pentagon is concerned. How do you judge the coverage of the tragedy by the US media? How do you comment on the explanation given by many us media that "the terrorists struck USA because they hate western values (civil liberties, tolerance, welfare, etc).

The second question we can simply dismiss. It is self-serving nonsense, and its purveyors surely know that, at least if they have any familiarity the current history, including the middle east. Naturally, these are convenient pretenses, which serve to deflect attention from the actual

grievances expressed even by the most pro-western elements in the middle east, as is "well-known" (in the words of the wall street journal article i quoted).

As for the media, we have to ask how they dealt with the basic questions that arise in the case of crimes, small or horrendous: who was responsible? What should the response be? Why did it happen? There has been virtually no discussion of any of these questions. The request of the Arab league, China, even nato that the us present credible evidence is dismissed as an absurdity, and in the case of the Taliban, further evidence of their criminality. The us will produce a white paper, which perhaps will be accepted by its allies, though the evidence is hardly likely to be more persuasive than it was after earlier terrorist bombings attributed to these terrorist networks -- probably correctly, but judgments are not evidence. As for what should be done, there is virtually no discussion of the lawful course that was pursued by Nicaragua, among others: when our leaders call for violence, we must applaud their courage and integrity. As for why, apart from a few exceptions like the wall street journal, several times, there is very little in the mainstream.

6. What do you think is: a) best case scenario. B) worst case scenario. C) the most probable scenario.

The proper reaction is to pursue the lawful course: Nicaragua is hardly the only precedent -- and bear in mind that the terrorist attack it suffered was far more destructive even than the September 11 crimes. To take another case, what was the right way for Britain to deal with IRA bombs in London? One choice would have been to send the RAF to bomb the source of their finances, places like Boston, where i live. Putting aside feasibility, that would have been criminal idiocy. Another possibility was to consider realistically the background concerns and grievances, and to try to remedy them, while at the same time following the rule of law to punish criminals. Or take the bombing of the federal building in Oklahoma City. There were immediate calls for bombing the middle east, and it probably would have been done if even a remote hint of a link had been found. When the perpetrator was found to be someone with links to the ultra-right militias, there was no call to obliterate Texas, Montana, Idaho and other places where the militias are located. Rather, the perpetrator was found, brought to court and sentenced, and to the extent that the reaction was sensible, there were efforts to understand the grievances that lie behind such crimes and to address the problems. Just about every crime -- whether a robbery in the streets or colossal atrocities -- has reasons, and commonly we find that some of them are serious and should be addressed. At least, that is the course we follow if we have any concern for right and justice, and hope to reduce the likelihood of further atrocities rather than increase it. The same principles

hold quite generally. Specifically, they hold in this case.

The worst case scenario would be to carry out a massive assault that would kill many innocent people -- in Afghanistan, not Taliban but their victims. Apart from the crime itself, that would answer bin Laden's prayers, as foreign leaders, specialists on the region, and probably us intelligence agencies are advising Washington: it would serve to rally many angry and desperate people to his horrendous cause, and to escalate the cycle of violence, with outcomes that could be catastrophic. Even if bin laden is killed, such an assault would be likely to have that effect: he would become a martyr, and his voice would resound all over the Arabic-speaking world, on the thousands of cassettes that are already circulating.

7. What do you believe that was the most hideous terrorist act in history?

It is impossible to answer. It depends which crimes we decide to call "terrorism," and what time scale we select.

8. What do you think motivated the terrorists to commit such a crime? The "enemy" was in the twin towers in Manhattan, in the pentagon or somewhere else? Where was the real enemy?

As I've said, we have every reason to take them at their word. And their word is very clear, as their deeds have been, for 20 years, when the radical Islamic forces that were organized by the CIA, Egypt, Saudi Arabia, Pakistan and others, carried out their first attack against their creators, assassinating president Sadat of Egypt, one of the most enthusiastic of these.

9. Who do you believe that did it? Was he Osama bin Laden?

I presume that the source is the terrorist networks that are loosely associated with bin Laden, but we have no credible evidence about bin Laden's direct involvement; that includes, i presume, US intelligence, which monitors these organizations closely and understand them intimately from their origins in US-initiated operations in Afghanistan. These are decentralized, apparently non-hierarchical structures, extremely hard to penetrate, which is why they could carry out such a shocking atrocity without the world's intelligence systems knowing a thing about it.

10. Do you believe that this occurrence will change the policy (domestic and foreign) of the us government?

That is a matter for action, not prediction. What happens elsewhere, including Greece, can make a considerable difference.

11. What do you fear most that will occur because of the terrorist attack?

The worst fears are the "worst case scenario" mentioned, which is by no means inevitable, or even highly probable, i suspect.

12. You agree to the estimation that "in 9/11/2001 the world changed?"

Undoubtedly. The history of modern Europe and its North American offshoot is one of carrying out shocking crimes against others -- or mutual slaughter, as in the American civil war or Europe's wars. This is the first time that the guns have been pointed in the opposite direction, at least on any significant scale. The Congo did not attack Belgium, or India England, or Algeria France, or Mexico or the Philippines the United States. The atrocities of September 11 were unique, not -- regrettably -- in scale, but in the target.

13. Which do you believe that will happen to countries (such as Greece) and the Balkans in general? We read many times that bin laden has many links with kla and ethnic Albanians guerillas. Do you think that Greece (and by extension the Olympic games 2004) is in danger of terrorist attacks, guerilla warfare and generally consequences that will force the Greek government to postpone or call off the Olympic games?

That is unpredictable, but it is likely to be affected by the course that the us and its allies pursue right now. If they answer bin Laden's prayers, then the likelihood of further atrocities is increased.

14. Is Islam dangerous to the western civilization or the western way of life consists a threat to mankind?

The question is too broad and vague for me to answer. It should be clear, however, that the US does not regard Islam as an enemy, or conversely. The world's most populous Muslim state, Indonesia, has been a US favorite since the army took power in 1965, organizing a slaughter that the CIA compared to the crimes of Hitler, Stalin, and Mao, and eliciting unconstrained euphoria in the west, which continued to support the mass murderer who was in charge as he compiled one of the most awful human rights records of the late 20th century. The most extreme Islamic fundamentalist state, apart from its Taliban offshoot, is Saudi Arabia, a us client since its origins. In the Balkans, for reasons we cannot explore here, the US chose to support Muslims against Christians. In the 1980s, a prime target of the US terrorist wars in Central America, which left hundreds of thousands of corpses and four countries in ruins, was the catholic church, which had committed the grievous sin of adopting "the preferential option for the poor." the "western way of life" includes a great variety of elements, many highly admirable, many adopted with enthusiasm in the Islamic world, many criminal and even a threat to human survival.

As for "western civilization," perhaps we can heed the words attributed to Gandhi when asked what he thought about "western civilzation":

he said that it might be a good idea.

INTERVIEW 06

by Svetlana Vukovic and Svetlana Lukic of 'Radio B92', Belgrade

1. Why do you think these attacks happened?

To answer the question we must first identify the perpetrators of the crimes. It is generally assumed, plausibly, that their origin is the Middle East region, and that the attacks probably trace back to the Osama Bin Laden network, a widespread and complex organization, doubtless inspired by Bin Laden but not necessarily acting under his control. Let us assume that this is true. Then to answer your question a sensible person would try to ascertain Bin Laden's views, and the sentiments of the large reservoir of supporters he has throughout the region. About all of this, we have a great deal of information. Bin Laden has been interviewed extensively over the years by highly reliable Middle East specialists, notably the most eminent correspondent in the region, Robert Fisk (London _Independent_), who has intimate knowledge of the entire region and direct experience over decades. A Saudi Arabian millionaire, Bin Laden became a militant Islamic leader in the war to drive the Russians out of Afghanistan. He was one of the many religious fundamentalist extremists recruited, armed, and financed by the CIA and their allies in Pakistani intelligence to cause maximal harm to the Russians -- quite possibly delaying their withdrawal, many analysts suspect -- though whether he personally happened to have direct contact with the CIA is unclear, and not particularly important. Not surprisingly, the CIA preferred the most fanatic and cruel fighters they could mobilize. The end result was to "destroy a moderate regime and create a fanatical one, from groups recklessly financed by the Americans" (_London Times_ correspondent Simon Jenkins, also a specialist on the region). These "Afghanis" as they are called (many, like Bin Laden, not from Afghanistan) carried out terror operations across the border in Russia, but they terminated these after Russia withdrew. Their war was not against Russia, which they despise, but against the Russian occupation and Russia's crimes against Muslims.

The "Afghanis" did not terminate their activities, however. They joined Bosnian Muslim forces in the Balkan Wars; the US did not object, just as it tolerated Iranian support for them, for complex reasons that we need not pursue here, apart from noting that concern for the grim fate of the Bosnians was not prominent among them. The "Afghanis" are also fighting the Russians in Chechnya, and, quite possibly, are involved in

carrying out terrorist attacks in Moscow and elsewhere in Russian territory. Bin Laden and his "Afghanis" turned against the US in 1990 when they established permanent bases in Saudi Arabia -- from his point of view, a counterpart to the Russian occupation of Afghanistan, but far more significant because of Saudi Arabia's special status as the guardian of the holiest shrines.

Bin Laden is also bitterly opposed to the corrupt and repressive regimes of the region, which he regards as "un-Islamic," including the Saudi Arabian regime, the most extreme Islamic fundamentalist regime in the world, apart from the Taliban, and a close US ally since its origins. Bin Laden despises the US for its support of these regimes. Like others in the region, he is also outraged by long-standing US support for Israel's brutal military occupation, now in its 35th year: Washington's decisive diplomatic, military, and economic intervention in support of the killings, the harsh and destructive siege over many years, the daily humiliation to which Palestinians are subjected, the expanding settlements designed to break the occupied territories into Bantustan-like cantons and take control of the resources, the gross violation of the Geneva Conventions, and other actions that are recognized as crimes throughout most of the world, apart from the US, which has prime responsibility for them. And like others, he contrasts Washington's dedicated support for these crimes with the decade-long US-British assault against the civilian population of Iraq, which has devastated the society and caused hundreds of thousands of deaths while strengthening Saddam Hussein -- who was a favored friend and ally of the US and Britain right through his worst atrocities, including the gassing of the Kurds, as people of the region also remember well, even if Westerners prefer to forget the facts. These sentiments are very widely shared. The _Wall Street Journal_ (Sept. 14) published a survey of opinions of wealthy and privileged Muslims in the Gulf region (bankers, professionals, businessmen with close links to the U.S.). They expressed much the same views: resentment of the U.S. policies of supporting Israeli crimes and blocking the international consensus on a diplomatic settlement for many years while devastating Iraqi civilian society, supporting harsh and repressive anti-democratic regimes throughout the region, and imposing barriers against economic development by "propping up oppressive regimes." Among the great majority of people suffering deep poverty and oppression, similar sentiments are far more bitter, and are the source of the fury and despair that has led to suicide bombings, as commonly understood by those who are interested in the facts.

The U.S., and much of the West, prefers a more comforting story. To quote the lead analysis in the _New York Times_ (Sept. 16), the perpetrators acted out of "hatred for the values cherished in the West as freedom, tolerance, prosperity, religious pluralism and universal suf-

frage." U.S. actions are irrelevant, and therefore need not even be mentioned (Serge Schmemann). This is a convenient picture, and the general stance is not unfamiliar in intellectual history; in fact, it is close to the norm. It happens to be completely at variance with everything we know, but has all the merits of self-adulation and uncritical support for power.

It is also widely recognized that Bin Laden and others like him are praying for "a great assault on Muslim states," which will cause "fanatics to flock to his cause" (Jenkins, and many others.). That too is familiar. The escalating cycle of violence is typically welcomed by the harshest and most brutal elements on both sides, a fact evident enough from the recent history of the Balkans, to cite only one of many cases.

2. What consequences will they have on US inner policy and to the American self reception?

US policy has already been officially announced. The world is being offered a "stark choice": join us, or "face the certain prospect of death and destruction." Congress has authorized the use of force against any individuals or countries the President determines to be involved in the attacks, a doctrine that every supporter regards as ultra-criminal. That is easily demonstrated. Simply ask how the same people would have reacted if Nicaragua had adopted this doctrine after the U.S. had rejected the orders of the World Court to terminate its "unlawful use of force" against Nicaragua and had vetoed a Security Council resolution calling on all states to observe international law. And that terrorist attack was far more severe and destructive even than this atrocity.

As for how these matters are perceived here, that is far more complex. One should bear in mind that the media and the intellectual elites generally have their particular agendas. Furthermore, the answer to this question is, in significant measure, a matter of decision: as in many other cases, with sufficient dedication and energy, efforts to stimulate fanaticism, blind hatred, and submission to authority can be reversed. We all know that very well.

3. Do you expect U.S. to profoundly change their policy to the rest of the world?

The initial response was to call for intensifying the policies that led to the fury and resentment that provides the background of support for the terrorist attack, and to pursue more intensively the agenda of the most hard line elements of the leadership: increased militarization, domestic regimentation, attack on social programs. That is all to be expected. Again, terror attacks, and the escalating cycle of violence they often engender, tend to reinforce the authority and prestige of the most harsh and repressive elements of a society. But there is nothing inevitable about submission to this course.

After the first shock, came fear of what the U.S. answer is going to be. Are you afraid, too?

Every sane person should be afraid of the likely reaction -- the one that has already been announced, the one that probably answers Bin Laden's prayers. It is highly likely to escalate the cycle of violence, in the familiar way, but in this case on a far greater scale.

The U.S. has already demanded that Pakistan terminate the food and other supplies that are keeping at least some of the starving and suffering people of Afghanistan alive. If that demand is implemented, unknown numbers of people who have not the remotest connection to terrorism will die, possibly millions. Let me repeat: the U.S. has demanded that Pakistan kill possibly millions of people who are themselves victims of the Taliban. This has nothing to do even with revenge. It is at a far lower moral level even than that. The significance is heightened by the fact that this is mentioned in passing, with no comment, and probably will hardly be noticed. We can learn a great deal about the moral level of the reigning intellectual culture of the West by observing the reaction to this demand. I think we can be reasonably confident that if the American population had the slightest idea of what is being done in their name, they would be utterly appalled. It would be instructive to seek historical precedents.

If Pakistan does not agree to this and other U.S. demands, it may come under direct attack as well -- with unknown consequences. If Pakistan does submit to U.S. demands, it is not impossible that the government will be overthrown by forces much like the Taliban -- who in this case will have nuclear weapons. That could have an effect throughout the region, including the oil producing states. At this point we are considering the possibility of a war that may destroy much of human society.

Even without pursuing such possibilities, the likelihood is that an attack on Afghans will have pretty much the effect that most analysts expect: it will enlist great numbers of others to support of Bin Laden, as he hopes. Even if he is killed, it will make little difference. His voice will be heard on cassettes that are distributed throughout the Islamic world, and he is likely to be revered as a martyr, inspiring others. It is worth bearing in mind that one suicide bombing -- a truck driven into a U.S. military base -- drove the world's major military force out of Lebanon 20 years ago. The opportunities for such attacks are endless. And suicide attacks are very hard to prevent.

4. "The world will never be the same after 11.09.01". Do you think so?

The horrendous terrorist attacks on Tuesday are something quite new in world affairs, not in their scale and character, but in the target. For the US, this is the first time since the War of 1812 that its national territory has been under attack, even threat. It's colonies have been

attacked, but not the national territory itself. During these years the US virtually exterminated the indigenous population, conquered half of Mexico, intervened violently in the surrounding region, conquered Hawaii and the Philippines (killing hundreds of thousands of Filipinos), and in the past half century particularly, extended its resort to force throughout much of the world. The number of victims is colossal. For the first time, the guns have been directed the other way. The same is true, even more dramatically, of Europe. Europe has suffered murderous destruction, but from internal wars, meanwhile conquering much of the world with extreme brutality. It has not been under attack by its victims outside, with rare exceptions (the IRA in England, for example). It is therefore natural that NATO should rally to the support of the US; hundreds of years of imperial violence have an enormous impact on the intellectual and moral culture.

It is correct to say that this is a novel event in world history, not because of the scale of the atrocity -- regrettably -- but because of the target. How the West chooses to react is a matter of supreme importance. If the rich and powerful choose to keep to their traditions of hundreds of years and resort to extreme violence, they will contribute to the escalation of a cycle of violence, in a familiar dynamic, with long-term consequences that could be awesome. Of course, that is by no means inevitable. An aroused public within the more free and democratic societies can direct policies towards a much more humane and honorable course.

INTERVIEW 07

by Michael Albert, Director, ZNet, USA

(1) There has been an immense movement of troops and extreme use of military rhetoric, up to comments about terminating governments, etc. Yet, to many people there appears to be considerable restraint...what happened?

From the first days after the attack, the Bush administration has been warned by NATO leaders, specialists on the region, and presumably its own intelligence agencies (not to speak of many people like you and me) that if they react with a massive assault that kills many innocent people, that will be answering bin Laden's most fervent prayers. They will be falling into a "diabolical trap," as the French foreign minister put it. That would be true — perhaps even more so — if they happen to kill bin Laden, still without having provided credible evidence of his involvement in the crimes of Sept. 11. He would then be perceived as a martyr even among

the enormous majority of Muslims who deplore those crimes, as bin Laden himself has done, for what it is worth, denying any involvement in the crimes or even knowledge of them, and condemning "the killing of innocent women, children, and other humans" as an act that "Islam strictly forbids...even in the course of a battle" (BBC, Sept. 29). His voice will continue to resound on tens of thousands of cassettes already circulating throughout the Muslim world, and in many interviews, including the last few days. An assault that kills innocent Afghans — not Taliban, but their terrorized victims — would be virtually a call for new recruits to the horrendous cause of the bin Laden network and other graduates of the terrorist networks set up by the CIA and its associates 20 years ago to fight a Holy War against the Russians, meanwhile following their own agenda, from the time they assassinated President Sadat of Egypt in 1981, murdering one of the most enthusiastic of the creators of the "Afghanis" — mostly recruits from extremist radical Islamist elements around the world who were recruited to fight in Afghanistan.

After a little while, the message apparently got through to the Bush administration, which has — wisely from their point of view — chosen to follow a different course.

However, "restraint" seems to me a questionable word. On Sept. 16, the New York Times reported that "Washington has also demanded [from Pakistan] a cutoff of fuel supplies,...and the elimination of truck convoys that provide much of the food and other supplies to Afghanistan's civilian population." Astonishingly, that report elicited no detectable reaction in the West, a grim reminder of the nature of the Western civilization that leaders and elite commentators claim to uphold, yet another lesson that is not lost among those who have been at the wrong end of the guns and whips for centuries. In the following days, those demands were implemented. On Sept. 27, the same NYT correspondent reported that officials in Pakistan "said today that they would not relent in their decision to seal off the country's 1,400- mile border with Afghanistan, a move requested by the Bush administration because, the officials said, they wanted to be sure that none of Mr. bin Laden's men were hiding among the huge tide of refugees" (John Burns, Islamabad). According to the world's leading newspaper, then, Washington demanded that Pakistan slaughter massive numbers of Afghans, millions of them already on the brink of starvation, by cutting off the limited sustenance that was keeping them alive. Almost all aid missions withdrew or were expelled under the threat of bombing. Huge numbers of miserable people have been fleeing to the borders in terror, after Washington's threat to bomb the shreds of existence remaining in Afghanistan, and to convert the Northern Alliance into a heavily armed military force that will, perhaps, be unleashed to renew the atrocities

that tore the country apart and led much of the population to welcome the Taliban when they drove out the murderous warring factions that Washington and Moscow now hope to exploit for their own purposes. When they reach the sealed borders, refugees are trapped to die in silence. Only a trickle can escape through remote mountain passes. How many have already succumbed we cannot guess, and few seem to care. Apart from the relief agencies, I have seen no attempt even to guess. Within a few weeks the harsh winter will arrive. There are some reporters and aid workers in the refugee camps across the borders. What they describe is horrifying enough, but they know, and we know, that they are seeing the lucky ones, the few who were able to escape — and who express their hopes that "even the cruel Americans must feel some pity for our ruined country," and relent in this savage silent genocide (Boston Globe, Sept. 27, p. 1).

Perhaps the most apt description was given by the wonderful and courageous Indian writer and activist Arundhati Roy, referring to Operation Infinite Justice proclaimed by the Bush Administration: "Witness the infinite justice of the new century. Civilians starving to death while they're waiting to be killed" (Guardian, Sept. 29).

> (2) The UN has indicated that the threat of starvation in Afghanistan is enormous. International criticism on this score has grown and now the U.S. and Britain are talking about providing food aid to ward off hunger. Are they caving in to dissent in fact, or only in appearance? What is their motivation? What will be the scale and impact of their efforts?

The UN estimates that some 7-8 million are at risk of imminent starvation. The NY Times reports in a small item (Sept. 25) that nearly six million Afghans depend on food aid from the UN, as well as 3.5 million in refugee camps outside, many of whom fled just before the borders were sealed. The item reported that some food is being sent, to the camps across the border. If people in Washington and the editorial offices have even a single gray cell functioning, they realize that they must present themselves as humanitarians seeking to avert the awesome tragedy that followed at once from the threat of bombing and military attack and the sealing of the borders they demanded. "Experts also urge the United States to improve its image by increasing aid to Afghan refugees, as well as by helping to rebuild the economy" (Christian Science Monitor, Sept. 28). Even without PR specialists to instruct them, administration officials must comprehend that they should send some food to the refugees who made it across the border, and at least talk about air drop of food to starving people within: in order "to save lives" but also to "help the effort to find terror groups inside Afghanistan" (Boston Globe, Sept. 27, quoting a Pentagon official, who describes this as "winning the hearts and minds of the people"). The New York Times editors picked up the same

theme the following day, 12 days after the journal reported that the murderous operation is being put into effect.

On the scale of aid, one can only hope that it is enormous, or the human tragedy may be immense in a few weeks. But we should also bear in mind that there has been nothing to stop massive food drops from the beginning, and we cannot even guess how many have already died, or soon will. If the government is sensible, there will be at least a show of the "massive air drops" that officials mention.

> (3) International legal institutions would likely ratify efforts to arrest and try bin Laden and others, supposing guilt could be shown, including the use of force. Why does the U.S. avoid this recourse? Is it only a matter of not wishing to legitimate an approach that could be used, as well, against our acts of terrorism, or are other factors at play?

Much of the world has been asking the US to provide some evidence to link bin Laden to the crime, and if such evidence could be provided, it would not be difficult to rally enormous support for an international effort, under the rubric of the UN, to apprehend and try him and his collaborators. However, that is no simple matter. Even if bin Laden and his network are involved in the crimes of Sept. 11, it may be quite hard to produce credible evidence. As the CIA surely knows very well, having nurtured these organizations and monitored them very closely for 20 years, they are diffuse, decentralized, non-hierarchic structures, probably with little communication or direct guidance. And for all we know, most of the perpetrators may have killed themselves in their awful missions.

There are further problems in the background. To quote Roy again, "The Taliban's response to US demands for the extradition of Bin Laden has been uncharacteristically reasonable: produce the evidence, then we'll hand him over. President Bush's response is that the demand is non-negotiable'." She also adds one of the many reasons why this framework is unacceptable to Washington: "While talks are on for the extradition of CEOs can India put in a side request for the extradition of Warren Anderson of the US? He was the chairman of Union Carbide, responsible for the Bhopal gas leak that killed 16,000 people in 1984. We have collated the necessary evidence. It's all in the files. Could we have him, please?"

Such comparisons elicit frenzied tantrums at the extremist fringes of Western opinion, some of them called "the left." But for Westerners who have retained their sanity and moral integrity, and for great numbers among the usual victims, they are quite meaningful. Government leaders presumably understand that.

And the single example that Roy mentions is only the beginning, of course, and one of the lesser examples, not only because of the scale of

the atrocity, but because it was not explicitly a crime of state. Suppose Iran were to request the extradition of high officials of the Carter and Reagan administrations, refusing to present the ample evidence of the crimes they were implementing — and it surely exists. Or suppose Nicaragua were to demand the extradition of the US ambassador to the UN, newly appointed to lead the "war against terror," a man whose record includes his service as "proconsul" (as he was often called) in the virtual fiefdom of Honduras, where he surely was aware of the atrocities of the state terrorists he was supporting, and was also overseeing the terrorist war for which the US was condemned by the World Court and the Security Council (in a resolution the US vetoed). Or many others. Would the US even dream of responding to such demands presented without evidence, or even if the ample evidence were presented?

Those doors are better left closed, just as it is best to maintain the silence on the appointment of a leading figure in managing the operations condemned as terrorism by the highest existing international bodies — to lead a "war on terrorism." Jonathan Swift would also be speechless.

That may be the reason why administration publicity experts preferred the usefully ambiguous term "war" to the more explicit term "crime" — "crime against humanity as Robert Fisk, Mary Robinson, and others have accurately depicted it. There are established procedures for dealing with crimes, however horrendous. They require evidence, and adherence to the principle that "those who are guilty of these acts" be held accountable once evidence is produced, but not others (Pope John Paul II, NYT Sept. 24). Not, for example, the unknown numbers of miserable people starving to death in terror at the sealed borders, though in this case too we are speaking of crimes against humanity.

(4) The war on terror was first undertaken by Reagan, as a substitute for the cold war — that is, as a vehicle for scaring the public and thus marshalling support for programs contrary to the public's interest — foreign campaigns, war spending in general, surveillance, and so on. Now we are seeing a larger and more aggressive attempt to move in the same direction. Does the problem that we are the world's foremost source of attacks on civilians auger complications for carrying through this effort? Can the effort be sustained without, in fact, a shooting war?

The Reagan administration came into office 20 years ago declaring that its leading concern would be to eradicate the plague of international terrorism, a cancer that is destroying civilization. They cured the plague by establishing an international terrorist network of extraordinary scale, with consequences that are — or should be — well-known in Central America, the Middle East, Africa, Southeast Asia, and elsewhere — while using the pretexts, as you say, to carry out programs that were of considerable harm to the domestic population, and that even threaten human survival. Did they carry out a "shooting war"? The number of corpses

they left in their wake around the world is impressive, but technically, they did not usually fire the guns, apart from transparent PR exercises like the bombing of Libya, the first crime of war in history that was timed precisely for prime time TV, no small trick considering the complexity of the operation and the refusal of continental European countries to collaborate. The torture, mutilation, rape, and massacre were carried out through intermediaries.

Even if we exclude the huge but unmentionable component of terrorism that traces back to terrorist states, our own surely included, the terrorist plague is very real, very dangerous, and truly terrifying. There are ways to react that are likely to escalate the threats to ourselves and others; there are ample precedents for more sane and honorable methods, which we've discussed before, and are not in the least obscure, but are scarcely discussed. Those are the basic choices.

> (5) If the Taliban falls and bin Laden or someone they claim is responsible is captured or killed, what next? What happens to Afghanistan? What happens more broadly in other regions?

The sensible administration plan would be to pursue the ongoing program of silent genocide, combined with humanitarian gestures to arouse the applause of the usual chorus who are called upon to sing the praises of the noble leaders committed to "principles and values" and leading the world to a "new era" of "ending inhumanity." The administration might also try to convert the Northern Alliance into a viable force, perhaps to bring in other warlords hostile to it, like Gulbudin Hekmatyar, now in Iran. Presumably they will use British and US commandoes for missions within Afghanistan, and perhaps resort to selective bombing, but scaled down so as not to answer bin Laden's prayers. A US assault should not be compared to the failed Russian invasion of the 80s. The Russians were facing a major army of perhaps 100,000 men or more, organized, trained and heavily armed by the CIA and its associates. The US is facing a ragtag force in a country that has already been virtually destroyed by 20 years of horror, for which we bear no slight share of responsibility. The Taliban forces, such as they are, might quickly collapse except for a small hard core. And one would expect that the surviving population would welcome an invading force if it is not too visibly associated with the murderous gangs that tore the country to shreds before the Taliban takeover. At this point, most people would be likely to welcome Genghis Khan.

What next? Expatriate Afghans and, apparently, some internal elements who are not part of the Taliban inner circle have been calling for a UN effort to establish some kind of transition government, a process that might succeed in reconstructing something viable from the wreckage, if provided with very substantial reconstruction aid, channeled

through independent sources like the UN or credible NGOs. That much should be the minimal responsibility of those who have turned this impoverished country into a land of terror, desperation, corpses, and mutilated victims. That could happen, but not without very substantial popular efforts in the rich and powerful societies. For the present, any such course has been ruled out by the Bush administration, which has announced that it will not be engaged in "nation building" — or, it seems, an effort that would be more honorable and humane: substantial support, without interference, for "nation building" by others who might actually achieve some success in the enterprise. But current refusal to consider this decent course is not graven in stone.

What happens in other regions depends on internal factors, on the policies of foreign actors (the US dominant among them, for obvious reasons), and the way matters proceed in Afghanistan. One can hardly be confident, but for many of the possible courses reasonable assessments can be made about the outcome — and there are a great many possibilities, too many to try to review in brief comments.

> (6) What do you believe should be the role and priority of social activists concerned about justice at this time? Should we curb our criticisms, as some have claimed, or is this, instead, a time for renewed and enlarged efforts, not only because it is a crisis regarding which we can attempt to have a very important positive impact, but also because large sectors of the public are actually far more receptive than usual to discussion and exploration, even it other sectors are intransigently hostile?

It depends on what these social activists are trying to achieve. If their goal is to escalate the cycle of violence and to increase the likelihood of further atrocities like that of Sept. 11 — and, regrettably, even worse ones with which much of the world is all too familiar — then they should certainly curb their analysis and criticisms, refuse to think, and cut back their involvement in the very serious issues in which they have been engaged. The same advice is warranted if they want to help the most reactionary and regressive elements of the political-economic power system to implement plans that will be of great harm to the general population here and in much of the world, and may even threaten human survival.

If, on the contrary, the goal of social activists is to reduce the likelihood of further atrocities, and to advance hopes for freedom, human rights, and democracy, then they should follow the opposite course. They should intensify their efforts to inquire into the background factors that lie behind these and other crimes and devote themselves with even more energy to the just causes to which they have already been committed. The opportunities are surely there. The shock of the horrendous crimes has already opened even elite sectors to reflection of a kind that would have been hard to imagine not long ago, and among the general pub-

lic that is even more true. Of course, there will be those who demand silent obedience. We expect that from the ultra-right, and anyone with a little familiarity with history will expect it from some left intellectuals as well, perhaps in an even more virulent form. But it is important not to be intimidated by hysterical ranting and lies and to keep as closely as one can to the course of truth and honesty and concern for the human consequences of what one does, or fails to do. All truisms, but worth bearing in mind.

Beyond the truisms, we turn to specific questions, for inquiry and for action.

[Downloaded from www.znet.org]

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

Michael Albert & Stephen R. Shalom

47 Questions and Answers on The War in Afghanistan

Oct 14, 2001

আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধ-আগ্রাসনের আগেপরে যে-প্রশ্নগুলা মানুষের কথায়-চিন্তায় অহরহ ঘুরেফিরে এসেছে সেইসব প্রশ্ন আর উত্তরের এই সংকলন আমাদের মনের অনেক প্রশ্নের ফয়সালা সারতে সাহায্য করবে।

1. What is Islamic fundamentalism?

The term "fundamentalist" is used in a number of different ways. One definition is someone who interprets the texts of his or her religion in a literal way or who adheres to the original, traditional practices and beliefs of the religion. Another definition is someone who is intolerant of the views of other religions or sects. These two definitions often overlap -- traditional religions tend to be authoritarian and misogynist, which lend themselves to intolerance -- but they are not the same. (For example, some pacifist religious sects might be fundamentalist in the first sense, but not the second.) Every religion has its fundamentalists -- Muslims, Christians, Jews, Hindus, and so on -- and some of these engage in terrorism.

Fundamentalists in the second sense have been on the rise worldwide. One reason has been the absence in so much of the Third World of a meaningful Left. Without a left alternative to the oppression and alienation of modern capitalism, many have sought solace in the easy explanations and promises of intolerant religion. Left organizations in many Arab and Muslim nations have either been smashed by right-wing forces (often backed by the major Western states) or discredited by ruthless dictatorships (as in Iraq) or Soviet-style parties. In this void, fundamentalism flourished. Fundamentalism was also sup-

ported by the opportunism of various states (for example, the United States backed reactionary fundamentalists, including Osama bin Laden, against the Soviet Union in Afghanistan and aided mullahs against the left in Iran; Israel gave early backing to Hamas in an effort to provide a counter-weight to the secular PLO).

The Taliban, the rulers of most of Afghanistan, adhere to a particularly extreme and intolerant variant of fundamentalist Islam. They came to power out of the in-fighting among the various Mujahedeen (religious warriors) groups following the Soviet withdrawal. Pakistan and Saudi Arabia were the principal international backers of the Taliban

Pakistani intelligence maintained extremely close ties to the Taliban and Pakistani troops assisted their rise to power. Most Taliban leaders and many of its foot-soldiers were trained in the madrassas -- religious schools -- in Pakistan set up with funding from wealthy Pakistanis, Saudis, and others in the Gulf, which taught a version of the fundamentalist Wahhabism that is the state religion of Saudi Arabia. Despite the anti-American and generally reactionary teachings of these madrassas, Pakistan has been a U.S. ally and Saudi Arabia has been one of Washington's closest allies

2. What is the attitude in the Arab and Islamic worlds
to (a) the Sept. 11 attacks, and (b) the current US war in Afghanistan?

Every government in the region other than Iraq condemned the September 11 attacks, and even Iraq sent its condolences to the victims. The enormity of the slaughter horrified many people in the region, and there were many deeply felt expressions of sympathy for those who lost their lives. But a large reservoir of anti-Americanism led many people to feel that the United States was finally getting back some of what it deserved, or to believe one of the idiotic conspiracy theories so common in the Middle East (the Israeli Mossad did it, the CIA did it). Among Palestinians, a poll in early October found that two-thirds considered the attacks to violate Islamic law, while a quarter thought them consistent with it. The poll showed Palestinians angry about U.S. foreign policy, but not at Americans.

But even among those who were horrified by the September 11 attacks, most people in the region seem to oppose the war on Afghanistan. (The same Palestinian poll found 89 percent criticizing a U.S. attack on Afghanistan, with 92 percent believing that it would lead to more attacks on the United States.) Many pro-U.S. governments were tactfully silent when the air strikes began, sensing the popular opposition. The unilateralism of the U.S. response was especially criticized; Iran -- which had indicated its willingness to support a UN action -- sharply condemned the U.S. attacks

3. What grievances fuel hatred for the U.S. in the Middle East?

Anti-American sentiment is widespread in the Middle East, not just among Islamic fundamentalists. This anti-Americanism has a variety of sources. Some comes from specific U.S. policies in the region -- backing Israeli oppression of Palestinians, enforcing devastating sanctions on the civilian population of Iraq, supporting authoritarian governments, often by deploying U.S. troops on land considered holy by Muslims. Some comes from resentment of Washington's economic and political arrogance more generally. And some comes from religious opposition to the secular world, of which the United States is the leading power, an intolerance fed by sexism, anti-Semitism, and other reactionary doctrines. One indication of the weight of all these factors is provided by the videotape Osama bin Laden released on October 7 -- not because it tells us anything about the motives of bin Laden (who is probably totally unconcerned with oppressed or suffering people, hoping only to precipitate a holy war engulfing the entire region) -- but because bin Laden is an astute judge of what issues inflame people. In that video, bin Laden referred to 80 years of Muslim humiliation, Israeli oppression of Palestinians, Iraqi starvation, and the atom bombs dropped on Japan. America, he warned, "will not live in peace before peace reigns in Palestine, and before all the army of infidels depart the land of Muhammad...." He felt these were the issues that people hearing him would be moved by, not an attack on Hollywood, much less democracy.

4. Does trying to understand/explain the grievances of the people of the Middle East constitute excusing bin Laden, excusing terror, softness on fascism, etc.

When some students killed their classmates at Columbine high school, people of good will tried to figure out the causes for such horrible events. In so doing, they were hardly justifying or excusing the heinous slaughter. The killers may have had some neo-Nazi sympathies (choosing Hitler's birthday as the day for their assault) -- but this didn't change our obligation to examine the deeper causes of adolescent alienation, to discover how schools might contribute to that alienation and what they could to do reduce it. No grievance of oppressed people can excuse or justify what happened on September 11. (As a PLO official declared: "It is true that there is injustice, terrorism, killing and crimes in Palestine, but that does not justify at all for anybody to kill civilians in New York and Washington.") But if we want to understand and reduce the widespread anti-Americanism that allows terrorism to find fertile soil, we need to attend to the grievances.

5. What is Terrorism?

Dictionary definitions indicate it is creating terror, employing fear for political purposes. More aptly, terrorism is attacking and terrifying civil-

ian populations in order to force the civilians' governments to comply with demands. So Hitler's bombing of London was terror bombing, unlike his attacks on British military bases. The issue isn't what weapon is used, but who is the target and what is the motive. For terrorism the target is innocent civilians. The motive is political, impacting their government's behavior. Attacks on the public for private gain are not terrorism, but crime. Attacks on a military for political purposes are not terrorism, but acts of war.

6. Are Bin Laden and his network terrorists?

Bin Laden has issued public statements calling for the killing of U. S. civilians, among others. Evidence presented at trials compellingly ties the bin Laden network to terrorist attacks (the World Trade Center bombing in 1993 and the U. S. embassies in Africa in 1998). So even apart from Sept. 11, there is no doubt that bin Laden and Al Qaeda are terrorists.

7. Is the Taliban terrorist?

In its treatment of the Afghan people -- especially women and religious minorities -- the Taliban has behaved in a terrorist manner. It has allowed bin Laden to establish training camps on its territory and prior to September 11, 2001, rejected UN demands that it turn bin Laden over to the United States. There have been no specific charges by the United States regarding any direct Afghan support for international terrorism. Prior to Sept. 11, Afghanistan was not on the U. S. State Department's (rather selective) list of nation's engaging in state terrorism.

8. Is Hamas a terrorist group?

Hamas and Islamic Jihad in Palestine engage in bombings of Israeli civilians. Despite the fact that Palestinians are oppressed, these attacks constitute terrorism. There can be no justification for blowing up civilians in a Sbarro's pizzeria or a Tel Aviv nightclub. These organizations are not the only terrorists, however. The Israeli government has killed huge numbers of Palestinian civilians. These acts too are terrorism. One terrorism does not justify or excuse the other. The United States has been backing -- with military, economic, and diplomatic support -- Israeli terrorism.

9. Is the U.S. government terrorist?

When the U.S. government targets civilians with the intention of pressuring their governments, yes, it is engaging in terrorism. Regrettably, this is not uncommon in our history. Most recently, imposing a food and drug embargo on a country - Iraq - with the intention of making conditions so difficult for the population that they will rebel against their government, is terrorism (with food and medicine as the weapons, not bombs). Bombing civilian centers and the society's public infrastructure

in Kosovo and Serbia, again with the intent of coercing political outcomes, was terrorism. And now, attacking Afghanistan (one of the world's poorest countries) and hugely aggravating starvation dangers for its population with the possible loss of tens of thousands, or more lives, is terrorism. We are attacking civilians with the aim of attaining political goals unrelated to them - in this case hounding bin Laden and toppling the Taliban.

10. Why did the World Trade Center terrorists do it?

We can't know, of course, but we can surmise. The September 11 attack was a grotesquely provocative act against a super power. No doubt many of those involved felt great anger and desperation due to U.S. policies in the region. But these attacks didn't alleviate such problems. The U.S. response is predictably violent and as any anyone would anticipate, reactionary forces have benefited in the U.S. and around the world.

But perhaps provoking the United States was precisely the intent. By provoking a massive military assault on one or more Islamic nations, the perpetrators may have sought to set off a cycle of terror and counter-terror, precipitating a holy war between the Islamic world and the West, leading, in their hopes, to the overthrow of all insufficiently Islamic regimes and the unraveling of the United States, just as the Afghan war contributed to the demise of the Soviet Union.

But if provocation rather than grievances motivated the planners of the terror strikes against the U.S., this wouldn't make grievances irrelevant. Whatever the planners' motives, they still needed to attract capable, organized, and skilled people, not only to participate, but even to give their lives to the planner's suicidal agenda. Deeply-felt grievances provide a social environment from which fanatics recruit and garner support.

11. What is the legal way of dealing with terrorism?

In our world, the only alternative to vigilantism is that guilt should be determined by amassing of evidence that is then assessed in accordance with international law by the United Nations Security Council or other appropriate international agencies.

Punishment should be determined by the UN as well, and likewise the means of implementation. The UN may arrive at determinations that one or another party likes or not, as with any court, and may also be subject to political pressures that call into question its results or not, as with any court. But that the UN is the place for determinations about international conflict is obvious, at least according to solemn treaties signed by the nations of the world.

Thus, to pursue a legal approach means assembling evidence of culpability and presenting it to the UN or the World Court. It means those

agencies undertaking to apprehend and prosecute culprits. It does not involve victims overseeing retaliation without even demonstrating guilt, much less having legal sanction, much less in a manner that increases the sum total of terrorism people are suffering and the conditions that breed potential future terrorism

12. If all terrorists were pursued through legal channels, what would the international response have been to the September 11 attacks?

Presumably, if provided proof of culpability, UN agencies would seek to arrest guilty parties. They would first seek to negotiate extradition. If a host government failed to comply, as a last resort they could presumably send in a force to extract guilty parties. But these actions would be taken in accord with international law, by forces led by international agencies and courts, in a manner respecting civilian safety, and consistent with further legitimating rather than bypassing respect for law and justice.

13. If all terrorists were pursued through legal channels, what would the international response have been to the embargo of Iraq, the bombing of Kosovo and Serbia, and the bombing of Afghanistan?

These acts, among many others, violate international law in many respects, not least because they harm civilians. Presumably, then, were international legal channels strengthened and respected, aggrieved parties could bring these and other cases to legal attention, leading to diverse prosecutions, many of which would be aimed at officials from the U.S.

14. Is what the U. S. is doing consistent with a legal approach?

To not present evidence, to decide guilt rather than respect institutions of international law, to prosecute not only presumed culprits but a whole population suffering terror and perhaps starvation--of course, international law has been violated. Worse, the mechanism for attaining illegal vigilante prosecution has been a policy which knowingly and predictably will kill many, perhaps even huge numbers of innocent civilians. We take access to food away from millions and then give food back to tens of thousands while bombing the society into panic and dissolution.

Why?

The answer is not to reduce the prospects of terror attacks. The U.S. government and all mainstream media warn their likelihood will increase, both out of short term desire to retaliate, and, over the longer haul, due to producing new reservoirs of hate and resentment. The answer is not to get justice. Vigilantism is not justice but the opposite, undermining international norms of law. The answer is not to reduce actual terror endured by innocent people. Our actions are themselves hurting civilians, perhaps in tremendous numbers.

All rhetoric aside, the answer is that the U.S. wishes to send a message and to establish a process. The message, as usual, is don't mess with us. We have no compunction about wreaking havoc on the weak and desperate. The process, also not particularly original since Ronald Regan and George Bush senior had similar aspirations, is to legitimate a "war on terrorism" as a lynchpin rationale for both domestic and international policy-making.

This "war on terrorism" is meant to serve like the Cold War did. We fight it with few if any military losses. We use it to induce fear in our own population and via that fear to justify all kinds of elite policies from reducing civil liberties, to enlarging the profit margins of military industrial firms, to legitimating all manner of international polices aimed at enhancing U.S. power and profit, whether in the Mideast or elsewhere.

15. Which nations have been supporting the US war in Afghanistan and why?

The press refers to the "U.S.-led" war on Afghanistan, but in fact, except for the first day when some British Tomahawk missiles were fired, only U.S. military forces have so far been engaged in combat. Various nations -- in Europe, Canada, and so on -- have offered troops if the U.S. so requests. So far there has been no U.S. request, presumably because Washington wants to maintain total control of the operation.

No Arab nation has offered troops or even allowed its territory to be (openly) used for offensive military operations. While many regimes do not support the Taliban, they fear public reaction if they should participate in an attack on a Muslim country. Pakistan is providing bases that may in the future be used for helicopter raids. This was a reluctant response to U.S. cancellation of its debt, lifting of sanctions (for its nuclear weapons program), and an apparent U.S. guarantee that it would have a say in the future government of Afghanistan. Uzbekistan, which at first offered bases only for humanitarian operations, seems to have agreed to let the U.S. use the bases as it wishes, in return for a U.S. security guarantee.

Various other nations -- such as Russia and China -- have offered support, though non-military, to the United States, hoping thereby to have U.S. support as they battle their own domestic secessionist movements which they accuse of terrorism (in Chechnya and China's western Muslim Xinjiang province).

16. What has been the role of the UN in the current war in Afghanistan?

The Security Council passed two strong resolutions following September 11, but neither one authorized the use of military force, and especially not unilateral military force. The New York Times reported (7 Oct. 2001): "A sign of Washington's insistence that its hands not be tied was

its rejection of United Nations Secretary General Kofi Annan's entreaties that any American military action be subject to Security Council approval, administration officials said." Still less has the United States been willing to have the United Nations have control over the response to terrorism, including over any military operations.

17. What are the reasons to oppose U.S. bombing of Afghanistan?

(a) Guilt hasn't yet been proven.
(b) Bombing violates International Law.
(c) Bombing will be unlikely to eliminate those responsible for the September 11 attacks.
(d) Huge numbers of innocent people will die.
(e) Bombing will reduce the security of U.S. citizens.

For in-depth discussion of the 5 points, please see also:
Albert/Shalom 5 Arguments Against War

18. But isn't it obvious bin Laden did it?

There are many reasons to suspect bin Laden's responsibility for September 11 and his recent video gloating does not lessen these suspicions. But although Secretary of State Colin Powell initially promised that evidence of responsibility would be presented, the Bush administration "decided it was not necessary to make public its evidence against Mr. bin Laden" (NYT, 7 Oct. 2001). The British government did prepare a document, "Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United States, 11 September 2001," (http://www.pm.gov.uk) which summarized real evidence regarding Osama bin Laden's involvement in earlier terrorist acts and noted the similarity of the Sept. 11 acts to the earlier acts (no warning given, intent to kill maximum number of people -- true of many terrorist acts), but provided very little information specifically regarding the events of September 11. The two crucial claims are contained in these statements, presented with no supporting evidence at all:

Since 11 September we have learned that one of Bin Laden's closest and most senior associates was responsible for the detailed planning of the attacks.

There is evidence of a very specific nature relating to the guilt of Bin Laden and his associates that is too sensitive to release.

Our guess, having no access to intelligence sources, is that bin Laden does indeed bear responsibility for the horrible deeds of September 11. But wars should not be started on the basis of our, or anybody else's, guess. Certainly public opinion in the Arab and Islamic world is going to want more convincing evidence. "A decent respect to the opinions of mankind," said the Declaration of Independence, required a public state-

ment of the causes which impelled the American colonists to a war of independence. Likewise, a decent respect for the opinion of the international community would require that before any action evidence of responsibility be presented. Washington might be satisfied with the evidence, but many others may not be.

We know of historical cases where U. S. officials have falsified evidence. (For example, in 1981 Washington issued a White Paper claiming to prove "Communist Interference in El Salvador"; Raymond Bonner promptly showed this to be "a textbook case of distortion, embellishments, and exaggeration.") But the issue goes beyond any deliberate manipulation of evidence. It's simply a basic principle of justice that people should not be judges in their own case. We know of other cases where U. S. officials were quick to act on totally inadequate evidence (as when they bombed a pharmaceutical plant in Sudan, alleging its involvement in producing chemical weapons, a claim that dissolved when subjected to examination).

19. Is it possible that there is decisive evidence, but that its disclosure would compromise important intelligence gathering capabilities?

Certainly it would be reasonable for a government to refuse to reveal intelligence sources which could help prevent future terrorist plots. No one is asking for names of informants and so on, but conceivably some evidence might point clearly to a specific informant. Consider, however, the following:

(a) the U. S. was able to present evidence in court regarding the 1998 attacks on the U. S. embassies in Africa;

(b) even if evidence could not be made fully public, could it not be shared with the Security Council for their assessment? Sharing the evidence with Britain and the rest of NATO is better than nothing, but not the same as sharing it with the body having legal authority for international peace and security;

(c) some evidence (its nature and extent unknown) was apparently shared with Pakistan -- before its intelligence chief was sacked for being too sympathetic to the Taliban.

If there is evidence suitable for Pakistan, it's hard to see why that couldn't be made public. Washington, however, does not want to establish the precedent that it has an obligation to present evidence.

20. But didn't Afghanistan reject out-of-hand US demand to turn over bin Laden?

The Taliban ambassador to Pakistan stated on October 5, "We are prepared to try him if America provides solid evidence of Osama bin Laden's involvement in the attacks on New York and Washington." Asked if bin

Laden could be tried in another country, the ambassador said, "We are willing to talk about that, but ... we must be given the evidence" (Toronto Star, 6 Oct. 2001, p. A4). One report (AP, 7 Oct. 2001) quoted the ambassador as saying that legal proceedings could begin even before the United States offered any evidence: "Under Islamic law, we can put him on trial according to allegations raised against him and then the evidence would be provided to the court." Washington responded that its demands were non-negotiable and initiated its bombardment of Afghanistan. Was the Taliban offer serious? Could it have been the basis for further concessions? Who knows? Washington never pursued it. But do we really want a world where countries unilaterally issue ultimatums and then unilaterally decide whether the terms of the ultimatum have been met, cut off further negotiations, and open fire?

We might note that some other countries have refused to extradite accused terrorists, even when substantial evidence is presented. For example, Haiti has convicted Emmanuel Constant in absentia for being one of the leaders of paramilitary forces that killed thousands of civilians during the junta years in the early 1990s (with no small measure of U.S. complicity). Washington has refused to turn him over.

21. But can you negotiate with terrorists?

For the most part, you can't, but that is irrelevant to the issues at hand. You can't negotiate with serial killers, either, or with people who go berserk and shoot up their workmates in a post office. We don't deduce from the intransigence of perpetrators that the victims or the victims families should therefore become vigilantes and seek to arrest the culprits. We don't deduce that they should form lynch mobs, seeking the culprits dead or alive. And most important, we don't deduce that they should go after the families of the culprits, or their neighbors families, of the restaurant where they had breakfast.

That one can't sensibly negotiate with bin Laden and Al Qaeda - which may or may not be true - would only tell us that one shouldn't negotiate with them, not that we shouldn't pursue sensible channels of legal redress and prosecution, not that we should become vigilantes, not that we should adopt a lynch mob mentality, and that we should even go beyond that to attacking innocent bystanders in huge numbers, starving and otherwise terrorizing them.

22. But doesn't the U.S. have the right of self-defense?

If under attack, any country has the right to repel the attack, according to international law. But the right of self-defense is not unlimited. The standard precedent is the Caroline case, which held that action in self-defense should be confined to cases in which the "necessity of that self-defense is instant, overwhelming, and leaving no choice of means,

and no moment for deliberation." Thus, self defense would permit the United States to shoot down attacking enemy planes, but not to wage a war half way around the globe a month after a terrorist attack, a war that U.S. officials say might go on for years. Instead, this is the sort of situation that should be turned over to the United Nations for action.

But let's suppose someone doesn't like the above formulation. What norm would we want instead? If a country's civilian population is attacked, then that country has the right to determine the perpetrator to its own satisfaction, issue an ultimatum, determine on its own the adequacy of the response to the ultimatum, and attack the perpetrator's host country, causing great civilian harm. Would we really want this to be a universal norm? This would mean that Cubans could attack Washington on grounds that Miami harbors support for terrorists who have attacked Cuban civilians. Likewise, Iraqis, Serbs, and now Afghans, not to mention Vietnamese, Laotians, Cambodians, Colombians, Guatemalans, and so on, could all target Washington on grounds that the U.S. government has attacked or abetted attacks on their civilian populations - and, for that matter, ironically, Washington can attack itself, on the grounds that it abetted the creation and arming of bin Laden's terror network which in turn attacked the U.S.

Prime Minister Tony Blair said that Britain was acting in self-defense because many British citizens died in the World Trade Center. But many Indian citizens also died; do we want India to issue an ultimatum to Pakistan (for its connections to bin Laden and other terror networks)? Do we want India to then decide whether Pakistan has met the terms of its ultimatum and if New Delhi decides no, then war ensues?

On October 14, the Taliban agreed to turn bin Laden over to a neutral country if the U.S. stopped the bombing. (We might note that a proposal to turn bin Laden over to a neutral country is not unreasonable, given the unlikelihood of a fair trial in a country whose president has declared that bin Laden was wanted "dead or alive.") The United States rejected the offer. Is this a decision that should be made unilaterally by Washington.

Is this the morality, legality, and practicality anyone could wishes to advocate for international relations?

23. But isn't the U.S. getting a vast coalition of support?

There was a vast outpouring of sympathy for the victims of the September 11 attacks. Many nations have indicated their willingness to participate in a campaign against terrorism. But, as indicated above (question 15), only one other nation thus far -- Britain -- has participated in the military actions against Afghanistan. More importantly, a coalition means a group of Washington's friends, which is not the same as obtaining legal international sanction for war.

24. What do we think about the Sept. 14th Congressional resolution (passed 98-0 in the Senate and 420-1 in the House) authorizing President Bush to use force?

No vote in a nation's legislature can permit that nation to behave contrary to international law. The Congressional resolution no more makes U.S. military action "right" than would a vote by India's legislature legitimate an attack on Pakistan or by Russia's legislature legitimate slaughter in Chechnya. Military actions that cause massive civilian harm as is now occurring in Afghanistan are wrong -- they meet our definition of terrorism -- no matter what the vote of a legislature may be.

One might also note how the members of the U.S. Congress -- with one courageous exception -- abdicated their responsibility. They are constitutionally assigned responsibility to provide a check on the arbitrary power of the executive branch. To pass a resolution authorizing the president to "use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations or persons" is essentially saying that Congress wants no voice in assessing evidence, determining the appropriate way to respond to that evidence, or even whether we will go to war against one or several dozen countries.

25. But aren't the targets being bombed in Afghanistan legitimate targets?

First, if the agent of attack is illegitimate, no target it attacks is a legitimate one, even if the target might be proper were the agent someone else. Suppose Saddam Hussein decided to bomb Afghanistan on grounds he didn't like the role of the Taliban in abetting terror in the world and against the U.S. Even if he confined himself to targets entirely bearing upon the actions of terrorists and not significantly endangering civilians, still, we would say Hussein was acting illegally since he had no UN authorization to act, and we wouldn't temper that claim on the grounds he could be doing worse. The norm is general.

Even if the current U.S. bombings were internationally and legally sanctioned, thus not being carried out in vigilante style, not all targets are legitimate by any means. There is no justification in attacking in a manner that puts people at risk of starvation, that attacks civilian infrastructure, or that carries risk of substantial civilian deaths.

If the attacks had been initiated because bin Laden and his network were demonstrated guilty, and UN legal agencies called for their extradition, and the Taliban refused, and it became necessary to pursue the culprits in order to prosecute them, then yes, there could be a list of legitimate targets for such endeavors, but only if the seven million people at risk of starvation were not endangered, and if means of assault

could be found which -- unlike those currently being utilized -- could be well controlled without causing terrible accidents.

On October 12, Mary Robinson, the UN's Commissioner for Human Rights, called on the United States to halt the bombing so that food could reach up to two million desperate Afghan civilians (Independent, 13 Oct. 2001)

26. But aren't civilian casualties being avoided in Afghanistan?

If the question is, could the U.S. bomb in a fashion to induce greater civilian casualties, of course the answer is yes, so that in that sense it is avoiding many possible casualties. And if the question is, is it good that the U.S. isn't causing more deaths by our actions, again the answer is yes. But the question arises, why cause as many as we are? Why aggravate the desperate food situation to the point of possible calamity? Why attack in a manner that disrupts all social life and, inevitably, hits many civilians with bomb impact? This is not going to diminish hatred of the U.S. nor the violence in the region, but increase both. There is no justification for all this other than the desires to propel a state of war as a policy that benefits U.S. elites. If the food disaster materializes at the levels feared by aid and UN agencies, the catastrophe will be without historical parallel for such a short engagement

27. But aren't U.S. food drops a sincere effort to help the people of Afghanistan?

The first week's airdrops, we're told, averaged about 37,500 rations per day. One ration is 3 meals, or one person-day of food. There are between 3-7 million people at risk of starvation. Thus, in order to alleviate the danger, the rate of airdrops has to increase over the largest drops so far by a factor of between one and two hundred.

Bush pledged $324 million in humanitarian aid to Afghanistan. Each ration costs $4.25. Let us assume that there are only 3 million at risk of starvation, that every ration will reach one of those people, and that every dollar of that $324 million is going to rations (and not to the planes, fuel, staff, medicine, or any other item associated with delivery). Under these fantastically generous assumptions, there will be enough food to feed these people for 25 days. The reality is much worse: millions are now fleeing the bombing, and will not sow their crops of winter wheat. Much of the dropped food will land in minefields and remote areas. Most of Bush's money will not be spent on food. And there are probably 7.5 million in danger of starving, not 3 million. But even in this scenario the money is insufficient to last for the winter. Also for comparison, $40 billion was appropriated for the war effort, and a single B-2 bomber costs $2.1 billion.

To first aggravate the starvation danger faced by roughly 7 million

at risk people by creating internal bedlam and cutting off food transport and aid through closing borders and bombing, and to then drop food for about one out of every hundred of the at-risk people, assuming all these meals were even accessible as compared to being scattered across terrain littered with military mines, is not a serious approach to saving lives. Rather, as the U.S. policymakers and commentators have repeated ad nauseam, it is a public relations effort aimed to reduce opposition, and nothing more.

As Doctors Without Borders, one of the agencies that had been working in Afghanistan, put it, "What is needed is large scale convoys of basic foodstuffs.... Until yesterday the UN and aid agencies such as ourselves were still able to get some food convoys into Afghanistan. Due to the air strikes the UN have stopped all convoys, and we will find delivering aid also much more difficult." As for the U.S. airdrops, "Such action does not answer the needs of the Afghan people and is likely to undermine attempts to deliver substantial aid to the most vulnerable."

28. What about the anti-terrorism bill passed by Congress, isn't that a step in the right direction?

We need to distinguish between privileges and basic rights. Being able to get to an airport just 25 minutes before your flight is a privilege, not a basic right. We should be more than willing to give up this privilege if it is necessary for security. But we should insist on an extremely high burden of proof before we're willing to scuttle fundamental rights. There are good reasons to think that the provisions of the anti-terrorism bill go far beyond what is necessary for security. For example, the definition of terrorism in the bill would cover domestic political organizations engaging in civil disobedience.

29. How about the Bush administration's campaign to dry up terrorism's financial networks?

Terrorist organizations have been able to finance their operations by laundering their money through banks. But cracking down on money laundering requires challenging the power of the banking industry and of the wealthy who use off shore banks to hide their assets something the politicians in thrall to the rich have been loathe to do. So U.S. officials have failed to use the legal tools they had to investigate terrorism's financial trail and have failed to request the new tools they needed. In May 2001, the U.S. blocked an effort by the OECD (the main industrial nations) to crack down on bank secrecy. (See Lucy Komisar, "U.S. Bank Laws Fund Terrorists," [AlterNet], 21 Sept. 2001, http://www.alternet.org/story.html?StoryID=11556; Tim Weiner and David Cay Johnston, "Roadblocks Cited in Efforts to Trace bin Laden Money," NYT, 20 Sept. 2001.) U.S. officials consider Saudi officials especially uncoop-

erative in freezing bin Laden's assets (NYT, 10 Oct. 2001). Ultimatums anyone?

30. How about supporting the Northern Alliance, doesn't that hold out positive promise for Afghanistan?

The Northern Alliance have in the past demonstrated a facility for barbarism only minimally less horrible than that of the Taliban. The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA), who have been struggling for years for democracy and against fundamentalism, have warned against allowing the Northern Alliance to come to power.

This strategy of the "enemy of my enemy is my friend" has been used before with disastrous results. This was the logic that led to U.S. and Western support for the Mujahideen, leading to the Taliban, and aid and support for Saddam Hussein, and so on. It is not hard to predict that support for the Northern Alliance will, in years ahead, lead to still more travail and horror for Afghanistan, for the region, and perhaps for the world beyond.

31. How about invading Iraq, won't that be good for Iraqis?

An influential group of Pentagon officials and national security elites have been urging that the United States use this opportunity to take military action to depose Saddam Hussein. Hussein is a monster and many Iraqis would be thrilled to see him go. But going to war against him without the most compelling evidence of his responsibility for the September 11 attacks would lead to massive instability in the Muslim world -- with horrific human consequences. A recent meeting of Islamic nations did not condemn the U.S. bombing Afghanistan (thanks to the efforts of U.S. allies), but all agreed that any further military action would be utterly unacceptable. Whatever benefit the Iraqi people might obtain from the deposing of Hussein would likely be outweighed by the horrors of a war in Iraq and of holy wars from North Africa to Southeast Asia. The simplest way to help the people of Iraq would be to lift the economic sanctions that have caused such devastating hardship.

Despite their eagerness to link Saddam Hussein to September 11, Israeli, Jordanian, and U.S. intelligence have found no connection (NYT, 11 Oct. 2001). Though both Al Qaeda and Hussein hate the United States, Hussein is not an Islamicist, and Al Qaeda considers him an infidel.

At the moment it seems as if the State Department, with its strategy of just going after Afghanistan, at least for now, will prevail over Defense Department officials who want to go after Iraq. But the United States delivered a note to the Security Council saying that its self-defense measures might require it to attack other countries.

(Apparently this sentence was added by the White House to the U.S. note without informing Secretary of State Colin Powell [NYT, 12 Oct. 2001].) Thus, we must await the result of the bureaucratic struggle within the Bush administration to see whether we'll go to war against Iraq. Is this a decision that Congress should have declined to get involved in? More crucially, is this a decision that should be up to the United States government rather than the United Nations?

32. How about increasing U.S. defense and military spending?

Does it make sense for some effort to be made to develop means of better predicting and interdicting terrorist attacks? Yes. Can one make a cogent argument that a large country needs some military expenditure to be in position to repel attacks, and to even engage in war should that horrible eventuality come to pass? Yes, though many will reasonably disagree. But does the U.S. need to spend not only $343 billion as in the year 2000, which was 69 percent greater than that of the next five highest nations combined (with Russia spending less than one-sixth what the United States does, and Iraq, Libya, North Korea, Cuba, Sudan, Iran, and Syria spending in total $14.4 billion combined and Iran accounting for 52 percent of this total), but still more to accomplish such security? No, the rush to spend more on militarism has nothing whatever to do with security against terrorism and has everything to do with military profiteering.

33. How about building a national missile defense system?

Such a system has nothing to do with protecting against terrorism. Such a system in fact destabilizes world prospects for peace by propelling a new arms race as well as a launch on warning mentality in other countries. The system is pursued by the U.S. government largely as a sop to high tech industry and profit making and should be opposed on those grounds, and due to the danger it places all humanity in.

34. How about repealing the executive order prohibiting the assassination of foreign leaders?

The U.S. government has been targeting foreign leaders for a long time, perhaps under an explicit waiver from the executive order, perhaps not. For example, the U.S. air force targeted not just Libyan leader Muammar Qaddafi in 1986 -- on the grounds that his barracks were command and control centers -- but (according to Seymour Hersh) even his family. Today, the U.S. is hitting the homes of Taliban leaders. So it is hard to imagine that Washington needs a freer hand. In situations short of war, a basic principle of our jurisprudence is that people should be brought to trial, not subjected to extra-judicial execution.

35. How about using racial profiling to counter terrorism in the United

States?

We need to distinguish between two different kinds of situations. Consider first the sort of situation that even strong opponents of racial profiling agree would be appropriate police work: "Police receive a credible tip that a white man armed with a bomb is somewhere in an office building. They surround the building and then enter it. The police examine white men more closely than those who are non-white." (See Randall Kennedy, Race, Justice, and the Law, Vintage, 1997, pp. 141, 161.) In these kinds of emergency situations, it would be reasonable to scrutinize whites more closely (or blacks or Middle Easterners, depending on the situation). But this is very different from making the targeting of a particular ethnic group a routine part of police work. Doing so involves two real dangers: (1) It's not likely to be very effective. The suspected 20th hijacker, a native Moroccan, looks black, not Middle Eastern. And next time, Islamic terrorists might use an Asian-looking Indonesian or a white-looking Bosnian. Recall too the pregnant Irish woman in 1988 whose luggage contained a bomb, put there unbeknownst to her by her Palestinian boyfriend. (2) It's likely to undermine an important protection against terrorism, namely, the cooperation of the Arab and Muslim communities in the United States. If these people are treated abusively, they are not likely to come forward with information needed by the police.

So what happens when a Middle Eastern man gets on a plane and the flight crew doesn't feel safe? In one notorious case, a Pakistani was removed from a Delta flight after the pilot said he wouldn't fly with the man on board. We can sympathize with the pilot's concern -- reporters have shown how easy it was even after September 11 to board a plane with knives and other weapons -- but his solution was totally unacceptable and discriminatory. The proper solution was for the pilot to say to Delta that security remains inadequate and demand that an armed air marshal be put on board. People's fears are real and legitimate. But we must try to address those fears in ways that do not scapegoat and abuse Arabs or Muslims or anybody else.

36. What is a "war on terrorism," and why is it being elevated as the capstone of U. S. foreign policy?

A war on terrorism is a project of attacking whomsoever the U.S. proclaims to be terrorist. In that sense it has many aspects. It can be used to assault opponents who are in fact terrorist, or other opponents who are not terrorist but are labeled to be. It can be used to induce fear in the U.S. population, so as to justify huge military expenditures, violations of civil liberties, and other elite-benefiting policies - much as the Cold War served the same purpose in decades past. It doesn't risk serious conflict as the scale of the engagements and their targets, are entirely

up to us. It doesn't legitimate international law, and so it does nothing to risk the U.S. being held accountable for our actions.

In other words, the War on Terrorism, like the Cold War in earlier decades, for reasons having little to nothing to do with its rhetorical aims is quite serviceable to elites, supposing that they are able to convince the population of its efficacy.

37. But what about the role of oil in the current crisis?

Oil of course plays a greater or lesser role in everything political and economic that happens in the Mideast, sometimes forefront, sometimes background. U.S. geopolitical and economic policies have as one of their prime motives maintaining access to and virtual control over oil sources around the globe. Pursuit of profit per se, and oil profit, are at the foundation of U.S. institutional arrangements in general, and thus impact our large-scale motives, of course. But the idea that oil is the proximate reason for the attack on Afghanistan, is very far fetched, just as the notion that the U.S. engaged in the war in Vietnam to gain access to minerals within Vietnam was far fetched. What is primarily at stake, geopolitically and economically, is not access to specific resources (or pipeline routes) but the rules of global interaction, the further delegitimating of international law, the development of a replacement for the Cold War - in this case, a war on terrorism - as well as actual concerns about terrorism itself.

38. So how long will the war in Afghanistan go on?

There is no way to say with confidence, but since Afghanistan is too poor to fight back and has so few targets of any substance or scale, serious assaults are unlikely to persist too long, one hopes. Nevertheless, Adm. Sir Michael Boyce, the chief of the British defense staff, said military operations "must expect to go through the winter and into next summer at the very least" and President Bush said that the military operation would continue for days, months or even years (NYT, 12 Oct. 2001).

To literally rip the fabric of the society to shreds and continue to obstruct possibilities for serious food aid could yield a holocaust, and even the most callous U.S. policy makers can't possibly be so ignorant as to conclude that the hate that would arise for the U.S. around the world would be in their interests. On the other hand, the war on terrorism has utility only insofar as the U.S. population can be kept focused on it, made fearful due to it, and thus willing to abrogate democratic influence and even a limited say over policymaking, as a result. So if the U.S. government can get away with doing so, a continuing attention to terrorism is to be anticipated.

39. What dangers will we face in South Asia and the Middle East as a result of the current war?

Perhaps the greatest danger is that a Taliban-like regime might come to power in Pakistan as a result of war-induced destabilization. Unlike Afghanistan, Pakistan is no minor player: it has nuclear weapons. Even with sober leaders, Pakistan has pursued highly reckless policies with regard to Kashmir, bringing it close to conflict with its nuclear armed neighbor, India.

More generally, there is the danger that the calls for holy war, largely ignored in the Muslim world in recent years, will now gain a wider following.

40. But won't the "war on terrorism" reduce terrorism, and isn't that worth it?

First, the attacks on civilians in Afghanistan, and the aggravation of the starvation conditions, is itself terrorist, greatly increasing the terrorism at play in the world.

Second, killing innocent civilians, as has already occurred and will increasingly occur, will likely create more terrorists in Afghanistan and more widely throughout the region. The New York Times reported (10/13/01) of an Afghan village struck by U.S. bombs, with many civilian casualties. "Maulvi Abdullah Haijazi, an elder from a nearby village, had come to assist. 'These people don't support the Taliban,' he said. 'They always say the Taliban are doing this or that and they don't like it. But now they will all fight the Americans. We pray to Allah that we have American soldiers to kill. These bombs from the sky we cannot fight.'" And when they can't kill U.S. soldiers, they can at least join a terror network. This is the bad fruit our rain from the sky nurtures-among survivors.

41. Wouldn't changing U.S. foreign policy under the threat of terrorism mean that we are giving in to terrorism?

Suppose a postal worker attacks his mates and some folks in the post office one morning. The government - not the surviving workers in the post office - moves to capture and prosecute the culprit (not to attack his neighbors, etc.). But hopefully the government also looks into the conditions that contributed to the postal workers heinous acts, as well. Suppose it discovers that stress levels in post offices are abysmal and contribute to anger and personal dissolution leading to "going postal. " Would the government be giving in to criminal pressures if it advocated a reduction in stress in postal work? No, on the contrary the government would be acting sensibly to reduce just grievances that needed reduction in any event, and which would have the very good by-product of helping reduce the likelihood of other postal workers attacking their workmates.

The same logic holds in this case. For the U.S. to alter its foreign policy to not support despots abroad, to not punish civilian populations

abroad, to not support unjust policies by allies abroad, to indeed try to redress huge injustices of economic impoverishment abroad, are all choices that should occur in any event, in their own right, and whose implementation would also, as a desirable side benefit, reduce the conditions that breed the hate and desperation terrorism feeds on.

42. Does the U.S. support a Palestinian state? Should it?

The Bush administration has now declared that its vision for the solution of the Israel-Palestine conflict includes a Palestinian state. The Bush administration is now in line with the former Clinton administration. This is better than Bush's previous backtracking, but it is still very far from what is needed. Washington says the boundaries of the Palestinian state are to be worked out by the parties -- the Palestinians and Israel -- but that means that Israel has an effective veto over any settlement, and until there is a settlement, Palestinians remain under Israeli occupation. Everyone now says they support a Palestinian state, including Israel, but the crucial question is whether the specific terms address the legitimate rights of the Palestinian people. The issue is not a few square kilometers of desert on one side of the border or the other, but whether there will be Israeli security zones carved out of the Palestinian state, whether Israeli security roads will traverse the Palestinian state, and whether Israeli settlements will remain. In addition, there are the questions of whether Israel will continue to control East Jerusalem which it conquered in 1967 and whether the Palestinians have to foreswear their right to return to lands from which they have been driven out. Until the United States is willing to use its influence to pressure Israel to accept real self-determination for Palestinians, the problem will remain.

43. What should the U.S. have done in response to September 11?

The U.S. government's guiding principle ought to have been to assure the security, safety, and well-being of U.S. citizens without detracting from the security, safety, and well-being of others.

Any response should have avoided targeting civilians or so-called dual-use targets and should have been carried out according to the UN Charter. We should have sought freely-offered Security Council authorization with the UN retaining control of any response.

For more specific recommendations, made before the bombing began, see also:

44. What other policies should our government be following to reduce the likelihood of people will undertake terrorist agendas?

It isn't crazy, in the U.S. to have locks on some doors, etc. But it is wise to try to enact policies that reduce poverty and desperation as well, not only because it is moral to do so to benefit those suffering, but because

it will dramatically reduce inclinations to steal. Similarly, internationally, it isn't crazy to expend some energies and resources guarding against terrorist attack. But it is wise to try to enact policies that reduce conditions of poverty and disenfranchisement, not only because it is moral to do so to benefit those suffering, but because it will dramatically reduce inclinations to terrorize and prospects for finding allies willing to abet that terrorism.

What else could we do? David Corn offers some suggestions: a large increase of funding for the public health infrastructure (which is today inadequate to deal with a serious biological or chemical terror), funding programs to secure or neutralize Russian nuclear material and to prevent Russian weapons scientists from being exported, stop exporting hand-held guns that can bring down airplanes. Having the federal government take over airport security is a suggestion we made previously; right now the Bush administration opposes Congressional legislation to this effect because it will increase big government. Richard Garwin has additional suggestions. All these make sense. And they are likely to enhance our security, while war is likely to do the opposite.

45. The peace movement says "Justice, Not War. " But with terrorists, how can justice be achieved without war?

First, it can't be achieved via war because, in this case, war kills huge numbers of innocents, reduces the attentiveness to law and justice, and creates huge reservoirs of hate fueling future terrorists possibilities.

Second, it can be achieved without war, however, by following the norms of international law, which, if need be, may even involve military aspects along with diplomacy and other features - but not war as in one country, or a pair, attacking another.

46. In what ways if any should the peace movement adjust its positions in the light of Sept. 11?

Peace movements in industrialized nations before September 11 should have attuned themselves to unjust and horrific violence that victimized the weak and was engaged to benefit the powerful. The same holds now.

Peace movements in industrialized nations before September 11 should have opposed unjust wars, particularly perpetrated by their own countries, and any policies making such wars more likely or more brutal. The same holds now.

Peace movements in industrialized nations before September 11 should have examined institutional causes for wars, seeking to reduce those causes as much as possible. The same holds now.

So did anything profound change calling for re-thinking by peace movements?

Yes, one thing did change, quite dramatically. For the first time some of the abhorrent violence has been turned toward the civilian populations of the developed nations. This means that defensive motives will enter developed nation's calculations vis-à-vis international relations with poor countries not solely rhetorically, but in fact. Peace movements will have to pay attention to that new reality even as they also pay attention to on-going structural causes of war and injustice.

47. What should be the relation of other movements to the peace movement, and vice versa?

Winning gains against intransigent elites depends on convincing them that to ignore demands will lead to more losses for them than to meet demands. What accomplishes this is always the specter of growing numbers of people taking the side of dissidents, becoming sufficiently aroused and impassioned to work to recruit still more allies, and to manifest their dissent in demonstrations and civil disobedience, and especially of growing numbers whose concerns begin to transcend immediate issues and call into question broader and even more important institutional allegiances of elites.

Thus, peace movements, anti-racist movements, labor movements, anti-capitalist movements, ecology movements, feminist movements, movements against capitalist globalization, movements for great democracy or against incursions on freedom, and any other social movements will benefit to the extent they mutually support one another and convince elites that to ignore their focus is to risk enlarged opposition not only on that issue, but on all others as well. They will suffer losses in their efficacy to the extent that they are isolated from one another, or even pitted against one another

Peace movements and other movements should support and even take up one another's struggles, to the extent circumstances and resources permit.

[Downloaded from www.zmag.org/ZNet.htm]

Howard Zinn

Retaliation

The images on television have been heartbreaking. People on fire leaping to their deaths from a hundred stories up. People in panic and fear racing from the scene in clouds of dust and smoke. We knew that there must be thousands of human beings buried alive, but soon dead under a mountain of debris. We can only imagine the terror among the passengers of the hijacked planes as they contemplated the crash, the fire, the end. Those scenes horrified and sickened me.

Then our political leaders came on television, and I was horrified and sickened again. They spoke of retaliation, of vengeance, of punishment. We are at war they said. And I thought: they have learned nothing, absolutely nothing, from the history of the twentieth century, from a hundred years of retaliation, vengeance, war, a hundred years of terrorism and counter-terrorism, of violence met with violence in an unending cycle of stupidity.

We can all feel a terrible anger at whoever, in their insane idea that this would help their cause, killed thousands of innocent people. But what do we do with that anger? Do we react with panic, strike out violently and blindly just to show how tough we are? "We shall make no distinction", the President proclaimed, between terrorists and countries that harbor terrorists". Will we now bomb Afghanistan, and inevitably kill innocent people, because it is in the nature of bombing to be indiscriminate, to "make no distinction"? Will we then be committing terrorism in order to "send a message" to terrorists?

We have done that before. It is the old way of thinking, the old way of acting. It has never worked. Reagan bombed Libya, and Bush made war on Iraq, and Clinton bombed Afghanistan and also a pharmaceutical plant in the Sudan, to "send a message" to terrorists. And then comes this horror in New York and Washington. Isn't it

clear by now that sending a message to terrorists through violence doesn't work, only leads to more terrorism?

Haven't we learned anything from the Israeli-Palestinian conflict. Car bombs planted by Palestinians bring air attacks and tanks by the Israeli government. That has been going on for years. It doesn't work. And innocent people die on both sides.

Yes, it is an old way of thinking, and we need new ways. We need to think about the resentment all over the world felt by people who have been the victims of American military action. In Vietnam, where we carried out terrorizing bombing attacks, using napalm and cluster bombs,on peasant villages. In Latin America, where we supported dictators and death squads in Chile and El Salvador and other countries. In Iraq, where a million people have died as a result of our economic sanctions, And, perhaps most important for understanding the current situation, in the occupied territories of the West Bank and Gaza, where a million and more Palestinians live under a cruel military occupation, while our government supplies Israel with high-tech weapons.

We need to imagine that the awful scenes of death and suffering we are now witnessing on our television screens have been going on in other parts of the world for a long time, and only now can we begin to know what people have gone through, often as a result of our policies. We need to understand how some of those people will go beyond quiet anger to acts of terrorism.

We need new ways of thinking. A $300 billion dollar military budget has not given us security. Military bases all over the world, our warships on every ocean, have not given us security. Land mines, a "missile defense shield", will not give us security. We need to rethink our position in the world. We need to stop sending weapons to countries that oppress other people or their own people. We need to decide that we will not go to war, whatever reason is conjured up by the politicians or the media, because war in our time is always indiscriminate, a war against innocents, a war against children. War is terrorism, magnified a hundred times.

Our security can only come by using our national wealth, not for guns, planes, bombs, but for the health and welfare of our people - for free medical care for everyone, education and housing guaranteed decent wages and a clean environment for all. We can not be secure by limiting our liberties, as some of our political leaders are demanding , but only by expanding them. .

We should take our example not from our military and political leaders shouting "retaliate" and "war" but from the doctors and nurses and medical students and firemen and policemen who have been saving lives in the midst of mayhem, whose first thoughts are not violence, but healing, not vengeance but compassion.

[Downloaded from www.zmag.org/ZNet.htm]

যুদ্ধ: দস্যুর দাপট সম্রাটের সন্ত্রাস

Edward S. Herman and David Peterson

WHO TERRORIZES WHOM?

One of the marks of exceptional hegemonic power is the ability to define words and get issues framed in accord with your own political agenda. This is notorious at this moment in history as regards "terrorism" and "antiterrorism." Since the September 11 attacks, two truths have been indisputable and universally reported. One is that the hijacker bombings of the World Trade Center and Pentagon were atrocities of a monumental and spectacular scale (and media coverage of that day's events alone may have generated more words and graphic images than any other single event in recent history). A second truth is that the bombings were willful acts of terrorism, accepting the basic and widely agreed-upon definition of terrorism as "the use of force or the threat of force against civilian populations to achieve political objectives." And let us also recognize that "sponsorship of terrorism" means organizing, and/or underwriting and providing a "safe harbor" to state or nonstate agents who terrorize. But there is a third indisputable truth, although much less understood, let alone universally reported: namely, that from the 1950s the United States itself has been heavily engaged in terrorism, and has sponsored, underwritten, and protected other terrorist states and individual terrorists. In fact, as the greatest and now sole superpower, the United States has also been the world's greatest terrorist and sponsor of terror. Right now this country is supporting a genocidal terrorist operation against Iraq via "sanctions of mass destruction" and regular bombing attacks to achieve its political objectives; it is underwriting the army and paramilitary forces in Colombia, who openly terrorize the civilian population; and it continues to give virtually unconditional support to an Israeli state

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

that has been using force to achieve its political objectives for decades. The United States has terrorized or sponsored terror in Nicaragua, Brazil, Uruguay, Cuba, Guatemala, Indonesia/East Timor, Zaire, Angola, South Africa, and elsewhere. And it stands alone in both using and brandishing the threat to use nuclear weapons. It has for many years provided a safe harbor to the Cuban refugee terror network, and it has done the same for a whole string of terrorists in flight from, among other places, El Salvador, Haiti, Vietnam, and even Nazi Germany (see Christopher Simpson's Blowback).

Even in its response to the September 11 terrorist events the United States resorted instantly to its own terrorism. Ignoring legal niceties-- despite its supposed devotion to the "rule of law"- -the United States immediately began to threaten to "take out" states harboring terrorists, threatened the Afghans with bombing--itself an act of terrorism--and by such threats succeeded in blocking the flow of food supplies to a starving population, which is yet another act of terrorism, and a major one. (A spokesman for Oxfam International stationed in Islamabad recently stated that "Prior to this crisis, the World Food Program, with the help of Oxfam and other groups, was feeding 3.7 million [Afghan] people. But with the onset of the bombing campaign, this has stopped as the aid workers have been force to withdraw. The airdrops will--at their very best--feed 130,000 people," or only 3.5 percent of those facing winter and starvation).

On October 7 the United States then began to bomb this impoverished country--not just a further act of terrorism, but the crime of aggression.

All serious observers recognize that the U.S. actions against Afghanistan have and will cause many, many more deaths than the 6,000 killed in New York, Washington and Pennsylvania. But U.S. power and self-righteousness, broadcast and justified to the whole world by a subservient media machine, assure that what the United States does will neither be called terrorism, nor aggression, nor elicit indignation remotely comparable to that expressed over the events of September 11--however well its actions fit the definitions. The same bias extends to other Western countries, diminishing in scope and intensity from Britain to the others, and weakening further in the Third World. In the Middle East, for most of the population the bias disappears and U.S. terrorism is called by its right name, although the U.S.-dependent governments toe their master's line, if nervously. In these more remote areas the press speaks a different language, calling the United States a "rogue state par excellence repeatedly defying international rulings whether by the World Court or by U.N. resolutions when they have not suited its interests" and a "bandit sheriff" (The Hindu, India), and speaking of this as an "age of Euro-American tyranny" with tyrants who are merely "civilized

and advanced terrorists" (Ausaf, Pakistan).

But another sad fact is that in this country, and Britain as well, even the Left has trouble escaping the hegemonic definitions and frames. Leftists here regularly discuss the terrorism issue starting from the premise that the United States is against terrorism and that the issue is how the U.S. government can best deal with the problem. They are worried that the United States will go about solving the problem too aggressively, will seek vengeance, not justice. So they propose lawful routes, such as resort to the United Nations and International Court of Justice; and they urge seeking cooperation from the Arab states to crush terrorists within their own states. They discuss how bin Laden money routes can be cut off. Some of them even propose that the United States and its allies intervene not to bomb, but to build a new society in Afghanistan, engage in "nation-building", as the popular phrase puts it, in the spirit of the Kosovo "new humanitarian" intervention.

While some of these proposals are meritorious, we haven't seen any that discuss how a "coalition of the willing" might be formed to bring the United States under control, to force it to stop using and threatening violence, to compel it and its British ally to cease terrorizing Iraq, and to make it stop supporting terrorist states like Colombia, Turkey, Indonesia, and Israel. Or to make U.S. funding of its terrorist operations more difficult! The hegemon defines the main part of the agenda--who terrorizes--and the debate is over how he and his allies should deal with those he identifies as terrorist.

A good illustration of this Left accommodationism is displayed in the "New Agenda to Combat Terrorism," recently issued by the Institute for Policy Studies and Interhemispheric Resource Center in their Foreign Policy in Focus series. Nowhere in this document is it suggested that the United States is itself a terrorist state, sponsor of terrorism, or safe harbor of terrorists, although it is acknowledged that this country has supported "repressive regimes." "Repressive" is softer and less invidious than "terrorist." The report refers to the "destructive and counterproductive economic sanctions on Iraq," but doesn't suggest that this constitutes terrorism. In fact, "destructive" sounds like buildings knocked down and fails to capture the fact of a million or more human casualties. The recent publicity given the U.S.'s deliberate destruction of the Iraqi water supply also suggests something more than "destructive and counterproductive" is needed to properly describe U.S. policy toward that country (Thomas Nagy, "The Secret Behind the Sanctions: How the U.S. Intentionally Destroyed Iraq's Water Supply," The Progressive, September 2001).

Nowhere does the IPS/IRC document mention Colombia, Turkey or Indonesia, where the United States is currently supporting "repressive regimes." This practice of leaning over backwards to downplay the U.S.

terrorist role merges into serious misreadings of ongoing events: for example, the New Agenda claims that one effect of September 11 was that "defense policy was redefined as defending America and Americans rather than as force projection." This takes as gospel official propaganda claims, when in fact September 11 has given the proponents of force projection just the excuse they need to project force, which they are doing under the guise of antiterrorism. As John Pilger notes, "The ultimate goal is not the capture of a fanatic, which would be no more than a media circus, but the acceleration of western imperial power" (New Statesman, Oct. 15, 2001). And discussing the Bush administration's non-negotiable demands on the Taliban, Delhi University professor Nirmalangshu Mukherji points out that "it is hard to believe that thousands are going to be killed and maimed, entire nations devastated, regional conflicts allowed to take ugly turns, the rest of the world held in fear--all because the dead body of a single, essentially unworthy person is given such high value." On the contrary, she proposes, as does Pilger, that "in the name of fighting global terrorism, the US is basically interested in using the opportunity to establish [a] permanent military presence in the area" that is notable for its geo-political importance ("Offers of Peace," Oct. 16, 2001). Calling for "reorienting U.S. policy along the lines of respecting human rights," the New Agenda report states that "the unnecessary projection of U.S. military abroad, represented by the archipeligo of overseas military bases, often serves as a physical reminder of U.S. political and military support for repressive regimes." This claim that such bases are "unnecessary" completely ignores their ongoing important role in facilitating the global expansion of U.S. business, and, amazingly, ignores the fact that the United States is right now in the process of building new ones in "repressive" states like

Uzbekistan, with 7,000 political prisoners and in the midst of a low-intensity war against Islamic insurgents ("U.S. Indicates New Military Partnership With Uzbekistan," Wall Street Journal, Oct. 15, 2001). Such bases are only "unnecessary" to analysts who are unable or unwilling to confront the reality of a powerful imperialism in fine

working order and in a new phase of expansion. These analysts seem to believe that the United States can easily, perhaps with Left advice, be dissuaded from being an imperialist power! The reasons for this Left accommodation to what we must call the Superterrorist's antiterrorist agenda are mainly twofold. One is the power of hegemonic ideas, so that even leftists are swept along with the general understanding that the United States is fighting terrorism and is only a victim of terrorism. Some swallow the New Imperialist premise that the United States is the proper vehicle for reconstructing the world, which it should do in a gentler and kinder fashion. Thus Richard Falk takes this for granted in declaring the U.S. attack on Afghanistan "the first truly just war since

World War II" (The Nation, Oct. 29, 2001), although claiming that its justice "is in danger of being negated by the injustice of improper means and excessive ends." Though writing in the liberal Nation magazine, it never occurs to Falk that the rightwing Republican regime of Bush and Cheney, so close to the oil industry and military-industrial complex, might have an agenda incompatible with a just war. Apart from this, as the attack was itself a violation of international law, and was from its start killing civilians by bombs directly and via its important contribution to the already endemic mass starvation, Falk makes the war "just" despite the fact that its justice was already negated at the time he made his claim. (By Falk's logic, an Iraqi attack on the United States would also be a highly just war, though its justice might be endangered by dubious means and excessive ends.) This is imperialist apologetics carried to the limit. The other reason for leftist accommodation is pragmatic. Thanks to the effectiveness of the U.S. propaganda system, U.S. citizens by and large are caught within the epistemic bind of NOT KNOWING THAT THEY DO NOT KNOW. Thus, leftists understand that people will have difficulty understanding what they are talking about if they start their discussions of controlling terrorism with an agenda on how to control Superterrorist's terrorism. If one wants to be listened to quickly and possibly influence the course of policy right now--and be far safer personally and professionally--it is better to take the conventional view of terrorism as a premise and discuss what the United States should do about it. Maybe this way one can help curb extremist responses. On the other hand, by taking it as the starting premise that the United States is only a victim of terrorism, one loses the opportunity to educate people to a fundamental truth about terrorism and even implicitly denies that truth in order to be practical. We find that we can't do that. After one of us (Herman) authored books entitled The Washington Connection and Third World Fascism (with Noam Chomsky) and The Real Terror Network, the latter featuring the gigantic U.S.-sponsored terror network that emerged in the years after 1950, and after following U.S. policy for years thereafter in which terrorism has been very prominent, he (and we) consider the notion of the United States as an antiterrorist state a sick joke.

We believe it is of the utmost importance to contest the hegemonic agenda that makes the U.S. and its allies only the victims of terror, not terrorists and sponsors of terror. This is a matter of establishing basic truth, but also providing the long- run basis for systemic change that will help solve the problem of "terrorism," however defined. Others see things differently, and very good articles have been written in the pragmatic mode. But we want to call attention to the fact that there is a cost to using that mode, and those that work in it should do this understanding what they are taking for granted and its costs. Given the cur-

rent trajectory of world events, we believe that we need a greater focus on ALL the terrorists and sponsors of terror, and less pragmatism.

October 18
www.znet.org

Edward S. Herman

Folks Out There have a "Distaste of Western Civilization and Cultural Values"

আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধ-আগ্রাসনের আগেপরে যে-প্রশ্নগুলা মানুষের কথায়-চিন্তায় অহরহ ঘুরেফিরে এসেছে তার মধ্যে সবচে বড় একটা প্রশ্ন ছিল, সত্যিই কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিরোধ-আন্দোলনের লোকজন যাহা-কিছু-পশ্চিমকে ঘৃণা করে? তারা কি আসলে শুধু সাম্রাজ্যবাদ নয়, খোদ পশ্চিমা সভ্যতার যাবতীয় অর্জনকেই ঘৃণা করে? এবং তা ধর্মীয় কারণে? এ লেখা এই প্রশ্নের ফয়সালা সারতে সাহায্য করবে।

One of the most durable features of the U.S. culture is the inability or refusal to recognize U.S. crimes. The media have long been calling for the Japanese and Germans to admit guilt, apologize, and pay reparations. But the idea that this country has committed huge crimes, and that current events such as the World Trade Center and Pentagon attacks may be rooted in responses to those crimes, is close to inadmissible. Editorializing on the recent attacks ("The National Defense," Sept. 12), the New York Times does give a bit of weight to the end of the Cold War and consequent "resurgent of ethnic hatreds," but that the United States and other NATO powers contributed to that resurgence by their own actions (e.g., helping dismantle the Soviet Union and pressing Russian "reform"; positively encouraging Slovenian and Croatian exit from Yugoslavia and the breakup of that state, and without dealing with the problem of stranded minorities, etc.) is completely unrecognized.

The Times then goes on to blame terrorism on "religious fanaticism...the anger among those left behind by globalization," and the "distaste of Western civilization and cultural values" among

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

the global dispossessed. The blinders and self-deception in such a statement are truly mind-boggling. As if corporate globalization, pushed by the U.S. government and its closest allies, with the help of the World Trade Organization, World Bank and IMF, had not unleashed a tremendous immiseration process on the Third World, with budget cuts and import devastation of artisans and small farmers. Many of these hundreds of millions of losers are quite aware of the role of the United States in this process. It is the U.S. public who by and large have been kept in the dark.

Vast numbers have also suffered from U.S. policies of supporting rightwing rule and state terrorism, in the interest of combating "nationalistic regimes maintained in large part by appeals to the masses" and threatening to respond to "an increasing popular demand for immediate improvement in the low living standards of the masses," as fearfully expressed in a 1954 National Security Council report, whose contents were never found to be "news fit to print." In connection with such policies, in the U.S. sphere of influence a dozen National Security States came into existence in the 1960s and 1970s, and as Noam Chomsky and I reported back in 1979, of 35 countries using torture on an administrative basis in the late 1970s, 26 were clients of the United States. The idea that many of those torture victims and their families, and the families of the thousands of "disappeared" in Latin America in the 1960s through the 1980s, may have harbored some ill-feelings toward the United States remains unthinkable to U.S. commentators.

During the Vietnam war the United States used its enormous military power to try to install in South Vietnam a minority government of U.S. choice, with its military operations based on the knowledge that the people there were the enemy. This country killed millions and left Vietnam (and the rest of Indochina) devastated. A Wall Street Journal report in 1997 estimated that perhaps 500,000 children in Vietnam suffer from serious birth defects resulting from the U.S. use of chemical weapons there. Here again there could be a great many people with well-grounded hostile feelings toward the United States.

The same is true of millions in southern Africa, where the United States supported Savimbi in Angola and carried out a policy of "constructive engagement" with apartheid South Africa as it carried out a huge cross-border terroristic operation against the frontline states in the 1970s and 1980s, with enormous casualties. U.S. support of "our kind of guy" Suharto as he killed and stole at home and in East Timor, and its long warm relation with Philippine dictator Ferdinand Marcos, also may have generated a great deal of hostility toward this country among the numerous victims.

Iranians may remember that the United States installed the Shah as an amenable dictator in 1953, trained his secret services in "methods

of interrogation," and lauded him as he ran his regime of torture; and they surely remember that the United States supported Saddam Hussein all through the 1980s as he carried out his war with them, and turned a blind eye to his use of chemical weapons against the enemy state. Their civilian airliner 655 that was destroyed in 1988, killing 290 people, was downed by a U.S. warship engaged in helping Saddam Hussein fight his war with Iran. Many Iranians may know that the commander of that ship was given a Legion of Merit award in 1990 for his "outstanding service" (but readers of the New York Times would not know this as the paper has never mentioned this high level commendation).

The unbending U.S. backing for Israel as that country has carried out a long-term policy of expropriating Palestinian land in a major ethnic cleansing process, has produced two intifadas— uprisings reflecting the desperation of an oppressed people. But these uprisings and this fight for elementary rights have had no constructive consequences because the United States gives the ethnic cleanser arms, diplomatic protection, and carte blanche as regards policy.

All of these victims may well have a distaste for "Western civilization and cultural values," but that is because they recognize that these include the ruthless imposition of a neoliberal regime that serves Western transnational corporate interests, along with a willingness to use unlimited force to achieve Western ends. This is genuine imperialism, sometimes using economic coercion alone, sometimes supplementing it with violence, but with many millions—perhaps even billions—of people "unworthy victims." The Times editors do not recognize this, or at least do not admit it, because they are spokespersons for an imperialism that is riding high and whose principals are unprepared to change its policies. This bodes ill for the future. But it is of great importance right now to stress the fact that imperial terrorism inevitably produces retail terrorist responses; that the urgent need is the curbing of the causal force, which is the rampaging empire.

[http://www.zmag.org/ZNET.htm]

Norman Solomon

War Needs Good Public Relations

আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন ওয়ারফেয়ার শুধু হাইটেক মিজাইল দিয়ে চলে নি; দরকার পড়েছে হাইটেক মিডিয়ারও। সেই মিডিয়া যুদ্ধের জন্য মার্কিন সরকারকে বিশেষজ্ঞ-ফার্মের লোকজনকে শত মিলিয়ন ডলার দিয়ে ভাড়া করতে হয়। প্রচারণা-পুঁজিবাদ-যুদ্ধে অতি সাম্প্রতিক একটা বিবরণী পাওয়া যাবে এই লেখায়।

For some people, war is terror, disaster and death. For others, it's a PR problem.

At the Rendon Group, a public-relations firm with offices in Boston and Washington, pleasant news arrived the other day with a $397,000 contract to help the Pentagon look good while bombing Afghanistan. The four-month deal includes an option to renew through most of 2002.

This is a job for savvy PR pros who know how to sound humanistic. "At the Rendon Group, we believe in people," says the company's mission statement, which expresses "our admiration and respect for cultural diversity" and proclaims a commitment to "helping people win in the global marketplace."

A media officer at the Pentagon explained why Rendon got the contract. "We needed a firm that could provide strategic counsel immediately," Lt. Col. Kenneth McClellan said. "We were interested in someone that we knew could come in quickly and help us orient to the challenge of communicating to a wide range of groups around the world."

As a PR outfit, Rendon has moved in some powerful economic circles, with clients including official trade agencies of the United States, Bulgaria, Russia and Uzbekistan. In Washington, the firm helped organize a series of conferences on "post-privatization management in the global telecommunications, electric power, oil and gas, banking and finance, and transportation sectors." Some of the clientele has been more liberal or

touchy-feely: Handgun Control Inc. and the American Massage Therapy Association.

Rendon proudly notes that it provided "community and media relations counsel to the Monsanto Chemical Company in its effort to clean up several contaminated sites." Overseas, Rendon helped the Kuwait Petroleum Corporation to cope with labor strife and bad press when closing a refinery in Naples, Italy.

Some clients have been more shadowy. Rendon worked for the government of Kuwait in the early 1990s. And the firm made a lot of money by contracting with the CIA to do media work for the Iraqi National Congress, an organization seeking the overthrow of Saddam Hussein.

Now, the Rendon Group is facing what is perhaps its most challenging project yet -- spinning for a war in Afghanistan. With its sights set on media content in 79 countries, Rendon will use standard tools of the PR trade, such as focus groups, websites and rigorous analysis of news coverage.

Defense Secretary Donald Rumsfeld said that "we need to do a better job to make sure that people are not confused as to what this is about." It's typical of warmakers to claim that the biggest problems lie with others' faulty perceptions rather than their own deadly orders. But no amount of PR wizardry can change the cold facts: when a bomb hits a home for the elderly or a hospital or a residential neighborhood, or when a bombing campaign sets in motion a cataclysm of mass starvation.

If some people are "confused" about this war, it may be because they remember the rationale for it: Killing thousands of civilians is unconscionable.

Though you wouldn't know much about it from watching TV news or skimming the front pages, large numbers of Afghans -- many of them children and elderly -- are facing the likelihood of starvation because the bombing has forced recurrent halts to the movement of food-aid trucks from Pakistan into Afghanistan. Concern is growing among humanitarian aid workers that about 100,000 people are now in imminent peril. By winter, the number could be in the millions.

Meanwhile, on television, we see footage of air-dropped meals that amount to no more than 1 percent of what's needed to prevent people from starving. That's called good PR.

At this point, the playbook for the Pentagon's media game is a familiar one. Consider the words of Eugene Secunda, a professor of marketing and former senior vice president of the J. Walter Thompson firm. "Operation Desert Storm allowed only one view of the battle: the one authorized by the military," he observed in 1991. "Like travelers led from their buses by tour guides, the TV crews were given an opportunity to videotape the 'panoramic vista' before them, and then were whisked to the next officially authorized destination."

Writing a decade ago, Secunda foreshadowed the kind of coverage we're now seeing. "In the aftermath of the war with Iraq, strategic planners, preparing for future wars, are unquestionably examining the lessons gleaned from this triumphant experience. One of the most important lessons learned is the necessity of mobilizing strong public support, through the projection of a powerful and tightly controlled PR program, with particular effort directed toward the realization of positive news coverage."

As bombs routinely fall on Afghanistan, that's the kind of coverage that dominates television screens in the United States. For now, anyway, the Pentagon is winning its PR war at home.

Note to readers: You can access free audio and video of Norman Solomon's recent appearance on C-SPAN's "Washington Journal" at www.c-span.org/terrorism/journal.asp -- listed under Monday, Oct. 15. The one-hour program focuses on media coverage of terrorism and the bombing of Afghanistan.

Terry J. Allen

Afghanistan: 1 Million may Die even if No Bombs Fall

Even if no bombs are dropped on Afghanistan and no bullets fired at Osama bin Laden or the Taliban, 1 million Afghans may die in what United Nations agencies warn will be a humanitarian crisis of "stunning proportions."

Afghanistan, already shredded by such man_made disasters as decades of war and years of Taliban rule, is suffering a major natural disaster in the form of severe drought and famine. Some 3.8 million Afghans we re already dependent on food aid from the inte„national agencies that withdrew after the September 11 attacks. Without new shipments, 320,000 Afghans will run out of food within a week; by December 1.6 million will exhaust their food supply, said UN World Food Program spokesman Khaled Adly.

When the harsh winter descends, 7.5 million very poor Afghans will face starvation and lethal cold, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance. The most vulnerable will die as surely as if they had been ripped apart by bombs.

It is no wonder that Afghans are fleeing in droves toward neighboring countries. Most will be turned back at the border and join millions of internally displaced persons, many condemned to squalid, overcrowded refugee camps.

Afghanistan's neighbors acted quickly to seal borders. They feared an overwhelming human flow that would flood already strained economies and contribute to political unrest. Since 1979, the 3_4 million Afghans in Pakistan, Iran, and other nations have constituted the largest single refugee group in the world.

The US was no more eager than Pakistan to see a new wave of refugees. One of the 18

demands that the Washington reportedly made on Pakistan, was to seal its border with Afghanistan to prevent bin Laden militants from escaping. The US also demanded a halt to fuel exports on which Afghanistan relies for military and civilian transportation and, in much of the severely deforested nation, for heat.

Afghans trapped in miserable border refugee camps, which aid agencies are attempting to supply, may be the lucky ones. Afghanistan reportedly has the world's highest infant, child and maternal mortality rates, the lowest literacy rate and life expectancy, and one of the two or three lowest levels of per capita food availability in the world. The UN puts life expectancy at 43.

The current drought and famine are so bad that "Some people, especially in the central parts of Afghanistan, have reportedly eaten poisonous grass that caused paralysis and many in the northern provinces have been eating meals of locusts mixed with animal fodder," reported the UN World Food Program.

"In today's Afghanistan," with its drought, wars, ruined infrastructure, and bad governance, wrote Afghan_ American author Tamim Ansary, "only the Taliban eat," Last July, Taliban leader Mulla Mohammed Omar called the drought God's punishment for the people's discontent with Taliban rule, and neglect of their religious duties.

While the US has not blamed the Afghan people for the plague of Taliban rule, the effect of Washington's actions may be to sentence one million of them to death for the polices of their leaders.

NOTE FROM TERRY:

People wanting to help a group supporting humanitarian relief and opposing Taliban offenses might consider sending a (tax-deductible) donation to the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)

The Afghan Women's Mission 260 S. Lake Avenue, PMB 165 Pasadena, CA 91101

You can read more about their work at www.rawa.org

[www.znet.org]

Justin Podur

Answers to Some Common Pro-War Arguments

October 7, 2001

The US and UK have begun to bomb Afghanistan. They have begun the bombing of Kabul and Kandahar. They have also dropped some food on the region. In order to assist activists, here are some common arguments for war, and answers to them. It refers to a number of helpful essays available on ZNet.

1. We have to do something to deal with the immediate threat.

In Secretary of Defense Rumsfeld's October 7 address, he said that there is no way to protect against every imaginable and unimaginable attack that terrorists can think of. He was right in this. He then went on to say that the only solution was to attack the terrorists and destroy them, to take the battle to them. We will return to this below.

The immediate threat, of further terrorist acts, can only be dealt with by improved security measures. Locking the cockpit of a plane, having more careful security measures, and so on.. A generalized attack on Afghanistan does not directly enhance the security of US civilians, and is directly harmful to the security of Afghani civilians. If Afghani civilians are as important as US civilians, then this war cannot continue.

If the only two options were (1) to try the al-Qaeda network in absentia, issue arrest warrants and resolve to catch them as soon as possible, and then to wait for an opportunity while pursuing diplomatic options, or (2) to launch a war that would kill many more innocent people, what would the moral course be?

Those aren't the only two options. Monbiot's proposal of 'Collateral Repair' (http://www.zmag.

org/monbiotcollat.htm) is to drop way more food than bombs, or rather, just food and not bombs. He makes a convincing case that this would, fairly quickly, result in just the kinds of changes that the US government claims it would like to see in Afghanistan.

2. We need to deter terrorists from further attacks.

This argument depends on terrorists being 'deterrable' by threats against them or the people they are oppressing. That the attacks of September 11 were suicide attacks establishes that a threat of death is not a deterrent to those responsible for them.

There is evidence that violent attacks and assassination campaigns against terrorist organizations does not deter suicide bombers. Israel has been carrying out a war against Palestinians in the occupied territories for decades. Part of this war has been the targeted assassinations of Palestinian dissident leaders believed to be responsible for suicide bombings. This has not prevented suicide bombings from occurring regularly in Israel.

A sensible approach on the other hand, would be to bring the specific perpetrators of the crimes to justice, and also to redress the grievances of those who are vulnerable to being recruited by terrorist networks. In Tariq Ali's words, 'The only real solution is a political one. It requires removing the causes that create the discontent. It is despair that feeds fanaticism and it is a result of Washington's policies in the Middle East and elsewhere.' (http://www.zmag.org/alicalam.htm)

3. The attacks are surgical, and we're doing humanitarian aid simultaneously. Civilians are being safeguarded.

Let us look at the food issue first. The figure given by the CNN for the first day's airdrops of food was 37500 rations. One ration is 3 meals, or one person-day of food. There are between 3-7 million people at risk of starvation. So in order to alleviate the danger, the rate of airdrops has to increase by a factor of one hundred.

Bush pledged $324 million in humanitarian aid to Afghanistan. Each ration costs $4.25. Let us assume that there are only 3 million at risk of starvation, that every ration will reach one of those people, and that every dollar of that $324 million is going to rations (and not to the planes, fuel, staff, medicine, or any other item). Under these generous assumptions, there will be enough food to feed these people for 25 days. The reality is much worse: millions are now fleeing the bombing, and will not sow their crops of winter wheat. Much of the dropped food will land in minefields and remote areas. Most of Bush's money will not be spent on food. And there are probably 7.5 million in danger of starving, not 3 million. But even in this scenario the money is insufficient to last for the winter. Also for comparison, $40 billion was appropriated for the war effort, and a single B-2 bomber costs $2.1 billion.

On the surgical nature of the strikes, it is important to note that

there is just no way to know. The only footage available so far is a fuzzy green screen on CNN, and highly controlled releases from the government. The government has openly stated that they will not give details on their operations, and so it is unlikely that we will be informed of the full impact of the war on civilians. If all of the history of war and the specific record of US-UK military actions in the past is any guide, the war will have devastating impacts on civilians.

4. The UN is untrustworthy, undemocratic, and anti-American. Adhering to international law and letting the UN take the lead would be a disaster.

Would using the relevant international legal instruments lead to an outcome more unjust and less conducive to security than launching a war? It seems unlikely. Consider the comparison to Nicaragua, mentioned by Noam Chomsky (http://www.zmag.org/chatwithchom.htm):

'We should remember that there are real precedents for this. The most obvious, because it is supported by a World Court decision and UN Security Council resolution, the highest authorities. Twenty years ago the United States launched a war against Nicaragua. That was a terrible war. Tens of thousands of people died. The country was practically destroyed. Nicaragua did not respond by setting off bombs in Washington. They went to the World Court with a case, the World Court ruled in their favor and ordered the United States to stop its "unlawful use of force" (that means international terrorism) and pay substantial reparations. Well, the United States responded by dismissing the court with contempt and immediately escalated the attack. At that point Niagara went to the UN Security council which voted a resolution calling on all states to obey international law. They didn't mention anyone, but everyone knew they meant the United States. Well, the United States vetoed it. Nicaragua then went to the General Assembly which, two years in a row passed a similar resolution with only the United States and Israel opposed. El Salvador in one year. But of course, the United States is a very powerful country. If it opposes lawful means, they can't be pursued. So Nicaragua could do nothing. On the other hand, if the U.S. pursued those means no one would stop it. In fact, everyone would support it.'

In this case, the whole world really is with the US, and no one would act to stop the US from using all the relevant international law to bring the perpetrators to justice.

5. The Taliban is horrible and their replacement by the Northern Alliance would be an improvement.

The first part is certainly true, but the second is debatable. To quote Robert Fisk (http://www.zmag.org/whoallies.htm), the Northern Alliance includes men who 'looted and raped their way through the suburbs of Kabul in the Nineties. They chose girls for forced marriages,

murdered their families' 'And, dare I ask, how many bin Ladens are serving now among our new and willing foot-soldiers?'

If the end of this open-ended war is the Northern Alliance in power after a long bombardment and various commando raids and assassinations of key Taliban leaders, the Afghani people who survive all this will not thank us.

Again, what would be a better solution for Afghanistan? Vijay Prashad makes some suggestions (http://www.zmag.org/forwardpast.htm). 'What are the alternatives? The mujahidin, mainly Hikmityar's crew, have killed much of the intelligentsia during its reign of terror in the 1990s, and it led to the exile of a huge number of reasonable Afghans, many of whom took shelter in New Delhi (and do not wish to return to a place that has given their families such nightmares). Organized refugee groups, like RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan), the Afghan Women's Network, and other such people's organizations have been at work for years trying to restart a progressive dynamic among Afghan refugees, but also to spill over into the besieged country. These groups will not be party to the types of corrupt capitalist deals already being worked out in Roman suburbs and in Uzbekistan: a moratorium on the exploitation of Afghanistan is perhaps in order, with the profits from a potential natural gas pipeline drawn into the redevelopment of the country's productive base and democratic institutions rather than toward Unocal or Bridas. These are our fights, against the war aims of the US and their new, yet old, allies, but in support of those popular agencies that oppose the Taliban from within the contradictions of Afghan life, both in diaspora and at home. It is time to move on the contradictions.'

Downloaded fromhttp://www.zmag.org/ZNET.htm

Michael Albert & Stephen R. Shalom

Five Arguments Against War

In the wake of the horrific attacks of September 11, many people find their feelings of sadness and shock mixed with anger and calls for war. But war would be horribly wrong for at least five reasons.

1. Guilt hasn't yet been proven.

As the New York Times acknowledged, "Law enforcement officials ... appear to have little solid evidence tying Mr. bin Laden's group to the attacks" (NYT, 20 Sept. 2001). If we believe in law and justice, when crimes are committed we don't advocate that victims who have a strong hunch about culprits impose punishment. We demand proof. We reject vigilantism. We reject guilt by association. This is elementary and uncontestable, except when fear and the drums of war cloud consciousness. In the case of September 11, though an Islamic or Middle Eastern connection seems clear, there are many extremist groups that might have been responsible. To rush to punitive judgment, much less to war, before responsibility has been determined violates basic principles of justice. Guilt should be proven, not suspected.

2. War would violate International Law.

International law provides a clear recourse in situations of this sort: present the matter to the Security Council, which is empowered under the UN Charter, the fundamental document of contemporary international law, to take appropriate action. The Security Council has met and unanimously denounced the terrorist attacks, passing a strong resolution. But the Security Council resolution did not -- despite what Washington might

আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধবিরোধিতা

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানুষ

claim -- authorize the use of force, and especially not a unilateral use of force. The resolution ends by saying that the Council "remains seized of the matter," which as former UN correspondent Phyllis Bennis notes, is "UN diplo-speak" meaning that "decision-making remains in the hands of the Council itself, not those of any individual nation." To be sure, the UN Charter allows countries to act in self-defense which would permit the United States to shoot down a terrorist plane, for example. But it has long been clear UN doctrine that self-defense does not allow countries to themselves launch massive reprisal raids -- precisely because to allow such reprisals would lead to an endless cycle of unrestrained violence.

3. War would be unlikely to eliminate those responsible for the September 11 attacks.

If bin Laden is indeed the evil genius responsible for the September 11 attacks, is it credible that he and his top aides would be so bumbling as to wait around for the U.S. military to exterminate them? We know they have already abandoned their training camps (NYT, 19 Sept. 2001). They may have relocated themselves to some unknown caves in the Afghan mountains, they may have moved into various Afghan villages, blending in with the population, or they may even have left the country entirely. Are U.S. bombers and cruise-missiles really going to find bin Laden and unknown associates? It's doubtful that Washington has good intelligence as to their whereabouts; when the U.S. launched cruise missiles at bin Laden in 1998 -- with the advantage of surprise -- its information was out of date and he was already gone. It's likely to be even harder to find him and his lieutenants now. War is hardly the most effective way to pursue the perpetrators and they are hardly likely to be its primary victims.

4. Huge numbers of innocent people will die.

It was precisely the fact that the September 11 attacks killed large numbers of civilians that made the attacks terroristic and so horrific. If it is immoral to slaughter thousands of Americans in an effort to disrupt the U.S. economy and force a change in U.S. policy, it is no less immoral to slaughter thousands of Afghans in an effort to force the Taliban to change its policy. The United States is moving large numbers of warplanes and missile-launching vessels into the region, yet there are hardly any military targets in Afghanistan for them to attack. It is inevitable that civilians will bear the brunt of any major campaign -- civilians who, in their vast majority, probably are ignorant not only of the recent terrorist assault on the U.S., but probably even of bin Laden himself. Ground forces might be less indiscriminate, but it's hard to imagine that Washington's military plans won't involve the massive application of force, with horrendous human consequences.

While the image of bombers flying over Afghanistan and bombing a people whose average lifespan is about 45 years of age and who are suffering terrible deprivation already -- not least due to the Taliban, which the U.S. helped create and empower -- is horrifying enough, it is important to realize that death and deprivation come in many forms. Even without widespread bombing, if the threat to attack the civilian population or outright coercion of other countries leads to curtailment of food aid to Afghanistan, the ensuing starvation could kill a million or more Afghans by mid-winter. Is this the appropriate response to terror?

5. War will reduce the security of U.S. citizens.

What drives people to devote -- and even sacrifice -- their lives to anti-American terrorism? No doubt the causes are complex, but surely deep feelings of anger and frustration at the U.S. role in the Middle East is a significant factor. If the United States goes to war some terrorists may certainly be killed, but so too will many innocent people. And each of these innocent victims will have relatives and friends whose anger and frustration at the United States will rise to new heights, and the ranks of the terrorists will be refilled many times over. And the new recruits will not just come from Afghanistan. To many Muslims throughout the Middle East, war will be seen as an attack on Islam -- and this is one reason that many of Washington's Islamic allies are urging caution. Significantly, the New York Times reports that the "drumbeat for war, so loud in the rest of the country, is barely audible on the streets of New York" (NYT, 20 Sept. 2001). Their city suffered unbearable pain, but many New Yorkers know that the retaliatory killing of people in the Middle East will not make them any safer; on the contrary, it is likely to lead to more, not less terror on U.S. soil, and in any event, would wish the same pain on still more innocent people.

The dynamic of terror and counter-terror is a familiar one: it leads not to peace but to more violence. Israel's response to terrorism hasn't brought Israelis more security. Nor has retaliatory terrorism made people more secure elsewhere. Indeed, it is quite likely that the perpetrators of the terror attack on the United States would like nothing more than to induce a massive U.S. military response which might destabilize the whole region, leading to the creation of millions of holy warriors and the overthrow of governments throughout the Islamic world. Whether bin Laden's al-Qaeda or some other extremist group or groups is responsible, war might play right into their hands, reducing the security of us all.

Edward Said

Misinformation About Iraq

The flurry of reports, leaks, and misinformation about the looming US war against Saddam Hussein's dictatorship in Iraq continues unabated. It is impossible to know, however, how much of this is a brilliantly managed campaign of psychological war against Iraq, how much the public floundering of a government uncertain about its next step. In any event, I find it as possible to believe that there will be a war as that there will not. Certainly the sheer belligerency of the verbal assaults on the average citizen are unprecedented in their ferocity, with the result that very little is totally certain about what is actually taking place. No one can independently confirm the various troop and navy movements reported on a daily basis, and given the lurching opacity of his thinking, George W Bush's real intentions are difficult to read. But that the whole world is concerned -- indeed, deeply anxious -- about the catastrophic chaos that will ensue after another Afghanistan-like air campaign against the people of Iraq, of that there is little doubt.

And yet, one aspect of the deluge of opinion, and a fact that is most disturbing quite on its own and without reference to its actual intention, is the spate of articles concerning post-Saddam Iraq. One that I'd like to discuss in particular is obviously part of a continuing effort by an Iraqi expatriate, Kanan Makiya, to promote himself as the father of what he calls a "non-Arab" and decentralised post-Ba'ath country. Now it is quite clear to anyone with the slightest concern about the travails of this rich and once-flourishing country that the years of Ba'athist rule have been disastrous, despite the regime's early programme of development and building. So there can be little quarrel with trying to imagine what Iraq might look like if Saddam is toppled either

১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মানুষ

by American intervention or by internal coup. Makiya's contribution to this effort has been a steady one, both on the airwaves and in quality journals where he is given a platform to air his views, about which I shall speak in a moment. What has been made less clear, however, is who he is and from what background he emerges. I think it is important to know these things, if only to judge the value of his contribution and to understand more precisely the special quality of his thoughts and ideas.

Usually identified as having a research connection with Harvard and as a professor at Brandeis University (both in Boston), Makiya when I knew him first in the early 1970s was closely affiliated with the Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine. As I recall, he was then an architecture student at MIT, but he hardly said anything during the occasions I saw him. Then he disappeared from view, or rather from my view. He surfaced in 1990 as Samir Khalil, the author of a vaunted book called The Republic of Fear that described Saddam Hussein's rule with considerable dread and drama. One of the media-rousing works of the first Gulf War, The Republic of Fear seemed to have been written -- according to a fawning interview with Makiya that appeared in the New Yorker magazine -- while Makiya took time off from working as an associate of his father's architectural firm in Iraq itself. He admitted in the interview that, in a sense, Saddam had financed the writing of his book indirectly, although no one accused Makiya of collaborating with a regime he obviously detested.

In his next book, Cruelty and Silence, Makiya attacked Arab intellectuals whom he accused of opportunism and immorality because they either praised various Arab regimes or remained silent about the various governments' abuses against their own people. Of course Makiya said nothing about his own history of silence and complicity as a beneficiary of the Iraqi regime's munificence, even though, of course, he was entitled to work for whomever he pleased. But he said the vilest things about people like Mahmoud Darwish and myself for being nationalists, allegedly supporting extremism and, in Darwish's case, for having written an ode to Saddam. Most of what Makiya wrote in the book was, in my opinion, revolting, based as it was on cowardly innuendo and false interpretation, but the book, of course, enjoyed a popular moment or two since it confirmed the view in the West that Arabs were villainous and shabby conformists. It seemed not to matter that Makiya himself had worked for Saddam or that he had never written anything about the Arab regimes until his Republic of Fear, until, that is, he was out of Iraq and done with his employment there. He was hailed here and there in America for being a brave man of conscience and for having defied the self-censoring practice of Arab intellectuals, but this praise was usually heaped on Makiya by people who had no knowledge of the fact that Makiya himself never wrote in an Arab country or that whatever meagre writing he produced

had been written behind a pseudonym and a prosperous, risk-free life in the West.

Except for his two books and an article urging the US administration to occupy Baghdad during the first Gulf War, Makiya wasn't much heard from after that. Then last year he produced an unreadable novel proving somehow that the Dome of the Rock was really built by a Jew; it was sent to me by the publisher, so I happened to have skimmed it before it appeared officially, but was nevertheless aghast at how badly written it was, and how, unable to resist showing off how many books its author had read, it was peppered with footnotes, surely an unusual thing for what purported to be a work of fiction. It died a merciful death, however, and Makiya lapsed back into silence.

Until the government-inspired campaign against Iraq broke out a few months ago Makiya had said little about the war against terror, the events of 9/11, and the war in Afghanistan. It is true that he did a kind of commentary for a popular American biweekly of Mohamed Atta's supposed Islamic terrorist handbook, but even by his standards it was a negligible performance. I vividly recall, however, that late last summer I happened by chance to hear a radio interview with him in which he was identified for the first time as heading a US State Department group planning for a post-war, post-Saddam Iraq. His name had not appeared among those mentioned as being part of the US-funded Iraqi opposition groups, nor had he contributed anything that could be read by a member of the general public about the Palestinian-Israeli conflict or any other Middle Eastern issues, although I had heard that he had visited Israel a number of times.

The most complete version of his plans for Iraq after an American invasion that derive from his current employment as a resident employee of the US Department of State, appears in the November 2002 issue of Prospect, a good liberal British monthly to which I subscribe. Makiya begins his "proposal" by enumerating the extraordinary assumptions behind his arguments, two of which almost by definition are unimaginable. The first is that "the unseating" of Saddam should not occur after a bombing campaign. Makiya must have been living on Mars to imagine that, in the event of a war, a massive bombing attack would not occur even though every single plan circulated for regime change in Iraq has stated explicitly that Iraq would be bombed mercilessly. The second assumption is equally imaginative, since Makiya seems to believe against all evidence that the US is committed to democracy and nation- building in Iraq. Why he thinks that Iraq is like Germany and Japan after World War II (both of which were rebuilt because of the Cold War) is beyond me; besides, he doesn't once mention the fact that the US is determined to bring down the Iraqi regime because of the country's oil reserves and because Iraq is an enemy of Israel. So, he starts out by making prepos-

terous assumptions that simply fly in the face of all the evidence.

Undeterred by such unimportant considerations, he presses on. Iraqis are committed to federalism, he says, rather than to a centralised government. The proof that he offers is pretty negligible. Like all his other attempts to convince his reader that he makes telling points, his logic is so weak because it is based equally on fictional supposition and his own, highly dubious personal affirmations. He is committed to federalism, and so he says are the Kurds. Where federalism as a system is supposed to come from (other than from his desk in the State Department), he doesn't bother to say. Clearly, he plans to have it imposed from the outside, although he makes the largely unsubstantiated claim that "everyone" is agreed that federalism in Iraq should be the outcome. This "means devolving power away from Baghdad to the provinces", presumably by a stroke of General Tommy Franks' pen. One would have thought that post-Tito Yugoslavia never existed and that that tragic country's federalism was a total success. But Makiya is so committed to his views as a kinglike theoretician of government that he simply ignores consequences, history, people, communities, and reality altogether so that he can make his ludicrously improbable case. This, of course, is exactly what the US government likes, that is, to have miscellaneous Arab intellectuals responsible to no constituency who urge the US military on to war while pretending to be bringing "democracy" to the place in full contradiction of America's real aims and its actual historical practices. Makiya seems not to have heard about ruinous US interventions in Indochina, Afghanistan, Central America, Somalia, Sudan, Lebanon, and the Philippines, or that the US is currently involved militarily with about 80 countries.

The grand climax of Makiya's justification for the invasion of Iraq by the United States is his proposal that the new Iraq should be non-Arab. (Along the way, he speaks contemptuously of Arab opinion which, he says, will never amount to anything. This obviously clears the board for his airy speculations about both the future and the past.) How this magical de-Arabising solution is to come about, Makiya doesn't say, any more than he shows us how Iraq is to be relieved of its Islamic identity and its military capabilities. He refers to a mysterious alchemical quality he calls "territoriality" and proceeds to build another sandcastle on that as the basis for a future state of Iraq. In the end, however, he volunteers that all this is going to be guaranteed "from the outside", by the United States. Where this has ever taken place before is not an issue that troubles Makiya, any more than he seems concerned about US unilateralism and needless destructiveness.

One scarcely knows whether to laugh or cry at Makiya's posturings. Clearly this is a man with no recorded experience of government, or even of citizenship. Between countries and cultures and with no visible com-

mitment to anyone (except to his upwardly mobile career), he has now found a haven deep inside the US government which he uses to fuel his amazingly speculative flights of fancy. For someone who has lectured his peers about intellectual responsibility and independent judgement, he provides examples of neither one nor the other. Exactly the opposite. Perched on a pulpit that has freed him from any accountability he seems now to be serving a master who has paid him well for his services -- as Saddam employed him in the past -- and his versatile conscience. I find it incredible that Makiya allows himself such sanctimony and vanity, but then why shouldn't he? He has never engaged in a public debate with any of his fellow Iraqis, never written for an Arab audience, never put himself forward for an office or for any political role requiring personal courage and commitment. He has either written pseudonymously or attacked people who have had no chance to respond to his defamations.

It is sad that Makiya implicitly suggests that his is the voice and the example of the future Iraq. And to think that thousands of lives have already been lost to his patron's cruel sanctions or that many more lives and livelihoods are about to be destroyed by electronic warfare wreaked on his country by George Bush's government. But this man is untroubled by any of this. Devoid of either compassion or real understanding, he prattles on for Anglo- American audiences who seem satisfied that here at last is an Arab who exhibits the proper respect for their power and civilisation, regardless of what role Britain played in the imperialist partition of the Arab world or what mischief the US dealt the Arabs through its support for Israel and the collective Arab dictatorships.

In and of himself, Makiya is a passing phenomenon. He is, however, a symptom of several things at once. He represents the intellectual who serves power unquestioningly; the greater the power, the fewer doubts he has. He is a man of vanity who has no compassion, no demonstrable awareness of human suffering. With no stable principles or values, he is typical of the cynical anti-Arab hawks (like Richard Perle, Paul Wolfowitz, and Donald Rumsfeld) who dot the Bush administration like flies on a cake. British imperialism, Israel's brutal occupation policies, or American arrogance do not detain him for a moment. Worst of all, he is a man of pretension and superficiality, flattering himself on his reasonableness even as he condemns his own people to more travail and more dislocation. Woe to Iraq!

[Al Ahram; November 30, 2002]

মানুষ-এর কাজের লোকদের পরিচিতি

এই পত্রিকার জন্য আমরা যারা লিখেছি, যাদের লেখা অনুবাদ করেছি, আর যাদের লেখা পুনর্মুদ্রণ করেছি তাদের নাম আর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণানুক্রমে দেয়া গেল। অনেকেরই পরিচয় অতিসংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। পরিচয়গুলা একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করা নয়, অন্যদিকে আমাদের দিক থেকে যত্নের পুরোটা আমরা নিতে পারিও নাই– এই দুই কারণে এই 'পরিচিতি' ত্রুটিমুক্ত না-হওয়া বিচিত্র না। পরিচিতিগুলা সব এক হাতে লেখা না। ফলত রীতিভিন্নতা আছে।

অরুন্ধতী রায়: প্রথম উপন্যাস *দ্য গড অব স্মল থিংস্* লিখেই ভারতদেশীয় লেখক অরুন্ধতী রায় আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি কেবল একজন ঔপন্যাসিকই নন, এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর চারপাশের পৃথিবীকে নিয়ে সর্বদা সজাগ থাকেন, কথা বলেন, এবং লড়াই করে যান। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে আছে *পাওয়ার পলিটিক্স, কস্ট অব লিভিং, দ্য গ্রেটার কমন* গুড ইত্যাদি। নর্মদা-প্রকল্পের পক্ষে হাইকোর্টের রায় অমান্য করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য তাঁকে সম্প্রতি জেলে যেতে হয়েছিল।

অসীম কুমার দাস: কবি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক। কাব্যগ্রন্থ: *ঝঞ্ঝা ও পুনরুত্থান*।

আ-আল মামুন: রাজশাহী-বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ-বিভাগের সহকারী-অধ্যাপক। *যোগাযোগ*-পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। *অ্যাডকমসো জার্নাল*-এর সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। এডোয়ার্ড এস. হারম্যান ও নোম চমস্কির *ম্যানুফ্যাক্চারিং কনসেন্ট* গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করছেন। ই-মেইল: namamun73@yahoo.com।

আফাজউদ্দিন বিপ্লব: দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।

আবদেলকরিম আল-কারমি (আবু সালমা): প্যালেস্টাইনের কবি। আবু সালমার জন্ম ১৯০৭ সালে হাফিয়াতে। তিনি আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেন এবং ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলিরা শহরটি দখল করার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। এরপর আক্কাতে চলে যান। কিছুকালের মধ্যেই তিনি আক্কা ছেড়ে দামেস্কে চলে যান। আক্কাতে থাকাকালে আবু সালমা নিজ শহরে প্রত্যাবর্তনের আশায় তার বাসভবন ও অফিসের চাবি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনের কবি ইব্রাহিম তুকান ছিলেন তাঁর বন্ধু। কবিতা আর প্যালেস্টাইনের প্রতি ভালোবাসার সুবাদে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এশীয় ও আফ্রিকীয় লেখক সংঘ আবু সালমাকে ১৯৭৮ সালে 'দ্য লোটাস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর লিটারেচার' প্রদান করে। তাঁকে 'অলিভ অফ প্যালেস্টাইন' অভিধায়ও ভূষিত করা হয়।

আবদেলরহিম মাহমুদ: প্যালেস্টাইনের তুলকারেমে ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তুলকারেম প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাক-শিক্ষা নিয়ে আল-নাজাহ ন্যাশনাল স্কুলে চলে যান। এবং ইব্রাহিম তুকানের ('পরিচিতি' দেখা যেতে পারে) ছাত্র হন, যিনি মাহমুদের প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন। আল-নাজাহ'তে আরবি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। ব্রিটিশ

ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে যখন বিপ্লব শুরু হয় তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পরে ইরাকে চলে যান। ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনে ফিরে এসে ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৪৮ সালের ১৩ই জুলাই আল-নাসিরাহ (বাইবেলবর্ণিত নাজারাত) এর কাছাকাছি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান।

আবু নাসের মোহাম্মদ ওয়াহিদ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। পড়াশোনা করতে এখন যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইমেইল: anmwahid@email.com।

আবু শুকুর-ই-বলখ: দশম শতকের আফগান কবি। ফার্সি কবি ওমর খৈয়ামের লেখা *রুবাইয়াত*-এর ভূমিকা-লেখক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত।

আমিন আজিমী: ড. আমিন আজিমী একজন পেশাদার মনোচিকিৎসক এবং আমেরিকার টেনেসি প্রদেশের নাসভিল শহরের বিয়ে ও পরিবার সংক্রান্ত চিকিৎসা-উপদেষ্টা। যুবা-বয়সে আফগানিস্তানের কাবুলে তাঁর কবিতা লেখার শুরু। দারি ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি লিখেছেন। কবিতার ভিতরে তিনি খুঁজে ফেরেন আফগানিস্তানের মরমী মন, পাহাড়ের সৌন্দর্য আর ভালোবাসা।

আসিফ নজরুল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগের শিক্ষক। প্রবন্ধ লেখেন। উপন্যাসও লেখেন। অধুনাবিলুপ্ত *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*-য় কাজ করতেন।

আহমদ শাহ্ দুররানি: আফগানিস্তানের স্বাধীনতা-স্থপতি। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি আহমাদ আবদালি ইরানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'আহমদ শাহ্ দুররানি' নাম নিয়ে আফগানদের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হন। দুররানিই আফগানিস্তান শাসন করার গণতান্ত্রিক পন্থা হিসাবে 'লয়া জিগরা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

অ্যান ট্যালবট: অ্যান ট্যালবটের যে-লেখাটা আমরা ছেপেছি সেটা ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অর্গানাইজেশান (আইএসও) এর ওয়ার্ল্ড সোশ্যালিস্ট ওয়েবসাইট-এ পাওয়া গিয়েছিল। এই সংশ্লিষ্টতার কথাটুকু ছাড়া আর কোনো পরিচয় আমরা জানাতে পারছি না তথ্যাভাবে।

ই. ইয়াঘি: পুরো নাম ইদ্না ইয়াঘি। প্যালেস্টাইনের নারী-কবি। এর বাইরের কোনো পরিচয় জানা যায় নি। তবে ইন্টারনেটে এঁর কবিতার বহু পোস্টিং দেখা যায়। বিশেষত *প্যালেস্টাইন ক্রণিকল্* এর সাইটে এঁর গদ্যপদ্য দেখা যায়।

ইব্রাহিম তুকান: ১৯০৫ সালে প্যালেস্টাইনের নাবলুসে জন্ম। নাবলুসের আল-রাশিদিয়া আল-ঘারবিয়া স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাশেষে আল-কুদসের মোত্রান-স্কুলে চলে যান। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সময়পর্বে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন। নাবলুসের আল-নাজাহ ন্যাশনাল-স্কুল (এখন বিশ্ববিদ্যালয়) এ আরবি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। পরে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তুকান ১৯৪১ সালের মে মাসে মারা যান।

উদিসা ইসলাম: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ-বিভাগের বিএসএস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠক্রমের আওতায় বর্তমানে 'ধর্ষণ-সংবাদে লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির

বিচারমূলক পাঠ' শিরোনামে গবেষণা করছেন। ই-মেইল: uma@rajbd.com।

এডোয়ার্ড এস. হারম্যান: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার হুয়ার্টন স্কুলের ফিন্যান্সের অধ্যাপক এবং এমিরিটাস প্রফেসর। অর্থনীতিবিদ ও মিডিয়া-বিশ্লেষক। কর্পোরেট ও আইনগত বিষয়াদি এবং মিডিয়ার পলিটিক্যাল ইকোনোমিতে তাঁর বিশেষ দখল রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা, যার মধ্যে আছে: *কর্পোরেট কন্ট্রোল, কর্পোরেট পাওয়ার; ডেমোনেস্ট্রেশান ইলেকশান্স* (সহলেখক ফ্রাঙ্ক ব্রডহেড); *রিয়েল টেরর নেটওয়ার্ক; ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট* (সহলেখক নোম চমস্কি); *ট্রায়াম্ফ অব দ্য মার্কেট*, *টেররিজম ইন ফ্যাক্ট অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা*, *ভিয়েতনাম অ্যান্ড এল সালভাদর* (সহলেখক ফ্রাঙ্ক ব্রডহেড), *দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য বুলগেরিয়ান কানেকশান* (সহলেখক ফ্রাঙ্ক ব্রডহেড), *আফটার দ্য ক্যাটাক্লিজম* (সহলেখক নোম চমস্কি), *দ্য ওয়াশিংটন কানেকশান্স্ অ্যান্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড ফ্যাসিজম* ইত্যাদি।

এডোয়ার্ড সাঈদ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। জন্ম জেরুজালেমে, ১৯৩৫ সালে। ছোটবেলায় লেখাপড়া করেছেন জেরুজালেম ও কায়রোর পশ্চিমা স্কুলে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন- ও হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে চুকিয়েছেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাট। তাঁর বই *ওরিয়েন্টালিজম* সাহিত্যজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষভাবে আলোচিত অপর বই *আউট অফ প্লেস* তাঁর আত্মজীবনী। সাঈদ অত্যন্ত গুণী পিয়ানোবাদক। সঙ্গীত-সমালোচক হিসাবেও তিনি রীতিমতো খ্যাতিমান।

এন্ড্রু মার: *বিবিসি*'র রাজনৈতিক ভাষ্যকার। *দ্য স্কটসম্যান* পত্রিকায় বাণিজ্য-প্রতিবেদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৮১ সালে। ১৯৮৮–১৯৯২ পর্যন্ত তিনি *ইকোনোমিস্ট* পত্রিকার রাজনৈতিক সম্পাদক ছিলেন। *দ্য অবজারভার* এবং *দ্য এক্সপ্রেস* পত্রিকাতেও কাজ করেছেন। ১৯৯০ সালের মে মাসে তিনি *বিবিসি*-তে রাজনৈতিক সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

কনি আল-রামাহি: প্যালেস্টাইনের কবি। বিস্তারিত পরিচয় জানা যায় নি।

কামাল নাসির: ১৯২৫ সালে বির্‌জিত-এ জন্মগ্রহণ করেন। বির্‌জিত স্কুলে পড়ালেখার পাট চুকিয়ে বৈরুতের অ্যামেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই তিনি বির্‌জিত স্কুলে কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে করতে ১৯৫৬ সালে রামাল্লা'র প্রতিনিধি হিসেবে জর্ডানের সংসদে নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল পশ্চিম তীর দখল করলে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি পিএলও'র নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন এবং এই কমিটির তথ্যপ্রচার-বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব নেন। তিনি falasteen al-thawrah ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ইসরাইলী গুপ্তঘাতকের হাতে কামাল বৈরুতে নিহত হন।

কারেম আল-ইরাকি: ইরাকের কবি। বিস্তারিত পরিচয় জানা যায় নি।

কাহার অসি: সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় আফগান কবি ও যোদ্ধা। হেকমতিয়ার-বিদ্রোহীদের রকেট-হামলায় কাবুলে নিহত হন। তার কবিতা বিধ্বস্ত স্বদেশভূমির জন্য ভালবাসা ও মমতায় ভরা। কাহার অসি যখন লিখছেন, তখনও সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে যায় নাই, এবং মুজাহেদিনরা তখনও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে আর তাদের চোখে তখনও সুন্দর স্বাধীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

ক্যাথারিন ফিনার: ব্রিটেনের *দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকায় কাজ করেন। ই-মেইল: ক্স katharine.viner@guardian.co.uk

খলিলুল্লাহ খলিলি: ওস্তাদ খলিলুল্লাহ খলিলি দারি ভাষার কবি এবং পন্ডিত। খলিলি চর্চা এবং প্রচার করেছেন সততা, সমবেদনা, সম্মান, মর্যাদা এবং শান্তির ধারণা। জন্ম ১৯০৭ সালে আফগানিস্তানের কাবুলে। বাবা-মা উভয়ে ছিলেন সাফি গোত্রের প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য। ৭ বছর বয়সে ওস্তাদ খলিলুল্লাহ খলিলি মাকে হারান। আমির হাবিবুল্লার মৃত্যুর (১৯১৯) পর রাজনৈতিক কারণে তার বাবাকেও হত্যা করা হয়। ১১ বছর বয়সে খলিলি এতিম হয়ে যান এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। কোহিস্তানে থাকার সময় খলিলির ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক বাড়ে এবং তিনি এলাকার ইসলামি পন্ডিতদের সাথে পড়াশোনা করেন। এখানেই তার অনতিক্রম্য সাধনার শুরু। আফগানিস্তান থেকে বাদশাহ আমানুল্লাহর নির্বাসনের (১৯২৯) পর মাত্র ২০ বছর বয়সে খলিলি মাজার-ই-শরিফের গভর্ণর হন এবং জহির শাহের ৪০ বছর শাসনকালে তিনি মহাসচিব, তথ্যমন্ত্রী, সভাকবি, এবং সৌদি আরব ও ইরাকের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ সালের অভ্যুত্থানের সময় তিনি ইরাকে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত। চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন, এবং সোভিয়েতবিরোধী প্রতিরোধ-আন্দোলনে শরিক হন। পাকিস্তানে থাকাকালে দেশের জনগণের দুর্ভাগ্য নিয়ে এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে প্রেরণা জাগিয়ে তার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। ওস্তাদ খলিলুল্লাহ খলিলি কবিতা, উপন্যাস, ইতিহাস এবং সুফিতত্ত্ব বিষয়ে প্রায় ৫০টি গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯৮৭ সালের ৪ঠা মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি: খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির জন্ম ৪ঠা মে ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যু ১০৮৮ খ্রীস্টাব্দে। মরমীচেতনা তাঁর কবিতার প্রধান প্রবণতা।

খুশাল খান খাত্তাক: আফগানিস্তানের জাতীয় কবি। সপ্তদশ শতকে মুঘল শাসনামলের কবি খুশাল খান খাত্তাক (১৬১৩-১৬৯০) লিখেছেন পশতু ভাষায়। থাকতেন হিন্দকুশ পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা। এই বিখ্যাত যোদ্ধা, কবি এবং খাত্তাক গোত্রের প্রধান। মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের ভূমি উদ্ধারের জন্য আফগানদের আহ্বান জানান। ভেদাভেদ ত্যাগ করে তিনি আফগানদের একত্রিত হওয়ার ডাক দেন এবং তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত করেন। জন্ম পেশোয়ারের কাছে। বাবা শাহবাজ খান ছিলেন খাত্তাক গোত্র-প্রধান। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ইচ্ছায় ১৬৪১ সালে খুশাল তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন কিন্তু শাহজাহানের পুত্র আওরঙজেব এসে খুশালকে দিল্লির গোয়ালিয়া দুর্গে বন্দী করেন। পেশোয়ার ফিরবার অনুমতি পাওয়ার পর খুশাল বিদ্রোহকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর কবরে উৎকীর্ণ: "আফগান-অহঙ্কার অক্ষুন্ন রাখতে আমি হাতে তুলে নিয়েছি তরোয়াল। আমি খুশাল খাত্তাক, সময়ের প্রণম্য মানুষ।" খুশাল খানের খাত্তাক গোত্র এখন থাকে কোহাত, পেশোয়ার এবং মারদান-এ।

গাউস রহমান পিয়াস: দৈনিক *প্রথম আলো*-র সাংবাদিক। নিউজ-ডেস্কে বসেন।

গুঞ্জন চৌধুরী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। গান করেন। 'নোঙরছেঁড়া' নামের ব্যাণ্ডসঙ্গীতদলের সদস্য।

জন পিলজার: অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে জন্ম। এখন লন্ডনে। একাধারে যুদ্ধ-সংবাদদাতা,

তথ্যচিত্র-পরিচালক, চিত্রনাট্য-লেখক। বহু দেশ নিয়ে লিখেছেন। ইংল্যান্ডে দু'দুবার সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ পুরস্কার "জার্ণালিস্ট অব দ্য ইয়ার" অর্জন করেছেন ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া বিষয়ক রিপোর্ট-এর জন্য। অ্যামেরিকান টেলিভিশন একাডেমি পুরস্কারও পেয়েছেন।

জালালুদ্দিন রুমি: মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি বল্‌খি'র জন্ম ১২০৭ সালে মাজার-ই-শরিফ এর বল্‌খ-এ। নাম ছিল জালালুদ্দিন মোহাম্মদ। জন্ম যদিও আফগানিস্তানে, তুর্কী এবং প্রাচীন গ্রীসে তিনি পরিচিত ছিলেন "রুমি" অর্থাৎ "রোমের লোক" হিসাবে। মোঙ্গলীয় আক্রমণের কালে তাঁর পরিবার তুরস্কের আনাতোলিয়ায় চলে যায়। আফগানিস্তানে তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন বল্‌খি নামে স্বীকৃত কিন্তু তুর্কীরা তার জন্মস্থান হিসাবে তুরস্ককে দাবী করে। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে যেখানে তিনি জন্মেছিলেন সেটা এককালে পরিচিত ছিল তুর্কীস্তান নামে। অবশ্য আফগানিস্তানে মোঙ্গলীয় আগ্রাসনের পর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর ১২৭৩ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তুরস্কই ছিল তার স্থায়ী নিবাস। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন দরবেশ শামস্ তাবরিজী। সুফী তরিকার এই গুরুসঙ্গ তাঁর জীবনকে আমূল পাল্টে দেয়। সঙ্গ করার ৩ বছরের মাথায় তাবরিজী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে মাওলানা রুমি পাগলের মতো গুরুকে খুঁজতে থাকেন। তাঁর *মসনবী* এই সময়কালে লেখা। গুরুপ্রেম, সুফীসাধনা আর নিখিল আধ্যাত্মিকতার কাব্য *মসনবীকে* রুমি নিজের লেখা না-বলে তাঁকে দিয়ে তাঁর ওস্তাদের লিখিয়ে-নেয়া বলে দাবি করতেন। তাবরিজীকে খুন করা হয়েছিল বলে অনেকে ধারণা করেন। রুমির মাজার তাবরিজীর মাজারের কাছেই। *মসনবী* ছাড়াও রুমি *ফিই-ই-মা-ফিহ দিওয়ান-ই কবির, মেকালিস-ই-সেবা, রুবালিয়ার, মাকতুবাত* এবং *মেনেউই* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। রুমির শিক্ষার প্রধান মৌলিক নীতি হচ্ছে মন ও হৃদয়ের শুদ্ধিসাধন। তার মরমীবাদ অন্যান্য মরমীদের থেকে আলাদা। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী, নীতিজ্ঞ, এবং পুনর্জাগরণবাদী যিনি তার সমস্ত জীবন ধরে এই আদর্শাবলীর পালন ও প্রচার করে গেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় স্কুল আর মিনারগুলো ধ্বংস না করলে চিন্তার বাধা এবং চৈতন্যের বেদনা কখনো যাবে না। অবিশ্বাস যে একধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস আর রক্ষণশীল ধর্মীয় বিশ্বাস যে একধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস সেটা না-বুঝলে এবং বিরুদ্ধ মতামতের প্রতি সহনশীলতা না-দেখালে যাঁরা সত্য খোঁজেন তাঁদের একজনও তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছবে না। মাওলানা রুমির মতে, মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লার সুন্দরতম নিখুঁত সৃষ্টি, এমনকি তাঁরই এক অংশ। তাঁকে মর্যাদা দিতে হবে। মাওলানার মতে, যে-ব্যক্তি সত্যে এবং আত্মার শুদ্ধতায় পৌঁছেছে সে তার মনোযোগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বার্থপরতা ঘুরিয়ে নেবে বিশ্বচেতনার দিকে। সুফী হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের থেকে বেশি করে পৌঁছোতে চায় বিশ্বচেতনায়। পার্থিব জগতকে চূড়ান্ত মনে করা তার কাজ না। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের ভালোবাসার স্থান সবার আগে, এবং ধর্মগুলো একত্রিত করা যেতে পারে এই ভালোবাসার মাধ্যমে। ১৯২৩ সালে তুর্কী অভ্যুত্থানের পর কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় এসে দেশের সমস্ত মাজার বন্ধ করে দেন। চার বছর বন্ধ থাকার পর ১৯২৭ সালে রুমির মাজার খুলে দেয়া হয় এবং অন্যান্য অনেক মাজার নিষিদ্ধ হলেও রুমির মাজার সবার জন্য খোলা থাকে।

জাস্টিন পোদুর: সাংবাদিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জেড নেটের নিয়মিত ভাষ্যকার। জেড নেটের সাউথ এশিয়া, কলাম্বিয়া, চিয়াপাচ, আফ্রিকা এবং বর্ণবাদ সংক্রান্ত ওয়েবপেজগুলা দেখাশোনা করেন। কানাডা-কলাম্বিয়া-মৈত্রী-তৎপরতার অন্যতম উদ্যোক্তা।

জিওভ প্যারিস: দীর্ঘকাল ধরে শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আন্দোলনের কর্মী। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সিয়েটলে বসবাস করেন। ১৯৯০ এর দশকের মধ্যভাগে অমুনাফামুখী কম্যুনিটি-সংবাদপত্র *ইস্ট এন্ড এস্টেট* প্রকাশ করেছেন। *সিয়েটল উইকলি*-তে নিয়মিত রাজনৈতিক ভাষ্য লেখেন। এছাড়াও তিনি *ইন দিজ টাইমস, ওয়াকিংফরচেন্জ-ডট-কম, অল্টারনেট, জেড নেট* এবং আরও নানান ওয়েবসাইট, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন।

জুয়েল মাজহার: কবি। দৈনিক প্রথম *আলো*-য় কাজ করেন। নিউজ-ডেস্কের প্রথম শিফট দেখেন। অনুবাদ করেন।

জেবা শরিশ-শামলি: আফগানিস্তানের কবি। ওয়াশিংটনভিত্তিক সংগঠন 'আফগানিস্তানের মানবাধিকার এবং শান্তির জন্য নারীদের জোট' (ওয়াফা)-এর মুখ্য পরিচালক।

জে.টি. হ্যারিস: জে টি. হ্যারিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *সান হোসে মার্কারি নিউজ* এর প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকাটির মূল মালিক-কোম্পানি 'নাইট রাইডার' মুনাফা বাড়ানোর জন্যে সাংবাদিক-কর্মচারি ছাঁটাই করার চেষ্টা চালায়। আস্তে আস্তে শক্তিহীন হতে থাকা মার্কিন অর্থনীতির চলতি পটভূমিতে এ ছাঁটাইয়ে রাজি না-হওয়ার কারণে গত ১৯শে মার্চ ২০০১ তারিখে তিনি পদত্যাগ করেন।

টেরি জে. অ্যালেন: স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে সাংবাদিকতা করেন। ক্ষুধা, যুদ্ধ, রাজনীতি ও পরিবেশ বিষয়ক রিপোর্টিঙের সূত্রে পৃথিবীর নানান দেশে কাজ করেছেন। ই-মেইল: tallen@igc.org।

ডেভিড পিটারসন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট *জেড নেট* এর নিয়মিত প্রদায়ক।

ডেভিড ম্যাক্‌রেইনল্ডস্: মার্কিন নাগরিক। ১৯৫১ সালে মার্কিন সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দেন। ১৯৫৭-৬০ সাল পর্যন্ত বামপন্থী ম্যাগাজিন *লিবারেশন*-এর সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সালে 'ওয়্যার রেজিস্টার্স লীগ'-এ যোগদান করেন। তিনি মার্ক্সবাদ ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস পদ্ধতির সমন্বয়ের প্রবক্তা। ১৯৫৮ সালে মার্কিন সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী হিসেবে এবং ১৯৬৮ সালে শান্তি ও স্বাধীনতা দলের প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৮০ সালে মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সমকামী প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বর্তমানে তিনি নিউ ইয়র্কে বসবাস করছেন এবং সমাজতান্ত্রিক ও শান্তিবাদী আন্দোলনগুলোতেও যুক্ত আছেন।

তারিক আলী: ইতিহাসবিদ ও ঔপন্যাসিক। জন্মসূত্রে পাকিস্তানী; বৃটেনে থাকেন। তাঁর অনেক লেখারই উপজীব্য মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এবং পশ্চিমা সমাজে মুসলমানদের অবস্থা। পাঁচটা উপন্যাস এবং ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক ১২-টারও বেশি বই লিখেছেন। অন্যতম গ্রন্থ *মাস্টার্স অব দ্য ইউনিভার্স: ন্যাটো'স বলকান ক্রুসেড*।

দাকিকি-ই-বল্‌খ: পুরো নাম আবু মনসুর মুহাম্মদ ইবনে আহমদি দাকিকি। আফগানিস্তানের কবি। খোরাসানের বল্‌খ শহরের স্থানীয় তাজিক। শুরুর দিকের দারি সাহিত্যের একজন ব্যতিক্রমী পুরুষ হিসাবে তিনি স্বীকৃত। তার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। সামদিন রাজসভায় তিনি ছিলেন বিদূষক। অনেক কবিতা ও গীতিকাব্য লিখলেও তিনি স্মরণীয় তাঁর মহাকাব্যের জন্য যার উপজীব্য *জেনদ্‌ আবেস্তা*-য় বর্ণিত প্রাচীন পারস্যবাসীর ধর্মের সূচনা এবং খোরাসানদের পৌরাণিক বীরদের যুদ্ধ ও সংঘাত। দাকিকি'র রচনাবলীকে ফেরদৌসীর

শাহনামা'র ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। মহাকাব্যিক সাহিত্যের প্রকরণগুলোর পথিকৃৎ হিসাবে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁকে দেয়া না গেলেও সাহিত্যের এই শাখায় তাঁর অবদান ব্যাপক। ফেরদৌসী তাঁর *শাহনামা*'য় দাকিকি'র কবিতা উল্লেখ করেছেন। ৯৮১ সালে তাঁর তুর্কী চাকরের হাতে খুন হন দাকিকি।

দুনিয়া আল-আবেদ আকাবি: প্যালেস্টাইনের কবি। দুনিয়া'র সাথে আমরা ই-মেইলে যোগাযোগ করেছিলাম। জানা গেল, তাঁর দাদী যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁরা প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত হন। এখন দুনিয়া কানাডায় থাকেন।

নরম্যান সলোমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া-নজরদারী সংগঠন 'ফেয়ার' (এফ.এ.আই.আর./ ফেয়ারনেস অ্যাণ্ড অ্যাকিউরেসি ইন রিপোর্টিং) এর সদস্য এবং 'ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক অ্যাকিউরেসি'র নির্বাহী পরিচালক। পশ্চিমা মিডিয়ার কর্পোরেট-পক্ষপাত ও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা বিষয়ে নিয়মিত লেখেন। তিনি মিডিয়া ও রাজনীতি বিষয়ক একজন সিন্ডিকেটেড কলামিস্টও বটে। এ পর্যন্ত তিনি ৮ খানা গ্রন্থ লিখেছেন যার মধ্যে রয়েছে *দ্য পাওয়ার অব ব্যবল*, *ফল্স হোপ*, *দ্য পলিটিক্স অব ইলিউশান ইন দ্য ক্লিনটন ইরা*। *বোস্টন গ্লোব*, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *ওয়াশিংটন পোস্ট*, *লস এঞ্জেল্স্ টাইম্স্*, *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন*, *জেড ম্যাগাজিন*, *দ্য প্রোগ্রেস* প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন এবং লিখছেন।

নাজনীন আখতার: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান-বিভাগে পড়াশোনা শেষ করেছেন। কিছু দিন কাজ করেছেন বেসরকারী সংস্থা 'প্রশিকা'র গবেষণা-শাখা 'ইমেক'-এ। তাঁর কাজের জায়গা তৃতীয় বিশ্বের নারীর লড়াই, ভাষা ও সংগ্রাম। বর্তমানে 'আদিবাসী নারীর কাজ' বিষয়ক একটা ফটো-ডকুমেন্টেশনের কাজ করছেন। ই-মেইল: nazneen_akter@eudoramail.com। ফোন: ০১৭১-১৮২৫২৯।

নূরুল ইসলাম: দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকায় কাজ করেন।

নোম চমস্কি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি'র (ম্যাসাচুসেট্স্ অফ টেকনোলজি) প্রফেসর মাত্র কদিন আগে 'অবসর' নিলেন। ভাষাবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মিডিয়া, সন্ত্রাসযুদ্ধ ও পররাষ্ট্রনীতির সমালোচক হিসাবে সব্যসাচী। নানা কারণে তাঁর নাম যতটা আলোচিত পরিচয় সাধারণ্যে ততটা বিদিত নয়। ১৯২৮ সালে পেনসিলভানিয়ার এক প্রগতিশীল ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে এমআইটিতে আছেন দর্শন ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগে। সারা পৃথিবী থেকে তাঁকে যে-ডক্টরেট ডিগ্রী ও অন্যান্য সম্মান দেয়া হয়েছে তা এত অসংখ্য যে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা কঠিন। তাঁকে যারা সম্মানসূচক ডক্টরেট দিয়েছে তাদের মধ্যে আছে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৭), শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৭), সোয়ার্থমোর কলেজ (১৯৭০), লয়োলা বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো (১৯৭০), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২), ম্যাসাচুসেট্স্ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩), বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮০), ও পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৫)। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ডিসটিঙ্গুইশ্‌ড্ সাইন্টিফিক কন্ট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৪) দিয়েছে। ১৯৮৮ সালে তাঁকে দেয়া হয়েছে বেসিক সাইন্সের কিয়োটো পুরস্কার। চমস্কি ১৯৬০-এর দশকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান একজন সমালোচকে পরিণত হন। মিডিয়া, সন্ত্রাসযুদ্ধ ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁর বইসমূহের মধ্যে আছে *আমেরিকান পাওয়ার অ্যান্ড দ্য নিউ ম্যানডারিন্স্* (১৯৬৯), *ফর রিজন্স্ অফ স্টেট* (১৯৭৩),

পিস ইন দ্য মিড্‌ল্‌ ইস্ট? (১৯৭৪), *হিউম্যান রাইট্‌স্‌ অ্যান্ড অ্যামেরিকান ফরেন পলিসি* (১৯৭৮), *আফটার দ্য ক্যাটাক্লিজম: পোস্টওয়ার ইন্দোচায়না অ্যান্ড দ্য রিকন্সট্রাকশান অফ অ্যামেরিকান ইমপেরিয়াল ইডিওলজি* (সহলেখক এডওয়ার্ড এস. হারম্যান) (১৯৭৯), *পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ হিউম্যান রাইট্‌স্‌* (১ম ও ২য় খণ্ড) (১৯৭৯), *দ্য ওয়াশিংটন কানেকশান্‌স্‌ অ্যান্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড ফ্যাসিজম* (সহলেখক এডওয়ার্ড এস. হারম্যান) (১৯৭৯), *লেকচারস অন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বাইন্ডিং* (১৯৮১), *টুওয়ার্ডস এ নিউ কোল্ড ওয়ার: এসেজ অন দ্য কারেন্ট ক্রাইসিস অ্যান্ড হাউ উই গট দেয়ার* (১৯৮২), *দ্য ফেটফুল ট্রায়াল: দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, ইজরায়েল অ্যান্ড দ্য প্যালেস্টাইনিয়ানস* (১৯৮৩), *দ্য কালচার অফ টেররিজম* (১৯৮৮), *ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট* (সহলেখক এডওয়ার্ড এস. হারম্যান) (১৯৮৮) *ডেটারিং ডেমোক্র্যাসি* (১৯৯১)। চমস্কি শৈশব থেকেই রাজনীতিতে আগ্রহী। রাজনৈতিক কারণেই ভাষাবিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন। নিজেকে পরিচয় দেন লিবার্টারিয়ান সোসালিস্ট হিসাবে।

ন্যান্সি হর্ণ: কবি। একজন মাঝবয়েসী আমেরিকান-খ্রিস্টান নারী। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সমর্থক।

ফরহাদ মজহার: কবি। প্রাবন্ধিক। পাক্ষিক *চিন্তা* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। নয়াকৃষি আন্দোলনের সংগঠক। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে: *খোকন এবং তাঁর প্রতিপুরুষ, ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি, আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে, সুভাকুসুম দুই ফর্মা, মেঘমেশিনের সঙ্গীত, গুবরে পোকার শ্বশুর, এবাদতনামা* প্রভৃতি। প্রবন্ধসংকলনের মধ্যে *প্রস্তাব, রাজকুমারী হাসিনা, সংবিধান ও গণতন্ত্র, জগদীশ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্পাদিত গ্রন্থ: *সাঁইজীর দৈন্যগান*।

ফরিদা আখতার: নারী আন্দোলনের নেত্রী। পাক্ষিক *চিন্তার* সম্পাদক। 'নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা'র পরিচালক। নারীমুক্তি ও পরিবেশ বিষয়ে নিয়মিত লেখালেখি করেন। অন্যতম গ্রন্থ: *সংরক্ষিত আসন সরাসরি নির্বাচন* (সম্পাদিত)।

ফাহমিদুল হক: বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক। এর আগে চট্টগ্রাম- ও রাজশাহী- বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগে পড়িয়েছেন। তিনি যোগাযোগ সাংবাদিকতা বিষয়ক পত্রিকা *যোগাযোগ*-এর সম্পাদক; যোগাযোগ-বিতর্ক ও -বীক্ষণের অনুপাঠশালা 'রেটোরিক'-এর প্রাক্তন সভাপতি। ছোটগল্প লেখেন, প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম *সে ও তার ছায়া*। তাঁর আগ্রহের বিষয়: মিডিয়া, যোগাযোগ-প্রযুক্তি, সাহিত্য, চলচ্চিত্র। ই-মেইল: fahmidulhaq@yahoo.com। মোবাইল: ০১৮-২৭২৯৯৯।

বখতিয়ার আহমেদ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। কিছুদিন নৃবিজ্ঞান পড়িয়েছেন ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ে। নৃবিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি অনুবাদের কাজ করেন নিয়মিত।

বদরে মুনীর: কবিতা লেখেন। নাটোরের আহমেদপুর কলেজের ইংরেজির শিক্ষক। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ: *আঙুলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা* এবং *মায়ার মুরতি, যাতনার যতি*।

বন্দনা শিবা: পদার্থবিদ, দার্শনিক, নারীবাদী। ভারতের হিমালয়-পাদদেশের দেরাদুন শহরে

জন্ম নেন। জনস্বার্থ রক্ষার লড়াইয়ের একজন দুর্দান্ত বক্তা। পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে নাগরিক তৎপরতায় তিনি সক্রিয়। চিপকো-আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি একটি বীজ-সংরক্ষণ-প্রকল্প পরিচালনা করেন যা ভারতীয় জাতীয় পরিবেশ পর্ষদের অন্তর্গত। ভারতব্যাপী তিনি তৃণমূল-সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত। খাদ্যের অধিকার আদায়ের একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনও তিনি পরিচালনা করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর সাথে কাজের সুবাদে ১৯৯৩ সালে তিনি 'রাইট লাইভলীহুড' পুরস্কার পান। ১৯৯২ সালে শিবা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ইকোলোজি বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি গবেষণা সংস্থা গড়ে তোলেন।

বারবারা এরেনরিখ: বারবারা এরেনরিখ *দ্য প্রগ্রেসিভ* পত্রিকার কলামিস্ট। *নিকেল অ্যাণ্ড ডাইম্‌ড্‌: অন (নট) গেটিং বাই ইন অ্যামেরিকা* নামে তাঁর একটা বই বেরিয়েছে 'মেট্রোপলিটান বুক্‌স্‌' থেকে ২০০১ সালে।

বাহার সায়ীদ: আফগান নারী-কবি। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী। (বাহারের পরিচয়ের জন্য মানুষ এর পক্ষ থেকে আফগান নারীদের বিপ্লবী সংস্থা রাওয়া'র সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁরা বাহারের কাব্যচর্চার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল বলে জানান, কিন্তু তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানাতে অপারগ হন তথ্যাভাবে।)

বুলান্দ আল-হায়দারি: ইরাকের কবি। বিস্তারিত পরিচয় জানা যায় নি।

মঈনুস সুলতান: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ এ পড়েন। সেই দেশের প্রতিরোধকর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এবং তাঁদের আন্দোলনে শরিক থাকেন সাধ্যমতো। নিয়মিত লেখেন মার্কিন দেশের প্রতিরোধ-আন্দোলনের নানান দিক নিয়ে।

মলয় কর্মকার: কবি। প্রচ্ছদশিল্পী। একসময় দৈনিক *মাতৃভূমি* পত্রিকায় কাজ করেছেন।

মাইকেল অ্যালবার্ট: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট *জেড নেট* ও *জেড ম্যাগাজিন* এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং *জেড ম্যাগাজিন* এর ওয়েব-ব্যবস্থার সিস্টেম-অপারেটরও। ষাটের দশকে ভিয়েতনামবিরোধী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখনও স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৎপর। *থিংকিং ফরওয়ার্ড, পার্টিসিপেটরি ইকোনোমিক্স, হোয়াট ইজ টু বি আনডান* প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখেন।

মাইকেল প্যারেন্টি: মাইকেল প্যারেন্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেখক। *Against Emperor*, *Dirty Truths*, *Blackshirts and Reds*-সহ তাঁর দশটিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়াকে সমালোচনা করে তাঁর রচিত দু-টি গ্রন্থ হলো: *Inventing Reality*, *Make Believe Media* – মাইকেল প্যারেন্টির সর্বসাম্প্রতিক গ্রন্থগুলো হলো *The Terrorism Trap*; *To Kill a Nation: The Attack on Yugoslavia*; এবং *Democracy for the Few*। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ হলো *The People's History of Ancient Rome* আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দি নিউ প্রেস থেকে বইটি বেরুবে।

মাইকেল ম্যান্ডেল: কানাডায় থাকেন। ফৌজদারী আইন, আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আইন, উচ্চতর ফৌজদারী আইন, ক্রিমিনোলজি, আইনী রাজনীতি এবং আধুনিক সংবিধানবিধি পড়ান। ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি অসগুড হল ল স্কুলে পড়াচ্ছেন। ইতালিয় আইন বিনিময় প্রকল্প'র প্রতিষ্ঠাতা এৰং বর্তমান পরিচালক। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, হিব্রু

বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। প্রফেসর ম্যান্ডেল কানাডার ‘চাটার্ড অব রাইট্‌স’ এর প্রণেতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিসহ অপরাধ, দ্বন্দ্ব, সংবিধান বিষয়ে তিনি বিস্তর লিখেছেন।

মানস চৌধুরী: জাহাঙ্গীরনগর-বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান পড়ান। পথ-নাটক তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নিম্নবর্গীয় গান। এইড্‌স্ ও যৌনতা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। সায়দিয়া গুলরুখের সাথে সম্পাদনা করেছেন নারীবাদী রচনা-সংকলন *কর্তার সংসার*। একই সহসম্পাদকের সাথে এখন করছেন *মা হাওয়া* সংকলনের কাজ। ই-মেইল: manosh@bd.drik.net।

মাহমুদুল হাসান সুমন: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান-বিভাগের শিক্ষক। রাজশাহী-বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান-বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। আগ্রহের বিষয় নৃবিজ্ঞান ও ভাষা, উন্নয়ন, লিঙ্গীয় বিষয়াবলী, এবং নিম্নবর্গীয় ইতিহাস। ছাত্রাবস্থায় ‘অশুচি’ ও পরে ‘যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ মঞ্চ’-র সাথে কাজ করেছেন। ই-মেইল: sumonmahmud@eudoramail.com। ফোন: ০১৭১-৪০১৪০০।

মার্ক স্টিল: বৃটেনের *দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট* (independent.co.uk) এর নিয়মিত কলামিস্ট।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান: কবি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। লেখক। রবীন্দ্রগবেষক। আল-কোরাণের অন্যতম বঙ্গানুবাদক। *যথাশব্দ* প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক।

মুসা মারুফী: তুলনামূলক আইন বিশেষজ্ঞ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব পোয়েট্রি তাঁকে চারবার ‘এডিটর’স চয়েস এ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করে। “ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব পোয়েটস” তাদের সম্মানিত সদস্য এবং বর্ষসেরা কবি হিসেবে ১৯৯৭ সালে তাঁর নাম ঘোষণা করে। ভয়েস অব আমেরিকা তার কবিতা প্রচার করেছে পশতুন এবং ইংরেজিতে।

মোহসেন মাখমালবাফ: ইরানের চলচ্চিত্র-পরিচালক। দক্ষিণ তেহরানের এক দরিদ্র অঞ্চলে মাখমালবাফের জন্ম, ১৯৫৭ সালে। কিশোর বয়সেই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন একটি ইসলামী জঙ্গী-গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং তারপর শাহ-এর বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৭৯ সালে ইরানের সামাজিক খোলনলচে বদলে-দেয়া বিপ্লব ঘটার আগে-আগে মাখমালবাফ ৫ বছর কারাগারে বন্দী ছিলেন। সেসময় তিনি ২০ বছর বয়সের এক রাজনৈতিক কর্মী। ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে এতোই অন্ধকার ও অনিশ্চিত মনে হতো যে কোন বন্যকল্পনায়ও তিনি ভাবতে পারেননি মাত্র ২০ বছর পরেই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন চলচ্চিত্রকার হয়ে উঠবেন। প্রকৃতপক্ষে যুবক বয়সে তার ধর্মীয় বিশ্বাস সিনেমা দেখা থেকে তাঁকে বিরত রেখেছিলো। অন্য কোন চলচ্চিত্র-পরিচালকের জীবন অল্প সময়ের ব্যবধানে মাখমালবাফের মতো এতো বেশি বিপ্লবী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বদলায়নি। আয়াতুল্লাহ খোমেনির বিপ্লবের ফলে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। এরপর তার সৃজনশীল তৎপরতাও অবারিত হয়। তিনি উপন্যাস লেখা এবং নাটক লেখায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৮২ সালে এসে তিনি প্রথম ছবিতে হাত দেন। ১৯৮৭ সালে করা *দ্য প্যাডলার* সিনেমাটি তাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। এসময় থেকেই তিনি তাঁর সিনেমার মাধ্যমে তার প্রথম যৌবনের প্রিয় মূল্যবোধগুলোকে প্রবলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকেন। ১৯৮৯

সালে নির্মাণ করেন *দ্য সাইক্লিষ্ট*। সিনেমাটিতে তিনি এক দরিদ্র আফগানের জীবন অঙ্কণ করেন। ১৯৯১ সালে করা *এ টাইম অব লাভ* এবং *দ্য নাইট্স অব দ্য জাইনদে* তাঁকে বিতর্কিত করে তোলে। ছবি দুটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় শারিরীক সম্পর্ক-ভালোবাসা দেখানোর জন্য ও বিপ্লব নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য। যদিও তাঁর বয়স এখনও ৫০-এর নিচে, ইতোমধ্যেই তিনি সিনেমা ও সাহিত্যের জগতে ব্যাপক অবদান রেখেছেন– প্রকাশিত হয়েছে ১৬টি তথ্যচিত্র, ২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৩০টি চিত্রনাট্য, ১০টি নাটক, ২টি প্রবন্ধ সংকলন এবং ২৮টি ছোট গল্প। ২০০০ সালে তাঁর নির্মিত *কান্দাহার* সাম্প্রতিক আফগানিস্তানের মর্মবিদারী পরিস্থিতির চিত্রদলিল।

<u>রবার্ট ফিস্ক</u>: বৃটেনের সবচাইতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সাংবাদিক; লণ্ডনের *দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট* পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ-প্রতিনিধি। পিএইচডি করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে। ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতায় তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করেছে। ১৯৭১–১৯৭৫ সাল সময়ে তিনি *লন্ডন টাইমস* পত্রিকার আইরিশ প্রতিনিধি হিসেবে বেলফাস্ট থেকে রিপোর্ট করতেন। ১৯৭৬ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করে চলেছেন। লেবাননে ইজরাইলী আগ্রাসণ (১৯৭৮-১৯৮২); ইরানী বিপ্লব (১৯৭৯); ইরাক-ইরান যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮); আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন (১৯৮০); উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯১); বসনিয়া যুদ্ধ (১৯৯২-১৯৯৬) এবং আলজেরিয়া সংকট (১৯৯২ থেকে চলমান) নিয়ে রিপোর্ট করেছেন। লেবাননের জাতিসংঘ-চত্ত্বরে ১৯৯৬ সালে শেল যে ইজরায়েলই নিক্ষেপ করেছিলো সেই তথ্য ফিস্কের রিপোর্ট থেকেই প্রথম জানা যায়। যে অল্প সংখ্যক সাংবাদিক বিন লাদেনের সঙ্গে আফগানিস্তানে তাঁর গোপন আস্তানাগুলোতে দেখা করতে পেরেছেন একাধিকবার, তাঁদের মধ্যে ফিস্ক একজন। সাংবাদিকতার নোবেল বলে পরিচিত পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৯৮ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাঁকে ওভারঅল মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড দেয়। সাত বার বৃটিশ ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিষ্ট অব দ্য ইয়ার এ্যাওয়ার্ড পান। ১৯৮৬ সালে পান জাতিসংঘের প্রেস এ্যাওয়ার্ড। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার জন্য ১৯৯৬ সালে তাকে জন্স হপকিন্স সিআইএএস-সিআইবিএ পুরস্কার দেয়া হয়। বেশকিছু বই লিখেছেন। তার মধ্যে লেবাননের গৃহযুদ্ধের সঠিক তথ্যাদি সম্বলিত *পিটি দ্য নেশান* উল্লেখযোগ্য।

<u>রাবিয়া বল্খি</u>: নবম শতাব্দীর বল্খ্ এর সামানিদ-বংশের রাজকন্যা। আফগানিস্তানের বিখ্যাত কবি রাবিয়া বল্খি। ভাই হারেথ-এর চাকর বাকতাস-এর প্রেমে পড়েন রাবিয়া। ক্রুদ্ধ হারেথ খুন করে বাকতাসকে। কথিত আছে, এই হত্যার সংবাদ শুনে রাবিয়া ছুটে যান যেখানে বাকতাসকে হত্যা করা হয়েছিলো এবং হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেন।

<u>রামজি বারুদ</u>: ফিলিস্তিনি লেখক রামজি বারুদ সিয়াটলভিত্তিক ওয়েবপোর্টাল *মিডল ইস্ট নিউজ অনলাইন* এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক।

<u>রিপন মাহমুদ</u>: ছড়া ও কবিতা লেখেন। নাটোর থেকে প্রকাশিত কবিতা বিষয়ক ছোটকাগজ *উটপাখি* সম্পাদনা করেন বদরে মুনীরের সাথে যৌথভাবে। নাটোর আলিয়া মাদ্রাসার জীববিজ্ঞানের শিক্ষক।

<u>রিফাত ফাতিমা</u>: এখন ঢাকার *নিউজ টুডে* পত্রিকায় কাজ করছেন। এনজিওতে ও বহুজাতিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কিছুকাল কর্মরত ছিলেন।

রেহনুমা আহমেদ: জাহাঙ্গীরনগর-বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান পড়াতেন। সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন লিখছেন পিএইচডি-থিসিস। বিষয় বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন, শ্রেণীগত পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক। rahnuma@bd.drik.net।

লতিফ নাজেমি: জন্ম ১৯৪৭ সালে আফগানিস্তানের হেরাত-প্রদেশে। সেখানে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্য সাহিত্যের ওপর পড়াশোনা করেন। নাজেমি কাবুল রেডিওতে সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে কাজ করেছেন এবং সেখানে তিনি 'সোনালি নিক্তি' নামে জনপ্রিয় একটা সাহিত্যবিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। একই সময়ে তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন পারস্য সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা। বার্লিনের হ্যামবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও নাজেমি পারস্য সাহিত্য পড়িয়েছেন যেখানে তিনি ভাষাতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা করেছেন। আরও শত শত আফগান বুদ্ধিজীবীর মতো তাকেও ১৯৮৭ সালে আফগানিস্তান ছাড়তে হয়েছে। এখন তিনি জার্মানীর ফ্রাংকফুট-এ থাকেন। *লেগুন এবং ছায়া ও লণ্ঠনে বাতাস* নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আফগানিস্তানের আধুনিক দারি সাহিত্য নিয়ে তার একটা ব্যাপক গবেষণা-সংগ্রহ প্রকাশের পথে। নাজেমির অনেক কবিতা ফরাসী, জার্মান, রুশ, আরবী, পোলিশ এবং মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তিনি ক্লাসিক ও আধুনিক পারস্য সাহিত্য বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছেন।

লায়লা সারাহাত: অগ্রবর্তী আফগান মহিলা কবি। ১৯৭৭ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তার মা, সুপরিচিত আফগান সাংবাদিক, সারলার রুশানি, খুন হন আফগানিস্তানে কম্যুনিস্ট শাসনকালে খালকি গোত্রের সদস্যদের হাতে। লায়লা ভাইবোনকে হারান অস্ট্রেলিয়ায়। বোনের মৃত্যুশোক না সামলাতেই তার মা নিহত হন। কাবুলে থেকে যাওয়া অল্প কয়েকজন কবির মধ্যে তিনি একজন, এবং তিনি কাবুলে সংঘটিত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ আর হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষকে হত্যার নৃশংসতা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন। ক্লাসিক এবং আধুনিক দুই ঢঙেই কবিতা লেখেন লায়লা সারাহাত। দুটো কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, *অবিরত আর্তনাদ* এবং *সবুজ সকাল*। আফগান নারীদের ওপর তালিবান যোদ্ধাদের অত্যাচার মাত্রাতিরিক্ত রূপ নিলে তিনি কাবুল ছাড়তে বাধ্য হন। আপাতত তিনি নেদারল্যান্ডস-এ থাকছেন।

শাবগির পুল্লাদিয়ান: জলিল শাবগির পুল্লাদিয়ান এর জন্ম ১৯৫৫ সালে। তার জন্মস্থান উত্তর আফগানিস্তানের রুস্তাক যা গত বছরের এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। রুস্তাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা শেষ করার পর তিনি ১৯৭৭ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি কাবুল ও হেরাত এ কাজ করেছেন এবং ১৯৮১ সালে আফগান বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য হন। একই সাথে তিনি বেশকিছু সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। পুল্লাদিয়ানের প্রথম দিকের কবিতা কাবুল ও হেরাত এর বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে কাবুলে গোপনে গঠিত মৌলভী জালালুদ্দিন রুমি বল্খি'র 'ভক্তসভা'র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পুল্লাদিয়ান ছিলেন সক্রিয় কর্মী এবং তাঁর কবিতা ও গদ্য লেখালেখি তারই সাক্ষ্য দেয়। তাঁর অনেক কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। যাদের মধ্যে সাম্প্রতিকতম হল দুর্ভাগ্যের দিগন্ত। অন্যান্য গ্রন্থ: *ছাইয়ের গাদার ওপরে, নির্বাসনের মুহূর্ত, মহাকাব্য থেকে কল্পনায়, পাহাড়ের জন্য গাথা* ইত্যাদি। ১৯৮৯ সালে পুল্লাদিয়ান আফগানিস্তান ছেড়েছেন এবং বর্তমানে হামবুর্গ-এ স্ত্রীর সাথে বসবাস করছেন। সম্ভবত তার প্রজন্মের মধ্যে

তিনিই সবচেয়ে উচ্চকিত রাজনৈতিক কবি। পারস্য সাহিত্যের ক্লাসিক ও আধুনিক-উত্তর ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যাপক জানাবোঝা। বিশ্বসাহিত্যের ওপর তার দখল অগাধ। তাঁর কবিতা স্মৃতিকাতরতা, আবেগের প্রচণ্ডতা, ক্রোধ, দেশপ্রেম আর গীতলতায় পূর্ণ।

সলিমুল্লাহ্ খান: *রাষ্ট্রসভা পত্রমালা*-র প্রধান সম্পাদক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএস-এও শিক্ষকতা করেছেন। কবি। অনুদিত কাব্যগ্রন্থ: *আল্লাহর বাদশাহী*। আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার অন্যতম সংগঠক। যোগাযোগ: ৪/৩ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৬। salim_khan@yahoo.com।

সাইয়িদ রাহ্‌মাতুল্লাহ্ হাশেমী: আফগানিস্তানের উৎপাটিত তালেবান সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত ছিলেন মাত্র ২৪ বছর বয়েসে। তিনি আফগানিস্তানের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। চারটা ভাষায় তাঁর দখল আছে। বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে পশ্চিমের পণ্ডিতদের মনোযোগ কেড়েছেন। তালেবান-আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় একটা শরণার্থী-শিবিরে ছিলেন। নিজে থেকে তালেবানদের সাথে যোগ দেন। এখন তিনি কোথায় জানা মুশকিল।

সায়দিয়া গুলরুখ: নারী আন্দোলনের সংগঠক। মানস চৌধুরীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন নারীবাদী রচনাসংকলন: *কর্তার সংসার*। মানসের সাথেই সম্পাদনার কাজ করছেন অপর সংকলন *মা হাওয়া*'র। ই-মেইল: saydia@bd.drik.net।

সুমন কায়সার: দৈনিক *প্রথম আলো*-তে কাজ করতেন। এখন *ইত্তেফাক*-এ কর্মরত আছেন।

সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর-বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। *ফোকলোর-জার্নাল* এর সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য। ফোকলোর-বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'বটতলা'-র সভাপতি। কবিতা লেখেন, সাহিত্য-পর্যালোচনা করেন, ছোট কাগজে কাজ করেন। ই-মেইল: sunewton@librabd.net। মোবাইল: ০১৭১-৮৬০৩৬৪।

সেলিম রেজা নিউটন: রাজশাহী-বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ-বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সভাপতি। অধুনালুপ্ত *অ্যাডকমসো-জার্নাল* এর সম্পাদক। বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে আশির দশকের শুরু থেকে যুক্ত। লেখালেখি করেন। ছোট কাগজের কর্মী। ই-মেইল: sunewton@librabd.net। মোবাইল: ০১৭১-৮৬০৩৬৩।

সোনালী কোলহাৎকর: আফগান উইমেন্স মিশনের সহ-সভাপ্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ-ক্যাম্পাসে, ফোরামে কথা বলেছেন আফগান নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এবং তার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ "The Impact of US Intervention on Afghan Women's Rights" বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের *Women's Law Journal*-এ প্রকাশিত হবে। জ্যোতির্বস্তুবিদ্যার (অ্যাসট্রোফিজিক্স) উপর হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন।

স্টিভেন আর. শ্যালোম: স্টিভেন শ্যালোম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির উইলিয়াম পিটারসন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ান। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে *স্যোসালিস্ট ভিশন* (১৯৮৩); *দ্য ফিলিপাইন্স রিডার* (১৯৮৭); ইত্যাদি। তিনি *জেড ম্যাগাজিন*-এ নিয়মিত লেখেন এবং সচেতন এশীয় বুদ্ধিজীবী এবং নয়া রাজনীতি বিষয়ক বুলেটিনের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য।

হাওয়ার্ড জিন: হাওয়ার্ড জিন ইতিহাসবিদ ও চিত্রনাট্যকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়াতে প্রথমত তিনি স্পেলম্যান কলেজে পড়াতেন, তারপর বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি গণঅধিকার আন্দোলনে সক্রিয় আছেন। ভিয়েতনাম-যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি তৎপর ছিলেন। অনেক বই লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে সুপরিচিত হলো *এ পিপল্স হিস্ট্রি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেট*। তার সর্বসাম্প্রতিক বই ইউ *কান্ট বি নিউট্রাল অন এ মুভিং ট্রেন*।

হান্জালা-ই-বাদ্ঘিস: দশম শতাব্দীর দারি সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ হান্জালা-ই-বাদ্ঘিস।

হানান আশরাবি: আরবলীগের তথ্যমন্ত্রী। প্যালেস্টাইনের আইনপরিষদের সদস্য। বার্জিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন; কলা অনুষদের ডিন। প্যালেস্টাইনের কূটনৈতিক-পরিষদের এবং ইনতিফাদা-কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের পরে, ১৯৯১ সালে, ইয়াসির আরাফাত তাঁকে মধ্যপ্রাচ্য-শান্তিপ্রক্রিয়ায় প্যালেস্টাইনী প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র পদে নিয়োগ দেন। ১৯৯৮ সালে তিনি পদত্যাগ করেন রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, বিশেষত শান্তি-আলোচনা আরাফাত যেভাবে পরিচালনা করেন তার প্রতিবাদে। ধর্মে খ্রিস্টান এই প্যালেস্টাইনীর জন্ম ১৯৪৬ সালে; ধনী পরিবারে। পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহরে বেড়ে উঠেছেন। ২২ বছর বয়েসে তিনি ইসরাইল-অধিকৃত প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত হন। বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি-সাহিত্যে পড়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে পিএইচডি করেছেন। লিখেছেন *দিস সাইড অফ পিস: এ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট*; কবিতা, গল্প-উপন্যাস আর সাহিত্য-সমালোচনার একাধিক সংকলন প্রণয়ন করেছেন। কার্টার-সেণ্টারের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য।

মানুষ

নোম চমস্কি
অরুন্ধতী রায়
এডোয়ার্ড সাঈদ
মাইকেল প্যারেন্টি
এডোয়ার্ড এস হারম্যান
বন্দনা শিবা
রবার্ট ফিস্ক
বারবারা এরেনরিখ
এন্ড্রু মার
জে টি হ্যারিস
মার্ক স্টিল
ক্যাথরিন ফিনার
মাইকেল ম্যান্ডেল
জন পিলজার
অ্যান ট্যালবট
তারিক আলী
সোনালী কোলহাৎকর
ন্যান্সি হর্ন
ওসামা বিন লাদেন
Norman Solomon
Howard Zinn
Albert and Shalom
Herman and Peterson
David McReynolds
মোহসেন মাখমালবফ
জামালুদ্দিন রুমি
শাবগির পুল্লাদিয়ান
কাহার অলি
বাহার সায়ীদ
লায়লা সাবাহাত
ড. আমিন আজিমী
জেবা শারিল শামলি
মুসা
ফরহাদ মজহার

সলিমুল্লাহ খান
বদরে মুনীর
সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী
রেহনুমা আহমেদ
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
ফাহমিদুল হক
রিফাত ফাতিমা
আ-আল মামুন
মাহমুদুল হাসান সুমন
নাজনীন আখতার
মঈনুস সুলতান
আসিফ নজরুল
হাফিজুর রশীদ
রিপন মাহমুদ
উদিসা ইসলাম
অসীম কুমার দাস
আফাজউদ্দিন বিপ্লব
আবু নাসের মোহাম্মদ ওয়াহিদ
আমিনুর রহমান
গাউস রহমান পিয়াস
গুঞ্জন চৌধুরী
ফরিদা আখতার
বখতিয়ার আহমেদ
মানস চৌধুরী
মাহমুদুল হাসান সুমন
সায়দিয়া গুলরুখ
সুমন কায়সার
নাসিমা সেলিম অলিক
সেলিম রেজা নিউটন
মলয় কর্মকার
নূরুল ইসলাম
আ ন ম ওয়াহিদ
জুয়েল মাজহার
শিবব্রত বর্মন

প্রচ্ছদ - সেলিম আহ্‌মেদ

মানুষ

মানুষ আর প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা

"...সন্ত্রাস অন্য ভাবেও কাজে আসে এবং সন্ত্রাস ক্ষমতাশালীদের একটা অস্ত্র। সন্ত্রাসকে দুর্বলদের অস্ত্র হিসেবে সচরাচর যেভাবে বলা হয় সেভাবে বললে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক ভুল থেকে যায়। সহিংসতার অন্যান্য হাতিয়ারগুলোর মতো সন্ত্রাসও প্রধানত ক্ষমতাশালীদের অস্ত্র– অভাবনীয়ভাবেই। সন্ত্রাসকে দুর্বলদের অস্ত্র বলা হয় এ-কারণে যে, ক্ষমতাশালীরা মতাদর্শিক ব্যবস্থাটিকেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের সন্ত্রাসকে কখনোই সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য করা হয়না।"

[নোম চমস্কি : *'সন্ত্রাসবাদ কাজে লাগে'*]

"সমস্ত সন্ত্রাস সম্পর্কে যা খারাপ তা হলো যখন এটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণা আর সরলায়িত মিথ (যা ইতিহাস ও বোধবুদ্ধির দিক থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়)-এর সাথে যুক্ত হয়। এই হলো সেই জায়গা যেখানে সেকুলার চেতনাকে চেষ্টা করতে হবে যেন তার অস্তিত্ব অন্যেরা টের পায়– সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোক বা মধ্যপ্রাচ্যে। কোনো কারণ, কোনো ঈশ্বর, কোনো বিমূর্ত ধ্যানধারণা নিরীহ লোকাজনের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞকে জায়েজ করতে পারে না– অন্তত বিশেষত যখন নাকি ছোট একটা গ্রুপ এরকম দায়িত্বে থাকে এবং সত্যিকারের কোনো ম্যাণ্ডেট না– থাকা সত্ত্বেও নিজেরাই নিজেদেরকে ঐ উদ্দেশ্যের প্রতিনিধি মনে করে।..."

[এডোয়ার্ড সাঈদ : *'ইসলাম এবং পশ্চিম ব্যানার হিসেবে অপর্যাপ্ত'*]

"বিশ্বটাকে শয়তানমুক্ত করতে আর কতো ইরাকি মানুষ মেরে ফেলতে হবে? প্রতিটি নিহত মার্কিন নাগরিকের জন্য কতোটি আফগানের লাশ চাই? প্রতিটি নিহত পুরুষের বিপরীতে কতোটি নারী ও শিশুর মরদেহ? প্রতিটি নিহত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারের লাশের বিপরীতে শুইয়ে দিতে হবে কতোটি মুজাহিদিনের লাশ? আমরা যখন ইনসাফের এই বীজগণিতের ধাঁধাঁ মেলাতে ব্যস্ত, ততোক্ষণে সারা বিশ্বের টেলিভিশনের পর্দায় উন্মোচিত হচ্ছে অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম।"...

[অরুন্ধতী রায় : *'ইনফিনিট জাস্টিস'-এর বীজগণিত*]

ISBN 984 8243 20-8
9 789848 243206

SHAMABESH

একটি সমাবেশ প্রকাশনা

রাজনীতি/সমাজবিজ্ঞান/আন্তর্জাতিকতা/মিডিয়া

US $ 15.95
B.TK. 495